ষা পথে সমস্যা শুকনো পায়ে চলা। এই সমস্যার সমাধান বাটার ওয়াটার-
তা। রবারের জুতো আগাগোড়া ছিদ্রহীন, তাই জলের প্রবেশপথ বন্ধ। এই
জুতোয় প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার, বাটার জুতোয় তা পাবেন। মসৃণ চিক্কণ রবার,
হারেও কেনার প্রথম দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম। আরামের জন্য
কাপড়ের লাইনিং। তাছাড়া, সোল আর হিল-এ এমন নকশার কৌশল,
তপক্ষে হড়কাবে না।

পরিচয়

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ১
শ্রাবণ, ১৩৭০

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

১

সূচীপত্র

খাসা সিগারেট

আজই খেয়ে দেখুন লেক্স

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

মের মেছো নন্দলাল বসু

নন্দলাল বসু' থেকে

ভবানী সেন

মার্কসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

মার্কসের ১৮৪৪ সালের অর্থনীতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিটি এতকাল ইংরেজি ভাষায় অপ্রকাশিত ছিল। কিছুকাল আগে তা প্রকাশিত হয়ে মার্কসবাদী দর্শনের মূল দৃষ্টিকোণের একটি স্বচ্ছ পরিচয় পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করেছে। অনেকের ধারণা প্রথম জীবনের এই প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব আছে মনে করেই মার্কস কিংবা এঙ্গেলস এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করার কথা ভাবেন নি। আবার কোনো কোনো পাঠক মনে করেন তরুণ মার্কস যে প্রবীণ মার্কসের চেয়ে অনেক বিষয়ে বেশি পরিণত ছিলেন তারই পরিচয় এই গ্রন্থখানি বহন করছে। কিন্তু এ সবই নিছক জল্পনা-কল্পনা। অতি-কল্পনা ছেড়ে দিয়ে আসুন আমরা পুস্তকের বিষয়বস্তুর মধ্যেই প্রবেশ করি।

আলোচ্য গ্রন্থে দেখা যায় যে বহুস্থানে মার্কসের লেখা অসম্পূর্ণ। এরূপ অসম্পূর্ণতা "ক্যাপিটাল", তৃতীয় খণ্ডেরও স্থানে স্থানে আছে এবং তা পূরণ করেছেন এঙ্গেলস। কিন্তু মার্কস যা ব্যক্ত করেছেন তা এত সমৃদ্ধিশালী যে অব্যক্ত অংশ তাঁকে বুঝবার পথে কোনো অনতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে না। অবশ্য, মার্কসের কোনো বিশেষ সময়ের বিশেষ লেখার অর্থ বুঝতে হলে তাঁর সমগ্র লেখার মধ্যে প্রকট সমগ্র চিন্তার কথা মনে রেখে বুঝতে হবে, আলোচ্য গ্রন্থখানিও তার ব্যতিক্রম নয়।

মার্কস এই পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেছিলেন ১৮৪৪ সালে—অর্থাৎ, প্রথম যখন তিনি হেগেলীয় দর্শনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে হেগেলকে পায়ের

Economic and Philosophic Manuscripts of 1844: K. Marx, Foreign Language Publishing House, Moscow.

উপর দাঁড় করিয়ে মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কাঠামো তৈরী করতে আরম্ভ করেন। বলা যেতে পারে যে এই লেখাটি সমগ্র মার্কসবাদী দর্শনের একটি ভূমিকা। আলোচ্য পুস্তকে মার্কস তাঁর দার্শনিক বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে বসেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দর্শনকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা।

আলোচ্য গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি হেগেলীয় দর্শনের যে সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি ভাববাদের মূল দৃষ্টিকোণের আত্মবিরোধ প্রস্ফুটিত করেছেন। হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষে এই অংশটি বোঝা কঠিন কিন্তু তবু এটা বুঝতে পারবেন যে 'আইডিয়াকে' সত্তার আদি রূপে কল্পনা করে হেগেল এমন এক স্ববিরোধিতার গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছেন যেখানে ভাববাদ চিরসমাধি লাভ করেছে। ভাববাদী চিন্তাধারার মধ্যে হেগেলের প্রণালীই সবচেয়ে সুগঠিত, সুতরাং তার মধ্যেই ভাববাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়েছে, বস্তুবাদকেও দিয়েছে বৈজ্ঞানিক ভূমিকা।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে মার্কস বস্তুবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত করে দেন। কিন্তু মার্কস মনে করেছিলেন যে শুধুমাত্র বিমূর্ত ভাবে দর্শনকে উপস্থিত করলে পাঠকবর্গ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃত সামাজিক সমস্যা ও ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা অবলম্বন করে দার্শনিক তত্ত্বকে মূর্তরূপে উপস্থিত করাই ছিল মার্কসের পদ্ধতি। সম্ভবত সেই জন্যই তিনি আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে একটি সাধারণ ছক তৈরী করে অপ্রকাশিত অবস্থায় নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন নিজেরই বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। তারপর তিনি সারাজীবন ধরে ইতিহাসের এক একটি বিশিষ্ট অধ্যায় ধরে ধরে সাধারণ তত্ত্বকে রূপায়িত করে গেছেন। আলোচ্য পুস্তকে আমরা পাই তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিহিত তত্ত্বমালার একটি ঘনীভূত নির্যাস। এর মধ্যে আছে মার্কস এবং এঙ্গেলসের দার্শনিক চিন্তাধারার সারাংশ। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর সমগ্র বক্তব্য জানা না থাকলে এই সদ্যপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি বোঝা যাবে না।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদী দর্শনের মূল নিয়ম হল দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সত্তার পরিবর্তন। এক সত্তা পরিবর্তনসূত্রে অন্য সত্তায় পরিণত হয়, কেননা সত্তার মধ্যে আছে দ্বন্দ্বের সংঘাত এবং সমাবেশ। স্ববিরোধী সত্তা দ্বন্দ্বসংঘাতের ভিতর দিয়ে নিজেকে হারিয়ে অন্য সত্তায় পরিণত হচ্ছে, আবার এই নতুন

সত্তারও হচ্ছে পরিবর্তন অর্থাৎ হারানোকেও সে হারিয়ে ফেলেছে। এ নিয়মটি বোঝাবার জন্য এঙ্গেলস 'সোশালিজম—ইউটোপিয়ান ও সায়ান্টিফিক'-নামক পুস্তকে একটি সহজ উদাহরণ দিয়েছিলেন। উদাহরণটি এই : বীজের ভেতর যখন অঙ্কুর গজায়, বীজ তখন নিজ সত্তা হারাতে আরম্ভ করে অঙ্কুরের ভেতর। বীজের আবরণ ভেঙে যে চারা বোরোয় তার মধ্যে বীজের ঘটেছে আত্মবিলোপ (alienation)। চারাও নিজেকে হারায় অহরহ, চারা হয় গাছ, গাছে ধরে ফল, ফলের মধ্যে জন্মে আবার বীজ। যে বীজ নিজেকে হারিয়েছিল চারার মধ্যে, সেই হারানোটা এতক্ষণে হারিয়ে গেল, পাওয়া গেল নতুন বীজ, ঠিক আগেকার বীজটি নয়, নতুন বীজ, বহুতর সংখ্যায়। এমনিভাবে বহু পুনরাবর্তনের পর দেখা যায় আদি বীজের পরিবর্তন ঘটেছে পরিণত বীজের মধ্যে। এমনি ভাবেই এক উদ্ভিদ আর এক উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। এই নিয়ম চলছে জীবজগৎসহ সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে।

অর্থাৎ, পরিবর্তন মানেই হল একের অবলুপ্তি অন্যের ভিতর, কিন্তু তারপরই আবার এই অবলুপ্তিরও ঘটেছে অবলুপ্তি। এমনিভাবেই নিত্য নতুনের আবির্ভাব ঘটছে। পুরাতনের গর্ভেই নতুনের জন্ম, আজ যা নতুন কাল আবার তাই পুরাতন, সেই পুরাতনের গর্ভে আবার জন্মাচ্ছে নতুন। অর্থাৎ স্থিতির ঘটছে নিরোধ, তারপর নিরোধেরও নিরোধ ঘটছে (negation of negation or alienation of alienation)।

হেগেলের দর্শন অনুসারে আইডিয়া থেকেই বস্তুর উদ্ভব, প্রথম নিরোধ (alienation) হল বস্তুর মধ্যে আইডিয়ার লয়। তারপর আবার আইডিয়ার মধ্যে ঘটছে বস্তুর লয়, এবার হচ্ছে নিরোধের নিরোধ (alienation of alienation)। অর্থাৎ, আইডিয়ার আত্মবিলোপই বস্তুর বস্তুত্ব।

হেগেলের কাছে 'মানুষ' একটি আইডিয়া—যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ যুগের মানুষও নয়। বিশিষ্ট ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে নির্বিশিষ্ট 'মানুষের' নিরোধ ঘটেছে, অর্থাৎ মূর্ত মানুষের মধ্যে বিমূর্ত মানুষের সত্তা গেছে হারিয়ে। মার্কসের কাছে আদিম যুগের প্রাক্-মানবীয় জীব থেকে যে মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে, সে হলো সত্যকার বিশিষ্ট মানুষ। তারই ক্রমবিবর্তনে বর্তমান যুগের বহু সংখ্যক ব্যক্তি-মানুষ দেখা দিয়েছে, সেই মানুষেরই চেতনার মধ্যে 'মানুষ' এই আইডিয়ার জন্ম। এই নির্বিশিষ্ট মানুষের কোনো স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা নেই, তার মধ্যে বিশিষ্ট মানুষের

স্বতন্ত্র সত্তা নিরুদ্ধ হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কে 'মানুষ' সম্পর্কে আইডিয়া থেকে বাস্তবসমাজে প্রকৃত মানুষ নিজেকে বদলায়, বাস্তবের মধ্যে আইডিয়ার ঘটে নিরোধ, তার ফলে দেখা দেয় নতুন মানুষ। হেগেলের মতে মানুষের চেতনাই আসল মানুষ, চেতনার পরিহার ঘটলে থাকে শরীরী ব্যক্তি। মার্কসের মতে, শরীরী মানুষটাই আসল মানুষ, তার মূর্ত সত্তা পরিহৃত হয় 'মানুষ' এই বিমূর্ত ও নির্বিশিষ্ট আইডিয়ায়।

মানুষের মানবতা নিয়েই বিবিধ দার্শনিক সমস্যার সূত্রপাত। মার্কস তাই তাঁর এই প্রথম দার্শনিক ছকে মানবতার দার্শনিক সমস্যাকেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। হেগেলের ভাববাদী নিরোধ তত্ত্বকে তিনি বস্তুবাদী নিরোধতত্ত্ব দিয়ে খণ্ডন করেছেন বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে।

মানবতার সমস্যা হল মানুষের স্বাধীনতার সমস্যা। আদিম যুগের প্রথম মানুষ তার অভাবের দাস, জীবনধারণের জন্য সে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিজ সত্তাকে হারাল প্রকৃতির কাছে, প্রকৃতির উপর আরোপ করল নিজ সত্তার নিয়ন্তা। জীবনধারণের সম্পদটাই হয়ে দাঁড়াল প্রকৃত জীবন। মানুষ তখন প্রকৃতির নিয়ন্তা নয় প্রকৃতিই তখন মানুষের নিয়ন্তা। সুতরাং মানুষের মানবতার নিরোধ ঘটছে প্রকৃতির মধ্যে।

অথচ মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ। আদিমতম মানুষ নিজ সত্তাকে হারিয়েছে নিজ বহির্ভূত প্রকৃতির মধ্যে। এইখানেই ঘটেছে মানুষের নিজ সত্তার নিরোধ (alienation)।

মার্কসের বক্তব্য বুঝবার জন্য এই সূত্রে কমিউনিজম-এর তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ের তুলনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় আদিম যুগের ট্রাইবাল কমিউনিজম বা বর্বরতা। এই সমাজে শ্রম সমষ্টিগত এবং আহৃত সম্পদ যৌথ। এই সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত। কারণ, যে প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে মানুষের নিজ সত্তা নিরুদ্ধ (alienated), তা এখন যৌথ সম্পদ, তাই যূথের মধ্যে ব্যক্তি-সত্তা বিলীন হয়ে রয়েছে। মানুষের নিজ সত্তা শ্রম, শ্রমও মানুষের ব্যক্তি-সত্তা থেকে পরিহৃত হয়ে যৌথ সত্তার মধ্যে বিলীন।

কমিউনিজম-এর দ্বিতীয় পর্যায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত সমাজ।

এই সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহ সামূহিক, কিন্তু ভোগ্য সম্পদ এবং শ্রম ব্যক্তির নিজস্ব। এই সমাজেও সম্পত্তির ভিতর মানুষের নিজ সত্তার নিরোধ সম্পূর্ণ ঘোচে নি। প্রথম যুগে যে-সম্পত্তির মধ্যে মানুষ তার নিজ সত্তাকে হারিয়েছিল, সেই সম্পত্তি এখন সমাজের ; ব্যক্তির শ্রম সমাজকে দিতে হয়, সমাজের সামূহিক সম্পদ থেকে সে পায় তার শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত সম্পদ। ব্যক্তিসত্তা এখানেও সমাজ কর্তৃক সীমিত, কারণ এই সমাজেও অভাব আছে। অভাবের প্রতিকার সম্পদ, সম্পদের মালিক সমাজ, মানুষের নিজ ব্যক্তিসত্তা এখানেও সীমিত। অভাবের ভিতর দিয়েই মানুষের ব্যক্তিসত্তার নিরোধ ঘটেছে, অভাবের সম্পূর্ণ অবসানেই ব্যক্তিসত্তার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা।

কমিউনিজম-এর তৃতীয় পর্যায় হল উচ্চতম স্তরের কমিউনিস্ট সমাজ, প্রাচুর্যের উপর যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, মানুষ যেখানে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করবে। এই সমাজে যার যেমন সাধ্য সে তেমন কাজ করবে, যার যেমন প্রয়োজন সে তেমন পাবে। এই সমাজেই দেখব যে মানুষের নিজ সত্তা সে নিজের মধ্যে ফিরে পেয়েছে, নিরোধের ঘটেছে নিরোধ। এঙ্গেলস এই যুগের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এই অবস্থায় মানুষ বাধ্যবাধকতার রাজ্য ছেড়ে স্বাধীনতার রাজ্যে প্রবেশ করবে। আলোচ্য পুস্তকে মার্কস তাই ঘোষণা করলেন যে কমিউনিজম হল মানবতাবাদ ; ব্যক্তিমানুষের সত্তার লয় নয়, তার প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য, কমিউনিজম সেই লক্ষ্যে পৌছবার পন্থা।

আদিম ট্রাইবাল কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্র এই দুই যুগের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিভিন্ন যুগে বিভক্ত, কিন্তু তার সাধারণ চরিত্র হল এই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীর অবস্থানের ওপর। দাসযুগের দাস, সামন্ত যুগের ভূমিদাস এবং ধনতান্ত্রিক যুগের সর্বহারা শ্রমিক নিজেকে অন্য মানুষের মধ্যে হারিয়েছে ; যে মানুষ প্রথম নিজেকে হারিয়েছিল বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে, এখন অন্য মানুষ তার হারানো সত্তার অধিকারী। এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শ্রমশক্তির অপহরণই এই সমাজের মেরুদণ্ড।

আদিম সমাজে মানুষ ছিল প্রকৃতির দাস, ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুগে মানুষ

মানুষের দাস। দাসত্বই মানুষের নিরুদ্ধ সত্তা (alienated self)। এক ব্যক্তির সত্তা তখন অন্য ব্যক্তির মধ্যে সাযুজ্য লাভ করেছে।

কমিউনিজমের দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ আমরা বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলি সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সেই সমাজে মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব ঘুচেছে, প্রাক্তন সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামূহিক হয়েছে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তবু ঘটেনি। এই সমাজের যৌথসম্পত্তি হল প্রাক্তন সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরোধ অর্থাৎ শ্রমসম্পদ অপহরণকারীর ঘরে সঞ্চিত হৃতসম্পদের অপহরণ। একে অপহরণের অপহরণ বলা যেতে পারে। মানুষের পরিহৃত সত্তা (alienated self) এই অবস্থায় ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে তার স্বস্থানে।

প্রাগ্ঐতিহাসিক মানুষ সম্পত্তির মধ্যে নিজেকে হারিয়েছিল; এই সম্পত্তি প্রথম হল ব্যক্তির, পরে হলো সমাজের, কিন্তু সম্পত্তি তবু সম্পত্তিই রইল; মানুষের পরিহৃত বা অপসৃত সত্তার বিগ্রহরূপেই সম্পত্তি বিরাজিত। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে (কমিউনিজম এর দ্বিতীয় পর্যায়) ব্যক্তির মধ্যে সেই হারানো সত্তার পুনঃপ্রবেশ ঘটছে, নিরোধ এখন অপসৃয়মান (transendence of alienation)। শেষ পর্যায়ের কমিউনিস্ট সমাজে নিরোধ হল নিরুদ্ধ (alienation is alienated), মানুষ ফিরে পেল তার নিজ সত্তা অথবা বলা যায় মানুষের ঘটল মুক্তি। ব্যক্তির জীবন এখানে প্রস্ফুটিত, মানবতার নিয়মেই মানুষ পরিচালিত; ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বিরোধের হল অবসান। এখন থেকে মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ !

প্রথম যখন মানুষ হল তখন মানুষ বলতে কোনো আইডিয়া ছিলনা। তারপর মানুষ বলতে একটা আইডিয়া হল কিন্তু আসল মানুষ সেই আইডিয়ার মধ্যে নেই। প্রকৃত মানুষের নিরোধ ঘটেছিল আইডিয়ার মানুষের মধ্যে, তখন আইডিয়ার মানুষ এল প্রকৃত মানুষের মধ্যে।

হেগেল ঠিক এই পদ্ধতিকেই উল্টো করে দেখিয়েছেন।

হেগেলের পদ্ধতি অনুসরণ করলে দাঁড়ায় এই যে প্রকৃত মানুষের আগে আছে আইডিয়ার মানুষ বা সুপারম্যান্। আসল মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে ও ধর্মের মধ্যে। সুপারম্যানের নিরুদ্ধ সত্তাই বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের ও বিশেষ বিশেষ ধর্মের মানুষের বিশেষ বিশেষ

পরিচয় বহন করে। এই সমস্ত পৃথক পৃথক ব্যক্তিসত্তার অবলোপ ঘটবে আবার সেই সুপারম্যানের মধ্যে। এক কথায় শেষ পর্যন্ত ধর্মেই মানুষের মুক্তি। বিশিষ্ট ধর্ম নিরুদ্ধ হবে নির্বিশিষ্ট ধর্মে।

মার্কসের পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম মানুষেরই নিরুদ্ধ সত্তা। ধর্ম নিরুদ্ধ হবে মানুষের মধ্যে মানবতার প্রতিষ্ঠায়। হেগেল ধর্মকে মানবতার নিরুদ্ধ সত্তা ঘোষণা করে ধর্মেই এসে পৌছচ্ছেন, মার্কস পৌছলেন মানবতায়।

এই সূত্রে মার্কস জনমানবের বা মনস্তত্ত্বের মর্ম উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন, যে-কোনো যুগের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মূলে আছে মানুষের নিজ সত্তার নিরোধের বিশিষ্টতা। এ বিষয়ে সংক্ষেপে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় এই :

একদা যে মানুষ প্রকৃতির দাস ছিল, প্রকৃতিই তার নিয়ন্তা। প্রকৃতির মধ্যে সে নিজেকে হারিয়েছে তাই সে নিজেকে চেনে না। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি তার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের আকর। এই আত্মবিস্মৃত মানুষই ট্রাইবাল সমাজে প্রথাগত অনুশাসনকেই তার জীবনের নিয়ন্তা বলে মেনে নিয়েছে। সম্পত্তি ব্যক্তিগত হবার পর ব্যক্তিপূজার সূত্রপাত ; সেই ব্যক্তি যখন অলক্ষ্যে অর্থের মাধ্যমে শ্রমশক্তি অপহরণ করে, তখন অর্থের ভিতরই মানুষ সবকিছুর মূল্যায়ণ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাজে অপহরণ এবং প্রত্যপহরণই জীবনধর্মের নিয়ন্তাস্বরূপ। কি দিলাম আর কি পেলাম, কি নিলাম আর কি নিতে পারি—এই মনস্তত্ত্বই মানুষকে তখন পেয়ে বসে। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ শুধু দেনা-পাওনার।

আত্মবিস্মৃতি থেকেই ব্যক্তিপূজা ও দেনা-পাওনার সম্বন্ধ, আত্মনিরোধই মানুষকে নিজ থেকে, সুতরাং মানুষকে মানুষ থেকে তফাৎ করে ফেলে। সম্পত্তির ভিতরই মানুষ নিজেকে হারিয়েছে, তাই সম্পত্তির মনস্তত্ত্বই মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। তখন এক মানুষের কাছে অন্য মানুষের মূল্য খাদকের কাছে খাদ্যের মতো, শিকারীর কাছে শিকারের মতো।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটায়, সম্পত্তিকে করে সামূহিক। কিন্তু মানুষের নিজ সত্তা তখনও সম্পত্তির মধ্যে নিরুদ্ধ। কি দেব আর কি পাব এই মনস্তত্ত্ব তখনও বলবৎ। অতীতে জীবনের যে মূল্যবোধ সৃষ্ট হয়েছিল তার মধ্যে যেমন ছিল সম্পত্তির মধ্যে ব্যক্তির বিলুপ্তি, তেমনি ছিল একব্যক্তির বিলুপ্তি অন্য ব্যক্তির মধ্যে।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর দ্বিতীয়টা গেল কিন্তু প্রথমটা কিছু পরিমাণে রয়ে গেল। তাই তখনও মানুষের মনস্তত্ত্বের মধ্যে দেনা-পাওনার স্বভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত নয়। মানুষের মধ্যে মানবতার পূর্ণতা এই দেনা-পাওনা দ্বারা সীমিত।

সর্বোচ্চ কমিউনিস্ট সমাজের নতুন মনস্তত্ত্ব, নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন সম্পর্ক এই সবকিছুর মূলে সম্পত্তির অবসান। উৎপাদনের প্রাচুর্য, প্রকৃতির ওপর মানুষের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ: এরই মানে হল মানুষের মধ্যে মানবতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মানুষ মানেই পূর্ণ মানুষ, আসল মানুষ, ব্যক্তি-মানুষ। সমাজ এখানে ব্যক্তির বহির্ভূত কোনো বহিঃশক্তি নয়। সমাজ এখানে সমস্ত ব্যক্তির স্বেচ্ছামিলনাত্মক স্বাভাবিক সত্তা। তাই এই সমাজে মানুষের মনস্তত্ত্বের ভিতর দেনা-পাওনার সংকীর্ণতা থাকতে পারেনা, থাকতে পারেনা ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জনস্বার্থের বিরোধ। তাই অপহরণ এবং প্রত্যপহরণের যে মনোবৃত্তি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবদান তার জড় তখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। হেগেলের আইডিয়ার মানুষ তখন আর আইডিয়ার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বাস্তবজীবনে সমুজ্জ্বল।

সুতরাং হেগেলের আইডিয়ার মধ্যে মানবতার মুক্তি নেই, মানবতার মধ্যেই হেগেলের আইডিয়ার মুক্তি।

আলোচ্য পুস্তকে মার্কস দেখিয়েছেন যে মানুষের ভাবধারার মধ্যেই হেগেলের প্রথম-আইডিয়ার জন্ম। এই উপলক্ষে মার্কস কার্য-কারণ তত্ত্বেরও কিছুটা আলোচনা করেছেন। কার্য-কারণ তত্ত্বের দোহাই পেড়ে ভাববাদীরাও প্রশ্ন তোলেন—যদি সুপারম্যান্ বা সুপ্রীম্ আইডিয়া বলে কিছু নাই থাকে তবে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণটি কি? প্রথম মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তোমার অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মানে কি? ব্রহ্মাণ্ডে বস্তুর গতি ও পরিণতি চলছে অহরহ: কার্য-কারণতত্ত্ব অনুসারে পূর্ব অবস্থা তার পরবর্তী অবস্থার কারণ। এই গতিধারা অনন্তকাল ধরে অনুসরণ করতে পার। কিন্তু যখনই জিজ্ঞাসা কর যে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কারণ কি, তখনই বিশিষ্ট ও মূর্ত গতিশীল বস্তুজগতের সর্ববিধ মূর্ত সত্তাকে মনে মনে বর্জন করে তার একটা নির্বিশিষ্ট ও বিমূর্ত আইডিয়ার কারণ জানতে চাও, অর্থাৎ জানতে চাও যা নেই তার আদি কারণ। জিজ্ঞাসা করাটাই চিন্তার ক্ষেত্রে একটি স্ববিরোধ। বিজ্ঞান বলে

এক বিশিষ্ট সত্তা থেকে অন্য বিশিষ্ট সত্তার উদ্ভব, নির্দিষ্ট বিমূর্ত সত্তার উদ্ভব বিশিষ্ট মানুষের মনে, আইডিয়ারূপে।

মার্কস দার্শনিকভাবে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করেছেন হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনায়। যাঁরা মার্কসবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর গবেষণায় নিযুক্ত, তাঁদের কাছে আলোচ্য পুস্তকটি অপরিহার্য। মার্কসবাদের সাধারণ পাঠকগণ কে কতটা বুঝতে পারবেন তা বলতে পারি না।

হেগেলের নিকট মানুষ মানেই মানুষের আত্মচেতনা। এই আত্মচেতনা নিরুদ্ধ হলেই দেখা দেয় বাস্তব মানুষের মূর্ত সত্তা। মানুষের এই বাস্তব সত্তা নিরুদ্ধ হলেই আবার ফিরে আসে আত্মচেতনা। সুতরাং হেগেলের মানুষ নির্বিশিষ্ট আত্মচেতনা, যে আত্মচেতনার কোনো আধার নেই, যা নিজেতেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ; অর্থাৎ, স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মচেতনা। মানুষ বলতে কি বোঝায়? রক্তমাংসের শরীরটি নয়, একটি চেতনা মাত্র। তবে শরীরটি কি? চেতনা যখন অন্তর্হিত (negated), তার ফল হল মানুষ বলতে একটি সশরীরী সত্তা। জ্ঞানের মধ্যে যখন এই সত্যের উপলব্ধি হবে তখন সশরীরী সত্তাটি অন্তর্হিত হয়ে গেল, রয়ে গেল একটি চেতনা—নিজের সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান।

মানুষকে যদি এরকম ভাবে ধরা হয় তাহলে বাস্তব জগতকেই অস্বীকার করতে হয়। কারণ আমি যদি স্বীকার করি যে আমি ছাড়াও মানুষ আছে, তাহলে সেই অন্য মানুষের কাছে আমি হচ্ছি একটি বাস্তব সত্তা অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কেউ যদি মানুষ থাকে তাহলে আত্মচেতনা সর্বস্ব আমিও একটি বাস্তব পদার্থ, আর একজনের "তুমি"। তা যদি হয় তাহলে হেগেলের দর্শনে আত্মচেতনা দ্বারা বাস্তব আমিকে সত্য সত্যই অন্তর্হিত করা গেল না, আমার চেতনায় বাস্তব আমি না থাকলেও অন্যের চেতনায় আমি একটি বস্তু,—যদি না মেনে নিই যে শুধু আমি ছাড়া বাস্তব জগতের আর কিছুরই কোনো অস্তিত্বই নেই, শুধু আমি আছি, আর কিছু নেই। অথচ আমার আমি যখন আত্মচেতনার নিরোধদ্বারা বাস্তব আমিতে পরিণত হচ্ছি তখন সেই আমি হচ্ছি প্রকৃতির একটি অংশ। অর্থাৎ আমি ছাড়া তখন আরও সত্তা আছে। আমার আমিকে যখন আমার বস্তুসত্তার নিরোধদ্বারা ফিরে পাই তখন আমার বহির্ভূত অন্য সত্তাগুলির কি হল? তারা যদি রইল তাহলে নিরোধের নিরোধ হল আংশিক সফল, অর্থাৎ আত্মচেতনায় আমার

আমিকে ফিরে পেলাম, আমার বস্তুসত্তা চলে গেল, কিন্তু বস্তুজগৎ তো রয়েই গেল। হেগেলের এই আত্মবিরোধ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা মার্কস দেখিয়েছেন যে বস্তুকে আদি এবং সত্য বলে মেনে না নিলে হেগেলীয় নিরোধের নিরোধ (negation of negation) অর্থহীন হয়ে পড়ে। হেগেল এই তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করে এক মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু ভাববাদী দর্শনের মধ্যে এ তত্ত্ব একেবারেই বন্ধ্যা।

মার্কসের মূল বক্তব্য এই যে হেগেলীয় দর্শনের নিরোধ এবং তার প্রতিনিরোধ (negation of negation) সৃষ্টির একটি মহানিয়ম, কিন্তু বস্তুকে আদি এবং সত্য বলে স্বীকার না করলে এ তত্ত্ব সফলভাবে প্রয়োগ করা যায় না। ভাববাদের সীমারেখার মধ্যে এ তত্ত্ব অচল। এই তত্ত্বই ভাববাদের অসারতা প্রতিপন্ন করে।

মার্কস এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যায়। আলোচ্য পুস্তকে এই উপলক্ষে কয়েকটি অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রম, মজুরী ও মূলধন সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক বিশ্লেষণ এই পাণ্ডুলিপিতেই লিপিবদ্ধ হয়। শ্রমিক থেকে শ্রমশক্তির অন্তর্ধান এবং অপরের মালিকানায় তার পণ্যে রূপান্তর যে মূলধন তথা তার গতি ও প্রকৃতির প্রাথমিক ভিত্তি—এই তত্ত্বই পরবর্তীকালে ক্যাপিটাল-এর ভেতর তিনি বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তারই প্রাথমিক আলোচনা পাওয়া যায়। বুর্জোআ সমাজে অর্থের ক্ষমতা নামক অধ্যায়টি খুবই মূল্যবান। এই অধ্যায়ে মার্কস অর্থের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। রীতি, প্রবৃত্তি ও সম্পর্ক অর্থ-প্রধান সমাজে অর্থ-দ্বারাই নির্ধারিত হয়। আমার প্রয়োজনবোধও অর্থের ওপর নির্ভরশীল। যেমন—আমার যদি রেলগাড়ি চড়ে বেড়াবার মতো অর্থ না থাকে তাহা হলে আমার ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা নেই। কার কি দরকার তা বুঝতে তার কোনো আসল দরকারের হদিস নেই। টাকা যদি থাকে তো দরকার আছে, টাকা না থাকলে দরকার নেই। মার্কসের কথায়—"যে সাহসিকতা খরিদ করতে সক্ষম সে ভীরু হলেও সাহসী।" বুর্জোআ সমাজে অর্থ সমস্ত সত্তা, সমস্ত মূল্যবোধ, সমস্ত সম্পর্ক একেবারে উল্টেপাল্টে আর একরকম করে দেয়। অর্থের মধ্যে সমস্ত সত্তার সমস্ত মূল্য নিরুদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থে মার্কসের লেখা ছাড়াও এঙ্গেলসের অর্থনীতি বিষয়ক সর্বপ্রথম

লেখাটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের নাম "অর্থনীতিক সমালোচনার ছক" (Outlines of a Critique of Political Economy)। পাদটীকায় সম্পাদকমণ্ডলী লিখেছেন যে এই পুস্তকে এঙ্গেলস্ ভাববাদ থেকে বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু তবু তিনি ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন কতকটা নৈতিক মানদণ্ড দ্বারা। এই প্রবন্ধে সর্বজনীন্ নীতিবোধ অনুসারে ধনতন্ত্রের সমালোচনা কোনো কোনো অধ্যায়ে পাওয়া যায়। অবশ্য মার্কস ১৮৫৯ সালেও এই পুস্তকখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি মার্কসবাদের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে দুরূহ হবে কিন্তু মার্কসবাদের গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিহার্য দলিল। প্রথম পাঠে মার্কসবাদ খুবই অস্পষ্ট মনে হবে, কিন্তু মার্কস এবং এঙ্গেলসের সমস্ত লেখা পড়ার পর আবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে মার্কসবাদের মূলমর্ম অনুধাবন স্পষ্টতর হবে।

কিন্তু প্রাথমিক পাঠকবর্গের একেবারে হতাশ হতে হবে না। অন্তত দুটি অধ্যায় আছে যা সহজবোধ্য। একটি মার্কস কর্তৃক লিখিত ('ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কমিউনিজম') ৯৮ পৃষ্ঠায় এবং অপরটি এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত ('অর্থনীতির সমালোচনা') ১৭৫ পৃষ্ঠায়।

'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কমিউনিজম'-এর অধ্যায়ে মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে মানবতার সম্পর্ক নিরূপণ করে দেখিয়েছেন যে :

"ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে যে ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্তাটি আছে তা হল শ্রম। শ্রম ছাড়া সম্পদ হয় না, সম্পত্তি সম্পদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু সম্পত্তি যখনি ব্যক্তিগত হল তখনই তার ভিতর থেকে তার শ্রমসত্তা অন্তর্হিত হয়ে গেল, কেন না শ্রম যার, সম্পত্তি তার নয়। শ্রমের এই আত্মপরিহার থেকে সম্পত্তি পরিণত হয় মূলধনে। মূলধন শ্রমেরই সৃষ্টি কিন্তু শ্রম-রহিত এবং শ্রমের বিপরীত শক্তি হিসেবেই মূলধনের আত্মপ্রকাশ। সমাজ যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাবে তখনই শ্রম ও মূলধনের বৈপরীত্য দূর হবে, মানুষ ফিরে আসবে তার নিজ সত্তায়।"

এই অবস্থায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কোনো বিরোধ থাকে না। ব্যক্তি তৈরি করছে সমাজ, সমাজ তৈরি করছে ব্যক্তিকে—ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এখানে সমাজের সামাজিক অস্তিত্বের বিরোধী নয়।

মার্কস আরও বলেন: প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল মানুষ, কিন্তু মানুষের বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল প্রকৃতি। মানুষের সম্ভোগের জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিন্তু মানুষকে বিজ্ঞান নিয়ে বিচার করতে হয় প্রকৃতিকে। এই মানুষ যখন স্বপ্রতিষ্ঠিত, নিজেতে নিজে ফিরে এসেছে—তখন সমস্ত মানুষ আর সমগ্র প্রকৃতি মিলে একটি সামূহিক সত্তা মানুষের চেতনায় ধরা পড়ে।

এই আলোচনার মধ্যে মার্কসের একত্ববাদ (monism) প্রকট হয়ে উঠেছে।

শেষ অধ্যায়ে এঙ্গেলস্ অর্থনীতি সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা ক্যাপিটাল-এর পাঠকবর্গের নিকট খুবই সহজবোধ্য। এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথম তিনি ফিজিওক্রাট্ থেকে আরম্ভ করে ক্লাসিকাল স্কুল পর্যন্ত সমস্ত অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। মূলধন, মুনাফা, খাজনা ও সুদ বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ধরিয়ে দিয়ে মার্কসবাদী অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক সারমর্ম উদ্ঘাটিত করেছেন। ম্যালথুসের তত্ত্বকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির কোনো সীমা নেই—তা সে কৃষিতেই হোক আর শিল্পেই হোক। কাজেই জনসংখ্যাটা সমস্যা নয়, সমস্যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ। ধনতান্ত্রিক যুগের "স্বাধীন প্রতিযোগিতাকে" ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির স্বর্গ থেকে টেনে নামিয়ে এঙ্গেলস তার অন্তর্নিহিত সম্পত্তির একচেটিয়া চরিত্রের নির্যাসটি তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে 'অর্থনীতিক সমালোচনার ভূমিকা' নামক গ্রন্থে তিনি এই বিষয়টিই সবিস্তারে বিবৃত করেন। এই গ্রন্থেরই মুখবন্ধে মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সারমর্ম ব্যাখ্যা করে যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তাকে বলা যেতে পারে মার্কসবাদের ঘনীভূত নির্যাস। তাতে তিনি ঘোষণা করেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের যে বিরোধ তাই পরিণত অবস্থায় সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করবে, তখন হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ।

অর্থাৎ মানুষের আত্মনিরোধের অবসান ঘটবে, মানবতা হবে নিজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত।

অশোক রুদ্র

তরুণ মার্কস

ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচার ও ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখার সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি বোধহয় এই যে ইংরেজি ভাষাই আমাদের সেই জানালা যা দিয়ে বহির্জগৎ আমাদের গোচরে আসে কিন্তু এই জানালায় যে বহির্জগতের সবটা উন্মুক্ত নয় তা আমরা সর্বদা খেয়ালে রাখি না। ইংরেজি সাহিত্যের চশমার মারফৎ পশ্চিম দুনিয়াটা দেখতে হয় বলে আমাদের চোখ যে কতদূর একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে তা সব সময়ে বোধে আসে না, কারণ চশমা পাল্টে অন্য চশমা পরার উপায় তো নেই। কিন্তু এক এক সময় অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ইংরেজির উপর নির্ভরতার দরুণ আমাদের অবস্থা কতটা দীন তা ধরা পড়ে যায়। দেশে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি জানা লোকের শ্রেণী আছে বলেই বোধহয় আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের স্থান এত নগণ্য। ইংরেজিভাষীদের রুচি নেই বা তাদের কাছে মূল্যহীন কিন্তু আমাদের কাছে আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত এমন অনেক সাংস্কৃতিক ও তাত্বিক ঘটনা ঘটে যায় যার কোনো খবরও আমরা পাইনা, পেলেও অনেক বিলম্বে পাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রই যদি ইংরেজি না জানত, কিছু ইংরেজি-জর্মন-ফরাসী-রুশ প্রভৃতি ভাষাবিদ অনুবাদকেরা যদি চোখ-কান খোলা রাখতেন কোথায় কি হচ্ছে তার দিকে, তাহলে হয়তো আমাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে অনুবাদ হত এবং বিশ্বমনীষার সঙ্গে আমাদের যোগটা অনেক বেশি সরস ও সতেজ হত।

ইংরেজির উপর নির্ভরশীলতার জন্য আমাদের ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ হতে পারে তার একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সে গিয়ে। দেখলাম ফ্রান্স জর্মনি সুইট্সারল্যাণ্ডে, বস্তুত গোটা ইউরোপীয় ভূখণ্ডে একমাত্র নাট্যাধিপতির স্থান নিয়েছেন বেরটোল্ট ব্রেখট্। অথচ কি লজ্জার বিষয়,

---

Le June Marx : Recherche Internationale a la Lumiere du Marxisme. No. 19, 1960.

আমি তাঁর নাম পর্যন্ত শুনিনি। শুধু আমি নয়, বাংলাদেশের খুব কম লোকই যে তখন পর্যন্ত ব্রেখটের নাম শুনেছিলেন তা বললে বোধহয় ভুল করব না। কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হয়না। তখন পর্যন্ত ব্রেখট-এর কোনো বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি। পত্রপত্রিকায় এক আধটা লেখার অনুবাদ এদিক-ওদিক বেরিয়েছে মাত্র। লণ্ডনের থিয়েটারে ব্রেখটের কোনো অভিনয় তখনো পর্যন্ত ইংরেজ কোনো পেশাদারী দল থেকে হয়নি। একবার শুনেছি Berliner Ensemble লণ্ডনে ঘুরে গেছিল, কিন্তু ইংরেজ দর্শকদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। তারপর অবস্থা ধীরে ধীরে বদলেছে। ব্রেখটের সব নাটক এখনও ইংরেজিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বেশ গোটা কয়েক পাওয়া যায়। গত বছরের শীতে লণ্ডনে ব্রেখটের Mahogonny মঞ্চস্থ হল, সমালোচক ও দর্শক মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। মুকুরে প্রতিবিম্ববৎ বাংলাদেশেও পরিবর্তন এসেছে। এখন ব্রেখটের উল্লেখ চতুর্দিকেই পাওয়া যায় বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে। কিন্তু ইংরেজদের চেয়ে ব্রেখটের প্রয়োজন অনেক বেশি আমাদের। অনেক আগেই তাঁর প্রভাব আসার প্রয়োজন ছিল।

এতো গেল একটা উদাহরণ। কিন্তু ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভরতার দরুণ খুব বেশি রকম যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা আমাদের দেশে মার্কসবাদের চর্চা। ইংরেজের দেশে মার্কসবাদের প্রভাব কম, চর্চাও কম। কিন্তু আমাদের দেশে চর্চার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী রকমের। সে তুলনায় চর্চা হয় খুব কম। তার জন্য আমাদের সামাজিক পরিবেশ অবশ্যই দায়ী, কিন্তু সমস্যাটাকে কম জটিল করে তোলেনি ইংরেজি ভাষার উপর আমাদের অসহায় নির্ভরতা। মার্কসের সম্পূর্ণ রচনাবলীর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ আমাদের জোটেনি। এই কবছর আগে পর্যন্ত Capital-এর মাত্র প্রথম খণ্ডটি বাজারে মিলত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কোনো ইংরেজি বা আমেরিকান সংস্করণ বাজারে ছিল না। সোভিয়েত সংস্করণ তো বের হল মাত্র এই সেদিন। Theories of Surplus Value বা Capital-এর চতুর্থ খণ্ডের তো সোভিয়েত সংস্করণও এখনও বের হয়নি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে ইংরেজি সংস্করণ (Lawrence and Wishart-এর ?) পাওয়া যেত তা সংক্ষেপিত, মূলের থেকে অনেক ভাগ ছোট। গত কয়েক বছরে অবশ্য সোভিয়েত Foreign Language Publishing House-এর দাক্ষিণ্যে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। নতুন নতুন অনেকগুলি বইয়ের নতুন সংস্করণ আমরা একের পর এক পেয়েছি কিন্তু

মার্কসের সম্পূর্ণ রচনাবলী এখনও তাঁরা প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি। ফরাসী জর্মন বা রুশ ভাষার সঙ্গে যদি আমাদের সরাসরি যোগ থাকত তো এই দৈন্যদশা এড়াতে পারতাম, কারণ আশা করা যায় এসব ভাষায় মার্কসের সমগ্র গ্রন্থাবলী সর্বদাই বাজারে সুলভ থেকেছে। অন্তত ফরাসী ভাষায় যে থেকেছে তা নিশ্চয় জানি। হয়তো বলা হবে যে বাজারে না মিললেও গ্রন্থাগারের মারফৎ মার্কসের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছিল—কারণ কিছু-না-কিছু সংস্করণ অতীতে কখনও-না-কখনও নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। কিন্তু একথাও মার্কসের সব লেখা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। একথা প্রযোজ্য নয় মার্কসের দার্শনিক চিন্তার অন্যতম প্রধান আধার, তাঁর জীবৎকালে অপ্রকাশিত ১৮৪৪ সনের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে। একথা বোধহয় আমাদের অনেকের কাছেই অজানা ছিল যে ১৯৩২ সালে এই পাণ্ডুলিপির প্রথম প্রকাশের পর থেকে ইউরোপীয় মার্কসবাদী চিন্তাধারায় এক প্রবল আলোড়নের সূত্রপাত হয়েছে। ইংরেজি পাঠকের এই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে মাত্র ১৯৫৯ সনে, মস্কোর Foreign Language Publishing House-এর সৌজন্যে। (তারপর, খুব সম্প্রতি, একটি নতুন ও স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রকাশ করেছিল লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সের T. B. Bottomore। এই অনুবাদের একটি মার্কিন সংস্করণও বার করেছেন Erich Fromm)। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের ঝড় আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ অপ্রশমিত রয়েছে তার দরুণ কোনো আন্দোলন আমাদের চিন্তায় বিক্ষোভ ঘটায়নি, কারণ ইংরেজি ভাষায় এই বিতর্ক খুব বেশি প্রকাশ পায়নি। ইংরেজিতে যেটুকু বা আভাস পেয়েছি তার অধিকাংশই এক দেশে, সরকারী কমিউনিস্ট পার্টির দার্শনিকদের মতামতটাই তাতে প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির বাইরের মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর দার্শনিকেরা, যাঁরা এই বিতর্কের মূল প্রবক্তা, তাঁদের মতামতের পরিষ্কার ধারণা পাইনি। যেমন ধরুন গত সনে Marxism Today-তে মার্কসবাদ ও অস্তিত্ববাদের মধ্যে মিল-বেমিল নিয়ে পোল্যাণ্ডে যে প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছে সে প্রসঙ্গে Adam Schaff তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, কিন্তু Adam Schaff কমিউনিস্ট পার্টির প্রবক্তা দার্শনিক। তাঁর মতামত যত মূল্যবানই হোক তাঁর প্রতিপক্ষস্থানীয় দার্শনিকদের মতামতকে তাঁদের নিজস্ব জবানীতে না পাওয়ায় আমাদের তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা মেটেনা। অথচ বিতর্কটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার আভাস পাই যখন দেখি কত বিভিন্ন

পৌছনর রাস্তা এবং তরুণ মার্কসের বিভিন্ন লেখায় এই পরিক্রমার চিহ্ন। বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলিই বেশি চিত্তাকর্ষক। তাদের একটিতে (Adam Schaff-এর "তরুণ মার্কসের প্রকৃত চেহারা") Kalakowski নামক পোলিশ দার্শনিককে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে কারণ তিনি নাকি দেখাতে চেয়েছেন মার্কসের epistemology-র মূল সূত্র তাঁর ১৮৪৪ সনের পাণ্ডুলিপিতে আবিষ্কার করা যায় এবং এই সূত্র অনুসারে মার্কসের ধারণা এঙ্গেলস্ ও লেনিন-এর ধারণা থেকে সামগ্রিকভাবে ভিন্ন। অপর একটি প্রবন্ধে একজন জর্মন সমালোচক (Hoeppner) অপর এক জর্মন দার্শনিকের (Fetscher) দোষ ধরেন কারণ দ্বিতীয়জন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন মার্কসের দ্বন্দ্ববাদ ও হেগেলের দ্বন্দ্ববাদে মূলত কোনো ভেদ নেই। একই প্রবন্ধে Ernst Bloch-কে সমালোচনা করা হয় এই বলে যে Bloch মনে করেন মার্কসের অন্তিম লক্ষ্য সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম ছিল না, ছিল মানুষের প্রকৃতি থেকে alienation এর অবসান, এমন এক অবস্থা যাকে মার্কস মানুষের ও প্রকৃতির পরস্পরের সঙ্গে একীভবন বলে বর্ণনা করেছেন। Jalm নামক জর্মন সমালোচক Ernst Bloch ও Thier এর সমালোচনা করতে গিয়ে গোটা alienation-এর তত্ত্বকেই নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্য মার্কসের চিন্তায় এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে Surplus Value-র তত্ত্বের কাছে আসন ছেড়ে দেয়। অন্যান্য প্রবন্ধে alienation-কে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয় না, "what Marx really meant" এই সুরে নানান ভাষ্য দেওয়া হয়। সোভিয়েত প্রবন্ধকার Brouchlinski-র প্রবন্ধটি থেকে জানতে পারি যে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার মূলে পাঠগত কারণও একটা আছে। ১৮৪৪ সনের পাণ্ডুলিপির দুটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন একটি জর্মন প্রকাশনা সংস্থা, Landshut und Mayer ; কয়েকমাসের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রকাশ করেন মস্কোর Marx-Engels Institute. প্রবন্ধকারের মতে মস্কো সংস্করণই প্রামাণ্য, অপরটি নানাবিধ প্রমাদে পরিপূর্ণ।

নানান প্রবন্ধের নানান আলোচনা থেকে এই গত ত্রিশ বৎসরের বিতর্কের মূল বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় সরলীকরণ করলে তা দাঁড়ায় এই : একদল বলছেন এই পাণ্ডুলিপি মার্কসের চিন্তার এক নতুন দিগন্ত প্রকাশ করে ; অপর দল বলেন এতে নতুন কোনো কথাই নেই, মার্কসের চিন্তার

উন্মেষে এ এক সোপান মাত্র। অধিকতর পরিণত আকারে এই চিন্তার ছাপ পরবর্তী লেখাতেও আছে। প্রথম দলের মতে এই পাণ্ডুলিপির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেই মার্কসের পরবর্তী জীবনের চিন্তাধারার সম্যক অর্থোদ্ধার করা যায়; দ্বিতীয় দল বলেন, পরবর্তী জীবনের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই এই পাণ্ডুলিপির যথার্থ মর্মোদ্ধার সম্ভব। শাস্ত্রচর্চার দিক থেকে দেখলে অবশ্য উপরোক্ত উভয় মতই ভ্রান্ত। কারণ মার্কসের পরবর্তী কালের আর সব চিন্তার চাবিকাঠি তাঁর তরুণ বয়সের এই একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে আছে, তাঁর পরিণত বয়সের কোন ধারণা যদি এই পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশিত ধারণার সঙ্গে না মেলে তো ধরে নিতে হবে পরবর্তী কালের ধারণাটা মার্কসের চিন্তার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রাহ্য নয়, এও যেমন অবৈজ্ঞানিক মনোভাব সূচিত করে, তেমনি এই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে মার্কসবাদ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তার মধ্যে অধিকতর গভীরতা বা প্রসার এই পাণ্ডুলিপি আনে না এই মতের মধ্যেও গোঁড়ামির গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু বিতর্কটা শুধুই শাস্ত্রীয় আলোচনার ব্যাকরণগত নয়। প্রথম দলের প্রবক্তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সরকারী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, দ্বিতীয় দলের বেশির ভাগই তাই বটে, যদিও সবাই নন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথম পক্ষে মত দিচ্ছেন যাঁরা তাঁরা প্রায়ই মার্কসের চিন্তায় শ্রেণীসংগ্রাম ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ যে স্থান অধিকার করে তাকে একটু কম করে দেখান, তাঁর চিন্তায় মানুষের অবস্থা ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তারই ব্যাখ্যানে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। এই কারণেই তরুণ মার্কসের লেখাকে তাঁরা পরবর্তী যুগের মার্কসের লেখার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। অপরদিকে সরকারী কমিউনিস্ট প্রবক্তারা তরুণ মার্কসের লেখায় যে শ্রেণীযুদ্ধ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ কম আছে তাতে স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করেন এবং বারবারই বলার চেষ্টা করেন শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বই, শ্রমিক শ্রেণীর ধনিকশ্রেণী কর্তৃক অর্থনীতিক শোষণের তত্ত্বই মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব, alienation-এর তত্ত্ব নয়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় এই দুই তত্ত্বের মধ্যে বাস্তবিকই কোন দ্বন্দ্ব নেই। শুধু alienation এর কথা বলে শ্রেণীসংগ্রামের কথা যদি চেপে যাওয়া হয় তো ধরে নেওয়া যেতে পারে যে প্রবক্তারা শ্রেণীসংগ্রাম বিনাই মানুষের alienation এর হাত থেকে মুক্তি খুঁজছেন অতএব তাঁরা মূলত মার্কসবাদ-বিরোধী। কিন্তু শুধু শ্রেণীসংগ্রামের উপর জোর দিয়ে alienation-এর তত্ত্বকে

লঘু করে দেখাবার মনোবৃত্তিতেও কি সংশয়ের কোনো কারণ নেই? আমি দেখবার চেষ্টা করব যে আছে।

তার আগে কমিউনিস্ট প্রবক্তাদের যুক্তিধারার মধ্যে যে রক্ষণশীলতা রয়েছে এবং তার দরুণ কিছু চিন্তাগত দুর্বলতা, এমন কি মার্কসের বক্তব্যকে বিকৃত করার প্রবণতাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তার কিছু নজির দেব। Hoeppner বলেন, মার্কসের তরুণ বয়সের লেখার থেকে পালিয়ে দূরে সরে যাওয়ার কোন কারণ মার্কসবাদের নেই। এ একটা স্বীকৃতি যে এরকম পলায়ণপর মনোভাব অনেক মার্কসবাদী দেখিয়েছেন। ১৯৩২ সাল থেকে এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা ও নতুন ধারণার প্রচারে যে অপরপক্ষই অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে তাও অনেক প্রবন্ধকার স্বীকার করেছেন। সংকলনটির ভূমিকাতেও সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর পূর্ববর্তী মার্কসের রচনাবলী (যদিও তা আগেও ফরাসী পাঠকদের কাছে সাধারণত ভুলপ্রমাদ-যুক্ত অনুবাদে সুলভ ছিল) অসাধারণ প্রচারলাভ করছে এবং নানাবিধ আতিশয্যের উপলক্ষ হচ্ছে। মনে হয় ঘটনাটা এই যে নিজেদের মার্কস-তাত্ত্বিক (Marxologue) মনে করেন এমন ব্যক্তিরা মার্কসবাদীদের দ্বারা উপেক্ষিত রচনাবলীর পুনর্বাসনের উদ্যমে রত হয়েছেন। একথা অনস্বীকার্য যে মার্কসের প্রথম যুগের কাজের সম্পর্কে ফরাসী মনোভাব কিছুকাল উপেক্ষার মত দেখিয়েছে। মনে হয় অজানা এক ক্ষেত্র সম্পর্কে এক অবিশ্বাসের reflex-এ তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন...।" আরও একটা কারণ বোধহয় ছিল। যতদিনে পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয় ততদিনে কমিউনিস্ট দুনিয়ায় ঘোরতর রকমে গুরুবাদের যুগ শুরু হয়ে গেছে। লেনিন ও পরে স্তালিনের ভাষ্য ছাড়া মার্কস পড়ার সাহসই বোধহয় কারও ছিল না। লেনিন এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বই জানতেন না, স্তালিনও হয়তো এর উপর কোন টীকা কাটেননি। সুতরাং গুরুবাক্যের অভাবে এর দিকে চোখ বুজে থাকাই হয়তো অনেক প্রকৃষ্ট বিবেচনা করেছিলেন।

এখন আলোচনায় যোগ দেওয়া হলেও সমালোচকেরা জায়গায় জায়গায় প্রতিপক্ষদের যুক্তিতে এমন অহেতুক আপত্তি এমন কি আতঙ্ক প্রকাশ করেন যে আশ্চর্য হতে হয়। আগেই উল্লেখ করেছি, Hoeppner নামক একজন সমালোচক গোটা alienation-এর তত্ত্বকেই উড়িয়ে দিতে চান এই বলে যে পরবর্তী যুগের অধিকতর গভীরতা প্রাপ্ত Surplus Value-র তত্ত্বে এই তত্ত্ব

হারিয়ে যায়। কিন্তু alienation মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে মাত্র ; শোষণ এবং Surplus Value-র তত্ত্ব এই অবস্থার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই ; এবং প্রথম বয়সে মার্কস মানুষের অবস্থার যে সংকট আবিষ্কার করেন পরবর্তী যুগে শ্রেণীসংগ্রাম ও শোষণের তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে তাঁর একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন বললে বোঝা যায়। সে ভাবে দেখলে alienation ও শোষণের তত্ত্বের মধ্যে কোনোই দ্বন্দ্ব চোখে পড়েনা, উভয় উভয়ের সম্পূরক প্রতীয়মান হয়। কিন্তু Hoeppner বলেন, "এইভাবে শ্রমের alienation-এর তত্ত্ব পরিশেষে Value ও Surplus Value-র অধিকতর উন্নত তত্ত্বের দ্বারা অতিক্রান্ত হয়।" Hoeppner লেখেন যেন alienation-এর তত্ত্বটা একটা অর্থনীতিক তত্ত্ব মাত্র! Hoeppner এবং আরও অনেকেই আপত্তি প্রকাশ করেন পাণ্ডুলিপির অন্যতম প্রথম প্রকাশক Landshut-এর এই উক্তিতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম লাইনকে এভাবেও লেখা চলত, "অদ্যাবধি ইতিহাস মানুষের auto-alienation-এর ইতিহাস মাত্র"। কেন, আপত্তি কেন? সোভিয়েত প্রবন্ধকার Pajitnov আপত্তি করেন Landshut ও Mayer-এর অন্য এক উক্তিতে যার মর্ম মার্কসের মতে ইতিহাসের অন্তিম লক্ষ্য নিছক উৎপাদন ব্যবস্থার সমাজীকরণে এবং শোষক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের মারফৎ শোষণের অবসানেই নয়, অন্তিম লক্ষ্য মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ও সঙ্গতিপূর্ণ আত্ম-উপলব্ধি। কিন্তু এতেই বা আপত্তি কেন? শোষণের অবসানের যে প্রয়োজন নেই তাতো বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যই শোষণের অবসানের প্রয়োজন। তেমনি Ernst Bloch কে সমালোচনা করা হচ্ছে এই জন্য যে তাঁর মতে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ইতিহাসের যুগ বিশেষ, তারও পরে আসবে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসানের যুগ। এতেই বা আপত্তির কি আছে?

বস্তুত প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই লক্ষ্য করা যায়, মার্কসের alienation-এর তত্ত্বকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ-তত্ত্বকে মার্কসের নাবালক বয়সের অপরিণত চিন্তার প্রকাশ বলে যাঁরা উড়িয়ে না দিয়েছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই alienation-কে শুধু মাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকের অবস্থার বর্ণনা বলে গ্রহণ করেছেন। শ্রমিকের শ্রমের ফল যেহেতু শ্রমিক পায় না ধনিক পায় সেহেতু উৎপন্ন দ্রব্য ও শ্রমিকের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়, এই হল এদের মতে alienation-এর সার। অবশ্যই এই অবস্থাটা alienation-

এর একটি অঙ্গবিশেষ। কিন্তু alienation-এর তত্ত্বে আর কিছু নেই বললে তা ইচ্ছাপূর্বক ভ্রান্তি সৃষ্টির অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। একথা একেবারেই সত্য নয় যে মার্কসের দর্শন শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, মার্কসের দর্শন একটি বিশ্ববীক্ষা, মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাস তাতে বিধৃত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কলকব্জা, তার উত্থান ও পতনের অন্তরীণ নিয়মের বিশ্লেষণেই মার্কস তাঁর জীবনের অধিক সময় ব্যয় করেছিলেন সত্য কিন্তু তার একমাত্র কারণ কার্ল মার্কস ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমসাময়িক। alienation-এর তত্ত্ব অবশ্যই শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষক শোষিতের সম্পর্কের মধ্যে নিঃশেষিত নয়; উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির (capital) অস্তিত্ব alienation-এর অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তা বললেও সব বলা হয় না। alienation-এর তত্ত্ব আরও অনেক গভীরের তত্ত্ব, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের (অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সমাজের) তথা মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের সর্ববিধ দ্বন্দ্বের ধারণাই এই একটি বাক্যে বিধৃত। একে সংকীর্ণ করে শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে দেখালে মার্কসবাদী দর্শনের মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়। আর শুধু মাহাত্ম্য খর্ব করাই না, তাতে মার্কসবাদীদের নিজেদের দৃষ্টিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অস্বচ্ছ করে রাখা হয়।

অথচ এই স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির দোষ যে শুধু গোটা কয়েক প্রবন্ধকারের লেখাতেই পাওয়া যায় তা নয়, স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যে মস্কো থেকে ইংরেজিতে যে Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 প্রকাশিত হয়েছে তার ভূমিকায় Institute of Marxism-Leninism-এর তরফ থেকে বলা হয়েছে, By "estrangement" or "alienation" Marx means the forced labour of the labourer for the capitalist, the appropriation by the capitalist of the product of a worker's labour and the seperation of the labourer from the means of production..." (পৃষ্ঠা ৮)

এই ব্যাখ্যার সঙ্গে পাঠক নিজেই বইটির ভিতরে মার্কসের নিজের আলোচনা তুলনা করে দেখুন। "Estranged Labour" শীর্ষক অধ্যায়টি (পৃষ্ঠা ৬৭-৮৩) এ-প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে পাঠ্য। গোটা অধ্যায়টি উধৃত করা সম্ভব নয় কিন্তু নিচের লাইন কটি দেখুন :

What, then, constitutes the alienation of labour ?

First, the fact that labour is external to the worker, i. e. it does not belong to his essential being ; that in his work, therefore, he does not affirm himself but denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop freely his physical and mental energy but mortifies his body and ruins his mind. The worker, therefore, only feels himself outside his work and in his work feels outside himself. (পৃষ্ঠা ৭২) As a result, therefore, man (the worker) no longer feels himself to be freely active in any but his animal functions... What is animal becomes human and what is human animal. (পৃষ্ঠা ৭৩) We have considered the act of estranging practical human activity, labour, in two of its aspects. (1) The relation of the worker to *the product of labour* as an alien object exercising power over him. This relation is at the same time the relation to the sensuous external world, to the objects of nature as an alien world antagonistically opposed to him. (2) The relation of labour to the act of production within the process of labour....(পৃষ্ঠা ৭৩) In estranging from man (1) nature and (2) himself, his own active functions, his life activity, estranged labour estranges the species from man. (পৃষ্ঠা ৭৪)

উধৃতি কয়টি প্রত্যেকটিই শ্রমসংক্রান্ত কিন্তু কোথাও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ নেই, তাছাড়া শ্রমিক, শ্রম, উৎপন্ন দ্রব্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়া এদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে তার মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা শুধুমাত্র ধনিক ব্যবস্থাতে প্রযোজ্য, তার আগেকার কোনো ব্যবস্থাতে প্রযোজ্য নয় ? শুধু তাই নয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও কি শ্রমিকের অবস্থা মোটামুটি এরকমই হতে পারে না ? এখানে বলে রাখি, উধৃতিগুলি ইচ্ছা করেই এমন জায়গা থেকে দিলাম যেখানে শ্রমেরই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু জীবনের অন্যান্য অংশেও যে alienation-এর ধারণা প্রযোজ্য তার সমর্থনেও অন্য অনেক উধৃতি দেওয়া যায়।

কেন এই ভীতি এই দার্শনিক ধারণাটা সম্বন্ধে? কেন এই প্রবণতা তাকে খর্ব করার, তার গণ্ডী সীমাবদ্ধ করার? alienation এমন একটি ধারণা যা দিয়ে ইতিহাসের যে কোনো যুগের, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে কোনো সমাজব্যবস্থার মানবিক সমস্যাবলীর বর্ণন ও বিশ্লেষণ সম্ভব। alienation-এর মূলে শুধুমাত্র সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যদিও তা অন্যতম প্রধান উৎস বটে। অন্য একটি প্রধান উৎস হল শ্রমের বিভাজন (division of labour)। উৎপাদন শক্তিদের বিকাশের সঙ্গে শ্রমের বিভাজন উত্তরোত্তর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে ওঠে, শ্রমিক ও শ্রমের ফল যে উৎপন্ন দ্রব্য তার মধ্যে দূরত্বও বাড়তে থাকে। এই ভাবে যে alienation-এর সৃষ্টি তার অবসান সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটলেই হবে না। শুধু তাই না, শ্রমের বিভাজন আরও এক ভাবে মানুষকে alienated করে। মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ক্রমেই কোনো একটি বিশেষ বৃত্তিশীল খণ্ড মানুষে পরিণত হয়। এই সমস্যাটির সম্পর্কে মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্ 'জর্মন ইডিয়োলজি'তে বলেছেন: "শ্রমের বিভাজনের সূচনা যেই হল, প্রত্যেকের উপর কোনো একটি বিশেষ ও একক শ্রমের এলাকা চাপান হল যার গণ্ডীর বাইরে সে যেতে পারে না: সে হয় শিকারোপজীবী নয় মৎস্যজীবী, মেষপালক নয় সমালোচক, এবং তাই তাকে থাকতে হয় যদি না সে জীবিকা হারাতে চায়।" এবং পরে "কমিউনিস্ট সমাজে যেখানে প্রত্যেকের জন্য একটি করে বিশেষ শ্রমের এলাকা নির্দিষ্ট করা থাকবে না, যেখানে যে কোনো ব্যক্তি যা ভাল লাগে সেই কাজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে সামাজিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে যাতে করে আমার পক্ষে আজ এটা করা ও কাল অন্য কিছু করা সম্ভব হবে, সকাল বেলা শিকার করতে পারব, দুপুর বেলা মাছ ধরতে, সন্ধ্যেবেলা মেষ চড়াতে পারব এবং নৈশভোজনের পর সমালোচনার কলম ধরতে পারব, আপন খুশীমত, কদাপিও শিকারোপজীবী, মৎস্যজীবী, মেষপালক বা সমালোচকে পরিণত না হয়ে গিয়ে।" এই সম্ভাবনাকেও নিশ্চয়ই শুধুমাত্র সম্পত্তির সমাজীকরণের মারফৎ হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে না। alienation-এর অপর ভিত্তি অবশ্য ব্যক্তির রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রের অবসানও নিশ্চয়ই শুধুমাত্র সম্পত্তির সমাজীকরণ মারফৎ আসে না।

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের গুরুত্ব লাঘব করা আমার

মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু alienation-এর তত্ত্বকে সংকীর্ণ করে কেবলমাত্র শ্রেণী বিভাজিত সমাজে বা সংকীর্ণতর করে কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রযোজ্য মনে করলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও সমাজে যে সব সমস্যা থাকবে তাদের বিচারে কোনো সাহায্য মার্কসবাদী তত্ত্বে পাওয়া যাবে না। বিপ্লব করে বা আইন করে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটালেই মানুষের সর্ববিধ সমস্যার অবসান হয় না, আজকের সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতেও সব সমস্যার অবসান হয় নি। মার্কসবাদী তত্ত্বের সমর্থনে এই সমালোচনা আরও জোরালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে, এই নয় কি alienation-এর তত্ত্বকে কোণঠাসা করে রাখার পিছনে ভীতির কারণ? আমি কি কাল্পনিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছি? তাই কি? কমিউনিজমে মানুষের মুক্তির অবস্থা বিষয়ে মার্কসের ধারণা সম্বন্ধে সোভিয়েত নেতারা যদি অবহিত থাকতেন তো পারতেন কি তারা এই তাজ্জব ঘোষণা করে দিতে যে আর বিশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত দেশে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হবে? মার্কসের কমিউনিস্ট সমাজে কল্পনা করা হয়েছে কারখানার শ্রমিকরাও শ্রম করবে সেই ভালবাসা ও স্বতঃস্ফূর্তি নিয়ে যা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিকে চিহ্নিত করে। আজকের সোভিয়েত সমাজে দেখছি তার উল্টো অবস্থা। শিল্পীকে চালিত করার চেষ্টা করছেন রাষ্ট্র ও পার্টির নেতারা। বলাই বাহুল্য রাষ্ট্র বা পার্টির এতো দাপট যে সমাজে তাতে মানুষের alienation এখনও ভালভাবেই বিদ্যমান, এবং সেই নিরিখে বিচার করলে কমিউনিজম এখনও সে সমাজ থেকে অনেক অনেক দূরে।

চিন্মোহন সেহানবীশ

জোটনিরপেক্ষতার পররাষ্ট্রনীতি

গত নভেম্বর মাসে চীনা আক্রমণের মুখে আমাদের প্রতিরোধ যখন সাময়িকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত তখন সে লাঞ্ছনাজাত বিক্ষোভের আবহাওয়ায় পররাষ্ট্রনীতির বিরোধীপক্ষ রব তুললেন যে আমাদের এই হালের জন্য নাকি দায়ী ঐ 'ক্লীব নীতি'। তাঁদের তরফ থেকে তাই প্রবল দাবি উঠল নীতি পরিবর্তনের। আবার এঁদের পরম শত্রু চীনা সরকারও তখন পঞ্চমুখ আমাদের 'কপট নীতির' নিন্দায়—নিরপেক্ষতার ঘোমটার আড়ালে নাকি আমাদের মন দেওয়া-নেওয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে মার্কিনদের সঙ্গে। আর চারদিকের এই সোরগোলে পড়ে দিশেহারা সাধারণ মানুষ—সচরাচর যাঁরা রাজনীতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না বরং নেহরুর উপরে বরাত দিয়েই যাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন এতাবৎ, তাঁরাও অনেকে ভাবতে লাগলেন—তবে কি সত্যই এমন মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে আমাদের অভ্যস্ত পররাষ্ট্রচিন্তায়।

পিপ্‌লস পাবলিশিং হাউস কর্তৃক সম্প্রতি আলোচ্য বইটির প্রকাশ তাই বিশেষ করেই প্রাসঙ্গিক। এটি এক হাতের রচনা নয়। দিল্লীর এক আলোচনাসভায় পঠিত আটজন বিশেষজ্ঞের আটটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে এর মধ্যে। সম্পাদনা করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত করুণাকরণ। জোটনিরপেক্ষতার (বাংলায় non-alignment-এর এই প্রতিশব্দটাই বহুল প্রচারিত হয়েছে সংবাদপত্রের কল্যাণে) 'মৌল উপাদান' প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান সাধারণ আলোচনাটিকেই ভূমিকা হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে বইটির গোড়ায়। তারপর আছে ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতির 'ইতিহাস, মতাদর্শ ও ভবিষ্যত' এবং ভারতবর্ষের 'জাতীয় স্বার্থের' সঙ্গে ঐ নীতির সঙ্গতি সম্পর্কে দু'টি প্রবন্ধ। স্বভাবতই জোট-নিরপেক্ষতার আলোচনা ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া,

---

Outside the Contest: Edited by K. P. Karunakaran. People's Publishing House. New Delhi. Rs. 15.

পশ্চিম এশিয়া, পাকিস্তান এবং ১৯৬১ সনে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত পঁচিশটি জোটনিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন সম্পর্কে পাঁচটি প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে এর পরে। এই সাতটি প্রবন্ধই তথ্যসমৃদ্ধ ও সুলিখিত। পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে বেলগ্রেড সম্মেলনে গৃহীত দু'টি অতি প্রয়োজনীয় দলিল। এ-ধরনের গ্রন্থে কিন্তু সর্বশেষে বিষয়-নির্দেশিকার সংযোজন অত্যাবশ্যক। আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি পূরণের ব্যবস্থা হবে।

তরুণ গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের রচনা হলেও সৌভাগ্যক্রমে সব মিলিয়ে বইটি সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বেশ সুখপাঠ্য। লেখার গুণে ও সম্ভবত সম্পাদকের পরিমিতিবোধের দরুণ তথ্য যথেষ্ট থাকলেও তথ্যভার তাঁদের বুকে চেপে বসে না পাষাণের মতো, অজস্র পাদটীকার কাঁটাও বেঁধে না পদে পদে।

Outside the Contest পড়তে পড়তে কয়েকটি কথা মনে আসে। কথার সূত্রপাত করা যেতে পারে গ্রন্থের নামকরণ থেকেই। এ কথা ঠিক যে কালের বিচারে জোটনিরপেক্ষতার অব্যবহিত পৃষ্ঠপট হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর হিমযুদ্ধ ও সেই হিমযুদ্ধজাত জোটবদ্ধতা। সে দিক থেকে হয়তো নামকরণ সার্থক। কিন্তু সংঘাতের বাইরে অবস্থানই কি আমরা যাকে সচরাচর জোটনিরপেক্ষতা বলে অভিহিত করি সেই নীতির প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? শ্রীযুক্ত করুণাকরণ তাঁর ভূমিকার শেষ দিকে লিখেছেন:

"এশিয়ার দেশগুলি জোটনিরপেক্ষতার যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে তার শিকড়…প্রোথিত রয়েছে তাদের জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যের গভীরে আর ঐ সব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের নিরিখে তাদের পররাষ্ট্রনীতি ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতিচর্চার পারস্পারিকতার মধ্যে"। (২৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য এবং এ সব দেশের জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের নিরন্তর তাগিদ—আমরা যে নীতির কথা বলছি তার উন্মেষ এই ক্ষেত্র থেকেই। স্বাধীনতা অর্জনের পর হিমযুদ্ধের পরিবেশে ঐ নীতিই রূপ নেয় জোটনিরপেক্ষতার। কারণ জাতীয় সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশের যে দাবির প্রকাশ জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের মধ্যে, অন্য অবস্থায় একটি বিশেষ ক্ষেত্রে (পররাষ্ট্রনীতি) তারই সম্প্রসারণ জোট-নিরপেক্ষতায়। বহুমূল্যদানে অর্জিত স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও দেশোন্নয়নের স্বার্থে মূলত এটি হচ্ছে আত্মনির্ভরতারই নীতি যদিও একই যুক্তিতে নিজেদের মধ্যে

ব্যাপকতর সংহতি প্রতিষ্ঠাও এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তলিয়ে দেখলে আবার ধরা পড়ে যে জাতীয় সত্তার স্বাধীন বিকাশের তাগিদ আসে ঐ সব দেশের সামনে যুগ যুগ ধরে যে সব জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পুঞ্জীভূত ও অনড় হয়ে রয়েছে তার সমাধানের মৌল দাবি থেকেই। অনেক বিশ্লেষণের পর শ্রীকরুণাকরণ তাই এই সিদ্ধান্ত পৌছেচেন যে: "Social revolution is the first priority in Asia।"

সমাজবিপ্লবের নিরন্তর তাগিদ যে এ সব দেশে প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার করে আপাতস্দূর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তা অনেক সময়ে প্রকাশ পায় রাষ্ট্রনায়কদের কথাতেও। যেমন সংবিধান পরিষদের সামনে জওহরলাল একদা বলেছিলেন:

"ইয়োরোপের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ নানাভাবেই ধরা পড়ে। আজকে এশিয়ার প্রধান উৎকণ্ঠা যাকে আশু মানবিক সমস্যা বলা চলে তাই নিয়েই। কমবেশি মাত্রায় অনগ্রসর এশিয়ার প্রতিটি দেশের প্রধান সমস্যা হল খাদ্যের সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যা। আমাদের উদ্বেগ এ-সব সমস্যা নিয়েই। শক্তির রাজনীতি প্রসঙ্গে তাই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।" (৮ই মার্চ, ১৯৪৯)

এবং "শেষপর্যন্ত পররাষ্ট্রনীতির উদ্ভব বৈষয়িক নীতি থেকেই এবং যতদিন পর্যন্ত না ভারতবর্ষ তার বৈষয়িক নীতি যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারছে ততদিন তার পররাষ্ট্রনীতিও কিছুটা অস্পষ্ট, অপরিণত ও পথ-হাতড়ানো ধরনের থাকতে বাধ্য।" (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪৯)

'সংঘাতের বাইরে' বা 'জোটনিরপেক্ষতার' মতো কথা তাই যে-নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে আসলে ব্যঞ্জনার দিক থেকে এই নীতি তার চাইতে অনেক বেশি সদর্থক। বিশ্লেষণের গভীরতার দরুন এ-কথাটিই সব চাইতে পরিস্ফুট হয়েছে শ্রীকরুণাকরণের প্রবন্ধে। অন্যান্য রচনাগুলিতে, বিশেষ করে ভারতের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জোটনিরপেক্ষ নীতির সঙ্গতি-বিষয়ক শ্রীদেবদত্তের প্রবন্ধে সব সময়ে এই দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন থাকেনি। সেখানে ঐ নীতিকে তার বৈষয়িক ভিত্তি থেকে কিছুটা বিযুক্ত করে দেখার ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মাঝে। তাই এই নীতির সঙ্গে সময়ে সময়ে আমাদের 'জাতীয় স্বার্থের' অসঙ্গতি এবং সে-ক্ষেত্রে 'জাতীয় স্বার্থের' খাতিরে কিঞ্চিৎ নীতিপ্রবণ হওয়ার নজিরও তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে (যেমন নেপাল ও পাকিস্তানের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে)। কিন্তু 'জাতীয় স্বার্থ' যে মূলত জাতির সামাজিক

ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে জড়িয়েই, সে দিক থেকে তার মূল চরিত্র মোটের উপর এক থাকলেও দেশে দেশে যে বৈচিত্র্য রয়েছে বা অবস্থাবিন্যাসে যে প্রতিনিয়তই তারতম্য ঘটছে এবং সেই অনুপাতে এই পররাষ্ট্রনীতিরও যে বিকাশ ঘটছে ও ঘটতে বাধ্য—এ কথা শ্রীদেবদত্ত সব সময়ে খেয়াল করেন নি। আর নীতির মধ্যে গতিশীলতার স্বীকৃতি কম দিয়েছেন বলেই অনেক সময়ে তাঁর বিচার কিছুটা ছকবাঁধা হয়ে পড়েছে। যেমন ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি যখন ভাগ করেন ১। Independent Policy বা স্বাধীন নীতি (১৯৪৬-৫০), Peace Area Approach বা শান্তি এলাকার দৃষ্টিভঙ্গি (১৯৫০-'৫৮) এবং non-alignment বা জোটনিরপেক্ষতা (১৯৫৮ সনের পর থেকে) এই তিন ভাবে, তখন তাঁর সতর্কবাণী সত্ত্বেও ব্যাপারটা একটু মনগড়া বোধহয়। তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঘটনাপ্রবাহকে কিছু বাঁকিয়ে-চুরিয়ে তাঁকে বলতে হয় যে "১৯৫৩ সনের পরেই (যুদ্ধের) উত্তেজনা ইওরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়ল এশিয়ায় ও আফ্রিকায়" (৬৭ পৃষ্ঠা) এই কথা ভুলে যে ১৯৫০ সন থেকেই কোরিয়া যুদ্ধের গতি পৃথিবীকে প্রায় ঠেলে দিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের কিনারায়।

তেমনই আন্তর্জাতিক সমস্যাদির প্রতি ভারতের মনোভাব বিচার করতে গিয়ে তিনি যখন তার পিছনকার বিচারবুদ্ধিসাপেক্ষ, অনুভূতিগত, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা উপাদানের কথা তোলেন আর বুদ্ধিগত উপাদানের মধ্যে কমিউনিজম, ধনতন্ত্র, যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রতি মনোভাব এবং অনুভূতিগত উপাদানের ভিতরে জাতীয়তাবাদ, বর্ণবৈষম্যবিরোধ, এশীয় সংহতির মনোবৃত্তিকে ধরেন তখন ব্যাপারটা বেশ কিছুটা মনগড়া ও যান্ত্রিক বোধ হয়। বিচারকালে বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লেষণের দিকটিতে কমজোর পড়ায় এই বিপত্তি মাঝে মাঝেই ঘটেছে এই প্রবন্ধে।

জোটনিরপেক্ষতার ভবিষ্যত (আলোচনার ধরন থেকে মনে হয় খুব সুদূর-ভবিষ্যতও নয়) প্রসঙ্গেও শ্রীদেবদত্তের মতামত তর্কাতীত নয়।

"…(ভারতের) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পরিপক্বতা অর্জন ও চীনা বিরূপতার প্রশ্ন, এমন এক অবস্থা যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঔপনিবেশিকতার ক্রমাবসান এবং কেনেডি ও ক্রুশ্চভের ক্ষমতালাভ—এই সব মিলিয়েই নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

'বিকাশমান রাষ্ট্রের পক্ষে মৌল তাগিদ হচ্ছে: মুক্তি নয়, বিকাশ এবং

সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কস্থাপন ও টি঳কে থাকা নয়, ক্ষমতা ও ক্ষমতা অর্জনের সব কটি আনুষঙ্গিক। বোধ হয় ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতিও নির্ধারিত হবে এই সব নতুন প্রয়োজন ও তাগিদের চাপেই। জোটনিরপেক্ষতার রাজনীতি হচ্ছে শান্তির রাজনীতি, শক্তিহীনতা ও কোনোমতে বেঁচে থাকার অবস্থা। শক্তি অর্জন ও বিকাশের রাজনীতির সঙ্গে জোটনিরপেক্ষতার সঙ্গতি সম্ভব হবে কি ?" (৯৩ পৃষ্ঠা)

এর সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরণ নায়ারের বিচার তুলনীয় :

"ভিতরের ও বাইরের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির বর্তমান চেহারারও যে পরিবর্তন ঘটবে এ কথা যুক্তিগ্রাহ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান প্রসঙ্গে সত্যকার মতৈক্য ঘটতে পারে যখন প্রত্যেকটি দেশই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'নিজে বাঁচো, অন্যেকে বাঁচতে দাও'-এর নীতি অনুসরণ করে চলবে। কোনো একটি শক্তিজোট হঠাৎ বিপুলতর সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে দাঁড়াতে পারে যার ফলে আজকের দুনিয়ার ভারসাম্য বিপর্যস্ত হবে এবং অসম্ভব ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে জোটনিরপেক্ষতার নীতি। এই সব দেশের ভিতরেও গুরুতর রাজনৈতিক ও অন্যবিধ পরিবর্তনের ফলেও পররাষ্ট্র নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। যে-কোনো শক্তিজোটের এই নীতির প্রতি সর্বাত্মক বিরোধিতাও বিশ্বদরবারে এ-নীতির প্রভাবকে খর্ব করতে বাধ্য বহুলাংশেই।

"অন্য এক দিক থেকেও এ-নীতি দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির ভিতরেও সর্বদাই পূর্ণ ও সুসমঞ্জস মতৈক্য ঘটেনি সর্বক্ষেত্রে। ...এই মতানৈক্য প্রমাণ করে বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য।...

"তবু এই মতানৈক্য জোটনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধতার মৌল উপাদানগুলিকে আচ্ছন্ন করে না। বর্তমানে সমস্ত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রাথমিক সমস্যা হল যত দ্রুত সম্ভব তাদের চিরন্তন, মধ্যযুগীয় সমাজের আধুনিকতাসাধন।..."

এ কথা ঠিক যে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, এবং পাকিস্তান বেলগ্রেড সম্মেলনে যোগদানকারী কোনো কোনো দেশ সম্পর্কে এই বইতে যে তথ্য সমাবেশ ঘটেছে তার থেকেও সেকথা স্পষ্টই বোঝা যায়। এও ঠিক যে ভিতরের

ও বাইরের চাপে ক্ষেত্রবিশেষে আমূল অবস্থান্তরও ঘটতে পারে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, যেমন মোসাদ্দেকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইরানে বা কাশেমের অভ্যুদয়ের পরে ইরাকে। কিন্তু বিপর্যয় ঘটলেও মূলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে যাবে, আর তারই সমাধানকল্পে থাকবে জাতীয় সত্তার স্বাধীন বিকাশের তাগিদ। তাই 'অদূর ভবিষ্যতে এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলিতে জোট-নিরপেক্ষতার ঝোঁক বাড়বে বই কমবে না—চীন সরকারের হালের মতিগতি সত্ত্বেও বোধ হচ্ছে এ কথাই সঠিক সাধারণভাবে যদি না অবশ্য বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায় ইতিমধ্যে।

বিশ্বযুদ্ধের পথরোধ করার ব্যাপারেও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে স্পষ্টতই। বহু আয়াস-অর্জিত স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং অব্যাহত জাতীয় উন্নয়ন—এদের পক্ষে বিশ্ব-শান্তিরক্ষা উভয়ের স্বার্থেই অপরিহার্য। তাই জোটনিরপেক্ষতার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শান্তির জন্য অকৃত্রিম আগ্রহ। এর সঙ্গে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের সমর্থন, এমন কি দেশোদ্ধারের জন্য প্রয়োজনবোধে ইন্দোচীন বা আলজিরিয়া বা আজকের দিনের এঙ্গোলার মতো সরাসরি অস্ত্রধারণের অসঙ্গতি-কল্পনা, হয় সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি (আমাদের গোয়া দখলের সময়ে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে যা প্রকট হয়ে উঠেছিল) নয়তো বা অতি বামপন্থী মূঢ়তাপ্রসূত (যেমন চীনের যুক্তি—যেহেতু সোভিয়েত বিশ্বশান্তিরক্ষায় উৎসাহী সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিশ্চয়ই তার সমর্থন নেই)। আসলে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যই শুধু নয়, আজকের পৃথিবীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্যও বিশ্বশান্তি অপরিহার্য। বেলগ্রেড সম্মেলন-সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রবন্ধটিতে এ-প্রসঙ্গের এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির ভিতরে সংহতি প্রতিষ্ঠার বিশদ বিচার উল্লেখযোগ্য।

সুনীল সেন

এশিয়ার নবজাগরণ

"এশিয়ার সমসাময়িক এবং চলমান ইতিহাস" যুগান্তরের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। স্বাধীন এশিয়ার "রাজনৈতিক রেখাচিত্র" উপস্থিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। সুমধুর ভাষায় তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলীর গতি ও প্রকৃতি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। "সাম্রাজ্যবাদের রূপরেখা" "বন্ধন মুক্তির রূপরেখা," "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া", "পূর্ব এশিয়ার সংঘাত", "চীন-ভারত সম্পর্ক", "পাকিস্তান নেপাল ও ভারত", "এশিয়ার ভবিষ্যৎ"—এই ছয়টি অধ্যায়ে এই বই বিভক্ত। যতদূর জানি বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে লেখক নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মতে দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে অনগ্রসরতা এশিয়ার সমাজ-জীবনের "বিক্ষোভ ও অসন্তোষের" মূল উৎস। এশিয়ার সমস্যাকে জটিল করেছে ধর্মের বিকৃতি, লোকাচার, বর্ণভেদের বৈষম্য, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, রক্ষণশীলতা। এই অবস্থায় মানুষের সৃজনশীল শক্তি অবরুদ্ধ, সমাজজীবন গতিশীল হবার পথে অনেক বাধার সম্মুখীন। সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে "পশ্চিমী দলে ভিড়াইবার" চেষ্টা ক্রমাগত চলবে; এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি সংস্থার (সংক্ষেপে সিয়াটোর) উৎপত্তি (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪); এশিয়ার ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-চক্রগুলি (চিয়াং কাইশেক, নগো দিয়েম, সীংম্যান রী প্রভৃতি) ট্রুম্যান-আইসেনহাওয়ার-কেনেডির ("মার্কিন উদারতাবাদী গণতন্ত্রীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও") পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে। এশিয়াতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘাত সৃষ্টির "একান্ত সম্ভাবনা", এবং সেই লড়াইয়ে "এক প্রান্তে থাকিবে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ এবং অন্য প্রান্তে সমাজতান্ত্রিক শিবির"।

এশিয়ার বন্ধন-মুক্তি। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশ। ছয় টাকা

(পৃঃ ১৭৯) এশিয়ার জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও সংশয় জেগেছে; "অদৃষ্টের বন্ধন"-কে অস্বীকার করে তাঁরা "অর্থনৈতিক বন্ধনের" কারণ জানতে উৎসুক হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশে রূপায়িত হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা।

বর্তমান সমালোচক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে একমত, তবে মনে হয় তাঁর কিছু ঢালাও মন্তব্য আছে যা আদৌ তর্কাতীত নয়। তাঁর দুটি মন্তব্য উধৃত করা গেল :

"গান্ধী-নেতৃত্ব ও নেহরু-নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে পূর্ণতর বিপ্লবের পথ হইতে সরাইয়া দিয়াছে—রক্তপাত, অশ্রু, এমন কি প্রয়োজনমত সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ভিতর দিয়া জনগণকে পুনর্জন্ম লাভের সুযোগ দেওয়া হয় নাই"। (পৃঃ ১৬৭)

"এশিয়ার বর্তমান অসমাপ্ত বিপ্লবের শুরু হইয়াছিল সংঘর্ষে ও রক্তপাতে (গান্ধীজীর অহিংসা সত্ত্বেও)। সুতরাং সেই বিপ্লব সমাপ্তি ও পূর্ণতার যখন পথ ধরিবে, তখন আর একবার অশ্রু ও রক্তপাতের নিশ্চিত সম্ভাবনা। অন্তত ফুলের মালা ও শঙ্খধ্বনির দ্বারা এশিয়ার সর্বত্র সেই বিপ্লবকে বরণ করা হইবে না"। (পৃঃ ১৮১)

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিতে গান্ধী-নেতৃত্ব এবং নেহরু-নেতৃত্বের নতুন মুল্যায়নের কোনো চেষ্টা লেখক করেন নি। গান্ধী-নেতৃত্ব বা নেহরু-নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার গান্ধী-নেহরুর নেতৃত্বেই ভারত ঔপনিবেশিক বন্ধন ছিন্ন করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিআন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না—এই তত্ত্ব ভারতের (এবং আরো কয়েকটি দেশের) ক্ষেত্রে অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। গোয়া মুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বুর্জোয়া সরকারের সামরিক অভিযানের ভূমিকা নিশ্চয়ই গৌণ নয়। ইতিহাসের গতি বিচিত্র। পুরনো ধ্যানধারণা দিয়ে সমসাময়িক ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি বোঝা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এশিয়ার "অসমাপ্ত বিপ্লব" কোন পথ ধরে অগ্রসর হবে? "অশ্রু ও রক্তপাতের" পথ কি এশিয়াবাসীর নিয়তি? এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের নতুন পরিস্থিতির নতুন সম্ভাবনার বিষয়টি এসে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় শ্রীমুখোপাধ্যায় বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব এবং এশিয়ার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপর এর প্রভাবের কোনো উল্লেখ করেন নি। আধুনিক যুগের কি অন্যতম প্রধান মর্মবস্তু এই নয় যে, বিশ্ব-

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজের বিকাশের নির্ধারক উপাদান হয়ে উঠছে? উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি নতুন ধারায় বিশ্ব-বিপ্লবের বিকাশকে প্রভাবিত করবার নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে নি? এশিয়ার কয়েকটি সদ্য স্বাধীন দেশ কি ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীন অর্থনীতিক বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র প্রসারের পথ গ্রহণ করে অগ্রসর হচ্ছে না? সিংহল ও ব্রহ্মদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

শ্রীমুখোপাধ্যায় উপসংহারে চীনের ভারত আক্রমণের বিষয় আলোচনা করেছেন। এশিয়ার ইতিহাসে এই ঘটনা যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে, তা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য। লেখকের ভাষায় "ইতিহাসের ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণে" আমরা বাস করছি। এই ঘটনার ফলে "সমাজতন্ত্রের আদর্শ আজ কোণঠাসা হইয়াছে, প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বাত্মক অভিযানে প্রগতিশীলতা চাপা পড়িয়াছে, এবং জনগণের নিকট যারা ছিল অবাঞ্ছিত হঠাৎ তারা দেশপ্রেমের মুখোস পরিয়া সভাক্ষেত্রে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে।" (পৃঃ ১৯০) ১৯৬২ সালের ১লা ডিসেম্বরে এই অংশ লিখিত। তারপর "প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বাত্মক অভিযান" আরো অগ্রসর হয়েছে। চীন এখনও কলম্বো প্রস্তাব গ্রহন করে নি। ঝোপ বুঝে কোপ মারবার জন্য কেনেডি-ম্যাকমিলান "কাশ্মীর সমস্যা" মিটিয়ে ফেলবার জন্য ভারতের উপর চাপ দিচ্ছেন। ভারতের জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়ার প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন।

রণজিৎ দাশগুপ্ত

নিরস্ত্র জয়

১৯৬২ সালের অক্টোবরের কয়েকটি দিন। কিউবার বিরোধে মার্কিন নৌ-অবরোধ শুরু হয়েছে। অস্ত্র-বোঝাই সোভিয়েত জাহাজ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হচ্ছে। মার্কিন জাহাজ তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। গোটা পৃথিবী জুড়েই যুদ্ধের মহড়া চলছে। মনে হচ্ছে, যুদ্ধ, নিউক্লীয় যুদ্ধ, আসন্ন আর সেই সঙ্গে সমগ্র মানবজাতি এবং হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে-ওঠা সভ্যতা ও সৌন্দর্যের পরমাশ্চর্য সব কীর্তি এসে দাঁড়িয়েছে চরম সর্বনাশের কিনারায়। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে, বারট্রাণ্ড রাসেল লিখছেন, "আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিতে কি একজনও প্রকৃতিস্থ লোক নেই। শেষ সম্ভাব্য মুহূর্তে জবাব এল : হ্যাঁ, একজন প্রকৃতিস্থ লোক রয়েছেন। ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন রাশিয়ার দিকে।...তাঁর প্রকৃতিস্থতা পৃথিবীকে বাঁচিয়েছে। এবং আপনারা ও আমি এখনও টিঁকে রয়েছি।" (পৃঃ ৭)

কিন্তু শুধু ক্যারিবিয়ান উপসাগরে নয়, ঐ একই সময়ে বিশ্বের আর এক প্রান্তে, চীন-ভারত সীমান্তে ঝড়ের কালো মেঘ জমা হচ্ছিল। গত অক্টোবরের এ-দুটি সমস্যার বিষয়েই রাসেল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত 'নিরস্ত্র জয়' বইটিতে।

সাধারণ্যে রাসেলের প্রধান পরিচয় দার্শনিক হিসেবে। সেই সঙ্গে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা-সমস্যা, শিল্প-সাহিত্য—জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমনি নানা শাখায় তাঁর অবাধ গতায়াত। কিন্তু এই অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষটি নিজেকে শুধুমাত্র কেতাবি বিদ্যার জগতে আবদ্ধ রাখেন নি। আর ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই ৯১ বছর বয়সেও তাঁর মস্তিষ্ক বিস্ময়কর রকমের সক্রিয়, চিন্তা ও উপলব্ধি প্রচণ্ড গতিশীল,

---

Unarmed Victory : Bertrand Russel, Penguin Books. London, 1963.

হৃদয় মানবিক আবেগে স্পন্দিত আর কর্মোদ্যম অপরিসীম। তাই দেখি, যে রাসেল একদা সোভিয়েত রুশিয়ার বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের উন্মাদ পরামর্শ দিয়েছিলেন আজ তিনিই নিউক্লীয় অস্ত্র-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়, সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও কারাবরণে অগ্রণী, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী মহৎ কর্মতৎপরতার অংশীদার, মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমালোচনায় মুখর, নিকিতা ক্রুশ্চভ ও সোভিয়েত সরকারের শান্তিনীতির গুণগ্রাহী। আর সে কারণেই অক্টোবরের সংকটময় দিনগুলিতে তিনি নিশ্চুপ বা নীরব থাকতে পারেন নি, ভাবতে পারেন নি যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ই একমাত্র ভবিতব্য। তাই তিনি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত প্রভাব, সম্পর্ক ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন ক্যারিবিয়ান উপসাগর ও হিমালয় সীমান্তের সংকট-মোচনের উদ্দেশ্যে, নিজেকে যুক্ত করেছেন দেশে দেশে সমস্ত সৎ, শান্তিকামী মানুষের শান্তি প্রয়াসের সঙ্গে এই গ্রহ ও গ্রহের বাসিন্দাদের জীবন নিরাপদ করার কাজে। সেদিনের সেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত, আর সেই অভিজ্ঞতার আলোয় কিউবা ও চীন-ভারত সমস্যা এবং সর্বোপরি, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নিহিত বিপদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির পরিচয় রয়েছে আলোচ্য বইটিতে।

দুই

নিঃসন্দেহেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে কিউবা সংকট হল সব থেকে নাটকীয় ও বিপজ্জনক। কমিউনিজম-বিরোধী পাণ্ডারা প্রচার করে থাকেন যে, এই সংকটের দায়িত্ব নাকি কিউবার বিপ্লবী সরকারের। কিন্তু এই সংকটের মূলে আসলে যে মার্কিন ধনকুবেরদের মুনাফা-লালসাটাই প্রধান কারণ, সে সত্যটি রাসেলের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি দেখিয়েছেন যে, বিপ্লব-পূর্ববর্তী কিউবায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ স্বৈরাচারী শাসকদের একটানা শাসনের পরিণাম কিউবাবাসীর পক্ষে মর্মান্তিক হলেও "কিউবান ভূম্যধিকারী ও আমেরিকান স্বার্থের দিক দিয়ে ব্যবস্থাটি ছিল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।" (পৃঃ ১৯)। কিউবা বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য এই অসঙ্গত পরিস্থিতির প্রতিকার। কিন্তু এই পরিবর্তনকে উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মেনে নিতে পারে নি। কেন না [ক] "কিউবাবাসীরা যে ধরনের সরকার নির্বাচন করল সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে নি"; এবং [খ] "এই ধরনের সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কিছু

প্রচণ্ড ধনী আমেরিকানদের আয় হ্রাস এবং তার মাধ্যমে বহুসংখ্যক অপুষ্ট কিউবাবাসীকে চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করা।" (পৃঃ ২৩)

এই পরিস্থিতিতে যে কোনো উপায়েই "কাস্ত্রো সরকারকে ধ্বংস করা এবং এর পরিবর্তে আমেরিকার আর্থিক স্বার্থের প্রতি বেশি অনুকূল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকার চেষ্টা সংকটের হেতু।" (পৃঃ ৫৬) কিউবা বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটানা প্ররোচনা ও আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির পটভূমিতেই কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি নির্মাণ। আর সোভিয়েত রাশিয়ার সক্রিয় সাহায্য ও উদার সহযোগিতা না পেলে যে ওয়াশিংটনের মতলব হাসিল হয়ে যেত—সেকথাও রাসেল বলেছেন।

তিন

সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্তাবকেরা প্রতিপাদন করতে চাইছে যে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপনই নাকি সংকটের কারণ। তারা রটনা করছে যে, এই ঘাঁটি স্থাপনের ব্যাপারে রয়েছে সোভিয়েত দেশের "মিথ্যাচারী, প্রতারণা-মূলক ও শয়তানী" নীতি। এবম্বিধ পরিস্থিতিতে "মুক্ত দুনিয়ার" ও "স্বাধীনতার" স্বার্থে কিউবায় হস্তক্ষেপ আর নৌ-অবরোধ ভিন্ন আর কি উপায় ছিল?

কিন্তু 'স্বাধীনতা'র জন্য এই বাগাড়ম্বর যে কত অসার সেটা দেখিয়ে রাসেল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মিসিসিপি, দক্ষিণ আফ্রিকা আর নাটিংহিলের কথা। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "স্পেন ও পর্তুগালকে 'মুক্ত দুনিয়া'র অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়, যদিও দুটি দেশেই জঘন্য স্বৈরাচারী সরকার বর্তমান। আমেরিকায় কমিউনিজম সম্প্রতি অপরাধে পরিণত হয়েছে।" (পৃঃ ১২) প্রকৃতপক্ষে 'মুক্ত দুনিয়া'র ঢাক যাঁরা বাজাচ্ছেন তাঁদের চিন্তা-চেতনায় পশ্চিম গোলার্ধে স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করার স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদী ধনকুবেরদের পরদেশ লুণ্ঠন করবার স্বাধীনতা। (পৃঃ ৬০, ৬২)

'প্রতারণার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাসেল বলেছেন, "রাশিয়ানরা কি করছে তা তারা গোপন করার কোনো চেষ্টা করেনি।" কিছু কিছু অস্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল একেবারে "প্রধান সড়কের কাছে এবং সবগুলিই আমেরিকান বিমান থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য খোলা ছিল।" (পৃঃ ৫৪)

'মিথ্যাচারণ'-এর বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল যে, এটি যদি করা হয়ে থাকে তবে করা হয়েছে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও নাটের গুরু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের

তরফ থেকে। তারই নমুনা হল কিউবায় স্থাপিত মাত্র ৫০০ মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রকে দূর পাল্লার আক্রমণাত্মক অস্ত্র বলে প্রচার করে মার্কিন দেশে ও অন্যত্র যুদ্ধের জিগিরকে খুঁচিয়ে তোলা। আর এই ধরনের মিথ্যা প্রচার ও সংবাদ তৈরিটা যে সচেতন সরকারী নীতিরই অঙ্গ সে-কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় মার্কিন এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী অব ডিফেন্স আর্থার সিলভেস্টারের উক্তিতে যেখানে তিনি বলছেন যে, সংবাদ হচ্ছে "আমেরিকান অস্ত্রাগারের একটি হাতিয়ার" এবং "নিউক্লীয় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার জন্য সরকারের জন্মগত অধিকারটি মৌলিক বলেই আমি মনে করি।" (পৃঃ ৫৬) কেউ কেউ হয়তো জাতিসঙ্ঘে কিউবা সংকটের গোড়ার দিকে সোভিয়েত প্রতিনিধি জোরিন কর্তৃক কিউবায় সোভিয়েত ঘাঁটির অস্তিত্ব অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু এ-বিষয়ে রাসেলের অভিমত হল যে, যথা সময়ে যথাযথ সরকারী নির্দেশের অভাবেই জোরিন ভুল করেছেন। উপরন্তু ব্যাপারটিতে জোরিনের বেশ কিছু ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকতে পারে, আর তার দরুণই পরবর্তীকালে জোরিনের অপসারণ ঘটেছে—এমন ইঙ্গিতও রাসেল করেছেন।

মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারী নেতাদের কপটতার স্বরূপ উদঘাটন করে রাসেল দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েত দেশের সীমান্তকে ঘিরে পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, তুরস্ক, জাপান, কানাডা ও অন্যান্য অনেক দেশে যুদ্ধ ঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি ও নিউক্লীয় সাবমেরিনের বেড়াজাল যারা রচনা করেছে তারাই আজ কিউবায় একটি স্বল্প পাল্লার ঘাঁটি নির্মাণের জন্য সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে হল্লা জুড়ে দিয়েছে। আর সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের অস্তিত্বকে যদি শয়তানী ও শত্রুতামূলক কাজ বলে গণ্য করাটা ন্যায়সঙ্গত হয়, "তবে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে হাইড্রোজেন বোমার, নিউক্লীয় রকেট ও পোলারিস সাবমেরিনের উপস্থিতিকে আমরা কি ভাবে ব্যাখ্যা করব?" (পৃঃ ২৫) সুতরাং সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে "যে দুমুখো আচরণের কথা লর্ড হোম বলছেন সেটিই হল আমেরিকান দুমুখো চিন্তা এবং ম্যাকমিলানের তথাকথিত সার্বভৌম সরকারের দু-রকম মাপকাঠির যোগ্য বর্ণনা।" (পৃঃ ৪২)

এই সাম্রাজ্যবাদী দুমুখো নীতি প্রচারের বাহন হয়েছে বেতার, টেলিভিশন ও সর্বোপরি সংবাদপত্র। যে 'মুক্ত দুনিয়া'র এত বড়াই করা হয় সেই দুনিয়াতেই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের মালিককুল কেমন করে

সংবাদ বিকৃত করে, সত্য গোপন করে আর সর্বনাশা যুদ্ধের হিস্টিরিয়া ছড়ায় তার বহু দৃষ্টান্ত রাসেল উপস্থিত করেছেন। কিউবা সংকটকালে এদের এই রটনাজালকে ছিন্ন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশন করার জন্য রাসেল সক্রিয় হয়েছেন, সংকট মোচনের জন্য কেনেডি, ম্যাকমিলান, ক্রুশ্চভ, কাস্ত্রো, উ থাণ্ট প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন (যদিও এসব বিবৃতির বেশির ভাগই সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায় নি) এবং শুধুমাত্র একক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে "যারা জীবনকে ভালোবাসে এমন প্রতিটি মানুষকে আমাদের দেশের রাস্তায় বেরিয়ে আসা এবং বাঁচার ও বাঁচতে দেওয়ার জন্য আমাদের দাবি জানানোর জন্য" উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। (পৃঃ ৩০)

চার

রাসেলের এই সমস্ত কর্মতৎপরতা ও আলোচ্য গ্রন্থে নানা তথ্য-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্যে যেটি প্রধান কথা সেটি হল যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা প্রসঙ্গে তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা। এই পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ইতিপূর্বে অনেক হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে নিউক্লীয় অস্ত্রের আবিষ্কারের দরুণ যুদ্ধের সমস্ত প্রকৃতিই একেবারে পাল্টে গেছে। নিউক্লীয় অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যুদ্ধকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক করে তুলেছে, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক নানা পরিবর্তন দুই বিরোধী সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে একই সঙ্গে সম্ভবপর ও প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে রাসেলের বিবেচনায় যুদ্ধ ও শান্তির প্রসঙ্গে "শান্তির গুরুত্বের তুলনায় দুই পক্ষের গুণাগুণের প্রশ্ন তুচ্ছ।" (পৃঃ ১৩) এই নিউক্লীয় যুগে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কোনো বাস্তব বিকল্প নেই। আর সে কারণেই, রাসেল ঘোষণা করেছেন, দুটি দেশের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় দেশের পক্ষে।

কিউবা সংকট সুনিশ্চিতভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, ক্রুশ্চভ ও সোভিয়েত সরকার নিউক্লীয় বিপদ এবং শান্তির সম্ভাবনা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। এই সংকট মোচনের জন্য সোভিয়েত ব্যবস্থাবলীই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সোভিয়েত সরকারের কাছে মানবজাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন, শান্তির প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্ন। আগেই বলা হয়েছে, সংকটকালে রাসেল অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে সুবিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

কিন্তু ম্যাকমিলান আবেদনটির শুধুমাত্র প্রাপ্তিস্বীকার করেছিলেন, কেনেডি পরামর্শ দিয়েছিলেন সোভিয়েত 'দস্যু'দের প্রতি মনোযোগ দিতে। আর ক্রুশ্চভ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন : কোনো হঠকারিতা করা হবে না, নিউক্লীয় যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া হবে না, শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সব রকম উপায়ে চেষ্টা চালানো হবে। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিই পূরণ করা হয়েছে। তাই রাসেলের সিদ্ধান্ত হল, "যদি কোনও দিন কাজ দিয়ে কথাকে সমর্থন করা হয়ে থাকে তবে তা করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।" (পৃঃ ৫২) সোভিয়েত ব্যবস্থাবলীর ফলেই একাধারে মানবজাতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির অস্তিত্ব এবং কিউবা বিপ্লবের অগ্রগতি রক্ষা পেয়েছে। এ ভাবেই কোনও অস্ত্র ব্যবহার না করে, রক্তক্ষয় না ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্জন করেছে এক মস্ত বড় নৈতিক জয়, 'নিরস্ত্র জয়'।

কিন্তু সোভিয়েত সরকার যখন "ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের জন্য ইচ্ছুক," তখনও আমেরিকান সরকার ও পশ্চিমী দেশগুলি অনুসরণ করে চলেছে আগের মতোই "সশস্ত্র উন্মাদগ্রস্ততার" নীতি। কিউবার বিরুদ্ধে হুমকী প্রদর্শনও অব্যাহত রয়েছে। নিঃসংশয়েই এই নীতি অনুসরণের মধ্যে রয়েছে যে-কোনো সময়ে সর্বনাশা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা।

রাসেল অবশ্য অকপটেই জানিয়েছেন যে, তিনি কোনোদিনই কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তাঁর মতে মার্কসবাদ বাতিল হয়ে গেছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অগণতান্ত্রিক ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নই যে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে শান্তির পক্ষে এটা তাঁর কাছে একটা গুরুত্বহীন যোগাযোগ বা "unimportant accident।" (পৃঃ ৭) আসলে অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিনে শান্তি ঘোষণার সময় থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন যে শান্তির জন্য নিরলস নিরবচ্ছিন্ন যোদ্ধা এ-ইতিহাস তিনি উপেক্ষা করেছেন। কিউবা সংকটকালে সোভিয়েত আচরণ ও নীতি যে মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং এটাই যে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত এবং এই সুবিবেচনাসম্মত নীতির মূল যে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতির ভিতরেই নিহিত, শান্তির সংগ্রাম যে কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ, এ-সত্যটি অনুধাবনে রাসেল ব্যর্থ হয়েছেন।

স্বভাবতই এরকম অনেক বিষয়ে রাসেলের সঙ্গে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এই মতপার্থক্য গৌণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মতপার্থক্যের

থেকে মিলের কথাটাই হল প্রধান—এবং এ-মিল বা ঐক্য হল আজকের দিনের সব থেকে মৌলিক, সব থেকে জরুরী বিষয়ে : বিশ্বশান্তির জন্য প্রহরাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে, আর দেশে দেশে জনসাধারণের সদাসতর্কতাই বিশ্বশান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র উপায়।

পাঁচ

যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যার বিষয়ে এই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়েই রাসেল ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। অবশ্য আশু ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে কিউবা সংকটের তুলনায় ভারত-চীন সংকট ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ। কেন না প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতি এসে দাঁড়িয়েছিল একেবারে চরম ধ্বংসের মুখোমুখি, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিপদটা ছিল একটা স্থানীয় যুদ্ধের সর্বাত্মক সাধারণ যুদ্ধে পরিণত হওয়ার। তথাপি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘর্ষ, এবং সেই সংঘর্ষ বিস্তারের সম্ভাবনায় রাসেল ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছেন অত্যন্ত সঙ্গত কারণে। আর এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত সাধ্য অনুসারে এই জটিল সমস্যা সমাধানে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন।

কিন্তু একান্ত মানবদরদ ও শান্তিকামনার জন্য রাসেলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও একথা না বলে উপায় নেই যে, চীন-ভারত সীমান্ত-সমস্যা প্রসঙ্গে রাসেলের অনেক ধারণা ও বক্তব্য একেবারেই ভ্রান্ত। বাস্তবিকপক্ষে ভারত-চীন বিরোধটিকে সমসাময়িক বাস্তবতার পটভূমিতে বিচার করার পরিবর্তে রাসেল গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত আইনী ও আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার ফলে তাঁর মনে হয়েছে : [ক] চীনের সীমান্ত দাবি খুবই জোরালো ; [খ] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'বেআইনী' দখলগুলির উত্তরাধিকারের দাবিদার ভারতীয় ইউনিয়ন ; [গ] চীনই প্রথম আক্রমনকারী কিনা, এটা বলা সংশয়ের বিষয় ; [ঘ] শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসায় ভারত তেমন আগ্রহান্বিত তো নয় বটেই, বরং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে রত।

এই দুই সুপ্রাচীন বন্ধু দেশের মধ্যে সংঘর্ষ যে গভীর বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ঘটনা, একথা যে-কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবে। কিন্তু কেন এমনটা ঘটল ? এখন কার ম্যাপ ঠিক, আর কার ম্যাপ বেঠিক—সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে রাসেল নিজেও

সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত নন। কিন্তু এরকমের কোনো সমস্যাকে আমরা কি বিবেচনা করব শুধু অতীত ইতিহাস ও পুরনো ম্যাপের সাহায্যে, না বর্তমান ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোয়? ভারতীয় জাতি সম্পর্কে ধারণা বা বর্তমান ভারত রাষ্ট্র তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতজয়ের পরবর্তী ব্যাপার এবং অনেকাংশে ফলও বটে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের বর্তমান সীমানা তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘটনা। কিন্তু অতীত ইতিহাসের নজীর তুলে যদি পুরনো সীমানা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয় তবে কেমন হবে? চীনা বক্তব্য থেকেই তো জানা যাচ্ছে, ১৯৫০ সালেই 'নেফা' অঞ্চলে ভারতীয় প্রশাসন প্রসারিত হয়েছে, এটা ঘটেছে বিনা বাধায় এবং ১৯৫৯ সালের আগে পর্যন্ত এ-বিষয়ে-কোনো আপত্তিই চীন সরকার জানান নি।

ভারত আলাপ-আলোচনায় আগ্রহী কিনা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলছে কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তরে মনে রাখা উচিত, অতীতে চীন যখন আজকের তুলনায় অনেক দুর্বল ছিল তখনই অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের পঞ্চশীল চুক্তিতে তিব্বতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সুবিধার উত্তরাধিকার ভারত স্বেচ্ছায় বর্জন করেছে। মনে রাখা উচিত, ঐ চুক্তি অনুসারেই তিব্বতের ইয়াংসি ও গিয়াংসি থেকে ভারত সাময়িক চৌকি তুলে নিয়েছে, এবং ভারত সরকারের মালিকানাধীন ডাক ও তার বিভাগকে নামমাত্র মূল্যে চীন সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রথম আক্রমণের বিষয়ে বলা যেতে পারে, এটা ঠিকই যে অক্টোবরের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতীয় জমির থেকে চীনা ফৌজ বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ নির্দেশটি ছিল ভারতীয় দাবি অনুসারে ম্যাকমেহন রেখার দক্ষিণে থাগলা গিরিপৃষ্ঠ অঞ্চলের জন্য। গত বছরে ৮ই সেপ্টেম্বরের আগে চীনারাও এ অঞ্চলে ছিল না এবং এখানে মামলা ছিল মাত্র ৪।৫ মাইলের। কিন্তু এই নির্দেশের পাল্টা জবাবে শুরু হয় চীনা অভিযান এবং এই অভিযান চালানো হয় সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে। ট্যাঙ্ক, মর্টার ইত্যাদিতে সুসজ্জিত অভিযানই প্রমাণ করে দেয় যে এটি ছিল সযত্নে প্রস্তুত ও যথেষ্ট পূর্বপরিকল্পিত। আর পূর্ব সীমান্তে এই অভিযান চালানো হয় ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম না করার পূর্ব-প্রতিশ্রুতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে।

একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ থেকে চীনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্ররোচনা জোগানো

হয়েছে, দেশের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা ও অন্ধ চীন-বিদ্বেষ জাগ্রত করার অপপ্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই যুদ্ধ-উন্মাদনার বিরুদ্ধে বারে বারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, চীনের প্রতি বর্বর হওয়ার জন্য ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনীর আহ্বানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন, দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধের শোচনীয় পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য বারে বারে আবেদন জানিয়েছেন, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতিকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। অবশ্য তাঁকে এবং তাঁর মতো আরও অনেককে কাজ করতে হচ্ছে এখন, এক পরিস্থিতিতে যখন দেশের ভিতরে উগ্র প্রতিক্রিয়াশীলেরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে। ফলে শান্তিকামী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাজ দুরূহ হয়েছে। কিন্তু এটা ঘটেছে চীন সরকারের ভ্রান্ত নীতির দৌলতে। রাসেল কিন্তু চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য সুস্থ শক্তির মধ্যেকার পার্থক্যটিকে ধর্তব্য বিষয় বলে মনে করেন নি। আর চীনের পক্ষ থেকে 'পিপলস ডেইলি'র পাতায় ও পিকিং রেডিওতে দিনের পর দিন যে বিষোদ্গার ও উৎকট কুৎসা রটনা করা হয়েছে সেটিও তাঁর নজরে পরে নি।

চীন যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে নিঃসন্দেহেই বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। কোনও বিজয়ী শক্তির পক্ষ থেকে এমন ঘটনা, বিশেষত সৈন্য প্রত্যাহার তর্কাতীতভাবেই অভূতপূর্ব ও অত্যন্ত তাৎপর্যসম্পন্ন। কিন্তু সামরিক সংঘর্ষ না হওয়াটাই ভালো ছিল না কি? আর ভারত যদি আক্রমণকারী হয়ে থাকে তবে চীনা পক্ষকে কেন সৈন্য প্রত্যাহার করতে হল? কেনই বা চীন কোনোরকম সালিশী বা তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানতে একেবারেই রাজী নয়? কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে গোড়ায় 'ইতিবাচক সাড়া'র কথা প্রচার করার পর ভারত সরকার যখন ঐ প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করলেন, তখন চীন কেন তা কার্যকরী করতে গররাজী? (রাসেল তো ভারত সরকারকে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।) এ-ক্ষেত্রে কপটতার দোষে কে দুষ্ট? এ-সব বিষয় ও তথ্য রাসেলের নজরে না পড়াটা নেহাৎই অপ্রত্যাশিত।

ছয়

রাসেলের এমন বিভ্রমের অবশ্য কারণ আছে। তিনি সমস্ত সমস্যাটির মতাদর্শ ও রাজনীতিগত দিকটিকেই অবহেলা করেছেন। তাঁর মতে "কোনো

মতাদর্শগত কারণে নয়, শুধুমাত্র কতকগুলি অঞ্চলগত প্রশ্নে চীন ও ভারতের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে।" (পৃঃ ৬৫) অথচ ব্যাপারটি হল ঠিক এর বিপরীত। এই বিরোধের মূল অতীতের ম্যাপ বা ইতিহাসের মধ্যে নেই; এর মূল রয়েছে ভারত সরকার, সরকারের নীতি ও দেশের ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস সম্পর্কে চীনা নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিচারের মধ্যে। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধ, শান্তি ও অন্যান্য মৌলিক সমস্যাবলী সম্পর্কে চীনা নেতৃবৃন্দের মতান্ধতা। আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির অনুসরণ যে সমাজতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ নীতি, এ-কথাটাই চীনা নেতাদের চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। আর এরই দরুণ শুধু যে চীন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক শত্রুতামূলক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে তাই নয়, কোনও পক্ষ অবলম্বন না করে এই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আবেদন করাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও চীনা সমালোচনার লক্ষ্যবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত-চীন সীমান্ত-সমস্যার এই মূলগত মতাদর্শগত দিকটি উপলব্ধি করতে রাসেল সম্পূর্ণভাবেই অপারগ হয়েছেন।

কিন্তু এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, এই ধরনের স্থানীয় যুদ্ধের মধ্যে যে বিপদ নিহিত রয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ তীব্রতর হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে, এ-রকমের কোনো সংঘর্ষে নিউক্লীয় শক্তিগুলির জড়িয়ে পড়বার ভয় রয়েছে—সেদিকে রাসেল অত্যন্ত সঠিকভাবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপরন্তু ভারতের মতো সদ্যস্বাধীন উন্নয়নকামী দেশে যুদ্ধের হিস্টিরিয়া তৈরি ও সামরিক সাহায্যের জন্য আমেরিকা বা ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীলতা যে গোষ্ঠী-বহির্ভূত নীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, গণতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে চরম বিঘ্নস্বরূপ, সে সম্পর্কেও তিনি সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এসবের উপরে রয়েছে আজকের উত্তেজনাপূর্ণ জগতে সংযম, সুস্থ বিবেচনা ও শান্তির জন্য তাঁর যুক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর। আর এ-কারণেই সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রশংসা তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

৮

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাস

সি. এইচ. ফিলিপস্-এর সম্পাদনায় হালে প্রকাশিত ভারত, পাকিস্তান ও সিংহলের ঐতিহাসিকগণ (হিস্টোরিয়ানস্ অব ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যাণ্ড সিলোন)-এর একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে—ভারতীয় পণ্ডিতরা ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে পথ নির্দেশ করে গেছেন, সে পথেই পরিক্রমায় ইচ্ছুক। ফলত যে সব ইতিহাস লেখা হয়েছে বা হচ্ছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল।" বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যের সপক্ষে বহু ইতিহাস-গ্রন্থেরই নাম করা চলতে পারে—পরিচিত, অপরিচিত দুই-ই। বোধ করি বিখ্যাত পণ্ডিত ভিন্সেণ্ট স্মিথের মারাত্মক উক্তিই এর জন্যে খানিকটা দায়ী—"The history of India in the Muhammedan period must necessarily be a chronicle of kings, courts or conquests, rather than one of national and social evolution." উনিশ শতকের ইওরোপ বলতে যেহেতু কার্যত আমরা ইংলণ্ডকেই বুঝতাম, সেহেতু ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়বস্তুকে বেছে নেবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিংবা হয়তো, রাজনীতি চর্চায় আমরা যেমন অগ্রসর হয়েছিলাম সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ততটা নয়—এই সূত্রেও এই ঝোঁকের ব্যাখ্যা পাওয়া চলে। সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যতটা আমরা স্বাধীন, স্বাবলম্বী হতে চেয়েছি, রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মূল শর্ত হিসাবে তার থেকে অনেক বেশি চেয়েছি। বাস্তবিক, রাজনৈতিক কার্যাবলীকেই সর্বদা শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া শুধু আমাদের ইতিহাস চর্চার নয়, জাতীয় আন্দোলনেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য)।

কিন্তু স্মরণীয়, ইংরেজ ভারত ইতিহাসবিদদের মধ্যে আমরা শুধু ভিন্সেণ্ট স্মিথদেরই পাইনি। আশ্চর্যের বিষয় মোরল্যাণ্ড—যাঁর মুসলিম ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা

Contributions to Indian Economic History. Edited by Tapan Roy-Chaudhuri ; Firma K. L. Mukhopadhyay. Calcutta, Rs. 8·00

(অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম ইন মোসলেম ইণ্ডিয়া) এক স্মরণীয় ইতিহাস-কর্ম— আমাদের ঐতিহাসিকদের উৎসাহিত করলেন না। অথচ তিনি বুঝেছিলেন ইতিহাসের মূল চাবিকাঠি অর্থনীতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই পাওয়া যাবে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কৃষি ও ভূমিরাজস্বই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছিন্ন রূপ চোখের সামনে থাকা দরকার। অবশ্য মোরল্যাণ্ড-এর প্রচেষ্টা তো দূরে থাক, রমেশচন্দ্র দত্তের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'ভারতের আর্থিক ইতিহাস' (দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া) কি আমাদের অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় উৎসাহিত করেছিল? অথচ বিশ শতকের গোড়াতেই এর প্রকাশকাল। এ-গ্রন্থ শুধু অর্থনীতিক ইতিহাস নয়, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বড় হাতিয়ারও বটে। ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে রমেশচন্দ্র দত্তের এই আশ্চর্য প্রচেষ্টার ভূমিকা সর্বদা স্মরণীয়। একদিক থেকে এই গ্রন্থ এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এর স্থান গ্রহণ করার মতো গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নি—প্রায় দেড়শো বছরের ভারতবর্ষ এর পটভূমি।

সুখের বিষয়, স্বাধীনতালাভের পর থেকে অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় আমাদের উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থাও হয়েছে। দিল্লীতে তো গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে যা শুধু অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চার জন্য। অবশ্যই আমাদের অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চার আরম্ভ-সূত্র রমেশচন্দ্র দত্ত। এবং তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছি আমরা। অবশ্য তাঁর প্রতি আমাদের সমালোচনা মাঝে মাঝেই রূঢ় হয়ে যাচ্ছে—অনেক সময়েই তাঁর বক্তব্যের আসল তাৎপর্য না বুঝে আমরা সমালোচনা করছি। যেমন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের মন্তব্যাবলী নিয়ে। তাঁর মতে "Lord Cornwalli's Permanent Settlement of 1793 is the widest and most successful measure which the British nation has ever adopted in India." অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল বর্ণনা করে দেখাতে চেয়েছেন যে, রমেশচন্দ্রের এই উক্তি ভুল। কিন্তু রমেশচন্দ্রের কাছে মূল প্রশ্নটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না—ছিল "ইকনমিক ড্রেন"। তিনি দেখেছিলেন যে এই বন্দোবস্তের ফলে "ইকনমিক ড্রেন" অন্তত কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এ ব্যাপারে দ্বিমত হবার কারণ নেই।

আধুনিক গ্রন্থকারও একথা স্বীকার করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যা হল তা "a set-back to the company's principle of collecting ever-increasing land-tax from the peasants."[১] অবশ্যই ইকনমিক ড্রেনের ওপর অত্যধিক মনসংযোগ-এর ফলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে কি কি কুফল ঘটতে পারে,—জমিদারদের হাতে কৃষকদের দুর্দশা কি ভাবে ঘটে এসব ব্যাপার তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তবু ঠিকই থাকে।

অবশ্যই রমেশচন্দ্রের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক। জাতীয়-আন্দোলনের সময়ের মধ্যে বাস করে রমেশচন্দ্রের পক্ষে হয়তো অনেক সময়ই নৈর্ব্যক্তিকতা আনা সম্ভব হয় নি। তাঁর লেখায় মর‍্যাল বা নৈতিক প্রশ্ন বার বার দেখা দিয়েছে। তা ছাড়াও আরও সীমাবদ্ধতার কথা আধুনিক ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন।[২] সুতরাং নতুন করে অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চা শুরু হয়েছে—রমেশচন্দ্রই এ ব্যাপারে পুরোধা। এক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের সমালোচনা নিশ্চয়ই করা হবে কিন্তু একথা যেন আমরা না ভুলি যে, রমেশচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অর্থনীতিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তেমনি মুসলমান যুগের জন্য আমাদের আরম্ভ মোরল্যাণ্ডে।

ইদানীং অর্থনীতিক ইতিহাসের চর্চা কোনদিকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ সংকলন-এর শেষ প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত তপন রায়চৌধুরীর রচনায়। তিনি যে গ্রন্থগুলির আলোচনা করেছেন, আরও সঠিক অর্থে চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন, তার পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ এখানে নেই—তবু বর্তমান লেখকের তার মধ্যে যে কয়টি গ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তার এবং শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর প্রবন্ধটির ভিত্তিতে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এই নতুন অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গবেষণা মোনোগ্রাফিক। রমেশচন্দ্র দত্তের মত বিস্তৃত সময় ও পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন গ্রহণ করা হচ্ছে না। সমগ্র দেশ নয়, দেশের একটি অংশই

১। The Rise and Fall of the East India Company: Ramkrishna Mukherjee p. 238.

২। শ্রীযুক্ত অমলেশ ত্রিপাঠীর 'ট্রেড এ্যাণ্ড ফিন্যান্স ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' দ্রষ্টব্য।

বেছে নেওয়া হচ্ছে গবেষণার জন্য বা অতি স্বল্প সময়কালের কয়েকটি সমস্যাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী বলেছেন, ইতিহাসের অন্য শাখার গবেষণা, সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই উন্নতি। অবশ্যই এর সঙ্গে আছে "documentary exploitation of source material"—মৌলিক উপাদানের উৎসস্থানীয় দলিল-দস্তাবেজের বিশ্লেষণ। অবশ্যই এই বিশেষীকরণের ফলে অর্থনীতিক সম্পর্কের প্যাটার্ন সম্পর্কে পুরনো তর্কবিতর্ক চাপা পড়ে যায় নি। রমেশচন্দ্র দত্ত ও ডিগবি আলোচিত "এক্সপ্লয়টেশন"-এর প্রশ্ন অনেক আধুনিক অর্থনীতিক ইতিহাসেরই কেন্দ্রীয় সূত্র। অবশ্যই এই আলোচনা কোনো বিশেষ বিষয়কে নিয়ে। এবং গড়ন ও গাঠনিক পরিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ খুঁটিনাটিগুলিও "significant minutea of structure and structural change', আধুনিক ইতিহাস-চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। কোনো বিশেষ বিষয় বা স্বল্প সময়কাল অথবা কোনো বিশেষ প্রদেশকে কেন্দ্র করে এই অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় আমাদের জ্ঞান নিখুঁত হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তৃত পটের চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে না কি? রমেশচন্দ্র দত্ত যেমন ব্যাপক সময় ও গোটা দেশকেই তাঁর গ্রন্থে ধরতে চেয়েছিলেন—দোষত্রুটি সত্ত্বেও তার অন্যমূল্য নিশ্চয় আছে। এই পটের চেতনা যদি না থাকে তাহলে অক্লান্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র অর্থনীতিক ইতিহাস বলার যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তাতে হয়তো একাডেমিক অর্থে অর্থনীতিক ইতিহাস রচিত হচ্ছে, নিশ্চয় তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু শেষ লাভ বড়ো একটা হচ্ছে না। বাস্তবিক ইতিহাসের কারবার সমাজে ব্যক্তিকে নিয়ে—এবং যিনি যেখানে অক্লান্ত পরিশ্রমে ইতিহাসের নতুন দিক আলোকিত করছেন তার শেষ কথা কিন্তু সে যুগের সমাজের চেহারাকে স্পষ্ট করা। মনোগ্রাফ রচনা করার সীমারদ্ধতা এখানেই। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতির মিলনেই তা সম্ভব। মার্কসের নির্দেশিত পথও এটাই। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত নিঃসন্দেহেই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিক ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই শুধুমাত্র ব্রিটিশদের আগমন ও শাসনের ফলাফল নিয়েই ব্যস্ত আছেন—তাও সারা সমাজে কী হল তা নয়—কতকগুলি শিল্প কিভাবে ভেঙে গেল, খুব সংকীর্ণ অর্থে কতকগুলি অর্থনীতিক বিষয় প্রভৃতি

নিয়ে। অথচ ভারতীয় সমাজের ভিতর থেকে কোনো তাগিদ ছিল কিনা, সেখানকার অবস্থা কী,—এসব আলোচনা অনেকটা অবান্তরের মতোই উপেক্ষিত। অবশ্যই দু'একজনের লেখায় এই সমস্যা আলোচিত হয়েছে। যেমন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর "দি রাইজ এ্যাণ্ড ফল অব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।" এবং এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, ভারতীয় বুর্জোয়াজির দুর্বলতা প্রভৃতির চমৎকার আলোচনা করেছেন তিনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উত্থান-পতনকে ইংলণ্ডের ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন—বৃহত্তর ইতিহাসের পটে তাকে স্থাপন করেছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ইতিহাস তাঁর বিষয়বস্তু নয়—ফলে কয়েক জায়গায় তাঁর মন্তব্য যেমন উপযুক্ত তথ্যসমৃদ্ধ নয়, তেমনি কয়েকটি অসতর্ক সামান্য সিদ্ধান্ত পীড়াদায়ক।

শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী যে কয়টি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন, তা হল—১। দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অ্যাণ্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল ফ্রম ১৭০৪ টু ১৭৪০—এস. ভট্টাচার্য। ২। ইকনমিক হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ফ্রম পলাশী টু পার্মানেণ্ট সেট্‌লমেণ্ট—(১ম খণ্ড) এন. কে. সিনহা (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে।) ৩। জন কোম্পানি অ্যাট ওয়ার্ক—হোল্ডেন ফার্বার ৪। ইকনমিক ট্র্যানজিশন অব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী—এইচ. আর. ঘোষাল (১৭৯৩—১৮৩৩)। ৫। ট্রেড এ্যাণ্ড ফিন্যান্স ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (১৭৯৩—১৮৩৩)—এ. ত্রিপাঠী। ৬। ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব অন্ধ্র প্রদেশ—এ. ভি. রমন রাও। ৭। ইকনমিক কণ্ডিশনস ইন দি ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সী—এ. সরদা রাজু। ৮। ইকনমিক হিষ্ট্রি অব দি বোম্বে, ডেকান অ্যাণ্ড কর্ণাটক (১৮১৮—১৮৬৮)—আর. ভি. চোকিস। ৯। ল্যাণ্ড রেভেনিউ পলিসি ইন দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস আণ্ডার ব্রিটিশ রুল—বি. আর. মিশ্র। ১০। স্টাডিস ইন ইণ্ডো-ব্রিটিশ ইকনমি হাণ্ড্রেড ইয়ারস এগো—এন. সি. সিনহা। ১০। দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—আর. কে. মুখার্জী। ১১। অরিজিনস অব দি মডার্ন ইণ্ডিয়ান বিজনেস ক্লাস—অ্যান ইণ্টারিম রিপোর্ট—গ্যাডগিল (মাইমিওগ্রাফড)। ১২। দি ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ানস অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া—এরিক স্টোকস। ১৩। ইনভেস্টমেণ্ট ইন্ এম্পায়ার—ব্রিটিশ রেলওয়ে অ্যাণ্ড স্টীম শিপিং এণ্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া (১৮২৫—১৮৪৯) ড্যানিয়েল থর্নার। এই গ্রন্থতালিকা আমাদের মন্তব্যকেই সমর্থন করে।

এই সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ ইরফান এম. হাবিব-এর ব্যাঙ্কিং ইন্ মুঘল ইণ্ডিয়া। শ্রীযুক্ত হাবিব-এর লেখার সব থেকে বড় গুণ যে তাতে রিসার্চ-এর গাম্ভীর্যও যেমন বিদ্যমান, তেমনি নতুন চিন্তা—প্রচলিত মতকে খণ্ডন, নতুন ভাবে ইতিহাস রচনা করার অভীপ্সা—পাঠককে চমৎকৃত করে। এই প্রবন্ধে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় "...Mughal India had developed 'money economy' to a considerable extent" এবং "there existed a brisk market in commercial paper, a system of insurance and the rudiments of deposit banking." অবশ্য ভারতবর্ষে মুসলমান যুগে "মানি ইকনমির" বিকাশ অনেকখানি ঘটেছিল—এই কথা আগেও বলা হয়েছে। যেমন এ. কে. নাজমুম করিম বলেছেন তাঁর 'চেঞ্জিং সোসাইটি ইন্ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান'-এ। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে মুশকিল হয়েছে যে তিনি শুধু মন্তব্য করেই ছেড়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি এর মূল মুসলমান শাসকদের মধ্য এশিয়া থেকে পাওয়া, "largescale use of money"-র সঙ্গে পরিচিতিতে খুঁজেছেন। শ্রীযুক্ত হাবিব যথার্থ ইতিহাসবিদের মতো এই মতকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন—Sarraf-দের কার্যাবলীর সূত্রে। Sarraf-দের সম্পর্কে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে মন্তব্য করেছেন যে "with all the "dissolving influence" that money is said to possess, the profession of the Sarraf has not escaped the tentacles of the Indian caste system and has been monopolised by the members of a few mercantile castes". বোধ হয় এই মনোপলি মুঘল যুগেও ছিল। "Testing and Changing money" ছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীর Sarraf হুণ্ডির ব্যাপারেও মূল ব্যক্তি। সতেরো শতকে বাণিজ্যের যে উন্নতি ঘটেছিল তার অন্যতম প্রমাণ বীমাব্যবস্থার বিকাশ—এক্ষেত্রেও বীমাকারী ছিল Sarraf-বৃন্দ। আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থার সার কর্ম টাকা ঋণ দেওয়া ও গচ্ছিত রাখা। মুঘল যুগে অন্তত কিছু Sarraf এই দ্বিবিধ কর্মই করতেন। অবশ্য Sarraf-রা ব্যতীত অর্থঋণের ব্যাপারে আরও ঋণদানকারী ছিল—যেমন মহাজন, সাহুকার ইত্যাদি। আলোচনার শেষে শ্রীযুক্ত হাবিব একটি তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন* যে আর্থিক সংগঠনের উন্নতি এবং টাকার ব্যাপক ব্যবহারের ফলই ধনতন্ত্র নয়।

* লক্ষণীয় ইরফান হাবিব তত্ত্ব থেকে তথ্যে আসেন নি—বাস্তবকে বিশ্লেষণ করার পরেই তত্ত্বে এসেছেন।

মুঘল যুগে ব্যাঙ্কব্যবস্থা তৎকালীন বাণিজ্যব্যবস্থার প্রয়োজনানুযায়ীই বিকশিত হয়েছিল—এই বাণিজ্য মূলত অপরিবর্তনীয় হস্তশিল্প (হ্যাণ্ডিক্রাফট) উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আসলে ব্যাঙ্কারদের মূলধন, যা কোনো উদ্যোগে নিযুক্ত ছিল না, আসলে ছিল ব্যাপারী পুঁজি "মার্চেন্ট ক্যাপিটাল।" ফলত উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর এর কোনো প্রত্যক্ষ হাত ছিল না। শ্রীযুক্ত হাবিব তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন মার্কসের উধৃতি দিয়ে, যার শেষ কথা, "The Independent development of Merchant Capital stands therefore in an inverse ratio to the general economic development of society."

সংকলনের পরবর্তী প্রবন্ধ সুলেখচন্দ্র গুপ্ত-র আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমের "সিডেড ও কঙ্কারড্ প্রভিন্সের" গ্রামসমাজ (ভিলেজ কম্যুনিটি) প্রসঙ্গে। উপরি উক্ত সময়ে গ্রামসমাজ বা ভিলেজ কম্যুনিটি ছিল বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মিশ্রণে তৈরী। অবশ্যই এই সময়, বিভিন্ন অধিকার ও সুবিধা কেবল জাতি বা বর্ণের সূত্রে বিবেচিত হত না। গ্রামের এই বিভিন্ন দলের জীবনে অবশ্যই ঐক্য এনে দিয়েছিল কতকগুলি অর্থনীতিক সম্পর্ক। যেমন জনসাধারণের জমি ও তার উৎপাদনের ওপর সাধারণ অধিকার ইত্যাদি। গ্রামসমাজের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এর স্বয়ং-সম্পূর্ণতা। এর কারণ, গ্রামসমাজে শুধু কৃষকরা নয় অ-কৃষি উৎপাদনের জন্য কারিগর "আর্টিজান"রাও ছিল। এবং শেষোক্তরা সমগ্র গ্রামসমাজের জন্যই কোনো বিশেষ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাদের পেশা সাধারণত জাতি-বর্ণের ভিত্তিতেই উত্তরাধিকার সূত্রে নিরূপিত হত। গ্রামসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর স্থায়িত্ব এবং শক্তি। অবশ্যই এই সব বৈশিষ্ট্য অন্তত অংশত ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার ফল। প্রাথমিক ভাবে এই মন্তব্যের পর শ্রীযুক্ত গুপ্ত বিস্তৃতভাবে গ্রামসমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—এর শ্রেণী বিন্যাস, অর্থনীতিক সম্পর্ক, কেমন ভাবে রাষ্ট্রের দাবি গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেয় প্রভৃতির বাস্তবনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় এ-প্রবন্ধ উজ্জ্বল। স্বল্প পরিসরে হলেও কী ভাবে পরিবর্তন গ্রামসমাজে এলো, ও গ্রামের ওপর মধ্যবর্তী শ্রেণীর (intermediaries) প্রভাব চমৎকার আলোচিত হয়েছে এ প্রবন্ধে।

শ্রীসুলেখচন্দ্র গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "During the later years of Mughal rule, a process of defeudalization (?)

was taking place and the British rule intervened before the process was completed." কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র দুর্বল হতে শুরু করে চোদ্দ শতক থেকে। এবং এই আঘাত শাসক-শক্তির দিক থেকেই এসেছিল। আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। শের শাহের পর থেকে এই প্রক্রিয়া আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। আকবরের হাতে তা আরও দ্রুতভাবে ঘটতে থাকে। এ ব্যাপারে শের শাহের ভূমি রাজস্ব সংগ্রহে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন স্মরণীয়। তিনি কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে গ্রামের প্রধানের (headman) ক্ষমতাও তিনি হ্রাস করেন অর্থাৎ গ্রামসমাজের ক্ষমতারই অবনতি ঘটে। শুধু তাই নয় শের শাহ গ্রামপ্রতিনিধি এই "হেডমেন"দের দায়িত্ব গ্রামসভা নয় সরাসরি রাষ্ট্রের কাছে ন্যস্ত করেন। আকবর এই প্রক্রিয়াকেই পূর্ণতা দেন। শুধু তাই নয়, গ্রামসমাজের স্থায়িত্ব সম্পর্কে মার্কসের উক্তি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে মুঘল বিজয় গ্রামীন অর্থনীতিতেও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার কাজ আরম্ভ করেছিল। অবশ্যই শ্রীসুলেখচন্দ্র গুপ্তর আলোচনা একটি বিশেষ সময় (অর্থাৎ যখন মুঘল শাসন দুর্বল) ও একটি বিশেষ স্থলকে (অর্থাৎ উত্তর প্রদেশকে) কেন্দ্র করে রচিত। তবু উপরি উক্ত এই সাধারণ মন্তব্য এই স্থানকালে প্রযোজ্য কিনা তা নিশ্চয়ই বিবেচ্য।

সংকলনটির তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ যথাক্রমে জগদীশ রাজ লিখিত অযোধ্যায় তালুকদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন (দি ইন্ট্রোডাকশন অব দি তালুকদারি সিস্টেম ইন্ আয়ুধ") এবং বি. এম. দন্তিয়ার ১৮৮৮ ভারতীয় কৃষিজীবীদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান (এ্যান এনকোয়ারী ইন্ টু দি কণ্ডিশনস অব দি এগ্রিকালচারাল ক্লাসেস ইন ইণ্ডিয়া ১৮৮৮) দুটি প্রবন্ধই মোটামুটি বর্ণনাত্মক। প্রথম প্রবন্ধটিতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকদের অর্থনীতিক নীতি কী রূপ পেল, রাজনৈতিক মিত্র সৃষ্টির চেষ্টায় তালুকদারদের ভূমির ওপর অধিকার দেওয়া হল রায়তদের অধিকার উপেক্ষা করে প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যদিও ১৮৫৭-র পূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয়ে অযোধ্যার সরকারী ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের কথাই ব্রিটিশ শাসক ভেবেছিল। এই প্রবন্ধের লেখক যদি প্রবন্ধের শেষে যে মন্তব্য করেছেন —(the conciliation of the taluqdars was also achieved, at the

expense of other classes of society in Oudh) তার যদি আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করতেন তাহলে ব্রিটিশনীতি সমগ্র সমাজে কী দুর্দশা আনল তা বোঝা যেত। বি. এম. দন্তিয়া লিখিত দ্বিতীয় প্রকল্পটির মূল্য বহুদিন গোপনে রাখা লর্ড ডাফরিনের ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের "এন্‌কোয়ারী"র গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দানে। এই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকের শেষে গ্রামীন দারিদ্র্য এবং কৃষকসমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রও উপস্থিত করা হয়েছে। বর্ণনাত্মক হলেও শ্রীজগদীশ রাজ ও শ্রীদন্তিয়ার প্রবন্ধ দুটি মূল্যবান্।

পরের অর্থাৎ পঞ্চম প্রবন্ধে রাশিয়ার শ্রীযুক্ত কোমারভ্ বিপ্লব পূর্ব ও বিপ্লেবোত্তর রাশিয়ায় ভারতীয় অর্থনীতিক ইতিহাসচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। মোটামুটি ভাবে ভারতীয় অর্থনীতি চর্চার শুরু আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে। এই সময় সাধারণত বিষয় হিসাবে রাশিয়া ও ভারতের বাণিজ্যই আলোচ্য ছিল। রুশ পণ্ডিতরা উপনিবেশিক শোষণের ফলে ভারতে যে অর্থনীতিগত পরিবর্তন এলো সে সম্বন্ধেও চিন্তা শুরু করেন। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে Saltykov ও Rotchev ভারতের হস্তশিল্পের ধ্বংস ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজারে পরিণতির চিত্র আঁকেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনীতিক বিকাশও রাশিয়ার ইতিহাসবিদ্‌দের আকর্ষণ করে। ১৮৫৭-৫৯-এর বিদ্রোহের ওপর কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়। এই উনিশ শতকের শেষেই রাশিয়ার গ্রামসমাজের ভবিষ্যৎ ও কৃষিসমস্যাই রুশ ঐতিহাসিকদের অন্যান্য দেশের কৃষি সম্পর্কের অধ্যয়নে উৎসাহিত করে—তার মধ্যে ভারতবর্ষও একটি দেশ।

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার এই ভারতীয় অর্থনীতিক ইতিহাসচর্চা আরও বিস্তৃত হয় সোভিয়েত পণ্ডিতদের হাতে। সোভিয়েত ভারতবিদ্‌দের দ্বারা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের নিয়মিত চর্চা এবং উচ্চ শিক্ষায় এর পঠন-পাঠন শুরু হয় এ-শতাব্দীর কুড়ির দশকের শেষের দিকে। এই চর্চার পিছনে আছে চিরপরিচিত উপনিবেশ (ক্ল্যাসিক কলোনি) হিসাবে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব, অন্যদিকে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য নিবিড় সহানুভূতি। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান I. M. Reusner (১৮৯৯-১৯৫৮) যিনি সোভিয়েত স্কুল অন্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির মূলে। জীবনের শেষের দিকে তিনি মনোনিবেশ করেন সতেরো ও আঠেরো শতকের ওপর,

এবং আধুনিক কালের প্রারম্ভে ভারতের সামাজিক অর্থনীতিক অবস্থাই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে আরো অনেকেই লেখেন। তাঁদের মূল বক্তব্য: ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভের পূর্বে ভারতবর্ষ উন্নত সামন্ততন্ত্রের স্তরে ছিল। কিন্তু সমাজ অচল হয়ে পড়ে নি, সামাজিক-অর্থনীতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল। Reusner ও তাঁর ছাত্রদের মতে শিল্পোৎপাদকের (মার্কস যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে) বীজ ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতীয় হস্তশিল্পে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীযুক্তা আন্তোনোভা তা স্বীকার করেন না। বস্তুত ভারতে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন, ধনতন্ত্রের বিকাশ (কলোনিতে), জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের সমাজ ও অর্থনীতিগত পটভূমি প্রভৃতি সোভিয়েত ভারতবিদদের উৎসাহ স্থল। এবং ইংলণ্ডে ধনতন্ত্রের বিকাশের পটভূমিতে ভারতে উপনিবেশিক শোষণও তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আঠেরো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা আলোচিত হয়েছে একটি সংকলনে আরও অনেকের রচনায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের সমস্যা নিয়েও আলোচনা চলছে। এই আলোচনায় ব্রিটিশ মূলধনের একচেটিয়া যুগে আসা, ভারতের মজুর শ্রেণী ও বুর্জোয়াজির গঠন প্রভৃতি সমস্যা আলোচিত হচ্ছে। অন্যদিকে আছে সামন্তব্যবস্থার ক্রম ভাঙ্গন, জমিদার কৃষকদের সম্পর্ক প্রভৃতি সমস্যার আলোচনা। অবশ্যই সামাজিক-অর্থনীতিক বিকাশ সোভিয়েত পণ্ডিতরা জাতীয় আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের সূত্রেই বিচার করছেন। সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও ধনতন্ত্রের আবির্ভাবই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন ও সংগঠিত গনসংগ্রামের জন্ম দিয়েছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। অবশ্য নতুন বিরোধেরও শুরু এইখানে। আধুনিক ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ইতিহাসচর্চার এই ব্যাপক প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ, ১৯৬০-এ রুশ ভাষায় 'আধুনিক যুগের ভারত ইতিহাস' সংকলন গ্রন্থ। এখানে একটি কথা স্মর্তব্য; সোভিয়েতে এই ভারতীয় ইতিহাসের চর্চায় ভারতীয় মাত্রেই আনন্দিত হবেন, কিন্তু মুস্‌কিল হচ্ছে যে প্রায় সবই রুশ ভাষায় লেখা। অথচ এখানে রুশ ভাষা অভিজ্ঞ পাঠক সংখ্যায় অল্প—ফলে গবেষণা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কোমারভদের ইংরেজি অনুবাদে ছোট প্রবন্ধ পাঠেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। যতক্ষণ এসব রুশ লেখা মূলে বা অনুবাদে ভারতীয় বিদ্বানরা পড়তে না পারছেন ততক্ষণ এসবের সত্যকার মূল্য স্থির ও সমাদর হবে না।

পরের প্রবন্ধে Ignacy Sachs বলেছেন যে অনুন্নত অর্থনীতি সমন্বিত দেশগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকাই তাদের চরিত্রের বিশিষ্ট জটিল প্যাটার্ন ফলত তাদের উন্নতির প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এবং অর্থনীতিক বিকাশের চর্চার ঐতিহাসিক পদ্ধতি বা হিস্টরিক্যাল অ্যাপ্রোচের ওপর জোর দেন তিনি। প্রবন্ধের গোড়াতেই প্রবন্ধকার জানিয়েছেন যে অনুন্নত দেশগুলির সামাজিক অর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা বহরে যদি বা মন ভোলায়, গুণে নয়। প্রথমত, এই সবদেশ থেকে খুব অল্পই আলোচনা আসছে। এবং উন্নত দেশে যে চর্চা হচ্ছে তাতে পশ্চিমীভাব বা ওয়েস্টার্নইজম-এর বোঝা কিছুতেই নামছে না।[৩] তারপর শুদ্ধ অর্থনীতি ও ফলিত অর্থনীতি নিয়ে যে মানসিক বিশৃঙ্খলার স্বরু হয়েছে তাতে এদের একটির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ প্রায় ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। আসলে বর্ণনাত্মক মনোগ্রাফ যেমন অন্যদিকে প্রচুর, তত্ত্বগত বিশ্লেষণ তেমনি স্বল্প। অনেকক্ষেত্রেই অধিক মাত্রায় তথ্যাধিক্য যুক্ত লেখায় আসল সমস্যাও হারিয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধ ও ফলিত উভয় অর্থনীতিই ভুগছে এক রোগে অর্থাৎ "a methodological under-estimation of the institutional aspects of the socio-economic process, seen both from a historical and sociological angle." এই ঝোঁকই প্রতিফলিত পলিটিক্যাল ইকনমির জায়গায় ইকনমিকস শব্দটি ব্যবহারে। অথচ পলিটিক্যাল শব্দটি দুটো পদ্ধতিগত ইঙ্গিত বহন করে।— এক, মানবসমাজের অর্থনীতিক সঠিক মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠানগত প্রকাশ বা 'ইনিস্টিটিউশনাল আসপেক্টস'-এর গুরুত্বের। দুই, এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রথামত আলোচনা বর্জনের প্রয়োজনীয়তার। বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানগত বিশ্লেষণেই শুদ্ধ ও ফলিত অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান ফারাক জোড়া যাবে।

"A first step from the multiplicity of concrete situations to the singling out of certain developmental patterns would be a proper classification of the countries involved according to the degree of development."—Ignacy Sachs কী ভাবে ও কখন অনুন্নত দেশগুলি স্বাধীন হলো ও অর্থনীতিক তাদের কতটা—তার ভিত্তিতে তিনটি ভাগ করেছেন—(ক) জাতীয় মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে এসেছে। (খ) বাইরের শক্তির ফলে বা উপনিবেশিকতার সাধারণ প্রক্রিয়াতে যে সব দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে—যদিও বহিঃপ্রভাব থেকে মুক্ত নয়, অন্যদিকে যাদের ইচ্ছা প্রুশীয় বা জাপানি ঢঙের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে যাওয়া। (গ) শক্তিশালী জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের ফলে যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং যারা কল্যাণরাষ্ট্র (ওয়েল ফেয়ার স্টেট) ও সমাজতান্ত্রিক দেশ—উভয় দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতির

৩। এ-প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সমাজ-অর্থনীতির সূত্রে ভ্যানলিয়র ও বুয়েক-এর আলোচনা স্মরণীয়।

দ্বারা প্রভাবিত। এই তৃতীয় গ্রুপেই এশিয়া-আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ যাদের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

এ ছাড়াও Ignacy Sachs অন্য ভিত্তিতেও দেশগুলিকে ভাগ করেছেন যেমন পুরাতন ও নতুন। দ্বিতীয়োক্তদের দেশে প্রায় পুরোপুরি ধনতন্ত্রই বহাল হয়েছে (যেমন ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড)। প্রথোমক্ত দেশে আছে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা ও তার ফলে—ভারসাম্যহীন ও জটিল কাঠামোর সৃষ্টি। বড় ছোট এই ভিত্তিতেও প্রবন্ধকার অনুন্নত দেশগুলোকে ভাগ করেছেন। এই জটিল কাঠামো ব্যাখ্যায় ছুটি পদ্ধতি প্রচলিত (১) বর্তমান মার্কসীয় বিশ্লেষণের দ্বারা ও (২) ডুয়াল ইকনমিকস ও ডুয়াল সোসাইটির তত্ত্বতে (বুয়েক)। Ignacy Sachs দ্বিতীয়টিরও গুরুত্ব স্বীকার করেন। এবং "the purposiveness of a dynamic analysis of composite structures and the relevance of transitory stages"—তিনি মানেন। তাঁর মতে "a useful distinction is that between exogenous and endogenous patterns of development." শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন "I propose now to deal succinctly with mutual influences of patterns of development in countries in different socio-economic stages. এবং এই সূত্রেই বুঝি অনুন্নত দেশের জনসাধারণ শিল্পবিপ্লবের ব্রিটিশ মজুরের বা মেইজি যুগের জাপানি কৃষকের দুর্দশা সে চায় না; তার ওপর সোভিয়েট শিল্প তাদের প্রভাবিত করেছে। অর্থনীতিক ভাবেও তারা, আজকের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে এক পরিবেশে নেই। সেইজন্যই এরা নানা 'স্টেট্ ক্যাপিটালিজম'-এর দিকে ঝুঁকেছে।

এই প্রবন্ধটি নানা দিক থেকেই মূল্যবান—বারো পৃষ্ঠার এতো আঁটসাঁট লেখা যে, সারাংশ সঙ্কলন করা মুস্কিল। ভারতের প্রথম অর্থনীতিক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন—Economic laws are the same in Asia as in Europe. নিরঙ্কুশ ভাবে বুঝলে দেখা যাচ্ছে কথাটা তা নয়। কারণ অসমান বিকাশ ও বিচিত্র জীবনযাত্রাও ইতিহাসের স্বীকৃত সত্য। এশিয়ার যার অধিকাংশই অনুন্নত দেশ, জটিল সমাজকাঠামোকে বুঝতে গেলে তাই ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিক পদ্ধতির মিলন ঘটানো দরকার। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করলে Ignacy Sachs-এর সঙ্গে অভিন্ন মত হতে হয়। ভ্যানলিয়র তো প্রাচ্যের ইতিহাসচর্চায় আলাদা ক্যাটেগরির কথাই বলেছেন—যুগ-বিভাগ সম্বন্ধেও আমাদের ভাববার সময় এসেছে।

বিনয় ঘোষ

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অর্থনীতিক দৃষ্টি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি সবদিক থেকেই আধুনিক ছিল, কোনো ভেজাল ছিল না তার মধ্যে। আধুনিক কালোপযোগী ছিল, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ধনতান্ত্রিক যুগে অর্থনীতিক মনোভাব যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই মনোভাবই তত্ত্ববোধিনীর বিভিন্ন রচনায় ফুটে উঠত। এইজন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অর্থনীতিকে যুগধর্মী ও প্রগতিশীল বলা যায়। ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য দেশের মতো এদেশেও শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের অবাধ অগ্রগতি হোক, এই ছিল তার কাম্য। কিন্তু এই কামনা বা উদ্দেশ্যকে স্বদেশের জনস্বার্থের প্রতিকূলে প্রশ্রয় দিতে কখনও সে সম্মত ছিল না। অর্থনীতিক শোষণ ও দুস্তর ভেদ-বৈষম্যজনিত সামাজিক উৎপীড়ন তত্ত্ববোধিনীর কাছে সর্বদাই অন্যায় ও অধর্ম বলে ধিক্কৃত হত। এদেশের আলস্যপ্রিয় ঘরকুণো লোকের শিল্পবাণিজ্যবিমুখতা, অর্থসঞ্চয়ের প্রতি সুদখোর মহাজনী মনোবৃত্তি, দালালী প্রবৃত্তি ইত্যাদির কঠোর সমালোচক ছিল তত্ত্ববোধিনী। সবার উপরে উল্লেখযোগ্য হল দেশের জনসাধারণের প্রতি, বিশেষ করে অর্থনীতিক্ষেত্রের বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতদের প্রতি তত্ত্ববোধিনীর গভীর সহানুভূতিশীল মনোভাব। ধনতান্ত্রিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত শিল্পায়ন-নীতির সমর্থক হলেও তত্ত্ববোধিনীর চেতনা থেকে এই সামাজিক সুবিচারবোধ কখনও লোপ পায় নি। আধুনিকতার সঙ্গে মানবিকতার এই সংমিশ্রণ হল তার অর্থনীতিক দৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলার গ্রাম্যসমাজের অর্থনীতিক দুরবস্থা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি রচনা* থেকেই এই জনদরদী অর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাটির নাম—পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা। ১৭৭২ শকে (১৮৫০ সাল) রচনাটি ধারাবাহিকভাবে তত্ত্ববোধিনীতে

* রচনাটি অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা বলে মনে হয়।

প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাতেও এদেশের সাধারণ কৃষক-প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু যতদূর বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাতে আর কোনো বর্ণনাই এত বাস্তব জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়নি। আজকের দিনেও যদি কোনো উপন্যাসকাতর পাঠক শতাধিক বৎসর পূর্বের গদ্যভাষায় লেখা এই রচনাগুলি পাঠ করেন, তাহলে চলচ্চিত্রের মতো গত শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের অত্যাচার-পীড়িত শোষিত জীবনের ছবি তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে বিদেশী শাসকদের হাতে হাত মিলিয়ে এদেশী উপশাসকরা কিরকম নৃশংসভাবে কৃষকদের শোষণ ও পীড়ন করতেন। রচনার মধ্যে শুধু যে পর্যবেক্ষণশক্তি ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, কালের বিচারে এমন সাহসেরও পরিচয় পাওয়া যায় যা এযুগের অতিপ্রগতিবাদী পত্রিকাতেও দুর্লভ। সংক্ষেপে তৎকালের অর্থনীতিক পশ্চাদ্‌ভূমির পরিচয় দিয়ে এই রচনাগুলির প্রতিপাদ্যের বিবরণ দেব।

কেউ কেউ বলেন কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের প্রশাসনব্যবস্থা ইংলণ্ডের ছাঁচে গড়ে তোলা—"to remodel the administration on English lines"—এই উদ্দেশ্যে তিনি আইনকানুন বিচারবিভাগ ইত্যাদির পরিবর্তন করেছিলেন এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) প্রবর্তন করে ইংলণ্ডের মতো ভূসম্পত্তি ও ভূস্বামীশ্রেণীর সৃষ্টি করেন—"introduced an English form of landed property and created a class of landlords which was hitherto unknown in India."[১] কর্নওয়ালিস মনে করেছিলেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানা স্বার্থ দ্বারা জমিদাররা অনুপ্রাণিত না হলে দেশের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হবে না। একথা আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। কোনো নূতন ব্যবস্থা, বিশেষ করে বিদেশী সমাজব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করার পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা নিয়ে কর্নওয়ালিস শাসনভার গ্রহণ করেননি, বরং প্রায় বিশ বছর ধরে তাঁর পূর্বগামীরা এখানকার গ্রাম্যসমাজের শাসনে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তিনি তারই উত্তরাধিকারী হয়ে এদেশে এসেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা তৎসম্পর্কিত কোনো ব্যবস্থা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। তাঁর আগমনের অনেক আগে থেকেই কোম্পানির শাসকরা এদেশে ভূমিরাজস্বের বহুবিধ

ব্যবস্থা প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পথ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কর্নওয়ালিস কেবল সেই পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাকা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।[২]

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বিবরণপ্রসঙ্গে এই ইতিহাস-বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক নয়, শুধু উল্লেখটুকুই যথেষ্ট। প্রাসঙ্গিক হল, ১৮৫০ সালে এদেশের গ্রাম্য-সমাজের যে ভয়াবহ করুণ চিত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আঁকা হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরের কথা। কর্নওয়ালিস অথবা কোম্পানির কর্মকর্তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকালে গ্রাম্যসমাজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তব ঘটনাচক্রে স্বভাবতই তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার গ্রাম্যসমাজ চিরন্তন গোষ্ঠীগত আত্মনির্ভরতার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে, নূতন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপীড়নে প্রায় উৎসন্নে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কৃষকদের দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না এবং পুরাতন বনেদী জমিদাররা অনেকক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার জটিল ও কঠোর নিয়মকানুন ধাতস্থ করতে না পেরে চিরকালের মতো ভূস্বামিত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বছরের পর বছর নূতন রাজস্ব-আইন ও নিলাম-আইনের চাপে বড় বড় পুরাতন জমিদারী খণ্ড খণ্ড হয়ে 'লাটে' উঠেছে এবং বনেদী ভূস্বামীরা নিজেদের পৈতৃক ভদ্রাসন থেকে পর্যন্ত উৎখাত হয়েছেন। আজও বাঙলার পুরাতন গ্রামে গ্রামে জঙ্গলাকীর্ণ জীর্ণ অট্টালিকার অস্থিপঞ্জরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই কলঙ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক দলিলপত্র হাণ্টার তাঁর Bengal MS. Record, 1782-1807 চার খণ্ডে সংকলন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "In these four volumes of *Bengal Records*, I cite many hundred letters written at that disastrous period, and showing how the disintegration of estates went on in every District of Bengal."[৩] পুরাতন জমিদারবংশের উচ্ছেদ যে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে শুরু হয়েছিল তা নয়, তার অনেক আগে থেকেই ব্যাপকভাবে ইংরেজদের ইজারাদারি ব্যবস্থা (farming system) প্রবর্তনের ফলে হয়েছিল। কোম্পানির আমলে এই ইজারাদারির পরীক্ষা ইংরেজরা কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির জমিদারী পাবার পর থেকে আরম্ভ করেছিলেন। কলকাতার হাট ঘাট মাঠ বাজার খাল বিল সবই তাঁরা ইজারা দিতেন এবং কলকাতা শহরে

এসে এদেশের লোক যাঁরা বিপুল ধনসঞ্চয় করেছেন তাঁদের মধ্যে এই ইজারাদাররা অন্যতম। কাজেই ইংরেজদের ইজারাদারি পরীক্ষার ইতিহাসই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে প্রায় একশত বছরের পুরাতন। কলকাতার বাইরে জমিদারীর ক্ষেত্রেও একবছর পাঁচবছর প্রভৃতি বিভিন্ন মেয়াদের ইজারার ভিতর দিয়ে অবশেষে তাঁরা চিরস্থায়িত্বের সিদ্ধান্তে এসে পৌছান (১৭৯৩)। বাংলাদেশে কোম্পানির রাজত্বকালকে এইদিক থেকে ইজারাদারদের স্বর্ণযুগ বলা যায়।

পুরাতন বনেদী রাজা-ভূস্বামীরা গ্রাম্যসমাজমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার পর যাঁরা নূতন জমিদারের শিরোপা পরে মঞ্চে পদার্পণ করলেন তাঁরা এই ভুঁইফোঁড়-অভিজাত ইজারাদার-শ্রেণী। কর্নওয়ালিসের আগে থেকেই, কোম্পানির ইজারানীতির দৌলতে (১৭৬৯-১৭৮৮) বনেদীবংশের পতন ও ভুঁইফোঁড় ইজারাদারদের উত্থানপর্ব আরম্ভ হয়েছিল—"the effect of the farming system was to level down the ancient zamindars and to level up the revenue farmers into new zamindars" [৪] কার্ল মার্কস তাঁর ভারতীয় ইতিহাসের খসড়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "greater part of the province's land holdings fell rapidly into the hands of a few city capitalists who had spare capital and readily invested it in land." [৫] মার্কস 'city capitalists' শুধু ইজারাদারদের কথা মনে করে ব্যবহার করেন নি বলে মনে হয়, তাদের সঙ্গে শহরবাসী বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি দালাল গোমস্তা ব্যবসায়ী প্রভৃতি নূতন ধনিকশ্রেণীর কথাও তাঁর মনে ছিল। এই নূতন ধনিকশ্রেণীর কাছে জমিদারীও বাণিজ্যপণ্যের মতো লেনদেনের, স্পেকুলেশনের ও মুনাফার বস্তু হয়ে উঠল। বস্তুত কর্নওয়ালিসেরও উদ্দেশ্য ছিল তাই। এদেশের নূতন ধনিকশ্রেণীর সঞ্চিতধনের একটা গতি করা প্রয়োজন। জমিদারীতে নিরাপদ আয় এবং অতিরিক্ত মুনাফার সৃষ্টি করে কর্নওয়ালিস এদেশের নূতন বাণিজ্যলব্ধ মূলধনকে স্বাধীন শিল্পায়নের ক্ষেত্র থেকে সনাতন ভূসম্পত্তির দিকে পরিচালিত করেছিলেন। কোম্পানির ডিরেক্টরদের একটি চিঠিতে (৬ মার্চ ১৭৯৩) তিনি পরিষ্কার লিখেছিলেন, "the large capitals possessed by many of the Natives, which they will have no means of employing…will be applied to the purchase of landed property as soon as the

tenure is declared to be secure." ৬ কাজেই জমিদারী যখন নূতন ইংরেজ-আইনে বাণিজ্যের পণ্য হয়ে উঠল, তখন তার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ বা কৃষকদের প্রতি গোত্রান্তরিত জমিদারদের সামান্য মানবিক মমত্ববোধটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। বেনিয়ানী দালালী ও ইজারাদারির মুনাফা থেকে যাঁরা জমিদারী কিনতে লাগলেন তাঁরা বেশীরভাগ হলেন শহরবাসী 'absentee' জমিদার। গবর্নমেণ্টকে নির্দিষ্ট রাজস্ব যোগান দিতে পারলেই তাঁদের দায় চুকে যেত, তারপর প্রজাদের উপর পীড়ন করে যত খুশি খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় হত তার সবটাই মুনাফা। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হলে খাজনার দায়িত্ব নেবে কে? বণিকবুদ্ধিতে এর সমাধান হল—মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি করা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে গবর্নমেণ্টের কাছে জমিদাররা হলেন contractor এবং জমিদাররা নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চালাবার জন্য একদল sub-contractor তৈরি করলেন। গবর্নমেণ্ট তাঁদের এই পরিকল্পনা ও দাবী আইনসঙ্গত উপায়ে মঞ্জুর করলেন। উপর থেকে জমিদারের চাপ এবং তার তলায় স্তরে স্তরে অসংখ্য মুনাফা-বুভুক্ষু মধ্যস্বত্বভোগীর চাপ—এইভাবে অসহনীয় এক শোষণযন্ত্রের চাপে বাংলার গ্রাম, গ্রাম্যসমাজ ও দরিদ্র কৃষকশ্রেণী ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল।

জমিদারদের পরবর্তী স্তরে পত্তনিদার দর-পত্তনিদার গাঁতিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্ষুদে জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হলেন। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭২ সালে বড় বড় জমিদার ও জমিদারীর সংখ্যা একশতের খুব বেশী ছিল না। কিন্তু তারপর চিরস্থায়িত্ব ও মধ্যস্বত্বের ফলে ১৮৭২ সালের মধ্যে জমিদারীর সংখ্যা বেড়ে দেড়লক্ষের বেশী হল। এর মধ্যে ৫৩৩টি হল বড় জমিদারী, ২০০০০ একরের উপরে, ১৫৭৪৭টি জমিদারী হল ৫০০-২০০০০ একরের মধ্যে এবং ৫০০ একর ও তার কম জমিদারীর সংখ্যা হল ১৩৭৯২০টি।৭ এই ক্ষুদে জমিদারীর সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপাতের আধিক্য অনুমান করা যায়। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' নীতি মধ্যস্বত্বভোগীরা গ্রাম্যসমাজে নির্বিচারে প্রয়োগ করেছেন এবং তার ফলে গ্রামের কৃষক-প্রজারা ধনেপ্রাণে উচ্ছন্নে গেছে, গ্রাম্যসমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতাও ধ্বংস হয়েছে। পল্লীগ্রামের প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলার গ্রাম্যসমাজের এই ধ্বংসের চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্ণনার মধ্যে অর্থনীতিক পশ্চাদ্‌ভূমির বিশ্লেষণ করা হয় নি বটে, করার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু ধ্বংসের চিত্রটিকে

অত্যন্ত জীবন্ত করে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রাম্যসমাজের এরকম বাস্তব চিত্র সেকালের রচনাতে নিতান্তই দুর্লভ।

রচনার প্রারম্ভে বলা হয়েছে "ভূমিই আমাদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমারদের প্রতিপালক।" কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে-কৃষকদের উপর আমাদের সুখ ও মঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদের দুঃখদুর্দশার ও যন্ত্রণার শেষ নেই। "ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও যন্ত্রণা-জনক।" যে রক্ষক সেই ভক্ষক, এই প্রবাদ বাংলার ভূস্বামীদের কথা মনে করে রচিত হয়ে থাকবে। ভূস্বামীরা কি শুধু নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করে নিশ্চিন্ত হতেন? রাজস্ব ছাড়াও বাটা, বৃদ্ধি, বাট্টার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বণী, হিসাবানা প্রভৃতি "অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিপীড়ন" করা হত। অনেক ভূস্বামী অনাদায়ী টাকার চতুর্থাংশ, অর্থাৎ একশত টাকায় পঁচিশ টাকা হারে, 'বৃদ্ধি' গ্রহণ করতেন। ভূস্বামীর গৃহে "বিবাহ, আত্মকৃত, দেবোৎসব বা প্রকারন্তর পুণ্যক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার" উপস্থিত হলে প্রজাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হত, কারণ "তাহারদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয়" সম্পন্ন করতে হত। "ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ।" 'মাঙ্গন' কথার অর্থ ভিক্ষা। জমিদাররা ভিক্ষার নাম করে বলপূর্বক অপহরণ করতেন—"ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া দস্যু-বৃত্তি সাধন করেন।" যে বছর দু'তিনবার এরকম 'মাঙ্গন' না হয়, সে বছর বছরই নয়। ঠিক রাজস্ব আদায়ের মতো "নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে" এই মাঙ্গন আদায় করা হত। এর চেয়েও বিচিত্র ব্যাপার হল, দরিদ্র প্রজাদের গৃহে বিবাহ শ্রাদ্ধ বা যে-কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান হলে তার জন্য ভূস্বামীদের 'শুল্কদান' করতে হত। কেবল ধর্মকর্মের উপর নয়, কুকর্মের উপরেও ভূস্বামীরা 'কর' স্থাপন করতেন। চুরি-ডাকাতি, কলহ-বিবাদ, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি সমস্ত কুকর্মের বিচারক হতেন তাঁরা, এবং বিচারকদের লোভানলে আহুতি দিতে পারলেই খুনের অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যেত। অনেক ভূস্বামী নিজেদের জমিদারীর মধ্যে পথের শুল্ক, দ্রব্যের কর, একচেটে বাণিজ্য ইত্যাদি নিজেদের ইচ্ছামত স্থাপন করতেন।

ভূস্বামীদের এই অত্যাচারের উপরে ছিল নায়েব-গোমস্তা-সরকার প্রভৃতি আমলাদের অকথ্য জুলুম। তাঁদের "নিয়োজিত ব্যাঘ্রসম নিষ্ঠুর-স্বভাব কর্মচারিদিগের কঠোর হস্তে" সর্বদাই প্রজাদের "পতিত হইতে হয়। তাহারদের কর্ণ কুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।"

আমলারা নিরীহ প্রজাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। "বন্ধন, প্রহার, কারারোধ, অনশন ইত্যাদি দুঃসহ দুশ্চিন্ত্য যন্ত্রণার আলোচনায় আর ধৈর্য্য রাখা অসাধ্য।"

ইজারাদারদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁদের "অতি প্রভূত লোভরূপ হুতাশন শিখা ভূস্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ হওয়ায় সম্ভাবিত।" ভূস্বামীর শোষণ-কৌশল ইজারাদারের হাতে আরও দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি পায়, তা না হলে ভূস্বামীকে নির্দিষ্ট 'কর' দিয়ে ইজারাদারের মুনাফা থাকে না। সাধারণত ভূস্বামীকে দেয় করের চতুর্থাংশ বেশী তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করেন। "কল্য যে ভূম্যধিকারির লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব ছিল, অদ্য তাহাতে আর পঞ্চবিংশতি সহস্র যুক্ত হইল! অতএব ইজারার নাম শুনিলে প্রজাদের হৃৎকম্প না হইবে কেন? এক্ষণে যাহারদিগকে উপর্য্যুপরি জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তাহারদের দারুণ দুর্দশা বাক্যপথের অতীত।"

উপদ্রবের এইখানেই শেষ নয়। এসব ছাড়াও "ফৌজদারি উপদ্রব" আছে, অর্থাৎ থানা-পুলিশ দারোগার উপদ্রব। "পঞ্চম-বর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া নিলীন হয়।" দারোগাদের "দীর্ঘোদর পূরণার্থে" প্রজাদের কিছু কিছু দান না করলে নিষ্কৃতি নেই। এর পরে আছে "মহাজন সংজ্ঞক বিষদ-বৈদ্য।" একবার মহাজনের হাতে পড়লে নিষ্কৃতির আর কোনো পথ থাকে না, "মূলধনের বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি" হয়ে প্রজাদের বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে।

ভূস্বামীদের অপকীর্তি ও প্রজাদের দুঃখদুর্দশার বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম দফায় এখানে শেষ হলেও, দ্বিতীয় দফায় তার আরও বৈচিত্র্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রজাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, ভূস্বামীরা তাদের দেহ ও দৈহিক মেহনতকেও কিভাবে নিজেদের অধিকারভুক্ত কেনা বস্তু বলে মনে করতেন তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়েছে যে বিনা মূল্যে ও বিনা বেতনে গোয়ালরা দুধ দেবে, জেলেরা মাছ দেবে, নাপিতে ক্ষৌর করবে, যানবাহন বহন করবে, চর্মকার চর্মপাদুকা দেবে—এইভাবে প্রত্যেককে জীবিকার ভাগ দিতে হবে জমিদারকে। "ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না।" দয়া করে ভূস্বামীরা বা তাঁদের আমলারা যদি

কোনো মূল্য বা মজুরি গ্রাম্য কারিগরদের দেন, তাহলে তা এত সামান্য যে তাতে মজুরি বা লাভ তো দূরের কথা, কাঁচামালের দামটুকুও তারা পায় না। ভূস্বামীদের এই স্বেচ্ছাচারী দ্রব্যমূল্যের নাম 'সরকারী মূল্য'। নিষ্ঠুর অত্যাচারী জমিদাররা প্রজাদের উপর যে কতপ্রকারের দৈহিক পীড়ন করে থাকেন তার একটি ১৮-দফা দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় :

১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত ২। চর্মপাদুকা প্রহার ৩। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বক্ষঃস্থল দলন ৪। খাপরা দিয়ে নাসিকা-কর্ণ মর্দন ৫। মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ ৬। পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া ৭। গায়ে বিছুটি দেওয়া ৮। হাত-পা নিগড়বদ্ধ করা ৯। কান ধরে দৌড় করানো ১০। কাটা দু'খানা বাঁধা বাখারি দিয়ে হাত দলন করা ১১। গ্রীষ্মকালে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে পিঠের উপর ও হাতের উপর ইট চাপিয়ে রাখা ১২। প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা ও গায়ে জল নিক্ষেপ করা ১৩। গোণীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা ১৪। বৃক্ষে বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা ১৫। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা ১৬। চূণের ঘরে বন্ধ করে রাখা ১৭। কারারুদ্ধ করে উপোস রাখা ১৮। গৃহবন্দী করে লঙ্কা-মরীচের ধোঁয়া দেওয়া।

পাষণ্ডতার কোন্ স্তর পর্যন্ত এদেশের জমিদাররা পৌঁছেছিলেন তা প্রজাদের দৈহিক নির্যাতনের এই ভয়াবহ শ্রেণীবদ্ধ তালিকা থেকে বোঝা যায়। তালিকাটি দীর্ঘতর করা যায় না যে তা নয়, কিন্তু যেটুকু করা হয়েছে তা থেকেই জমিদারী নৃশংসতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া "প্রজাদিগকে দাসবৎ-মৃত্যুবৎ করিয়া রাখিবার নিমিত্তে ভূরি ভূরি যাষ্টিক (লেঠেল) নিযুক্ত" রাখা হয় এবং কোনো কোনো ভূস্বামী "প্রকৃত দস্যুদিগকেই পোষণ করেন।" নিজ ধনাগার থেকে অর্থ দিয়ে যে তাদের পোষণ করতে হয় তাও নয়, প্রজাদেরই এই ভূস্বামী-আশ্রিত দস্যু-লেঠেলদের ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

তৃতীয় দফায় তত্ত্ববোধিনীর লেখক "দুর্বৃত্ত নীলকরদিগের ব্যবহারের" বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে ভূস্বামীদের পূর্বকথিত অত্যাচারের চেয়ে নীলকরদের অত্যাচার আরও ভয়ানক, তাঁদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্মূল হবার উপক্রম হয়েছে। নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়ে প্রজাদের দ্বারা নীলচাষ করেন। দাদন যৎসামান্য, কিন্তু তারও অর্ধেকের বেশী দালাল-গোমস্তারা উদরসাৎ করেন। উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে প্রজারা নীলচাষ করতে আপত্তি করে,

কিন্তু সাহেবের অত্যাচারের ভয়ে করতে বাধ্য হয়। নীলের মুনাফা থেকে সাহেব নিজের উদর ফাঁপিয়ে তোলেন, কাজেই প্রজারা কদাচ নীলের ন্যায্য মূল্য পায় না। নীল চাষ করে প্রজাদের পেটও ভরে না, জমির উৎপাদিকা-শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রজাদের সর্বস্বান্ত করে নীলকর সাহেব মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে থাকেন। প্রজাদের কাকুতি-মিনতিতে সাহেব কর্ণপাত করেন না, কালা ও বোবা হয়ে থাকেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রজারা নীলচাষ করতে বাধ্য হয়, কারণ "প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য?" যদি প্রজারা প্রাণরক্ষার দায়ে ক্ষেতে শস্য বপন করে তাহলে "নির্দয় নীলকরের প্রেরিত নিদারুণ লোকেরা" তাদের অজ্ঞাতসারে সেই ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে নীলের বীজ বপন করে যায়। ধান্যাদি শস্য বপন করা হয়েছে এমন জমিতেও নীলকররা লোকজন নিয়ে এসে যখন জোর করে নীলবীজ বপন করে যান তখন কৃষাণের মনে হয় "যেন ঐ হলযন্ত্র তাহার হৃদয়ক্ষেত্রেই চালিত হইল।"

এত বিপদ মাথায় নিয়ে প্রজাদের নীলচাষ করেও শান্তি নেই। উৎপন্ন নীল সাহেবের নীলকুঠিতে পৌঁছে দেওয়ার পরেও "বিষম বিপত্তি" দেখা দেয়। "হিংস্র জন্তুবৎ নৃশংসস্বভাব আমলারা" দাদন দেওয়ার সময় প্রজাদের কাছ থেকে একদফা দালালি আদায় করেন, তারপর তারা যখন কুঠিতে নীল নিয়ে আসে তখন তা মাপার সময় আর-এক দফা 'সেলামি' বা 'প্রণামি' চান। প্রজারা দিতে বাধ্য হয়, কারণ তা না হলে সাহেবের আমলারা "২৫ মণ পরিমাণোপযোগি নীল দেখিয়া পাঁচ মণ মাত্র লিখিতে চাহে।" অবশ্য সেলামি দিয়েই যে প্রজারা স্বস্তি পায় তা নয়, কারণ সেলামিটি বেমালুম উদরস্থ করে আমলারা নীলকর সাহেব প্রভুর পক্ষে ওজন কমিয়ে লিখে রাখেন, ২৫ মণ নীল খাতাকলমে ১৫ মণের বেশী হয় না। প্রজারা ক্রমে ঋণের জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে তাদের "পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতিও তৎপরিশোধে সমর্থ হয় না।" এরপর নীলকর সাহেবদের ও তাঁদের এদেশীয় আমলাদের নানাপ্রকার অত্যাচারের আরও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাংলার গ্রাম্যসমাজের একরকম নিখুঁত অর্থনীতিক জীবনচিত্র উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আর কোনো বাঙলা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় না। প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতার জন্য তো বটেই, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের জন্যও এই রচনাগুলি অদ্বিতীয়।

গ্রাম্যসমাজ ও নাগরিক সমাজ। মধ্যবিত্তের চরিত্রচিত্রণ

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের সামাজিক চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। প্রধানত এই চিত্র ভূস্বামী-কৃষকশ্রেণীর পারস্পরিক অর্থনীতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, অন্যান্য শ্রেণীর কথা, বিশেষ করে নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর (middle-classes) চরিত্রব্যাখ্যাও রচনার মধ্যে করা হয়েছে। সনাতন ও পুরাতন গ্রাম্যসমাজের স্তম্ভগুলি ব্রিটিশ আমলের ভূমিরাজস্বনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে ভেঙে পড়েছে, কিন্তু সেই ভগ্নস্তূপের উপর তার কোনো নূতন কাঠামো গড়ে ওঠেনি। পরাধীন অর্থনীতির প্রতিবন্ধের জন্য সেরকম কোনো নূতন সামাজিক কাঠামো সবল ভিত্তির উপর গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। পূর্বের সমাজব্যবস্থায় বিত্তের (money) কোনো সামাজিক কৌলীন্য বা মর্যাদা (social status) ছিল না, কুলমর্যাদা বা স্তরবিন্যস্ত জাতিবর্ণ-মর্যাদা (hierarchical caste-status) ছিল প্রধান। নূতন সমাজব্যবস্থায় বিত্ত শ্রেষ্ঠ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হল এবং তার ফলে পুরাতন জাতিগত-বৃত্তিভিত্তিক সমাজে ধীরে ধীরে ফাটল ধরতে লাগল। নূতন বিত্তভিত্তিক সমাজে স্বভাবতঃই উপরের ধনিক ও নিচের দরিদ্রের মধ্যে এক মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হল। এই মধ্যশ্রেণীর মধ্যেও বিত্তগত মর্যাদার তারতম্য অনুসারে ক্রমে স্তরভেদ হতে থাকল—যেমন 'উচ্চ-মধ্য' (Upper Middle), 'মধ্য-মধ্য' (Middle-Middle), 'নিম্ন-মধ্য' (Lower-Middle)। কিন্তু আপাতত এই স্তরভেদের জটিলতা বিগত শতকের সামাজিক ইতিহাসের সাধারণ গতিনির্দেশ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের বিচার্য হল, পরাধীন পরিবেশে এদেশে যে নূতন গ্রাম্য-মধ্যবিত্তশ্রেণী ও নাগরিক-মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হল, তার চারিত্রিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য। একথা ঠিক যে আধুনিক যুগে সামাজিক অগ্রগতির প্রধান চলনশক্তি যুগিয়েছে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং যে সমস্ত চারিত্রিক গুণ তার সহায় হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, শিক্ষালব্ধ উদারতাবোধ ইত্যাদি। পোলার্ডের বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে: "Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation."[৮] কিন্তু কতকগুলি চারিত্রিক অগুণও আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের গোড়া থেকে মধ্যবিত্তের চরিত্রে শ্রেণীগতভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে—যেমন স্বার্থপরতা, যন্ত্রবৎ হৃদয়হীনতা,

পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি। সমাজ যদি বিত্তকেন্দ্রিক হয় এবং সেই বিত্ত উপার্জনের স্বাধীন ও স্বাভাবিক পথগুলি রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে মধ্যবিত্তচরিত্রের গুণ অপেক্ষা দোষগুলি বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে তাই হয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে। কারণ ব্রিটিশ আমলে আধুনিক মধ্যবিত্তের বিকাশের সুযোগ বাংলাদেশে যতটা প্রশস্ত ছিল, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তা ছিল না। সেই কারণে একসময় মধ্যবিত্তের চারিত্রিক গুণ বাংলাদেশে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে দোষগুলিও তেমনি অতিদ্রুত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্তের এই চারিত্রিক দোষগুলিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নির্মমভাবে কশাঘাত করা হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুখ্যত মধ্যবিত্তের মুখপত্র, সুতরাং এই সমালোচনা কতকটা আত্মসমালোচনার মতো।

ভূস্বামী-কৃষকশ্রেণীর শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বর্ণনাকালে তত্ত্ববোধিনীর লেখক মধ্যে মধ্যে বাংলার গ্রাম্যসমাজের যে চিত্র লেখনীর আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, বাস্তব জীবন্ত চিত্র হিসেবে তা অতুলনীয়। তিনি লিখেছেন যে কেবল ভূস্বামীরা নন, "তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকেও প্রজাদিগকে ক্লেশ দিতে ত্রুটি করে না।" এই "তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকেও" যে গ্রাম্য মধ্যবিত্তশ্রেণী তা বলাই বাহুল্য। পল্লীগ্রামে যাঁর "যৎপরিমাণে সম্পত্তি ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তিনি লোকের উপর অত্যাচার" করে নিজের ক্ষমতা "প্রদর্শনার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন। সমস্ত লোক আমার আয়ত্ত ও বশীভূত থাকুক, ইহাই সকলের নিতান্ত বাসনা।" এই গ্রাম-মধ্যবিত্তরা (rural middle-class) কারা? "ভূস্বামীর সংসার-সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্রকর্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন," বা যাঁরা নিযুক্ত থাকেন তাঁরা এই মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ। অর্থাৎ গ্রাম্য-মধ্যবিত্তের একটি অন্যতম স্তর হল ভূস্বামীদের আমলাগোষ্ঠী। ভূস্বামীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে তাঁদের "প্রভাবের আর পরিসীমা থাকে না; বাজার-সরকারও রাজার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ করে।" 'টিপিকাল' মধ্যবিত্তচরিত্রের বর্ণনা—জমিদারের বাজার-সরকারও গ্রাম্যসমাজে রাজার মতো প্রভুত্ব করতে চায়। "গ্রামের মধ্যে যিনি অন্যান্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ধনবান"—অর্থাৎ বিত্তের দিক থেকে 'মধ্যবিত্ত'—তাঁর অভিলাষ যে আর সকলেই তাঁর দ্বারস্থ থাকুক এবং তাঁর দাস হয়ে সেবা করুক। এও মধ্যবিত্তচরিত্রের আর-একটি বড় বৈশিষ্ট্য। লেখক দুঃখ করে বলেছেন যে

এককালে গ্রামে যে-ব্যক্তি অতি-দরিদ্র ছিল, "সেও দৈবাৎ সান্ন" হলে "যাবতীয় লোকের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ করে।" জমিদারের অনুগ্রহপুষ্ট অর্থলোলুপ আত্মাভিমানী মধ্যবিত্তের পদার্পণে বাংলার গ্রাম্যজীবন যে কতদূর কলুষিত হয়েছিল তা এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়। পল্লী অঞ্চলে যতরকমের উৎপাত-উপদ্রব হত, তার প্রধান স্রষ্টিকর্তা ছিলেন এই মধ্যবিত্তশ্রেণী, এবং তাঁদের মধ্যে আবার প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে অন্যতম ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগীর দল, জমিদারদের আমলাগোষ্ঠী এবং থানা-পুলিশের কর্মচারীরা। এই মধ্যবিত্তরা স্বদেশী ও বিদেশী প্রভুর ক্ষমতার দর্পণে সর্বদাই নিজেদের মুখ দেখতেন এবং সেই ক্ষমতার প্রতিবিম্বকে কায়া মনে করে গ্রাম্যসমাজে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করতেন না। নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়নের যে বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহেবদের চেয়েও এদেশীয় গোমস্তা-দালালশ্রেণী বেশি অত্যাচারী ছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে অত্যাচারের বিচিত্র কৌশল উদ্‌ভাবনে তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। এঁদেরই বলা হয়েছে, নীলকরদের আশ্রিত 'নিদারুণ লোক।' নীলকররা অবশ্যই দারুণ, কিন্তু তাঁদের এদেশীয় আমলারা নিঃসন্দেহে নিদারুণ। এঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত, কিন্তু গ্রাম্য-মধ্যবিত্তের বিস্তৃত বনেদ এঁদের দ্বারাই গঠিত হয়েছিল এবং অদম্য অর্থলালসা এঁদের হৃদয়টিকে একটি বিকট শোষণযন্ত্রে পরিণত করেছিল।

অর্থ উপার্জনের কলাকৌশল ছাড়া এই গ্রাম্য-মধ্যবিত্তের আর কোনো গুণ ছিল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই মধ্যবিত্তের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—"তাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া বিখ্যাত বটেন, কিন্তু ব্যবহারানুসারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হইলে তাঁহারদিগকে এ আখ্যা প্রদান করা কোনক্রমেই উচিৎ নহে। যৎকিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষা মাত্র তাঁহারদের বিদ্যার সীমা; তাঁহারা বিদ্যারসের স্বাদ গ্রহণও করেন না, নীতিশাস্ত্রেও শিক্ষিত হয়েন না। বিদ্যা ও ধর্মহীন লোকের যে প্রকার আচরণ হওয়া সম্ভব, তাহা কাহার অগোচর আছে? তাঁহারদের মুখশ্রীতে কেবল লোভ ও নির্দয়তার নিদর্শনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, জ্ঞান ও ধর্মের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টি করা যায় না। তাঁহারদের সন্তানরাও প্রায় তদনুরূপ প্রকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারদিগেরই ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং তাঁহারদের নিকট শিক্ষা লিখিয়া ক্রমে ক্রমে···কোন একটা সামান্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া পিতা পিতৃব্যাদির ন্যায় অহিতাচার আরম্ভ করে।" এই হল গ্রাম্য-

মধ্যবিত্তের স্বরূপ, আধুনিক বিদ্যা বা শিক্ষার বালাই নেই যাঁদের, কেবল কিঞ্চিৎ নগদ অর্থের জোর আছে এবং তার চেয়েও বেশী জোর আছে সামাজিক ক্ষমতার, যদিও সেই ক্ষমতাটুকু প্রভুর ক্ষমতার অবাস্তব ছায়ামাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শহরের পত্রিকা এবং শহুরে মধ্যবিত্তরাই পত্রিকার পরিচালক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যা-বিচারে তত্ত্ববোধিনীর দৃষ্টি গ্রামাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের প্রতি কখনও নিবদ্ধ হয়নি। যখনই অর্থনীতিক সুখসমৃদ্ধি ও অভাব-অনটনের কথা পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে, তখনই গ্রাম ও গ্রামবাসীর কথা তার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠেছে, এবং বাহ্যশ্রীর জৌলুস অথবা শহর-নগরের দৃশ্যমান সমৃদ্ধিকে কখনও সে সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি বলে ভুল করেনি। ব্রিটিশ আমলে বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে এদেশের বাস্তব (material) জীবনযাত্রার যে উন্নতি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক লিখেছেন:

"যে বাষ্পীয় রথের লৌহবর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্বকালীন লোকের মনেতেও কল্পনা করে নাই, এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী আপামর সাধারণ লোকে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্বদা গতায়ত করিতেছে এবং যে অদ্ভুত তাড়িত বার্তাবহ পূর্বকালীন লোকে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় দেবকীর্তি বলিয়া মনে করিত, এক্ষণে বঙ্গভূমির নানাস্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয় যন্ত্র সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে সংসারের কার্য্যোপযোগী বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং যে মুদ্রাযন্ত্র সাধারণরূপে বিদ্যাপ্রচারের একমাত্র উপায়, যাহার সহায়তাক্রমে একদিবসের মধ্যে সহস্র সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রচারিত হইতে পারে, এক্ষণে বঙ্গদেশে উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্রেরও বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে।...এক্ষণে এদেশে যেমন নানাবিধ সুখভোগের উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানোপার্জন বিষয়েও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।"—'বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা', শ্রাবণ ১৭৭৮ শক।

যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানানো হয়েছে, এবং 'সবই আমাদের বেদে আছে' এরকম বিসদৃশ ধারণার বশবর্তী হয়ে এই প্রগতিকে তাচ্ছিল্য করার কোনো প্রয়াসও এর মধ্যে নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনের এই টেকনিকাল উন্নতির ফলে সমগ্র দেশ ও দেশবাসী কতদূর উন্নত ও

উপকৃত হয়েছে, সেই প্রশ্নই আসল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্ববোধিনীর লেখক বলেছেন, "যখন বঙ্গরাজ্যের প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী ও প্রতি পরিবারের" দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন "অনবরত দুঃখ দাবানলের অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করা যায়।" সমৃদ্ধি শহরে-নগরে যেটুকু দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে তাও দেখা যায় না। সুতরাং যাঁরা শুধু কলকাতার মতন শহরের দিকে চেয়ে থাকেন এবং শহরের মুষ্টিমেয় ধনিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সাহেবিয়ানা দেখে চমৎকৃত হন, তাঁরাই বাংলাদেশের বিশেষ উন্নতির কথা বলতে পারেন। "যাহারা কেবল কলিকাতাস্থ ও কতিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে, যাহারা কেবল নগর মধ্যে সর্বদা কতিপয় সধন লোকের সহিত একত্রিত হইয়া কথোপকথন করে, এবং যে সমস্ত লোক আধুনিক নব্যসম্প্রদায়ীদিগকে ইংরেজদিগের বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া মহানন্দে আনন্দিত হয়, তাহারাই বলে যে অধুনা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে—।" কিন্তু গ্রাম ও গ্রামবাসীর প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করলে এই ধারণা ভুল মনে হয় এবং 'বিশেষ উন্নতি' তো দূরের কথা, মনে হয় বিশেষ অবনতি হয়েছে। "কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ মনুষ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং যাহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানাপ্রকার দুঃখের বার্তা শ্রবণ করে, তাহারা আর কখনই বলিতে পারে না যে এক্ষণে বঙ্গরাজ্যের বিশেষ দুর্দশা ভিন্ন কোন অংশে ইহার উন্নতি হইয়াছে।"

কলকাতা শহরের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানকার ধনিকদের বিলাসিতার সঙ্গে গ্রামের সাধারণ লোকের দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনযাত্রার তুলনাও করা হয়েছে। "অধুনা কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন প্রকাশ্য স্থানস্থ কতিপয় ব্যক্তি যেমন উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এবং সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ ও সুন্দর যানবাহনে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখী হইয়াছে, সেইরূপ পল্লীগ্রামের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদনাভাবে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" সমাজের এই বিষম বৈষয়িক উন্নতি তত্ত্ববোধিনীর কাম্য ছিল না। যে বৈষয়িক উন্নতি সামাজিক বৈষম্যের পথ প্রশস্ত করে তা কখনও দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কাম্য হতে পারে না। অর্থনীতিক উন্নতির পথে দেশের শহর-নগর ও গ্রামের অগ্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হোক এবং সমাজের ধনভাণ্ডারের

পিচ্ছিল পথে এবং দীর্ঘমেয়াদী দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমায় উড়ে গেল। এঁদের বংশধররা, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে, অবস্থাচক্রে বাণিজ্যবিমুখ ও নিষ্কর্মা হয়ে সুদখোর-খাজনাখোরে পরিণত হলেন। এই পরিণতির পরের চিত্রই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আঁকা হয়েছে। এদেরই কথা মনে করে মন্তব্য করা হয়েছে যে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরে অবস্থার উন্নতি করতে এরা 'অপটু' এবং উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের অনুষ্ঠান করে সমধিক ধন উপার্জন করতে এরা 'অক্ষম'।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর অর্থনীতিক জীবনের এই শোচনীয় অবস্থা বিগত শতকের মধ্যভাগেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। এমন কি মধ্যবিত্তের মধ্যে সুযোগ্য ব্যক্তিরা পর্যন্ত যে "রাজকীয় উচ্চপদ" লাভে বঞ্চিত, সেকথাও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। "আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতন প্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোকে সেই কার্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করিয়া ১০০।১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না।" লেখক বলেছেন যে রাজা রাজবল্লভ, রাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতির মতন পদমর্যাদা বা ক্ষমতা ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া এযুগে (অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে) আর সম্ভব হবে না। তার কারণ কি? রাজবল্লভ-নবকৃষ্ণের যুগে আধুনিক মধ্যবিত্তের বিকাশ হয় নি, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। যখন তার বিকাশ হল এবং তার পাশাপাশি ইংরেজদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর 'অধঃশ্রেণীভুক্ত' সরকারী চাকুরিজীবী-শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকলেন। 'ডেপুটির' স্তর পর্যন্ত তাঁদের পদোন্নতির সীমা প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেল। প্রধানত এই ডেপুটিত্বের চূড়ান্ত পরিণতির কথা মনে করেই তত্ত্ববোধিনীর লেখক দুঃখপ্রকাশ করেছেন—"এদেশীয় লোকে সুচারুরূপে রাজনিয়ম পরিচিত হউন বা এক্ষণকার অপেক্ষা সহস্রগুণে কর্মক্ষম ও বিষয়দক্ষ হউন, তাহাদিগকে চিরদিনই অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এইরূপে অল্প বেতনে রাজকর্ম নির্বাহ করিতে হইবেক।" ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের আগে পর্যন্ত এদেশের ব্রিটিশ শাসকদের সরকারী কর্মনিয়োগনীতি ছিল ভারতীয়-বিরোধী, অর্থাৎ সাদা-কাল জাতিবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অ্যাক্টে এই বৈষম্যনীতি দূর করার সদিচ্ছা ঘোষিত হলেও, কার্যক্ষেত্রে তা যে পুরোপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি, তত্ত্ববোধিনীর ১৮৫৬ সালের সমালোচনা

থেকে তা বোঝা যায়। তাই ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জ যখন উচ্চশিক্ষাকে সরকারী কর্মযোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি বলে ঘোষণা করেন, তখন শিক্ষিত বাঙালীরা সভা আহ্বান করে সেই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেন। 'এজু-রাজ' (এডুকেটেড-দের রাজা) রামগোপাল ঘোষ সভায় ধন্যবাদ-প্রস্তাব পেশ করলে কিশোরীচাঁদ মিত্র তা সমর্থন করে বলেন: "Among the formidable obstacles which oppose themselves to the progress of education in our country, the absence of all connection between education and pecuniary success in the world is one of the principal···I hail therefore this resolution····" [৯] কিন্তু আরও বার বছর পরে এদেশীয় শিক্ষিতশ্রেণীর মনে যে কতখানি বিক্ষোভ জমা হয়েছিল, তত্ত্ববোধিনীর রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশ্য বাঙালীজাতি একটি পরনির্ভর চাকুরিজীবীশ্রেণীতে পরিণত হোক, তত্ত্ববোধিনীর তা কাম্য ছিল না। স্বাধীন শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য ভিন্ন যে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়, এ-বোধ তত্ত্ববোধিনীর খুব প্রখর ছিল। 'অতীতে আমাদের সবই ছিল'—এরকম গণ্ডমূর্খোচিত কোনো ধারণা তার ছিল না। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর মন্তব্য লক্ষণীয়: "এতদ্দেশীয় শিল্পনৈপুণ্যে অতি উৎকৃষ্ট সুখসেব্য নানাবিধ বিলাস-সামগ্রী উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ত উপকরণের অল্পতা হেতুই হউক বা অন্য কারণেই হউক, যে সকল সামগ্রী মনুষ্য জীবনের আপাততঃ অবশ্যম্ভাবী অভাব বিমোচনের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার নির্মাণে আমাদের শিল্পবিদ্যা সেরূপ স্ফূর্তি পায় নাই। এই জন্য আমরা জীবনের নানাবিধ সুখ-স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি ও সভ্যতার পথও কিয়দংশে রুদ্ধ রহিয়াছে।" এই বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক ও অর্থতত্ত্বানুগামী। প্রাচীন ভারতের গৃহশিল্পোৎপন্ন যে-সব সামগ্রী বহির্বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত তা সাধারণ লোকদের জন্য নয়, রাজা-বাদশাহদের বিলাস-সামগ্রী। সাধারণ মানুষের উপভোগ্য বস্তু খুব সামান্যই ছিল এবং তা নিজেরাই তারা উৎপাদন ও উপভোগ করত। উৎপাদন-উপভোগের (production-consumption) ক্রিয়া সাধারণত গ্রাম্যসমাজের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে যেত না এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানও খুব অনুন্নত ছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের চিরদিনের আধ্যাত্মিকতা ভোগবিমুখতা ও সন্ন্যাস-বৈরাগ্যপ্রবণতা তার বস্তুগত সমৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। তাই আক্ষেপ করে

তত্ত্ববোধিনীর লেখক লিখেছেন "বিদেশীয়রা সর্বকালে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যকে এত সমাদর করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা স্বয়ং ইহার প্রতি সমুচিত মনোযোগ প্রদান করি নাই।"

ভারতের বাণিজ্যিক অবনতির তিনটি কারণ তত্ত্ববোধিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম কারণ—প্রকৃতি এদেশকে সুজলা সুফলা করেছে, তাতে বিনা আয়াসে লোকের মোটা অভাব মিটে যায় এবং অতিরিক্ত আয়াসে কিছু করার প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় কারণ—আমাদের দেশের জলবায়ু মানুষকে শ্রমবিমুখ করে তোলে। তৃতীয় কারণ—আমাদের দেশাচার আর্থিক উন্নতির পরিপন্থী। দেশাচারের জন্য বিদেশযাত্রা নিষেধ, সমুদ্রযাত্রায় জাতিনাশ, বংশানুক্রমিক বর্ণগত বৃত্তি স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক। অর্থাগমের অধিকাংশ প্রশস্ত পথই এই কারণে অবরুদ্ধ। তা না হলে ইয়োরোপীয়দের মতোই আমাদের চরিত্রে সাহস ও উদ্যম এতদিনে নিশ্চয়ই দেখা দিত এবং তাহলে আমাদের আর্থিক জীবনও অনেক উন্নত হত।*

১। Modern India and the West: L. S. S. O'Malley, London 1941, p. 57.

২। W. W. Hunter: Bengal M S. Records. London 1894, vol. I, pp. 24-25

৩। Hunter: *op. cit.* p 111

৪। Hunter: *op. cit.* p. 32

৫। Karl Marx: Notes on Indian History, Moscow (*n.d.*), p. 101

৬। 2nd Report of Select Committee of House of Commons, 1808-12, app. 9, p. 103

৭। Bengal Administration Report, 1872-73, p. 73

৮। A. F. Pollard: Factors in Modern History, 3rd ed. London 1932, p. 43

৯। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড: বিনয় ঘোষ: 'প্রাসঙ্গিক তথ্য', ৪৯৫-৯৬

* লেখক-কৃত "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনা-সংকলন) গ্রন্থের (শীঘ্র প্রকাশিতব্য) সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একাংশ।

তরুণ সান্যাল

"নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্র' : সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের তত্ত্ব

মূলধনতন্ত্রী অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে বলে সামাজিক অসাম্য প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য যেমন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন ঘটছে, তেমনি সর্বপ্রকার বাণিজ্য বা কর্মসংস্থান সঙ্কটের সর্বরোগহর সালসার সন্ধান মিলেছে—এমন কথা পত্র-পত্রিকায়, বক্তৃতায় প্রতিদিনই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মূলধনতন্ত্রের মূলে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে কিনা, এবং তার বাহ্যিক বর্ণাঢ্যতা যথার্থ নব যৌবনের চিহ্নযুক্ত কিনা—এ সমস্ত বিষয় আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল মহলে বেশ কয়েক বছর ধরে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্রীগণ মূলধনতন্ত্রের কল্যাণমূলক নবরূপায়ণে যেমন ক্রমশ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, এমন কি ব্রিটেনের লেবার দলের সম্মেলনে রাষ্ট্রীয়করণ বিষয়ে বাদানুবাদের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে কর এবং ঋণ ব্যবস্থার সহযোগে জাতীয় আয় বণ্টনের দিকে বেশি নজর ও জোর দেওয়া হয়েছে। বামপন্থী কীনসপন্থীগণ শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে আয়বণ্টনের কথা মূলধনতন্ত্রের সঙ্কটমোচনের জন্য স্থায়ী প্রতিষেধক বলে মনে করেন, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী কীনসপন্থীগণ অধিকতর সুদের হার এবং রাষ্ট্র নিজে উৎপাদনের দায়িত্ব না নিয়ে কর প্রসূত অর্থ কমে আসা চাহিদাকে ঠেকা দিতে উৎপাদনকারীদের হাতে তুলে দিতে চান। দক্ষিণপন্থীদের নিকট আজ অস্ত্রসজ্জা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক।

মূলধনতন্ত্রের এবম্বিধ উদ্বর্তনের বিচারে মার্কসবাদীদের মধ্যেও এক ধরনের যান্ত্রিক যুক্তিবিস্তার লক্ষ্য করা যায়। মূলধনতন্ত্রের মূলে না হলেও কাঠামোতে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যা মার্কসপন্থীদের এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

Theories of "Regulated Capitalism" : Edited by I. G. Blyumin, Foreign Languages Publishing House, Moscow.

ইউরোপের মার্কসবাদীদলগুলি বহুবিচারের পর মূলধনতন্ত্রের নব বস্ত্রধারণের বিষয়টি যেমন পরিষ্কার হয়েছে, এশিয়ার বহু দেশের মার্কসবাদীগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ মূলধনতন্ত্রের অভিজ্ঞতার অভাববশত মূলধনতন্ত্রের ভোলবদলের গুরুত্ব-টুকুও বুদ্ধিবৃত্তিতে লোপ পেতে বসেছে। এবং উদ্ধৃতি কণ্টকিত বাগ্‌বিস্তারে তাঁরা বহু ক্ষেত্রেই রণং দেহি রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ যান্ত্রিক চিন্তানুসারীদের অভাব নেই। এমতাবস্থায় খোদ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক আই. জি. ব্লিউমিন কর্তৃক সম্পাদিত Theories of "Regulated Capitalism" বইখানির প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়েছে। মূলধনতন্ত্রের জরাগ্রস্থ বলিরেখা কণ্টকিত নৃসংশ অবয়ব 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্র' নামধেয় প্রসাধনের উগ্রতা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, সেটা নানা নিবন্ধের মাধ্যমে বইখানিতে লিখিত হয়েছে। বইখানিতে চারটি প্রবন্ধ লিখেছেন আর. কাফিঝভ, আই. ওসাদকায়া, ডি. স্মিস্‌লভ এবং এ. পোক্রোভস্কি। এঁরা প্রত্যেকেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের Candidate of Economic Sciences, এবং যথাক্রমে 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রের' তত্ত্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ঘটিত সমস্যা, ব্রিটেনে অধিক ও লগ্নিমূলক মূলধনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা এবং আধুনিক ফ্রান্সে সরকারী উদ্যোগে শিল্পসংহতি প্রবর্তনা বিয়য়ক নিবন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক মূলধনতন্ত্রের রঙবেরঙের বাহারী সাজপোশাক কাটিয়ে দিয়ে এঁরা গলিত নখদন্ত মূলধনতন্ত্রের ভোলবদলানো স্বরূপ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখাতে পেরেছেন। নিরস্ত্রীকরণ যে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলকশীর্ষ এবং নিরস্ত্রীকরণের ফলেই মূলধনতন্ত্রকে একেবারে চূড়ান্তভাবে আঘাত করা যেতে পারে, আধুনিক মূলধনতন্ত্রে সমরসজ্জার ভূমিকা আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখকগণ সুচারুভাবে তা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন।

মূলধনতন্ত্রের সমর্থকদের গলাবাজি বিভিন্ন যুগে বিভন্ন ধর্মী ছিল। এই কিছুদিন পূর্বেও এঁরা অর্থনীতিতে সরকারী অনুপ্রবেশ অসহ্য এবং মূলধনতন্ত্রবিরোধী বলে মনে করেছেন। যখন সরকারী প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন তখন এঁরা সে সহায়তা নিতে কুণ্ঠিত হন নি, সরকার তো এঁরাই গঠন করেন, সরকার প্রভাবিত রাষ্ট্রযন্ত্র মূলধনতন্ত্রীদের সময়মত

সহায়তা করতে তো আসবেই। মূলধনতন্ত্রের আদিযুগের নাম নানা কারণে অনেকে সওদাপুঁজির যুগ বা Mercantilism দিয়েছেন। সে যুগে স্বর্ণই, বা কেনা-বেচার জগতের বিনিময় মাধ্যমকেই সম্পদ বলা হত। যে দেশে বেশি সোনা, সে দেশই তত বড়লোক। সওদাগরগণ বিদেশে বেশি জিনিস বিক্রয় করে বেশি সোনা আনতে পারতেন বলে, সরকার তাঁদের সমর্থক ছিল। দেশের মজুরদের খুব কম মজুরী দিলে, বিদেশে বেশি দামে দ্রব্য বিক্রী হলে মুনাফার পরিমাণ যেমন বাড়ে, দেশে সোনাও ঢের আসে। আবার বিদেশের বাজার বন্দুকের জোরে, ছলেবলেকৌশলে দখল করে প্রত্যক্ষ লুঠতরাজের মাধ্যমে শোষণে, পরোক্ষে কর, খাজনা এবং বিক্রীত দ্রব্যের উচ্চ দাম আদায়ের মাধ্যমে ঢের বেশি বেশি সোনা দেশে আনা চলত। মূলধনতন্ত্রের আদিযুগে দেশের শ্রমিকশ্রেণীও বিদেশ শোষণের দস্তুর পৈশাচিকতায় মূলধনতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার সহায়তা চেয়েছেন। এর পরের ধাপে দেখা দিয়েছে প্রতিযোগিতামূলক মূলধনতন্ত্র। উর্দ্ধতনের পরবর্তী ধাপে মূলধনতন্ত্রীদের নিকটে রাষ্ট্রের অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে। ফলে, দেখানো হল মূলধনতন্ত্রে বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সঙ্কট দেখা দেবার কোনও আপাত কারণ নেই। স্বল্পস্থায়ী সঙ্কট দেখা দিলেও তার কারণ অন্যত্র। এক্ষেত্রে অর্থনীতির নমনীয়তাই বাণিজ্যসঙ্কটের বিরোধী। অর্থনৈতিক জগতে একের যোগান অপরের চাহিদারই প্রতিফলন, বা উল্টোটা। ফলে যদি দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলির এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্বতঃ গমনাগমন স্বচ্ছন্দ থাকে, তবে ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী, যে দ্রব্যের চাহিদা বেশি সে দিকেই তাদের সঞ্চালন ঘটবে। এবং প্রতিটি উদ্যোক্তা বাজারের অতি অল্প দ্রব্যের যোগান দেয় বলে তারা দাম নির্ণয়ে প্রভাবিত করতে পারবে না। মজুরের মজুরী বাড়াবার প্রয়োজন নেই, কেন না যে শিল্পে মজুরী বেশি হবে, অন্যান্য সুবিধা অসুবিধা স্থির থাকলে, সে শিল্পে মজুরের যোগান বেড়ে যাবে, ফলে বর্ধিত মজুরী কমে যাবে। বলা বাহুল্য, এই শ্রবণসুভ্যা, নয়নসুখকর, উচ্চারণে কণ্ঠরুচি তত্ত্বের গভীরে নজর এড়ানোটাই ছিল লক্ষ্য। উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের বৈপরীত্য কেন এ অবস্থার সঙ্কট আনবে, সে বিষয় প্রগতিশীল পাঠকের অজানা নয়। রাষ্ট্র কেন মজুরদের সুখসুবিধার দিকে নজর দেবে না তার কারণও এই Laissez faire-এর তত্ত্বের মধ্যে

বিস্তৃত। এই ধাপের পরের ধাপ একচেটিয়া মূলধনের ক্ষমতার যুগ, লেনিন যাকে 'সাম্রাজ্যবাদ, মূলধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর' বলে আখ্যা দিয়েছেন। মূলধনতন্ত্রের আদি যুগের তত্ত্ব যেমন সওদাগরী মূলধনতন্ত্র, মধ্যযুগের তত্ত্ব যেমন অবাধ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব, তেমনি একচেটিয়া মূলধন নির্দেশিত অর্থনীতির তত্ত্বই হল 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রের' তত্ত্ব।

'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রে'র তত্ত্বের প্রবক্তাগণ অবশ্য মূলধনতন্ত্রে যে স্থায়ী পূর্ণকর্মসংস্থান সম্ভবপর নয় তা প্রথমেই স্বীকার করে নেন। মুনাফার হার যদি হ্রাস পায়, এবং তদনুপাতে অর্থ বিনিয়োগগত অত্যধিক' আয়, অর্থাৎ সুদের হার [বৃদ্ধি পায়, স্থির থাকে কিংবা হ্রাস পায়] পরিবর্তন সাহায্যকারী না হয়, তবে কর্মসংস্থান অবশ্যই হ্রাস পাবে। কীনসীয় তত্ত্বানুসারে জাতীয় আয় নিরূপিত হয় সমগ্র ভোগ্য দ্রব্য ও সমগ্র মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনমূল্যের যোগফলে; এবং এ জাতীয় আয় যখন ব্যক্তিগত আশ্রয়প্রার্থীগণ কর্তৃক ব্যয়িত হয় তখন সমগ্র অর্থনীতির আয়-ব্যয় হয় দুভাগে, ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে এবং সঞ্চয়ে ভাগ হয়ে যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা এবং উৎপাদন মোটামুটি একই পরিমাণ থাকে, কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (marginal efficiency of capital) এবং প্রচলিত সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। প্রথমটি যদি দ্বিতীয়টির বেশি, সমান ও কম হয়, তবে যথাক্রমে উৎপাদন, ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে, স্থির থাকবে এবং কমে যাবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আর্থিক কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে যদি সুদের হার কমাতে পারে তবে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে পারে। আবার বড়লোকদের উপরে কর বসিয়ে, বা সরকারী ঋণ করে যদি সরকার সামাজিক সঞ্চয় পরিমাণ থেকে টাকা এনে নিজে উৎপাদন করে, কিংবা উদ্যোক্তাদের নিকটে দ্রব্য উৎপাদনের বরাত দেয়, তবে কর্মসংস্থান বাড়তে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যক্তিগত বর্ধিত আয়ের গরিষ্ঠাংশই ভোগের জন্য ব্যয় করে, সুতরাং তাদের হাতে এই টাকা এলে তা গুণকের সহযোগিতায় আরও চাহিদা বাড়াতে পারে। [ধরা যাক কোনো ব্যক্তির বর্ধিত আয় ১০০ টাকা, ঐ ব্যক্তি এবং এ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ বর্ধিত আয়ের $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয় করে। ফলে প্রথম ব্যক্তি তার আয়ের ১০০ × $\frac{৩}{৪}$ বা ৭৫৲ ভোগ করবে, যা তার নিকটে বিক্রেতাদের আয়, তারাও পুনরায় ৭৫ × $\frac{৩}{৪}$ বা

৫৬ টাকা ২৫ ন. প. ব্যয় করবে। এইরূপে সমগ্র বর্ধিত আয় হবে

$$১০০+\frac{৩}{৪}.১০০+\frac{৩}{৪}.^{২}১০০\cdots=১০০\left[\frac{১}{১-\frac{৩}{৪}}\right],$$

এই $\left[\frac{১}{১-\text{প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা}}\right]$ কে গুণক বলা হয়]।

ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূলধনী দ্রব্যেরও চাহিদা বেড়ে যাবে। এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভোগব্যয় বৃদ্ধির ফলে ত্বরণ ঘটবে। এই তথাকথিত ফলপ্রসূ তত্ত্বে বিশেষ ভাবে কর, ঋণ এবং সরকার কর্তৃক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বরাত দেওয়াই বেশি উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক জনসাধারণের উপরে কর বসিয়ে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে যে সরকারী আয় হবে, তার পুনর্ব্যয়ের ফলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। নিম্নজীবনযাত্রার মানসম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীর সঞ্চয়ের পরিমাণ শূন্য কিংবা ঋণাত্মক। সুতরাং তার নিকটে কর আদায় করে তাকেই ফিরিয়ে দেওয়াতে গুণকের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যাবে না। কিন্তু মূলধনতন্ত্রীদের কর দানের ক্ষেত্রে চাপ দিলে উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা তাদের কমে যেতে পারে। আর কাফিঝভের মতে তাই, শ্রমিকদের উপরে যে কর বসে, তার জন্য সরকার কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ করেন না, এবং যে পরিমাণ শ্রমিকদের চাহিদা কমে সেই পরিমাণ সরকারের চাহিদা বাড়ে মাত্র, ফলে সাধারণ বিচারে দেশে ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে না। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি পরিমাণ আয়কর বেড়েছে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা সরকার কতখানি নিজের কুক্ষিগত ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে নিচে তার তালিকাটি দেওয়া হল :

মজুরীর উপরে আয় করের বৃদ্ধি

সরকারী আয়ব্যয় বৎসর পূর্তি ৩০শে জুনের হিসাবে

	১৯৪৩	১৯৪৭	১৯৫২	১৯৫৫	১৯৫৬
ব্যক্তিগত আয়কর (হাজার মিলিয়ন ডলার হিসাবে)	৬'৬	১৯'৩	২০'৩	৩১'৬	৩৫'৩
নিয়োগকারীদের দ্বারা আটক রাখা টাকা (হাজার মিলিয়ন হিসাবে)	০'৭	৯'৮	১৭'৯	২১'৩	২৪'০

	১৯৪৩	১৯৪৭	১৯৫২	১৯৫৫	১৯৫৬
মজুরীর উপরে করের পরিমাণ এবং সমগ্র ব্যক্তিগত আয়করের শতকরা অনুপাত	১০·৬	৫০·৮	৬১·১	৬৭·৪	৬৮·০

অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র আয়করের দুই তৃতীয়াংশ শ্রমিকশ্রেণীই বহন করে, পরোক্ষ করের পরিমাণও ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সালে ৪১০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে গিয়ে ১০৭০ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

মূলধনতন্ত্রের অন্যতম সঙ্কটের কারণ নিম্নভোগের সঙ্কট। সুতরাং শ্রমিক-শ্রেণীর ভোগের পরিমাণ কমিয়ে অতি উৎপাদনের সঙ্কটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের অনুপাতে বলা যায় যে দেশের এক বৃহৎ অংশের জীবনযাত্রার মান নিম্নস্তরের। ১৯৫৪ সালের মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কমিটির বিচারে দেখা যায় যে হেলার কমিটি নির্ণীত বেঁচে থাকার মানের ঢের নিচুতে মার্কিন দেশের ২ কোটি ৬৩ লক্ষ মার্কিন পরিবার, অর্থাৎ সমগ্র পরিবার-সংখ্যার ৬৩ শতাংশ, অবস্থিত আছে। অধিকন্তু ৮৩ লক্ষ পরিবার (সমগ্রের ২০ শতাংশ) হেলার কমিটি নিরূপিত পারিবারিক বাজেটের অনুকূল আয়ের শতকরা ৩৭ ভাগ কম উপার্জন করে। ১৯৫৪ সালে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ মার্কিন পরিবারের কোনরূপ সঞ্চয়ই ছিল না। অপর দিকে সমগ্র পরিবারের ৪ শতাংশের (২২ লক্ষ পরিবারের) সঞ্চয় ছিল গড়ে দশ হাজার ডলার। ভোগকারীদের ঋণ ১৯৫৬ সালে ৩৪৪০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। এতে বোঝা যায় কী বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোগ্যদ্রব্য কেনার জন্য ঋণগ্রস্ত হতে হয়। সুতরাং বিপুল সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণীকে দ্রব্য ক্রয়ে বঞ্চিত করে দ্রব্য ক্রয় বৃদ্ধির এই পন্থাটি সঠিক হল না।

এ ছাড়া মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টিও ভাবা প্রয়োজন। প্রতি বছর যে বিপুল সঞ্চয় মার্কিন অর্থনীতিতে দেখা যায়, তা হল বেকার মূলধনের স্তূপ। বেকার মূলধনকে কাজে লাগাবার জন্য মার্কিন সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা না বাড়িয়ে ঐ বেকার মূলধনকে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করছেন। মূলধনী দ্রব্য যখন ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে অপারগ, কেননা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে না, সে জন্য বেকার মূলধনকে ব্যবহার করা যেতে পারে অন্যবিধ কাজে অর্থাৎ অস্ত্রসজ্জার কাজে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূলধনের একাংশ সরকার

নানাবিধ করের সহায়তায় বরাত পাঠিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, তা ছাড়া ঋণ গ্রহণ করেও (তাও অধিকক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত মূলধন থেকে আসে) তা কাজে লাগানো যায়। এমন কি অস্ত্র বিদেশে পাঠিয়ে, সহায়তার নামে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন চালু রাখা যায়—ফলে দেশে সংকট ঠেকা দেওয়া এবং বিদেশে বাজার রক্ষা করা সম্ভবপর। এবং একান্ত এই জন্যই ঠাণ্ডা যুদ্ধ জীইয়ে রাখা কর্তব্য বলে মার্কিন রাজনীতিকগণ মনে করেন। যৌথ মুনাফার উপরে সরকার কর বৃদ্ধি করেছেন, ফলে ১৯২৯, ১৯৩৯, ১৯৪৯ সালের যৌথ মুনাফার (হাজার মিলিয়ন ডলার বা ১০০ কোটি ডলার হিসাবে) ১'৩, ১'৪, ১০'৪ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৬ সালে দাঁড়িয়েছে ২২'০; ডিভিডেণ্ড ৫'৮, ৩৮, ৭'৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১'৯; অবণ্টিত মুনাফা ১৯২৯ সালের ২'৫ থেকে ১৯৫৬ সালে ৯''এ বর্ধিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই যৌথ মুনাফা যে বিপুল পরিমাণে সৃষ্ট হয়, নিচে তার সঞ্চীয়ন দেওয়া হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ মুনাফার উপরে কর

জাতীয় গড়

	১৯২৯	১৯৩৯	১৯৪৯	১৯৫১—৫৬
জাতীয় আয় (১০০ কোটি ডলারে)	৮৭'৮	৭২'৮	২১৬'২	৩০৫'৬
যৌথ মুনাফার উপরে কর (১০০ কোটি ডলারে)	১'৪	১'৪	১০'৪	২০'৬
মুনাফার শতকরা	১৪'৬	২১'৯	৩৯'৭	৫৩'১
জাতীয় আয়ের শতকরা	১'৬	১'৯	৪'৮	৬'৭

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে শ্রমিকশ্রেণীর উপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর কেবলমাত্র ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটায়—শ্রমিকশ্রেণীর হাত থেকে সরকারের হাতে। কিন্তু মুনাফার উপরে করের প্রকৃতি অন্যবিধ। উদ্বৃত্ত মূলধনের বিচারে এর সদুত্তর মিলবে। লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ, মূলধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ধাপ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মূলধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে ব্যাপক উৎপাদনের এবং মূলধনের সংহতি প্রথমত একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন করে; ব্যাঙ্কিং এবং শিল্পমূলধনের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়ত লগ্নি মূলধন বা ফিনান্স ক্যাপিটালের পত্তন ঘটায়। এই স্তরে, লেনিন দেখিয়েছেন 'অধিক পক্ব' মূলধনতন্ত্র মূলধনের সঞ্চয়ন ঘটিয়ে অগ্রচারী মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত মূলধনের সৃষ্টি করে এবং ঐ মূলধন দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় মুনাফা লাভের

মতো লগ্নির স্থান না পাওয়ায় তৃতীয়ত মূলধনের বিদেশে রপ্তানী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রে' লেনিন কথিত দ্বিতীয় ধাপে সরকারী বরাত সম্মত সামরিক দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে মূলধন স্বাভাবিক সঞ্চালনের চেয়ে কিছুটা বেশি সক্রিয় থাকতে পারে। এই উদ্বৃত্ত মূলধন মূলত আপেক্ষিক এবং স্বদেশে সম্পূর্ণ লগ্নির অসম্ভাব্যতার জন্য দায়ী স্বদেশের জনগণের গরিষ্ঠাংশের নিম্ন জীবনযাত্রার মান এবং অসম উন্নয়ন, এই অসম উন্নয়ন শিল্পের চেয়ে কৃষির পাশ্চাদ্‌বর্তিতার লক্ষণাক্রান্ত। এর ফলে উৎপাদন যন্ত্রের অপূর্ণ ব্যবহার, ব্যাপ্ত বেকারী, মূলধনতন্ত্রী উৎপাদন সংগঠনে ও ব্যাঙ্কে প্রচুর লগ্নিগত বেকার মূলধন জমা পড়ে থাকে, সুতরাং বিদেশে মূলধনরপ্তানীর প্রচেষ্টা এবং টাকার বাজারে চূড়ান্ত ফাটকাবাজী দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং যৌথ মূলধনের মুনাফার উপরে কর, এই উদ্বৃত্ত মূলধনের একাংশ সরকারের হাতে গিয়ে পুনর্ব্যয়িত হবার ফলে বেকার মূলধনের সামান্য লগ্নি সম্ভবপর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কর আবার ছোট কর্পোরেশনগুলি থেকে বেশি তোলা হয়, এবং বরাত পাঠানো হয় বড় বড় কর্পোরেশনের দপ্তরে বেশি হারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় ১৯৫১-৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮০টি বৃহৎ যৌথ উৎপাদন সংগঠন ১১·৭ হাজার মিলিয়ন ডলার কর দিয়েছে বটে (মোট করের ১৮·৪ শতাংশ), কিন্তু সরকারী বরাত পায় সামরিক উৎপাদনের ৫৭·৯ হাজার মিলিয়ন ডলার (শতকরা কণ্ট্রাক্টের ৫৮·৮ ভাগ); বাকি কর্পোরেশনগুলি ৫১·৮ হাজার মিলিয়ন ডলার কর দিলেও (মোট করের শতকরা ৮১·৬ ভাগ) কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে ৪০·৫ হাজার মিলিয়ন ডলারের। অর্থাৎ বৃহৎ কর্পোরেশনগুলি ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের উপর আরোপিত করের গরিষ্ঠাংশ নিজেদের কোলে টেনে নিতে পারে।

সরকারী বাজেটের ঘাটতি মেটাতে সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতের ব্যয় বর্তমানের ব্যয়ের ফলে দেশের ঋণ-ব্যবস্থায় যেমন চাপ পড়ে, তেমনি ঋণ-প্রবাহ চিরটা কাল তো সমান চলতে পারেনা। ঋণ পরিশোধের জন্য কর দিতে হয় শ্রমিকদের, পরিশোধের কালে এবং ব্যয়ের কালে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর আসল আয়ের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত ও সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ভয়ও অনেক।— যদি আর্থিক অবস্থায় চাপ পড়ে তবে দেশের ট্রেজারি দেউলিয়াও হয়ে পড়তে পারে।

৬

সুতরাং নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রের ভাষাটি শ্রবণসুখকর হলেও, বর্মমূলক নয়। অস্থায়ী ভাবে অনুকূল ব্যবস্থা চালু রাখলেও তার পতন অবশ্যম্ভাবী, কেননা ক্রমাগত বৈপরীত্য ও সংঘাত অর্থনীতিতে বেড়েই ওঠে। এমতাবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে যদি কোনোও পক্ষ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে সরকারকে সামরিক কণ্ট্রাক্টের দায়মুক্ত করতে পারে, তবে অতি অল্পসময়েই মূলধনতন্ত্রের এই অবস্থা ভেঙে পড়বে। উদ্বৃত্ত মূলধন ব্যবহারের স্থান সঙ্কুলান না হলে, সংকটের সূত্রপাত হবে, যে বিপুল ঋণব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার তলার এই মাটি বড় নরম। মিলিটারি কণ্ট্রাক্টের চোরাবালি ধসিয়ে দিলে মূলধনতন্ত্রের ঋণব্যবস্থাও বহুলাংশে ধসে পড়তে বাধ্য। ফলে, অতি উৎপাদনের স্থায়ী সংকট দূরীভূত হতে পারে না। এর সমাধান মার্কিন জনগণেরই হাতে।

আই. ওসাদস্কায়া মার্কিন অর্থনীতির অন্তবিধ সংকটের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। মুদ্রাস্ফীতিতে কাগুজে টাকার মূল্য হ্রাস পায়, এবং চাহিদার চেয়েও ঐ টাকার অধিক প্রচলন ঘটে বলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং জাতীয় আয় শ্রমিকশ্রেণীর স্বপক্ষে না বণ্টিত হয়ে মূলধনতন্ত্রীদের স্বার্থের স্বপক্ষে যায়। যাই হোক, মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করার জন্য নানাবিধ পন্থা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদগণ প্রণয়ন করেছেন। মূল্যনিয়ন্ত্রণ তাদের মধ্যে অন্যতম। কোনো কোনো লেখকের মতে শ্রমিকশ্রেণীর উপরে কর আরোপ করে, ঐ টাকা, মূলধনতন্ত্রীরা মূল্যনিয়ন্ত্রণের ফলে যে মুনাফা অর্জন করতে পারলো না, সেজন্য তাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হোক। বলা হয়, শ্রমিকশ্রেণীর মজুরীবৃদ্ধি হেতু মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ে। সুতরাং মজুরদের উপরে কর বাড়ুক। কিন্তু অনুৎপাদক ব্যয়মূলক সামরিক অস্ত্রসজ্জাজনিত ব্যয়ই মার্কিন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি জীইয়ে রাখতে চায়। এবং সেজন্যই উদ্বৃত্ত টাকা প্রচলনধারা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় না।

ডি. স্মিসলভ ব্রিটেনের সাম্প্রতিক আর্থিক ও লগ্নিগত মূলধনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ডলার ঘাটতি ক্রমশ দেশের অর্থব্যবস্থার উপরে চাপ সৃষ্টি করেছে। ব্রিটেনের আর্থিক ও বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের বাজারের সঙ্কট মূলত মার্কিন মূলধনের প্রবেশ এবং অস্ত্র

প্রতিযোগিতার ফলেই ঘটেছে। সুতরাং এই সঙ্কট মোচনের পন্থাগুলি হলো : "immediate cessation of the arms race, the restriction of fabulous monopoly profits, and the broad expansion of trade with the socialist countries."

ফরাসী দেশে নিয়ন্ত্রিত মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্ত্বকে *DIRIGISME* বলা হয়েছে। শ্রী. এ. পোক্রোভস্কি দেখিয়েছেন, সরকারী চাপের ফলে কার্টেল সমবায় এবং সরকারী বিভাগে উৎপাদন মূলত একচেটিয়া মূলধন-তন্ত্রীদের স্বার্থেই সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলধনতন্ত্র বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা নিবন্ধটিতে রয়েছে। যাই হোক, dirigisme-এর প্রবক্তাদের নিকটে মূলধনবাদী অর্থনীতির উৎপাদনের অরাজকতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষাকারী অর্থনীতিতে যথাযথ পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদগণের বহু চীৎকৃত সংকটনিরোধী প্রতিষেধক রূপে 'নিয়ন্ত্রণী' শক্তি ব্যর্থ করে দিতে বাধ্য। তবু মূলধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার এই পরিকল্পনা-মুখী আগ্রহ স্পষ্টত দেখিয়ে দিচ্ছে যে ব্যাপ্ত পরিকল্পনা বিধৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার শিশু মূলধনতন্ত্রের জঠরে পরিণত হয়ে গর্ভবাস অবসানের কামনা করছে।

Regulated Capitalism বইখানি মূলধনতন্ত্রের স্বরূপ নিরূপণে কৌতূহলী পাঠকের খুবই উপকারে আসবে ॥

দিলীপ বসু

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ইতিহাস

অধ্যাপক ফ্লেমিং আমেরিকার ভ্যান্‌ডেরবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" (International Relations) বিষয়ে শিক্ষকতা করছেন ১৯২৮ সাল থেকে এবং গত কয়েক বছর ধরে একই বিষয়ে রিসার্চ-প্রফেসারও তিনি। প্রসঙ্গত, এই ভ্যানডেরবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার এমন এক অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত যেখানে ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের মতবাদের পঠন-পাঠনও আইনত নিষিদ্ধ।

প্রফেসর ফ্লেমিং মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী নন, এমন কি সোশ্যালিস্ট ও তাঁকে বলা চলে না—অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানার যথেষ্ট সামাজিক ভবিষ্যত আছে বলেই তাঁর বিশ্বাস ; এক কথায় আমেরিকার একটি বিশেষ রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন বিশিষ্ট, গণ্যমান্য, 'রেসপেক্‌টেবল্' প্রফেসর, যাঁর মতামতকে মার্কিন দেশের কর্তৃপক্ষ ভালো, চক্ষেই দেখবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বড়ো জোর উদারনৈতিক রুজভেল্‌টিয় 'নিউ ডিল্' ধরনের মতবাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে।

পাঁচ শতাধিক করে প্রায় ১১ শত পাতার এই দুইটি বইয়ের প্রায় প্রতি ছত্রেই রয়েছে বিশেষ শ্রমসাধ্য ও খুঁটিয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টার স্বাক্ষর। ফলে সাম্প্রতিক ইতিহাসের যে কোনো ছাত্রের পক্ষে বইটি খুবই মূল্যবান। উদারনৈতিক বুর্জোয়া মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেক মার্কসিস্টও একমত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। সত্যান্বেষণের যথার্থ বিষয়মুখী দৃষ্টিভঙ্গীর আর গোঁড়ামির একপেশে মনোভাব ছেড়ে ইতিহাসের মার্কসীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলে, মূলত একই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে—প্রফেসর ফ্লেমিংয়ের আলোচ্য পুস্তকটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

The Cold War and its Origins : Prof. D. F. Fleming. (Vol. I—1917-1950 ; Vol. II—1950-1960). Doubleday & Co. Inc. New York. 110 sh.

অবশ্য প্রফেসর ফ্লেমিংয়ের বিরাট পুস্তকের প্রতিটি ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যার সঙ্গে সবাই একমত হবেন তা নয়। বিশেষ করে প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদে রুশ বিপ্লবের যে মূল্যায়ন তিনি করেছেন অনেকেই তা অগ্রাহ্য করবেন।

১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব

তবে রজনী পাম্ দত্তের ('সাম্প্রতিক ইতিহাস') মত মার্কসবাদীর সঙ্গে এক বিষয়ে কিন্তু তিনি একমত। তিনিও সাম্প্রতিক ইতিহাসের পর্বকাল ধরেছেন ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব থেকে। তবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যাকে বলা যেতে পারে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাত্রারম্ভ করে।

অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের মতে অবশ্য রাশিয়ান্ বিপ্লবই যতো নষ্টের গোড়া; বিপ্লবের দ্বারা মূলোচ্ছেদ করাতে তাঁর মতে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তিনি পছন্দ না করলেও ফরাসী বিপ্লবের 'Liberty, Equality, Fraternity'-র মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের যে আপস ছিল সেটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি; এবং আর তা ছিল বলেই ১৯৪০-এ ভিসি গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল তাও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে।

তবে রাশিয়ান বিপ্লবকে একটা প্রকাণ্ড আপদ মনে করলেও তিনি পরিষ্কার মত দিয়েছেন যে, বিপ্লবের সঙ্গে একসঙ্গে ঘর করতে হবে এবং না করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। শুধু তাই নয়, এই বিপ্লবকে অস্বীকার করার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরে স্নায়ুযুদ্ধের (cold war) উৎপত্তি হয়েছে এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর তাঁর পুস্তকের প্রধান কাঠামো নির্ভর করছে। এবং আজকের দিনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ না করলে পৃথিবী ও মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই সিদ্ধান্তের বাস্তবতাকে তিনি স্বীকার করেছেন অকপটে।

রুশ বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯১৭-তে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিপ্লবের আগুন দাবানলের মতো সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানিতে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর হাতের মুঠোয় এলেও প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে ক্ষমতা তাদের হাতে রইল না, গিয়ে পড়ল সাইড্ম্যান, নস্কে ইত্যাদি সোস্থাল ডেমোক্রাটদের হাতে; তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করলেন সৈন্যদের (অধ্যাপক ফ্লেমিংও

স্বীকার করেছেন, পৃঃ ৩৬-৩৭) এবং ষোল বছর ধরে ক্রমাগত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যে ভাঙন ধরিয়ে শেষ অবধি ১৯৩৩-এ ফ্যাশিজমের ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে দিলেন।

১৯১৯-এ বেলাকুনের নেতৃত্বে শিশু হাঙ্গারিয়ান সোভিয়েত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হল রুমানিয়ার ফ্যাসিস্ট ঝটিকা বাহিনী, বুলগেরিয়াতেও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। ওদিকে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে ইওরোপের আটটি দেশের সৈন্যবাহিনী শিশু সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুগপৎ আক্রমণ করল। পূর্বে জাপান ও আমেরিকার সৈন্য এবং পশ্চিমে কোলচাক্-ডেনিকিন্ নামে জারের আমলের সেনানীদের আড়ালে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ পুরোদমে শুরু হল। রাশিয়াতে আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের ও ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল আন্দোলন এই 'হস্তক্ষেপ'-কে রুখে দেয়। রুশ বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গাঘাতে ইওরোপের অন্যান্য দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট কায়েম না হলেও, সেই সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণী অন্তত রাশিয়ার বিপ্লবের রক্ষার্থে নিজ শক্তির পরিচয় দেয়।

এ-সমস্তই আমাদের কালের গত পঞ্চাশ বছরের জানা ইতিহাস, তবু হয়তো এক নজরে এর পর্যালোচনা করবার প্রয়োজন আছে; আলোচ্য পুস্তকেও যে চলতি বিবরণ পাওয়া যাবে, সেটার সঙ্গে ঘটনার বিবরণী হিসাবে আমরা একমত হতে পারি।

১৯২৪-এর পরে রুশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের চরিত্র খানিকটা পাল্টে গিয়ে, সরাসরি সামরিক আক্রমণাত্মক হস্তক্ষেপের বদলে শুরু হয় জঘন্য কুৎসা প্রচার। জাল দলিলের সাহায্যে (যেমন কুখ্যাত জিনোভিয়েভ চিঠি ও আরকস তল্লাসী) বিদেশে সোভিয়েত রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে জঘন্য পীড়ন ও অত্যাচার শুরু হয় এবং আমেরিকা সোভিয়েত রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে অসম্মত হয়। কুৎসার নমুনা হিসাবে আলোচ্য পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠাতে অধ্যাপক ফ্লেমিং শিকাগো ট্রিবিয়ুনের ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালের বহু শিরোনামা তুলে ধরে মন্তব্য করছেন:

The *Tribune* published a stream of articles which would lead its widespread readers to conclude that there was a never-ending series of revolts in Russia."

১৯৩৩ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত গভর্নমেন্টকে স্বীকৃতির

কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ফ্লেমিংয়ের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন :

"...twenty-one other Governments, including Britain, France and Japan, had recognised the Government of the Soviet Union but that made no difference to the United States...A series of economic and political earthquakes was required to change this outlook.

"The first of there world-shaking events was the tremendous explosion of paper values in Wall Street in October 1929,...In these years of bitter bread it appeared also that the Soviet Union was not filled with unemployment and want. Under the regimentation of the Soviet planned economy everybody had a job and life went on as usual, except for some hardships caused by the disruption of world trade, this phenomenon led multitudes of Americans to develop a great interest in this strange economy which had been supposed to collapse presently, but instead our own had. What made this new system tick? Many people were not so certain that Washington should never speak to Moscow." (পৃঃ—৪৬-৪৭)।

'Regimented' এবং 'Strange economy'-র যে প্রভাব তখনকার ১৯৩৩-এর জগতে ধনতান্ত্রিক সমাজের ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর পড়েছিল তারই জন্য ধনতান্ত্রিক জগতের মুকুটমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শেষ অবধি স্বীকার করে নিতে হল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে। ত্রিশ বছরের ব্যবধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে বিশেষ করে মহাকাশ জয়ের পরে সেই আরো সঙ্কুচিত ধনতান্ত্রিক জগতকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব পরোক্ষে স্বীকার করতে হচ্ছে তার নিজের অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনাতেও পরিকল্পনার ধারণাকে চালু করে ও অনেকাংশে প্রয়োগ করে। গতবারে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, এবারে তেমনি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে উত্তরোত্তর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাও তাদের চিন্তা করতে হচ্ছে।

অধ্যাপক ফ্লেমিংয়েরও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এটা ধরা পড়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৮৫ পৃষ্ঠা থেকে পুস্তকের শেষ অবধি তাঁর সমস্ত জোর সেদিকেই পড়েছে। তিনি বলেছেন যে, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭-তে (সোভিয়েত ইউনিয়ন যেদিন মহাকাশে প্রথম স্পুট্‌নিক নিক্ষেপ করে) :

"an event occurred which registered the end of 'The American Century' (পৃঃ ৮৮৫)…"The Sputniks compelled us to begin a reassessment of our paramountcy" (পৃঃ ৮৮৭) ; "The new Russia could not be 'contained' as the old had been." (পৃঃ ৮৯২)।

ফ্যাশিজমের অভ্যুত্থান

১৯৩৩-এ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্কটের ফলে একদিকে যেমন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক জগৎ স্বীকার করে নিল তেমনি অন্যদিকে জার্মানিতে হিটলারি ফ্যাশিজমের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরে (১৯২২ সালে ইতালীতে মুসোলিনী ক্ষমতা দখল করলেও) সারা ইওরোপে ফ্যাশিজমের বিভীষিকা তার আসল নগ্ন রূপে দেখা দিল।

লীগ অব নেশন্‌সে সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিটাভিন্‌ভ্‌ "সমষ্টিগত নিরাপত্তা (collective security) ব্যবস্থা গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন ; 'বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সে' ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং বিশেষ করে 'আগ্রাসন"-এর সংজ্ঞা যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, পশ্চিমী কুটনীতিকরা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও, অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের মতে, "They (পশ্চিমী কুটনীতিকরা—সমালোচক) found it impossible to believe that the dreaded Communist state really had pacific purposes…Yet there is no reason to question the sincerity of his (অর্থাৎ লিট্‌ভিন্‌ভের তথা সোভিয়েত রাষ্ট্রের—সমালোচক) desire to prevent another war, the Soviet Union had nothing to gain by it and much to lose" (পৃঃ ৫০)।

ফ্যাশিজমের অভ্যুত্থানের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তোষণ-নীতি যে মূলত দায়ী, একথা কেউই আজ আর অস্বীকার করবেন না। ১৯৩৩-এ হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতা দখলের পরে ১৯৩৫ সালে ব্রিটেন জার্মানির

সঙ্গে নৌ-শক্তি চুক্তি (Anglo-German Naval Treaty) করে প্রকারান্তরে ঘোষণা করে যে, অতঃপর হিটলারের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে চরিতার্থ করবার জন্য পূর্বদিক, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করার নীতির দ্বারা ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতায় আসার পথও সুরাহা হয়।

তারপর কুখ্যাত মিউনিকে চেম্বারলিনের চেক্ গণতন্ত্রকে কোরবানি করার দ্বারা কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইওরোপের রাজনীতি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ফ্যাশিজমকে খতম করতে গিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে এবং একমাত্র তারই বলে ইওরোপের তথা বিশ্বরাজনীতিতে অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসাবে সে ফিরে আসতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের বা পরের বিশদ ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, তবে আজকের স্নায়ুযুদ্ধের উৎপত্তির মূলসূত্র খুঁজতে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই পর্যালোচনা করা দরকার।

স্নায়ুযুদ্ধের আরম্ভ

অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের মতে স্নায়ুযুদ্ধের শুরু রুজভেল্টের মৃত্যুর পরে, চার্চিলের ৫ই মার্চ, ১৯৪৬ সালে আমেরিকার ফুলটন শহরের কুখ্যাত বক্তৃতায়। সত্য বটে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষের ত্রিশক্তির (সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ব্রিটেন) বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা বিশেষ করে করেছিল জার্মান ফ্যাশিস্টরা এবং সে সময়ে কেবল সোভিয়েট নয়, আমেরিকা ও ব্রিটেনের কাছ থেকেও বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, যুদ্ধকালীন মিত্রতাকে তাঁরা যুদ্ধোত্তর যুগেও চালিয়ে নিয়ে যেতে চান। সেদিক থেকে চার্চিলের ফুলটন্ বক্তৃতার পূর্বে কেউ স্নায়ুযুদ্ধের ভাষা ব্যবহার করেন নি। ফুলটনে চার্চিল বললেন যে, ইংরেজীভাষী জনসাধারণের মৈত্রী ছাড়া পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নেই, তাহলে আবার প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হবে, কারণ ইতিমধ্যেই অর্ধ-ইউরোপে স্টাটিন্ থেকে ত্রিয়েস্ত অবধি 'লৌহ-যবনিকা' টানা হয়েছে। প্রসঙ্গত, লৌহ-যবনিকা শব্দটি চার্চিলের নিজস্ব নয়, রজনী পাম্ দত্ত পরে প্রমাণ করেছেন যে, কথাটি নাৎসীদের প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েব্‌ল্‌স্ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

যাই হোক, প্রফেসর ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের সামান্য কিছু

মতভেদ আছে। প্রথমত, ১৯৪৫ সালের ৬ই ও ৯ই আগস্ট,হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয়, সেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে শেষ করবার জন্য নয়, তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া হিসাবে স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম ঘোষণা। কারণ পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করার পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে এই বোমা আসার আগে পর্যন্ত আমেরিকান কূটনীতির মূলকথা ছিল যে, তার হাতে এমন অস্ত্র আছে যার বিরুদ্ধে আর কারুর কথাটি চলবে না।

রজনী পাম দত্তের Studies in Contemporary History-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ও পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের 'Atomic Weapons and East-West Relations'-এও এ সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাবে। আমেরিকার পরমাণু-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারকে ১৯৪৪-এ যখন আন-আমেরিকান একটিভিটিস্ কমিটির সামনে সোভিয়েতের গুপ্তচর হিসেবে অভিযুক্ত করবার চেষ্টা করা হয়, তখন জেনারেল গ্রোভস তাঁর জবানবন্দীতে বলছেন :

"I think it important to state—I think it is well-known—that there was never from about two weeks from the time I took charge of the project any illusion on my part but *that Russia was the enemy and that the project was conducted on that basis.* I didn't go along with the attitude of the country as a whole that Russia was a gallant ally. I always had suspicions and the project was conducted on that basis, *of course, that was reported to the President.*" (Atomic Weapons and East-West Relations, by Prof. P. M. S. Blackett, পৃঃ ৭০, বাঁকা হরফ আমার)।

পারমাণবিক বোমা তৈয়ারির উদ্দেশ্য তাহলে পরিষ্কার ছিল—দরকার মতো পারমাণবিক বোমা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারবে; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টেরও সেটা অজানা ছিল না। প্রসঙ্গত এই উদ্দেশ্য বা "terms of reference" নিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরি করবার জন্য জেনারেল গ্রোভসের নেতৃত্বে যে 'ম্যানহাট্টান প্রোজেক্ট' নামে আমেরিকার পারমাণবিক বোমার তৈরির যে রিসার্চ শুরু হয়, সেটা ঘটেছিল আগস্ট

১৯৪২-এ,—যখন ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে স্টালিনগ্রাদে ফ্যাশিজমের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিচ্ছে সোভিয়েতের লাল ফৌজ এবং তার বীরত্ব গাথা বর্ণনায় ইঙ্গ-মার্কিন গভর্নমেন্ট সে সময় পঞ্চমুখ।

অবশ্য ১৯৩৯ সালে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও বিশেষভাবেই প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টকে অনুরোধ করেছিলেন এই গবেষণা হাতে নেবার জন্য। কারণ জার্মানিতে বৈজ্ঞানিক অটো হানের পরমাণু-কেন্দ্রীনকে ভাঙ্গতে পারার ফলে তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, হিটলার জার্মানি হয়তো পারমাণবিক বোমা তৈয়ারি করার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। জার্মানির পরাজয়ের পর অবশ্য দেখা গেল যে, জার্মানি অটো হানের রিসার্চের ওপর বেশি ঝোঁক না দেওয়াতে পারমাণবিক বোমা তৈয়ারিতে তাদের কাজ প্রায় কিছুই এগোয় নি।

ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার হতে পারে—এই মনোভাব জেনারেল গ্রোভসের থাকলেও এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টের তা অজানা না থাকলেও ইউরোপের যুদ্ধান্তে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বারবার যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির মৈত্রীকে যুদ্ধোত্তর যুগে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথাই বলেছেন। সেটা যে আন্তরিক ছিল, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করবার কোনো কারণ দেখি না।

রুজভেল্টের মৃত্যু আমেরিকার নীতি পরিবর্তনের সূচনা করল।

নাগাসাকি-হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকালীন মৈত্রী নীতি থেকে পুনরায় সোভিয়েত-বিরোধী নীতিতে প্রত্যাবর্তন হিসাবে ছাড়া আর কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের অবশ্য এই ব্যাপারে স্ববিরোধিতা আছে। তিনি বলছেন :

"In midsummer 1945 four powerful urges pushed our leaders toward the swift use of the atomic bomb: (1) to save American lives; (2) to shorten the war; (3) to announce the atomic fittingly; and (4) to minimise the expansion of Russian power in the Far East.

"In the earlier stages of the decision the first two motives were the strongest; in the final stages the last two

appear to have become decisive. At the time the first three purposes seemed to have been brilliantly achieved and the fourth in part. In perspective our success seems more doubtful." (পৃঃ ৩০৬)

আসলে প্রফেসার ফ্লেমিং-এর মনের এই দোদুল্যমানতা তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্ববিরোধিতার পরিচয়। তবে আনন্দের কথা এই যে, সেটা কাটিয়ে উঠে তিনি অবশেষে পরিষ্কার বলছেন :

"The military results of Hiroshima were comparatively minor. The inevitable surrender of Japan was hastened a little. The political fission which flowed from Hiroshima helped powerfully to split the world by inaugurating a new balance of power conflict and arms race under conditions more dangerous than before.

"The American decisions concerning the use of the atomic bomb definitely marked the end of the war-time alliance with the Soviet Union and the beginning of the post-war balance of power struggle." (পৃঃ ৩০৮)

১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করার পর বিশ্ব-রাজনীতিতে যে নতুন কূটনৈতিক পর্বের স্থচনা, তাকে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। তা হল আমাদের মতে :

(১) ১৯৪৫ সালে, যখন একমাত্র আমেরিকার হাতেই পারমাণবিক বোমা ছিল ;

(২) ১৯৪৯-১৯৫৩, যখন সোভিয়েতের হাতেও পারমাণবিক বোমা আসার পরেও হয়তো পরিমাণগত ও গুণগত হিসাবে আমেরিকাই এগিয়ে ছিল ;

(৩) তাপ-পারমাণবিক হাইড্রোজেন বোমা দু-পক্ষেরই হাতে থাকার ফলে পারমাণবিক যুদ্ধক্ষমতা দু-পক্ষেরই তুল্যমূল্য অবস্থায় পৌছল ;

(৪) তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রও বিশেষ করে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটলে মানবসভ্যতার নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্তি হবেই, এই স্থির সিদ্ধান্ত।

অধ্যাপক ফ্লেমিংও নিশ্চয়ই এই স্তরভাগে আপত্তি করবেন না, কারণ তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার বিশদ ইতিহাসের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকার একাধিপত্য ও শক্তি ঠিক যে পরিমাণে কমেছে, সেই পরিমাণেই সে ক্রমশ সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তির দিকে এগোতে বাধ্য হয়েছে।

বিষয়টি আলাদা একটি প্রবন্ধ ছাড়া স্বল্প পরিসরে পুরা আলোচনা করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে, ১৯৪৫ সালে এচিনসন লিলিয়েনথাল, পরে বারক প্ল্যানে পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার নামে সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার প্রচ্ছন্ন ও খানিকটা প্রকাশ্য চেষ্টাও ছিল। বলা হয়েছিল যে, কোনো দেশ (অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন) যদি আক্রমণ করে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ ও সমুচিত (instant and condign) শাস্তি দেওয়া হবে পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে।

১৯৪৯ সালের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে সমর্থ হল, তখন থেকেই আমেরিকা উঠে-পড়ে লাগলো হাইড্রোজেন বোমা বা তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে। নভেম্বর ১৯৫২ সালে আইনট-কে তাপ-পারমাণবিক বোমার পরীক্ষাও সফলভাবে সমাধা হল। কিন্তু ১৯৫৩ সাল শেষ হবার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়নও যখন তাপ-পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ করল, তখন থেকেই দু-পক্ষের যুদ্ধক্ষমতা সমান (atomic parity) হয়ে দাঁড়ালে। এর পরে হয় সর্বাত্মক ধ্বংস, নয় সর্বাত্মক নিরস্ত্রী-করণের পথে পৃথিবীতে চিরশান্তি, এবং শ্রেণীবিহীন ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের পটভূমিতে নিজ নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংগ্রামের নিষ্পত্তি—মানব সমাজের সামনে মাত্র এই দুটো পথ খোলা রইল।

নাগাসাকি-হিরোশিমাতে ধ্বংস

নাগাসাকি-হিরোশিমার পারমাণবিক বোমা (ধ্বংসক্ষমতা ২০,০০০ টন TNT Trinitrotoluene) আজকে মাত্র ক্ষেপণাস্ত্রের 'পারমাণবিক মাথা' (atomic warhead) হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা হয়েছে, কারণ সাধারণ একটি তাপ-পারমাণবিক হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসক্ষমতা হচ্ছে ন্যূনপক্ষে ৪০ লক্ষ টন TNT। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দু পক্ষ মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে

৩০ লক্ষ টন বা তিন মেগাটন TNT ব্যবহার করা হয়েছিল আর আজকে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরে হয়তো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাতেও কয়েকটি মেগাটন বা এমন কি সুপার-মেগাটন ধ্বংসক্ষমতা যুক্ত তাপ-পারমাণবিক বোমা আছে।

হিরোশিমাতে ইউরেনিয়াম্-২৩৫ বোমার একটি আঘাতে ৭০,০০০ লোক আর নাগাসাকিতে প্লুটোনিয়াম বোমার আঘাতে মারা যায় ৪০,০০০ লোক। ভূপৃষ্ঠের ১,০০০ থেকে ২,০০০ ফিট ওপারে এই ছুটি বোমার বিস্ফোরণ করান হয় এবং বিস্ফোরণের স্থান থেকে ১½ মাইলের মধ্যেই মোট নিহত লোকের শতকরা ৯০ জনকে পাওয়া যায়। অবশ্য বোমার বিস্ফোরণের আগুনের ঝলসানিতে পরে আরো বহু লোক মারা যায়। বোমাটি যে স্থানের উপরে ফাটে, সেটিকে কেন্দ্র করে ছয় বর্গ মাইল জুড়ে সাধারণ বাড়িগুলি একেবারে ধুলিসাৎ হয়, কেন্দ্রের এক বর্গ মাইলে কোনো বাড়িই টেঁকে নি, তার বাইরে ছয় মাইলের মধ্যে ছু একটি রিইন্‌ফোর্সড্ কন্‌ক্রীটের বাড়ি আধা ভেঙ্গে যায়।

অসম্ভব কোনো প্রতিরক্ষা

হিসাবে দেখা যায়—যে বৃত্ত জুড়ে ধ্বংস হয় (radius of destruction) সেই বৃত্ত ধ্বংসশক্তির তৃতীয় মূলের অনুপাতে বাড়ে কমে। এই হিসাব অনুসারে অধ্যাপক ব্ল্যাকেট লিখেছেন :

"Let us compare the number of successful aircraft sorties required to destroy an area of 400 square miles when the three types of bombs are carried. The relative number of sorties are 1 for H-bombs 50 for A-bombs and 10,000 for chemical bombs carried by bombers with a ten-ton load. These figures are alone sufficient to show why the problem of effective defence against H-bombs is almost insoluble—so few bombers can be permitted to get through." (Atomic Weapons and East-West Relations, পৃঃ ৪৭-৪৮)।

অধ্যাপক ব্ল্যাকটের উপরি উক্ত পুস্তক লেখবার সময় আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তেরি হয় নি; অর্থাৎ বোমারু বিমানকেই মেগাটন বোমাগুলি

বয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা যাবে—এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেও অধ্যাপক ব্ল্যাকেটকে শেষ অবধি সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, অন্তত একটি বোমারু বিমানও যদি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে তো তার হাইড্রোজেন বোমার আঘাতেই ভয়াবহ ধ্বংস হবে এবং নিশ্চয়ই এটা দু পক্ষেই হবে।

আর আজ আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশগমনকারী শক্তিশালী রকেটে আমেরিকা-সোভিয়েটের মধ্যবর্তী দূরত্ব পার হতে পারে মাত্র কয়েক মিনিটে, এবং বলা বাহুল্য, সেই ক্ষেপণাস্ত্রের শীর্ষদেশে সুসজ্জিত থাকবে সুপার মেগাটন বোমা। এই অবস্থাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সময় পাওয়া যাবে মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়ে সামান্য বেশি সময়। অবশ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে কেবলমাত্র সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথাই এখানে বলা হচ্ছে, জনপদ ও জনসাধারণকে বাঁচানোর ব্যবস্থার চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র হবে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

এমত অবস্থায় মানবসভ্যতার আত্মনিধনের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অধ্যাপক ফ্লেমিং বাস্তববাদী হিসেবে তা বুঝেছেন। স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পর থেকেই তিনি বুঝেছেন যে, 'American Century'-রির কোনো আশা নেই, কাজেই "ভবিষ্যৎ" (the future) নামে পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদের একেবারে শুরুতেই বলছেন : "That the coming era will not be 'the American Century' seems to be already decided." (পৃঃ ১০৭৫)।

আজকের পৃথিবীতে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক যতগুলি সমস্যা আছে, যেমন বার্লিন, কোরিয়া, লাওস, ইত্যাদি, সেগুলি একের পর এক আলোচনা ও সমাধানের রাস্তা বাৎলে (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তি বজায় রাখবার দিক থেকে) দিয়ে তিনি লিখছেন :

"Antagonistic coexistence is a welcome advance from the white heat of the cold war. It is a carefully reasoned and moderately stated position, but the question remains whether it is more than a transitional program toward a more friendly

coexistence. It was an excess of antagonism which lost us the cold war." (পৃঃ ১১০৫)।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করতে হলে চাই সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ এবং অবিলম্বে অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ। অধ্যাপক ফ্লেমিং-এর সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও বলতে পারি :

"We have reached the point in the words of Noel-Baker's informed warning, where the politics misnamed defence may bring the final consummation of the use of force, the end of man. This is the fate for which we are all lived up, attempting to defend the undefendable and to be always ready to destroy the enemy totally. Nothing less than a sweeping world disarmament treaty can restore the safety of mankind and this will never be achieved unless we constantly remember that the the romanticists are those who still believe that modern armaments can make a nation safe.' It will not be achieved either without the powerful compulsion of public opinion and without resolute leadership." (পৃঃ ১১১৩)।

সুজয় মিত্র

সমাজবাদ ও যুদ্ধ

বেশ কয়েক বছর ধরে চীনা নেতারা যুগোশ্লাভিয়াকে "আধুনিক শোধনবাদের" কেন্দ্র বলে অভিহিত করে তীব্র রাজনৈতিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম প্রথম এই অভিযানে বিশ্বের প্রগতিশীল মহল বিশেষ বিচলিত হন নি, কারণ যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে একটা সন্দেহের ভাব অনেকের মধ্যে বহুদিন থেকে ছিল। বোধহয় সেই কারণেই যুগোশ্লাভিয়াতে টিটোর পরেই যাঁর স্থান, সেই এড্ওয়ার্ড্ কার্দেলি লিখিত 'সমাজবাদ ও যুদ্ধ' নামক বইটি প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের দেশে অন্তত বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

১৯৬০-এর তুলনায় আজ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কার্দেলির একটি কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে—চীনাদের কাছে যুগোশ্লাভিয়া ছিল উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁদের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য হল গোটা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আন্তর্জাতিক নীতির সংশোধন। চীনের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে যাঁরাই একমত হতে পারছেন না, আজ তাঁদেরই বলা হচ্ছে শোধনবাদী। স্বাভাবিক ভাবেই এই অবস্থায় যুগোশ্লাভিয়ার নেতাদের বক্তব্য কি, ছুৎমার্গ পরিহার করে তা জানবার ইচ্ছা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে দেখা দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা কার্দেলির লেখার মধ্যে হয়তো সত্যই কিছু শোধনবাদের আভাস খুঁজে পাবেন, তাঁর প্রত্যেক যুক্তির সঙ্গে নিশ্চয়ই সকলে একমত হবেন না। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে যুদ্ধরোধের সম্ভাবনা, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন পথ, ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে চীনা নীতির এত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা একটি লেখার মধ্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য যুগোশ্লাভিয়ার নেতার পক্ষে একটা

Socialisn and War : Edvard Kardelj (August 1860). Indian Edition, Hans Publishers, Bombay (1961)

সুবিধা আছে—কূটনৈতিক কারণে চীনকে আলবেনিয়া বলে ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর কৌশল তাঁকে গ্রহণ করতে হয় নি। পরবর্তী ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্দেলির যুক্তিকে আরো শক্তিশালী করেছে, নাকচ করেনি। চীনা নীতির বাস্তব প্রতিক্রিয়া, আর মার্কস্-এঙ্গেল্স্-লেনিনের বক্তব্যের সঙ্গে তার বিরাট প্রভেদ, এই দুই দিক থেকে আলোচনা করে কার্দেলি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যে চীনের বর্তমান নেতৃত্বকে শুধু গোঁড়ামি বা মতান্ধতার জন্য অভিযুক্ত করলে সবটা বলা হয় না। কয়েকটি মৌলিক ক্ষেত্রে তাঁরা মার্কস্‌বাদের ধ্রুপদী নীতি থেকে পর্যন্ত বিচ্যুত হয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কার্দেলি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান অবদানের কথা, আশা প্রকাশ করেছেন যে শীঘ্র হোক বা কিছু দেরিতে হোক, চীনের জনগণ ও পার্টি তাঁদের ভুল শুধরে নেবার ক্ষমতা নিজেদের মধ্যেই খুঁজে পাবেন। চীনকে কোনঠাসা করে রাখবার পশ্চিমী নীতির কঠোর সমালোচনাও তিনি করেছেন। মনে রাখতে হবে চীনা সংবাদপত্রে যুগোশ্লাভিয়ার নেতাদের অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইত্যাদি বলে হামেশাই বর্ণনা করা হয়। তাই কার্দেলির সংযম ও ভদ্রতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। গালাগালি অপেক্ষা যুক্তিতর্কই তাঁর অস্ত্র, প্রকৃত মার্কস্‌বাদীর মতো তিনি চীনা বিচ্যুতির কারণ খুঁজবার চেষ্টা করেছেন সে দেশের বাস্তব অবস্থার মধ্যে। সব মিলিয়ে বইটির বহুল প্রচার নিশ্চয়ই কাম্য—অবশ্য ইংরাজি অনুবাদটি আর একটু ভালো ও সুখপাঠ্য হলে সুবিধা হত।

যুগোশ্লাভিয়ার (আর আজ বিশ্বের বেশির ভাগ কমিউনিস্ট পার্টির) বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগ কি? সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধকে তাঁরা ভয় পান তাই যুদ্ধ যে অনিবার্য সেই লেনিনীয় নীতি পরিত্যাগ করে তাঁরা নতজানু হয়ে আমেরিকার কাছে শান্তি ভিক্ষা করছেন। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ও সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৌঁছুবার কথা বলে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম থেকে দূরে চলে আসছেন, মার্কসবাদ সংশোধন করছেন। চীনা নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরাই একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী—বাকীরা সুবিধাবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছেন। তিন বছর পরে আজ ভাষার আরো কিছু উন্নতি হয়েছে—এখন

তাই সরবে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর কমিউনিস্ট নেতাদের একটা বড় অংশ "ইঁদুরের মতো ভীতু"।

লেনিন থেকে কিছু উধ্বৃতি দিয়ে চীনের নেতারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন; যে যুদ্ধ আজও অনিবার্য, কারণ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র তো বদলায় নি। সাম্রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবার আগে যুদ্ধবিহীন অস্ত্রবর্জিত পৃথিবী স্থাপনের আশা তাই অলীক ভাববিলাস মাত্র। কিন্তু লেনিন তো শুধু একটা ফতোয়া জারি করেন নি, পঞ্চাশ বছর আগেকার পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করেই তিনি দেখিয়েছিলেন, যে শান্তির শক্তি সেদিন ছিল আপেক্ষিকভাবে দুর্বল, তাই যুদ্ধের দিকে সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক ঝোঁক পরাস্ত করা ছিল কঠিন। আজকের দিনের অবস্থা সম্যক পর্যালোচনা না করে শুধু লেনিনের সে যুগের সিদ্ধান্তটুকু তুলে ধরার অর্থ কি? বাস্তব পর্যালোচনা বাদ দিয়ে মন্ত্র আওড়ানো কি প্রকৃত লেনিনবাদ?

কার্দেলির মতে, যুদ্ধ অনিবার্য এ তত্ত্ব আজ আঁকড়ে ধরার পেছনে দুই ধরনের কারণ থাকতে পারে। হতে পারে চীনের নেতারা আমাদের যুগের নতুন সম্ভাবনাকে সত্যিই বুঝছেন না, যে-যুগে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধমান পরাক্রম, সদ্যস্বাধীন জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির নীতি, বিশ্বজোড়া শান্তি আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি ও সংগ্রাম, সব মিলিয়ে যুদ্ধের পথে এক প্রবল বাধা সৃষ্টি করছে, আবার অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমেই হয়ে পড়ছে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। অথচ এই চীনারাই বলেন, যে সাম্রাজ্যবাদ হল "কাগুজে বাঘ" মাত্র! তর্কের মধ্যে অসংগতিটা লক্ষণীয়। পারমাণবিক যুগে যুদ্ধের প্রকৃতির যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যার ফলে সামরিক টেক্নিক্ই এক হিসেবে যুদ্ধের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, এ কথা মানতে বাধা কোথায়? উধ্বৃতি সহকারে কার্দেলি দেখিয়েছেন, যে মার্কসের মতে ১৮৭০-এর পর ইওরোপে আপেক্ষিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা কারণ ছিল নতুন সামরিক টেকনিক, যার ফলে যুদ্ধের ঝুঁকি কিছুদিন সহজে কেউ নিতে চাইছিল না। [পৃঃ ৪১]

কিন্তু চীনা মতবাদের অপর একটি ভিত্তি থাকতে পারে, যা বোধহয় আরো সাংঘাতিক। চীনের নেতারা কি ভাবছেন, যে যুদ্ধই হল সমাজবাদের বিপ্লবী অস্ত্র, বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই সব থেকে সহজে ও তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্যতন্ত্রকে ধ্বংস করে সুখি পৃথিবী গঠন করা যাবে? কোনো কোনো চীনা লেখা পড়লে সে রকম ধারণাই তো হয়। পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ চরিত্রের কথা বললে

চীনারা প্রতিবাদ করেন—"সাম্রাজ্যবাদীরা পারমাণবিক যুদ্ধ আরম্ভ করলে তাদেরই অতিদ্রুত পতন হবে, মানবজাতি কখনই ধ্বংস হবে না…মৃত সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর বিজয়ী জনসাধারণ খুবই তাড়াতাড়ি হাজারগুণ উন্নত এক সভ্যতা গড়ে তুলবে…।" ['লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক,' এপ্রিল ১৯৬০] সঙ্গে সঙ্গে চীনারা বলেন, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান একটা সাময়িক কৌশল মাত্র, সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতি নয়। কিন্তু কার্দেলি ঠিকই লিখেছেন, নিছক সাময়িক সহঅবস্থানের জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই, তা তো আপনা থেকেই এখনো রয়েছে। প্রশ্ন হল, সহঅবস্থানকে মৌলিক নীতি বলে গ্রহণ করে আমরা কি কার্যক্ষেত্রে সমস্ত সম্ভবপর উপায়ে যুদ্ধ আটকানোর চেষ্টা করব, নাকি 'যুদ্ধ হলেও ক্ষতি নেই' এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপস-প্রস্তাব মাত্র অগ্রাহ্য করে পৃথিবীকে যুদ্ধের কিনারায় ফেলে রাখব? দ্বিতীয় পন্থাটির সঙ্গে ডালেস নীতির পার্থক্য কোথায়?

কার্দেলি বলেছেন, যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্বও অনেক বেড়ে যাচ্ছে, তাদের উপরে সমগ্র বিশ্বের ভাগ্য, মানব সমাজের ভবিষ্যৎ, এখন অনেকটা নির্ভর করছে। এই অবস্থায় চীনা নীতি, সজ্ঞানে না হলেও বাস্তব পরিণামে, পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাবে? ১৯৬০-এর পরের তিন বছরের চীনা লেখা এবং কাজ এই প্রশ্নের উত্তরকে আরো স্পষ্ট, আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তাঁদের সর্বাধুনিক কিছু লেখায় [যথা—'কমরেড তোগলিয়াত্তির সহিত আমাদের মতপার্থক্য'—ডিসেম্বর ১৯৬২] চীনারা স্বীকার করেছেন যে বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা সম্ভব, কিন্তু শান্তি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে তাদের মতটি এখনও যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। আপসহীন সংগ্রাম, "আঘাতের বদলে আঘাত", "মুখোমুখি সংঘর্ষ" ("blow for blow", "head-on clash")—এ রকম কথার ছড়াছড়ি তাদের রচনায়। কার্যক্ষেত্রে এ-সবের অর্থ তো ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে বেশ ভালো করে বোঝা গেছে। আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে আগুন লেগে গেলে দাম দিতে হয় অবশ্য তত্ত্ববিদদের নয়, অসংখ্য জনসাধারণকে। লক্ষ্যসিদ্ধির অন্য পথ আদৌ থাকলে যুদ্ধের পথে পা বাড়ানো মূঢ়তা ছাড়া আর কি।

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ দেশজয় করে গায়ের জোরে বিপ্লব রপ্তানি করা—চীনা তর্কগুলি যে তাদের নিজস্ব লজিকে এই বক্তব্যে গিয়ে পৌঁছয়, এই সিদ্ধান্ত আরো দুটি তত্ত্ব আলোচনা

করে কার্দেলি প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। চীনের নেতাদের একটি অভিযোগ হল, ঢালাওভাবে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে "আধুনিক শোধনবাদীরা" ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্যের মার্কসবাদী তত্ত্বটি অস্বীকার করছেন। তাঁরা অন্যায় যুদ্ধের বিপক্ষে, কিন্তু ন্যায়যুদ্ধ সমর্থন করেন। প্রথম দৃষ্টিতে বিশেষ আপত্তিকর না হলেও এই তর্কের মধ্যে ত্রুটি গলদ আছে। প্রথমত, সমাজতন্ত্র আক্রান্ত হলে তার রক্ষার জন্য যুদ্ধের ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোনো মার্কসবাদীর মনে সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোনো যুদ্ধ ন্যায্য বলেই কি সেটা কাম্য, বিশেষ করে আজকের দিনে, সভ্যতাধ্বংসকারী পারমাণবিক অস্ত্রের যুগেও? বরং যুদ্ধ আটকানোর সাধ্যমত চেষ্টা করাই কি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রাথমিক কর্তব্য নয়? দ্বিতীয়ত, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে একটি অন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ করা কি তত্ত্বগত দিক থেকে একেবারে অসম্ভব? কার্দেলির এই প্রশ্ন আজকের দিনে আমাদের দেশে ভবিষ্যৎবাণীর মতো শোনায়। সকলেরই জানা আছে, সমাজতান্ত্রিক দেশ কখনো কোনো অবস্থাতেই আক্রমণকারী হতে পারে না, এই অন্ধবিশ্বাস ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে কি পরিমাণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্রের পক্ষে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, এই সত্যটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত টানার কি কোনো যৌক্তিকতা ছিল, যে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতারা একটি বিশেষ সময় এমন একটা ভুল করতে পারেন না? সমাজবাদী নেতারা কি কোনো ব্যাপারে কখনও ভুল করেন নি? বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ লেনিনের মনে এধরনের মোহ কোনোদিন স্থান পায়নি—"সামাজিক বিপ্লব করে ফেললেই প্রলেটারিয়েট দুর্বলতা বা ভুলের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে না। তবে শেষ পর্যন্ত নিজের ভুলই (আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ঘাড়ে চাপার ব্যর্থ চেষ্টা) তাকে সত্য পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। [কার্দেলি কর্তৃক উধৃত, পৃঃ ৭৭]

"আধুনিক শোধনবাদের" বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়ে, পার্লামেণ্টকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে, সমাজতন্ত্রে পৌছানোর সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু চীনাদের মতে বিপ্লবের অর্থই হল "বিপ্লবী যুদ্ধ", শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সম্ভাবনা এতই কম যে সে-বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহঅবস্থান, আর দেশের ভিতরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা,

ছুটোই হল "আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রাম" পরিত্যাগ করার নামান্তর। অথচ একথা সুবিদিত যে, বিপ্লবের রূপ সব দেশে সব কালে এক হয় না (যেমন বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া বিপ্লবের ইতিহাসে ফ্রান্সের মতো তীব্র সংগ্রাম আমরা আর কোথাও দেখি না)। আর অবস্থাবিশেষে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের সম্ভাবনা স্বয়ং মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন কেউই তো একেবারে নাকচ করেন নি। সমাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনা অন্তত কোনো কোনো দেশে বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে পারে না কি? যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের সঙ্গে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্যাকে চীনারা যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই "শোধনবাদের" বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র অভিযান তাঁরা আরম্ভ করেছেন, কার্দেলির মতে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রশ্ন জাগে, "আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রাম", যার থেকেই নাকি "শোধনবাদীরা" বিচ্যুত হয়েছেন, এই কথাটি বলতে চীনারা ঠিক কি বুঝছেন? এর অর্থ কি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক চূড়ান্ত শক্তি-মীমাংসা (অর্থাৎ যুদ্ধের) জন্য প্রস্তুত হওয়া, যার অংশরূপে প্রত্যেক দেশে সশস্ত্র বিপ্লব দেখা দিতে বাধ্য?

চীনা লেখায় তাহলে বিশ্বযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রের বিশ্বজয়, সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর, সব কিছু এক করে দেখা হচ্ছে। মার্কসবাদের প্রামাণ্য সাহিত্য থেকে বিস্তর উধৃতি দিয়ে কার্দেলি প্রমাণ করেছেন যে, এই ধরনের অতি-বাম মতবাদের তীব্র সমালোচনা আগে বহুবার করা হয়েছে। চীনের নীতি তাই শুধু মতান্ধতার দোষে দোষী নয়, ট্রটস্কিবাদের মতো তা মার্কসতত্ত্ব থেকে গুরুতর এক বিচ্যুতি। এখানে লেনিনের ছুটি স্বল্প-পরিচিত উধৃতি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করা গেল না। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, অথচ পড়লে মনে হয় লেখাগুলি যেন আজকের দিনের চীনা নীতি ও তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যেই লিখিত।

"এই লেখকেরা বোধহয় মনে করেন, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনোমতেই শান্তি স্থাপন করা উচিত নয়।...এ মত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।...এঁরা বুঝি ভাবেন, আন্তর্জাতিক বিপ্লবকে বাইরে থেকে খুঁচিয়ে তোলা দরকার, আর খোঁচানোর উপায় সর্বদাই যুদ্ধ, কোনোমতেই শান্তি নয়, কারণ শান্তি স্থাপিত হলে জনসাধারণের মনে সাম্রাজ্যবাদকে 'আইনসম্মত' করে তোলা হবে? এ রকম কোনো থিওরি মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্কসবাদ বিপ্লবকে খুঁচিয়ে তোলার বিরুদ্ধে, কারণ শ্রেণী-

সংঘাত একটা পর্যায়ে না পৌঁছলে বিপ্লব সম্ভব নয়। এ যেন এমন এক থিওরি, যার মতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানই হল গিয়ে সর্ব অবস্থায় সংগ্রামের একমাত্র রূপ।" [কার্দেলি, পৃঃ ৫৬]

এস্টোনিয়ার সঙ্গে এক সীমান্ত-চুক্তির সমর্থনে লেনিন বলছেন—

"এই চুক্তিতে আমরা বেশ কিছু এলাকা ছেড়ে দিয়েছি, এমন সব এলাকা, যা জাতিগত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুযায়ী আমরা ত্যাগ করতে বাধ্য ছিলাম না। কিন্তু এইভাবে আমরা কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলাম যে, আমাদের কাছে সীমানার প্রশ্ন বড় কথা নয়। আমাদের কাছে বড় হল শান্তিপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিকাশের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। তাছাড়া এই নীতি দ্বারা আমরা শত্রুদেশেরও আস্থা অর্জন করতে পারলাম।" [কার্দেলি, পৃঃ ৫৪]

যথার্থ মার্কসবাদের সঙ্গে এই অসঙ্গতি ছাড়াও বাস্তব কার্যক্ষেত্রে চীনা নীতির পরিণাম কি ? প্রথমত বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাবৃদ্ধি—আর কার্দেলির মতে সে-যুদ্ধে পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের জয় হলেও বিশ্ব-অর্থনীতির এত প্রচণ্ড ক্ষতি হবে যে তার ভিত্তিতে উন্নত সমাজ-গঠন হাজার-গুণ কঠিন হয়ে উঠবে। কারণ মার্কসবাদের একেবারে গোড়ার কথা হল, সমাজতন্ত্র শুধু সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তার জন্য চাই উন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীনা নীতির বিষময় ফল। সহঅবস্থান নীতির জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষতি হয় নি—আন্তর্জাতিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হবার যুগেই আফ্রিকা ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল চূর্ণ করে দিচ্ছে, লাটিন আমেরিকায় দেখা দিয়েছে সমাজতন্ত্রের আলোকবর্তিকা। অথচ ঠিক একই সময়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সীমানা ইত্যাদি প্রশ্নে ঝগড়া খুঁচিয়ে তোলার ফলে এশিয়ার মানুষের মনে চীন সম্বন্ধে দেখা দিচ্ছে বীতশ্রদ্ধ ভাব, সন্দেহ, এমনকি ভয়।

চীনা নেতাদের মতে শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে দেওয়া। সামগ্রিক অস্ত্রবর্জন ইত্যাদি দাবির এর বেশি সার্থকতা নেই, সাম্রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার আগে তা কার্যকরী হতে পারে এমন কোনো আশা পোষণ করা হল গিয়ে বুর্জোয়া প্যাসিফিজম। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা একথা পরিষ্কার মনে রাখবে আর বলবে যে শান্তি

আন্দোলন তাদের কাছে শত্রুকে বেকায়দায় ফেলার একটা রাজনৈতিক কৌশল মাত্র, আসলে যুদ্ধ অনিবার্য। তার পরেও অবশ্য বাইরের লোকে ভেড়ার মতন দলে দলে তাদের আন্দোলন সমর্থন করবে! কার্দেলি আরো প্রশ্ন তুলেছেন, পশ্চিমী দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের গুরুত্বের বিষয়ে চীনারা অনেক কিছু বললেও সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে তাদের ধারণা কি অনেকটাই মনগড়া নয়? শ্রমিকেরা সর্বদাই বিপ্লব করতে ইচ্ছুক, বিশ্বযুদ্ধ হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করে দেবেন—এসব কথা ভাবতে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীর উপর কমিউনিস্টদের তুলনায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রভাব কিছু কম নয়, এবং শ্রমিকশ্রেণীর অন্তত একটা বিরাট অংশ মোটেই পারমাণবিক ধ্বংসের ঝুঁকি নিয়ে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত নয়। উগ্রবিপ্লবী বাক্যবাণ বা গালাগালি তাঁদের শুধু আরো দূরে সরিয়ে দেবে—বরং শান্তি-আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই শ্রমিকদের ক্রমশ সমাজতন্ত্রের দিকে টেনে আনতে পারে। শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য মোটেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নয়, কার্যকরী দাবির পিছনে পৃথিবীর জনসাধারণের বিরাট অংশকে সমবেত করে পদে পদে সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হটিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। তাই শান্তি আন্দোলন আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামেরই একটি অংশ, দু-এর মধ্যে চীনে-দেওয়াল সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যদানের কোনো আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার কথা উঠলেই চীনা নেতারা তাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রী মূলধন রপ্তানি বলে উড়িয়ে দেন। সে ভয় যে আছে তা কার্দেলি স্বীকার করেছেন, কিন্তু কথা হল আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা পশ্চিমী দেশকেও সাহায্যের শর্ত কিছুটা পরিবর্তিত করতে বাধ্য করছে। তাই পশ্চিমী সাহায্য নিলেই কোনো দেশ তৎক্ষণাৎ তাঁবেদার হয়ে যায় না, সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের আকর্ষণ ভারসাম্য বজায় রাখে। উগ্র বামপন্থীদের মনে বোধহয় আর একটি ভয় আছে—অর্থনৈতিক কিছু উন্নতি হলে যদি জনসাধারণের বিপ্লবী মনোভাব নষ্ট হয়ে যায়! (আমাদের দেশে এ-ধরনের চিন্তার নিদর্শন বেশ সহজেই মেলে না কি? একে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবীতত্ত্ব বলা অন্যায় হবে না।) ইতিহাসে বিপ্লব কিন্তু দুর্দশার যান্ত্রিক প্রতিফলন নয়, আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য চাই সংগঠিত আধুনিক শ্রমিক-শ্রেণী—

তাই বৈদেশিক সাহায্যলাভের ফলে যদি সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি পুরনো ধরনের পুঁজিবাদের দিকেও অগ্রসর হয়, পিছিয়ে-পড়ে থাকার চেয়ে তাও শ্রেয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের ফলে আজ অনগ্রসর দেশে অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক শিবির যদি সাহায্য বন্ধ করে দেয়, সদ্য-স্বাধীন দেশের জাতীয় বুর্জোয়াকে একেবারে শত্রু বলে গণ্য করে, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাদের নিজের দলে টেনে নেওয়া বিশেষ কঠিন হবে না।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাহলে দেখা যাচ্ছে, উগ্রবামপন্থী বাগাড়ম্বরের ফল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, কার্যক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া—এবং এ-অবস্থা থেকে সুবিধাবাদী কার্যক্রমে পৌছতে অনেক সময়ে বেশি দেরি হয় না। কার্দেলির বই বেরোবার কিছুদিন পরে এর উদাহরণ আমরা পেলাম চীন-পাকিস্তান মৈত্রীতে। অথচ এই ভ্রান্ত নীতিই চীনা নেতারা চাপানোর চেষ্টা করছেন সমগ্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর।

ঐতিহাসিক কারণে যুগোশ্লোভিয়া কমিউনিস্ট আন্দোলনে কোনো একটি দেশ, পার্টি বা নেতার আধিপত্য (hegemony) বিস্তারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে খুবই—হয়তো কিঞ্চিৎ অতিমাত্রাতেই—সচেতন। বিরাট পৃথিবী-জোড়া আন্দোলনের যে আজ আর এক বা একাধিক কেন্দ্র থাকতে পারে না, মার্কসবাদের মূলনীতির কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রত্যেক পার্টিকে যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজ অবস্থা অনুযায়ী নিজের মতো চিন্তা করতে হবে, কোনো রকম গুরুবাদ (সে মস্কো বা পিকিং—যেখান থেকেই আসুক না কেন) যে আজ অচল—এই ধরনের চিন্তা আজ অনেক দেশের মার্কসবাদীদের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। কার্দেলির পুস্তকেরও এই হল একটি প্রধান বক্তব্য।

চীনা নীতির সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সে-নীতির বাস্তব কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কার্দেলি করেছেন। এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো বোধহয় সম্ভব নয়, তবে কার্দেলির বক্তব্যগুলি নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর বইয়ের গোড়াতেই [পৃঃ ১১] কার্দেলি মন্তব্য করেছেন, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে গুরুতর বিচ্যুতি ঘটলে প্রগতিশীল মহলে অনেক সময়ে দুই ধরনের ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হয় চেষ্টা চলে বুর্জোয়া অপপ্রচার বলে সব কিছু উড়িয়ে দেবার, অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরা হয় এমন সব 'যুক্তি'-কে,

যে সমাজতান্ত্রিক দেশে কখনও অত্যাচার থাকতে পারে না, সমাজতান্ত্রিক দেশ কিছুতেই আক্রমণকারী হতে পারে না, ইত্যাদি। যখন বাস্তবকে অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন আবার এক লাফে অন্য প্রান্তে চলে গিয়ে অনেকে বলতে শুরু করেন, দেশটা আদৌ সমাজতান্ত্রিক নয়, কিংবা হয়তো মার্কসবাদের মধ্যেই কোথাও গলদ আছে। উভয় ভুলের সূত্র কিন্তু একই—সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে অতি-রোমান্টিক এক ছবি, যেন বিপ্লবের পরদিন থেকেই নতুন সমাজ একেবারে দোষমুক্ত হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। আসলে সমাজতন্ত্র কিন্তু বিমূর্ত আইডিয়া নয়, অত্যন্ত জটিল এক বাস্তব প্রক্রিয়া, যার মধ্যে আবার অন্তর্দ্বন্দ্ব ডায়েলেকটিক্‌স্-এর নিয়ম অনুযায়ীই না থেকে পারে না। স্রোতের গতি মোটামুটি ঠিক দিকে, কিন্তু পথে আবর্ত থাকতে পারে, জলটাও হতে পারে বেশ কিছুটা ঘোলাটে। সমাজতান্ত্রিক গঠনপর্বে পুরাতন সমাজের ভগ্নাবশেষ তো অনেক দিন পর্যন্ত বাধা দিতেই থাকে, তাছাড়া কার্দেলির মতে গঠনপ্রক্রিয়ার নিজস্ব কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে—যেমন পার্টি-নেতৃত্ব ও শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন একটা পর্যায়ে থাকলেও তার থেকে আমলাতান্ত্রিক বিচ্যুতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। [পৃঃ ১৩১-১৩২] সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে মতপার্থক্য অস্বাভাবিক বা সর্ব অবস্থায় ক্ষতিকরও নয়—কারণ প্রত্যেক দেশের নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার দ্বারা সেখানে মার্কসবাদী ইডিওলজি কতকটা প্রভাবিত হবেই। ঠিক সেই কারণে কোনো বিশেষ পার্টির একছত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা কার্দেলির মতে সৃজনশীল মার্কসবাদ আর সমাজতান্ত্রিক জগতের সজীবতার পক্ষে এত ক্ষতিকর। সমাজতন্ত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থান সম্বন্ধে কার্দেলির সমস্ত বক্তব্য মেনে না নিয়েও বলা যায়, যে এ বিষয়ে মার্কসীয় অনুসন্ধানের খুবই প্রয়োজন আছে। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এ নিয়ে আলোচনা ১৯৫৭ সালে মাও ৎসে-তুংই আরম্ভ করেছিলেন। শত পুষ্পের সঙ্গে সে ধারাও বুঝি আজ শুকিয়ে গেছে !

মার্কসীয় দর্শনের ভাষায় কার্দেলির মতে চীনা নেতারা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত পরিত্যাগ করে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণের উপরে স্থান দিচ্ছেন মনগড়া কল্পনাকে ; তাঁদের কাছে পৃথিবীটা পরিবর্তনবিহীন, বড় বেশি যান্ত্রিক, সব হয় শাদা নয় কালো। ডায়েলেকটিক্‌স্-এর কথা তুলে চীনারা মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন—বিপরীতের মধ্যে দ্বন্দ্বই যখন বড়

কথা, ঐক্যটা নেহাৎই আপেক্ষিক, তখন সহঅবস্থান ইত্যাদির কথা এত বলা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি নয় কি? কিন্তু কার্দেলি অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন [পৃঃ ৩৬-৩৯] যে এই তর্কে মার্কসীয় দর্শনের দু-ভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, ঐক্যের মধ্যেও বিরোধ চলতে থাকে, লেনিনের ভাষায় আপেক্ষিক আর চিরন্তনের তফাৎটাও আপেক্ষিক—তাই সহঅবস্থান বা শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের অর্থ শ্রেণী-সংগ্রাম পরিত্যাগ করা নয়। দ্বিতীয়ত, বিরোধ বা সংগ্রামের রূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হতে পারে, পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলিরও কিছু পরিবর্তন সংঘাতের ভিতর দিয়ে হতে থাকে গুণগত রূপান্তরের পূর্বেই। প্রকৃত শোধনবাদীরা অবশ্য নতুনের দোহাই দিয়ে মার্কসবাদকেই অচল ঘোষণা করেন—কিন্তু তাই বলে পরিবর্তনকে অস্বীকার করাও কি সৃজনশীল মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি নয়?

চীনের নেতাদের কেউ কেউ স্তালিনপন্থী বলে থাকেন, কিন্তু আসলে জ্ঞানত না হলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁদের নীতি মিলে যাচ্ছে বরং ট্রট্স্কিবাদের সঙ্গে, যার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৬০ সালে 'চতুর্থ আন্তর্জাতিক' নামক পত্রিকায় চীনের সপ্রশংস উল্লেখে। [কার্দেলি পৃঃ ৮৮-৮৯] স্তালিন নীতিগতভাবে কোনোদিন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের লেনিনীয় তত্ত্ব অস্বীকার করেন নি। কিন্তু একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়া অসম্ভব ট্রট্স্কির এই বিখ্যাত যুক্তির উল্টা পিঠ ছিল সহঅবস্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা, যুদ্ধ অনিবার্য ভেবে তার মধ্য দিয়ে 'বিশ্ববিপ্লব' ঘটানোর দুরাশা। ট্রট্স্কির নীতি জয়যুক্ত হলে দেখা দিত এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক 'বোনাপার্টিজম্'—বিপ্লব-রপ্তানি, দেশজয় করে সমাজতন্ত্র প্রসারের চেষ্টা। আজ অবশ্য এককভাবে সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন ঘটনার স্রোতে অবান্তর হয়ে গেছে, কিন্তু সহঅবস্থান চললে বিশ্ববিপ্লব বাধাপ্রাপ্ত হবে, চীনা এই যুক্তিকে নয়া-ট্রট্স্কিবাদ বললে কি খুব ভুল হয়?

চীনের বর্তমান নীতির বাস্তব সামাজিক ভিত্তি কি? বিশ্ব-পরিস্থিতি ও চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, এ দু-দিক থেকে কার্দেলি প্রশ্নটির জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, বিশ্বরাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য আজ ক্রমেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর থেকে স্থায়ী শান্তি ও নতুন উপায়ে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা ভাবাই হল স্থিরচিন্তার লক্ষণ। কিন্তু

অতিবিপ্লবীদের মনে হতে পারে—আমাদের যখন শক্তি বেশি, তখন এক ধাক্কায় 'ন্যায় যুদ্ধে' পুঁজিবাদকে চিরতরে ধ্বংস করে ফেললে হয় না? (অবশ্য এই ধরনের যুদ্ধকামনা কস্মিনকালে মার্কসের মনে আসেনি, কারণ তিনি ছিলেন মানবিকবাদের অকুণ্ঠ ধারক ও বাহক।) তাছাড়া স্বার্থান্বেষী নেতারা সমাজতন্ত্রের নতুন শক্তিকে সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারে ব্যবহৃত করবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। সমাজবাদকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে জাতিদম্ভ, রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা, অন্যের উপর সর্দারির প্রবৃত্তি।

অশুভ সম্ভাবনাগুলি চীনের ক্ষেত্রে বাস্তব রূপ গ্রহণ করল কেন, এই হল দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রচণ্ড সংগ্রাম, অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রধানত নিজেদের চেষ্টাতেই চীনে বিপ্লব জয়লাভ করেছে। সে দেশের নেতা, পার্টি, ও জনগণের মধ্যে তাই যথেষ্ট পরিমাণ আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অল্প সময়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যুগ-যুগান্তরের দারিদ্র্য দূর করার স্বাভাবিক ইচ্ছার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল চীনের বিপুল আয়তন ও অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ অর্থনীতি। এদিকে পশ্চিমী অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবরোধের ফলে চীনের সমস্যা বহুগুণ বেড়ে গেল। ফলে দেখা দিল সাব্‌জেক্‌টিভিজম্‌, অতিবিপ্লবী কার্যক্রম, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যার সব থেকে বিখ্যাত নিদর্শন গণ-কমিউন—সাময়িক ভাবে কিছু সার্থকতা থাকলেও কার্দেলির মতে একে সাম্যবাদের বীজ বলা হাস্যকর, কারণ উৎপাদনের বিপুল অগ্রগতি ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টনের নীতি মার্কসের মতে কার্যকরী হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে চীনা পার্টির গুণগুলি রূপান্তরিত হল দোষে, আত্মবিশ্বাস পরিণত হল অহঙ্কার ও জাত্যাভিমানে। অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে আজ এই পার্টির নেতারা ক্রমশই নয়া-ট্রট্‌স্কিবাদ ও বোনাপার্টিস্ট কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, রাশিয়াকে কোণঠাসা করে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় তাঁরা আজ মশগুল।

যুগোস্লাভিয়ার নিজস্ব যে সমস্ত বক্তব্য ও নীতি তাকে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে এতদিন কিছুটা বিচ্ছিন্ন রেখেছে, কার্দেলির বইয়ে তার উল্লেখ থাকলেও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নেই। আমাদের

আলোচনার পরিসর থেকেও তাই মোটামুটি এদিকটা বাদ দেওয়া গেল। তবে কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যায়। "সক্রিয় সহঅবস্থান" কথাটা যুগোশ্লাভ নেতারা খুব ব্যবহার করেন—চীনা অপব্যাখ্যার জবাব দিয়ে কার্দেলি বলছেন, "সক্রিয়" কথাটির অর্থ শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য যুগোশ্লাভিয়ার মতে শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নয়, আর তাঁদের এই নীতির সঙ্গে ক্রুশ্চেভ তোগলিয়াত্তি বা তোরেজের বক্তব্যের বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। [পৃঃ ৯০-৯৩] মৌলিক তফাৎ বিশেষ নেই, তবে অদূর ভবিষ্যতে দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতখানি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা যুগোশ্লাভ নেতারা সম্ভবপর মনে করছেন, তা যেন একটু বেশি আশাবাদী। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা নিশ্চয়ই ভোলা উচিত হবে না, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার মৌলিক বিরোধের তুলনায় এগুলিকে প্রায় এক পর্যায়ে ফেলা কিছুটা বাড়াবাড়ি নয় কি? [পৃঃ ১২৬] তৃতীয়ত, কার্দেলির মতে সমাজতান্ত্রিক দেশে শুধু আমলাতন্ত্র নয়, "রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদের" লক্ষণ অনেক সময়ে দেখা যায়। [পৃঃ ১৩১] বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর "রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদ", আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ—দু-এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? সর্বশেষে প্রশ্ন জাগে—সমাজতন্ত্রের ভিতরে প্রত্যেক দেশের বিকাশের স্বাধীনতা নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিপদ যতদিন আছে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে না কি? যুগোশ্লাভিয়া জোট-নিরপেক্ষ থাকায় সমাজতন্ত্রের হয়তো কিছু ক্ষতি হচ্ছে না; ১৯৪৮এর পর বিকল্প পথও তার বিশেষ ছিল না (মার্কিন শিবিরে যোগ দেওয়া ছাড়া)—কিন্তু অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে জোটবদ্ধ হয়ে থাকা আত্মরক্ষার জন্যই আজও প্রয়োজনীয়।

যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে কিছু মতপার্থক্য থেকে গেলেও, ঠিক আজকের দিনে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল আন্দোলনে (এবং আমাদের দেশে তো বটেই) "প্রধান বিপদ" যে মতান্ধতা ও নয়া-ট্রট্স্কিবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুব অল্প। এই প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড কার্দেলির বইখানি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং কিছুটা ইতিমধ্যেই করেছে। সামাজিক অগ্রগতির সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকমাত্রের তাই এ-বই সযত্নে পড়ে দেখা উচিত।

অমল দাশগুপ্ত

আইনস্টাইন ও শান্তি

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ ও পরবর্তীকালে দার্শনিক ও মানবপ্রেমিক আলবার্ট আইনস্টাইনের সকল বাক্য ও কর্মের অনুপ্রেরণা ছিল যুদ্ধ-বিরোধিতা। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান শান্তিবাদী। এজন্যে প্রায়শই তাঁকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেয়ে শান্তির সপক্ষে দায়িত্বপালনকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে প্রায় একই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধবিরোধী ঘোষণা ও জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রচার। তার পরের চল্লিশটি বছরেও তাঁর অক্লান্ত তৎপরতা সমভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তেমনি যুদ্ধ-বিরোধিতায়। বিজ্ঞানী ও মানবপ্রেমিকের এমন সমন্বয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁর জীবনটি শুধু বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্যেই স্মরণীয় নয়, পৃথিবীকে যুদ্ধহীন করবার জন্যে অনলস সক্রিয়তার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত হিসেবেও অনুকরণীয়। অকৃত্রিম যুদ্ধ-বিরোধিতায় এক সময়ে তিনি এমনকি অস্ত্রসজ্জার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে নিজের হাতে চিঠি লিখে পারমাণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তিকে মানুষের আয়ত্তাধীন আনার প্রচেষ্টাকে আনুকূল্য করেছিলেন। এজন্যে তাঁকে কম নিন্দা ও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়নি। অন্য দিকে, জাতিবিদ্বেষ, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাত্যাভিমানকে তিনি সর্বক্ষেত্রে তীব্রতম ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তাঁর আন্তর্জাতিকতা ছিল অতিমাত্রায় উদার আর এই উদার আন্তর্জাতিকতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি রচনা করেছিলেন এক সর্বব্যাপ্ত বিশ্ব-সরকারের পরিকল্পনা। তাঁর এই

Einstein on Peace—Edited by Otto Nathan and Heinz Norden. Simon and Schuster, New York, 1960, $8.50.

আইনস্টাইন : জীবন-জিজ্ঞাসা—সংকলক ও অনুবাদক : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি। জানুয়ারি, ১৯৬৩। আট টাকা।

সমস্ত বাক্য ও কর্মের জন্যে এমনকি বন্ধুভাবাপন্ন মহলের অপ্রত্যাশিত বিরূপতা ও আক্রমণও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে তিনি প্রতিটি বিরূপতার মূল উৎপাটিত করেছিলেন, প্রতিটি আক্রমণকে জয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতো একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে বিজ্ঞান-বহির্ভূত বিষয়ে এতখানি সময় দেওয়া প্রায় আত্মদানের সমতুল্য। সম্প্রতি বর্তমান শতাব্দীর এই মহত্তম আত্মদানের খণ্ড খণ্ড পর্বগুলোকে একসূত্রে গেঁথে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে। বর্তমান যুগকে উপলব্ধি করার জন্যে এই দুটি গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

'আইনস্টাইন অন পীস' গ্রন্থটি সুবৃহৎ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০৪। গ্রন্থটি শুরু হয়েছে আইনস্টাইনের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, ১৯১৪ সালে, যখন তিনি সুইজারল্যাণ্ড ত্যাগ করে এসে বার্লিনে বসবাস শুরু করেছিলেন। গ্রন্থটি শেষ হয়েছে ১৯৫৫ সালে আইনস্টাইনের শেষ অসমাপ্ত রচনার (ইস্রায়েলের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভাষণ) প্রতিলিপি দিয়ে। মাঝখানের পৃষ্ঠাগুলোতে রয়েছে আইনস্টাইনের যুদ্ধবিরোধিতার ও শান্তিপ্রচেষ্টার বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। আর তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাতায়াত করেছেন পৃথিবীর এই চল্লিশ বছরের ইতিহাসের অজস্র স্বনামধন্য ব্যক্তি, যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর ঘটনা-রূপায়ণে যাঁদের অনিবার্য প্রভাব কোনো-না-কোনো ভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন সুবিখ্যাত বার্ট্রাণ্ড রাসেল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন: "আইনস্টাইন শুধু যে তাঁর যুগের সবচেয়ে কৃতী বিজ্ঞানী ছিলেন তাই নয়—উপরন্তু ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। অর্থাৎ বিজ্ঞানী হওয়া ছাড়াও অন্য কিছু। রাষ্ট্রনেতারা যদি তাঁর কথা শুনে চলতেন তাহলে পৃথিবীর মানুষের জীবনে দুর্যোগের মাত্রা আরো অনেক কম হতে পারত।"

আইনস্টাইন সম্পর্কে এই অন্যতর স্বীকৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিজ্ঞানী তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছুও। সম্পাদকের ভূমিকা থেকে উধৃতি দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই।

"আইনস্টাইন জানতেন তিনি কতখানি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজে এ-ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না এবং মনে মনে ভাবতেন যে এতখানি সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে তাঁর নিজের যতোই অস্বস্তি থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে এও তিনি বুঝতে পারতেন যে সমাজে ও বিশ্বে তাঁর এই অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে এবং সমগ্রভাবে

সমাজের পক্ষে কাজ করবার বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। এই কারণে, যখনই তাঁর মনে হত যে তিনি যদি চেষ্টা করেন বা প্রভাব বিস্তার করেন তাহলে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে—তখনই তৎপর না হয়ে পারতেন না। এ-বিষয়ে তাঁর গভীর দায়িত্ববোধ ছিল। এজন্যে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটলেও তিনি নিরস্ত হতেন না, যদিও অন্য যে-কাজেই ব্যস্ত থাকুন না কেন তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকত বৈজ্ঞানিক বিষয়। ব্যক্তির জন্যে ও সমাজের জন্যে সময় ও উদ্যোগ ব্যয় করতে তিনি ছিলেন সতত প্রস্তুত। লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, রিপোর্ট ও বক্তৃতা পড়া, বিবৃতি ও বক্তৃতা তৈরি করা, বা অন্য যে-কোনো ভাবেই হোক কাজে লাগতে পারা—এতে তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না। বা কখনো বিচার করতে বসতেন না যে যাঁর জন্যে তাঁকে সময় ব্যয় করতে হচ্ছে তিনি মস্ত পণ্ডিত ও সুবিখ্যাত ব্যক্তি, না, একেবারেই অজ্ঞাত অখ্যাত? যে ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন, তিনি যতো নিচুতলারই হোন, সহৃদয়সংবেদনার সঙ্গে তিনি অবিলম্বে তৎপর হয়ে উঠতেন।

যে-সব দায়িত্বপালনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করতেন তার সবগুলিই ছিল জরুরি, সবগুলিই আশু কর্তব্য। যেমন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইহুদীসমস্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, অধিকতর ফলপ্রসূ ও সার্থকতামণ্ডিত জীবনের জন্যে সাধারণ শিক্ষা। কিন্তু যতই সময় পার হয় ততই যুদ্ধকে লোপ করার সংগ্রামটাই আইনস্টাইনের কাছে সবচেয়ে জরুরি বলে মনে হতে থাকে। তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে যে-সব মস্ত মস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে তাঁর অবদান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য, সেগুলো তাঁর জীবনকালের মধ্যেই নিয়োজিত হয়েছিল মানুষের জীবনধারণের মানকে আরো উন্নত করে তোলার জন্যে নয়, সন্ত্রাস ও ধ্বংসের উপায়গুলিকে আরো পরিবর্ধিত করার জন্যে। আইনস্টাইনের জীবনের শেষ কয়েকটি বছরে সামরিক প্রস্তুতি হয়ে উঠেছিল বহুগুণ তীব্র আর বিশ্বশান্তি ক্রমেই সংকটাপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ক্রমেই হয়ে উঠেছিল দুরূহ ব্যাপার। শান্তির পক্ষ নিয়ে কথা বলাকেই মনে করা হত দেশদ্রোহিতা আর তার ফলে ভোগ করতে হত রাজনৈতিক নির্যাতন। শান্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা যতই কমেছিল ততই আইনস্টাইন অনুভব করেছিলেন ক্রমবর্ধমান একাকীত্ব। বিশেষ করে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিষ্ক্রিয়তা

আর জাতীয়তাবাদী প্রচারে যারা বিভ্রান্ত তাদের অজ্ঞতা আইনস্টাইনকে দুঃখিত করেছিল। যখন তিনি দেখতেন, যুদ্ধপ্রস্তুতি বা পারমাণবিক অস্ত্রধারীদের নিছক উন্মত্ততার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ নেই তখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠতেন। কিন্তু কোনো সময়েই সত্যিকারের হতাশ হন নি। আমার মনে হয়, তিনি যে হতাশ হতেন না তার কারণ মানুষের ন্যায়বোধের উপরে তাঁর আস্থা অটুট ছিল। তিনি মনে করতেন, অবিসম্বাদী সাফল্যে ও কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল একদল মানুষ যদি বিশ্বের বিবেকের উদ্দেশে আবেদন জানান তাহলে সেই আবেদন ব্যর্থ হবার নয়। এই কারণেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি মানবতাকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, ঘনায়মান সর্বনাশের বিপুলতা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন মানুষকে। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে।...এইটিই ছিল আইনস্টাইনের শেষ প্রয়াস।”

সম্পাদকীয় ভূমিকায় অতঃপর বলা হয়েছে যে আইনস্টাইনের শান্তি-বিষয়ক রচনাগুলিকে একত্রিত করে তাঁরা আইনস্টাইনের উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। আস্থা রেখেছেন মানুষের ন্যায়বোধে। আশা প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীর শান্তি বজায় রাখার জন্যে পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটির উদ্বেগ ও উদ্যোগ মানুষকে বিচলিত, অনুপ্রাণিত ও কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করবে। এই আশা নিয়েই সম্পাদকদ্বয়ের এই বিপুল প্রয়াস—১৯১৫ থেকে ১৯৫৫ এই চল্লিশ বছরে আইনস্টাইনের শান্তি-প্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণ। বলা বাহুল্য, এজন্যে প্রচুর পরিশ্রম ও অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়েছিল। সম্পাদকদ্বয় উভয়তই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

॥ দুই ॥

আইনস্টাইনের যুদ্ধ-বিরোধিতার কর্মকাণ্ডে চারটি পর্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। (১) ১৯১৫ থেকে ১৯৩৩—অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে জার্মানিতে ফ্যাশিবাদের উদ্ভব পর্যন্ত, (২) ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯—জার্মানিতে ফ্যাশিবাদের উদ্ভব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ, (৩) ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে শেষ, এবং (৪) ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে আইনস্টাইনের মৃত্যু (১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে। যুদ্ধের গোড়ার

দিকে সামরিক সুবিধালাভের জন্যে জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতাকে অমান্য করে বসে। জার্মান সংস্কৃতির বাণীর সঙ্গে জার্মান বাহিনীর কার্যকলাপের এই অসঙ্গতির দৃষ্টান্তে সারা পৃথিবীতে প্রবল একটি বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়। এমন কি তৎকালীন জার্মান গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে প্রচারিত হয় 'সভ্য জগতের উদ্দেশে ইস্তাহার' নামে একটি ঘোষণা। ইস্তাহারটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'কুলটুর-ভেলট'। জার্মান শব্দ 'কুলটুর' তারপর থেকেই পৃথিবীর মানুষের কাছে কালিমালিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিলেন ৯৩জন শিল্পী, বিজ্ঞানী, ধর্মযাজক, কবি, আইনজীবী, পদার্থবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। স্বাক্ষরকারীরা প্রায় সকলেই ছিলেন নিজস্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিবর্তনবাদী আর্নস্ট হেকেল, রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কর্তা ভিল্‌হেলম্ রোয়েণ্ট্‌গেন, জীববিজ্ঞানী পাউল এরলিখ, সঙ্গীতজ্ঞ এঙ্গেল্‌বার্ট হুম্পার্‌ডিঙ্ক এবং আরো অনেকে। এঁরা জার্মান জাতীয়তাবাদের সমর্থক না হয়েও জার্মানবাহিনীর যুদ্ধাপরাধকে অস্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের ও জনসাধারণের মনোভাব কী ছিল।

কিন্তু অন্য একটি কণ্ঠস্বরও এই ইস্তাহার প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক জর্জ ফ্রীডরিখ নিকোলাই ছিলেন সেকালের সুপরিচিত শান্তিবাদী। তিনি রচনা করলেন 'ইউরোপীয়দের উদ্দেশে ইস্তাহার' নামে একটি উদাত্ত প্রতিবাদী ঘোষণা। কিন্তু অধ্যাপক নিকোলাই নিজে সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঘোষণায় স্বাক্ষর পাওয়া গেল আর মাত্র তিনজনের। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন আইনস্টাইন। যুদ্ধবিরোধী ঘোষণায় এইটিই আইনস্টাইনের প্রথম স্বাক্ষর। ইস্তাহারের প্রথম অনুচ্ছেদটি ছিল এই :

"ইতিপূর্বে আর কোনো যুদ্ধে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সূত্রগুলি এমন সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নি। আর এই ব্যাপারটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন প্রযুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। এই স্বীকৃতি স্বভাবতই একটি সর্বজনীন বিশ্বব্যাপী সভ্যতার দিকে আমাদের

নিয়ে যেতে পারত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেকগুলো বন্ধন ইতিপূর্বে গড়ে উঠেছিল বলেই হয়তো বর্তমানের এই বিচ্ছেদ আমাদের কাছে আরো বেশি তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক।"

ইস্তাহারের শেষদিকে গ্যেটের নাম করে সকল সৎ ইউরোপীয়কে আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন তাঁরা সশস্ত্র সংঘাতের বিরুদ্ধে মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ ও ইউরোপকে বাঁচাবার জন্যে 'ইউরোপীয়দের লীগ' গড়ে তোলেন।

অন্যদিকে এই যুদ্ধের বছরগুলিতেই আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা প্রায় একটি শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। ১৯১৫ সালে 'জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি' প্রচার করা ছাড়াও ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।

অথচ এই মানুষটিই একই সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী তৎপরতাতেও দাঁড়িয়েছিলেন প্রথম সারিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময়ে জার্মানির সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধবিরোধী পার্টি ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই জাত্যভিমানের বিষাক্ত আবহাওয়ায় এই পার্টি পঙ্গু হয়ে যায়। তবে পার্টি পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু কিছু মানুষ থেকে গিয়েছিলেন যাঁদের চিন্তাশক্তি পঙ্গু হয় নি। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন নতুন একটি সংগঠন যার নাম 'বুণ্ড নয়েস ফাটারলাণ্ড' (নিউ ফাদারল্যাণ্ড লীগ)। আইনস্টাইন ছিলেন এই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ও প্রধান স্তম্ভ। ১৯১৪ সালের ১৬ই নভেম্বর এই সংগঠনটির জন্ম। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারী রোষে ও বিরুদ্ধ আবহাওয়ার চাপে সংগঠনটির নিষ্ক্রিয়তা-প্রাপ্তি। কিন্তু এই অল্প সময়ের অস্তিত্বের মধ্যেই এই সংগঠনের কার্যকলাপ প্রচণ্ড একটি যুদ্ধবিরোধী কণ্ঠস্বরের মতো ধ্বনিত হয়েছিল। এই সংগঠনের মাধ্যমেই আইনস্টাইনের সঙ্গে ব্রিটিশ শান্তিবাদী বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল, জর্জ বার্নার্ড শ, ফেনার ব্রকওয়ে ও আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। যুদ্ধ-বিরোধিতায় উদ্দীপিত আইনস্টাইন নিজেই উদ্যোগী হয়ে অনেকের কাছে অযাচিত পত্র লিখেছিলেন। এমনি একটি পত্র গিয়েছিল বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও শান্তিবাদী রম্যাঁ রলাঁর কাছে। পত্রে তিনি লিখেছিলেন :

"...ভবিষ্যৎ কাল যখন ইউরোপের কৃতকর্মের খতিয়ান করতে বসবে

তখন আমাদের সম্পর্কে কি একথা বলা হবে না যে তিন শতাব্দীর আপ্রাণ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার পরেও আমরা বড়ো জোর অগ্রসর হয়েছি ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততা পর্যন্ত ?…”

রলাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎকার ১৯১৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যাণ্ডে। রঁলার ডায়েরিতে এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী কালে এই দুই মহামনীষীর মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি সুদীর্ঘ পত্রালাপ করেছিলেন। ‘আইনস্টাইন অন পীস’ গ্রন্থের অনেকগুলো পৃষ্ঠা জুড়ে এই পত্রালাপের বিবরণ পাওয়া যায়।

‘বুণ্ড নয়েস ফাটারলাণ্ড’ নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নি। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে আবার শুরু হয় এই সংগঠনটির কার্যকলাপ। দুটি জনসভা আয়োজিত হয় বুণ্ডের উদ্যোগে। দ্বিতীয় জনসভায় গৃহীত হয় অত্যন্ত জোরালো ভাষায় রচিত একটি ঘোষণা, যাতে দাবি ওঠে—অবরোধ-অবস্থা, সেন্সরশিপ ও সংরক্ষণমূলক শিল্পের বিলোপ, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি, সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা, সমরবাদের উচ্ছেদ (বিশেষ করে শিক্ষা-ব্যবস্থায়) ইত্যাদির।

যতদূর জানা যায়, আইনস্টাইনও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভবত এই সভায় গৃহীত ঘোষণাপত্রটিই তিনি পাঠিয়েছিলেন সহযোগী বিজ্ঞানী মাক্স্ প্লাঙ্ক-এর কাছে স্বাক্ষরের জন্যে। ১৯১৮ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে মাক্স্ প্লাঙ্ক একটি চিঠি লিখেছিলেন আইনস্টাইনকে। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে যদিও ঘোষণার সঙ্গে তাঁর পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে কিন্তু বাস্তব অসুবিধের দরুণ ঘোষণায় স্বাক্ষর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে যেহেতু তিনি কাইজারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন অতএব কাইজারের সিংহাসন-ত্যাগের দাবিতে সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে কাইজার নিজের থেকেই সিংহাসন ত্যাগ করবেন।

মাক্স্ প্লাঙ্কের চিঠির ঠিক চোদ্দ দিন পরে, ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে, বিপ্লবের চাপে বাধ্য হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন কাইজার ভিলহেল্ম্ ও জার্মান রিপাব্লিক ঘোষিত হয়েছিল। আরো দুদিন পরে, যুদ্ধবিরতির দিনে, আইনস্টাইন দুটি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর মায়ের কাছে

সুইজারল্যাণ্ডে। দুটি চিঠিতেই আইনস্টাইন বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে মাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বিপ্লবের ফলে জার্মানিতে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের পথটি উন্মুক্ত হল।

॥ তিন ॥

১৯১৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে আমাদের এই পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে একটি ঐতিহাসিক সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে প্রায় পাঁচ বছরের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই তারিখটিতে একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পৃথিবীর দূর দূর দেশে অভিযান করেছিলেন সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের সত্যতা যাচাই করতে। ১৯১৯ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি ও রয়াল অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটির যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুসারে আলোর যে তীর্যক গতি প্রত্যাশিত, সূর্যগ্রহণের সময়ে ঠিক সেই ব্যাপারটিরই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন পৃথিবীর প্রধান সংবাদ হয়ে উঠলেন ও রূপকথার নায়কের মতো খ্যাতির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে আইনস্টাইনকে উপলক্ষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে অভিনন্দনীয় সংবাদ বলে মনে হয়েছিল। আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনন্যসাধারণ মর্যাদা আর এই নামটি হয়ে উঠেছিল একটি প্রতীকের মতো। তারপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আইনস্টাইন তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত এই অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে সর্বতোভাবে প্রয়োগ করেছিলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির সূত্রে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধহীন পৃথিবী রচনা করার প্রয়াসে, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজে এই খ্যাতিকে মনে করতেন অকারণ ও বোঝাস্বরূপ।

এই ঘটনার কয়েক মাস আগেই, ১৯১৯ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল আইনস্টাইনের নামযুক্ত দ্বিতীয় যুদ্ধবিরোধী ঘোষণা। মানুষের শুভবুদ্ধির উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে রমাঁ রলাঁ একটি আন্তর্জাতিক পত্র রচনা করেছিলেন। এই পত্রে আইনস্টাইনের স্বাক্ষর ছিল। তবে আইনস্টাইন মনে করতেন, তৎকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের শুভবুদ্ধির

উদ্দেশ্যে আবেদন প্রচারের চেয়েও মানুষের যে-দুর্বুদ্ধি যুদ্ধাপরাধের নৃশংসতায় গত কয়েক বছরে দেশে দেশে প্রেতের নৃত্য করেছে তার নির্মম উদ্ঘাটনই যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাকে আরো সার্থকভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারত। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু কাজও করেছিলেন। তিনি ও আরো কয়েকজনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফ্রান্সে জার্মান বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্যমূলক পুস্তিকা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আইনস্টাইন যেমনটি আশা করেছিলেন, সেই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া এই পুস্তিকা সৃষ্টি করে নি। বরং, প্রাজ্ঞ ও সংস্কৃতিবান বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও প্রয়োজনের সময়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিহার করতে পারেন না দেখে তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন।

১৯২১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে 'নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট' পত্রিকায় আইনস্টাইনের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন :

"মনুষ্যসমাজকে···আচ্ছন্ন করেছে অত্যধিক মাত্রায় তীব্র ও অত্যধিক মাত্রায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা। জাতীয়তাবাদের যে তরঙ্গ বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা একটি কঠিন ব্যাধি বিশেষ। উত্তেজনার সামান্য মাত্র কারণ উপস্থিত থাকলেই বা কখনো কখনো বিন্দুমাত্র কারণ উপস্থিত না থাকলেও এই জাতীয়তাবাদ জাত্যভিমানে পর্যবসিত হয়।

যুদ্ধের পূর্বে সংস্কৃতি বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এবং সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের অস্তিত্ব ছিল তা মূলগত বিচারে একটি সুস্থ লক্ষণ। এই আন্তর্জাতিকতাবাদ পুনঃস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি নেই বা যুদ্ধের ক্ষত নিরাময় হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই।"

১৯২১ সালে ও পরবর্তী কালে আইনস্টাইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে অষ্ট্রিয়ায় ও চেকোশ্লোভাকিয়ায়, ফেব্রুয়ারিতে আম্‌স্টারডামে, মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন। পরে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে তিনি গিয়েছিলেন ফ্রান্সে ও অক্টোবরে প্যালেস্টাইন ও স্পেন হয়ে প্রাচ্য দেশগুলিতে। আইনস্টাইনের এই ভ্রমণ অবশ্যই প্রধানত বিজ্ঞানী হিসেবে। কিন্তু এই বিস্তৃত ভ্রমণে শান্তিদূতের ভূমিকাটিও অপ্রধান ছিল না। বিশেষ করে ফ্রান্সে ও জাপানে আইনস্টাইনের ভ্রমণ খুবই সার্থকতামণ্ডিত হয়েছিল। ফ্রান্স ও

জার্মানির মধ্যে তিনি সম্প্রীতির আবহাওয়া সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। আর জাপান সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল অতি নিবিড় একটি মমতাময় আকর্ষণ।

প্রাচ্যদেশে ভ্রমণের সময়েই তিনি খবর শুনেছিলেন যে পদার্থবিদ্যায় ১৯২১ সালের নোবেল পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর এই প্রাচ্য-ভ্রমণের সময়েই আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে ইতালির ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুসোলিনি। আর যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ফরাসী বাহিনীর পুনঃপ্রবেশ ঘটেছিল জার্মানির রুঢ় অঞ্চলে।

১৯২৩ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে একটি অটোগ্রাফে আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন :

"বয়স্কদের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা শিশুরা মানে না। জাতি মানে না ইতিহাসের শিক্ষা। অতীতের তিক্ত পাঠ অবশ্যই বারে বারে নতুন করে গ্রহণ করতে হবে।"

॥ চার ॥

ইতালিতে মুসোলিনির ক্ষমতালাভের পর থেকেই আইনস্টাইন ফ্যাশিবাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফ্যাশিবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি যে পৃথিবীর শান্তিকেই বিপন্ন করে তুলছে—এই সতর্কবাণীও তিনি বারবার উচ্চারণ করেছিলেন। এ-বিষয়ে রমাঁ রলাঁ, ব্রিটিশ অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, ফরাসী লেখক আঁরি বারবুস, মাদাম কুরী, ম্যাকসিম গর্কি ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সে-সময়ে তাঁর দীর্ঘ পত্রালাপ হয়েছিল। একাধিকবার বিভিন্ন উপলক্ষে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন। অজস্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন; এবং যখনই মনে হয়েছে কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলে যুদ্ধ-বিরোধিতার উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে পারে, বিনা দ্বিধায় তাতে যোগ দিয়েছিলেন। 'আইনস্টাইন অন পীস' গ্রন্থে আইনস্টাইনের জীবনের এই সর্বাধিক কর্মব্যস্ত দশকের পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে।

১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে নাৎসীরা জার্মানিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আর ১৯৩৩ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে আইনস্টাইন

চিরকালের মতো ইউরোপ ত্যাগ করে এসে আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই আটটি মাসের ঘটনাবলী আইনস্টাইনের জীবনে প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মতো উপস্থিত হয়ে অনেক পুরনো ধারণা তছনছ করে দিয়েছিল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁর একান্ত সহযোগী বিজ্ঞানী মাক্স্ প্লাঙ্ক পর্যন্ত প্রুশিয়ান আকাদেমি থেকে তাঁর বহিষ্কারের পক্ষপাতী। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল শক্তিমত্ত এক দানবের রণহুঙ্কার ও ইহুদী-নিধনের প্রস্তুতি। আইনস্টাইন তখন ঘোষণা করেছিলেন যে যুদ্ধ-বিরোধিতা নয়, যুদ্ধকে প্রতিহত করবার জন্যেই চাই পশ্চিমী শক্তির যুদ্ধ-প্রস্তুতি। আইনস্টাইনের মতো দীক্ষিত শান্তিবাদীর মুখে এই প্রকাশ্য ঘোষণা যে কী সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার বিশদ বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থের একটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়।

পরবর্তী দুটি পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমস্যা। এই দুটি পর্বের ঘটনাবলী বহুবিচিত্র এবং আইনস্টাইনের নাম পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। এমন কি যদি বলা হয় যে আইনস্টাইনের জীবনের আবর্তেই এই বিশেষ সময়কালের জটিলতম ও দুরূহতম ইতিহাসের একটি প্রতিফলন পাওয়া যেতে পারে—তাহলেও ভুল বলা হয় না। আলোচ্য গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়েই আইনস্টাইনের জীবনের এই শেষ ষোলটি বছরের বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের সঙ্গে আইনস্টাইনের জীবনের এই দুটি পর্বের যোগসূত্র খুবই নিকট এবং বহু-আলোচিত বলে অনেকের কাছে মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে পৃথক পৃথক ঘটনাগুলো কালের পটভূমিতে স্থাপিত হবার ফলে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মনে হয় কালের যাত্রার ধ্বনিই যেন শোনা যাচ্ছে একটি ব্যক্তি-জীবনের মহৎ সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনীর মধ্যে।

॥ পাঁচ ॥

'আইনস্টাইন : জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে শুধু শান্তিবাদী আইনস্টাইন নয়, দার্শনিক, মানবপ্রেমিক, সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক আইনস্টাইনের, এক কথায় মানুষ আইনস্টাইনের, সমগ্র পরিচয়টি উপস্থিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "আইনস্টাইনকে শুধু বিজ্ঞানী বলা চলে না। জাতিবৈষম্য, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্ম ও বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রশ্নে বহু যুগ ধরে মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজকে যে সব নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আইনস্টাইন স্বয়ং সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত অনেক প্রবন্ধে বিভিন্ন সময় স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে ব্যক্ত করে গেছেন।"

আলোচ্য গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়ে আইনস্টাইনের সুচিন্তিত অভিমতের পূর্ণাঙ্গ একটি সঙ্কলন। গ্রন্থটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত : অভিমত (এই অংশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা 'আমার দৃষ্টিতে এই জগৎ', 'বিজ্ঞান ও সভ্যতা', 'সমাজ ও ব্যক্তিত্ব', 'বিজ্ঞান ও সমাজ', 'সমাজবাদ কেন ?' ও 'বারট্রাণ্ড রাসেলের জ্ঞান সম্বন্ধীয় মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য'), স্বাধীনতা (উল্লেখযোগ্য রচনা 'ফ্যাসিবাদ ও বিজ্ঞান', 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকামীদের সম্মেলনে', 'নিগ্রোদের প্রশ্ন', ও 'মানবীয় অধিকার'), ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র (আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের অনুলেখন এই অংশের অন্তর্ভুক্ত, উল্লেখযোগ্য রচনা 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' ও 'ধর্ম এবং বিজ্ঞান—এদের ভিতর সঙ্গতিবিধান করা কি অসম্ভব ?'), শিক্ষা (উল্লেখযোগ্য রচনা : 'শিক্ষা প্রসঙ্গে'), মিত্রবর্গ (বার্নার্ড শ', সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, মহাত্মা গান্ধী, লিও বেক্ সম্পর্কে মন্তব্য), রাজনীতি, রাষ্ট্র ও শান্তিবাদ (এই অংশে রাশিয়ান আকাদেমির সদস্যবর্গের আইনস্টাইনের উদ্দেশে খোলা চিঠি ও আইনস্টাইনের জবাব অন্তর্ভুক্ত, উল্লেখযোগ্য রচনা 'পারমাণবিক যুদ্ধ না শান্তি ?'), ইহুদীদের কথা (উল্লেখযোগ্য রচনা 'ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন সমস্যা') ও বিবিধ (উল্লেখযোগ্য রচনা 'গণিতজ্ঞের মনোজগত', 'এ যুগের মৌলিক সমস্যা', 'গান্ধীর পথে চলতে হবে')।

পরিশিষ্টে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৪২ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'আইনস্টাইন' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত এবং আইনস্টাইনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযোজিত হয়েছে।

এই সঙ্কলন-গ্রন্থে যদিও বহু বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশিত, তাহলেও লক্ষ্য করা যাবে যে আইনস্টাইনের সমগ্র চিন্তাজগত একটি মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত হয়েছে। তিনটি প্রবন্ধ থেকে তিনটি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

"যুদ্ধ আমার কাছে এক হীন ও ন্যক্কারজনক ব্যাপার বলে মনে হয়। এরকম ঘৃণ্য ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে আমি বরং ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে রাজি আছি।" (আমার দৃষ্টিতে এই জগৎ)

"একমাত্র স্বাধীন ও মুক্ত মানবই নব নব আবিষ্কার ও চিৎপ্রকর্ষবিধায়ক সৃষ্টিকার্যে সক্ষম, এবং এই সব আবিষ্কার ও সৃষ্টিই আমাদের আধুনিক মানব-সমাজের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলেছে।" (বিজ্ঞান ও সভ্যতা)

"আমাদের যুদ্ধোত্তর বিশ্বের চিত্র খুব উজ্জ্বল নয়। আমাদের অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কথা বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা রাজনীতি-বিশারদ নই এবং রাজনীতি নিয়ে অনধিকার চর্চার বাসনা কখনও আমাদের হয়নি। তবে আমরা এমন কতকগুলি বিষয় জানি যা রাজনীতিবিদদের অগোচর। সুতরাং কর্তৃপক্ষীয়দের আমরা এই কথা মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে বোধ করছি যে অনায়াসে সুখ-সুবিধা ভোগ করার কোন পন্থা নেই এবং শম্বুকগতিতে চলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখলে কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর কষাকষি করার মত সময় আর নেই। আজকের অবস্থায় সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ প্রয়োজন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এবং সমগ্র রাজনৈতিক ধারণার সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব সাধন ঈপ্সিত।"

এই গ্রন্থের জন্যে বাঙালী পাঠক সঙ্কলক-অনুবাদক ও প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইখানি সুসম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। 'ছন্দ' প্রথম বার হয় ১৩৪৩ সালে। ঐ সংস্করণের 'পরিশিষ্ট' অংশে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে কবি কর্তৃক লিখিত একখানি পত্র ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তিনখানি পত্রের প্রাসঙ্গিক তথ্য, 'পদ্যছন্দ' ও 'গদ্যছন্দ' সম্পর্কিত আলোচনা 'মোটকথা' নামে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

দশবছর পরে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'তে যখন 'ছন্দ' মুদ্রিত হয় (১৩৫৩) তখন প্রবন্ধগুলিকে সাময়িকপত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো হয়। প্রবন্ধগুলি 'সবুজপত্র' 'বিচিত্রা' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাবলীতে 'পরিশিষ্ট' অংশে পূর্বে অসংকলিত ছন্দবিষয়ক কয়েকটি রচনাও যুক্ত করা হয়। তাছাড়া 'চিঠিপত্র' অংশে জে. ডি. এণ্ডারসনকে লিখিত পত্র দুইটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার, প্যারীমোহন, ধূর্জটি-প্রসাদকে লিখিত পত্রাবলীও সেখানে স্থান পায়।

সম্প্রতি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'ছন্দ' গ্রন্থখানির যে মূল্যবান সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন, তার ফলে গ্রন্থখানির সকল অপূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা দূর হয়েছে। আমাদের দেশে রসসাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, মননসাহিত্যের ক্ষেত্রে সে চাহিদা তত মন্দা। আবার সংকলন, সম্পাদন প্রভৃতি কার্যের যথার্থ মর্যাদা আমরা এখনো দিতে শিখিনি। আমরা ভাবের আবেগ, রসের আক্ষেপ প্রভৃতির উপর যে গুরুত্ব দিয়ে থাকি, দুঃখের বিষয় তথ্যের যথার্থ প্রয়োগ ও বিজ্ঞানসম্মত বিচারের প্রতি সেই গুরুত্ব এখনো আমরা দিতে পারি নি।

একবার একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, একটি কবিতার

ছন্দঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী। আট টাকা॥

রচনাকাল ১৩১২ না ১৩১৩ এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে? কবিতার রসাস্বাদন এক বছরের অদলবদলে কম-বেশি হয় না। তাছাড়া পাণ্ডুলিপিতে কি ছিল, প্রথম প্রকাশে তার কোনো রদবদল হয়েছিল কিনা, পরবর্তী সংস্করণে তার কোন্ রূপান্তর লক্ষিত হয়, কোন্ তারিখে এটি পড়া হয়েছিল, কোথায়—এ সবেরই বা দরকার কি? অর্থাৎ যাকে textual-editing বলা হয়, তিনি তার গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। অথচ পাশ্চাত্ত্যে এই ধরনের সম্পাদন-কার্য উচ্চমর্যাদা লাভের অধিকারী হয়েছে। আমাদের দেশে অনেকে যে গুরুত্ব দেন না তার কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও তথ্যগতজ্ঞান সম্পর্কে অনীহা। সুখের বিষয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংকলন-সম্পাদন কর্মে মহৎ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তরুণ সমাজের ঔদাসীন্য মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করছে।

'ছন্দ' গ্রন্থখানির সম্পাদনা উচ্চাঙ্গের হয়েছে। সম্পাদনা কর্মে যে কী দুরূহ শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে গ্রন্থখানির দিকে লক্ষ্য করলেই সে কথা প্রতীয়মান হবে। একটি ঘটনা ধরুন। ছন্দের বিচিত্র প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছেন, তার কোন্‌টি কোন্ কবিতা বা গান থেকে নেওয়া অথবা প্রয়োজনবোধে কবি তাঁর বক্তব্যের পোষকতার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যে কবিতা রচনা করে নিয়েছেন সেগুলির ঠিক হদিশ দেওয়া সামান্য শ্রমের ব্যাপার নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্র লেখেন 'টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা' ইত্যাদি। ঐ কবিতার দুটি মাত্র পদ রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-উদ্ধৃত পদ দুটির পাঠ ঠিক কিনা তার বিচারের জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্য কথা' অংশে উদ্ধৃত পদটি এবং 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত পদটির তুলনামূলক বিচার করতে হয়েছে। অনেকের কাছে এগুলি হয়ত পণ্ডশ্রম কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এর মূল্য নিশ্চয়ই বুঝবেন। আলোচ্য গ্রন্থে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

সম্পাদিত গ্রন্থের অপর বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক রচনাগুলিকে কালক্রম অনুসারে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করা। পূর্বের সংস্করণে এই রীতি অবলম্বিত হয় নি। রচনার কালক্রম অনুযায়ী রচনাগুলিকে সাজিয়ে

ধরলে রচয়িতার বক্তব্যের ও দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক রূপের পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার স্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থে রচনাসন্নিবেশকৌশলে সহজ-বোধ্য হয়েছে। 'পরিশেষ' ও 'সম্পূরণ' অংশে অনেক নতুন রচনা ও চিঠিপত্র, ভাষণ সংকলিত হতে দেখা যায়। ফলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কিত তাবৎ রচনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই গ্রন্থ পাঠে লাভ করা যাবে।

সম্পাদিত গ্রন্থখানির একটি বড়ো অংশ 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগ। সংজ্ঞা, পাঠ, পাণ্ডুলিপি ও দৃষ্টান্ত এই চতুর্বিধ পরিচয় ঐ বিভাগে প্রদত্ত হয়েছে। এগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি পড়লে দেখা যায় তাঁর ব্যবহৃত ছন্দ-পরিভাষাগুলি সর্বত্র সমার্থক হয় নি। যেমন 'কলা' শব্দটি। একটি লঘুধ্বনি উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে তাকে বলা হয় 'কলা'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো পর্বকে বলেছেন 'কলা', কখনো বা 'উপপর্ব'কে। 'তিন মাত্রার ছন্দ'কেই তিনি যে কত নামে ডেকেছেন। এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত বক্তব্যকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরতে গেলে তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষা ও সংজ্ঞা-গুলির বিশদ পরিচয়ের দরকার আছে।

'পাঠ-পরিচয়' অংশে মুখ্য রচনাগুলির পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এণ্ডারসন-রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ 'ছন্দ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির সময় বর্জিত হয়েছিল। সেগুলিকে উদ্ধার করে বসানো হয়েছে। তাছাড়া 'চলতি ভাষার ছন্দ' রচনাটি প্রথম সংস্করণে ও রচনাবলী সংস্করণে ছিল না। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের এই রচনাটিকে আলোচ্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া সঙ্গত হয়েছে।

কাজেই অনিবার্য কারণে 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ দীর্ঘ হয়েছে। দুরূহ শ্রমজাত এই তথ্যসম্ভারকে আমরা সানন্দে গ্রহণ করব। এই ধরনের কাজ বাংলা-সাহিত্যে যত হয় ততই ভালো।

রবীন্দ্রনাথ শুধু মহাকবি বা ছন্দস্রষ্টা নন, তিনি যে তত্ত্ববিচারেও ছান্দসিকদের অগ্রগণ্য আশা করি এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। তিনিই প্রথম বাংলাছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন বা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেন, তার অন্তর্নিহিত রূপ-বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে আমাদের সামনে ধরে দেন, কত সূক্ষ্ম অর্থবহ চমৎকার ইঙ্গিত দেন, সেগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বে

সচেতন ছিলাম না। 'কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব'—ছন্দ ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রে চিরদিন রবীন্দ্রনাথ এই নীতি মেনে এসেছেন। তাই তিনি যখন 'চাল' ও 'চলন' প্রসঙ্গ তোলেন, অথবা সম-অসম-বিষম চলনের ছন্দের কথা বলেন, তখন তিনি প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণের পথে চলেন না, নিজের সূক্ষ্ম সংবেদন দ্বারা যা অনুভব করেন তাকেই প্রকাশ করে দেন। তাই দেখি—শরদ চন্দ | পবন মন্দ | বিপিনভরল | কুসুমগন্ধ | —এই পর্ববিভাগকে তিনি নতুন নাম দেন 'পদক্ষেপ' এবং এর উপরেই যে ছন্দের বিশেষত্ব নির্ভর করছে সেটি আমাদের দেখিয়ে দেন। এই শ্রুতি কোনো ব্যাকরণ প্রভাবজাত নয় বরঞ্চ সংগীতের প্রভাবজ। রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আলোচনায় সংগীতের পরিভাষা—যথা, সম, তাল, লয়, ফাঁক প্রভৃতির প্রচুর ব্যবহার করেছেন। মনে হয় তার ফল সর্বত্র শুভ হয় নি। সংগীতের 'তাল' বা 'লয়' দিয়ে বাংলা কবিতার ছন্দবিচার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'নয় মাত্রার ছন্দে' রচিত সেই 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটির প্রসঙ্গ এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। অমূল্যধনবাবু যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তার সন্তোষজনক জবাব সেখানে নেই। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন গীতছন্দের 'পর অমূল্যধনবাবু জোর দেন পঠিতছন্দের যতি ও প্রস্বরের 'পর। সেজন্য মতের মিল ঘটে নি। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথ গীতছন্দ ও পঠিতছন্দের ভেদ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন :

"গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের পরে।")

অথবা 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' অধ্যায়ে বাংলায় হসন্ত-মধ্য শব্দের মাত্রাগণনার আলোচনাকালে তিনি যখন 'পয়ার' ঠাটের বলে 'টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল্'—পংক্তিকে চালাবার চেষ্টা করেন তখন আমরা ঐ পংক্তিতে ছড়ার ছন্দকেই পাই, 'পয়ার'কে নয়। আবার 'ছন্দের প্রকৃতি' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় জেদের সুরে বলেন, "অথচ এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ-কাব্য' লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সেকথা স্বীকার করব না।" তখন তাঁর মতকে আমরা কোনো ক্রমেই স্বীকার করি না। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বহুভাবে কি মেঘনাদবধে ব্যবহৃত ছন্দের প্রশংসা করেননি ?

এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো মন্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য বোধ না

করবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি কবি কী অনায়াসে, অবলীলাক্রমে নানা মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রচনা করে চলেছেন। কী নিপুণভাবে ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্য নির্ণয় করছেন। অথবা সংস্কৃত-বাংলা এবং প্রাকৃত-বাংলার ছন্দের মধ্যেকার তফাৎ বোঝাতে গিয়ে দুয়ের প্রকৃতিগত গড়নটিকে কতো সুন্দর করে খুলে-খুলে দেখিয়েছেন। প্রচলিত মতে যাকে 'পয়ার ছন্দ' বলা হয় (প্রবোধবাবু বলেন 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক') তার দেহে যুক্তধ্বনির বহুল অবস্থান সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত 'শোষণশক্তি'র বলে মাত্রাগত সমতা বিদ্যমান থাকে। 'শোষণশক্তি' আখ্যা রবীন্দ্রনাথই দান করেন। তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'প্রবহমানতা' সম্পর্কে তিনিই আমাদের সচেতন করেন, গদ্য কবিতার ছন্দকে নির্দেশ করেন 'ভাবের ছন্দ' বলে আর শেষে বলে যান "একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ ছন্দের অজস্র রূপ নির্মাণ করেছেন ও ছন্দতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রণী হয়েছেন। বাংলা কবিতার ছন্দে যে কত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ছন্দ আলোচনায় অগ্রণী না হলে সেই সম্ভাবনা অজ্ঞাত থেকে যেত।

রবীন্দ্র মজুমদার

রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি

ভারতের লোকমানসকে রামায়ণ যে কী গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে, তা নিয়ে বাগবিস্তার করা বাহুল্য। যাকে বলা হয় 'ইণ্ডিয়ানিজম্'—ভারতীয়তা বা ভারতীয় মানস—তারই এক অতি উজ্জ্বল ও সংহত রূপ চিত্রিত হয়েছে রামায়ণে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেসব মূল্যবোধ সাধারণভাবে ভারতীয়দের ব্যক্তিজীবনকে এবং পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই সব মূল্যবোধই বাস্তব দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামায়ণে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "রামায়ণের আদি-কবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত কিছু ধর্ম, রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে ভ্রাতৃরূপে পতিরূপে বন্ধুরূপে ব্রাহ্মণধর্মের রক্ষাকর্তারূপে অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন; নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।"

রামায়ণ মহাকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি আর তার কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রূপক বা nature myth সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। রামায়ণের এই দুই দিকের ওপরেই রবীন্দ্রনাথও আশ্চর্য উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। 'রামায়ণ' (প্রাচীন সাহিত্য), 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (ইতিহাস), 'সাহিত্যসৃষ্টি' (সাহিত্য) প্রভৃতি প্রবন্ধে, 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণের (১৯২৬) প্রস্তাবনায় এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের ইতিহাসাশ্রিত কাঠামো আর তার রূপকার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে সেই রূপকার্থ হল এই:

রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি—প্রবোধচন্দ্র সেন। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯। তিন টাকা

রামায়ণ-কাহিনীর মুখ্য চরিত্র রাম আর সীতা : রাম শব্দটির অর্থ রমণীয় ; তাঁর বর্ণ নবদূর্বাদলশ্যাম—কৃষিজাত শস্যশ্যামল রমণীয়তার প্রতীক ; তিনি পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন—হলচালনার অযোগ্য উষর ভূমিকে উর্বরা করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গোরু তখন ধন বলিয়া এবং কৃষি পবিত্রকর্মরূপে গণ্য হইত। জনক স্বহস্তে চাষ করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হঠিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।" "ভারতবর্ষে কৃষি বিস্তারে উদ্‌যোগী পুরুষ" জনকের হলমুখে সীতার—অর্থাৎ হলরেখার—আবির্ভাব ; সীতার পাতাল-প্রবেশ কাহিনীর মধ্যেও তাঁর এই রূপক-সত্তার সমর্থন মেলে। এই সীতাপতি রাম আর হলধর বলরামকে এক ও অভিন্ন মনে করার মতো পৌরাণিক উপাদান যে প্রচুর আছে, তা সকলেই জানেন। রাম আর সীতার নিত্যসহচর লক্ষ্মণ—যে-শব্দটির অর্থ কল্যাণ ও সম্পদ।

এই রূপকার্থের আরেক দিকে আছে স্বর্ণলঙ্কা ও রাবণ। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (এবং মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত রামোপাখ্যানেও) রাবণ শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে রবকারয়িতা—যিনি আপন প্রতাপবলে দেবতা মানুষ ও যক্ষদের আর্তরব করিয়েছিলেন। দশগ্রীব কামবল রাবণের বিভীষিকাময় প্রতাপের উৎস বিপুল ধনসম্পদ, সঞ্চিত স্বর্ণ। মায়াবী স্বর্ণমৃগের প্রতি প্রলুব্ধ করে সীতাকে হরণ করার মধ্যে যে বক্তব্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা খুব স্পষ্ট : চিরকাল এই স্বর্ণাধিপতিরা ধনলোভে আকৃষ্ট করে কৃষিজীবীর সর্বনাশ ঘটায়। 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে।" আরণ্যকাণ্ডে স্বর্ণমৃগরূপী মারীচের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'রজতবিন্দুচিত্রিত', 'রৌপ্যবিন্দুশোভিত' বলে। আরেকটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই-যে, সীতাহরণ ঘটেছিল 'রামের প্রিয় ঋতু' হেমন্ত কালে—যখন ধরার অঞ্জলি ভরে উঠেছে পাকা ধানে।

রামায়ণে যে সামাজিক ইতিহাসটুকু প্রচ্ছন্ন আছে, সে সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বিশদ আলোচনা করেছেন 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ও

'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ দুটিতে। রামকাহিনীর মূলে আছে ভারতের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের যে তিনটি বিরাট ঘটনা, রবীন্দ্রনাথের মতে তা এই :

১। মৃগয়াজীবী ও গোসম্পদে আসক্ত আর্যদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজারা ক্রমেই বেশি করে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়তে লাগলেন এবং এই কৃষিবিস্তার উপলক্ষেই অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত বাধল। "আর্যদের ভারত-অধিকারের পূর্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত। দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গম স্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল" —বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

২। আর্যদের কৃষিবিস্তারের শত্রু 'রাক্ষস'শক্তির পরাজয়: রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় "রামচন্দ্র বানরগণকে—অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন। এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।" সুউন্নত এক সভ্যতার স্রষ্টা এই দ্রাবিড়রা ছিল শিবের উপাসক—যে-শিব নিজেও একসময় তাঁর 'প্রেত' সঙ্গীদল নিয়ে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন। আর্যদের কাছে বিভীষিকাময় সেই শৈবশক্তির প্রতীক হরধনু ভঙ্গ করে রাম জনকের আস্থা অর্জন করেছিলেন।

৩। একদিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আত্মকলহ, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের জয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেই বিরোধকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বৃত্তিগত ভেদ"—সনাতন আচারবিধির প্রতি একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণরা ছিলেন যজ্ঞানুরক্ত, আর উপনিষদোক্ত 'রাজবিদ্যা'র প্রতি আগ্রহী ক্ষত্রিয়রা কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন যজ্ঞবিরোধী। বলা বাহুল্য, যজ্ঞকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মা-উপাসক ব্রাহ্মণদের আর বিষ্ণু-উপাসক ক্ষত্রিয়দের এই সংঘাতের পেছনে আসলে ছিল পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় ক্ষমতা দখলের লড়াই, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের লড়াই। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার যাঁরা এই নতুনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে

অগ্রগণ্য হলেন বিশ্বামিত্র—যিনি সনাতন ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির রক্ষক ও রঘুবংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের অধিকার থেকে রামকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।"

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর এই 'রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি' গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলিকেই বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমতের ভিত্তিতেই গ্রন্থকার তাঁর নিজের বক্তব্যগুলি দাঁড় করিয়েছেন।

এই বইটি রামায়ণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থকার-লিখিত পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম প্রবন্ধটি ('রামায়ণ') লেখা হয়েছিল রাজশেখর বসু-কৃত রামায়ণের সারানুবাদ ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত-কৃত তুলসীদাসের রামচরিতমানসের বঙ্গানুবাদের আলোচনা উপলক্ষে। এই প্রবন্ধে সেন মহাশয় রামায়ণের ঐতিহাসিক পটভূমির আর রূপকার্থের যে-বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা সাধারণ রামায়ণ-পাঠকের মনে রামায়ণকাব্যের মোটের ওপর স্পষ্ট ও বাস্তব-গ্রাহ্য এক সামাজিক পটভূমি রচনা করবে। সেদিক থেকে এই প্রবন্ধটি মূল্যবান।

এই রকম আরেকটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ রচনা হল তৃতীয় প্রবন্ধ 'রামায়েত ধর্ম': বৈষ্ণব ধর্মের নানা সাম্প্রদায়িক বিভাগের মধ্যে মুখ্য দুটি বিভাগ হল কৃষ্ণায়েত আর রামায়েত। ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম-শাখাগুলির অন্যতম কৃষ্ণায়েত বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু তার তুলনায় ঢের অর্বাচীন রামায়েত বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক কে? নিশ্চয়ই রাম নন; বাল্মীকিও নন। ভারতের লোকমানসে কৃষ্ণ যেমন কালক্রমে দেবত্ব অর্জন করে জগৎপালক বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, রামও তেমনি অনেক পরে—সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ১ম-৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে—বিষ্ণুর অবতার হিসাবে পূজিত হতে থাকেন। এরকম অনুমানের কারণ খ্রীষ্টপূর্বকালে লেখা কোনো গ্রন্থে বা শিলালিপিতে রামাবতারের কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। বিষ্ণুই যে রামরূপে ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, একথা যেসব গ্রন্থে বলা হয়েছে—যেমন, বায়ুপুরাণে, মহাভারতের শান্তিপর্বে, রামায়ণের আদিকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে—সে সবই খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতকের মধ্যে রচিত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। রামের মূর্তিপূজার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়। চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রামের মূর্তিপূজা যে বেশ ব্যাপক আকারে শুরু হয়েছে, তার নানা প্রমাণ আছে।

এই সব রামপূজকদের এক সুসংগঠিত রামায়েত ধর্মসম্প্রদায়ে সংঘবদ্ধ করেন চতুর্দশ শতকে সাধু রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যরা। রামানন্দ প্রথমে ছিলেন রামানুজ-প্রবর্তিত শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজে অনুসৃত সংকীর্ণ জাতিভেদ বর্ণভেদ অধিকারভেদ বৈষ্ণবদের মধ্যে কখনও তেমন প্রবল না থাকলেও, রামানুজ-অনুগামী বৈষ্ণবাচার্যরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা ও অনুদারতার গণ্ডীতে বাঁধা পড়ছিলেন। যে-বর্ণভেদ প্রথা মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে, তৎকালীন ভারতের সামাজিক পটভূমিকায় রামানন্দের এই রামায়েত বৈষ্ণবধর্মান্দোলন খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই গোঁড়ামির যুগে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যকে অস্বীকার করে রামানন্দ অত্যন্ত দুঃসাহসী এক বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। রামানন্দের বারোজন অগ্রগণ্য শিষ্যের মধ্যে একজন মুসলমান জোলা কবীর, একজন চামার রুইদাস এবং আরেকজন নাপিত সেনা। রামানন্দের নারী-শিষ্যদের মধ্যে পদ্মাবতীর নাম স্মরণীয়।

রামানন্দ-প্রবর্তিত এই রামায়েত ধর্মান্দোলনের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য এই যে, সে সময়ে ভাগবত ধর্মের অবক্ষয়ের ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, গোপীলীলা ও কান্তভাব জনমানসের এক বিপুল অংশকে প্রভাবিত করে এক সামাজিক-নৈতিক অধঃপতন ঘটাচ্ছিল। কৃষ্ণায়েত বৈষ্ণবদের সেই লীলাবাদের স্থানে রামানন্দ ভক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রামসীতার অতি মহৎ ও মানবিক চরিত্রের আদর্শকে স্থাপন করে।

এই প্রসঙ্গে, একটি প্রশ্ন আমাদের মনকে পীড়িত না করে পারে না: বাংলাদেশে যে রামপূজা প্রতিষ্ঠা পায় নি, সহজ ও উদার রামায়েত ধর্ম এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে নি, তার কারণ কি এই যে, চৈতন্যদেব সেযুগে আমাদের সমাজের সমস্ত সংকীর্ণতার বাঁধ ভাঙবার জন্যে যে উদার ও অতি প্রবল বৈষ্ণবান্দোলন শুরু করেছিলেন, তা প্রধানত ওই কান্ত-ললিত ভাবকেই আশ্রয় করেছিল, লীলাবাদ কোণঠাসা করে রেখেছিল ভক্তিবাদকে? রামায়েত বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিযোগের সঙ্গে যে

কর্মযোগের সমন্বয় ঘটেছিল, বাংলাদেশের ভাবাবেগবিহ্বল প্রেমলীলারসে আচ্ছন্ন বৈষ্ণবমানস তাকে ঠিক নিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "রামায়ণকথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মানুষের যতপ্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদবৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যের নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"

শেষ দুটি প্রবন্ধে ('রামরাজ্য' এবং 'রামরাজ্য ও আধুনিক ভারত') লেখক আলোচনা করেছেন বাল্মীকি থেকে তুলসীদাস ও গান্ধীজী পর্যন্ত বহু শতাব্দী ধরে যে রোগ-দৈন্য-ভেদাভেদহীন আদর্শ এক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারতীয়দের কল্পনায় চিত্রিত হয়ে এসেছে, সেই রামরাজ্যের কথা। স্বভাবতই এই প্রবন্ধ দুটিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা 'জুড়ে' আছে রামরাজ্য বলতে গান্ধীজী কি বুঝতেন, তারই আলোচনা। লেখক নিষ্ঠাবান গান্ধীভক্ত এবং ভাববাদীর এই ভক্তিবশে তিনি রামায়ণে বর্ণিত রামচরিত্রমাহাত্ম্য "সর্বতোভাবে মহাত্মাজি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য" বলে ঘোষণা করেছেন। (পৃঃ ৯৫) রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গান্ধীজীর রামরাজ্যের পরিকল্পনাটি নিয়ে তর্ক না থাকতে পারে—সব যুগে সব মানুষই রাষ্ট্রিক-সামাজিক ব্যবস্থার এক আদর্শ কল্পরূপ সামনে রাখে, গান্ধীজীও তাই রেখেছিলেন। কিন্তু সমগ্রভাবে ও সাধারণভাবে রামরাজ্যের ধ্যানমুগ্ধ গান্ধীবাদ ও গান্ধীদর্শনের ভূমিকা কি, তা আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

এ-যুগের কোনো সামাজিক আন্দোলনই রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না—বিশেষ করে যখন সেই সামাজিক আন্দোলনের রূপটি এদেশে বণিকশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সূচিত হয়েছিল। ধনিক-বণিক শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব ভাগবত বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত প্রবল (তৎকালীন একটি বিশেষ সামাজিক শক্তির বিকাশের মুখেই যে বৈষ্ণববাদের জন্ম—এটা ঐতিহাসিক সত্য) এবং গান্ধীজীর সেই রামভক্তি বৈষ্ণব বণিক-পরিবারেরই উত্তরাধিকার। আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীজীর খুব বড়ো দান হল রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক উন্নতির সাধনাকে যুক্ত করা। ভারতের জননায়ক ও ধর্মনেতাদের মধ্যে গান্ধীজীই প্রথম মানুষের আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের জন্যে দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়ন আর রাজনৈতিক মুক্তিকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রামভক্তিমুগ্ধ

গান্ধীজীর দর্শনের মধ্যে স্ববিরোধিতা ধরা পড়ে যখন তিনি বলেন—রাজনৈতিক মুক্তির পর সেই আদর্শ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে অহিংস কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে, ব্যক্তির 'হৃদয় পরিবর্তনের' মধ্যে দিয়ে।

রামানুগামী চরিত্রমাহাত্ম্যে, প্রেমের আহ্বানে, হৃদয়ের মুক্তিতে, অহিংসার উদারতায় এ-যুগের সমস্ত জটিলতার ও সংঘর্ষের সমাধান হতেই পারে না। কারণ, হিংসার রূপ যুগে যুগে বদলায়। আজকের দিনে শ্রেণীগত শোষণের মধ্যে দিয়ে হিংসার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি। কিন্তু ধনবাদী রাষ্ট্রকে এই হিংসাশ্রিত শ্রেণীবৈষম্যের ফল বলে গান্ধীজী ঘোষণা করেন নি। এই রাষ্ট্রের প্রভু যে-শোষকশ্রেণী, সেই শ্রেণীর বিলুপ্তি না ঘটলে রাষ্ট্রে ব্যক্তির আত্মবিকাশ —সে বিকাশ আত্মিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন—হতেই পারে না, এই শ্রেণীবোধ গান্ধীজীর রচনাবলীতে পাওয়া যায় না। শোষক শ্রেণীই যে সহিংস শ্রেণী এবং তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় শক্তিই যে সেই হিংসার কায়েমী অস্ত্র, এ কথা গান্ধীজী কখনও বলেননি। এ দেশের উঠতি ধনিকশ্রেণী তাই সাবালকত্ব অর্জনে গান্ধীবাদের সুযোগ নিয়েছে পুরোমাত্রায়।

আদর্শ এক রামরাজ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী গান্ধীজী কতকগুলি সামাজিক নীতি তৈরি করে নিয়েছিলেন: আত্মশাসনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় শাসনের বিলুপ্তি ঘটানো; উপকরণ-বাহুল্য বর্জনের দ্বারা জীবনযাত্রাকে সরল ও 'প্রাকৃতিক' করে তোলা; সেই উদ্দেশ্যেই প্রাচীন আদর্শে পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে তোলা; পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মারফতে কেন্দ্রীভূত সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রক্ষমতাকে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করে দেওয়া; ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বণিক শ্রেণীর সাবালকত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই এ-সব আদর্শ সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই, গ্রন্থকারের কথায়, "যে-রামরাজ্যের কল্পনা বহুশত বৎসর ধরে ভারতবর্ষের হৃদয়কে মুগ্ধ করে রেখেছে, বিংশ শতকে মহাত্মা গান্ধী তাকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দেবার প্রয়াসে জীবনপাত" করলেও, তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে "এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে সে-কল্পনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠাদানের কোনো প্রয়াস দেখা গেল না" তার কারণ "রামরাজ্যের কল্পনা ভারতীয় চিত্তে নিছক কল্পনারূপেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং কল্পনাতেই পর্যবসিত হয়েছিল, কখনও ভাবনায় পরিণত হয়নি।" শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক শক্তি যতোদিন রাষ্ট্রের কর্ণধার, ততোদিন হৃদয়-পরিবর্তন, ব্যক্তিগত সত্যচর্চার দ্বারা অপরের শ্রেয়বোধকে জাগিয়ে তোলা ইত্যাদি রামরাজ্যনীতির ধোঁয়াটে ধারণা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে সহজ সাবলীলতা আছে। রামায়ণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি অনেক ভেবে দেখার মতো কথা বলেছেন—কিন্তু তিনি রামায়ণ পাঠ করেছেন প্রধানত কাব্য-রসগ্রাহীর স্বচ্ছ ও প্রসন্ন মন নিয়ে। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ পাঠককে তৃপ্তি দেবে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি পর্ব

'গ্রন্থালয়' প্রকাশ ভবনের কল্যাণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতকগুলি অবিস্মরণীয় লেখা আবার পড়া গেল। একটি সুলিখিত ভূমিকা ও একটি মূল্যবান গ্রন্থ-পরিচিতি বইখানির গৌরব বাড়িয়েছে। বইখানির জন্য প্রকাশ ভবনকে, ভূমিকার জন্য রথীন্দ্রনাথ রায়, ও গ্রন্থপরিচিতির জন্য অশোক গুহকে পাঠকমাত্রেই সাধুবাদ জানাবেন। শ্রীযুক্ত রায় মানিক-সাহিত্যের আদি-অন্তের নিপুণ রসগ্রাহী আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন।

মানিকবাবুর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে কল্লোল যুগের কথা অনিবার্যভাবে ওঠে। জগদীশ গুপ্তের উত্তরসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলা হয়। এক্ষেত্রেও সে কথা উঠেছে, এবং সে কথা বলা হয়েছে। এগুলির যথোপযুক্ততা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। সুতরাং আমরাও ভূমিকা লেখক ও গ্রন্থপরিচায়কের সূত্র অবলম্বন করে মানিকবাবুর সৃষ্টির অনন্যতার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হব। কল্লোল এবং জগদীশ গুপ্তকে ছাড়িয়ে মানিকবাবুর যাত্রারম্ভ। সে কারণে কল্লোল ও জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর মিল-অমিলের কথাটা সর্বপ্রথমেই প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তির স্বতন্ত্র চেহারা আঁকতে গিয়ে, দেখা যায়, কল্লোলের অধিকাংশ লেখকই মানুষের নিঃসঙ্গ স্বরূপ অঙ্কনের দিকে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু সেই নৈঃসঙ্গ্যকে আঁকার বিষয়ে কল্লোলী লেখকরা অধিকাংশক্ষেত্রেই দুই ধরনের অসঙ্গতির বোঝা বহন করেছেন। এক, নৈঃসঙ্গ্যকে রোমান্টিক বৈভব বিবেচনা করে তাকে বর্ণালু ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন, নতুবা, নৈঃসঙ্গ্যটা বিদেশী ব্যাপার বিবেচনায় বিষয়ে এবং বিন্যাসে বিদেশী গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে গিয়ে কৃত্রিমতার দ্বারস্থ হয়েছেন। জগদীশ গুপ্তের বৈশিষ্ট্য এখানে যে তিনি নৈঃসঙ্গ্যকে রোমান্টিক বর্ণালুতায়

মানিক গ্রন্থাবলী : প্রথম ভাগ। গ্রন্থালয়। দশ টাকা।

রঙিন করেন নি, এবং তাঁর শিল্পসৌরভ সন্দেহাতীতরূপে দেশজ। জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস পড়ে সব সময়েই মনে হয় শরৎচন্দ্রের আবেগপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন আস্বাদ পাচ্ছি—কিন্তু কখনো এ কথা মনে হয় না যে বিদেশী উপন্যাসের নায়কদের চলন, বলন, মননকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়ে হাজির করা হচ্ছে। কেন না, তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মে যে অভিজ্ঞতার রঙ লাগিয়েছিলেন সেটা আসল রঙ। তাকে তাঁরাই খুঁজে বের করেছিলেন নিজ নিজ অন্বেষার টানে। সাহিত্যিক বিস্তর পড়তে পারেন, বিলিতি বইতে আপন দেশ খুঁজতে পারেন, কিন্তু সেই রঙ-ঢঙ তাঁকে নিজে মাথা খুঁড়ে বার করে নিতে হবে, যেমন পিকাসো, যেমন যামিনী রায়। তা নইলে সবই বৃথা। সে ব্যর্থতায় তাঁরা লিফলেট-বিশারদ অথবা মঞ্চ-বিশারদ হাফ-প্রফেট হতে পারেন, কিন্তু যে 'যুগ-যুগান্তে ফোটায় মুকুল—যার তাড়াহুড়া নাই', তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না। আর তা করতে গেলে অতসী মাসীর বরের মতো বাঁশী বাজিয়েই যেতে হয়, বুকের রক্ত মুখে তুলে; আনন্দের মতো নেচেই যেতে হয়; সব আবরণ খুলে ফেলতে ফেলতে আগুনকে দিয়ে দিতে হয় সব কিছু। সেই কারণে মুখে মুখে যে সব বৃথা সহানুভূতি রটনা করা হয় তাঁর শেষ পরিণাম সম্বন্ধে—আমার সেগুলো ভালো লাগে না। মানিকবাবু মদ খেতেন? খেতে পারেন। হয়তো অনেকেই খান, কিন্তু তফাৎটা হল এই যে শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি কখনো নিজেকে ভোলেন নি, আর সব থেকে বড় কথা—কখনো অপরকে ভোলাতে চান নি।

তাই মানিকবাবুর সিদ্ধি আর ব্যর্থতাকে হ-য-ব-র-লয়ের সেই বিখ্যাত মাপ-ফিতে দিয়ে বিচার করা চলে না যাতে শুধু ছাব্বিশ ইঞ্চিই আছে। এর মাপকাঠি স্বতন্ত্র। রথীনবাবু সে বিষয়ে আমাদের ঠিক ভাবেই সচেতন করেছেন, কিন্তু মধুসূদনের তিন বছরের সাহিত্যজীবন ও বাকি শেষ কয়েক বছরের অপ্রতিরোধ্য আত্মবিনাশের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রমণের সাদৃশ্য শুধু মদ্যপানের কারণেই চিন্তা করতে লোভ হলেও, ঐ পার্থক্যের কারণেই করা উচিত নয়। এটা ভূমিকা লেখক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায় সম্ভবত উপলব্ধি করেই "মধুসূদনীয় প্যাটার্ন" কথাটি ব্যবহার করেছেন। এবং জগদীশ গুপ্ত মানিকবাবুর পূর্বসূরী —এই উভয় লেখকের মধ্যে কিঞ্চিৎ আত্মিক সম্পর্ক আছে—এবং তা সত্ত্বেও শেষোক্ত লেখক পূর্বোক্তকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছেন—এই সমুদয় উক্তির

পরেও আমরা এখন জানতে চাই যে জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত পার্থক্যটা কোনখানে? রথীনবাবুর সুলিখিত ভূমিকায় এই পার্থক্যের অনুভূতি বিদ্যমান, কিন্তু তা অস্পষ্ট বলে, সে অনুভূতির প্রকাশও হয়েছে অস্পষ্ট। সদা-প্রচলিত, হাতের-কাছে-পাওয়া প্রশংসোক্তি— যথা, জীবনরহস্য অনুসন্ধানের গভীরতা, পর্যবেক্ষণের প্রশস্ততা, জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা—এ-বিষয়ে বিশেষ আলোকসম্পাত করে নি। অন্যথা—সুন্দর এই ভূমিকাটিতে উক্ত অনুচ্ছেদটিই এই দৌর্বল্যের জন্য দ্বিধাবিভক্ত। অসংলগ্নভাবে এক নিঃশ্বাসে মানিকবাবুর ঐতিহ্যানুসারিতা আবিষ্কারে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে না পড়লে রথীনবাবুই বলতেন যে জগদীশবাবুর বিষয় হল মানুষের নিঃসহায়ত্ব; আর যাত্রারম্ভের মুহূর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিল মানুষের নিরুপায়ত্ব। আত্মিক মিলটা এইখানে যে এই দুই-ই হল মানুষের নৈঃসঙ্গ্য-চেতনার দুপিঠ। আর, মানিকবাবু জগদীশ গুপ্তের অপেক্ষা অগ্রসর এই কারণে যে তাঁর চরিত্রেরা এই নিরুপায়বোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, হেরে গেলেও করে না। শশী-কুবের-বিমল এরা এবং আরো অনেকে তার প্রমাণ। এইখানেই মানিকবাবুর পরবর্তী রূপান্তরের বীজ ছিল—কিন্তু সে কথা এ সংকলনপ্রসঙ্গে আলোচনার বিষয় নয়। প্রশ্ন তোলা যায় যে নিঃসহায়ত্ব ও নিরুপায়ত্বে তাৎপর্যগত তফাৎ কোথায়? জগদীশবাবু নিঃসহায় মানুষকে এঁকেছেন, আঁকতে গিয়ে মানুষের মূর্তিকে ট্র্যাজিক গৌরব দিয়েছেন। মানুষ নিরুপায় এই কথা বলতে গিয়ে মানিকবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে এ-মানুষকে ট্র্যাজেডির নায়কের গৌরব দেওয়া যাবে না। বিমলকে শান্তার রক্তে লাল ব্যাণ্ডেজ পুড়িয়ে ফেলতে হয়, শশীকে চলে যাবার সমস্ত আয়োজন একে একে বাতিল করে গাওদিয়াতেই ডাক্তারি নিয়ে থাকতে হয়, কুবের আবার এক ব্যর্থতার পালা শুরু করে—যে সামান্য কারণে তারা কাহিনীর দিক থেকে আগ্রহোদ্দীপক বা ইন্টারেস্টিং ছিল, সে-টুকুও গুঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীতেও দাঁড়ি পড়ে। মানুষের এই মূর্তিই মানিকবাবু এঁকেছেন। এই গুঁড়িয়ে যাওয়াটাই মানিকবাবুর বিষয়। দেখতে গেলে এটা তুচ্ছ—ভাবতে গেলে এটা গুরু-গভীর। সে মানুষই আবিষ্কার করে যে তার জীবন মহাকাব্য তো দূরের কথা, ভালো করে লেখা একটা কবিতাও নয়।

দেখতে গেলে তুচ্ছ, ভাবতে গেলে গভীর মানিকবাবুর ভাষাও। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই তাঁর সার্থকতার স্তরে বক্তব্যের উপযুক্ত ভাষা গড়ে তোলেন—

ঔপন্যাসিকের ভাষার সেই তাৎপর্যপ্রসঙ্গে কয়েক বছর আগে 'পরিচয়' পত্রিকায় আলোচনা করা হয়েছে—এ কথা নতুন কথা কিছু নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশ্নটা হল যে মানিকবাবুর ভাষার শক্তিটা কোথায়? সেক্ষেত্রেও আবার জগদীশবাবুর সঙ্গে তুলনাতেই মানিকবাবুর ভাষার বিশিষ্টতাকে বোঝা যাবে। জগদীশবাবুর ভাষায় বিন্দুমাত্র রাবীন্দ্রিকতা নেই। এবং সে গদ্য ব্যাখ্যামূলক ভঙ্গি গ্রহণ করতে ভালোবাসে। নিচের উদাহরণটি তার প্রমাণ।

> স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনের একটা সূত্র না থাকিয়া পারে নাই; কিন্তু প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত প্রবেশ করিয়াছিল এ কথা বলা চলে না। সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা জন্মিয়াছিল—মাঝে মাঝে তা ফুটিত; তার উপর কোথায় ভয়াবহ দণ্ডপাণি এক শাসক বসিয়া আছেন—তিনিও টানিয়া লইয়া প্রকাশ্যে একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন—মাখন তা অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে, চিনিবার দিকে এমন উগ্রভাবে সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা যেমন কঠিন, চিনিতে পারার পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেমনি কঠিন। সুখের হোক দুঃখের হোক তবু স্পর্শ ছিল—সুখে দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রবল হইলেও কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিল; অভিমানবোধ ছিল; আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল—
>
> সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এত বড়ো ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে তাহার উদ্দেশ নাই।

[একটি কলঙ্কিত কাহিনী। জগদীশ গুপ্ত]

শেষের কয়েকটি শব্দে লক্ষ্যভেদী-অনুচ্ছেদটিকে অব্যর্থ করে তোলার জন্যই যেন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা-বিস্তৃত অনুচ্ছেদটি লেখা হয়েছে। লক্ষণীয় ভাষার অ-রাবীন্দ্রিকতা। 'প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত' বা 'সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা'—প্রভৃতি বাগভঙ্গি শরৎচন্দ্রীয় প্রসাদ-পুষ্ট কানে অনভ্যস্ত ঠেকে। কিন্তু দীর্ঘ এবং আপাত শিথিল বাক্যের অন্তরে একটা শক্তি রয়েছে—যেটা জগদীশ গুপ্তের ভাবুকতার দান। মানুষের দুর্বলতা, এবং নিঃসহায়ত্বের

কথা বলতে গিয়ে তাঁর জীবনের নানা স্বতঃবিরোধের কথা বলতে হয়—বাক্যাংশগুলি তাই যেন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ভাবে লগ্ন নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মানুষের সর্বজনীন নিবুর্দ্ধিতার অংশ বিরাজমান। তাকে আবেগে রঙিন করে তোলা জগদীশ গুপ্তের কাজ নয়। গদ্যধারা তাই একান্ত নিরভিমান, মনোভঙ্গি নিরাসক্ত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ের গদ্যের সাধারণ লক্ষণও এই ; কিন্তু সাধারণ ধর্ম পৃথক। জগদীশবাবু থেকে যে অংশটুকু উধৃত করা হল তার "মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে···" এই অংশটুকুতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায় বটে—তথাপি গভীরতর অভিনিবেশে মানিকবাবুর অধিকতর শক্তি সম্বন্ধে সদাই অবহিত হওয়া যায়। নিচের উধৃতিটি তার প্রমাণ।

> স্নেহ প্রেম মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মূর্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধা থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলে, বাঁধন-শুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের কাজটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য ; তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখ দেখে আমার মনে হল, রাধুনীর কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ-শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।
>
> [বৃহত্তর ও মহত্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায় যে জগদীশবাবুর ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা ভাবুকতা বলছি মানিকবাবুর ক্ষেত্রে সেটা শুধুই ভাবুকতা নয়, তদতিরিক্ত কিছু—সেটাই মানিকবাবুর দার্শনিকতা। জগদীশবাবু বুঝতে পারতেন যে-বিষয়বস্তু তিনি হাতে নিচ্ছেন তা অনন্যস্পৃষ্ট—কিন্তু এই বিষয়-ভাবুকতা তাঁকে কিছুটা আবদ্ধ করে ফেলত। বিষয়কে তিনি যেন বড় বেশি মূল্য দিতেন। মানিকবাবু সে ক্ষেত্রে জানতেন যে মানুষের অন্তর্জগতকে যদি সে নিজেই আনমনে আবিষ্কার করে ফেলে তাহলে সে-প্রসঙ্গে আর কোনো বিষয়ই তুচ্ছ নয়, কোনো বিষয়-গৌরবই গৌরবের নয়। এই দার্শনিকতাই মানিক-বাবুর ভাষাতেও প্রতিবিম্বিত। মানবিক হৃদয় অথবা প্রকৃতির খণ্ডলীলা যে

কোনো কিছুর বর্ণনাই তখন তাঁর হাতে হয়ে পড়ে সেই দার্শনিকতারই ভাষা-মাধ্যম। তাই অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে পদ্মার রূপবর্ণনা :

> কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। ষ্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে—তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে।
>
> তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র-কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারাজীবন। (পদ্মানদীর মাঝি)

সাধারণ বক্তব্য থেকে মানিকবাবু কেমন ভাবে গভীর কথা ছেঁকে আনেন উধৃতিটি তারও নিদর্শন বটে। গতিশীল যানের ওপর থেকে সব কিছুই পশ্চাদ্‌গামী বলে মনে হবে এই অতি সাধারণ তথ্যটি 'পদ্মানদীর মাঝি'র বিশিষ্ট তাৎপর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েই অর্থবান। এর মধ্যে অনন্যসাধারণত্ব কিছু নেই। কিন্তু মানিকবাবু যেই বলেন 'তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য', যেই বলেন একাভিমুখী জলস্রোতের কথা, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার ছলচ্ছলে যেমন কান পাতলে সমুদ্রের ধ্বনি শোনা যায়—মানিকবাবুর এই সংক্ষিপ্ত সরলোক্তিও তেমনি সুগভীরের ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। নদী ছাড়া সবই বাহুল্য—এর মধ্যে জীবনের নিষ্ঠুর বৈরাগ্যের হঠাৎ ছায়া পড়েছে। এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর ভাষা এঁর "শিল্পসার্থকতার অন্যতম কারণই" শুধু নয়, এই ভাষাতেই ইনি জীবনকে ভেবেছেন। এখানে ভাবনাই ভাষা।

প্রসঙ্গত আরো বলা যায় এই প্রকৃতিচেতনাও মানিকবাবুর এক বিশিষ্ট সম্পদ। তিনি জগদীশ্ গুপ্ত থেকে যে সমস্ত কারণে অধিকতর অগ্রসর—এই প্রকৃতিচেতনা তার অন্যতম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিদৃষ্টির ভিতরে যে শিশুর আনন্দ ও ঋষির বিস্ময় ক্রিয়াশীল ছিল—মানিকবাবুর প্রকৃতিচেতনা সে আনন্দ-বিস্ময়ের সঙ্গে বস্তুত সম্পর্কহীন। এ প্রকৃতি নিয়তির মতো নিষ্ঠুর বলে যে আমাদের মনে দাগ কাটে তা নয়, এ বৈরাগীর মতো অনাসক্ত বলে আমাদের তুচ্ছ আকাংক্ষাকে কোনো মূল্যই দেয় না। জীবলীলার প্রতি অনাসক্ত এই প্রকৃতির কথা মানিকবাবু বারে বারে

বলেছেন। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় নদী বা জল তাঁর গল্পে একাধিকবার পৃষ্ঠ-পট রচনা করেছে। অন্তত বেশ কয়েকটি উপন্যাসে ও ছোট গল্পে এ কথার সাক্ষ্য মেলে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের নিরুপায়-মানুষের চরিত্রার্থ এই পটভূমিকায় স্বভাবত অন্যতর তাৎপর্য পেয়েছে। জগদীশবাবুর লেখাতে দেখা যায় যে বারে বারে তিনি অন্ধকারের কথা বলেছেন—তাঁর অন্ধকারের স্মৃতি দুর্মর। মানিকবাবু সে ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে আলো-অন্ধকারের কথা বলতে জানতেন। কারণ—আবার, আমরা আগের কথাতেই ফিরছি—মানুষের অন্ধকারে নিঃসহায় মূর্তি নয়, নিরুপায় মূর্তিটির নানা প্রয়াসের কথা ছিল তাঁর যাত্রারম্ভের কালের প্রধান কথা। অথচ মানিকবাবু ছবি আঁকতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। "অন্ধকার এত গাঢ় যে মনে হয় ধোঁয়ার মতোই বুঝি বাতাসে উড়িয়া যাইবে", অথবা "কুবের মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নদীর বাতাস কপিলাকে স্পষ্ট করিয়াছে। শাড়িখানি মিশিয়া গিয়াছে অঙ্গে", অথবা, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসীর মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তনদুটি ভাসে আর ডোবে"—এর কোনো ছবিই ঘটা করে রঙ তুলি নিয়ে আঁকা হয় নি। নদীর স্রোত যেমন চলতে চলতে তটের ওপর আঁকিবুকি কাটে, অথবা হাওয়া আঁকে মেঘের গায়ে এও তেমনি। কপিলার স্তন অথবা কীর্তিনিয়োগীর মাথার আর (পুতুলনাচের ইতিকথা)—লেখক কোথাও জড়িয়ে পড়েন না, কেননা বাইরের দিক থেকে বিষয়-বিমুক্ত বলেই তিনি অন্তরে আসক্তিবিহীন। বর্ণনায় রঙ নেই, শুধু আছে নিরভিমান রেখা। এইখানে দাঁড়ালেই আরো বোঝা যায় যৌনতা-অযৌনতা প্রভৃতি মানিকবাবু প্রসঙ্গে কত অবান্তর কথা। সমীচীন ভাবেই রথীনবাবু এগুলোর আর একবার প্রতিবাদ করেছেন।

বর্তমান সংকলনটি দেখে মনে হয় এঁরা মানিকবাবুর সারাজীবনের গ্রন্থাবলীর কতকগুলি কালানুক্রমিক সংকলন প্রকাশ করবেন। এটি তারই প্রথম ভাগ। এখানে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত মানিকবাবুর সাহিত্যকর্মের পরিচয় প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। পুতুলনাচের ইতিকথা এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে সবদিক থেকেই—বিশেষত সংকলনটির আত্মার দিক থেকে পূর্ণতা পাওয়া যেত। মানিকবাবুর শিল্পীজীবনের এই পর্যায় পাঠকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক। তখনও শরৎচন্দ্রের কিছু জের মানিকবাবুর রচনায় রয়েছে—রথীনবাবু সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি ন্যায়ত আকর্ষণ করেছেন।

অথচ তখনই তাঁর নিজস্ব পথও তিনি খুঁজে পাচ্ছেন। নেকি ও শিপ্রার অপমৃত্যু গল্প দুটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সর্পিল', 'মহাসঙ্গম', 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পগুলির কথাও এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। সুখ, সততা, ঈশ্বর প্রভৃতি পুরনো কথাগুলো যখন মানুষের জীবনে শুধু স্মৃতিতে পর্যবসিত হতে চলেছে গল্পগুলিতে সেই জটিল সময়ের স্বাক্ষর স্পষ্ট। বাংলা কথাসাহিত্যে সর্বপ্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিজ সাহিত্য সীমানা থেকে হিউমারকে বিসর্জন দিলেন—জটিলতা থেকে অধিকতর জটিলতায় অবতরণ যেখানে মূল সুর সেখানে এটাই স্বাভাবিক। সব সময়েই এই সূত্রে একটা কথা স্মরণীয় যে এ জটিলতা কদাপি বাইরের জোটপাকানো জটিলতা নয়।

সুতরাং এই নিরুপায় মানুষের চেহারা আঁকতে গিয়েই মানিকবাবু দারিদ্র্যকেও এঁকেছেন। মাটির সাকি বা আত্মহত্যার অধিকার গল্পদুটির কথা এক্ষেত্রে বলা যায়। এবং এইখানেই তিনি একটা সীমাবদ্ধতার দুর্ভোগ বহন করলেন। মানিকবাবুর পক্ষে এটা অবশ্যই স্বাভাবিক যে দারিদ্র্যকে তিনি উচ্ছ্বাসে আবেগে চিত্রল করে তুলবেন না। কিন্তু দারিদ্র্যের প্রাকৃত চেহারা আঁকতে গিয়ে মানুষকে দরিদ্র করে ফেললেই আপত্তি। বর্তমান সংকলনের গল্প সংগ্রহে সে ব্যাপার ঘটেনি। কিন্তু তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের কোনো কোনো গল্পে তা ঘটেছে। লক্ষণীয় যে মানিকবাবু দারিদ্র্যের চেহারা দুভাবে আঁকেন। পদ্মানদীর মাঝিতে দারিদ্র্যের চেহারায় জীবনের সংকীর্ণতা নেই, মাটির সাকি প্রমুখ গল্পে দারিদ্র্য জীবনকে সংকীর্ণ করেছে—এই কথাই লেখকের বক্তব্য। এই শেষোক্ত বক্তব্যকে বাস্তবতার সাধনা বলে কখনো কখনো মানিকবাবু মনে করেছেন। এটা বস্তুত পক্ষে ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে আসা। মানিকবাবু উপলব্ধি করেছিলেন যে এই ভাবে ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে আসা অনিবার্য। কিন্তু অন্তরময় মানুষের কথা আর বাইরের যন্ত্রণাময় মানুষের কথা একই দার্শনিক গ্রন্থিসূত্রে অন্বিত করা যাবে না। তাই মধ্যবর্তী পর্যায়ে মানিকবাবু নানা মুখে পথ খুঁজেছেন। এই পর্যায়ে মানিকবাবুর লেখায় ধীরে ধীরে কী ভাবে নিরুপায় মানুষ অপেক্ষা মানুষের বিশ্লেষক মূর্তি প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা দেখানো চলে। তারই অন্তর্নিহিত ন্যায়ক্রমের পরিণতিতে মানিকবাবু মার্কসবাদীদের সাধনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

স্বভাবত এ পথ দীর্ঘ। এবং শুধু দীর্ঘ নয়, জটিলও বটে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সদাই এই দীর্ঘ পাদ পরিক্রমা স্মরণীয়। মানিকবাবু মার্কসবাদী হতে

চেয়েছিলেন বলেই এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, এর মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা হল মানিকবাবুর বারে বারে নিজেকে অতিক্রমের প্রয়াস। কোনো সমালোচকই তাঁর মার্কসবাদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে মানিকবাবুর এই শেষতম পর্যায় নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন না, করা সমীচীন নয়; ঠিক তেমনি মানিকবাবুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের দুখানা কি একখানা বই নিয়ে আলোচনা করে মানিকবাবুর লেখায় যৌনতা আবিষ্কার করে চমকিত হওয়া উচিৎ নয়। একজন শিল্পীর সমগ্র জীবনের অন্বেষার তাৎপর্য-বিচার সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়েই করা দরকার। মানিকবাবু সেক্ষেত্রে ফাঁকি দেননি। ভাল ভদ্র অশ্লীল গল্পের বাজার-দর আছে। ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক সেই বাজারের ফরমাসে সে গল্প লেখেন, জীবনের জটিলতায় লেখক-নায়ক সেকথা আমাদের জানিয়েছে। এই ফাঁকিতেই ছিল মানিকবাবুর প্রচণ্ড আপত্তি। প্রকৃতপক্ষে সরলীকরণের লোভ যে-লেখকটির একেবারেই ছিল না, তাকে বিচার করার সময় আমরা যেন সরলীকরণের সুবিধাভোগী না হতে যাই। তার আগে একবার অন্তত যেন মানিকবাবুর নায়ক-পর্যায়ের দিকে তাকাই। তাহলে দেখতে পাব—প্রথম পর্যায়ের নিরুপায়ত্বের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত নায়ক, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্লেষক নায়ক, তৃতীয় পর্যায়ে সমগ্রতাসন্ধানী নায়ক হতে চেয়েছে। সত্য-সন্ধ লেখক মাত্রেই এ কথা বোঝেন যে জীবন শিল্পের থেকে বড় বলেই শিল্প কখনো জীবনের কোলছাড়া হতে পারে না। শিল্পকে খুঁজে ফেরেন তিনি, জীবনকে খুঁজতে খুঁজতেই। শিল্পে সাময়িক সিদ্ধি তাই, তাঁর কোনো পিছুটান রচনা করতে পারে না। বর্তমান সংকলনে, যে-লেখক 'দিবারাত্রির কাব্য' লিখেছেন, তিনিই শিপ্রার অপমৃত্যু লিখেছেন। ব্যর্থতম গল্প 'বৃহত্তর ও মহত্তর' লিখতেও তাঁর বাধে না। কারণ তিনি জানেন মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করার প্রয়াসের পথে নিজেরই ব্যতিক্রম রচনা করে। আর সেই শিল্পীর জন্যই করুণা হয় যিনি শিল্পী হবার বাসনার পায়ে দাসখৎ লিখে দেন সহজে। তাঁরা সিদ্ধির পাদপীঠে ছাড়া—সেটাও আবার বাজার-সিদ্ধি—সত্যকে খুঁজতে যান না। মজার কথা এঁরাই কেউ কেউ নিঃশেষিত মানিকবাবুর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকেন। তবে আমরা জানি তাঁরা অনেকেই আজ আছেন কাল থাকবেন না—কিন্তু তাঁদের অনেক পরেও বাংলাদেশের নতুন নতুন লেখকদের প্রভাবিত করে চলবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—শিরোপাবিহীন লেখক।

যুগান্তর চক্রবর্তী

উপন্যাস : ভাষা ও চিন্তা

সাহিত্যের প্রয়োজনে বড় দীর্ঘকাল মানুষ ভাষা ব্যবহার করেছে —এ কথা উপলব্ধি করার সময় দেশকাল নিরপেক্ষ প্রত্যেক আন্তরিক লেখকের ক্ষেত্রেই কখনো-কখনো উপস্থিত হয়। ভাষার সহিত জড়িত এই ভাবনায় লেখক অনুভব করেন, এত দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত মানুষের ভাষা যেন বা জাগতিক নশ্বরতাকে অমরতাদানে আর সক্ষম নয়। মনে হয়, পরিচিত ভাষার ব্যবহারে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার ক্লান্ত ধারাবিবরণী যেন এক নিরর্থক বিড়ম্বনা। এবং কোনো কোনো লেখকের ক্ষেত্রে ভাষার সহিত জড়িত এই সমস্যা ও প্রশ্ন এমন চরম, নির্বিকল্প মূল্য পায় যে, উক্ত লেখকের সাহিত্যচর্চা এই সমস্যার সমাধান ও প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের ইতিহাস মাত্র বলা চলে।

সমস্যাটা অবশ্য মুখ্যত গদ্যসাহিত্য বা উপন্যাসের নয়, এ-সমস্যা একান্ত ভাবেই কবিতার নিজস্ব সমস্যা। কারণ, কবিতা কবি ও প্রত্যক্ষ বিশ্বের অন্তর্গত নশ্বরতার সেই অমর যাতায়াত, শব্দাশ্রয়ী ভাষা যার একমাত্র পার্থিব অভিজ্ঞান। কবিতার ইতিহাসে তাই এমন সময় আসে যখন ইতিপূর্বে বহুবার উচ্চারিত ভাষায় বস্তুর নাম অবধি উচ্চারণে কবি পরাঙ্মুখ হন, যেহেতু এ পরিণামী উচ্চারণে বস্তুর রূপ ঝরে, বস্তুর শুদ্ধতা নষ্ট হয়। অপরপক্ষে, উপন্যাস সাহিত্য যেহেতু স্থান ও কালে স্থাপিত মানুষের জগন্ময় বাস্তবতার বিন্যাস, সেহেতু উপন্যাসের বহুবিস্তারী আয়তনে সকল বস্তুর নাম ও পরিণাম, রূপ ও রূপহীনতা, শুদ্ধতা ও শুদ্ধতার বিনাশ পরস্পর ক্রিয়াশীল ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ সমগ্রতার সন্ধান করে, যার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় উপন্যাসের ভাষা তাৎপর্যময় কথিত উক্তির নিকটবর্তী। কিন্তু জীবন যেহেতু জীবনাতীতের সোপান, মহৎ উপন্যাসমাত্রই তাই কবিতার লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত

অন্তর্জলী যাত্রা। কমলকুমার মজুমদার। কথাশিল্প প্রকাশ, সাড়ে পাঁচ টাকা।
রক্তের হাওয়া। অসীম রায়। কথাশিল্প প্রকাশ, পাঁচ টাকা।

হয়, শুধু আধুনিক কালেই নয়, উপন্যাসের জন্মকাল থেকেই হয়েছে। এবং আপন কালে প্রচলিত কথিত ভাষার উপরোক্ত তাৎপর্যদানের প্রশ্নে ভাষাচিন্তা উপন্যাসের চিন্তাও বটে।

ইদানীন্তন বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য-চর্চায় উপন্যাসের এই ভাষাচিন্তাই কি এক অভিনব, সর্বাত্মক রূপ ধারণ করে? কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য, বিশেষত 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস পাঠের পর এ-প্রশ্ন স্বতঃই পাঠকের মনে দেখা দেয়। কমলকুমার মজুমদার যদিও বর্তমান বাংলাদেশের শুধুমাত্র সাহিত্যিক-পাঠকগণের মধ্যেও সমধিক পরিচিত নন, তথাপি তিনি বেশ কিছুকাল যাবৎ সাহিত্যচর্চায় রত, যদিও 'অন্তর্জলী যাত্রা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এবং কমলকুমার মজুমদারের অন্যান্য রচনার ন্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা'ও সেই ভাষায় রচিত যা চলিত অর্থে সাধু ভাষা। কিন্তু এই শুদ্ধ ভাষা শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের প্রচলিত সাধুত্বের উপর নির্ভর করে না। লেখকের চৈতন্যের প্রয়োগে এই শুদ্ধ ভাষা শুদ্ধতার সংজ্ঞা অবধি নতুন অর্থে নির্ণয়ের অপেক্ষা রাখে। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্যাসের প্রয়োজনে বাংলা গদ্যভাষার যে-প্রথম সৃষ্টিশীল স্ফূর্তি, আপন মনীষায় বাঙালী মানসের সামগ্রিকতা প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার যে জীবনব্যাপী সাধনা, রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক লেখকগণের কথনো সার্থক-কথনো-অর্ধমনস্ক প্রয়াস ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্চর্য সিদ্ধি, এবং নিতান্ত সাম্প্রতিককালের চরিত্রহীন, নিরুদ্দেশ গদ্যচর্চার ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন যেন কমলকুমার মজুমদারের নিকট নিরর্থক লাগে। তাই বাংলা গদ্যভাষার ধারাবাহিক বিবর্তনকে "অস্বীকার করে", শুদ্ধতার প্রয়োজনে, অদ্যাবধি ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের সকল অনুষঙ্গের অতীত, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গদ্যের শুদ্ধ উৎসে কমলকুমার মজুমদার আত্ম-মুক্তির পথ খোঁজেন। এবং প্রাচীনতার উৎস সন্ধানে, মনে হয়, কমলকুমার মজুমদার ইংরেজপূর্ব বাংলা গদ্যভাষার সুপ্রাচীন নিদর্শন অবধি অগ্রসর হন।

কমলকুমার মজুমদারের এই উৎস-সন্ধানের কিছু প্রেরণা হয়ত নিছক প্রাচীনতাপ্রীতি। অন্তত এ-ধারণা ঈষৎ প্রশ্রয় পায়। কারণ, 'অন্তর্জলী -যাত্রা'র প্রচ্ছদপট, গ্রন্থসজ্জা, লেখকের ভাষায় "টাইটেল পৃষ্ঠা ইত্যাদির অক্ষর আজ্ঞা", এমনকি ব্যক্তিনামের পূর্বে "বাবু" শব্দটির প্রয়োগে প্রাচীন বাংলা ঐতিহ্য যে-পরিমাণ সচেতন যত্নে অনুসৃত, তাতে মনে হয় লেখকের

ঐতিহ্যবোধ যেন নিতান্তই ঐতিহ্যের আক্ষরিক অনুবাদ। মনে হয়, ঐতিহ্যের অনুসরণে অন্তত এ-ক্ষেত্রে লেখক যেন বড় বেশি অভিমানী। কিন্তু এই অতিশয় অভিমানের পর, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বক্তব্য ও বিষয়-ভাবনায়, চিন্তা ও দর্শনে, ইংরেজসৃষ্ট বাংলার দুশো বছরের ইতিহাসের অতীত যে-ঐতিহ্য স্বভাবময় রূপ পায়, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে তা ইতিপূর্বে ধারণাতীত ছিল।

'অন্তর্জলী যাত্রা'র স্থান ও কাল রামমোহনকালীন বাংলাদেশ ; ঘটনাপট গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশানভূমি ; নায়ক চাঁড়াল বৈজুনাথ, এ মহাশ্মশানে যে "রূপরস-গন্ধের সততা মানিয়া নির্ভীক।" এই উপন্যাসের কাহিনীর সূত্র "গঙ্গাতীরে অন্তর্জলী উদ্দেশ্যে আনীত সীতারাম চট্টোপাধ্যায়।" এবং কাহিনীর এই সূত্রে জ্যোতিষী অনন্তহরি ঘোষণা করেন, "চাঁদ যখন লাল তখন তার প্রাণ যাবে··· যাবে কিন্তু একা যাবে না হে। দোসর নেবে···" তাই, এই শ্মশানভূমিতে যশোবতীর সম্প্রদান হয়, যে-যশোবতীর মনে "পুষ্পের অজ্ঞতা ব্যতীত কিছুই ছিল না।" এবং সম্প্রদানের পর বৃদ্ধ, মৃত্যুমুখী সীতারাম "পদাঘাত করিবার অমানুষিক ঔদ্ধত্যের সহিত কহিলেন, 'বাঁচব'।" এ-উপন্যাসের বিষয় তাই অমরতা। এবং সত্যিই এই উপন্যাসে অমরতা সহজে উচ্চারিত হয়। তাই গ্রন্থের প্রথমাংশে কাহিনীর সূত্রে উপস্থিত জ্যোতিষী অনন্তহরি, কবিরাজ বিহারীনাথ, কুলপুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ, দুই ভাই বলরাম ও হরেরাম ইত্যাদি নশ্বর জগতের লৌকিক প্রতিনিধিগণের শেষাবধি আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। এই অমরতার জগতে একদিকে থাকে সীতারাম-যশোবতীর শ্মশান-বাসর। অন্যদিকে চাঁড়াল বৈজু, এই মহাশ্মশানে ভ্রাম্যমান ভীষণ সহজ বৈজু চাঁড়াল, প্রাকৃত বৈজুনাথ, যে "নীচ কুলোদ্ভব", তাই "ঊর্দ্ধ আকাশে হাস্যধ্বনি ছড়াইয়া" দেয়, সে স্বভাবত শাস্ত্রবাক্য বলে, কারণ, "ই যে মহাটোল বটেক।" ভূমিকায় লেখক নিজে বলেন, "এই গ্রন্থের ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের, ইহার কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের।" বড় চমৎকার ভাবে লেখক বলেন যে, এ-গল্প "ঈশ্বর দর্শন যাত্রার গল্প।" বর্তমান বাংলাদেশে এ-গল্প বলার সাহস একমাত্র কমলকুমার মজুমদারই রাখেন।

এই গল্পের প্রয়োজনেই কি কমলকুমার মজুমদার আলোচ্য গ্রন্থে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন? কিন্তু দেখা যায়, কমলকুমার মজুমদারের গল্পের বিষয় যখন আধুনিক কাল, তখনো, প্রখর ঐতিহ্যবোধ ও শুদ্ধতার প্রয়োজনে, বাংলা

গদ্যের শুদ্ধরূপ লেখকের অবলম্বন। কমলকুমার মজুমদারের সকল রচনায়, বিশেষত আলোচ্য গ্রন্থে, লেখকের ঐতিহ্যআশ্রিত ভাষা ও চিন্তাই তাই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এবং এই ভাষার প্রসঙ্গেই প্রশ্ন দেখা দেয়, উপন্যাসের ভাষামুক্তির প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন কি কিছুমাত্র সত্য নয়? কমলকুমার মজুমদারের নিকট এ-প্রশ্ন হয়তো ধৃষ্টতামাত্র হবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা জাগে, সমাজজীবনের সকল কার্যকারণের ন্যায়, ভাষার বিবর্তনের ন্যায়, বাঙালীর ধর্মচিন্তা, বাঙালীর মাতৃসাধনার ইতিহাসও কি ঐতিহাসিক চেতনাময় এক অনিবার্য বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে না? "এই গ্রন্থের ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের, ইহার কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের।" ইতিপূর্বে উদ্‌ধৃত এই উক্তিপ্রসঙ্গে লেখক ইঙ্গিত দেন, কিন্তু বলেন না, সমাজবিবর্তনের কোন্ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় রামপ্রসাদের মাতৃ-সম্বোধন কাব্যরূপ পায়, এবং উনিশ শতকের নবজাগৃতির পটভূমিকায় রামকৃষ্ণে তা একান্তভাবে লোকাশ্রয়ী। ইতিহাস হয়তো জীবনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি নয়, কিন্তু সামাজিক কার্যকারণের ঐতিহাসিক চেতনা ছাড়া এই স্বরূপভেদ কি করেই বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? সাধক রামপ্রসাদ, নিঃসঙ্গ কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে মাতৃমূর্তির স্বতই কথা হয়, আমরা তা অন্তরাল থেকে শুনে থাকি। কিন্তু রামকৃষ্ণের কথামৃতের একমাত্র উপলক্ষ মানুষ, অজস্র মানুষ, কখনো অতিমানব, বাংলার জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের পুরোধা বিদ্যাসাগর, বঙ্গনাট্যের নায়ক গিরীশচন্দ্র এবং পরিশেষে আগামী বাংলার প্রাণশক্তির প্রতীক যুবক বিবেকানন্দ। এবং তারই মধ্যে মধ্যে সেই সব মানুষ, নিরাশ্রিত, নিরবলম্ব, ভাষাহীন, যারা নিজেরাই শুধু আপন প্রয়োজনে রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয় না, আপনকালের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রামকৃষ্ণ যাদের নিকট যান। রামপ্রসাদের পর বাংলাসাহিত্যে শাক্তসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণের পর বাংলার সমাজজীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়োজন হয়।

এ-প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় এই যে, সমাজবিবর্তনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঐতিহাসিক প্রয়োজনের এই ভিন্নতা সত্ত্বেও, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের মাতৃসম্বোধনের ভাষা কিন্তু তাঁদের আপন-আপন কালের প্রাণশক্তিময় কথ্যভাষা। আপনকালের কথিত ভাষায় শুদ্ধতার জটিল সম্ভাবনা অনুসন্ধান না করে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় উপন্যাসের ভাষাশক্তির কোন্ প্রয়োজন সাধিত হয়? উপন্যাসের লক্ষ্য বাস্তবতা, বাস্তবাতীতেরও স্থানকালশাসিত বাস্তবতা, ঐতিহ্য-

বোধেরও বাস্তব ঐতিহাসিক চেতনা। উপরন্তু, 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বাঙালী মানসের যে-ঐতিহ্যআশ্রিত জগৎ কমলকুমার মজুমদার উপস্থিত করেন, তা এমনই অমর, এমনই সম্পূর্ণ, পূর্বাপর সম্পর্কহীন ও দূরান্বয়ী যে বর্তমান বাংলার জীবনসত্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধস্থাপন সহজ হয় না। অথচ বিশেষ স্থান ও কালের সহিত আপন কালের সম্বন্ধযুক্ত সত্যের ধারাবাহিক, অর্থময় ইতিবৃত্ত রচনাই উপন্যাসের কাজ। ফলে, বর্তমান বাংলার সমাজজীবনের বাস্তবতায়, এই নৈমিত্তিক কুরুক্ষেত্রে, যেখানে পরাজয়ের প্রশ্ন অবান্তর, কারণ পরাজয় পূর্বনির্ধারিত, সম্মুখসমরের অবকাশহীন এই প্রাত্যহিকতায় যেখানে আত্মার অবধারিত বিনাশ বিনাসমারোহে সমাপ্ত হয়, সেখানে কমলকুমার মজুমদার, উপন্যাসের পটক্ষেপে, চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত শুদ্ধ গদ্যের ব্যবহারে, কোন্ মূল্যবান উক্তিসমূহ উচ্চারণের আশা করেন?

এ-সকলই প্রশ্নমাত্র। 'অন্তর্জলী যাত্রা' গ্রন্থপাঠের পর, প্রশ্ন, অসংখ্য প্রশ্ন মনে জাগে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ন্যায় গ্রন্থের আলোচনায় এ-জাতীয় কিছু-কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া আলোচকের পক্ষে কোন্ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেই বা উপনীত হওয়া সম্ভব! এবং এই সকল প্রশ্ন ঘোরতর হয় যখন দেখা যায় যে, নিদারুণ প্রশ্নের পরও, ভাষা ও ভাবনার অব্যর্থ ঐক্যে, অভিপ্রেত তাৎপর্যে কমলকুমার মজুমদারের আশ্চর্য সিদ্ধি না-মেনে উপায় থাকে না; যখন দেখা যায় যে, শব্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কদাচ ইন্দ্রিয়ের আসক্তিমাত্র নয়, "গীতায়" উক্ত ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকল আহুতি দিয়ে কমলকুমার মজুমদার আত্মার পরমতাকে স্পর্শ করেন। তাই এই সকল প্রশ্নের কিছুমাত্র উত্তর হিসেবে বর্তমান আলোচকের মনে হয় যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভাষা ও বিষয়-ভাবনায় কমলকুমার মজুমদার যে-সমস্যা উপস্থিত করেন সে-সমস্যা উপন্যাসের নয়, কবিতার। উপন্যাস যে-সত্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত, কবিতা সেই ইতিবৃত্তের পরম পরিণাম। তাই, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কালচিত্রন ও প্রতিবেশ রচনায় কমলকুমার মজুমদারের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা যদিও বর্তমান বাংলাসাহিত্যে অভূতপূর্ব, তথাপি 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় এই চিত্ররচনার কাজ লেখক যেন কবির মতোই করেন। এই উপন্যাসে তাই বিশেষ কিছুই ঘটে না। যা হয়ে ওঠে, আখ্যানের আকারে তা উপস্থিত করা অসম্ভব। লেখক নিজেই গ্রন্থের একস্থানে বলেন, "এ কোন ঘোর বাস্তবতা! এই কি পৃথিবী! তথাপি এ হেন দৃশ্যে গোলাপ ছিল, এ হেন দৃশ্যের স্বাদ ছিল।" কমলকুমার মজুমদার

প্রকৃতই কবি। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র সর্বত্র কবিতার শুদ্ধ কাজ। উপন্যাসের যতটুকু কবিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কবিতার যতটুকু উপন্যাসের আয়ত্তাধীন, ততটুকু কবিতা নয়, 'অন্তর্জলী যাত্রা' এক অমোঘ কাব্যের মর্মস্থলে স্থাপিত। এই উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃতি দেওয়া অসম্ভব। কারণ, সকল অমোঘ কাব্যের ন্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা'ও প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে।

'অন্তর্জলী যাত্রা' পাঠে তাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উপন্যাসপাঠকগণ কিছুমাত্র উপকৃত হবেন, এমন আশা কম। উপন্যাস লেখকগণও যে কিছুমাত্র উপকৃত হবেন, এমন আশা আরো কম। কারণ, এ-হাস্যকর অবস্থা বর্তমান বাংলাদেশেই দেখা দেয় যে, উপন্যাস লেখকের মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পাঠকের মানসিকতার স্তরেই আবদ্ধ। উপকৃত হতে পারেন একমাত্র কবিরা, অবশ্য সাহিত্যের উপকারিতায় বর্তমান বাংলার তুখোড় যুবক, বুদ্বুদবিলাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত কবিগণের যদি কিছুমাত্র আস্থা থাকে।

এই সব কথার পরও অবশ্য কথা থাকে। কথা এই যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র স্বরূপ ও সিদ্ধি নিয়ে মতামত যাই হোক না কেন, ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধের যে মৌলিক প্রশ্ন কমলকুমার মজুমদার উত্থাপন করেন, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে তা দিগ্‌নির্দেশকারী। এ-কথা যথার্থই মনে হয় যে, বর্তমান বাংলাদেশের প্রচলিত কথ্য ও সাহিত্য ভাষা সর্বপ্রকার মহৎ বিষয় ও ভাবনা ধারণে অক্ষম। এবং কথিত ভাষা ও ভাষা-ঐতিহ্যের সমন্বয়ে উপন্যাসের ভাষাচিন্তার প্রয়োজনীয় সমাধান যদিও 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় অসম্পূর্ণ থাকে, তথাপি কমলকুমার মজুমদার-নির্দেশিত ভাষা-ঐতিহ্যের উৎসেই হয়তো বাংলা গদ্যভাষার মুক্তি নিহিত আছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান কালের রূপহীন, ধর্মহীন, পরিপ্রেক্ষিতহীন বাঙালী মানসের ভবিষ্যৎ যদিও ঐতিহাসিক কার্যকারণ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল, তথাপি শুদ্ধ ঐতিহ্যবোধের কেন্দ্রে বাঙালীমানসের প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় কমলকুমার মজুমদার বর্তমান বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহেই পথিকৃৎ।

•

শ্রীযুক্ত অসীম রায়ও গদ্যভাষার সচেতন লেখক। এবং অসীম রায়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'রক্তের হাওয়া'র নায়ক নিজেও যেহেতু লেখক, সেহেতু এ-উপন্যাসে নায়কের ভাবনায় লেখকের ভাষাভাবনা স্বভাবতই আসে। কিন্তু ভাষাচিন্তা অসীম রায়ের নিকট কখনোই চূড়ান্ত মূল্য পায় না, অভিজ্ঞতার

প্রকাশে অসীম রায় শুধু সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ম্রিয়মান বাচালতায় একপ্রকার চারিত্র্য দান করেন। আধুনিক বাঙালীর জীবন ও বুদ্ধিচর্চায় অসীম রায়ের গদ্যভাষায় কিছু-কিছু বাক্যালাপ সম্ভব।

কমলকুমার মজুমদার ও অসীম রায়ের কোনো তুলনামূলক বিচার এ-আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তুলনা অবান্তর। কারণ, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে কমলকুমার যা অর্জন করেন, শুধু অসীম রায় কেন, সকল জীবিত লেখকের মিলিত প্রয়াসেও তা আয়ত্তাতীত। তবে কমলকুমার মজুমদারের ন্যায় অসীম রায়ও সাম্প্রতিক উপন্যাস-সাহিত্যে প্রায়-অপরিচিত লেখক, যদিও তিনি ইতিপূর্বে আরো তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। যে-কালে উপন্যাসের বিষয়বিচারে বাংলাদেশের উপন্যাস লেখক নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনীয় এবং বিষয়নিরপেক্ষ ভাবনায় যে-কালে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকগণ শিল্পীর স্বাধীনতায় নিরতিশয় কাতর, অথচ দ্ব্যর্থক মিলনের প্রেরণায় (দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা) যে-কালে বাংলা উপন্যাস শুভদৃষ্টির কোনো শুভক্ষণে যথারীতি প্রকাশিত হয় এবং মলাটে সিলোফেন-গুণ্ঠিত নারীমুখ শিল্পের পারমার্থিক মায়া জাগায়, সে-কালে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অসীম রায় বেশ কিছু-পরিমাণে চরিত্রবান, বেশ কিছুপরিমাণে ভাবগম্ভীর। এবং এইসব স্বাতন্ত্র্যলক্ষণে অসীম রায় যে চিহ্নিত সে-বিষয়ে তিনি বেশ কিছুপরিমাণ আত্মসচেতনও বটে। কিন্তু বড় বেশি সচেতন। অসীম রায় তাঁর উপন্যাসে বড় বেশি পরিমাণে উপস্থিত।

'রক্তের হাওয়া' উপন্যাসের বিষয়, লেখক ও তার জীবন, লেখকের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার শিল্পরূপায়ণ। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে যে-জীবন লেখক যাপন করেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সে-জীবনে তার কি কোনো দাবি থাকে? নাকি শিল্পের উপজীব্য হিসেবেই সে-জীবন একমাত্র মূল্যবান? অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় গমনের প্রয়োজনে লেখকের ব্যক্তিসম্পর্কে যে সংঘাত ও বিরোধ দেখা দেয় সামাজিক আনুগত্যের প্রথাগত নীতিবোধে কি তার বিচার চলে, নাকি শিল্পের সত্য সে-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড? এ-জাতীয় কিছু চিন্তা, শিল্প ও জীবন সম্পর্কে আরো নানাবিধ চিন্তা অসীম রায় তাঁর 'রক্তের হাওয়া' উপন্যাসে উত্থাপন করেন। সাম্প্রতিক বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে এ-জাতীয় গুরুতর চিন্তা যখন কোনো লেখক উত্থাপন করেন, তখন সত্যিই আশা হয়।

'রক্তের হাওয়া'র নায়ক অমর, "কোনো আলোড়নহীন সার্বজনীন নামের আড়ালে" প্রথম যৌবন কাটিয়ে, "জীবনের গোড়া বেঁধে", তিরিশ বছর বয়সে "কৌলিন্য" অর্জন করার পর তার প্রথম উপন্যাস লেখে। এই উপন্যাসের নায়ক অমর নিজেই এবং কাহিনী অমরের জীবন, তার প্রেম। অমর নিজেই বলে, এই বইয়ে "সে নিজে কাহিনী হয়েছে।" বলে, "এ বই লেখকেরই এক অবিচ্ছিন্ন ডায়েরী", "ডায়েরীর মতো নগ্নভাবে প্রায় শিল্পকে বিপন্ন করে তার নিজেকে মেলে দেওয়ার চেষ্টা···।" অমরের এই "চেষ্টা অনেকেই নিতে পারে নি", তার বই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে "আলোড়ন" তোলে, তার মা "মর্মান্তিকভাবে অভিভূত" হন, অমরের বন্ধু সন্তোষের মতে "বইটা anti-social।" তার কারণ, অমরের জীবন ও উপন্যাসের উপজীব্য যে-প্রেম, সে-প্রেম প্রচলিত নীতিবিচারে অসামাজিক, কারণ, নায়িকা রমা বিধবা, তার সন্তান বর্তমান, এবং অমর ও রমার প্রেম পরিণতিহীন। অমরের মতে, "রমার সঙ্গে তার বিচিত্র বিরতিহীন সম্পর্ক তার যৌবনের একাগ্র সিম্বল।" কিন্তু অমর শুধু নায়ক নয়, লেখক। তাই অমরের প্রেমের অভিজ্ঞতা তাকে যে "সৌর জগতে" স্থাপন করে, সেই "সৌর জগতে" ঘাতকের মতো প্রবেশ করে তার বই। এই বইয়ের ভিতর নিজেকে নিঃশেষে প্রকাশ করে অমর একদিকে তার "সৌর জগতের" নায়িকার "সর্বনাশ সে ডেকে আনে।" অন্যদিকে, তার অভিজ্ঞতা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়। সে অনুভব করে, "তার বিষয়বস্তুর কাছ থেকে সে বিদায় নিচ্ছে, তার নিজের মুখাগ্নি করছে নিজেই।" "বই লেখার পর থেকে মনে হচ্ছে তার আর জীবনে কোনো লালসা নেই।" (জীবনে কোনো "লালসা" নেই? "লালসা"? ভাষা-সচেতন লেখক অসীম রায় এ-উপন্যাসে ভাষার এ-জাতীয় বীভৎস ব্যবহার আরো কিছু-কিছু করেন।) কিন্তু "অমর চায় না এ ক্যাথারসিস। আর চায় না বলেই সে চায় তার রক্তের হাওয়া পালটাতে।"

আর অমর তা চায় বলেই, "আবার এক অনিশ্চিত জগতে নিজেকে ছুঁড়ে" দিয়ে "নূতন বিষয়বস্তু" হবার প্রয়োজনে, সন্তোষের আত্মীয়া সুমিতার সঙ্গে অমরের স্বতঃপ্রবৃত্ত পরিচয়, অমরের প্রাথমিক উদাসীনতার পর, অমরকে শেষাবধি এক সদর্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। অবশ্য 'রক্তের হাওয়া' যদিও গতানুগতিকতামুক্ত চিন্তাপ্রধান উপন্যাস, তথাপি অমরের সহিত সুমিতার আলাপ কিন্তু সাধারণ বাংলা গল্পে সম্ভবপর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী

ছবির একজিবিশনেই হয়। এবং স্মিতার আহ্বানে পরবর্তী কোনো সাক্ষাতের শেষে অমর যে-কোনো বুদ্ধিমান প্রেমিকের সচেতন বুদ্ধিহীনতা নিয়েই স্মিতাকে বলে, "নিজেকে বাঁচাতে হলে দ্বিতীয়বার ভালবাসতে হয়।" এবং অমর, যে শুধু নায়ক নয়, লেখকও বটে, সেই অমর যে-কোনো কলা-কৌশলময় প্রেমিকের নির্লিপ্তি নিয়ে বড় গম্ভীরভাবে বলে, "চেষ্টা করলে ভালবাসা আসে।" যেন এতেও কিছু স্পষ্ট হয় না, যেন এর পরও কিছু বাকি থাকে, তাই অমরের স্রষ্টিকর্তা অসীম রায় স্মিতাকে দিয়ে হাসিমুখে বলান, "আপনি যেন নিজেকেই বললেন কথাটা।" এবং, আশ্চর্য, অমর বলে, "হ্যাঁ, নিজেকেই বললাম।"

অবশ্য অমরের রক্তের হাওয়া এত সহজেই বদলায় না। অনেক, আত্ম-চিন্তা, অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, শিল্প-জিজ্ঞাসা, তার ব্যক্তিচরিত্র ও শিল্পীসত্তার সমর্থনে মহাভারতের অর্জুন-সুভদ্রা-দ্রৌপদী প্রসঙ্গ ("আর্টিস্টের কাহিনী মানেই কৌন্তেয়র কাহিনী, তাঁর রক্তের হাওয়া বদলাবার কাহিনী, তাঁর স্বজনহত্যার কাহিনী।") ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের মানসে, তার রক্তের হাওয়াবদলের কাহিনী এগোয়। কাহিনীর প্রয়োজনে আরো কিছু চরিত্র আসে, কিন্তু তারা সকলেই অল্প-রিক্তর অমরের মুখ চেয়ে আসে। এমনকি অমরের উড়িষ্যাদেশীয় গৃহভৃত্য আনন্দ, এই পরিশীলিত, বুদ্ধিমান, উড়িষ্যাদেশীয় গৃহভৃত্য একমাত্র অমরের গৃহেই সম্ভব। এই উপন্যাসের এক অধ্যায়ে অমরের বই সম্পর্কে আনন্দের উক্তি, রমা ও অমরের অসামাজিক প্রেম নিয়ে আনন্দের দীর্ঘ আলোচনা, আনন্দের আক্রমণ ও অমরের আত্মরক্ষা, 'রক্তের হাওয়া'র ন্যায় চিন্তাপ্রধান ভাবগম্ভীর উপন্যাসের একমাত্র কমিক রিলিফ।

কিন্তু এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে এই গল্পে শেষ পর্যন্ত কি হয়? অমরের আত্মচিন্তা, অমরের শিল্পজিজ্ঞাসা, জীবনের সঙ্গে অমরের সম্পর্ক ও সংঘাত, নায়ক ও লেখক অমরের রক্তাক্ত অস্তিত্বের কোন বিশ্বাসযোগ্য শরীর দাঁড় করায় যা আমাদের জীবন ও শিল্পভাবনায় আলোকপাতকারী? সামাজিক মানুষ হিসেবে অমর জীবনে প্রতিষ্ঠিত, ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এবং অমরের মনে হয়, ব্যাঙ্কের এই "তীর্থক্ষেত্রই তার নিজস্ব তীর্থক্ষেত্র।"

লেখক হিসেবে অমর সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত লেখকের এক সংহত, পরাক্রান্ত চরিত্রধর্মে বিশ্বাসী; "ক্ষ্যাপা বাউল উদাসী", "দরদী মরমী উদাসীন" শিল্পী তার চিন্তায় স্থান পায় না; তাই "জমিদার ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে

সে শ্রদ্ধা করে।" অথচ, একমাত্র প্রেমের পরিধি ছাড়া, অমরের চিন্তায় ও কর্মে, লেখক ও মানুষ হিসেবে সেই সামগ্রিক পরাক্রম অর্জনের সামান্যতম প্রয়াসও অনুপস্থিত যা তার এবম্বিধ মূল্যবান ধারণার কিছুমাত্র সমর্থন করে। সহধর্মী বস্তুসত্যের অভাবে, বাস্তবতার অনুপাতনিরপেক্ষ এই উচ্চাভিলাষী চিন্তাও তো একপ্রকার বিলাস। অথচ, চিন্তায় ও কর্মে অসঙ্গত অমরকে উপহাস করা অসীম রায়ের উদ্দেশ্য নয়; খণ্ডিত, বিভক্ত অমরের রক্তক্ষয়ের মধ্যে আধুনিক মানুষ ও লেখকের স্পর্শযোগ্য জটিলতাকে উপস্থিত করা এই উপন্যাসের বিষয় নয়; প্রেমিকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে অমর এই উপন্যাসে আগাগোড়া এক স্পষ্ট, সদর্থক চরিত্র হিসেবেই চিত্রিত। উপরন্তু, শিল্পী সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা সত্ত্বেও ডায়েরীর মতো একান্ত ব্যক্তিগত এমন বই অমর লেখেই বা কেন যা তার শিল্পকে অবধি বিপন্ন করে? যে-বই পড়ে অমরের ব্যক্তিগত প্রেমের কাহিনী তার পরিচিত মহলে জানাজানি হয়ে যায়, যে-বইয়ের জের টেনে রমার বান্ধবীরা অনায়াসে রমাকে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ঠাট্টা করে, উপন্যাস হিসেবে তেমন বই লেখার সার্থকতাই বা কি? অথচ অমরের বই উপন্যাস হিসেবে ব্যর্থ, এমন ইঙ্গিত লেখক অসীম রায় কখনোই করেন না।

অবশ্য অমর ভাবে, ঠিক শিল্পের জন্য এ বই সে লেখে না, "শিল্পের জন্য তার লোভ নেই।" তবে কিসের জন্য লেখে? অমর রমাকে বলে, "সত্যকে খুঁজতে হয়েছিল" বলেই এ বই তাকে লিখতে হয়েছে। কিন্তু কি এই "সত্য"? অমর জীবনের সত্য ও শিল্পের সত্যের কথা চিন্তা করে, লেখার জীবন যাপন করার কথা ভাবে। কিন্তু একমাত্র প্রেমপাত্রীর পরিবর্তন করা ছাড়া অমরের "সত্যের" আর কোন্ চেহারা ফোটে? অমরের আত্মচিন্তায় প্রেমিকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে, প্রেমিকের অনুতাপ, আত্মগ্লানি, বিবেকপীড়া আছে, কিন্তু অপ্রেমের দুঃখ নেই। অমর প্রেমিকার চিন্তা করে, কিন্তু ভালোবাসায় তার শরীর, তার অস্তিত্ব কদাচ দুঃখময় হয় না। তাই অমর সুমিতাকে বলে, "চেষ্টা করলে ভালবাসা আসে", আশ্চর্য সতর্কতায় সুমিতার দিকে অগ্রসর হবার কথা ভাবে। তাই রমাকে বিবাহ করার চিন্তা তার কাছে অবাস্তব, যেহেতু রমাকে বিবাহ করার অর্থ অমরের বকুলবাগান রোডের বাড়ি ত্যাগ করা, আর এই ত্যাগের অর্থ তার অতীত ও বর্তমানের ধারাবাহিকতা, তার প্রাক্তন বন্ধনকে অস্বীকার করা, "জীবনের সত্তা থেকে তার শিল্পীর সত্তাকে" ছিন্ন করা, যার

ফলে "তার শিল্পের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" তবে অমর শিল্পের প্রয়োজনে তার জীবন থেকে রমার প্রেমের বর্তমানকে অতীত করে দেয় কেন, তার জীবনের ধারাবাহিকতা থেকে প্রেমের অভিজ্ঞতাকে পৃথক করে কেন? এ-প্রসঙ্গে মহাভারতের রূপক কোনো কাজে লাগে না, লেখকের প্রয়োজনের প্রশ্ন আরোপিত হওয়ায় অর্জুন-দ্রৌপদীর প্রেমের অভিজ্ঞতার বিয়োগান্তক মানবিক সত্য শুধু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রাক্তন বন্ধনে "আটকে থাকা মানে আত্মিক মৃত্যু", তবে অমর তার ব্যাঙ্কের "তীর্থক্ষেত্রে", তার বকুলবাগান রোডের বাড়ির নিরাপত্তায় আটকে যায় কেন? নাকি অমরের অস্তিত্বের শিকড় যতোটা বকুলবাগান রোডের বাড়ির গভীরে প্রোথিত ততোটা রমার প্রেমে কখনোই ছিল না? বকুলবাগান রোডের বাড়ি তার জীবনের সম্পূর্ণ পটভূমি, আর রমার প্রেম তার অভিজ্ঞতার আংশিক অগভীর সত্যমাত্র? লেখক হওয়ার নামে তাই অমর নিতান্তই "বকুলবাগান রোডের বাড়ির ছেলে" হয়ে যায়, নিতান্তই নায়ক হয়ে যায়। এবং নায়ক অমর লেখক হওয়ার নামে অতিশয় হিসাবী, আত্মসর্বস্ব, ভঙ্গিমাময় প্রেমিক।

অমরের রক্তের হাওয়া বদলের কাহিনী তাই নিতান্তই তার চিন্তা থেকে চিন্তাবদলের নীরক্ত কাহিনীমাত্র, রমার প্রেমের ক্লান্তি থেকে সুমিতাকে "ভালবাসার চেষ্টার" কাহিনী, এক নারী থেকে অন্য নারীতে গমনের কাহিনী। এক নারী থেকে অন্য নারীতে গমন অবশ্য আমরাও মাঝে-মাঝে করে থাকি। কিন্তু পার্থক্য এই যে, অমর তা শিল্পীর সত্যসন্ধানের প্রেরণায় অভিজ্ঞতার প্রয়োজনবোধে করে। কিন্তু প্রেমের অভিজ্ঞতাই কি লেখকের অভিজ্ঞতার সারাৎসার? শৈশব থেকে বড় হওয়া অবধি, পরিণতির প্রত্যেক স্তরে, চেতনায় ও অবচেতনায়, প্রত্যক্ষ বিশ্বের সহযোগে, জীবনের বহুধাবিরোধী আন্দোলন ও অন্তঃস্রোতে যে-অভিজ্ঞতা লেখক নিঃশব্দে সঞ্চয় করে, অমরের জীবনে তার ইতিহাস কোথায়? উপরন্তু, লেখকের জীবনে অভিজ্ঞতার অর্থ কি এই যে, একটিমাত্র বই লিখেই অভিজ্ঞতা তার নিকট অর্থহীন হয়ে যায়? রমার প্রেমের অভিজ্ঞতার ন্যায় বকুলবাগান রোডের বাড়ি নিয়ে অমর যদি বই লিখত তবে কি অনুরূপভাবে বকুলবাগান রোডের বাড়ির সত্যও তার নিকট মিথ্যে হয়ে যেত? এবং একটি প্রেমের অভিজ্ঞতা যদি একটিমাত্র বই লিখতেই নিঃশেষ হয়ে যায়, পুনরায় লেখার অভিজ্ঞতার জন্য যদি পুনর্বার প্রেমের প্রয়োজন হয়, তবে বেশকিছু সংখ্যক বই লিখতে হলে লেখকের পক্ষে কতবার

ভিন্ন নারীতে গমনের প্রয়োজন হবে? ইত্যাকার প্রসঙ্গে অবশ্য অসীম রায় কিছু বলেন না।

এবং এইসব প্রশ্নের সদুত্তরের অভাবে, উত্তরের সন্ধানে, লেখক অসীম রায় ও তাঁর উপন্যাস 'রক্তের হাওয়া', 'রক্তের হাওয়া'র নায়ক অমর ও লেখক অমর, লেখক অসীম রায়ের চিন্তা ও লেখক অমরের চিন্তা, অমরের উপন্যাস ও তার নায়ক অমর নিজে, এবং 'রক্তের হাওয়া'র নায়িকা রমা, নায়ক অমরের প্রেমিকা রমা, অমরের উপন্যাসের নায়িকা রমা, ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এমন একাকার জটিলতার সৃষ্টি হয় যে, মনে হয় এই সমস্ত জটিলতার জন্য অসীম রায়ের 'রক্তের হাওয়া'ই নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত দায়ী। তাই উপন্যাসের একেবারে শেষ অধ্যায়ে, রমার কাছে বিদায় নেবার অন্তিম কৈফিয়ৎ হিসেবে, "তাছাড়া তোমার সঙ্গে সম্পর্ক তো কোনোদিনই কাটাতে পারব না," অমরের এই বিদায়বাণীতে বিরক্ত রমা যখন তার এতদিনের সংযম নষ্ট করে প্রতারিতা নায়িকার প্রথম চিৎকার হানে, "ওসব কথাগুলো তোমার আগামী বইয়ের জন্য তুলে রাখো" তখন পাঠক হিসেবে আমাদের পক্ষেও অসীম রায়ের আগামী উপন্যাসের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো চিন্তা থাকে না।

অসীম রায়ের 'রক্তের হাওয়া' সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সমস্যার একটি ভিন্নতর দিক উপস্থিত করে। প্রচলিত বাংলা উপন্যাস বয়স্কপাঠ্য রূপকথা হিসেবেও অচল, অথচ দ্রুতনিঃশেষিত সংস্করণে কিছুকাল দুর্মর, এবং আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু মনে হয়, অসীম রায়ের ন্যায় চিন্তাশীল, স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত লেখকগণের উপন্যাস সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের দুর্বলতার বিকল্প হিসেবে যতোটা উল্লেখযোগ্য, যথার্থ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ধারণা প্রকাশে ততোটা মূল্যবান নয়। অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধের সমন্বয় তাঁদের চেতনায় অনেক ক্ষেত্রেই কোনো পরিপূর্ণ চিন্তাবৃত্ত গ্রহণের অবকাশ পায় না; পূর্ব-নির্দিষ্ট কিছু চিন্তার আশ্রয়ে একটি বক্তব্য প্রকাশের অত্যধিক আগ্রহ তাঁদের ঔপন্যাসিক সিদ্ধির বাধা হয়ে দাঁড়ায়; অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় বিনয়ের অভাব থাকে; সহধর্মী বস্তুসত্যের অভাবে চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারহীন, নিরবলম্ব। একথা ঠিক যে, নিতান্ত কোনো গল্প নয়, চিন্তা ও বক্তব্যপ্রাধান্যই আধুনিক উপন্যাসের অমোঘ লক্ষণ, কিন্তু একথাও ঠিক যে, আধুনিক উপন্যাস শেষ পর্যন্ত উপন্যাসই হবে। এবং এ কারণেই আধুনিক উপন্যাসের রূপ এমন জটিল, সিদ্ধি এমন সাধনাসাপেক্ষ, আনুপাতিক ব্যর্থতাও এমন শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু এই সব চিন্তা নতুন চিন্তা নয়, কোনোটাই বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, সমস্তটাই শেষাবধি উপন্যাস-লেখকের নিরন্তর নিজস্ব সমাধানের উপর নির্ভর করে।

হেমন্ত সেন

গুরুবাদ ও যুক্তিবাদ

ক্লড ককবার্ন তুখোড় সাংবাদিক, এককালে বিলিতি সাংবাদিক-গোষ্ঠীর 'তারকা'। তাঁর সরস শাণিত লেখনীর নামডাক এখনও কম নয়। তবে এখন তিনি রণক্লান্ত; জীবনে লড়াই করেছেন অনেক, ঘুরেছেন নানা ঘাটে, খ্যাতি, ক্ষমতা বা অর্থের লোভে নয়, যদিও এর যে কোনোটাই অনায়াস লভ্য ছিল; মত বদলেছেন কিম্বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতটা পরিচ্ছন্ন, পরিণত হয়েছে কিন্তু মন তাঁর বদলায় নি। একালের রাগী ছোকরাদের সঙ্গে, সভ্যভব্য বুদ্ধিমন্তদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে ককবার্ন এখনও বলতে রাজী নন যে সবই ঝুটা, কোনো আদর্শ নেই, দয়া নেই, ভালমন্দ করবার মতো কিছুতেই আর যুক্তিগত আস্থা স্থাপনের উপায় পর্যন্ত নেই।

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মাঝ দিয়ে ককবার্ন উত্তর ত্রিশে এসেছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে। তার আগে তিনি লণ্ডন টাইমসের ওয়াশিংটন দপ্তরের সহকারী প্রতিনিধি। টাইমস ছেড়ে ককবার্ন শুরু করেন নিজের উদ্যোগে বিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজ 'উইক' প্রকাশনা। এই 'উইকে'ই ককবার্নের চমকপ্রদ আবিষ্কার লর্ড য়্যাস্টরের পল্লীভবনে "ক্লাইভডেন গোষ্ঠীর" গোপন শলাপরামর্শ হিটলারকে তোষণের চেষ্টায়। বিলিতি সাংবাদিকতার ইতিহাস, উত্তর ত্রিশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর রহস্য উদ্ঘাটনের কৃতিত্বে ককবার্নের এই 'উইক' এখনও বিখ্যাত। ফ্রাঙ্ক পিটকায়ের্ন এই ছদ্মনামে ডেইলী ওয়ার্কারে রাজনৈতিক এবং বৈদেশিক সংবাদের ভাষ্য যিনি নিয়মিত লিখতেন তিনি এই ককবার্ন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে "ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে"ও ককবার্ন ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট-বিপদ, অর্থাভাব, সম্ভ্রান্ত আত্মীয়স্বজন ও পুরোনো বন্ধুবান্ধবের বিরূপতা ককবার্নকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্রব

---

1. *Crossing The Line*, 2. *View From The West*, By Claud Cockburn. MacGibbon & Kee.

ছেড়েছেন পঞ্চাশোত্তর কালে। বুদ্ধিমন্তরা পরামর্শ দিয়েছে এবার বই লেখো ক্র্যাডচেঙ্কোর মতো "আমি স্বাধীনতা বেছে নিয়েছি"। ককবার্ন বলেছেন, আমি কি এমনই হাঁদা, এতকাল যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি স্বেচ্ছায় তাঁদের ছেড়েছি বলে বুক চাপড়িয়ে বলব আমি ঠকেছি, আমার সঙ্গে ওরা প্রতারণা করেছে ?

কমিউনিস্টদের সংশ্রব কেন ছেড়েছেন সে বিষয়ে ককবার্ন তাঁর আত্ম-কাহিনীতে সরস ভঙ্গিতে কিছু কিছু আলাপ করেছেন। নাৎসী-সোভিয়েট প্যাক্টের সময়েই হ্যারি পলিটের মতো ককবার্নও মানসিক সঙ্কট অনুভব করেছেন। তারপর মেঘ আবার কেটেছে, স্তালিনের বিধানে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হয়েছে জনযুদ্ধ (যুদ্ধের শেষে স্তালিনই আবার পাঁতি দিয়েছিলেন, যুদ্ধটা শুরু থেকেই ছিল সাম্রাজ্যবিরোধী)। পঞ্চাশোত্তর কালে ককবার্ন দল ছেড়েছেন কতকটা মানসিক ক্লান্তিতে। তবে এও ঠিক যে ভক্তিমার্গী কমিউনিস্টদের মতান্ধতা তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী চিত্তকে পীড়িত করেছে। কমিউনিজমের ত্রুটিবিচ্যুতিকে ককবার্ন হাল্কা করেন নি, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে সবচেয়ে যেটা অনুভব করেছেন তিনি সেটা হল কমিউনিস্টরা যে পথে, যে পদ্ধতিতে গতানুগতিক ভাবে চলেছে তা দিয়ে বড় রকমের এবং ভালো কোনোও পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

ককবার্ন অন্ধবিশ্বাসের নির্বিচার দাবিপূরণের দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু অনুতাপের, আত্মধিক্কারের কোনো সঙ্গত কারণ তিনি দেখেন নি। ফলিত কমিউনিজম থেকে মুখ ফিরিয়ে ধনতন্ত্রের প্রেমে বিগলিত হওয়াটা একেবারেই তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতার বিরোধী। আত্মকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট উক্তিতে তাঁর চিন্তায় পরিচ্ছন্নতার, উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। শুদ্ধ মন্দটাই তিনি দেখেন নি, দেখেছেন সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের আগ্রহে এমন যুক্তিবাদী লোকও আছেন যাঁরা মোহ বিসর্জন দিলেও আশা ছাড়ে না ("who in shedding their illusions do not also shed their hopes.") মোহান্ধতা আর গুরুবাদী জবরদস্তির একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ককবার্ন। হিটলারী ডিক্টেটরশিপ এবং প্রলেটেরীয় ডিক্টেটরশিপের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য ডেইলী ওয়ার্কারের একটি প্রবন্ধে একজন লিখেছিলেন যে, স্তালিন যদি কালই মারা যান তবুও তাতে সোভিয়েতরাষ্ট্র মারাত্মক ভাবে বিপর্যস্ত হবে না। আর যায় কোথায়, মস্কোয় মহা সোরগোল ;

প্রচণ্ড রোষ, স্তালিনের মৃত্যুকামনা যারা করেছে তারা নিশ্চয়ই বুর্জোয়া দালাল, অতএব নিষিদ্ধ হল বেশ কিছুদিনের জন্য মস্কোয় ডেইলী ওয়ার্কারের প্রবেশ। ভক্তিবাদী মতান্ধতার এই জবরদস্তিকে লঘু করার জন্য বলা যেতে পারে ধন-গণতন্ত্রেও এমনতর অনেকরকম জবরদস্তি হয়, আরও খারাপ হয়। সে কথা ঠিক। কিন্তু ধন-গণতন্ত্রী জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিকারের পথ, অনন্ত প্রতিবাদের, সাধারণত কিছুটা উন্মুক্ত। তাছাড়া গুরুবাদ স্বেচ্ছাচার কমিউনিস্ট শাসনের কলঙ্ক নিশ্চয়ই। অন্ধবিশ্বাসের তাড়নায় কমিউনিজমের মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি, স্তালিনের আমলে রাশিয়ায় পূর্ব-য়ুরোপে ভয়াবহ অত্যাচার অনাচার সম্পর্কে ভক্তিবাদী কমিউনিস্টরা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান বা আলোচনা করেন নি। ককবার্নের মতে এ-বিষয়ে বিশ্বাসীদের (তাঁর নিজেরও) ছিল দুই প্রস্থ দুর্ভেদ্য বর্ম—এক প্রস্থ হল ত্রুটি, বিচ্যুতি অনাচার ইত্যাদি সবই কমিউনিস্টবিরোধীদের, "পুঁজিবাদী দালালদের" রটনা ; দ্বিতীয় প্রস্থ হল, ডবল স্টাণ্ডার্ড, আমেরিকায় বৃটেনে কিম্বা অন্য গণতন্ত্রী দেশে অত্যাচার অনাচার ঘটলে সেটা খুব খারাপ, কিন্তু কমিউনিস্ট ভক্তিবাদীদের মতে সোভিয়েত রাশিয়ায় বা কমুনিস্ট রাষ্ট্রে ওসব ঘটলে তার বিচার করতে হবে আলাদা ভাবে। নিজের সম্বন্ধে ককবার্ন বলছেন, কমিউনিস্টদের উগ্রতা এবং ভ্রষ্টাচার তাঁর রাজনৈতিক সংশয় সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট কর্মধারা থেকে সরে এসেছেন অন্য কারণে। প্রায় বছর কুড়ি ব্রিটিশ কমুনিস্ট পার্টির সারাক্ষণ কাজে লেগেছিলেন ককবার্ন। দেখেছেন ঝড়জল, শীতের কষ্ট, নিন্দাবিদ্রূপ, এবং দুচার মারধর সয়েও কাজে লেগে থাকায় কমিউনিস্টদের জুড়ি নেই। লোকে বলে কমিউনিস্টরা যে কোনোও সংগঠনে ঢুকে পড়ে সেটা দখল করে বসে। ককবার্ন রসিয়ে রসিয়ে বলেছেন, তা হবে না কেন, দখল করতে হয় না 'আপসে' হয়, শনিবার বিকেলে কোনোও ইউনিয়নের মিটিং-এ অন্য কোনোও দলের পাত্তা মেলে না, কমিউনিস্টরা দলীয় নির্দেশ মতো ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে হাজির! নিষ্ঠাই কমিউনিস্টদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুণ, আবার এই নিষ্ঠাই অসহিষ্ণু মতান্ধতার সঙ্গে যুক্ত হলে হয় সবচেয়ে মারাত্মক। ককবার্ন অনেক ঠেকে ঠেকে অনুভব করেছেন, মার্কস যাই লিখে থাকুন, ব্রিটেনে অন্তত 'এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে' ; বনেদী কমিউনিস্ট পন্থায় সমাজসঙ্কটের সুষ্ঠু সমাধান খুবই দুষ্কর, এখন একেবারে অসম্ভবপ্রায়।

তা বলে "অনুতপ্ত পুত্রের" মতো ককবার্ন ধনতন্ত্রের আশ্রয়কে সর্বার্থসার গণ্য করেন নি। ধনবৈষম্য এবং শোষণের অবসান তিনি এখনও কামনা করেন; কমিউনিস্ট মতাদর্শের মৌল প্রেরণাকে তিনি মোহমুক্ত চিত্তে সমর্থনে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলিত কমিউনিজমের গলদ আবিষ্কার করে যে বুদ্ধিমন্তরা মহা উল্লসিত তাঁদের সম্বন্ধে ককবার্নের সরস শ্লেষোক্তি যেমন উপভোগ্য তেমনি সময়োচিত। পরমবিজ্ঞ একজন সাবধানবাণী শোনাচ্ছিলেন, "বাপু হে, তোমাদের মুশকিল কী জানো, তোমরা মানুষের ভালোয় বড় বেশি বিশ্বাস কর; অথচ এই হতচ্ছাড়া মানুষই তোমাদের পথে বসাবে।" এর মোক্ষম উত্তর, "তাতে কী হল, ভগবানও তো আপনাদের বিস্তর বার পথে বসাচ্ছেন, তবুও তো ভগবানে বিশ্বাস অটল!" ফলিত কমিউনিজমের গলদে যাঁরা ভয়ানক ভাবে বিচলিত তাঁরা অনেকেই অনায়াসে দেড়শ বছরের বনেদী ধন-গণতন্ত্রের অনাচার ভ্রষ্টাচার ও বিকারকে দিব্যি হজম করেন কী করে, কোন্ যুক্তিতে? মতান্ধতা এঁদের কম নয়। কিন্তু এর জন্য অনেকখানি দায়ী ভক্তিবাদী কমিউনিস্টপন্থীদের উগ্র মনোভাব ও ক্ষমতার ব্যভিচার। ককবার্ন যথার্থ বলেছেন, কমিউনিজম মানবসমাজের সব কিছু সবস্থার সমাধান করতে সক্ষম এমন অন্ধবিশ্বাস পোষণ করা কমিউনিস্টদের আদর্শের পক্ষেই ক্ষতিকর, অনর্থকর সমাজের পক্ষেও।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আচার্য নন্দলাল

সৎ-শিল্পরসিক শ্রীকানাই সামন্ত আর একটি সুপরিকল্পিত ও সুমুদ্রিত শিল্প বিচারের বই প্রকাশ করে রসিকজনের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই সঙ্গে প্রকাশক "কথাশিল্প"কেও ধন্যবাদ জানাই এত অল্প দামে দুটি বহু-রং এবং ১৭টি দুই-রং ও এক-রঙের বড় ও ছোট চিত্র সম্বলিত রয়্যাল সাইজ ৮৪ পৃষ্ঠার সুমুদ্রিত এবং বর্তমান রুচি অনুসারী বিক্রয়-সম্ভাবনায় বিমুখ গ্রন্থের প্রকাশ দায়িত্ব বহনের জন্যে।

শিল্পরসিক পাঠকদের কাছে শ্রীসামন্ত অপরিচিত নন। বাংলার সংস্কৃতিধর্মী পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন শিল্প ও কাব্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি রসিকসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষত চার বছর আগে প্রকাশিত তাঁর "চিত্রদর্শন" বইটি এ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আলোচ্য বইটি শুধু নন্দলালের শিল্প আলোচনাই নয় গুরুকৃত্যও বটে, তাই চিত্রবৈচিত্র্য ও রস বিচার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ যুক্ত হয়ে একদিকে যেমন বইটি আংশিক সুখপাঠ্য ও মানবিকতায়ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিপাদ্যকে আচ্ছন্ন করে রসপ্রসার ব্যাহতও করেছে কিছুটা।

অবনীন্দ্র-শিষ্য শিল্পাচার্য নন্দলাল তাঁর গুরুর মতো শিষ্য ভাগ্য থেকে নিজে বঞ্চিত হলেও ভক্তজন বঞ্চিত নন। অবনীন্দ্রনাথ সান্নিধ্যে সার্থক বিকশিত হয়েছিলেন নন্দলাল অসিত, সুরেন, শৈলেন, ক্ষিতীন্দ্র, ভেঙ্কটাপ্পা প্রমুখ প্রতিভা। শিল্পাচার্য নন্দলালের অনুগামী শ্রীবিনোদবিহারী ভিন্ন অন্য সার্থক শিল্পী এখনও অপরিচিত। তবু ভক্ত শিষ্যদের প্রচেষ্টায় সাধারণের কাছে নন্দলালের পরিচিতি সহজ হয়েছে। অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্প আলোচনায় মাসিক প্রবাসীতে নন্দলালের চিত্র ও রচনায় প্রকাশে। রবীন্দ্রমজুমদার প্রভৃতি সম্পাদিত ও সংগৃহীত "নিরীক্ষা" পত্রিকার নন্দলাল সংখ্যা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, সাপ্তাহিক দেশ, মাসিক বিশ্ববাণী, পাক্ষিক দর্শক প্রভৃতিতে নন্দলাল বিষয়ে

শ্রীনন্দলাল বসু: কানাই সামন্ত। কথাশিল্প প্রকাশ, কলকাতা-১২। ৬'৫০

আলোচনা, বিশেষ করে কানাই সামন্তের আলোচ্য পুস্তকটি এবং চিত্রদর্শন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নন্দন', বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর নন্দলাল-বিষয়ক গ্রন্থ, রম্যাংশুশেখর দাস-এর Nandalal Bose And Indian Painting প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ তারই প্রমাণ।

শ্রীসামন্ত তাঁর এ প্রচেষ্টায় ভাবাতিশয্যকে নিয়ন্ত্রিত করলে সফলতা সুলভ্য হত। শুধুমাত্র নন্দলালের জীবনী প্রচেষ্টা হলে হয়তো যে-সব আলোচনা স্বাভাবিক হত শিল্পী নন্দলালের বিচারে তা বহুলাংশেই অকিঞ্চিৎকর। গুরু নির্দেশে নন্দলাল, রামকৃষ্ণ ভক্ত সান্নিধ্যে এসেছেন। ভগ্নী নিবেদিতার সহযোগিতায় লেডী হারিংহ্যামের সঙ্গী হয়ে অজন্তা ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি করার সুযোগ পেয়েছিলেন নন্দলাল। গণেন মহারাজের স্নেহপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চিন্তে কর্মরত ছিলেন তাঁরা। এ সহযোগিতা ও সাহায্যে স্বভাব-কর্মী নন্দলাল কৃতজ্ঞতাজাত ভক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণমুখী হয়ে উঠেছিলেন, এমন চিন্তা অনুচিত নয়। তাই এ গ্রন্থে শিল্পী-নন্দলালের বিকাশ চিত্রিত করার প্রয়োজনে গদাধর-প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক।

অবনীন্দ্র নির্দেশে জীবনধর্মী শিল্পী নন্দলাল অনুভব করেছিলেন গণসংযোগের প্রয়োজনীয়তা। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এদেশের শিল্পীরা পূর্বকালে আশপাশের ঘটনা কালের প্রভাব ইত্যাদি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কেবল ধ্যানস্তিমিত অবস্থাতে বসে ছবি, মূর্তি ইত্যাদি রচনা করে গেছে একথা যেমন মিথ্যা, আজকের বাংলার শিল্পীর দল আমরাও সেইভাবে কাজ করে চলেছি একথাও তেমনি মিথ্যা।" এমন অবনীন্দ্র-অনুশাসনে নন্দলাল জীবনশিল্পী হয়ে উঠেছেন।

গুরু নির্দেশেই নন্দলাল পট আঁকতে শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন, "আমাদের আর্ট বিশেষ গোষ্ঠীর জিনিস, গণ্ডীর জিনিস। পট আঁকো, যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই হবে আনন্দ।" শিল্পী গিয়ে বসলেন পথের ধারে, হাটের মাঝে। পটুয়ার মতো দ্রুত পট এঁকে ২৷৪ আনা দামে বিক্রয়ও করলেন কিছু। এরই এক পরিণত রূপ প্রকাশ পেয়েছে হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপ চিত্রণে। তাই বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলালের পটচিত্রের কৃতকৌশল স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে অবনীন্দ্র-ভগিনী শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর পট চিত্রায়ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর তুলনা নিষ্প্রয়োজন। পট-চিত্রে সাফল্যের অধিকারিণী সুনয়নী দেবীর পটের বৈশিষ্ট্য

ছিল পরম্পরার সঙ্গে স্বকীয়তার সংশ্লেষণ। সুঠাম, সাবলীল রেখার ছন্দে অপরূপ অনুস্থাপন, অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এনেছিল সুনয়নীর পটে। শ্রীসামন্ত তাঁরই রচিত "চিত্রদর্শন" গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠার সহগামী মুদ্রিত চিত্র-পটে সুনয়নীর ছবিটি দেখলেই নিশ্চয় আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন। পট-চিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য নন্দলালেও দুর্লভ।

অবনীন্দ্র-অনুসারী কথাবিন্যাস প্রচেষ্টা বিপথগামী হয়ে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছে বেশ কিছুটা। সম্ভবত লেখক অবচেতনে এ-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন। তাই এক আলোচনায় বার বার শুধু মনে করেছেন "বড় কঠিন সাধনা, যার বড়ো সহজ সুর" ; এবং এই সহজ সুর অনায়ত্ত থাকায় সিদ্ধিলাভ ঘটেনি। সহজ সরল কথায় সাধারণের অজ্ঞাত শিল্প ভাষা, সাধারণকে যতটা বোঝানো সম্ভব, মহতের অনুকৃতীধর্মী অনুরূপ-সর্বস্ব (ফর্ম) প্রকাশ-প্রচেষ্টা তাকে দুরূহ করে তোলে। শ্রীসামন্তের ক্ষেত্রেও এমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারে বারে। আশাপ্রদ যে 'চিত্র দর্শন'-এর প্রকাশিত কুজ্ঝটিকা 'শ্রীনন্দলাল বসু'-তে অনেক স্বচ্ছ হয়েছে। তাই কামনা করবো এ-বিষয়ে লেখকের আরো সচেতনতা।

সুমুদ্রিত এই বইটি লক্ষ্য করলে লেখক ও প্রকাশকের আপন দায়িত্ব-সচেতনতা বোঝা সম্ভব। কিছু বিচ্যুতি ঘটলেও প্রতিভাধর শিল্পীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণ আয়ত্ত করতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন লেখক, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠবে কার্পণ্য করেন নি প্রকাশক। তবে মহৎ শিল্পীর সামর্থ-প্রকাশে চিত্র নির্বাচনে আরো সুষ্ঠু বিবেচনার সুযোগ ছিল। পরম্পরাগত ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে আজ যে দুর্যোগ সমাগত, পাশ্চাত্ত্যের অনুকৃতি শিল্পের প্রদর্শনী ও প্রতিলিপিতে যখন দেশ প্লাবিত, ঠিক তখন এমন গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ দুঃসাহসিক ও অভিনন্দনযোগ্য। সেই সঙ্গে এমন লেখকদের আরো সংযম ও একনিষ্ঠ প্রয়াস এবং এমন প্রকাশকদের সুমুদ্রণ ও যোগ্য পরিবেশন-প্রচেষ্টা এই বিপথগামী শিল্প আন্দোলনকে প্রতিহত করে শিল্পীদের আরো সংযমী ও সুবুদ্ধিপ্রণোদিত করবে এবং সৎ-শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহিত করবে। মোহমুক্ত আত্মসমালোচনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনুরাগ ত্যাগ করে নির্মম হাতে অসৎকে পরিহার করে মহৎ শিল্প সাধনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসার ও প্রচারের প্রয়াস করতে হবে। তাই বিচক্ষণ শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয়ের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির প্রকাশ-অপেক্ষায় রইলাম।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে

সার্ধ শতাব্দী কাল ধরে স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এমন একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী রচনা করেছিলেন যা নিয়ে যে-কোনো দেশই গর্ব করতে পারে। এঁদের মধ্যে এক জায়গায় একটা মিল ছিল। এঁরা কেউই বিদেশে শিক্ষালাভ করেন নি। এদেশেই আপনাপন বিশিষ্ট ধারায় বিকাশলাভ করেছেন। সৌভাগ্যবশত, ডঃ মজুমদার ও নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এখনও আমাদের মধ্যে কর্মনিরত। বার্ধক্য সত্ত্বেও ডঃ মজুমদারের কর্মোদ্যম শিথিল হয় নি। এবং তাঁর এই কর্মক্ষমতা তরুণ কর্মকুণ্ঠ ঐতিহাসিকগণকে যেন ধিক্কার দেয়।

গত কয়েক বৎসর যাবত ডঃ মজুমদার আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সঙ্কলনের দায়িত্বে তিনি ডিরেক্টর ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে ভারত সরকার ঐ সম্পাদকমণ্ডলী বাতিল করে দেন। এক বৎসর পর ডঃ তারাচাঁদকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হয়।

ডঃ তারাচাঁদ লিখিত পুস্তকের প্রথম খণ্ড ১৯৬১ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশ লাভ করে। কোনো ভালো বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিফল হওয়া কঠিন। ডঃ তারাচাঁদ কিন্তু পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডঃ মজুমদারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অবদান Sepoy Mutiny and Revolt of 1857 গ্রন্থখানি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এখন তাঁর 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল।

History of the Freedom Movement in India : (Volume 1) By Dr. R. C. Majumdar, Firma K. L. Mukhopadhya. Calcutta. Rs. 15.

সরকারী বিধিনিষেধ মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

"The Capacity to seize victoriously on available materials, catch in them what is significant from his point of view and convey them, in a form that is effective" বিশেষভাবেই ডঃ মজুমদার এই ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রচণ্ড সতেজ মনীষার স্বাক্ষর ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট এই বর্তমান পুস্তকেও। দুই বইয়েরই যেটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যতা ধূসর পাণ্ডিত্য নয়, উদ্দেশ্য সচেতনতা।

দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাপর্ব বলতে আমরা নির্দিষ্টভাবে যা বুঝি তা নিয়ে। প্রথম খণ্ডে যার অধিকাংশ জুড়ে থাকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, পাই আমরা তার প্রেক্ষাপট। ডঃ মজুমদার তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশ যে কৃতিত্বের অধিকারী তার স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠিত হন নি। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর সাহসের অভাব আছে নিশ্চয়ই এমন কথা বলা যায় না। ভূমিকায় তিনি লেখেনও : "প্রাদেশিকতার অপবাদ দেওয়া হবে এই ভয়ে ভীত হয়ে যদি আমি যা বিশ্বাস করি তা বলা থেকে বিরত হই তাহলে ঐতিহাসিক হিসেবে আমি কর্তব্যচ্যুত হব।" এবং সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের বা সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে একটি যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ তিনি উপস্থিত করেন। ডঃ মজুমদার দৃশ্যত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও শুল্ক-সম্বন্ধীয় ঘৃণ্য কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের মনকে যা ভবিষ্যত বয়কট আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল তার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হয় নি। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ধমনী-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিদেশী আমলাতন্ত্রের কথা নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। স্বাদেশিকতা ধর্মের বিকাশের কাহিনী অবশ্য উপযুক্ত গুরুত্বই পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর ছিল মোটের উপর দুর্ভিক্ষের যুগ। এই পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারিত 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটির তাৎপর্য সম্যকভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থনীতিক আধেয় তাঁর লেখায় যথোচিত গুরুত্ব পায় নি। শ্রীঅরবিন্দ রমেশচন্দ্র দত্তের অর্থনীতিক ইতিহাসপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : "এই একটি

ক্ষেত্রে তিনি কেবল ইতিহাস লেখেন নি, ইতিহাস সৃষ্টিও করেছেন।" অর্থনীতিক অধিকার সম্পর্কে চেতনার ক্রমোন্মেষই বোধহয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম, প্রসার ও সাফল্যের একটি প্রধান কারণ।

ডঃ মজুমদার তার পুস্তকের ভূমিকায় আমাদের জানিয়েছেন যে, মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কিত অংশে তিনি সত্য প্রকাশে দ্বিধান্বিত হন নি। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের একটি তালিকাও তিনি দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ব্রিটিশের ও আলিগড় আন্দোলনের সৃষ্টি এই মত ভুল। বিপুল তথ্যের সমাবেশ করে চমকপ্রদভাবে তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন। কিন্তু কথা হল এই যে কোনো একটা মতকে বাস্তব সত্য বলে ধরে নিলে ইতিহাসকে যে কোনো তত্ত্ব প্রমাণের কাজে লাগান যায়। কেননা, আমরা যা দেখতে চাই তাই দেখে থাকি। পাকিস্তানের জন্ম সম্পর্কে যাঁরা অন্যমত পোষণ করেন, যাঁরা একে একটি রাজনৈতিক অঘটন বলে মনে করেন তাদের মতের স্বপক্ষেও কিছু বলার আছে। বলতে কি মোটের উপর এই ঝোঁকটা ছিল অযৌক্তিকতার। বর্তমান সমালোচকের বাল্যকাল কেটেছে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে। ধর্ম বা জাতিভেদ-চেতনা চিরকাল ছিল এবং প্রতিবেশী সম্পর্কের উপর তা প্রাধান্যলাভ করেছে একথা তার পক্ষে বিশ্বাস করা মুস্কিল। একদা কথাপ্রসঙ্গে মিঃ জিন্না মিসেস কেসীকে বলেছিলেন "ধর্মান্ধদের নিন্দে করো না। আমি ধর্মান্ধ না হলে পাকিস্তান সৃষ্টি আদপে হত না।" ভারত ছেড়ে ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করে লর্ড মাউণ্টব্যাটন বলেছেন "পাঞ্জাব ও বাঙলার মতো প্রদেশের ক্ষেত্রে অনিবার্য ব্যবচ্ছেদের কথা মিঃ জিন্নাকে জানানো হলে, তিনি ঐক্যের ইতিহাস-আশ্রিত প্রদেশগুলোর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে গররাজী হন। কোন মানুষ আগে পাঞ্জাবী বা বাঙালী পরে সে হিন্দু বা মুসলমান। আমি তাঁর সঙ্গে একমত হলাম। আমি তাঁকে বললাম এই প্রদেশগুলির ব্যবচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছে, তা আমারও মনের কথা আর ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরাও সেই একই মনোভাব পোষণ করেন। এই ভাবে আমাদের আলাপ চলতে লাগল। এ যেন, আমরা বলতে পারি, ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় পৌছন। বোম্বাই হতে সিন্ধুকে পৃথক করতে লেগেছিল দুই বৎসর কিন্তু ৪০ কোটি মানুষকে আমরা আড়াই মাসে বিভক্ত করে দিলাম।"

কোনো রকম প্রগল্‌ভ না হয়ে পুস্তকের প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে আমি দু-চার কথা বলব। পুস্তকের ৭০-৭৭ পৃষ্ঠায় বারওয়েল ও ভান্সিটার্টের বিবরণ ও ষ্টিফেনের 'Nuncoomar and Impey'-র ভিত্তিতে মহারাজ নন্দকুমারের ভূমিকা চিত্রিত করা হয়েছে। ডঃ মজুমদার উৎসের কিছু সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারওয়েল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন বা ভ্যান্সিটার্ট যা যা বলেছেন এবং ষ্টিফেন যা যা লিখেছেন ডঃ মজুমদার তার সবটারই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার স্বদেশভক্ত ছিলনা প্রমাণ করতে এসব কিছুর একত্র সমাবেশের কোনো প্রয়োজন ছিল কি? বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে দেশভক্ত কথাটিই যখন অর্থহীন ছিল। ডঃ মজুমদারের নামের একটা ওজন আছে। তার সাহায্যে তিনি এই প্রচারকে নতুন জীবন দান করলেন। মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্রে শঠতা ও সততার এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল। সুতরাং তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় এক দুরূহ ব্যাপার। এক সময়ে নন্দকুমার তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন আবার পরবর্তী সময়ে হেস্টিংস-বিরোধী হয়ে পড়েন। সকল কালের রাজনৈতিক চরিত্রের মতো তিনিও ধূর্ত ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। কিন্তু ক্লাইভের চিঠিপত্র ও হেস্টিংসের নিজের স্বীকৃতিই এ কথা প্রমাণ করে যে নন্দকুমারের চরিত্রে মহত্ত্বও ছিল। বারওয়েল ও ভ্যান্সিটার্ট-বর্ণিত নিরঙ্কুশ শঠচরিত্রই তিনি ছিলেন না। ১৭৫৮ সালে ক্লাইভ লিখিত কয়েকটি পত্রে জানা যায়, যে, নন্দকুমার মীরজাফরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রায় দুর্লভকে উৎখাত ও উচ্ছেদ করতে অস্বীকৃত হন। এ কাজে আমীর বেগের সঙ্গে সহযোগিতা করলে নবাব তাঁকে খেতাব ও জায়গীরের প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু তবু তাকে প্রলুব্ধ করা যায় নি। বিতর্কমূলক ও পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য-নির্ভরতা ঐতিহাসিককে অসুবিধার সম্মুখীন করে। এবং ভারতীয় ইতিহাস সাধনার অন্যতম পথিকৃত তাঁর বইয়ের এই অংশে নিজের ক্ষমতার প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি বলেই মনে হয়।

পরিশেষে, এই গ্রন্থ ভাণ্ডারে আহৃত ফসল দেখে বলা যায় সরকারি যৌথ উদ্যোগের তুলনায় ইতিহাসশাস্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগই এখনও গতিশীল ও কর্মকুশল।

সুশোভন সরকার

এশিয়ার মুক্তি

ইওরোপে সাম্প্রতিক ইতিহাস-চর্চার একটা আকর্ষণীয় দিক হল সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আধুনিক ইতিহাস যে ইওরোপ-কেন্দ্রিক থাকতে পারে না এই বোধ। আলোচ্য গ্রন্থটি এই নতুন আগ্রহ ও বিস্তারের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ডাচ ভাষায় এর প্রকাশের তারিখ ১৯৫৬; আর. টি. ক্লার্ক-এর ইংরাজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে ঠিক এক বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে। লেখক, অধ্যাপক জান রমেন, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। তিনি তাঁর স্বদেশের এক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছেন বারো খণ্ডে; বর্তমান জগতে ইওরোপের প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বই আছে; ইউনেস্কো-পরিকল্পিত পৃথিবীর ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডের (বিংশ শতাব্দী) তিনি হলেন অন্যতম সম্পাদক; ১৯৫১-৫২ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অধ্যাপনা সূত্রে এশিয়াবাসীর সঙ্গে তাঁর কিছুটা সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল। ইংরাজি সংস্করণের ভূমিকায় সর্দার পানিক্করের জ্ঞানগর্ভ আলোচনাটুকু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রসাদগুণে উপভোগ্য হয়েছে।

বর্তমান এশিয়ার ইতিহাসের নানা দিক সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানা লেখা প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও অধ্যাপক রমেন-এর গ্রন্থটি বিশেষ সমাদরের যোগ্য। এর বৈশিষ্ট্য হল লেখকের ব্যাপক দৃষ্টি, গোটা মানব জাতির আশা-নিরাশা সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি, ইতিহাসে ঘাত-প্রতিঘাতের যুক্তিসঙ্গত সুষম বিশ্লেষণ, অগণিত ফ্যাক্টের মাঝ থেকে ঘটনাস্রোতের একটি সুসম্বদ্ধ রূপ-নির্ধারণ। বিশ শতকের এশিয়ার ইতিহাস এখানে সংক্ষিপ্ত অথচ পর্যাপ্ত একটি সামগ্রিক রূপ পেয়েছে, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। অনুসন্ধানী ছাত্র ও সাধারণ পাঠক উভয়কেই বইখানি নিঃসন্দেহে তৃপ্ত করবে, কারণ এ-লেখা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য।

The Asian Century: A History of Modern Nationalism in Asia—by Jan Romein. George Allen & Unwin Ltd., London, 1962. 50 s.

লেখক এশিয়ার মধ্যে ইজিপ্ট-কেও ধরে নিয়েছেন, তার কারণ সে-দেশে পশ্চিম ও দক্ষিণস্থিত দুর্গম প্রাকৃতিক বাধার চাপে দেশবাসীকে সর্বদাই পূর্ব অর্থাৎ এশিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়েছে। এশিয়াবাসীর বিপুল সংখ্যায় ঘনিষ্ঠ সমাবেশ চিরদিনই মহাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে। এদের চোখ দিয়ে দেখলে মহাদেশকে কেন্দ্রিক ও প্রান্তিক দুই অংশে ভাগ করা সঙ্গত। প্রথম অংশে পড়ে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, চীন, জাপান প্রভৃতি। অপর অংশে পড়বে আপেক্ষিকভাবে জনবিরল উত্তর ও মধ্য এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, তুরস্ক এবং ইজিপ্ট্।

যুগ যুগ ধরে এই এশিয়া যে একেবারে অচল অপরিবর্তিত ছিল তা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে মহত্তম ধর্মের সব কয়টির জন্মস্থল এশিয়া মহাদেশ, সুতরাং অন্তত আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল স্রোতধারা এখানে প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু একথাও সত্য যে আর্থিক জীবনের বনিয়াদ এই অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী একই রূপে বিরাজ করে এসেছে। প্রায় কৃষিসর্বস্ব উৎপাদন, চাষের একই সনাতন পদ্ধতি, উৎপাদিত শস্যের প্রায় একই পরিমাণ, আকস্মিক বিপর্যয় ও দুরবস্থা থেকে পুনরুত্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পোৎপাদনের আপেক্ষিক সঙ্কীর্ণতা, সমাজে মধ্যশ্রেণীর দুর্বল অবস্থা—সমাজের এই ছক এশিয়ায় এতই দীর্ঘস্থায়ী যে তাকে বহুদিন চিরস্থায়ী বলেই গণ্য করা হয়েছিল। রাজ্যের উত্থান-পতন, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি ছিল সমাজের উপরতলার বিক্ষোভ, নিতান্তই বাহ্যিক ব্যাপার, সমাজ-জীবনকে এ-সব উপদ্রব বিশেষ স্পর্শ করে নি। উদ্বৃত্ত সম্পদকে চিরাচরিত প্রথায় ভোগ করে এসেছিল মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী, তাদের নেতা ভূস্বামীগণ, পুরোহিতবর্গ অন্তরঙ্গ সহচর।

জীবনযাত্রার এই ধরন কিন্তু এশিয়ার কিছু নিজস্ব ব্যাপার নয়। সভ্যতার অপর লীলাভূমি ইওরোপেও আন্দাজ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত অবস্থা ছিল এরই অনুরূপ। সেখানে কিন্তু এরপর আসে বিশাল পরিবর্তন, এতদিনকার সভ্যতার সাধারণ ছক ভেঙ্গে নতুন যুগের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেই জয়যাত্রার একটা অঙ্গ হল এশিয়ার উপর ইওরোপের প্রভাব বিস্তার। অবশ্য মোটামুটি ১৮০০ সালের আগে পর্যন্ত ইওরোপীয় প্রভাব আধিপত্যে পরিণত হতে পারে নি, ইওরোপের দিগ্বিজয় আসলে সম্পন্ন হয় মাত্র উনিশ শতকে। তখন ইওরোপের কবলে এসে পড়ল এশিয়ার তিন প্রাচীন সমাজ—চৈনিক, হিন্দু, এবং ইস্‌লামীয়; সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় মুঠির মধ্যে এল এশিয়ার

উত্তর ও মধ্য ভূখণ্ড। গোটা এশিয়া তখন ইওরোপের একান্ত পদানত।

ইওরোপের প্রথম সংস্পর্শে এশিয়াবাসী দ্বার রুদ্ধ করে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রয়াস পেয়েছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখা গেল নতুন উদ্যম—আধুনিক ইওরোপের শ্রেষ্ঠত্বটুকু যথাসম্ভব আত্মসাৎ করে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। ইওরোপীয় আঘাতের প্রত্যাঘাতে বিশ শতকে রূপ গ্রহণ করল এশিয়ার মুক্তি-অভিযান। অধ্যাপক রমেন এর তিনটি দিক লক্ষ্য করেছেন—রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন, বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যবহার মারফৎ আর্থিক বিপ্লব, এবং সমাজের পুনর্বিন্যাস। এইভাবে আরম্ভ হয়েছে এশিয়ার চিরাচরিত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী রূপান্তর। ১৯৫০ সালের মধ্যে এশিয়া হল আবার স্বাধীন উত্তর এশিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্লীন হওয়াতে স্বতন্ত্র স্বাধীন না হলেও নবজন্মে উদ্বুদ্ধ। এশিয়ার মুক্তি তাই শুধু বিদেশী শৃঙ্খলের মোচন নয়, সনাতনী বিধিব্যবস্থা থেকে উদ্ধার-প্রাপ্তিও বটে। এশিয়া আজ দাঁড়িয়েছে অজানা ভবিষ্যতের দ্বারদেশে, প্রাচীন সনাতনী সুপ্তিতে প্রত্যাবর্তন আজ অসম্ভব-প্রায়।

ইতিহাসে এশিয়ার পুনর্জাগরণ তাই এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এর বিস্তার এক চমকপ্রদ ঘটনা, সামান্য অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এতবড় পরিবর্তন বিস্ময়জনক, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এখানে অশেষ। এশিয়ার মুক্তি-অভিযানকে অধ্যাপক রমেন যে পাঁচ পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন, সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না হলেও তার কিছুটা সার্থকতা আছে। প্রথম যুগকে তিনি বলেছেন 'জাগরণ' (১৯০০-১৯১৪); তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ইওরোপ সম্বন্ধে 'মোহমুক্তি' (১৯১৪-১৯১৯)। তৃতীয় পর্যায়ে হল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী 'ঘাত-প্রতিঘাত' (১৯১৯-১৯৪১)। এরপর দেখি 'ঝড়ের দিন' (১৯৪১-১৯৪৫) অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধের আলোড়ন। ১৯৪৫-এর পরবর্তী আমলকে গ্রন্থকার নাম দিয়েছেন 'সিদ্ধিলাভ ও আশাভঙ্গ'। অতীত থেকে মুখ ফেরানো সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত।

অধ্যাপক রমেন শুধু কাহিনীকার নন। তাঁর নিজের বিশ্বাস এই যে এশিয়ার মুক্তি পৃথিবীর ঐক্য সাধনের দিকে পদক্ষেপ। বাস্তব ঘটনার মাল-মশলা নিয়েই ইতিহাস রচিত হয়, কিন্তু যে-কোনও ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে ঐতিহাসিকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পেতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে রমেন

হাইডেলবার্গের অধ্যাপক জ্বেলিনেকের এক প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করেছেন। রমেন-এর দৃঢ় ধারণা যে যদিও এশিয়ায় ইওরোপীয় প্রভুত্বের অনেক নিদর্শনেই লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয় তবুও ইওরোপের সাময়িক আধিপত্যের কিছুটা সুফলও লক্ষণীয়। এতে করে এশিয়ার পুনর্জন্ম এবং তার ফলে নতুন সমাজ-বন্ধনে জগৎজোড়া ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে মুশকিল এই যে এশিয়ার নেতৃস্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ঐতিহাসিক কারণেই দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, বিভক্ত।

অধ্যাপক রমেন পশ্চিমী জাতিদম্ভতা থেকে মুক্ত। তিনি তাই এশিয়ায় ইওরোপীয় নীতির অনেক দিকের নিন্দা থেকে বিরত থাকেন নি। নিরপেক্ষতার নামে অনেক ঐতিহাসিকের ইওরোপীয় শাসনের সাফাই গাওয়া তাঁর লেখায় তাই অনুপস্থিত, পশ্চিমী লেখকেদের সাম্রাজ্য-সংশ্লিষ্ট সঙ্কীর্ণতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। অথচ তিনি এশিয়ার অন্ধ স্তাবকও নন। মুক্ত এশিয়া সম্বন্ধে তিনি মোহসৃষ্টি করেন নি, ভবিষ্যতের সঙ্কট সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তাঁর লেখায় মানবিক মনের পরিচয় তাই পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করবে। বহু প্রসঙ্গে তাঁর মতামত এইজন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার্য। দৃষ্টির গভীরতা ও লিপিকুশলতার জন্যও তাঁর বিচিত্র নানা আলোচনা স্মরণীয় হয়ে থাকবে—গান্ধীজির ভূমিকা এবং নেহেরুনীতির বিশ্লেষণ; এশিয়ার উপর জাপানের প্রভাব আর চীনের একপুরুষব্যাপী রণশিক্ষার অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার আশ্চর্য অভিযান কিম্বা ঠাণ্ডা লড়াই-এ পরমাণবিক বোমার চাপ সৃষ্টি; সনাতন সংস্কার বর্জনে মুস্তাফা কামাল পাশার অপূর্ব সাহস অথবা বান্দুং সম্মেলনের তাৎপর্য, যেখানে দেখা গেল এশিয়ার নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্য, অথচ ঈপ্সিত ঐক্য রইল সুদূরপরাহত।

ডক্টর প্লুভিয়ার সংকলিত ঘটনাপঞ্জী ও একটি গ্রন্থ-তালিকা আলোচ্য বইখানির সম্পদ বাড়িয়েছে। পাঠকসমাজে ও ছাত্রমহলে এর বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী বলে লেখার মধ্যে কিছুটা ভুল-ভ্রান্তির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন সহজসাধ্য। নিছক ছাপার ভুল চোখে পড়ল অনেক জায়গায় (যেমন ৬৩, ১৩৬, ১৭৬, ১৯৭, ২০৬, ২৫৫, ২৬২, ২৯২, ২৯৮ পৃষ্ঠায়)। অনেকগুলি ভারতীয় নামের বানান ভুল করা হয়েছে। কয়েকটি বাক্যাংশ পাঠক সম্ভবত ভুল বুঝবেন (যেমন ৬৫, ৬৯, অথবা ২৬২ পৃষ্ঠায়)। জমিদার অর্থে লেখা হয়েছে 'জমিন্দারি'; হরতালকে

বলা হয়েছে 'বয়কট'; 'অসহযোগ' শব্দের উল্লেখ নেই; সুভাষচন্দ্র বসু হয়েছেন 'চন্দ্র বোস'; মীরাটের বন্দীরা এবং সুভাষচন্দ্রকে বর্ণনা করা হয়েছে সোস্যালিস্ট বলে; এম. এন. রায়কে করা হয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের নেতা। জনযুদ্ধকে দেখানো হয়েছে বিকৃত রূপে আর চীনের বহুবিতর্কিত গণ কমিউন নাকি একটা "যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।" ১৮৮ পৃষ্ঠায় পড়ি যে চীনের বিপ্লব "ইতিহাসের মহত্তম বিপ্লব।" সতেরো শতাব্দীর ইংরাজ বিপ্লব, আঠারো শতকের ফরাসী বিপ্লব, এবং আমাদের এ-যুগের রুশ বিপ্লব তাহলে কি ছিল? পশ্চিম ও এদেশের বুদ্ধিবাদী মহলের একাংশে যে প্রচ্ছন্ন চীনা-প্রীতি চোখে পড়ে একি তারই চিহ্ন না একটা অসাবধান উক্তি মাত্র?

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে সমালোচকের কিছু আপত্তি আছে। বিষয়বস্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম, কিন্তু গোটা এই শতককে কি এশিয়ার নিজস্ব বলে চিহ্নিত করা সমীচীন? আফ্রিকা বা লাটিন আমেরিকাই বা নয় কেন? শোনা যায় যে আমেরিকানেরাও অনেকে ভাবে যে শতাব্দীটা নাকি তাদেরই—মার্কিন শতাব্দী। বস্তুনিষ্ঠ বিচারে কি মনে হওয়া উচিত নয় যে বিশ শতকের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা সমাজবাদের অভ্যুত্থান—থিওরি থেকে সমাজবাদের বাস্তবে উত্তরণের প্রচেষ্টা? এটা কোনও মহাদেশ-বিশেষের ব্যাপার নয়, মানবজাতির ইতিহাসে ব্যাপক মোড় ফেরার নিদর্শন। দেশ বা মহাদেশের খণ্ডিত ভাবমণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের যুগকে দেখাটা নিশ্চয় অসঙ্গত।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

দর্শনের দারিদ্র্য ? বিজ্ঞানের বৈভব ?

আয়নার ওপারে এলিসের সই রাঙা রাণীর মুখ দিয়ে ডজসন বলেছেন যে পায়ের তলার মাটি এত দ্রুত সরে যাচ্ছে যে এক জায়গায় স্থির থাকতে গেলেও খুব জোরে ছুটতে হয়। পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে আমাদেরও অনুরূপ পরিশ্রম করতে হয়, নচেৎ পশ্চাদ্‌গমন অনিবার্য। অতীত নিয়ে কারবার করা ঐতিহাসিকের পেশা হলেও তাকে বর্তমানের মাটিতেই দাঁড়াতে হয়। তাই ঐতিহাসিকের বিশ্ববীক্ষা কালের প্রগতির সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তনশীল। অবশ্য এক জাতের ঐতিহাসিক এই প্রয়োজন স্বীকার করেন না। উপাত্ত সংগ্রহেই এদের সন্তুষ্টি। সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়নে এদের অনীহা। এরাই মায়াকভ্‌স্কির উপহাসের লক্ষ্য :

'তল্লাশ করে অতীতকাল
লিভভ্‌স্কির ঝরে অশ্রু—
মেহ্‌দি, না লাল
ছিল বারিবারোসার শ্মশ্রু ?'

('আমি ভালবাসি', ১৯২২; লিভভ্‌স্কি ছিলেন জনৈক পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা।) পেশাদার গবেষক, যারা কেতাব লেখেন খেতাব পেতে, তাদের একটা অংশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত হলেও এদের ঐতিহাসিক না বলে পুরাণতত্ত্ববিদ্ (antiquarian) বলাই সঙ্গত।

এটা আর তর্কাধীন নয় যে ইতিহাসের সন্নিধ সমাজবিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই হাওয়া বদল হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে হাওয়া কিছুটা এলোমেলো বইছে। সেই হাওয়ায় ভাসা কয়েক টুকরো খড় অজ্ঞতার বেড়া ডিঙিয়ে ঐতিহাসিকের আত্মসন্তুষ্টি বিপর্যস্ত করছে। গত দশকে ইতিহাস-দর্শনের কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তার সূত্রের (theory of indeterminacy) ফলে আজকে কারণতার (causality) ধারণা পরিবর্তিত।

What is History : E. H. Carr. Macmillan, London. 21sh.

পরম ও আপেক্ষিক সত্যের ধারণাও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত। নিমিত্তে আস্থা না থাকলে ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ঘটনা-পারম্পর্য রূপে উপস্থাপিত করা স্বাভাবিক (মার্ক টে্ইন-এর ভাষায়—one damn thing after another)। ঐতিহাসিক ফিশর বলেছেন, ইতিহাসে সামান্যীকরণ (generalisation) অসম্ভব, কারণ ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধেই বলা চলে যে সম্পূর্ণ অনুরূপ আগে কখন ঘটেনি ভবিষ্যতেও ঘটবে না। এই জাতীয় (unique) ঘটনার সামান্যলক্ষণার অভাবহেতু সামান্যীকরণ চলে না। আর একটি প্রশ্ন নিয়ে গত দশকে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে—ইতিহাসে নিয়ন্ত্রণ বা নিয়তিবাদ (determinism)। 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' (১৯৫৪) গ্রন্থের লেখক আইজেয়া বর্লিন-এর মতে হেগেল এবং মার্কস্ ছিলেন নিয়তিবাদী। তারা ব্যক্তির ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য (free will) অস্বীকার করে মানুষকে ইতিহাস নির্দিষ্ট নিয়তির অয়ন পথে নিশ্চেতন বস্তুকণার ন্যায় কল্পনা করেছেন। বর্লিনের মতে মানুষকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ববিধানের অধীন করে তার ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা নীতিবিরুদ্ধ। এবং আপতন (accident) ও নিয়মের ব্যত্যয়গুলিকে অবহেলা করে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ঘোষণা করা যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে নিয়তিবাদের ছিদ্রপথে মার্কস্‌বাদকে আক্রমণ করতে একটা দল সৃষ্টি হয়েছে এবং এই দলের মূল গায়েন কার্ল পপ্‌পার। 'মুক্তসমাজ ও তার শত্রু' (১৯৫৭) পুস্তকে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শত্রুদের কুলপঞ্জিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তার মতে হেগেল ও মার্কস্-এর মধ্যেই ব্যক্তিস্বাধীনতালোপী দর্শনের মূল, এবং তারও আগে আদি পাপী প্লাতো। বিশেষভাবে এদের দর্শনে ঐতিহাসিক নিয়তিবাদকে তিনি সকল নষ্টের মূল মনে করেন ('নিয়তিবাদী ইতিহাসের দারিদ্র্য,' ১৯৫৭)। প্রকৃতপক্ষে পপ্‌পারের অভিযোগ এই যে উপরোক্ত ত্রয়ী ইতিহাস-দর্শনে অনিষ্টকর এক মায়াবাদের জনক।

এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে অধ্যাপক কাআর লিখিত নবতম গ্রন্থের মূল্য বোঝা যাবে। যে-সকল লেখক ইতিহাস-দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণে যত্নপরায়ণ তাদের মত খণ্ডন করে কাআর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছেন। তার মতে বৈজ্ঞানিকের কাছে ঐতিহাসিকের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। পশ্চিমে মূল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাচীন চার্চ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ; হিউম্যানিটিজ্ ও বিজ্ঞানের পৃথকীকরণ এবং প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাগুলির বিজ্ঞান সম্বন্ধে উন্নাসিকতা এই কারণপ্রসূত। কৌলীন্য

নষ্ট হওয়ার মধ্যযুগীয় ভীতি ত্যাগ করে বিজ্ঞানের আত্মীকরণ অবশ্য কর্তব্য। কাআর বলছেন যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মুখ্য সমস্যা একই—প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশ। শতাধিক বৎসর আগে মার্কসের উক্তি স্মর্তব্য : "ইতিহাস (অর্থাৎ মানব-ইতিহাস) প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ইতিহাসের অংশ…সমাজবিজ্ঞান কালক্রমে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত হবে, যেমন প্রকৃতিবিজ্ঞান আবার সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত হবে : সৃষ্টি হবে একটি বিজ্ঞান।" ('১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি, মস্কো সংস্করণ, ১৯৬১, পৃঃ ১১১).

কাআরের মতে বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে সনাতন দর্শনের অনেক ভ্রান্তি দূর হয়েছে। এককালে বলা হত যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি অনিবার্য, কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে কেবল সম্ভাব্যতার হিসেব (calculation of degree of probability) করা সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানেও ভবিষ্যদর্শন সম্ভব না হলেও সম্ভাব্যতার পরিমাপ করা চলে। কাআর বৈজ্ঞানিক পঁয়কারের উক্তি উৎকলিত করেছেন : বিজ্ঞানের নিয়মগুলি চিন্তনের সাহায্যের জন্য প্রকল্প (hypotheses) মাত্র। উদাহরণস্বরূপ কাআর পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড-এর কথা বলেছেন—তিনি পুরাতন প্রথায় কার্য-কারণের নিয়ম খুঁজতেন না, কি ঘটছে তার সম্যক ধারণাই তার লক্ষ্য ছিল। নিউটনীয় বলবিদ্যার যান্ত্রিকতাকে আধুনিক বিজ্ঞান পেছনে ফেলে এসেছে। যেমন ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের ছাপ একসময়ে সমাজবিজ্ঞানের ওপর পড়েছিল (organismic theories), পুরাতন বলবিদ্যার অনুকরণে সমাজবিজ্ঞানে অমোঘ নিয়মাবলী আবিষ্কার করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। পুরাতন যান্ত্রিকতার অনুকৃতি আজকের দিনে নিতান্ত অচল।

আধুনিক বিজ্ঞান অতি দুরূহ এবং জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় একাধিক বিদ্যারি অনুশীলন দুঃসাধ্য। তাই নতুন বিজ্ঞান অনেক নতুন ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। অনিশ্চয়তার সূত্র (theory of indeterminacy) বেনিয়মের নিয়ম বলে ধরে নিয়ে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' অনেকে মায়াবাদের পুনরুজ্জীবনের যে সালসা তৈরী করেছেন ঐতিহাসিক তা' মেনে নেবে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাবধানবাণী স্মর্তব্য : "অবশ্য পদার্থ বিজ্ঞান আজ কার্য-কারণের শৃঙ্খল-মুক্ত ; এবং কোনও অবস্থার যথাযথ পুনরাবৃত্তি যেহেতু অঘটনীয়ই নয়, অভাবনীয়ও বটে, তাই নির্বিকল্প-ন্যায়ের মত নিত্য প্রকৃতিও

হয়তো একটা আদর্শ, অসাধ্য আদর্শ। পক্ষান্তরে…কার্যত আমরা হেতুবাদের সমর্থন পাই বা না পাই, নিমিত্তে ভক্তি হারালে, ইতিহাসও রূপকথার ভেক পরবে।" ('উদয়াস্ত', ১৯৩৭)

মার্কসীয় ইতিহাস দর্শনের সমালোচকদের—বিশেষত এদের সুপরিচিত প্রবক্তা কার্ল পপ্‌পার সম্বন্ধে কাআরের মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। এদের বক্তব্য পূর্বেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগ তিন দফা। মার্কস্-এর ইতিহাস দর্শনে আপতন (accident) প্রসূত নিয়মের ব্যত্যয় অগ্রাহ্য করা হয়েছে ; ব্যক্তির ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হয়েছে ; তৃতীয়ত, ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে নিয়তিবাদী মানসিকতার বশে—যেটা ঐতিহাসিকের পক্ষে অনধিকার চর্চা।

কাআর মার্কস্ আলোচনা করে দেখিয়েছেন (পৃঃ ৯৫) যে আকস্মিক ঘটনা বা আপতন তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু আপতিক কোন কিছু কেবলমাত্র ইতিহাসের গতিকে ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করে, গতিপরিবর্তনের কারণ কখনই হয় না। তা ছাড়া আপাত দৃষ্টিতে যেটা আপতিক সেটা বর্তমানে অজ্ঞাত কোনও নিয়মের বশীভূত হতে পারে। এবং আপতনের ধারণাটিও, প্লেখানভের ভাষায়, আপেক্ষিক—কারণ একটি ঘটনাপ্রবাহে যেটা আপতিক অপর একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহে সেটাই অনিবার্য। ব্যক্তির ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা অতি পুরাতন। কাআর এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি—কারণ সম্ভবত এই যে প্লেখানভ্ অনেকদিন আগে মার্কসীয় মতের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন ('ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান'; ১৮৯৮)। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে পপ্‌পার ইত্যাদির কলহ মার্কস্ নয়, হেগেলের সঙ্গে— যিনি অবশ্যম্ভাব্যতা (necessity) এবং ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য (freedom) গূঢ় অর্থে একই অনুমান করেছিলেন। যাই হোক সমস্যাটি কাআরের মতে ইতিহাসের নয় নীতিশাস্ত্রের। (প্রকৃতই এই বিবাদে নিয়ত ক্যালভিনিয় শাস্ত্রালোচনার ক্লান্তিকর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।)

ভবিষ্যদ্বাণী (prediction) সম্বন্ধে নিয়তিবাদী ইতিহাস দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। যদি ইতিহাস (পপ্‌পারে ভাষায় unique process) সামান্যীকরণের সুযোগ না দেয় তবে ভবিষ্যদর্শন অসম্ভব। এর উত্তরে কাআর বলেছেন যে unique কথাটি আপেক্ষিক। দুটি একই জাতের প্রাণী বা একই জাতের পাথর সম্পূর্ণ এক অন্যের অনুরূপ নয়—তাই বলে প্রাণীবিদ্যা বা ভূবিদ্যা

অসম্ভব হয় নি। কাআরের ভাষায়: "The historian is not interested in the unique, but what is general in the unique"...এবং এই ভাবেই সামান্যীকরণ সম্ভব। পপ্‌পার বা বর্লিন বলেন যে ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞানের সূত্রগুলি রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলির মত নয়। অতি সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও সত্যাসত্য নির্ণয়ে আপেক্ষিকতার প্রশ্ন ওঠে। কাআরের মতে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানী অমোঘ নিয়মের পরিবর্তে সম্ভাব্যতার পরিমাপেই আস্থাশীল; সমাজবিজ্ঞানের কর্তব্য একই, কেবল অনিশ্চয়তার মাত্রা অধিক যেহেতু variables বহু, যেহেতু মাপনা অসম্ভব বলে সামাজিক অনেক প্রক্রিয়া অজ্ঞেয়, যেহেতু মানুষ অচেতন নয়।

এই প্রসঙ্গে কাআরের ইতিহাস দর্শন সম্বন্ধে দুইটি প্রতিজ্ঞা বিশদ করা দরকার। ঐতিহাসিকের আপেক্ষিক সত্য নিয়ে কারবার। পরম সত্য চরম লক্ষ্য—"it is still incomplete—something in the future towards which we move"... (পৃঃ ১১৫)। হেগেলীয় ভাষায় তিনি বলছেন "it is in the process of becoming"। দ্বিতীয়ত, কাআর সনাতন দর্শনের বিষয়-বিষয়ী (object-subject) সংক্রান্ত দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। পুরাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের (epistemology) নিরুক্তি তার মতে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য। যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ যুগপৎ বিষয় এবং বিষয়ী, গবেষক এবং গবেষণার বিষয়, দর্শক এবং দৃষ্ট বস্তু সেহেতু বিষয়-বিষয়ী পৃথকৃত্ব অসম্ভব। তা ছাড়া সমাজবিজ্ঞানে নিয়তই বিষয় এবং বিষয়ী পরস্পরকে প্রভাবিত করছে। উদাহরণত আমরা 'ইতিহাসের শিক্ষা' গ্রহণ করি, আবার অর্থনৈতিকের পরামর্শে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করি। আধুনিক পদার্থবিদ্যাতেও বলে যে "জগৎ পর্যবেক্ষণমাত্রেই পক্ষপাত দুষ্ট।" কাআরের মত বিস্তৃত উৎকলনের যোগ্য: "Classical theories of knowledge no longer fit the newer sciences, least of all physics. The process of knowledge, far from setting subject and object sharply apart, involves a measure of interrelation and interdependence between them. Social sciences as a whole, since they involve man as both subject and object, both investigator and the thing investigated are incompatible with any theory of knowledge which rigidly divorces object and subject..."

ঐতিহাসিক কাআর নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে ইতিহাসের পথে মানুষের প্রগতি সম্বন্ধে বিশ্বাস আজকের পশ্চিমের ঐতিহাসিকেরা অনেকেই হারিয়েছে। অথচ এদেরই পূর্বসূরী ঐতিহাসিকদের ক্রমপ্রগতিতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কাআর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কেম্‌ব্রিজ্‌ আধুনিক ইতিহাস সম্পাদনাকালে (১৮৯৬) লর্ড একটনের উক্তি : মানব সমাজের প্রগতি ইতিহাসের একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (hypothesis) যা আমরা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেব। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেন যখন শক্তিস্বাচ্ছল্য ও আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় তখন মানসিক আবহাওয়া ছিল ভিক্‌টোরিয় আশাবাদে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যতে সম্বন্ধে আশা অতীত সম্বন্ধে অন্বেষণে মানুষকে উৎসাহিত করে। "A society which has lost belief in its capacity to progress in the future will quickly cease to concern itself with its progress in the past"। (পৃঃ ১২৭) আজকে প্রগতিতে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের অনাস্থা সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কাপ্রসূত। গত কয়েক বৎসরে মার্কস্‌বাদীদেরও কতকগুলি প্রত্যয় বিপর্যস্ত হয়েছে। কোথায় সেই বিশ্বাস যা নিয়ে মায়াকভ্‌স্কি 'ভাবীকালের কমরেডদের' সাম্যতন্ত্র গড়ে তুলে ইতিহাস সৃষ্টি করতে বলেছিলেন ('জোর গলায়', ১৯৩০)। যে বিশ্বাস নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'ইতিহাস আমাদের দিক নেয়' ('পদাতিক' ১৯৩৯)। আজকের কাজ সেই প্রগতিতে প্রত্যয়ে প্রত্যাবর্তন এবং তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ভাদ্রে প্রকাশিতব্য সমালোচনা সংখ্যা ২

নির্বাচিত বিষয় সূচী

লাফার্গ দম্পতি। সুকুমার মিত্র ॥ বিপ্লববাদের ইতিহাস। শান্তিময় রায় ॥ ইতিহাস ও জনগণ। অমিত গুপ্ত ॥ কলকাতার আদিপর্ব। প্রদ্যোৎ গুহ ॥ ফ্রয়েড। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শিল্প, স্বাধীনতা, সমাজ। গৌতম সান্যাল ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ একালের কবিতা। শান্তি বসু ॥ অনুবাদের ভূমিকা। কেতকী মজুমদার ॥ বিষ্ণু দের কবিতা। সিদ্ধেশ্বর সেন ॥ অশ্বমেধের ঘোড়া : দীপেন্দ্রনাথ। দেবেশ রায় ॥ সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্বরূপ। প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ॥ লোক সাহিত্য ও লৌকিক সংস্কৃতি। তুষার চট্টোপাধ্যায় ॥ উৎস থেকে উজানে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ ঋগ্বেদ-সংহিতা। শঙ্খ ঘোষ ॥ জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি সমস্যা। শঙ্কর চক্রবর্তী ॥ মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব। নিশীথ কর ॥

হিরণকুমার সান্যাল

রামমোহনচরিত

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর।
মিস কলেটের জন্ম হয় ১৮২২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাত্র দশ-এগারো বছরের বালিকা কলেটের মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে তাঁর উত্তর জীবনের প্রধান সঙ্কল্প ছিল রামমোহনের জীবনকাহিনী রচনা। এই কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মিস কলেটের আগ্রহ আর একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল যে অসমাপ্ত রামমোহন-কাহিনীকে সম্পূর্ণ করে তিনি প্রকাশ করেন ১৯০০ সালে—নিজের নাম গোপন রেখে। বর্তমান সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে—তাঁর নাম রেভারেণ্ড এফ্. হার্বার্ট স্টেড্।

রেভারেণ্ড স্টেড্ রামমোহন জীবনীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এই কথা জানান যে পুরোপুরি মিস কলেটের সংগৃহীত তথ্যাদি অবলম্বন করে তিনি ঐ কাজ শেষ করেন।

১৯১৩ সালে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হেমচন্দ্র সরকার মিস কলেটের রামমোহন-জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নবযুগ প্রবর্তনে রামমোহনের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আগের চাইতে অনেক বেশি সচেতন হয়েছি এবং এই কারণে আরো বেশি অনুভব করেছি রামমোহনের একটি প্রামাণিক জীবনকাহিনীর অভাব। (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়'—প্রথম প্রকাশ বঙ্গাব্দ ১২৮৮—বইটিরও যথেষ্ট

The Life and Letters of Raja Rammohan Roy: by Sophio Dobson Collet, Third Edition (1862). Edited by Dilip Kumar Biswas and Probhat Chandra Ganguli. Published by Sadharan Brahmo Samaj. Calcutta.

পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন।) আলোচ্য বইটির সম্পাদকদ্বয় এই অভাব মোচন করেছেন—সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে।

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক গবেষণায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া', 'বাংলার নারী জাগরণ' ও 'রামমোহন প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থাদির লেখক হিসেবে। শেষোক্ত গ্রন্থে প্রভাতবাবু ঐতিহাসিক গবেষণার নামে রামমোহনের নামে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন অত্যন্ত নিপুণ হাতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর আর একটি পুস্তিকা যাতে তিনি পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একাধিক অতথ্য উক্তি খণ্ডন করেছেন অকাট্য যুক্তি দিয়ে। সুতরাং মিস কলেটের বই-এর সম্পাদনার ভার ব্রাহ্মসমাজ যে যোগ্য হাতে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সম্পাদকদ্বয় এ যাবৎ রামমোহন সম্বন্ধে যত গবেষণা হয়েছে তা তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে তার সারসংগ্রহ সংযোজন করেছেন মিস কলেটের বই-এর আটটি পরিচ্ছেদের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে একটি করে নোট হিসেবে। এই নোট-গুলি আকারে দু-এক স্থানে মূল পরিচ্ছেদের চাইতেও বড়। কিন্তু এই নোটগুলি উল্লেখযোগ্য আকারের জন্য নয়—ঐতিহাসিক উপকরণ বিশ্লেষণ করে রামমোহন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সন্ধানের ও নানা ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডনের জন্য।

দুঃখের বিষয় রামমোহন সম্বন্ধে সাগ্রহ গবেষকদেরই কেউ কেউ তাঁর সম্বন্ধে নানা অতথ্য ধারণা প্রচারের চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের নানা দিকে তাঁর গবেষণা আলোকপাত করেছে। এই জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পারি না। কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে রামমোহন সম্বন্ধে গবেষণা প্রসঙ্গে একাধিকবার তিনি শুধু একদেশদর্শিতার নয় রীতিমত বিকৃত মনের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

১। ব্রজেন্দ্রবাবু মানতে চাননি যে কিশোর রামমোহন তিব্বতে গিয়েছিলেন। সম্পাদকদ্বয় প্রমাণ করেছেন এই অবিশ্বাস একেবারে অহেতুক।

২। বিলেতযাত্রার সময়ে রামমোহনের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন তাঁর পুত্র

রাজারাম। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন প্রমাণ করতে রাজারাম মুসলমান। সম্পাদকদ্বয় ব্রজেন্দ্রবাবুর এই অপচেষ্টার সম্যক উত্তর দিয়েছেন।

৩। রামমোহন ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন পরিণত বয়সে কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইংরেজি বলায় ও লেখায় যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন তা অনেক ইংরেজকেও বিস্মিত করেছিল। এমনকি তাঁদের একজন বলেছিলেন যে ইংরেজি শব্দনির্বাচনে রামমোহনের দক্ষতা ইংরেজদেরও অনুকরণ-যোগ্য। (৪০৬ পৃষ্ঠা) কিন্তু ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের সেক্রেটারি স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট্ নিছক বাহবা নেবার লোভে রামমোহনের ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে অপপ্রচারের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার যথোচিত উত্তর দিয়েছিলেন তৎকালীন একাধিক ইংরেজ—যাঁরা রামমোহনকে ভালো করে জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডক্টর সুশীলকুমার দে ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আর্নট-এর উক্তির পুনঃ প্রচারের চেষ্টা করেন। সম্পাদকদ্বয় এই বিষয়ে বহুল আলোচনা করে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে আর্নট-এর উক্তির মূলে ছিল দুষ্ট অভিসন্ধি।

এই সব মূল্যবান নোট ছাড়া বইটির পরিশিষ্ট অংশে আছে বহু মূল্যবান উদ্ধৃতি ও সব শেষে মিস কলেটের একটি জীবনী ও বিভিন্ন ভাষায় রামমোহন প্রণীত গ্রন্থের তালিকা।

এই পরিশিষ্ট অংশগুলির মধ্যে ৭নং অংশে উদ্ধৃত হয়েছে বিখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী রবার্ট ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা একটি চিঠি যার সন্ধান ইতিপূর্বে কেউ পায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের বেশ একটু তর্কযুদ্ধ হয় ও তাতে মিস কার্পেণ্টারের মতে (The Last Days in England of the Raja Rammohon Roy) ওয়েন সম্পূর্ণ পরাজিত হন।

এই সব নানা নোট ও উদ্ধৃতির ফলে মিস কলেটের মূল রচনাটি যে সমৃদ্ধ আকারে আমাদের হাতে পৌছেছে তাতে রামমোহনের একটি সম্পূর্ণ অবিকৃত ঐতিহাসিক চিত্র আমরা পাই। কিন্তু রামমোহন প্রসঙ্গের এই হল সূত্রপাত—শেষ নয়। আশা করি এরপর সম্পাদকদ্বয় হাত দেবেন রামমোহন প্রসঙ্গের পরবর্তী অধ্যায়ে—রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টায়।

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

কণ্ঠরোধে অসম্মতি

সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' দেখে সত্যি চমকে উঠলাম। চিরকাল বলে এসেছি অ্যারিওপ্যাজিটিকা সুতরাং অ্যারিওপ্যাগিটিকা নামটা পড়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল। এতদিন তবে ভুলই বলে এসেছি। লজ্জার কথা। পড়া খানিকটা এগোবার পর বুঝলাম লজ্জিত হবার কারণ নেই। অ্যারিওপ্যাজিটিকাই সঠিক উচ্চারণ। কথাটার গ্রীসীয় জন্মরহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করবার জন্যেই সুপণ্ডিত অনুবাদক প্রচলিত উচ্চারণকে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু জন্মরহস্য ভূমিকাতে উল্লেখ করা যেত। ললাটিকা করা ভালো হয়েছে কি? অচলিত নামের অবতারণায় কারুরই লাভ হয়নি—না অনুবাদকের, না পাঠক-পাঠিকার।

বইখানা যখন হাতে এল তখনও পশ্চিম বঙ্গ নাটক নিয়ন্ত্রণ বিল সাময়িক ভাবে প্রত্যাহৃত হয়নি। বরং প্রতিবাদের প্রবল ঝড় বইছে। মনে হল ভালোই হল। অ্যারিওপ্যাজিটিকা পড়ার পক্ষে এই তো উপযুক্ত পরিবেশ।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীর মহাবিপ্লবের পদধ্বনি কয়েক দশক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। চতুর্থ দশকে ১৬৪৪-এর নভেম্বর মাসে মিল্টনের অ্যারিওপ্যাজিটিকা প্রকাশিত হল।

বিপ্লবের পশ্চাদ্‌পট আঁকতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ক্রিস্টফার হিল দেখিয়েছেন বিপ্লব যখন বেশ খানিকটা দূরে তখন থেকেই সাহিত্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সাহিত্যের কথাই শুধু বলব। ঝড় আসন্ন দেখে জর্জ হার্বার্ট এবং নিকোলাস ফেরার সাহিত্যক্ষেত্র থেকে ফেরার হলেন। মুখ ফুটে কিছু না বলাই নিরাপদ মনে করলেন। বার্টন তাঁর 'অ্যানাটমি অব্ মেলাংকলি' গ্রন্থে সমকালীন সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মেলাংকলি বা বিষাদের বিশ্লেষণ উপস্থিত করলেন। পুরোহিত-তন্ত্রের বিদ্বেষ-

---

* সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক বাংলায় অনূদিত মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' প্রসঙ্গে।

বিভুষিত মিল্টন তাঁর 'লিসিডাস' কবিতায় এবং 'কোমাস' নাটকে তাঁর মনের দ্বন্দ্বের আভাস দিলেন। এর অনেক পরে ১৬৪১-এ স্পষ্ট করে তাঁর মনের কথা তিনি প্রকাশ করলেন যখন পুরোহিততন্ত্রের অপমানজনক জোয়ালের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে বললেন যে এদের ঘাতকসুলভ মনোভাব এবং চরম মূর্খতার জন্যে কোনও স্বাধীন ও ঐশ্বর্যবান্ মনের বিকাশ সম্ভব নয়। কবি জর্জ উইদার সেন্সরশিপ বা চিন্তা-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার নিন্দা করে বললেন যে এই ব্যবস্থা সমস্ত লেখককে, এমনকি রাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীকে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার প্রকাশকে শৃঙ্খলিত করেছে। এই উইদারই জন টেলরকে বলেছিলেন বইএর কাটতি যদি চান তবে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লিখুন আর জেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। যাঁরা সেন্সরশিপের দরুণ দুর্ভোগ ভুগেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চ্যাপম্যান, ড্রেটন, বেন জনসন, ডান, রলি, ফ্লেচার, ম্যাসিঞ্জার, মিডলটন, বার্টন প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকেরা। মহাবিপ্লব যতই এগিয়ে আসতে লাগল সেন্সরশিপও তত কঠোর হতে লাগল। আমাদের এখানে যেমন ব্রিটিশ আমলে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ হয়েছিল আবার এখন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে তেমনি তখনকার ইংল্যাণ্ডেও নাট্য নিয়ন্ত্রণের আয়োজন হয়েছিল। ধর্ম এবং রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে বলে চিত্তবিনোদন বিভাগের অধিকর্তা পুরনো নাটকের পুনরভিনয়ের ওপরও সেন্সরশিপ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সব নাটককেই দু-বার লাইসেন্স নিতে হত। একবার অভিনয়ের জন্যে, আরেকবার ছেপে বার হবার জন্যে। আমাদের সাম্প্রতিক নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলেও দু-বার করে লাইসেন্স নেবার নির্দেশ ছিল। একবার অভিনয়-গৃহ বা অভিনয় স্থানের জন্য, আরেকবার অভিনয় আর অভিনীত হবে যে-নাটক তার জন্যে। ইংল্যাণ্ডে ১৬৪১ পর্যন্ত দেশের মধ্যেকার কোনও রকম খবর ছেপে বার করা আইনত দণ্ডনীয় ছিল। ছাপানো খবরের কাগজ একেবারেই ছিল না, ছিল শুধু ঘরোয়া ভাবে প্রচারিত নিউজ-লেটার—আমাদের 'সংবাদ-পত্র' কথাটি যার সঠিক অনুবাদ হতে পারত। কিন্তু এই নিউজ-লেটার বা সংবাদ-লিপি সর্ব-সাধারণের আয়ত্তের বাইরে ছিল—অত দাম দিয়ে অসাধারণরাই শুধু ওগুলো রাখতে পারতেন। বে-আইনী ভাবে কিছু ছাপালে দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যে-সব বই বিদেশ থেকে আমদানী করা হত, গির্জার বড়ো কর্তারা নির্দোষ বলে ছাড়পত্র না দিলে সেগুলোকে বাজারে ছাড়া যেত না। এই নিয়ম-ভঙ্গের জন্যে জন লিবার্ণকে চাবুক মারতে মারতে লণ্ডনের বড়ো বড়ো রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে

আনা হয়েছিল। লাইসেন্স-প্রাপ্ত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের সময় আরেকবার লাইসেন্স নিতে হত।

অভিজাততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেন্সরশিপের ব্যবস্থাও ধসে পড়ে। ১৬৪১-এর পরের বছরগুলো রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্যতা লাভ করেছে কারণ তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের মুখপত্র হিসেবে শস্তা খবরের কাগজ প্রকাশিত হতে লাগল। ১৬৪৫-এ দেখা গেল ৭২২ খানা খবরের কাগজ বার হচ্ছে। যত রকমের বিষয় কল্পনা করা যায় সব রকম বিষয়েই পুস্তিকা প্রকাশের জোয়ার বইল। ত্রিশ বছর ধরে গড়ে দৈনিক তিন খানা করে পুস্তিকা বার হতে লাগল যদিও ১৬৪২ থেকে ১৬৪৯ এ ক-বছর পুস্তিকা-প্রকাশের দৈনিক হার আরও বেড়ে গিয়েছিল। এই আত্মপ্রকাশের প্রবলতাকে জাতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ বলে মিল্টন অভিনন্দন জানালেন। ভাবলেন চিন্তা-নিয়ন্ত্রণের পাষাণ-ভার থেকে মুক্তি পেয়ে মানব-মন মননের অবারিত স্রোতে এগিয়ে যাবে দূরে দূরান্তরে স্বাধীন চিন্তার নিত্য নব দিগন্তে। অ্যারিওপ্যাজিটিকার একটি বহুব্যবহৃত উদ্ধৃতি এই ভাবটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করছে: "Methinks I see in my mind a noble and prissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks."

১৬৪৩-এর জুন মাসে পার্লামেণ্ট সেন্সরশিপের পুনঃপ্রবর্তন করাতে মিল্টন অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তাঁর মনে হল প্রবহমান মুক্ত জীবনস্রোতের গতিপথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করা হল। সেন্সরশিপের যে-হুকুমনামা পার্লামেণ্ট জারি করেছিল তাতে ছিল যে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমোদনে এবং বিনা লাইসেন্সে যেন কোনও গ্রন্থ ছাপানো না হয়। একেই বলে প্রি-সেন্সরশিপ অর্থাৎ প্রকাশের পূর্বে নিয়ন্ত্রণ—ভ্রূণ অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণও বলা যেতে পারে। আমাদের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলেও এই প্রি-সেন্সরশিপের ব্যবস্থা ছিল। মিল্টন তাঁর সময়কার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে এ ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং কোনও লেখা প্রকাশ হওয়ার পর যদি তার মধ্যে দণ্ডনীয় কিছু থাকে তাহলে যথারীতি বিচারের পর আদালত শাস্তির ব্যবস্থা করুক। আমাদের নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকেরা প্রতিবাদ করবার সময় প্রায় একই কথা বলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে অভিনয়ের পর দোষ বার হলে তখন নাটক-নাট্যকার-

নাট্যপ্রযোজক ইত্যাদি সকলকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদালতে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। প্রকাশের আগে নয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি আইনে বিবিধ অপরাধের যথেষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সেই অনুযায়ী দোষদুষ্ট নাটক পরিবেশনের অপরাধের শাস্তি অনায়াসে হতে পারে। যাক সে অন্য কথা।

সুতরাং মুদ্রণ-যন্ত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ সহ্য করতে না পেরে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্যেই অ্যারিওপ্যাজিটিকার জন্ম। একজন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ঐতিহাসিক অবশ্য বলেছেন যে বইখানির উৎপত্তির মূলে প্রায় বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা গোছের একটা ব্যাপার আছে। মিল্টন তাঁর চেয়ে অর্ধেক বয়স কম এমন একটি কন্যাকে গৃহিণী করেন কিন্তু কন্যাটি এক মাস যেতে না যেতেই রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যান। এই ঘটনা মিল্টনকে বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে পুস্তিকা প্রকাশে উত্তেজিত করে। বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত এই পুস্তিকাগুলির প্রচার কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করাতে মিল্টন মুদ্রণ-যন্ত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে অ্যারিওপ্যাজিটিকা লেখেন। যে-মিল্টন বরাবর রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে লেখনী চালনা করেছেন এবং লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তাঁকে এভাবে খাটো করবার চেষ্টা করা মানে নিজেই খাটো হওয়া।

পার্লামেন্টের মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে মিল্টন অ্যারিওপ্যাজিটিকায় বলেছেন যে এই নিয়ন্ত্রণ-প্রথা বা কু-প্রথা প্রথম মধ্যযুগে উদ্ভাবিত হয় রোমান-ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপদের প্রাধান্যের সময়, যখন অন্ধ ধর্মোন্মত্ততা চরমে উঠেছে এবং ইন্‌কুইজিশান নামক ধর্মীয় আদালত বিচারের নাম করে নির্বিচারে ধর্মের তথাকথিত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে চলেছে বীভৎস নির্মমতার সঙ্গে—বিচার হয়ে উঠেছে নিপুণ মারণ-শিল্প কারণ ঐ আদালত হত্যার নানারকম কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। ধর্মকে রক্ষা করতে হবে তো—সুতরাং "মারি অরি পারি যে কৌশলে"। মধ্যযুগের আঁস্তাকুড়ে জন্মেছে যে ঘৃণ্য কু-প্রথা মিল্টন তাকে বর্জন করবার আহ্বান জানালেন।

বাংলা অনুবাদে নতুন করে অ্যারিওপ্যাজিটিকা পড়বার সময় এসব কথা পড়তে পড়তে স্বভাবতই আজকের দিনের কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল। মনে পড়ছিল যে আজকে স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামের অপূর্ব ঐতিহ্যবাহী

বাংলা দেশে যে নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিল আমাদের সামনে এসেছিল এবং হয়তো আবার নতুন আকারে অদূর ভবিষ্যতে আসবে তা এমন একটি কু-প্রথার অনুকরণ ও অনুসরণ করছে যার জন্ম আমাদের পরাধীনতার কলঙ্কিত যুগে, বৃটিশ আমলের আঁস্তাকুড়ে।

যে আইনের বিরুদ্ধে মিল্টনের প্রতিবাদ সেই আইনের এক জায়গায় এই কথাগুলো আছে :

The Stationers' Company and the officers of the two Houses are authorised to search for unlicensed Presses, and to break them up ; to search for unlicensed books, etc. ; and confiscate them ; and to "apprehend all authors, printers and others" concerned in publishing unlicensed books and to bring them before the Houses "or the Committee of Examination" for "further punishments", such persons not to be released till they have given satisfaction and also "sufficient caution not to offend in like sort for the future."

"All Justices of the Peace, Captains, constables and other officers" are ordered to give aid in the execution of the above.

আমাদের ১৯৬২-র নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলে ছিল :

The authority for granting licenses under this Act (herein after referred to as the licensing authority) shall be—

(a) in Calcutta, the Commissioner of Police, Calcutta, and

(b) elsewhere, the District Magistrate,

If any person

(a) holds any performance, or causes or permits any performance to be held, or

(b) organises, conducts or takes part in, any performance held, or

(c) being the owner or occupier or having the use of any place, opens, keeps or uses such place, or causes or permits the same to be opened, kept or used, for any performance held,

in contravention of any of the Provisions of this Act or of any rule or order made thereunder, he shall, on conviction, be punishable.......

যাঁরা লাইসেন্স দেবেন তাঁদের সম্বন্ধে মিল্টনের বক্তব্য বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য :

"এই প্রসঙ্গে অনুজ্ঞা-পত্র দানকারিগণের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন তাহার কথা একবার বিবেচনা করুন। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বইগুলি জগতে আলগোছে ভাসিয়া আসুক আর না আসুক, যে লোককে এই সব বইয়ের জীবনমৃত্যুর বিচারক হইয়া বসিতে হইবে তাঁহাকে সাধারণ পর্য্যায়ের মানুষ হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত হইতে হইবে। তাহা না হইলে কোন্‌টা অনুমোদনযোগ্য,—কোন্‌টা নয় এ বিষয়ে দোষগুণ বিচারে প্রকাণ্ড ভুল হইবার সম্ভাবনা।...নিতান্ত অপদার্থ লোক, অথবা যে লোক নিজের সময় সম্বন্ধে একেবারে খোলাখুলি ভাবে অমিতব্যয়ী নয় এমন কোনও লোক যে বর্তমান অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের স্থলাভিষিক্ত হইতে চাহিবেন তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অবশ্য যদি কেহ নিজেকে একজন বেতনভুক্ মুদ্রণ-পরীক্ষকের পর্যায়ে পাতিত করিতে না চান! এই সব পর্যালোচনা করিয়া ইহার পরে আমরা কি জাতীয় অনুজ্ঞাপত্র-দানকারী আশা করিতে পারি সে-বিষয়ে অতি সহজেই ভবিষ্যদ্‌-দৃষ্টি লাভ করিতে পারি। তাঁহারা হয় হইবেন অজ্ঞ, না হয় স্বেচ্ছাচারী, না হয় শিথিল অমনোযোগী—আর না হয় হইবেন আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত হীনচেতা।" (সাহিত্য অকাদেমীর ডঃ দাশগুপ্ত কৃত অনুবাদ থেকে উদ্‌ধৃত)

অনুজ্ঞাপত্রদানকারীদের সম্পর্কে মিল্টনের ধারণার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মিল আছে।

"ক্ষমতা হস্তান্তরের এক বছর পরেই 'শহীদের স্বপ্ন', 'বাপুনে কাঁহানা', 'জাগ্রত-ভারত' ও 'বিষের ধোঁয়া' প্রভৃতি ছবিতে পুলিসি অত্যাচারের দৃশ্য ও 'ভারত ছাড়' শ্লোগান বাদ দিতে বাধ্য করা হয়। বিখ্যাত ছবি 'ভুলি নাই'কে সতর্ক করা হয় এবং '৪২ সাল' ছবিকে...সাজা দেওয়া হয়।...এই ঘটনা আমাদের দেশের প্রযোজকদের বুঝিয়ে দেয় যে, ব্রিটিশের পুরাতন অত্যাচারের কথা অর্থাৎ গত ২০০ বছরের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের প্রকৃত ইতিহাস বলা চলবে না। এই আমলের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজমোহনের

বউ' যে-ভাবে সেন্সার করা হয় তা উল্লেখযোগ্য। এই ছবিতে জমিদার এক জায়গায় কর্মচারীদের বলেছেন, পুলিশকে ঘুষ দিয়ে এজাহার বদলে দিতে। সেন্সারএ জায়গাটা বাদ দেয়।…'আবর্ত', 'দিগ্‌ভ্রান্ত' ও 'ছিন্নমূল' প্রভৃতি ছবিও সেন্সারের পাল্লায় পড়ে। তার মধ্যে 'দিগ্‌ভ্রান্ত'তে বলা হয়েছিল দেশের সংবাদপত্র ধনী লোকদের হাতে এবং তারা অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা ছাপে না…শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'তে "তোর মুখে ঝাড়ু" মারবো' সংলাপ এবং 'বিন্দুর ছেলে'তে মা সন্তানকে চুমো খাচ্ছে—সেন্সার বাদ দেয়। অথচ বিলাতী ও বোম্বাই-মার্কা অশ্লীল ছবি সম্পর্কে সেন্সর কিছু বলে না। এই সব কারণে ১৯৫০ সালে ফিল্ম তদন্ত কমিটির সামনে বাংলা ছবির খ্যাতনামা ডিষ্ট্রিবিউটার শ্রী কে. এল. চ্যাটার্জি বলেন: "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখাতে পারি না সরকারী সেন্সারের ভয়ে—ইতিহাস দেখাতে পারি না হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ভয়ে।" (দর্পণ শুক্রবার, ২৮ জুন ১৯৬৩—"আনন্দবাজারের বিভ্রান্তি চেষ্টার অপচেষ্টা" লেখক: স্বধী প্রধান)।

সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত অ্যারিওপ্যাজিটিকার অনুবাদের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে সি. ভি. ওয়েজউড আলোচ্য গ্রন্থটির কালাতীত সর্বজনীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে বিপ্লবী মিরাবো এই মহৎ গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন। ওয়েজউড আরও বলেছেন যে মিল্টন যে-যুদ্ধের কথা জানতেন তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক যুদ্ধের সময় ১৯৪৪-এর লণ্ডনে বসে যথোপযুক্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অ্যারিওপ্যাজিটিকার তৃতীয় শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই শতবার্ষিক শ্রদ্ধা নিবেদনে যোগ দিয়েছিলেন দেশ-বিদেশের মনীষীরা এবং তাঁরা মিল্টনকে স্বাধীন মনের উৎসাহী সমর্থক বলে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

পড়তে পড়তে ভাবছিলাম মিল্টনের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ইংরেজরা এদেশে কোন্ ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ জাতির জাতীয় ঐতিহ্য ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করলে বোধ করি এই শাসক-শ্রেণীর ওপর অবিচার করা হয়। ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার তাঁদের সমালোচনা শুনলে বরাবর অধৈর্য হয়ে উঠতেন এবং জনমতের বাহন ও পরিবেশকদের নিষ্ঠুর আক্রমণে বিপর্যস্ত করতেন। এদেশের প্রেস আইনের ইতিহাস তার অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বুকে করে রয়েছে। মহাকবি মিল্টনের

অ্যারিওপ্যাজিটিকা ব্রিটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে প্রচলিত থেকেও শাসকশ্রেণীর মেজাজের কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি, যেমন পারে নি আরেক মহাকবির সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সম্পর্কে সুতীব্র ধিক্কার ধ্বনি। সিডিশান বা রাজদ্রোহ বিল পাশ হবার ঠিক আগের দিন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় মনের আগুনে ভরা যে-প্রবন্ধ পড়েছিলেন তাতে বলেছিলেন: "···দেখিলাম গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!" তিনি আরও বলেছিলেন: "অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ করা না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।"

সমস্যা হচ্ছে মিল্টনের মহান্ আদর্শ যেমন ইংরেজ শাসকদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি তেমনি রবীন্দ্রনাথের মহান্ আদর্শও ইংরেজ-মুক্ত ভারতবর্ষে সম্মানিত হচ্ছে না। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর প্রতি বছর নভেম্বর মাসে আমরা অ্যারিওপ্যাজিটিকার জন্মদিবস পালন করতে পারতাম আর সকলের সামনে তুলে ধরতে পারতাম স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বজার মতো মিল্টনের অ্যারিওপ্যাজিটিকার এই বাণী: "Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely, according to conscience above all liberties." To know, to utter, and to argue freely—জানবার, প্রকাশ করবার এবং অবাধে তর্ক করবার অধিকার ঘোষণা করেছিলেন মিল্টন ভিক্ষার ভঙ্গীতে হাত পেতে নয়, উদ্ধতভাবে উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ হাতে। সেই জন্যে তিনি স্মরণীয়।

কেউ কেউ দুঃখ করে বলেছেন মিল্টনের একমাত্র বহুল-প্রচারিত গদ্য রচনা যে অ্যারিওপ্যাজিটিকা তার বিষয়বস্তু হচ্ছে কি না আধুনিককালে সর্বত্র স্বীকৃত পরমতসহিষ্ণুতার নীতি। কিন্তু "সর্বত্র স্বীকৃত" কথাটা অত চট করে বলে ফেলা কি ঠিক হল? অপর একজন সমালোচক প্রত্যুত্তরে বলেছেন যে আমরা আজকাল কারুর সঙ্গে মতবাদের ব্যাপারে বিরোধ হলে তাকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করি না বা আগুনে পুড়িয়ে মারি না বটে—কিন্তু

এই সহিষ্ণুতাটুকুই যথেষ্ট নয়। প্রত্যুত্তরের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি সেটুকু সহিষ্ণুতাই কি সর্ব দেশে সর্বক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে? ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার নানা কৌশল কি আমরা জানি না? চিতার আগুনে জ্যান্ত নাই বা পোড়ালাম, কিন্তু ধিকি ধিকি তুষের আগুনে পুড়বে অথচ চট করে মরবে না এরকম ব্যবস্থা কি আমরা জানি না? সুতরাং জনমত প্রকাশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অ্যারিওপ্যাজিটিকায় বিধৃত মিল্টনের প্রগতিশীল মতবাদ আজও আমাদের প্রবল সহায়ক। সেই জন্যে অ্যারিওপ্যাজিটিকার বাংলা অনুবাদকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং তার বহুল প্রচার কামনা করি।

মিল্টনের প্রগতিশীল মতবাদের কথা বিস্তারিতভাবে বলবার ক্ষেত্র এটা নয়। একখানি বইকে পূর্ণ মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করাও মূঢ়তা। তবে একথা নিশ্চিত যে মিল্টনের উদারপন্থী মত ও আদর্শ, "সবকিছুই প্রমাণ করবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য" তাঁর এই দাবি এবং মানবসমাজের অগ্রগমনের শক্তির ওপর তাঁর অবিচল আস্থা আজকের দিনের পথ-চলায় আমাদের অমূল্য পাথেয়। ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত মিল্টনও ছিলেন না, আমাদের রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না। কিন্তু "একলা চল রে" সবসময় আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদের জপমন্ত্র নয়, বিশেষ পরিবেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক সম্প্রদায়ের সকলকে ছাঁচে ঢালার অপচেষ্টার প্রতিরোধের বৈপ্লবিক আহ্বানও বটে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর মুদ্রণ-যন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ সমাজের হয়েই বিদ্রোহ। তাই ক্ষুব্ধ মিল্টনের আক্ষেপ: "the iron yoke of outward conformity hath yet left a slavish print upon our necks" আজও বহু দেশে বহু মানুষের মর্মান্তিক আর্তনাদ।

সাহিত্য অকাদেমীর অ্যারিওপ্যাজিটিকার অনুবাদক ও সম্পাদক হচ্ছেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থের সি. ভি. ওয়েজউড লিখিত মুখবন্ধটির উল্লেখ করেছি। ওয়েজউডের মুখবন্ধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তা মিল্টনের গ্রন্থখানির সর্বজনীনতার দিকটা তুলে ধরেছে এবং মিল্টনকে আমাদের আজকের দিনের দ্বন্দ্ব-মুখর জীবনের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে যুক্ত করেছে। এই মুখবন্ধের পরেই হচ্ছে ডক্টর দাশগুপ্তের অতি মূল্যবান্ ভূমিকা। সুবিস্তীর্ণ এই পটভূমিকায় ডক্টর দাশগুপ্ত পাঠক-পাঠিকাকে সাহায্য করবার জন্যে প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তথ্য সংগ্রহে তাঁর পাণ্ডিত্য সুপ্রমাণিত।

পরিবেশনের সরস প্রাঞ্জলতা তাঁর সৎসাহিত্যের দুর্গে সাধারণ-পাঠকের প্রবেশকে সুগম করবার আন্তরিক আগ্রহের পরিচায়ক। অ্যারিওপ্যাজিটিকা নামের উৎপত্তি, ইংল্যাণ্ডে মুদ্রণালয়-নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, গ্রন্থখানির সার সংকলন এবং মিল্টনের রচনাশৈলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভূমিকাটিকে প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার প্রিয় করে তুলবে। আমাদের মাতৃভাষার কোনও গ্রন্থে এরকম উচ্চমানের ভূমিকা বিরল। ওয়েজউড যেমন মিল্টনের অ্যারিওপ্যাজিটিকাকে আমাদের আজকের দিনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন ডক্টর দাশগুপ্ত অবশ্য তা করেন নি কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মুদ্রণালয়-নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তাঁর দুয়েকটা উক্তি যেন আজকের দিনের জগৎ ও জীবনের ওপর তির্যকভাবে আলোকপাত করছে বলে ভাবতে ভালো লাগে। যেমন: "...পুরোহিত-তন্ত্রের পক্ষ হইতে প্রেসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র চেষ্টা হইলে প্রেসবিটারগণ এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টগণ সমভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্রকে পরাভূত করিয়া নাকচ করিয়া দিতে পারিবার পরে প্রেসবিটারগণ যখন শাসনক্ষমতা হাতে পাইলেন তখন তাঁহারা আবার বিরুদ্ধবাদিগণের সমালোচনায় এবং আক্রমণে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্র-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীতা বোধ করিতে লাগিলেন।" আবার: "আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসঙ্গে লেখক-নিয়ন্ত্রণের যে সরকারী অভিসন্ধি তাহা রোধ করাই হইল মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা' গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য।" খবরের কাগজের সব খবর সব সময় লক্ষ্য করতে পারি না কিন্তু আমার বিশ্বাস ডক্টর দাশগুপ্ত নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ধৃষ্টতা যদি মার্জনীয় হয় তবে আরেকটা বিশ্বাসও এখানে উত্থাপন করি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ডক্টর দাশগুপ্ত কলাকৈবল্যবাদীদের মতবাদে বিশ্বাসী নন তবে সোজাসুজি সেই মতবাদটাকে খণ্ডন করতে একটু দ্বিধা বোধ করেন, বোধ হয় তাঁর অনন্যসুলভ অমায়িকতায় বাধে—এই অমায়িকতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে বলেই একথা বলছি। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা স্পষ্টতর করা দরকার। ভূমিকায় যেখানে ডক্টর দাশগুপ্ত মিল্টনের কবি-জীবনের ইতিহাস দিয়েছেন সেখানে দেখিয়েছেন যে কবি সুদীর্ঘ উনিশ বছরের জন্যে "বহির্জীবনের উত্তেজনাময় এবং আবিলতাময় আন্দোলন সমূহের" সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন: "ইহা স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে অভিপ্রেত বলিয়া মনে

হয় না। মিল্টনের অনুরাগী সমঝদারগণ তাই অধিকাংশেই এই মত প্রকাশ করিবেন যে মিল্টন তৎকালীন সর্বপ্রকার আন্দোলন মতবিরোধ এবং দলাদলির মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়া ভাল করেন নাই…" পরমুহূর্তেই তিনি বলেছেন: "…মিল্টনের জীবন-দেবতা তাঁহাকে অন্য পথে পরিচালিত করিয়াছেন। একেবারে বিপথে ঠেলিয়া দিয়াছেন কি-না সে-কথা আজ নিশ্চিত করিয়া কে বলিবে?" একটু পরেই কিন্তু দ্বিধার ভাব কাটিয়ে উঠে ডক্টর দাশগুপ্ত জীবন-দেবতার চেয়ে জীবনের আহ্বানকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় বলেছেন: "মিল্টন এই জীবন-সংগ্রামের ধূলিক্লিন্ন দিকটিকে সযত্নে পরিহারপূর্বক নিজেকে যদি বৃহত্তর সমাজ-জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেন, শুধু মননহীন কর্মহীন প্রথাবদ্ধ বাণী-আরাধনাতেই নিজেকে একনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেন তবে হয়তো অলস-কল্পনার বিলাস-ব্যসনে রচিত কতকগুলি স্বাদগন্ধহীন ছন্দমিলযুক্ত জিনিস পাইতে পারিতাম·· মানুষের জীবনে তাহা কোনও সত্য মূল্য লাভ করিত না। …যে কাব্য…তীব্র ঘনীভূত চেতনাকে মুক্তি দেয় নিখিল শূন্যের সীমাহীন প্রসারে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কাল-পরিধিতে, সে-জাতীয় কাব্য রচনার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তাহার জন্য মিল্টনের জীবন-দেবতা হয়ত এই দীর্ঘ উনিশ বৎসরের রূঢ় জীবন-চর্চাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।" দ্বিধা কাটিয়ে উঠে পণ্ডিতেরা যদি জীবনধর্মী সাহিত্যের পক্ষে এভাবে পৌরুষময় প্রত্যয়পূর্ণ ঘোষণায় মুখর হয়ে ওঠেন তবে নপুংসক সাহিত্যিকদের কোমল কলকাকলির মধ্যেও আমরা কিছুটা ভরসা পাই।

ভূমিকা থেকে অনুবাদে পৌছতে অনেক দেরী হয়ে গেল। অনুবাদ থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। অতি সুপরিচিত কয়েকটি উদ্ধৃতি অবশ্য দেব। নইলে বিচার কি করে হবে? মূল ও অনুবাদ পর পর দিয়ে যাচ্ছি।

ভালো বই সম্বন্ধে মিল্টন বলছেন:

"…as good almost kill a man as kill a good book. Who kills a man kills a reasonable creature, God's image; but he who destroys a good book, kills reason itself, kills the image of God, as it were in the eye. Many a man lives a burden to the earth; but a good book is the precious life-blood of a

master spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life." অনুবাদ :

"একখানি ভাল বই নষ্ট করা প্রায় একটি ভাল মানুষকে মারিয়া ফেলিবারই সামিল, যে ব্যক্তি একটি মানুষকে মারিয়া ফেলে সে একটি বুদ্ধিজীবী প্রাণীকে মারিয়া ফেলে—ভগবানের প্রতিমূর্তিকে মারিয়া ফেলে; কিন্তু যে ব্যক্তি একখানি ভাল বইকে নষ্ট করিয়া ফেলে সে বুদ্ধিকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে—সে যেন ভগবদ্-বিগ্রহকে চোখে আঘাত করিয়াই বিনষ্ট করে। অনেক মানুষই পৃথিবীতে একটা ভারস্বরূপ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু একখানি ভাল বই হইল একটি মহান্ আত্মার প্রাণ-শোণিত-স্বরূপ—ইহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বহুমূল্য রত্নের ন্যায় সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে এই জীবনের পরে অপর একটি জীবনের উদ্দেশ্যে।"

সম্ভবত embalmed-এর অনুবাদ "মুদ্রাঙ্কিত"—অনুবাদকের গুরুতর অমনোযোগিতার প্রমাণ। বাদবাকী সবটুকু অনুবাদ হিসেবে মন্দ নয়।

গুণীর গুণাবলীর প্রয়োগ সম্পর্কে মিল্টন বলছেন :

"I cannot praise a fugitive and cloistered virtue, unexercised and unbreathed, that never sallies out and sees her adversary, but slinks out of the race, where that immortal garland is to be run for not without dust and heat."

অনুবাদ : "যে গুণের কোনও অনুশীলন নাই, জীবনের স্পর্শে যাহা প্রাণবন্ত নয়, এমন পলায়নপর মঠপ্রাচীর-বেষ্টিত গুণসমূহের আমি প্রশংসা করিতে পারি না। যে গুণ স্বতঃ-উৎসারণের দ্বারা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার প্রতিপক্ষের অনুসন্ধান করে না, পরন্তু জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে অমর-মাল্য লাভের জন্য ধূলি-ক্লিষ্ট তাপ-দগ্ধ ধাবন-প্রতিযোগিতা সেখানে যে গুণ চোরের মত লঘুপদে পিছাইয়া চলে, আমি সেই গুণের প্রশংসা কিছুতেই করিতে পারি না।"

Cloistered virtue-র অনুবাদ "মঠপ্রাচীর বেষ্টিত গুণ"। এটা অনুবাদ হিসেবে বেশ দুর্বল। Unexercised, unbreathed, sallies out এবং sees her adversary-র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুবাদে ফুটে ওঠে নি। slinks out of the race-এর ভাষান্তরও যথাযথ হয় নি। লেখক হয়তো লক্ষ্য করেন নি যে বাক্যটিতে অশ্বারোহণ-সংক্রান্ত metaphor অধিকাংশ কথার অর্থকে বৈশিষ্ট্য

দান করেছে। অনুবাদ গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে আমার অনেকবার মনে হয়েছে যে লেখক ভূমিকায় যতখানি মন দিতে পেরেছিলেন যে কোনও কারণেই হোক অনুবাদের বেলা ততখানি মনঃসংযোগ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

ইংরেজ জাতির নবজাগরণের লক্ষণ দেখে কবির আনন্দ তাঁর ভাষাকে নিয়ে গেছে মহাকাব্যের উচ্চগ্রামে। তিনি বলছেন :

"Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks. Methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth, and kindling her undazzled eyes at the full midday beam ; purging and unscaling her long-abused sight at the fountain itself of heavenly radiance ; while the whole noise of timorous and flocking birds, with those also that love the twilight, flutter about, amazed at what she means, and in their emious gabble would prognosticate a year of sects and schisms."

অনুবাদ : "আমার মনে হইতেছে, আমি আমার মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি, একটি মহান্ প্রবলপরাক্রান্ত জাতি নিদ্রাভঙ্গের পরে একটি বলিষ্ঠ লোকের ন্যায় তাহার অধৃষ্য কেশগুচ্ছ কম্পিত করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। মনে হয় এই জাতিকে আমি একটি ঈগল পাখীর সদৃশ দেখিতে পাইতেছি। সেই ঈগল পাখীটি তাহার পুরাতন পালক ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রবল যৌবনে বিবর্ধিত হইতেছে ; তাহার যে চক্ষু দুইটিকে কোনও আলোকই ধাধাইয়া দিতে পারে নাই সেই চক্ষু দুইটিকে পরিপূর্ণ মধ্যাহ্ন তেজের দিকে আরও প্রখরভাবে স্থাপন করিতেছে। এই ঈগলের দৃষ্টিশক্তি বহুদিন পর্যন্ত অপব্যবহার-দুষ্ট, দিব্যজ্যোতিতে সে আজ সেই দৃষ্টিকে পরিষ্কৃত এবং আঁশবিমুক্ত করিয়া তুলিতেছে। আর অন্যদিকে দলবদ্ধ ভীরু পাখীগুলির এবং গোধূলির আবছায়াপ্রিয় পাখীগুলির কলরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঈগল যে কি করিতে চাহে তাহা ভাবিয়া এই পাখীগুলি বিস্মিত! তাহাদের ঈর্ষান্বিত বকবকানিতে তাহারা ভবিষ্যৎ বৎসরটির জন্য কেবল দল ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতেছে।"

"প্রখরভাবে স্থাপন করিতেছে" আর "আঁশবিমুক্ত" এই কথাদুটিকে বাদ

দিলে উপরের উদ্‌ধৃতিটি সুন্দর অনুবাদের একটি উদাহরণ, অনুবাদকের ভাষান্তরণ-প্রতিভার পরিচায়ক। মূল ইংরেজী পড়বার সময় ভাবছিলাম invincible locks-এর কি প্রতিশব্দ দেন অনুবাদক দেখা যাক। "অধৃষ্য কেশগুচ্ছ" পড়ে মুগ্ধ হলাম। "অধৃষ্য" বিশেষণটির জন্য অনুবাদক অভিনন্দন-যোগ্য। এই হল ঠিক ঠিক inspired অনুবাদ। এই জায়গাটা পড়তে পড়তে অনুবাদকের সব ত্রুটি ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। একটু বাদেই পড়ি সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বমানবের হয়ে মিল্টনের স্বাধীন চিন্তার অবারিত প্রকাশের অলঙ্ঘ্য দাবি: "Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties." অনুবাদ পড়ি: "আমাকে জানিবার স্বাধীনতা দিন, আমাকে বলিবার স্বাধীনতা দিন, —আমাকে বিবেক অনুসারে—সর্বোপরি স্বাধীনতার নীতি-অনুসারে—যুক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দিন।" Above all liberties-এর এই অনুবাদ একেবারেই সমর্থন করা যায় না। অথচ ওয়েজউড লিখিত মুখবন্ধে একই উদ্‌ধৃতির নির্দোষ অনুবাদ অনুবাদক নিজেই উপস্থিত করেছেন। (পৃঃ ৯)

আমি শ্রদ্ধেয় অনুবাদককে অনুরোধ করি তিনি অবিলম্বে নতুন সংস্করণের জন্য অনুবাদ-সংস্কারের কাজে হাত দিন। Unesco-প্রচারিত বাংলা বই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁর অবিসম্বাদিত। নিশ্চয়ই ব্যস্ততাজনিত দ্রুততা অনুবাদের দুর্বলতার জন্যে দায়ী। মিল্টনের ল্যাটিন-প্রভাবিত জটিল বাক্যগঠনরীতির জট ছাড়িয়ে অনুবাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন। তবু এ কাজে অনুবাদক যথেষ্ট নিপুণতা দেখিয়েছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমরা আশা করব তিনি উন্নততর অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাকর-প্রমাদগুলো (যেমন 'স্বাগত সম্ভাষণ', 'পুড়িয়া ফেলান', 'ভাক্তামি', 'মাপজোপ' ইত্যাদি) দূর করবেন। ইংরেজী উচ্চারণের বাংলা প্রতিলিপিগুলোও সব জায়গায় ঠিক হয় নি। সেগুলো পরিবর্তিত হওয়া খুবই দরকার।

যারা কণ্ঠরোধে আগ্রহী, গ্রন্থমেধযজ্ঞে উৎসাহী তাদের প্রতি মিল্টনের সর্বকালের ভর্ৎসনা-বাণী এই আলোচনার উপসংহার হোক:

"একখানি ভাল বই নষ্ট করা প্রায় একটি ভাল মানুষকে মারিয়া ফেলিবারই সামিল।"

আহারের পর
দিনে দু'বার..

পরিচয়

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

২

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ২
ভাদ্র, ১৩৭০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

বিয়োগপঞ্জী

সম্প্রতি গত এক মাসের মধ্যেই প্রায় অল্পদিনের ব্যবধানে বাংলার বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট কয়েকজনের তিরোধান আমাদের শোকাভিভূত করেছে।

জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য শিশিরকুমার মিত্র, রেডিও-ইলেকট্রনিক্স ও আয়োনোস্ফিয়ার সম্পর্কিত গবেষণা ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রেখে গেলেন। ধ্রুপদ-চর্চায় বিষ্ণুপুর ঘরাণার স্থান সারা ভারতে বাংলার নিজস্ব অবদান। সঙ্গীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের, পরিণত বয়সেও, তাই এই লোকান্তর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনার জগতকে বেদনার্ত করে গেছে। তাঁর সাধন-ধারা ছাত্রছাত্রী পরম্পরায় আর তৎপ্রণীত 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা'য় বিধৃত রয়ে গেল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু কল্লোলকালীন লেখক গোষ্ঠীর একজন শক্তিমান কথাকার, সাহিত্যানুবাদক ও হৃদয়বান শিল্পীকে হরণ করল। প্রবীণ বয়সে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান একজন সৎ, বিবেকবান সাহিত্যিকের স্থান শূন্য করল।

এরই সঙ্গে, তরুণতর বাঙালী কবিগোষ্ঠীর কাছে আঘাত হয়ে আসে তাঁদেরই সমবয়স্ক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি দিলীপকুমার সেনের আকস্মিক অকালমৃত্যু—বিশেষত শেষদিকে রচনায় তিনি যখন কাব্যাচর্চায় ক্রমশ পরিণত-মনস্কতার অন্বেষণ করছিলেন।

আরও সম্প্রতিও, ইংরেজ কবি লুই ম্যাকনীসের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। তিরিশের অডেন-স্পেণ্ডার-ডে-লুইসের সহযোগী এই আর একজন বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত কবি, ইংরেজী কবিতার সেই সময়ের কাব্যান্দোলনের তরঙ্গে যাঁর কবিকৃতি আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিল।

এঁদের প্রত্যেকের প্রসঙ্গেই 'পরিচয়'-এর পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যায় যোগ্য আলোচনা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আমাদের রইল।

নিশীথ কর

মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব

থার্মো-নিউক্লিয়ার যুগ। তায় সমাজতান্ত্রিক শিবির অনেক প্রসারিত ও শক্তিশালী। স্তালিন-যুগের সেই 'লেনিনজম'-এর দ্বন্দ্বগুলি হুবহু প্রয়োগ করে সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারাগুলিকে যেন সঠিক বিশ্লেষণ করা যাচ্ছিল না। সোভিয়েত দেশের ২০তম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশেভ তাই কতকগুলি মার্কস-লেনিনতত্ত্বের কালোপযোগী বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছিলেন। পরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ১৯৫৭ সালের ১২ পার্টি ও ১৯৬০ সালের ৮১ পার্টির সিদ্ধান্তে সেই বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই 'মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব' বইখানি লিখিত।

বছর দুই পূর্বে বইখানি যখন মস্কো থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সেটি মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। পরে কিন্তু এই লেনিনতত্ত্ব নিয়েই বিরাট মতপার্থক্য প্রকট হয়ে পড়ে। ফলে এই বই-এর অনেক কিছু বিতর্কমূলক হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য এই মতপার্থক্যের দুটি প্রধান প্রবক্তা হল: রুশ ও চীন।

আজ মার্কসীয় তত্ত্বগুলি অতি সাধারণ লোকের কাছেও বিতর্কমূলক হয়ে উঠেছে। ফলে ভক্তিমার্গে মার্কসীয় অনুগমনের রেওয়াজে কিছুটা ঘাটতি পড়েছে। আর তাই সাধারণের মধ্যে যুক্তিমার্গে মার্কসবাদ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সেই নিরিখেই এই বইটির পুনর্বিচার বোধ হয় নিরর্থক হবে না।

তবে ইতিমধ্যে মতপার্থক্য যে মত-কলহের রূপ নিয়েছে তাতে এই

Fundamentals of Marxism—Leninism, Foreign Languages Publishing House, Moscow.

ভ্রাতৃকলহ শেষে ভ্রাতৃবিচ্ছেদে পরিণত হলে মার্কসীয় তর্কবিতর্কও দুঃখজনক হয়ে উঠবে। সে আশঙ্কা সত্ত্বেও কিন্তু বইখানির ইংরাজি অনুবাদ সুখপাঠ্য বলে মনে হয়েছে। প্রায় নয় শত পৃষ্ঠায় লিখিত বইখানিতে সাম্প্রতিক কালের অনেক বিষয়ের অনেক সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অংশে দার্শনিক আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: দার্শনিক বস্তুবাদ, ডায়ালেকটিক্স্ ও জ্ঞানতত্ত্ব। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইউরোপীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদী দর্শনের মধ্যে সংগ্রামের উল্লেখ করা হয়েছে। আর দেখান হয়েছে যে এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত শাসক ও শোষক শিবিরের সংগ্রাম। দুঃখের বিষয় এখানে এশিয়া দেশের কোনো দর্শনের আলোচনা নেই। এই অবজ্ঞা হয়তো আজকের মতপার্থক্যের অন্যতম কারণ! যাই হোক, আধুনিক কালের দর্শনালোচনায় 'এক্‌জিস্‌টান্‌-সিয়ালিজম', 'নব্য পজিটিভিজম', 'প্র্যাগ্‌মাটিজম' প্রভৃতি মতবাদ-উদ্ভবের যে সামাজিক কারণ তা নির্দেশ করা হয়েছে। দুটি সাম্রাজ্যবাদী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের নৃশংসতায় সাম্প্রতিক কালের দার্শনিকরা বহির্বিশ্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার পথ ধরে প্রচ্ছন্ন ভাববাদী দর্শনের মধ্যেই আশ্রয় নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই দর্শন দেখা যাচ্ছে ধনতন্ত্রের সমর্থক। আর প্র্যাগ্‌মাটিজমকে আমেরিকার বৃহৎ ব্যবসাদারদের দর্শন বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের বুর্জোয়া দার্শনিকরা তাই আসলে প্রচ্ছন্ন ভাববাদী। সার্ত্রে বা কামু; রাসেল বা কার্নাপ বা আয়ার; ডিউয়ী বা উইলিয়াম জেমস—এঁরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে ধনতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু এ-সবের আলোচনা এত সারল্যাশ্রিত যে এ-সব দর্শনের সঙ্গে তার সামাজিক ভিত্তির যে সম্পর্ক তা সাধারণ পাঠকের কাছে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। তাছাড়া, আজকের জগতে এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা বস্তুবাদী না হয়েও বা ভাববাদী হয়েও সমাজতান্ত্রিক জগতের অনেক কিছুর সমর্থক বা ডায়ালেক্‌টিকস্ তত্ত্বের অনেক কিছু স্বীকার করে নেন। তাঁদের চিন্তার এই স্ববিরোধিতার সামাজিক কারণ নির্দেশ বা আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

তবে অন্যান্য দেশের বস্তুবাদী দার্শনিকরা ভাববাদী ও অন্যান্য দর্শনালোচনায় তার স্ববিরোধিতা ও সীমা নির্দেশ করেছেন। এঁদের দর্শন সম্বন্ধে কিন্তু কোনো আলোচনা নেই। শুধুই তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

এঁদের মধ্যে আছেন: আমেরিকার বারোজ ডানহাম, হাওয়ার্ড সেলসাম, হ্যারি ওয়েলস, জন সমারভিলি। ইংলণ্ডের জন লুইস, মরিস কর্নফোর্থ, আর্থার হেনরি রবার্টসন। ফ্রান্সের রজার গরদী, জিন কানাপা, মারিও স্পিলেমা, সিজারে লুপোরিনা প্রভৃতি।

ডায়ালেকটিক্‌সের আলোচনায় বস্তুজগতের আকারগুলিকে (ক্যাটিগোরিকে) বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে—তবে বহুক্ষেত্রেই তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় দেখান হয়েছে তত্ত্ব (থিয়োরি) ও প্রয়োগের (প্র্যাকটিসের) নিগূঢ় সম্বন্ধ। "প্রয়োগ ব্যতিরেকে তত্ত্ব হয় বন্ধ্যা এবং বিনা তত্ত্বের নির্দেশে প্রয়োগ হয় ব্যর্থ।" তবে শেষ পর্যন্ত কোনো তত্ত্বের সত্যতা বিচার করা যায় তার প্রয়োগের মাধ্যমেই। এই প্রয়োগতত্ত্বের আলোচনা আজকের দিনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকের মতপার্থক্যের হয়তো শেষ সমাধান হবে এই প্রয়োগের ভিত্তিতেই।

দ্বিতীয় অংশে ইতিহাসের আলোচনাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: মার্কসবাদী ঐতিহাসিক তত্ত্বের সারার্থ; শ্রেণী; শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা; ইতিহাসে ব্যক্তি ও জনতার ভূমিকা; সামাজিক প্রগতি। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক ইতিহাসে স্তালিনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। কারণ স্তালিন সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের পুনঃপুনঃ মূল্যায়নের অন্ত নেই। আর স্তালিনকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্যেরও অন্ত নেই। এই বই-এ বলা হয়েছে ইতিহাসে নেতার ভূমিকা যদিও স্বীকৃত, তবুও সেই নেতার অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে অনেক দোষ থাকতে পারে। তাই ব্যক্তিপূজা মারাত্মক। স্তালিনের চরিত্রে বহু গুণ ছিল। যেমন, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অসাধারণ সংগঠনশক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান, লৌহদৃঢ় মনোবল, অনমনীয় সংগ্রামস্পৃহা। কিন্তু তাঁর চরিত্রে আবার কতগুলি দোষ ছিল। যেমন, দুর্বিনীত ব্যবহার, অপরের মতামত সম্পর্কে অসহিষ্ণু মনোভাব, সন্দেহপ্রবণতা, চাটুপ্রিয়তা ইত্যাদি। তাই স্তালিনের ব্যক্তিপূজার ফলে তাঁর চরিত্রের দোষগুলি সোভিয়েত সমাজের অনেক ক্ষতিসাধন করে, পার্টির গণতান্ত্রিকতা ব্যাহত হয়, আইন-লঙ্ঘন ঘটে, অহেতুক পীড়ন চলে এবং কিছু অযোগ্য লোক চাটুবৃত্তি দ্বারা নেতৃত্বের

আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। স্তালিনের ভূমিকা থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করা যায় যে ব্যক্তিপূজা সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের বিরোধী। (পৃঃ ২২৯)

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে শুধু স্তালিন-ব্যক্তিপূজার আলোচনা কেন? লেনিন-ব্যক্তিপূজার আলোচনা করা হয় নি কেন? অর্থাৎ সব ব্যক্তিপূজাই বন্ধ করার গণতান্ত্রিক পন্থা নির্দেশ করা হয় নি কেন? অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে স্তালিন সম্বন্ধে ব্যক্তিপূজাকে নিন্দা করার উৎসাহ থাকলেও—আসলে ব্যক্তিপূজাকে বন্ধ করার আগ্রহ নেই। তাই বোধ হয় 'ব্যক্তিপূজার ঔচিত্য' নিয়েই মার্কসবাদীদের মধ্যে আজ মতপার্থক্য।

মার্কসবাদের আলোচনায় অর্থনীতি মূলকথা। তৃতীয় অংশে ধনতন্ত্রের অর্থনীতির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রাক-মনোপলি ধনতন্ত্র, ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর—সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদ। শেষোক্ত আলোচনা আজকের জগতে বিশেষ মূল্যবান।

ধনতন্ত্রের অর্থনীতিকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখান হয়েছে যে ধনতন্ত্র যখন শুরুতে সামন্ততন্ত্রের শিকল ভেঙ্গে আবির্ভূত হল তখন তা প্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিল। পরে কিন্তু সেই ধনতন্ত্রই যখন রূপান্তরিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে পৌছল তখন আবার তা সমাজের পায়েই শিকল পরাল। মনোপলি ধনতন্ত্রের দৌরাত্ম্যে নানা দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটে সমাজদেহ কণ্ঠকিত হল। পর পর দুটি যুদ্ধই এই সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের পরিণতি।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে কিছু রূপান্তর ঘটান হল। এই রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য হল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। পূর্ব সঙ্কটের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান অর্থনীতিকে সঙ্কটমুক্ত করার জন্য রাষ্ট্র মনোপলি ধনতন্ত্রকে নানা ভাবে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল। ফলে দ্বিতীয় যুদ্ধের পর প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে বর্তমান ধনতন্ত্রের রূপ নিল "রাষ্ট্রসর্বস্ব মনোপলি ধনতন্ত্রবাদ" (State-monopoly Capitalism)।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে অবশ্য ধনতন্ত্র কিছুটা নিয়মিত হল। এ কথাও সত্য যে তেমন কোনো গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটও দ্বিতীয় যুদ্ধের পর দেখা দেয় নি এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে (যেমন, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানি, ইংলণ্ড) প্রগতিও সম্পূর্ণ শিথিল হয় নি। কিন্সীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে বেকার সমস্যা এড়াবার প্রচেষ্টাও কিছুটা সফল হয়েছে। শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে এবং ট্রেড ইউনিয়নেরও শক্তি বেড়েছে।

এই সব পরিবর্তনের ফলে আজকের দক্ষিণপন্থী সোসাল ডেমোক্রাটরা, বৃটিশ লেবার পার্টির কিছু নেতা (যেমন, জন ষ্ট্র্যাচি) এবং আমাদের দেশে পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত বলতে শুরু করেছেন যে মার্কসবাদ বরবাদ হয়ে গেছে। রাষ্ট্র এখন শ্রেণীসংগ্রামের উর্ধ্বে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত মনোপলি ধনতন্ত্রই ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রবাদে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে "সর্বজনীন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র" বলে আর সাম্রাজ্যবাদকে প্রচার করা হচ্ছে "জনগণের ধনতন্ত্রবাদ" বলে।

এতে কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে না। অবশ্য সাময়িক পরিবর্তন যা ঘটেছে তা অস্বীকার করে লাভ নেই—কিন্তু সে পরিবর্তনও যে সোভিয়েত অর্থনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল—তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ সাময়িক সাফল্য সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের দুরারোগ্য রোগের লক্ষণ কিন্তু পরিস্ফুট। এই বই-এ দেখান হয়েছে যে খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে তিনবার সঙ্কট বা মন্দা (যাকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বলেছে "রিসেসন") দেখা দিয়েছে। (পৃঃ ৩৪৩) সরকারী হিসাব অনুযায়ী আমেরিকায় বেকারকাহিনীও ক্রমবর্ধমান—১৯৫৯ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ। (পৃঃ ৩৪৩) তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক শোষণ ও যুদ্ধসজ্জার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই অস্ত্রসজ্জার খতিয়ানে এত বিশাল পরিমাণ পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছে যে উদ্বৃত্ত পুঁজির সমস্যা উঠতে পারছে না। কিন্তু দুনিয়ায় ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়ে অস্ত্রসজ্জার পরিমাণ কমলে এবং ঔপনিবেশিক শোষণের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটলে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে গুরুতর সঙ্কট দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, যতদিন না উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধের সম্পূর্ণ অবসান ঘটছে ততদিন শ্রেণীসংঘর্ষ বা সঙ্কটের হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাওয়া সম্ভবপর হবে না। উপরন্তু দেখা যায় 'রাষ্ট্রায়ত্ত মনোপলি ধনতন্ত্রবাদ' রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রের দিকে ঠেলে না দিয়ে—বরং মনোপলি ধনতন্ত্রবাদীরাই রাষ্ট্রকে ধনতন্ত্রবাদের স্বার্থেই পরিচালিত করছে। তাই বর্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রসর্বস্ব মনোপলি ধনতন্ত্রবাদ এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যার ফলে শুধু শ্রমিক কৃষক নয়, নতুন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীও" (বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মী, হিসাবরক্ষক, শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী, অফিস কর্মচারি, বাণিজ্য ও প্রচার ব্যবস্থার কর্মী প্রভৃতি) শ্রমিকশ্রেণীর মিত্ররূপে আবির্ভূত হচ্ছে। বুর্জোয়া

শ্রেণীর মধ্যেও স্তরবিভাগ এমন পর্যায়ে পৌছেচে যে মুষ্টিমেয় মনোপলি ধনতন্ত্রবাদীদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যাপক মোর্চা গঠনের সম্ভাবনা বর্তমানে ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই ধরনের যুক্ত-মোর্চার পথকেও কেন্দ্র করে মতপার্থক্য আছে। অর্থাৎ এ পথ রিফর্মের বা শোধনবাদীদের পথ ; বিপ্লবের পথ নয়।

সাম্প্রতিক পথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চতুর্থ অংশে করা হয়েছে। এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্ব ও কৌশলের যে-আলোচনা করা হয়েছে তা বর্তমান মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই কমিউনিস্ট কৌশলের অর্থ কিন্তু ফন্দি বা ফিকির নয়। ফন্দি বা ফিকির ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কমিউনিস্টরা তাদের লক্ষ্যে পৌছবার কৌশল বা পথটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার নৈতিক সাহস রাখে—তা সে-পথ রক্তক্ষয়ীই হোক বা শান্তিপূর্ণই হোক। সাম্রাজ্যবাদীরা কিন্তু তাদের কৌশল বা অভিসন্ধি খোলাখুলি প্রকাশ করে না।

উপস্থিত এই কৌশলটি নিয়েই কমিউনিস্ট দুনিয়ায় বিশেষ মতপার্থক্য: মার্কসবাদ মানবতাবিবর্জিত হবে, না মার্কসবাদ মানবতাসম্মত পথ গ্রহণ করবে, এই হল মূল কথা। এটম শক্তির উদ্ভবের পর যুদ্ধের রূপ গেছে বদলে। থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ এখন বিশ্বধ্বংসী। কিন্তু এই ধ্বংসকে স্বীকার করেও সমাজতন্ত্রে পৌছতে হবে? না, বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধকে এড়িয়ে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও প্রতিযোগিতার পথে সাম্যবাদী লক্ষ্যে পৌছানর চেষ্টা করতে হবে? কারণ: "Communists firm conviction that in our time a war will inevitably plunge humanity into an abyss of tremendous sufferings and will for a long time impede its social, economic and cultural progress"। (পৃঃ ৫৭৪) তাছাড়া, একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা শুধু হিংসানীতিরই অনুগামী নয়—তারা পারতপক্ষে অহিংস নীতিরই সমর্থক। তবে অতীতে তারা বাধ্য হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে—কিন্তু আজ দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির ফলে অস্ত্রহীন বিপ্লব সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য এ সব কথা শুধুই সম্ভবপর

বা hypothetical। ভবিষ্যৎ দুনিয়াই প্রমাণ করবে কমিউনিস্টরা কোন্ পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই hypothesisও এক দল মার্কসবাদী মানতে রাজী নয়। তাদের পক্ষে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বা সহ-অবস্থান সম্ভবপর নয়।

কমিউনিস্ট কৌশলের প্রধান কথা অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার্জন। এই ক্ষমতা রুশ দেশে অক্টোবর (১৯১৭) বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণী প্রথম লাভ করে। কিন্তু এই বই-এ দেখান হয়েছে যে সেই বিপ্লবেও লেনিন শান্তিপূর্ণ পথ গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরে কিন্তু বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীই সেই বিপ্লবকে রক্তক্ষয়ী করে তুলতে বাধ্য করে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে একাধিক রাষ্ট্র একাধিক পথ গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সংযুক্ত ফ্রন্টের উদ্যোগ।

পরবর্তী যুদ্ধোত্তর যুগের প্রধান কথা হল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সম্প্রসারণ। শুধু তাই নয়, এ যুগের আর একটি নতুন পরিস্থিতি হল পুরাতন উপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন এবং তা থেকে কতকগুলি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে এই রাষ্ট্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) যে দেশগুলি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে (যেমন, চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম)

(২) যে দেশগুলি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে (যেমন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, ক্যাম্বোডিয়া, সিংহল, ইরাক, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সুদান, টিউনিসিয়া, মরোক্কো, লিবিয়া প্রভৃতি)

(৩) যে দেশগুলি স্বাধীনতা লাভের পরেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামরিক এবং অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাকে সীমিত করছে (যেমন, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ)।

এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছেড়ে দিলে—দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও অনেকাংশে প্রগতিশীল। এই সমস্ত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নীতির মধ্যে

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তারা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতা কমাতে উৎসুক। একথা সত্য এ সব দেশে অত্যন্ত সীমিত ভূমিসংস্কার করা হয়েছে। তবে শিল্পোৎপাদন উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও বেড়েছে। অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। অবশ্য একথা ঠিক যে অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীই স্বাধীনতা লাভের পর সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। তবুও এই সমস্ত দেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে অন্যান্য শ্রেণীরও নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথও উন্মুক্ত হচ্ছে। আর একটি কথা এই সব দেশের রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার (State Capitalism) প্রসার দেখে যেন ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রসর্বস্ব মনোপলি ধনতন্ত্রবাদের (State Monopoly-Capitalism) সঙ্গে তার সমগোত্রীয় সাদৃশ্যই দেখানো না হয়। কারণ মনে রাখতে হবে যে প্রাচ্যের দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। (পৃঃ ৫১১)

প্রাচ্যের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা কাটাবার জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য তাই রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া, ভারত ও ব্রহ্মে সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্যের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এ সমাজতন্ত্রবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ থেকে অনেক দূরে থাকলেও, জনগণের চাপে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যে সমাজতন্ত্রবাদকে লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে এটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর আর একটি অংশের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতার কথাও ভুললে চলবে না। 'এরা একদিকে যেমন রাষ্ট্রকে শুধু তাদের ধনতান্ত্রিক স্বার্থে পরিচালনা করতে উৎসুক; তেমনি অন্যদিকে বিদেশী মূলধনের সঙ্গে আপসের জন্যও উৎসুক। আবার সাম্রাজ্যবাদীরাও নতুন ফন্দী এঁটে এখন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর এই দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গে মিত্রতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এরা এমনকি অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের সুবিধারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তবে এরা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্পবিকাশের বিরোধী। এরা এখন দেশী-বিদেশী "মিশ্র" শিল্পসংস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ

উদ্যোগী। তাছাড়া আছে এদের সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ। সর্বোপরি আছে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা।

শেষোক্ত প্রবণতার বিচার করলে মতপার্থক্য বোধ হয় স্বাভাবিক। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন উপনিবেশগুলি ছাড়া, বাকিগুলি প্রগতিশীল নয়। এই দেশগুলি নয়া উপনিবেশবাদের শিকলে বাঁধা পুরনো সাম্রাজ্যবাদেরই অপ্রত্যক্ষ ঘাঁটি। সুতরাং এই স্বাধীন উপনিবেশগুলির আশু কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

শেষাংশের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের যে আলোচনা তা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ মার্কসতত্ত্বের যে লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমে পৌঁছান তারই নানা সমস্যা নিয়ে এই অংশের আলোচনা। আর সেই আলোচনার মূল উপাদান করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা।

স্বভাবতই 'প্রলিটারিয়ান ডেমোক্রাসি'কে আদর্শ ডেমোক্রাসি বলে ধরতে হবে। কারণ তা শ্রেণীদ্বন্দ্ববিবর্জিত কিন্তু তা আয়াসলভ্য। তাকে 'প্রলি-টারিয়ান ডিক্টেটরশিপে'র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যতদিন বুর্জোয়া শ্রেণী বা তার প্রভাব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে টিঁকে থাকবে ততদিনই এই 'ডিক্টেটরশিপ' চলবে। বুর্জোয়াবিরোধী এই ডিক্টেটরশিপের নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই ডিক্টেটরশিপের নামে যখন অনেক অগণতান্ত্রিক ব্যাপার জনগণের উপরও চাপানো হয়, তখন এর সমালোচনা প্রয়োজন। কারণ এই ডিক্টেটরশিপ যখন রাষ্ট্রের পক্ষে কার্যকরী করা হয় নিরঙ্কুশ এক পার্টি-নায়কতার মাধ্যমে এবং সেই পার্টির ভিত্তি যখন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা— তখন ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা গেছে যে রাষ্ট্র ডেমোক্রেসিকে সুরক্ষিত না করে জনগণের উপর ডিক্টেটরশিপেরই দাপট চালিয়েছে। এতে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করলেও কোনো গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে লেনিন বা বিশেষত স্তালিনের শাসনকালে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার নজিরের উল্লেখ বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। তবে অতীতে তার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা যদিই বা থাকে, বর্তমানে এই গণতান্ত্রিকতার সম্প্রসারণ কেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? অর্থাৎ অতীতে যাই ঘটুক বর্তমানে লেনিন-প্রবর্তিত পার্টি-কাঠামো বা রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে যদি গণতান্ত্রিক পরিবর্তন না আনা যায়, তাহলে তাকে আদর্শস্থানীয়

গণতন্ত্র বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হবে। সম্প্রতি আবার সোভিয়েত দেশের ২২তম পার্টি কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছে যে সে-দেশ শ্রেণীবিবর্জিত হওয়ায় সেখানে নাকি এই ডিক্টেটরশিপ অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু যখন রাষ্ট্র-কাঠামো বা পার্টি-কাঠামোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক পরিবর্তন দেখা গেল না এবং যেখানে ক্রুশ্চেভের একনায়কত্বের দাপট আজও অব্যাহত সেখানে শুধুই কথার কথা হিসাবে প্রলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ উড়িয়ে দিলেই যে সেটা উড়ে গেল, একথাও তো বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়।

এখানে এইটুকু শুধু উল্লেখযোগ্য যে যাঁরা সোভিয়েত মতের সঙ্গে একমত নন তাঁরা বলছেন যে সোভিয়েত দেশে এখনও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব নাকি বর্তমান। আর সেই কারণে প্রলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপও সেখানে উধাও হতে পারে না বা আজও তা হয় নি।

কিন্তু গণতন্ত্রের প্রশ্ন বাদ দিলে সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে তা পড়লে কিছু নতুন জ্ঞান লাভ হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে অভূতপূর্ব দ্রুত অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা লক্ষণীয়। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে দেশকালভেদে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের তারতম্য হয়। "The duration of the transition period from capitalism to socialism is bound to vary in different countries. Much depends here on internal and international conditions।" (পৃঃ ৬৯৩) শুধু তাই নয়, একথাও মনে রাখতে হবে যে: "there should be no skipping essential phases, no undue haste. Unjustified haste in building socialism is harmful।" (পৃঃ ৬৯৩) কিন্তু তা বলে মনে করলে চলবে না যে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। সর্বত্রই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বেই সংঘটিত করতে হয়।

এ ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো এখানে কোনো অসম সম্পর্ক থাকে না বলে শোনা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই নীতিরও ব্যতিক্রম হয়েছিল বলে শোনা

গেছে! সে যাই হোক, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হ'ল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করা এবং অনুন্নত এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিকেও উন্নত করার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করা।

কিন্তু সমাজতন্ত্রে অর্থনীতিই মূল কথা হলেও—তাকে কেন্দ্র করে যে নানামুখী সামাজিক রূপ-পরিবর্তন হতে থাকে সেটাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিনব অবদান বলা যেতে পারে। সোভিয়েত দেশে এ পরিবর্তন কিছুটা লক্ষণীয়। সেখানে পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী বর্তমান। শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্থক্য অনেক হ্রাস হলেও সম্পূর্ণ চলে যায় নি। নগর ও গ্রামের মধ্যে প্রভেদ দূরীভূত হয় নি। তবে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেছে এবং সংস্কৃতির ব্যাপ্তিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের অবিংসবাদিত-ভাবেই অগ্রগতি ঘটেছে। তবে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে পরিবর্তন আশা করা গিয়েছিল তা আজও কিন্তু ঘটে নি। মানব-কেন্দ্রিক সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে সভ্যতার মাপকাঠি বোধ হয় মানুষের এই নৈতিক সম্বন্ধের উন্নতি। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বীকার করা হয়েছে যে স্বল্প সময়ে এ মানবিক রূপান্তর ঘটে ওঠে নি: "It is understandable that in the course of a few decades it is impossible fully to eriadicate all the conceptions and habits which struck deep root during the domination of private property for thousands of years. Various traits of old morality and way of life still survive in the minds of some members of socialist society: a dishonest attitude to work, money-grabbing, selfishness, nationalistic prejudices, a wrong attitude to women, drunkenness and anti-social views which at times lead to hooliganism and crime।" (পৃঃ ৭৫৮) তবে এই সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে: "We speak of all such phenomena as being survivals of capitalism. Thereby we also stress that these phenomena are alien to socialism and that in themselves social relations in socialist society, far from producing such ugly phenomena, on the contrary, gradually must oust them।" (পৃঃ ৭৫৮)

আশা করা যাক বহু আকাঙ্ক্ষিত কমিউনিস্ট সমাজে এসব কলঙ্ক দূরীভূত হবে। সেই সমাজের একখানি সুন্দর ছবি এই বই-এ আঁকা হয়েছে। শ্রেণীসমাজের সব ভেদাভেদ, সব বৈষম্য সেখানে অপসারিত। এমনকি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও সেখানে অবলুপ্ত। সেই প্রথম প্রত্যেক মানুষ সেখানে নিজের আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রত্যেক মানুষ অধিকার-ভেদে যার যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী (according to his ability) কাজ করবে—আর তার পরিবর্তে তার প্রয়োজন অনুযায়ী (according to his needs) তার শ্রমের মূল্য গ্রহণ করবে। অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সমাজে উৎপাদনের যে প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে তারই ভিত্তিতে এই সাম্যবাদী স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা হবে। বহু যুগের বহু মানুষের স্বপ্ন তখন সার্থক হবে!

কিন্তু সে দিন সুদূরপরাহত নয়। সোভিয়েত দেশে সাম্যবাদী সমাজের দিকে যাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর আনুসঙ্গিক বৈষম্যগুলির ক্রমাপসরণ কেন যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না, সেই প্রশ্নই মনে থেকে যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে "কমিউনিস্ট সমাজ" সৃষ্টির আর একটি "এক্সপেরিমেণ্ট" চলেছে। শুধু উৎপাদনের প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই নয়—অনগ্রসর অর্থনৈতিক ভিত্তিতেও নাকি কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একথাও যাঁরা বলছেন তাঁরাও অবশ্য মার্কসবাদী, একথা কিন্তু ভুললে চলবে না।

সুতরাং মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী কে এবং মার্কসবাদী কে নয়?—এই প্রশ্নই বইখানি পড়তে পড়তে বারংবার মনে হয়েছে। আর স্মরণে এসেছে এঙ্গেলস-উল্লিখিত মার্কসের সেই কথা: "All I know is that I am not a Marxist."

সুতরাং সাম্প্রতিক মতপার্থক্যের কবর দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক নতুন মার্কসবাদ রচনা করা কি চলে না?

সুকুমার মিত্র

লাফার্গ দম্পতি

কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী ও বিপ্লব-সাধক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্‌-এর চারিদিকে যে কয়টি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সমাবেশ ঘটেছিল পল লাফার্গ তাঁদের অন্যতম। বিদুষী মার্কস-দুহিতারাও কেবলমাত্র মার্কস ও এঙ্গেলস-এর স্নেহধন্যাই ছিলেন না, তাঁদের কর্মজীবনের সাথীও ছিলেন। স্বভাবতই মার্কস-দুহিতারা প্রতিভাশালী তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং যাঁরা মার্কস-কন্যাদের পাণিগ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দুইজন ছিলেন ফরাসী লুদেৎ ও লাফার্গ এবং একজন ইংরেজ এ্যাভেলিং। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এঁদের সকলের নামই উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে।

এদেশে যাঁরা প্রথম মার্কসবাদী আন্দোলনে লিপ্ত হন তাঁরা মার্কস, এঙ্গেলস, লাফার্গ প্রভৃতি মনীষীদের রচনাবলীর সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এঁদের রচনাবলীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। লাফার্গের লেখা 'ইভোলিউশন অব প্রপার্টি' নামক বিখ্যাত (মূল ফরাসী) গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ধনদৌলতের রূপান্তর' নামে অধ্যাপক সরকারই প্রথম প্রকাশ করেন, বোধ হয় ১৯২৪।২৫ সালে। তারপর আমরা ইংরাজীতে মার্কস এঙ্গেলস প্রভৃতির রচনাবলী পাঠকালে কখনও কখনও লাফার্গের উল্লেখ দেখেছি, জেনেছি তিনি এঙ্গেলস-এর কোনো কোনো রচনা অনুবাদ করেছিলেন, মার্কস সম্বন্ধে লাফার্গের লেখাও আমরা পড়েছি, আর জেনেছি মাদাম ক্রুপস্কায়ার রচিত 'লেনিনের স্মৃতিকথা' থেকে লাফার্গ দম্পতির আত্মমৃত্যু বরনের কাহিনী। এর বেশি লাফার্গ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত ফ্রেডারিক

করেসপণ্ডেন্‌স—ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পল এ্যাণ্ড লরা লাফার্গ। প্রথম খণ্ড (১৮৬৮—১৮৮৬) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৭—১৮৯০), মস্কো।

এঙ্গেলস এবং পল লাফার্গ ও লরা লাফার্গের পত্রাবলীর দুটি খণ্ড যখন এদেশে এসে পৌঁছল তখন আমরা নতুন করে জানলাম ও চিনলাম পল লাফার্গ এবং তাঁর জীবনসঙ্গিনী লরাকে। এক আশ্চর্য উজ্জ্বল মনীষা যার হীরকদ্যুতি দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি পত্রে! এই বিপুলায়তন দুই খণ্ডের পত্রাবলীতে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পল লাফার্গ ও লরা লাফার্গের ব্যক্তিগত জীবন একান্ত অন্তরঙ্গভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আমাদের সামনে। আর শুধু তাই নয়। এই পত্রাবলীতে উন্মোচিত হয়েছে উনিশ শতকের শেষ দিকের ইওরোপের ইতিহাসের দৃশ্যপটগুলি। খ্যাতনামা রাষ্ট্র ধুরন্ধর, সমাজবাদী নেতা, ছোট বড় আরও বহু মানুষের অংশগ্রহণে যে দৃশ্যপটগুলি বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। এই ইতিহাসের পটভূমিতেই প্রথম আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপ, বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার প্রতিক্রিয়া উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে এই পত্রাবলীতে। এক কথায় এই পত্রাবলী শুধু এঙ্গেলস ও লাফার্গ দম্পতির ব্যক্তিগত পত্রাবলী নয়, এই পত্রাবলী ইওরোপের ইতিহাসের একটি যুগের (প্রথম আন্তর্জাতিকের ইতিহাসসহ) আকর-গ্রন্থ।

নিছক ব্যক্তি-জীবনের যে চিত্রটি এঙ্গেলস-লাফার্গ পত্রাবলীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা হাসি-কান্নায় ভরা এক মধুর চিত্র। পিতৃপ্রতিম এঙ্গেল্স তাঁর কন্যা-সমা লরা এবং জামাতাস্থানীয় সহকর্মী পলকে সাহায্য করার জন্যে সদা মুক্তহস্ত, পল ও লরার চিঠির পর চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে টাকার তাগিদ দিতে কখনও ভুল হয় না, আর ভুল হয় না এঙ্গেলস-এর টাকা পাঠাতে। সংসারের কুটিল চক্র পল কখনই বুঝে উঠতে পারেন নি, তাই কখনও তিনি ডাক্তার, কখনও ফটো-এনগ্রেভার, কখনও ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কার, কখনও সাংবাদিক বা চাকরীজীবী—কিন্তু অর্থভাগ্য তাঁর ছিল না। লোকে ঠকিয়েছে, ফাঁকি দিয়েছে, আর নতুন নতুন পেশা অবলম্বন করে স্বচ্ছল জীবনযাত্রার দিবাস্বপ্নে মশগুল লাফার্গ প্রতিবারই প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে যখন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন তখন "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" এই অবস্থা। তবু ভাবনা নেই, কারণ এঙ্গেলস আছেন, সন্তান-স্নেহাতুর মুক্ত হৃদয় এঙ্গেলস।

এঙ্গেলস-এর চরিত্রের সঙ্গে লাফার্গের চরিত্রের কিছুটা মিল আছে। দুজনেই বেপরোয়া, পর্যটনে, পানোৎসবে, আনন্দোল্লাসে দুজনেই উদ্দাম, দিলদরিয়া।

লরার সঙ্গে বিয়ে স্থির হবার পর লাফার্গ এঙ্গেলসকে চিঠি লিখছেন :

শ্যাম্পেনের বোতলগুলির মহান্ শিরশ্ছেদকারী। এল এবং অন্যান্য ভেজাল-দেওয়া বাজে জিনিসের অতলস্পর্শ গলাধঃকরণকারী স্প্যানিয়ার্ডদের সম্পাদকের প্রতি অভিনন্দন: পানোৎসবের দেবতা যেন আপনার উপর দৃষ্টি রাখেন।

সমস্ত দুনিয়ার সঙ্গে আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, মেডিকেল ছাত্র, কুমার মিঃ লাফার্গ "অধিবিদ্যার মুক্তারাজির মাল্য রচনাকারিণী" কুমারী জে. লরা মার্কসকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। আর এই বিয়ে খুব আগে হলে এপ্রিল মাসে হতে চলেছে। এর আগে কখনও কেউ ট্যান্টালাসের অবস্থায় পড়তে চেয়েছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ, এই এপ্রিল মাসটা চাঁদের আলোয় ঠাণ্ডা লাগার অথবা দিনের বেলায় 'হঠাৎ প্রেমে পড়ার' (এখানে যে ফরাসী বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ 'সর্দিগরমি'ও হয়—লেখক) পক্ষে চমৎকার মাস। (২নং চিঠি, ১৮৬৮, ১৮ই মার্চ)

বিয়ের পর লেখা আরও অনেক চিঠিই এমনই হাস্য-পরিহাসে উজ্জ্বল। বর্ণনার ভঙ্গি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, শাণিত বিদ্রূপ চিঠিগুলিকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এ ক্ষেত্রে লরাও স্বামীর উপযুক্ত জুড়ি।

লাফার্গ, গুয়েসদে প্রভৃতি নেতারা উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিয়ে লোককে লুটপাট করতে প্ররোচিত করছেন এই অভিযোগে ফরাসী সরকার মামলা আনার পর যে সকল ঘটনা ঘটে সেগুলির বিবরণ লাফার্গ ও লরার চিঠিগুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জেল হয়েছে লাফার্গ ও গুয়েসদের। লাফার্গের চিঠিতে দেখা যায় দুই বন্ধু জেলে যাওয়ার আগে জেল পরিদর্শনে গেলেন। (উনিশ শতকের এই ইওরোপ আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে—লেখক) জেলের গভর্ণর গুয়েসদেকে দেখে বিব্রত, লজ্জিত। গুয়েসদের কাছেই তিনি প্রথম রাজনীতির পাঠ নিয়েছিলেন, এখন কিনা নিজের গুরুকেই তিনি জেলে আটক রাখবেন। লজ্জিত ছাত্র বিনয়-সহকারে দুজনকেই জেলের ভিতরে ঢুকে সব চেয়ে ভালো ঘর বেছে রেখে যেতে অনুরোধ করলেন। ঘর বাছা হল, বন্দীরা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন গভর্ণর তার ব্যবস্থা করলেন। বন্দীরা নিজেদের আসবাবপত্র নিয়ে আসার অনুমতি পেলেন। বেলা ১০টা থেকে থেকে ৪টা পর্যন্ত লোকজন বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। লরা রোজ জেলের মধ্যে যাবেন এবং স্বামী ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সারবেন এ ব্যবস্থাও হল। (চিঠি নং ৭৪)।

এর পরেই লরা লিখেছেন এঙ্গেলসকে যে বন্দীরা ভালোই আছে। তাঁর কাজ হল রোজ তরিতরকারী মাংস মাছ ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া এবং সেই সুযোগে ভোজনোৎসব জমিয়ে তোলার জন্য ছোট এক বোতল ব্রাণ্ডি পাচার করা।

লাফার্গ লিখছেন (লাফার্গ ভোজনরসিকও বটে) গোল বেধেছিল গলদা চিংড়ি নিয়ে। বড় বড় দাঁড়া, জমকালো খোলা, চেহারাটা সত্যিই রাজকীয়। এমন জিনিস বন্দীদের জন্য দেওয়া নিষিদ্ধ। গভর্ণর বুদ্ধিমান লোক। তিনি ফতোয়া দিলেন চিংড়ির খোলা ছাড়িয়ে ফেল। তাহলেই চিংড়ির আভিজাত্য থাকল না। তখন তাকে আর বিলাসীর খাদ্য বলা চলে না। এইভাবেই গলদা চিংড়ি সাজসজ্জা-বিরহিত হয়ে জেলে ঢুকবার অনুমতি পেল। এর পর লাফার্গের নানাবিধ মাংসের জন্য একটি হাস্যরসপূর্ণ আবেদন। ব্যক্তিজীবনের এমন নানা ধরনের হাস্যমধুর চিত্র চিঠিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এসব ছাড়াও আছে সংগঠনের কথা, রাজনীতির কথা, সাহিত্যের কথা এবং আরো অনেক কিছু। বেদনার স্পর্শও লেগেছে কোন কোন চিঠিতে। যে-ইংল্যাণ্ডে তাঁরা জন্মেছিলেন, মানুষ হয়েছিলেন সেই ইংল্যাণ্ডের প্রতি লরার ভালবাসাও ফুটে উঠেছে দু-একটি চিঠিতে। ১৮৮৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের চিঠিতে লরা লিখেছেন :

My heart is in England (my heart is not here)
With her brown kippered herrings and bland Pilsner beer !

এঙ্গেলস-এর কাছে মাফ চেয়েছেন কবিতায় বার্ণস-এর ছায়া পড়েছে বলে।

মর্মান্তিক বেদনাময় চিঠি আছে একটি। এঙ্গেলস-এর কঠিন পীড়ার সংবাদে ব্যাকুল লরার চিঠি। এই চিঠিটিতে সন্তানহারা মায়ের ছবিটিও ফুটে উঠেছে কয়েকটি লাইনের মধ্যে। স্পেনে থাকার সময় লরা তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তানকে হারিয়ে ছিলেন। কলেরা রোগে মারা গিয়েছিল ছেলেটি ঠিক সময় ওষুধের অভাবে। এঙ্গেলস-এরও কি তাই হবে? সময়মত ওষুধ যদি তিনি না পান? লিখতে লিখতে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল লরার চোখ থেকে ঝরে পড়ে বড় বড় ফোঁটা চিঠিটিকে ভিজিয়ে দিল। পিতৃপ্রতিম এঙ্গেলসকে হারানোর ভয়ে ব্যাকুল লরা এ চিঠিতে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন সন্তানহারা জননী ও স্নেহাতুরা কন্যারূপে।

কার্ল মার্কস-এর শেষ জীবনের কিছু খবরও প্রথম খণ্ডের চিঠিগুলিতে পাওয়া যাবে। এই সমস্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের কথা পরিমাণের দিক থেকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়গুলির তুলনায় অনেক কম।

স্পেনে প্রথম আন্তর্জাতিকের সংগঠকরূপে পল লাফার্গকে আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পত্রে দেখতে পাই। ছদ্মবেশে সীমান্ত অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হয়েছিলেন লাফার্গ এবং এঙ্গেলস-এর নির্দেশ অনুযায়ী সুচারুরূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। ইওরোপে প্রথমআন্তর্জাতিকের সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার, বিভিন্ন দল, উপদল ও রাজনৈতিক নেতাদের উক্তি, রচনা ও কর্মের বিচার, কর্মনীতি নির্ধারণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে লাফার্গ ও এঙ্গেলস-এর পত্রাবলী এক বিস্ময়কর তথ্যের খনি। লরা লাফার্গও তাঁর স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনীরূপে বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধানত ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও স্পেন এই পত্রাবলীর আলোচনার ক্ষেত্র, অন্যান্য দেশও বাদ যায় নি। এই সকল আলোচনায় ইতিহাসের অনেক নেপথ্য দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে যা সাধারণত ইতিহাসগুলিতে পাওয়া যায় না।

১৮৮৪ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে কলেরা মহামারী দেখা দিয়েছিল এবং রথস্চাইল্ড গ্রুপ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ফাটকাবাজরা কলেরার মওকায় 'নাফা' করতে ছাড়ে নি এ-খবর পাওয়া যাবে লাফার্গের একটি চিত্তাকর্ষক পত্রে। (নং ১১৭)

১৮৮৫ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট আতঙ্কে বিহ্বল ফরাসী সরকার লালঝাণ্ডা ওড়ানো বন্ধ রাখার অজুহাতে শ্রমিক মিছিলের উপর গুলী চালিয়ে চার জনকে (২৪শে মে) হত্যা করে। এই মে মাসেই ভিক্তর হুগোর মৃত্যু হয়। বুর্জোয়াদের হুগো-প্রীতির মূল কারণ দেখিয়ে লাফার্গ যে সকল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন তাঁর চিঠিতে তার কারণ একান্তভাবেই রাজনৈতিক। (পত্র নং ১৫৪ ও ১৫৫।) হুগো ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং তাঁর শোক-মিছিল উপলক্ষে ধনিকশ্রেণী শ্রমিক মিছিলের পাল্টা জবাব দিতে চেয়েছিল।

এ সময় লাফার্গ জেলে ছিলেন। তাঁর মুক্তিলাভ বুর্জোয়াদের সমাজতন্ত্রী হয়ে যাওয়ার ফল বলে যে ভুল ব্যাখ্যা লাফার্গ দিয়েছিলেন এঙ্গেলস তা দেখিয়ে দিয়েছেন ২০১ নং চিঠিতে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই চিঠিটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির মধ্যেও যে পার্থক্য

থাকে এবং বুর্জোয়া কর্মনীতিতে সেই পার্থক্য যে প্রতিফলিত হয় এটা এঙ্গেলস পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাউটস্কি, বের্নস্টাইন, হাইণ্ডম্যান, লিয়েবনাখট্, বেবেল এবং আরো অনেকের চেহারা। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছে ১৮৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা পল লাফার্গের চিঠিতে। এ সময় এঙ্গেলস সত্তর বৎসর অতিক্রম করেছেন। লরার কাছে লেখা ১লা ডিসেম্বরের চিঠিতে এঙ্গেলস নিজের সত্তর বৎসর পূর্তির কথা জানিয়েছেন আর দিয়েছেন বার্ধক্যের ইঙ্গিত, নিজের এবং বেবেল, লিয়েবনাখট্ প্রভৃতি সহকর্মীদের। অক্লান্ত যোদ্ধার জীবন শেষ হয়ে আসছে, তবু তাঁর কর্মের বিরাম নেই।

১৮৯৫ সালের ৫ই অগস্ট এঙ্গেলস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে আরও চিঠিপত্র লেখালেখি লাফার্গ দম্পতির হয়েছিল। সেগুলি ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

লাফার্গ দম্পতি বেঁচেছিলেন ১৯১১ পর্যন্ত। জীবনের প্রতি এত ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত এমন আদর্শ নিষ্ঠা ও নিরলস কর্মপরায়ণতা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। চিঠিগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায় লাফার্গ-দম্পতি জীবনকে প্রতি মুহূর্তে নানা বর্ণে রসে উপভোগ করে চলেছেন সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়। জীবনের প্রতি এত বলিষ্ঠ ভালোবাসা ছিল বলেই জীবন-লীলায় যখন আর তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা ফুরিয়ে এল বলে তাঁদের মনে হল তখন একান্ত অনায়াসে ও অবহেলায় তাঁরা আত্মমৃত্যু বরন করলেন। আমাদের দেশে গীতা মুখস্থ করে যাঁরা হেদিয়ে যান অথবা গীতার কথা বলে ভারতীয় সভ্যতার বড়াই করেন তাঁদের মধ্যে জীর্ণ বস্ত্রের মতো এই দেহত্যাগের ক্ষমতা 'কোটিকে গোটিকে'রও আছে কিনা সন্দেহ!

লাফার্গের প্রতি লেনিন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ১৯১০ সালে প্যারিসে থাকার সময় লেনিন ও তাঁর স্ত্রী লাফার্গ দম্পতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে লাফার্গ দম্পতি আত্মমৃত্যু বরণ করেন। এ খবর লেনিনের কাছে পৌঁছালে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বলেন, "যদি কেউ আর পার্টির জন্যে কাজ করে উঠতে না পারে তাহলে, তাকে সোজাসুজি সত্যের মোকাবিলা করতে হবে এবং লাফার্গ দম্পতির মতোই মরতে হবে।"

লাফার্গ দ পতির শেষকৃত্যানুষ্ঠানে লেনিন গভীর আবেগের সঙ্গে ভাষণ দিয়েছিলেন।

লাফার্গ দম্পতি ও এঙ্গেলস-এর পত্রাবলী সম্পাদনে ও অনুবাদে মস্কোর বিদেশী ভাষা প্রকাশনা ভবন যত্ন ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু একটি অভিযোগ থেকে যায়। সেটি হল লাফার্গ দম্পতির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর অভাব। হয়তো তৃতীয় খণ্ডে এই অভাব পূরণ করা হবে, তবে মনে হয় প্রথম খণ্ডেই জীবনী দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আমরা তৃতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করব। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী শ্রমিক কংগ্রেসের সংগঠনী কমিটির রিপোর্টের প্রচ্ছদপটের প্রতিলিপি এবং কার্ল মার্কস-এর বংশতালিকা সংযুক্ত হয়েছে।

এঙ্গেলস-লাফার্গ পত্রাবলী প্যারিস থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফরাসী সংস্করণ থেকেই বর্তমান খণ্ডগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। প্রথম দুই খণ্ডে এঙ্গেলস, লাফার্গ ও লরার ছবি এবং এঙ্গেলস ও লাফার্গের লেখার প্রতিলিপি আছে। দুই খণ্ডে মোট ৪১০টি চিঠি ছাপা হয়েছে।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্রয়েড

হোয়াইটহেডের দর্শনের সমালোচক হিসেবে [প্রসেস্ এ্যাণ্ড আনরিয়ালিটি] হ্যারী. কে. ওয়েলস-এর প্রথম পরিচিতি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্র্যাগম্যাটিজম্-এ (Pragmatism—Philosophy of Imperialism) আমেরিকার শাসকশ্রেণীর জীবনদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার ফলে তিনি ম্যাক্‌র্থি কোম্পানীর বিরাগভাজন হন। 'জেফারসন্ স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস্'; (যেখানে তিনি লেক্‌চারার ছিলেন) ম্যাকার্থির কোপ-দৃষ্টির ফলে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর বইখানি নানা ভাষায় অনূদিত হয় ও এই মার্কসবাদী চিন্তাবিদের নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র মারণাস্ত্র ও ডলার মার্কবৃষ্টির উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, সব দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও স্তাবকের দল সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আক্রমণে রত এবং রহস্যবাদ ও অনিশ্চয়তাবাদের কুজ্ঝটিকা জাল সৃষ্টি করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত-করণে সচেষ্ট। তাই জন ডিয়ুই, উইলিয়াম জেমস্, চার্লস পিয়ার্স, জনফিসকে ও অলিভার ওয়েণ্ডেলের 'প্র্যাগমাটিক' তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠকদের সতর্ক করার পর সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের 'সাইকোএ্যানালিসিস' ও নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাবের দিকে ওয়েল্‌সের নজর পড়ে। মননক্রিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মার্কসবাদী এঙ্গেলস্ ও লেনিনের কিছু কিছু মন্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু মনের জটিল ও সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়ার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অনেকটা উদাসীন। কাজেই ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণাকে যে ভাববাদী দর্শন-সৌধের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার কাজে লাগানো যায়, এ-সম্বন্ধে অনেকেই ছিলেন অনবহিত। কারণ রাশিয়ান ফিজিওলজিস্ট আইভান পেত্রভিচ পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও লব্ধ

Freud—(A Pavlovian Critique) Harry. K. Wells, Lawrence & Wishart, London, 1960. 25 sh.

নবতম মস্তিষ্কবিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের পরিচিতির অভাব। ওয়েলস্ বস্তুবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ফ্রয়েডকে বিচার করতে সচেষ্ট হলেন। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর দেশে বেঞ্জামিন ও জেম্‌স্ রাস্ ও পরে থর্নডাইক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানসিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে জেম্‌স্ ও ফ্রয়েডীয় ভাবধারা তাঁদের প্রভাবকে অনেকাংশে বিলুপ্ত করেছিল বলা চলে। ওয়েল্‌স তাই বলেছেন :

"The Freudian rocket was made in Vienna, but launched in the United States. It is therefore appropriate, for an American to attempt to evaluate the teachings of Freud. In my country psycho-analysis penetrates all aspects of national life and culture, and at the same time comprises an important item of ideological export to the rest of the world."

অনেক পরিশ্রম ও অধ্যয়নের ফলে এই evaluation বা মূল্যায়ন করেছেন ওয়েলস্ তাঁর লিখিত 'পাভলভ য়্যাণ্ড ফ্রয়েড'-এর দুটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে আছে বিখ্যাত শারীবৃত্তবিদ আইভান পেত্রভিচ পাভলভ-এর মস্তিষ্কবিষয়ক গবেষণার ফলাফল, মনোবিজ্ঞানে পাভলভীয় তত্ত্বের অবদান, ও মানসিক রোগের চিকিৎসার উপর পাভলভীয় তথ্যের প্রয়োগবিধি এবং পাভলভীয় প্রত্যয় প্রভাবে মার্কসীয় দর্শনের সমৃদ্ধি ও বিকাশের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের প্রথম জীবনের স্নায়ুবিজ্ঞান-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে। তারপর দেখানো হয়েছে কি ভাবে তরুণ ফ্রয়েড ধীরে ধীরে "myth-making creator of psycho-analysis" হয়ে উঠেছেন। বিরাট সম্ভাবনাময় এক বিজ্ঞানীকে দেখা গেল অবশেষে এক রহস্যময় কাল্ট (cult)-এর প্রবক্তারূপে।

প্যারিতে Charcot-এর অধীনে কিছুকাল কাজ করার পর ফ্রয়েড হামবুর্গে এসে প্র্যাক্‌টিশ শুরু করলেন। দৈহিক আঘাত ছাড়াও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে কেন? হিস্টিরিয়ায় অঙ্গবিশেষের প্যারালিসিস বা অন্যান্য আঙ্গিক বিকৃতির কারণ কি? এই ধরনের রোগীর সংখ্যাই বেশি : তাদের নিরাময়ের উপায় কি? ভাবতে লাগলেন ফ্রয়েড। এই সময়ে ন্যান্সীতে Bernheim ও Liebault সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবের সাহায্যে হিস্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করতেন। এ সময় এই বিষয়ক একখানি বই পড়ার সুযোগ হয়। তিনি ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগ নিরাময়ে প্রথমদিকে ভালো ফল পেতে

লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলেন সব রোগীকে সম্মোহিত করা যায় না। আর দেখলেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটছে মাত্র সাময়িক উপশম। অভিভাবনের উপর তিনি বিশ্বাস হারালেন। বলা উচিত বার্নহাইমের পদ্ধতিতে অভিভাবনে শুধু রোগলক্ষণ দূরীকরণের কথাই থাকত। রোগের মূল অনুসন্ধান করা বা তৎসংক্রান্ত কোনো অভিভাবন দেওয়া তাঁদের রেওয়াজ ছিল না। আর সম্মোহন বা অভিভাবন সম্পর্কিত তাঁদের থিওরি ছিল অবৈজ্ঞানিক। কাজেই রোগলক্ষণের পুনঃপ্রকাশ ঘটত। এই সময় Dr. Joseph Breuer বর্ণিত এক হিস্টিরিয়া রোগীর কথা ফ্রয়েডের মনে পড়ে। সম্মোহিত অবস্থায় রোগী এমনী সব আবেগময় মুহূর্তের কথা মনে করতে পেরেছিল—যে-কথা জাগ্রত অবস্থায় তার মনে আসে নি। পিতার রোগশয্যার পাশে বসে তার অনেক ইচ্ছা হত যা সে সময়ে দমন করা ছাড়া উপায় ছিল না। Dr. Breuer সিদ্ধান্ত করেছিলেন রোগলক্ষণ হচ্ছে অবদমিত ইচ্ছার ফল। তার নাচবার ইচ্ছা অবদমিত হবার ফলে ঘটেছে তার পায়ের প্যারালিসিস।

এইবার ফ্রয়েডের মনে হল তিনি রোগ লক্ষণের মূল কারণের হদিশ পেয়েছেন। "A psychic injury was caused by the necessity to repress, a strong impulse, while the physical symptoms were substitutes for the action that would have been appropriate for the impulse."

এখান থেকেই ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ঝাপসা হতে থাকে। মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটা অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত দিয়ে তিনি ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন। ফ্রয়েড যখন অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তে ব্যস্ত, ঠিক তখন, সেই ১৮৯৫ সালে আইভান পেত্রভিচ পাভলভ গবেষণাগারে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। ধীরে ধীরে তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে, অনুমানকে প্রশ্রয় না দিয়ে, রাতারাতি সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা না করে এগিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানী ও সত্যসন্ধানী পাভলভ। আর কল্পনাপ্রবণ, দ্রুত-সিদ্ধান্তপ্রয়াসী ফ্রয়েড চরম তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য ব্যগ্র। এই দুই মহারথীর চারিত্রিক বৈপরীত্য এঁদের একজনকে করেছে বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক। আর একজনকে করেছে অনুমানভিত্তিক তত্ত্ব প্রচারক।

মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার জন্য দুজনেই আজীবন সচেষ্ট ছিলেন: তবে তাঁদের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

"While Pavlov sought the solution to the enigma of mental processes and their disturbed states in the functioning of the upper regions of the nervous system, Freud on the contrary pursued the same objectives within the limits of the mind itself, without regard to knowledge of the brain as the organ of mental life."

"Pavlov employed the experimental method of natural science to discover the facts and laws of the reflex activity of the brain, while Freud sought to discover the dynamics of mental processes by probing minds, his own and his patients."

ওয়েলসের এই ভূমিকাই পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে একজনের পদ্ধতি বিষয়গত বা objective, অপরের পদ্ধতি অন্তর্দর্শী বা introspective।

প্রথম থেকেই ফ্রয়েডকে দ্বয়বাদী রূপে দেখা যায়—বলছেন ওয়েলস্। কিন্তু তাঁর দ্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি মনে করতেন মস্তিষ্ক মননক্রিয়ার আধার আবার বলতেন :

"I have no inclination at all to keep the domain of the psychological floating, as it were in the air, without any organic foundation. But I have no knowledge neither theoretically not therapeutically, beyond that conviction, so I have to conduct myself as if I had only the psychological before me."

ফ্রয়েডের চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অবাধ ভাবানুষঙ্গ, স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ও পরিবৃত্তি (transference) সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা সকলেরই আছে। জীবনের বেশির ভাগই ফ্রয়েড ব্যয় করেছেন 'অবদমন'-এর বিচার-বিশ্লেষণেও ঐ সম্পর্কিত অধ্যয়নে। অবদমিত অভিলাসের নির্গমন পথ নিয়েই ফ্রয়েডীয় গবেষণা। উপরে উদ্ধৃত তিনটি পথ ছাড়া আরও তিনটি পথের হদিশ পেয়েছেন ফ্রয়েড। নিউরোটিক রোগ উপসর্গ; দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি ও পরিহাস এই তিন পথেও অবদমিত অভিলাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। পরিহাস তাঁর মতে আক্রমণাত্মক ও প্রলোভনসঙ্কুল অবদমিত ইচ্ছার প্রতীক। এই সব নিয়ে জীবনের শেষভাগে ফ্রয়েড তাঁর

জীবনদর্শন গড়ে তোলেন ও এই দর্শনের নাম দিলেন 'Metapsychology'. তাঁর এই 'মেটাসাইকোলোজি'র যে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—একথা ফ্রয়েড নিজেই স্বীকার করেছেন।

"The indefiniteness of all our discussions on what we describe as metapsychology is of course due to the fact that we know nothing of the excitatory process that takes place in the elements of the psychical systems, and that we do not feel justified in framing any hypothesis on the subject. We are consequently operating all the time with a large, unknown quantity, which we are obliged to carry over into every new formula."

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমী দুনিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হতাশা ও বিভ্রান্তির জোয়ার আসে, তারই সুযোগে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা আন্দোলন বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে। মনস্তত্ত্বের গণ্ডী পেরিয়ে এ আন্দোলন জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি সব কিছুতেই ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা মনঃসমীক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করেন, ফলে ফ্রয়েড এবং সাইকোঅ্যানালিসিস্ পৃথিবীর সকল শিক্ষিত নর-নারীর কাছে অতিপরিচিত হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি প্রসিদ্ধি লাভ করে আর একটি কথা—ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স। বালক শৈশব থেকেই মাকে ভালোবাসে ও পিতার প্রতি পোষণ করে ঘৃণা ও শ্রদ্ধা। মায়ের প্রতি ভালোবাসায় পিতা তার প্রতিদ্বন্দ্বী—কাজেই পিতার মৃত্যুই তার কামনা। এ-কামনাকে সে ভয়ে বা ভক্তিতে অবদমন করতে বাধ্য। অবদমিত কামনা নির্জ্ঞান মনে এসে বাসা বাঁধে ও সেখানে সঞ্চিত থাকে "charge of psychic energy।" বালকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার নির্জ্ঞান মনের এই মাতৃলিপ্সা ও পিতৃনিধন ইচ্ছাকে সমাজানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত করার সাফল্যের উপর। এই হচ্ছে সোজা কথায়—ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স। ইলেকট্রা কমপ্লেক্স এর উল্টো পিঠ।

ফ্রয়েডের মতে সামাজিক সম্পর্ক, নীতিবোধ, ধর্মাধর্ম বিচার সবই এই ঈডিপাস কম্প্লেক্স-নির্ভর।

"Their origin and development have nothing to do with

the labor process not with the relations people enter into based on the way they obtain food, clothing and shelter !"

শুধু তাই নয়। ইতিহাসেরও স্রষ্টা এই ঈডিপাস কমপ্লেক্স। ইতিহাস ফ্রয়েডের মতে, শক্তিশালী পুরুষেরা সৃষ্টি করে। জনসাধারণের অভিলাস শক্তিশালী পিতরোপম পুরুষের আজ্ঞাবাহী দাস হওয়া। নীট্শের 'সুপারম্যান' তত্ত্বকে ঈডিপাসের আওতায় দাঁড় করিয়ে ফ্রয়েড এই অভিমত প্রকাশ করেছেন :

"We know that the great majority of people have a strong need for authority, which they can admire, to which they can submit, which dominates and sometimes ill-treats them...It is the longing for the father that lives in each of us from his childhood days, for the same father whom the hero of legend boast of having overcome."

ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের এই হচ্ছে ফিলজফি।

ফ্রয়েডের মতে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির দাস। এই সহজাত প্রবৃত্তি দুই ধরনের : কামাত্মক আর ধ্বংসাত্মক এদের একসঙ্গে বলা হয় Death-Eros Instinct। যুদ্ধ তাই ফ্রয়েডের মতে স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষের সহজাত ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি যুদ্ধের কারণ, কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য।

নারী সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সুবিদিত হলেও ওয়েলস্-এর মন্তব্য উদ্ধৃতির-যোগ্য :

"Instead of tracing the position of women to the conditions existing in certain stages of society, he attributes it to recognition on the part of both sexes of an alleged anatomical 'deficiency' in women. Young girls, he holds, assign the lack of the male anatomy to castration as punishment for sin and if they are to progress normally into "feminimty", they must accept an inferior and and passive condition."

এ উক্তি ফ্রয়েড-নিপীড়ক নাৎসীরা কাজে লাগিয়েছেন !

সহজাত প্রবৃত্তিমূলক মনস্তাত্ত্বিকদের মতে :

"The division of mankind into classes is the result not of

historical forces, but of permanent inborn differences in human nature."…"Imperialism, with its super-exploitation and oppression of colonial semi-colonial countries requires this doctrine above all others.…And even more significant the doctrine of national or racial superiority is a powerful means of keeping the working people of the imperialist nation from joining with oppressed nations against their common enemy. In this form, the doctrine of innate superiority is chauvinism and white supremacy" [Harry K. Wells Ivan. P. Pavlov : International Publishers].

ওয়েলস-এর এই সব উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি ফ্রয়েডীয় ভাবধারার গুরুত্বের পরিমাণ। শুধু যদি একটা রোগ-নিরাময়ের পদ্ধতি হত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা, তাহলে তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন থাকত না। মনোবিদ ও চিকিৎসকমণ্ডলীর গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকত ফ্রয়েড-এর নাম। ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণার প্রভাব যদিও আজ ক্ষীয়মাণ, তবুও অনস্বীকার্য যে আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপের কতকাংশে এখনও তার প্রবল আধিপত্য। কারণ হিসেবে ওয়েলস বলেছেন: শিক্ষিত লোকের মনে 'দ্বয়বাদ'-এর (dualism) প্রভাব অপরিসীম। হাজার হাজার বছরের শ্রেণীসমাজের শোষণপীড়নকে সমর্থন করার প্রচেষ্টায় ভাববাদ-দর্শন নানাভাবে প্রচারিত হয়ে মানুষের বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। ফ্রয়েড পৌরাণিক কাহিনী ও প্রচলিত সংস্কারের পুরনো মদ নতুন বোতলে পরিবেশন করাতে অতি সহজেই জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হলেন। অবশ্য মনে রাখা দরকার জীবনের প্রারম্ভে ফ্রয়েড সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করেছিলেন ও বিজ্ঞানীমহলে অল্পবিস্তর পরিচিতি লাভও করেছিলেন। সে সময় মধ্যযুগীয় অনুশাসনে নর-নারীর প্রেম ও যৌনজীবন অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় অনুশাসন ও ভিক্টোরিয়া যুগের 'পিউরিটানিজম'-এর বিরুদ্ধে ফ্রয়েডীয় 'যৌনসর্বস্ব' (Pan-sexualism) মতবাদ তরুণদের কাছে প্রগতিশীল বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম দিকে যাঁরা তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাধারী

এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল নীতিবাগীশের দল। কাজেই সে-সময়ে ফ্রয়েডীয় ভাবধারা শুধু জনপ্রিয় নয়, অনেকের কাছে প্রগতিশীল জীবনদর্শন বলেও প্রতিভাত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সব থেকে বড় কথা, অদ্বয়-বস্তুবাদী দর্শনের প্রসার বা প্রচার বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর অনভিপ্রেত। কাজেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকথাকে নানা রঙে রাঙিয়ে এক 'প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক' ভাবধারা বলে চালু করার জন্য শাসকশ্রেণী ও তাঁদের তাঁবেদার ও উপদেষ্টা বুদ্ধিজীবীদের ছিল যথেষ্ট স্বার্থ ও আগ্রহ। একচ্ছত্র পুঁজিবাদ নানা কৌশলে সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও নেতৃত্বের মূল সূত্রগুলির মধ্যে 'সহজাত প্রবৃত্তিবাদ ও যৌনসর্বস্বতা'র অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মার্কসবাদকে হেয় ও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে—এটাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানাশ্রিত পাভলভীয় মতবাদ প্রথমত শারীরবৃত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য নয়; দ্বিতীয়ত অদ্বয়-বস্তুবাদ দর্শনের (materialism-monism), সম্যক উপলব্ধি শ্রেণীসমাজের বিলোপ ও নতুন পরিবেশ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। ওয়েলস-এর ভাষায়: "For as long as there is a powerful, though minority class of people which has a life and death stake in maintaining idealism as a buttress to its control over the majority, there will be concerted efforts both to prevent wide-spread knowledge of the science of higher nervous activity, and to encourage all forms of idealist and obscurantist notions about mental life, from the theological soul and spirit to the psycho-analytical instinct and unconscious."

সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্রের প্রধান বক্তব্য "you can't change human nature।" আজ এই 'শোষণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা'মূলক (exploitive and competitive) সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষের চরিত্রে ও মানসিকতায় যে-সব দোষ-ত্রুটি, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য দেখা যায়—সেগুলিই মানুষের সনাতন ও শাশ্বত মানসিক ধর্ম। সুতরাং সুযোগসুবিধা দিলেও মানুষের হৃদয়ের বা মননধর্মের পরিবর্তন অসম্ভব; সাম্যবাদী সমাজ গড়ার কল্পনা আকাশকুসুম। এ ছাড়া রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য: কাজেই সমানাধিকার বা সকলের পক্ষে সমান সম্ভাবনা কোনোদিনই আসতে পারে না। কাজেই পাভলভীয় সিদ্ধান্ত: "All peoples are endowed with the same

essential nervous apparatus for the development of consciousness and human nature generally. According to this scientific psychology there are no innate differences in the higher nervous mechanisms of classes, races, nations or the sexes." (Wells) আমেরিকা বা পশ্চিমী দুনিয়ায় অচল। তেমনি অসহনীয় পাভলভের বক্তব্য :- "The chiefest, strongest and most permanent impression we get from the study of higher nervous activity by our methods is the extra-ordinary plasticity of this activity, and its immense potentialities ; nothing is immobile or intractable, and everything may always be achieved, changed for the better, provided only that the proper conditions are created !"

পাভলভ ও ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের বিভিন্নতা এবং সে-সবের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের মধ্যেই ওয়েলসের আলোচনা পর্যবসিত নয়। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি নিপুণভাবে ফ্রয়েড ও পাভলভ-এর বিভিন্ন গবেষণাধারা বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাভলভ-এর লালাগ্রন্থির নালী (salivary fistula) ও ফ্রয়েডের স্বপ্ন-নালীর (Dream Fistula) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই সূত্রে এই দুই মহারথীর গবেষণা-প্রণালীর পার্থক্য তিনি পাঠকদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। মনঃসমীক্ষা বা স্বপ্ন-বিশ্লেষণের প্রধান উপায় হল introspection। এখানে সব কিছু নির্ভর করছে রোগীর নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ, বিচারবুদ্ধি, অনুভবের তারতম্য ; তার মেজাজ, personal bias ইত্যাদির উপর ; এককথায় এ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে subjective। সাবজেকটিভ কথাটিকে ওয়েলস এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "It means determination by the make-up of the individual mind, rather than by objective conditions and facts. অপরপক্ষে পাভলভীয় পদ্ধতি পুরোপুরি অবজেকটিভ—objective means viewing phenomena as external and apart from self-consciousness." এছাড়া পাভলভ-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে কোনো প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো অন্যের দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারে ও পরীক্ষার ফলাফলের তথ্যাদির সত্যতা নিরূপিত হতে পারে। জন হপকিনস ও কর্নেলে, গ্যান্ট ও লিডেল পাভলভ-এর গবেষণা অনেকবার নিজেদের

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেছেন ও ফলাফলের যাথার্থ্য নিরূপিত করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-নালীর প্রাপ্ত ফলাফলের যাথার্থ্য নিরূপণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। মনে রাখা দরকার এই লালা-নিঃসরক নালী (Salivary Fistula) থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত পাভলভ-এর কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স তত্ত্ব আর স্বপ্ননালী বা Dream Fistula থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশেষ বিশ্লেষণের উপর ফ্রয়েডের অবদমন তত্ত্বের ভিত্তি।

ওয়েলসের এই বই-এর চতুর্থ অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ পনেরো বছর থেকে ফ্রয়েড ও পাভলভ নিয়ে নানা স্থানে বহু লোকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দেখেছি এঁরা সকলেই প্রায় পাভলভকে ওয়াটসন প্রমুখ behaviourist-এর দলে ফেলেছেন। ফ্রয়েড যেমন সহজাত প্রবৃত্তিকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, চিন্তাভাবনার প্রধান নিয়ামক ও নির্ধারক বলে কল্পনা করেছেন, ওয়াটসন তেমনি একেবারে বিপরীত মত, অর্থাৎ পরিবেশ, অভ্যাস ও শিক্ষাকে মানসিকতার একমাত্র নিয়ন্ত্রক বলে প্রচার করেছেন। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই দুই মতই একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত। ওয়েলস বলছেন : "Pavlov does not deny innate activity as the Behaviourists have done. On the contrary, he shows experementally that there can be no learning at all without inborn reactions." সহজাত প্রবৃত্তি বা instinct-এর অস্তিত্ব নিয়ে পাভলভ-ফ্রয়েড-এর মতভেদ নয়। মতভেদ এই প্রবৃত্তির শক্তি ও প্রকৃতি নিয়ে। পাভলভ অবশ্য instinct কথাটি ব্যবহার করতে চাইতেন না। পাভলভ বলেছেন : "Unconditioned Reflexes"। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার পক্ষে এগুলো যথেষ্ট নয় ; যদিও এদের শক্তি অপরিসীম। এদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স—যা পরিবেশের সূক্ষ্ম ও জটিল পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম ও তদনুযায়ী মানুষকে (প্রাণী) পরিবেশের সঙ্গে শুধু মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নয়, পরিবেশকে পরিবর্তনের ব্যাপারেও মানুষের সহায়ক। "There are according to Pavlov, relatively few higher nervous Unconditioned Reflexes and even these are only a foundation on which the psychic activity of the animal or man or animal must be acquired during life." (Wells) এ ছাড়া পাভলভ-এর উত্তরসূরীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে 'আনকণ্ডিশনড রিফ্লেক্স' যতই শক্তিশালী

হোক, কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স তাকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। শিক্ষার অপরিসীম শক্তি অনস্বীকার্য। অর্থাৎ মানুষ পশু থেকে বিবর্তিত হয়েও পাশবিক নয়; গুণগত ভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। সামাজিক পরিবেশের উন্নতি মানবিক চরিত্রের উন্নতি আনয়নে সক্ষম। ওয়েলস-এর আশা আমরা আগামী দিনের সমাজে নতুন মানুষ ও মানবিক চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখতে পাব, নিঃসন্দেহ। এবং এ-আশা তিনি পোষণ করেন পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা থেকে।

ফ্রয়েডের সম্বন্ধে ওয়েলস-এর উপসংহারী উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "The dualistic, subjective idealism of his approach to the human mind posed little scientific danger to the semi-official ideology (of U. S. A.). On the contrary it by and large enhanced that ideology by giving obscurantism a broader base in the mind and culture of the American people. আর পাভলভ সম্বন্ধে বলেছেন: "The conistent and militant monistic materialism of the science of higher nervous activity was, and is, in the sharpest possible opposition to the prevailing manner of thought. This in itself is sufficient to account for the relatively slow rate of recognition of Pavlov's science.

যাঁরা বস্তুবাদ-দর্শন ও মার্কসিজম্-এর ছাত্র তাঁদের প্রত্যেকের কাছে এই বই ও এর পূর্বে প্রকাশিত Pavlov and Freud-এর প্রথম খণ্ড (I. P. Pavlov. Wells—International Publishers, U. S. A., 1956). খুবই মূল্যবান। সাধারণ পাঠকদের কাছে প্রথম খণ্ডের মূল্য অপরিসীম, কেননা পাভলভ সম্পর্কিত সুলিখিত বই ইংরাজী ভাষায় খুবই কম।

শঙ্কর চক্রবর্তী

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি সমস্যা

একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী দুঃখ করে বলেছিলেন, অন্য সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে জিনিসপত্র নাড়াচড়া করে একটা পরীক্ষা-কাজ চালাবার সুযোগ রয়েছে কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে একমাত্র উপাদান হল আলোর সঙ্কেত। এ এমন একটি বস্তু যাকে ভাঙ্গাগড়ার স্বাধীনতা নেই—তার সূক্ষ্মদেহকে এতটুকু বিকৃত না করে অতি সাবধানে মর্মবাণীটুকু উদ্ধার করে নিতে হবে।

এ উক্তিটুকুর পেছনে খানিকটা আক্ষেপ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে জগতে বাস করেন, সেখানে প্রতিনিয়ত চলেছে এক মহানাটকের অভিনয়; যে-নাটকের কুশীলবগণের মনোভাবের প্রকাশ হয় আলোর হাতছানিতে আর দর্শকরূপে বিজ্ঞানী বিস্ময়পুলকে রোমাঞ্চিত হন, এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ করেন।

এই আনন্দকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির স্তরে না রেখে সাধারণের জন্যে বিতরণ যিনি করতে পারেন, তিনিই গুণী। লভেল সাহেব দুনিয়ার অন্যতম সেরা রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাছে জডরেল ব্যাঙ্কে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও জোরালো যে-রেডিও দূরবীণ যন্ত্র রয়েছে, সেটি তাঁরই নির্দেশে তৈরি এবং তিনি ঐ গবেষণাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ। B. B. C.-তে রিথ্ লেকচাররূপে কয়েক বছর আগে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুলিই পুস্তকাকারে বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

জগজিত সিংয়ের পুস্তকের বিষয়বস্তু তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক ও স্বল্প পরিমাণে জটিল। Cosmology হল এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে পদার্থবিদ্যা,

---

The Individual and the Universe—A. C. B. Lovell. Oxford University Press, London. 10s. 6d.

Great Ideas and Theories of Modern Cosmology—Jagjit Sing. Dover Publications. Inc. New York. 1 Doller 85 Cents.

গণিত ও জ্যোর্তিবিদ্যার একটি সহজ সমন্বয় ঘটেছে। বিজ্ঞান গবেষণায় সরাসরি নিযুক্ত না থেকেও লেখক যে-অনায়াসভঙ্গিতে জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল ধ্যানধারণার মহাসমুদ্রে বিচরণ করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সমস্যাকেও (যা প্রায় metaphysics-এর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়) লেখক পরিস্ফুট করে তুলেছেন। উভয় লেখকই অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সমস্যাকে তুলে ধরেছেন।

এক

এই মহাবিশ্ব অসীম, অনন্ত না সসীম—এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান নিয়ে জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা আজো বিব্রত হয়ে আছেন। কোটি কোটি তারা নিয়ে একটি তারাজগত (galaxy), অনন্ত কোটি তারাজগতের সমবায়ে এই মহাবিশ্ব—আপাতদৃষ্টিতে অসীম রূপে প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক। আলোর দূরবীণ যন্ত্রের মাধ্যমে ৩০০ কোটি আলো-বছর (আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল) দূরের তারাজগতের সন্ধান পাওয়া গেছে। রেডিও দূরবীণের সাহায্যে দৃশ্য জগতের এই সীমা আরো বিস্তৃত হতে চলেছে। (বহু তারা আলোর সঙ্গে রেডিও-ঢেউ পাঠিয়ে থাকে, একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় যার উৎপত্তি)।

একটি ঘটনা এ ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আলো ও রেডিও-দূরবীণ যন্ত্রে ধরা পড়ছে এই মহাবিশ্বের এক বিরাট প্রসারণ (great expansion)। সমগ্র তারাজগত দূর থেকে ক্রমে আরো দূরে ছুটে চলে যাচ্ছে এক প্রচণ্ড গতিতে। ২৬ কোটি আলো-বছর দূরে সিরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষেত্রে এই গতির পরিমাণ সেকেণ্ডে ১০,৫০০ মাইল, ১৪০ কোটি আলো-বছর দূরে ভার্গো নক্ষত্রজগতের বেলায় সেই গতি সেকেণ্ডে ৩৮,০০০ মাইল। সেকেণ্ডে ৬২,০০০ মাইল গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে যে তারাজগত, জ্যোর্তিবৈজ্ঞানিক ক্যামেরাযন্ত্রের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্যে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রেডিও দূরবীণের ক্ষেত্রেও এমন তারাজগতের রেডিও-ঢেউ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যারা প্রায় আলোর কাছাকাছি গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আলো সবচেয়ে গতিশীল বস্তু)। সেই সীমা ছাড়িয়েও তারাজগত থাকতে পারে, কিন্তু তারা চিরদিনের জন্যে আমাদের অগোচরেই থেকে যাবে।

দূরবীণ যন্ত্রের চরম উৎকর্ষসাধন হলেও তাদের সন্ধান আমরা কোনোদিনই পাব না।

কাজেই মহাবিশ্ব অনন্ত কি না, পরীক্ষামূলকভাবে তা জানবার উপায় বিজ্ঞানীদের নেই।

দুই

পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে স্থানচ্যুত করে কোপার্নিকাস মধ্যযুগের চার্চের কাছে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবীতে সমস্ত গুরুভার বস্তু স্থানচ্যুত হলেই কেন মাটিতে এসে আশ্রয় নেয়, এ প্রশ্নের জবাব তাদের জানা ছিল না। নিউটন তাঁর সর্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করলেন।

ইউক্লিডের জ্যামিতি ও নিউটনের বিজ্ঞান—এই দুটি প্রধান খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান মহাবিশ্বের যে-ছবিটি আমাদের কাছে তুলে ধরছিল, তার দুটি মোদ্দা কথা হল এই—এই মহাবিশ্ব আকারে অনন্ত এবং তার সমগ্র অঞ্চল একই ধর্ম ও নিয়মের বশীভূত। ইউক্লিডের যুক্তি ছিল এত অভ্রান্ত, যে বহু শতাব্দীব্যাপী জ্যামিতিশাস্ত্র পরিগণিত হচ্ছিল সবচেয়ে নিখুঁত ও নিশ্চিত বিজ্ঞানরূপে, যার জন্যে প্লেটো ঈশ্বরকে জ্যামিতিবিদ (geometer) বলে অভিহিত করেছিলেন। নিউটনীয় বিশ্বে সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক নিয়ম হল মাধ্যাকর্ষণ এবং মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে চলেছে এই মাধ্যাকর্ষণ বলের (force) মাধ্যমে।

আইনস্টাইন বিশ্বের এই ধারণাকে পালটে দিলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের মাধ্যমে (general theory of relativity)। তাঁর মতে মাধ্যাকর্ষণকে একটি বল রূপে ব্যাখ্যা করা ভুল বরং এভাবে বলাটা ঠিক হবে যে এর প্রভাবে বস্তুমাত্রেরই চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বক্রাকৃতি লাভ করে।

মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তুর প্রভাবে তাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চল (স্পেস্) বক্রতাধর্মী। এই স্পেস অনন্ত নয়, সসীম; ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অনুযায়ী স্পেসে দুটি বিন্দুর মধ্যেকার সর্বনিম্ন দূরত্ব হল একটি সরলরেখা এবং সেখানে একটি রেখার সমান্তরাল আর একটি রেখা টানা সম্ভব। কিন্তু আইনস্টাইনের স্পেসে কোনো সরলরেখাই টানা সম্ভব নয় (যেহেতু স্পেস্‌মাত্রেই বস্তুর প্রভাবে বক্রাকৃতি)। এখানে দুটি বিন্দুর মধ্যেকার নিম্নতম দূরত্ব হলো একটি বৃহৎবৃত্ত

(great circle) এবং কোনো সমান্তরাল সরলরেখা আদৌ অঙ্কন করা সম্ভব নয় (Riemannian জ্যামিতি অনুযায়ী)। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেল, একটি নক্ষত্রের আলোকরেখা সূর্যের পাশ দিয়ে আসার সময় বক্রাকৃতি লাভ করল এবং সূর্যের চারপাশে বুধগ্রহের কক্ষপথে যে বিচ্যুতি (perturbatidus) তাও স্পেসের বক্রতার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। একই কারণে একজন যাত্রী স্পেসের কোনো জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে সমগ্র মহাবিশ্বকে ঘুরে আবার সেখানেই ফিরে আসতে পারেন।

আইনস্টাইনের বিশ্বে কাল বা সময়ের মাপ ছাড়া কোনো ঘটনার ধারণা করা সম্ভব নয়, তাই এ বিশ্ব হল space-time-continuum. নিউটনের বিশ্বে কোনো ঘটনা পরস্পরের কাছ থেকে বহু দূরবর্তী দুটি প্রদেশের (যেমন পৃথিবী ও নক্ষত্র সিরিয়াস) বাসিন্দার দৃষ্টিতে একইভাবে ধরা পড়বে। কিন্তু আইনস্টাইনের বিশ্বে দুজন দর্শক একই ঘটনাকে কখনোই একইভাবে (simultaniety of events) দেখতে পাবে না, যেহেতু একই গতিতে ধাবমান আলো দুজনের কাছে বিভিন্ন সময়ে পৌঁছবে।

তিন

আইনস্টাইনের বিশ্বতত্ত্বে মহাবিশ্বের যে চেহারাটা পাওয়া গেল, তার প্রকৃতি জড়ধর্মী (static)। এখানে দুটি বলের মধ্যে একটি সাম্য বিরাজ করছে, তারা হল মাধ্যাকর্ষণ ও মহাবিকর্ষণ (cosmic repulsion)। একটি বস্তু আর একটি বস্তু থেকে বহু দূরত্বে থাকলে তাদের মধ্যেকার আকর্ষণবলের চেয়ে প্রবলতর হয় একটি বিকর্ষণবল (মহাবিকর্ষণ)। এ-যেন এক দাঁড়িপাল্লা, যার দুটি পাল্লায় সমান ওজন চাপানো। কোনোদিকে ঝুঁকে পড়লেই সমূহ বিপদ। মাধ্যাকর্ষণের জোর বাড়লে মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তু এক মহাসঙ্কোচনের প্রভাবে একটিমাত্র বস্তুপিণ্ডে এসে জড়ো হবে। উল্টোদিকে মহাবিকর্ষণের মাত্রা তুলনায় সামান্য বাড়লেও মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে এক চরম শূন্যতায় এসে পৌঁছবে। যে-বিশ্বতত্ত্বে সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্ব একটি সুতোর ওপরে ঝুলছে, স্বভাবতই তা বহু তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। (আইনস্টাইন cosmic repulsion-এর তত্ত্বটিকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে পরে স্বীকার করেছিলেন)। রুশ অঙ্কবিদ ফ্রীডমান আইনস্টাইনের মূল সমীকরণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে দুটি বিশ্বের সন্ধান

পাওয়া যাচ্ছে—একটি আন্দোলনধর্মী (oscillating), আর একটি প্রসারণধর্মী (expanding)। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের সমগ্র নক্ষত্রজগতের বস্তু একটি বিশেষ ঘনীভূত অবস্থায় সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। তারপরে শুরু হল প্রসারণ। প্রথম ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত প্রসারণের সীমায় পৌঁছে মহাবিশ্ব আবার সঙ্কোচনের বশীভূত হচ্ছে এবং চরম সঙ্কোচন থেকে আবার শুরু হচ্ছে প্রসারণ। এই পালা অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কেবলই প্রসারণের পালা। আমেরিকান জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হাব্‌ল-এর পরীক্ষা থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণের সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেল।

চার

মহাবিশ্বের সমগ্র তারাজগতের ক্রমপ্রসারণের (আমাদের তারাজগত ছায়াপথ বা milky way থেকে দূরে সরে যাওয়া) গতিবেগের ভিত্তিতে হাব্‌ল দেখালেন যে, তারা সবাই আজ থেকে ৮০০ থেকে ৯০০ কোটি বছর আগে এক ঠাঁই হয়ে ছিল। এই বিপুল সময়ের মধ্যে সমগ্র তারাজগতের ক্ষেত্রেই এক বিপুল বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু যে প্রাথমিক বস্তুপিণ্ড থেকে তারা গড়ে ওঠে, সেটি যে জায়গা জুড়ে ছিল আজকের বিপুল মহাবিশ্বের তুলনায় তার আয়তন ছিল খুবই ছোট।

Abbe Lemaitre ১৯৩৩ সালে মহাবিশ্বের একটি নতুন সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বললেন—যার নাম Evolutionary theory বা 'বিবর্তনতত্ত্ব'। লেমেইতার-এর মতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল একটি অত্যন্ত ঘনীভূত, ছোট বস্তুপিণ্ড থেকে, যাকে তিনি বলছেন প্রাথমিক পরমাণু (primeval atom)—সমগ্র তারাজগতের বস্তু যার মধ্যে জড়ো হয়ে ছিল এবং তার ঘনত্ব ছিল এত বেশি যে প্রতি ঘন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষেত্রে বস্তুর ওজন ছিল প্রায় দশ কোটি টন। এই বস্তুপিণ্ডের মাঝে দেখা দেয় এক বিরাট বিস্ফোরণ এবং তার ফলে সমগ্র বস্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কয়েক শ বা কয়েক হাজার কোটি বছর বাদে এই প্রসারণের বেগ স্তিমিত হয়ে আসে। তখন মহাবিশ্বের মোট ব্যাপ্তি ছিল হয়তো একশ কোটি আলো-বছর। এই অবস্থায় মহাবিশ্বের প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায় স্থিতিধর্মী (আইনস্টাইন-বিশ্বের মত)—যেখানে মাধ্যাকর্ষণ ও মহাবিকর্ষণ একে অপরের সমতা বজায় রেখে চলছিল। প্রাথমিক বস্তুপুঞ্জ থেকে সমগ্র তারাজগতের গঠনপর্ব এই সময়েই ঘটেছিল। এরপর দুই

বিপরীতমুখী সমধর্মী বলের মধ্যে সাম্য হারিয়ে মহাবিকর্ষণ বল জোরালো হয়ে ওঠে এবং সমগ্র মহাবিশ্ব এক বিরাট প্রসারণের ধারায় ৯০০ কোটি বছরের এক সুদীর্ঘ কাল পেরিয়ে বর্তমান রূপে পৌঁছেছে।

তারাজগতের গঠনপর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহাবিশ্বের বিবর্তনের যে ধারা, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মাবলী দিয়ে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তার পূর্ববর্তী পর্বকে বিচার করতে বসলেই যত অনিশ্চয়তা ও জটিলতা মাথা তুলতে থাকে। ঠিক কতটা সময় পেছিয়ে গেলে প্রাথমিক পরমাণুর যুগে পৌঁছনো যাবে, সঠিকভাবে তা এই বিশ্বতত্ত্ব থেকে জানবার উপায় নেই।

সেই 'প্রাথমিক পরমাণু'র আভ্যন্তরীণ গঠন কিরূপ ছিল, তা অনুধাবন করতে গিয়েও খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। এখানে দেখা দেয় আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞানের অনির্দেশ্যবাদ (principle of uncertainty)। একটি বস্তুর সমগ্র পরমাণুর কোনো একটির সঠিক প্রকৃতি (তার ভর ও অবস্থান) কোনোমতেই জানা সম্ভব নয়; আমরা শুধু সেই ঘটনাকেই অনুধাবন করতে পারি যেখানে অনেকগুলি পরমাণু সংশ্লিষ্ট। 'প্রাথমিক পরমাণু'র অবস্থাটাও যেন এই একটি পরমাণুর মতো, তা ভেঙে যখন বহু হয় (অগণিত তারাজগতের মাধ্যমে), তখন থেকেই তার প্রকৃতি বা ধর্ম আমাদের কাছে বোধগম্য হতে পারে।

পাঁচ

গ্যামো 'প্রাথমিক পরমাণু'র একটি অন্য চেহারা দিলেন। তাঁর মতে এর সবটাই ছিল প্রচণ্ড তপ্ত তাপীয় বিকীরণ (thermal radiation)। প্রসারণের ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে মহাবিশ্বের তাপ ছিল ১০০ কোটি ডিগ্রি, একদিন বাদে তাই নেমে আসে চার কোটি ডিগ্রিতে। কাজেই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ মহাবিশ্বের জীবনের প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। গ্যামোর মতে সমগ্র বিশ্ব গোড়া থেকেই প্রসারিত হয়ে চলেছে, মধ্যে কোনো স্থিতিধর্মী পর্ব দেখা দেয় নি।

মহাবিশ্বের 'বিবর্তনতত্ত্বে'র প্রথম প্রবক্তা চার্চের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাঁর চেতনায় মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা মানুষের বুদ্ধির অনধিগম্য মনে হওয়া বিচিত্র নয়; সমস্ত যুক্তিতর্ক যেখানে অচল হয়ে বসে।

গ্যামো অবশ্য এ-প্রসঙ্গে বলছেন যে, 'প্রাথমিক পরমাণু' থেকে মহাবিশ্বের সূচনা নয়, বরং এ তার সংকোচনপর্বের একটি বিশেষ অবস্থা। মহাবিশ্ব হয়তো এর বহু আগে থেকেই বিরাজ করছিল।

তবে 'প্রাথমিক পরমাণু' তত্ত্ব অনুসারেই যদি মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে তা চিরদিনই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের বাইরে থেকে যাবে। কারণ দু হাজার কোটি বছর আগে যে অবস্থা ছিল, তা আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না।

অধ্যাপক লভেল তাঁর গ্রন্থে 'The Origin of the Universe' অধ্যায়ে এ-প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

ছয়

মহাবিশ্বের 'বিবর্তনতত্ত্ব' অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের অন্তিম পরিণতি এক শীতল মৃত্যু। সমগ্র নক্ষত্রজগৎ প্রসারিত হতে হতে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। প্রসারণের ফলে সমগ্র মহাবিশ্বও অনন্ত রূপ লাভ করে চলেছে। ফলে একদিন মহাবিশ্বের বস্তুরূপে এক অতিতনুর পর্যায়ে এসে পৌঁছবে (material thinning of the universe)। [সমগ্র নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তারা তাদের প্রথম অবস্থা—Main sequence—(যেমন আমাদের সূর্য) পর্ব থেকে বহু লক্ষ কোটি বছর পরে রূপান্তরিত, হচ্ছে white dwarf বা শ্বেত বামন রূপে, যেখানে আমাদের সূর্য তাপই হারিয়ে ও ক্রমে ছোট হতে হতে চাঁদের মতো একটি শীতল ছোট বস্তুতে পর্যবসিত হবে। এ হল মৃত নক্ষত্র।] সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জ আবার তাদের তাপশক্তিকে ক্রমাগত বিকীরণের মাধ্যমে মহাকাশে ছড়িয়ে চলেছে। Second law of thermodynamics অনুযায়ী ক্রমেই এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন সমগ্র মহাবিশ্বের তাপশক্তি সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে গিয়ে একটি বিরাট নিম্নঅঙ্কের কোঠায় এসে পৌঁছবে; সমস্ত জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ চিরকালের মতো অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে যাবে—সেই পর্বটা হল মহাবিশ্বের তাপমৃত্যু (heat death of the universe), তাপযুক্ত হয়ে নয়, তাপ-বিহনে মৃত্যু।

সাত

মহাবিশ্বের এই শোকাবহ পরিণতি যে-তত্ত্বের শেষ কথা, তার বিরুদ্ধে আর একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন Gold Hoyle ও Bondi—যার নাম

steady state theory। এই তত্ত্বের মূল কথাটা হল মহাবিশ্বের কোনো আদি নেই, অন্ত নেই—এ এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। মহাবিশ্বে নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটছে, তারাজগত ক্রমপ্রসারণের আবেগে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে—এই ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে বস্তুর ধ্বংস সূচিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে এই মহাবিশ্বের সর্বত্র বস্তু অবিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কাজেই অপসৃয়মান তারাজগতের স্থান গ্রহণ করছে অন্য নতুন তারাজগত এবং মোটামুটিভাবে মহাবিশ্বের চেহারাটা থাকছে একই রকম। এ অতীতেও যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমনি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একইরূপে থাকবে।

এই তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞান জগতে আর একটি বড় সমস্যা সৃষ্টি করে তুলল। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং শক্তিকে বস্তুতে রূপ দেওয়া যায় কিন্তু কিছু-না (nothingness) থেকে বস্তুর সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে সমগ্র স্পেস জুড়ে, সেইটেই প্রশ্ন। ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের conservation of matter তত্ত্ব এখানে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মহাবিশ্বে শক্তি থেকে বস্তুতে রূপান্তরের কোনো প্রমাণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে এখনো পাওয়া যায় নি।

আট

দুটি তত্ত্বের মধ্যে steady state theory অনেক বেশি বস্তুবিজ্ঞানসম্মত এবং মানুষের মনের কাছে এর আবেদনও অনেক বেশি।

জ্যোর্তিবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে বিবর্তনতত্ত্বের সপক্ষে যুক্তির পরিমাণ বেশি। তবে অত্যন্ত জোরালো রেডিও দূরবীণের সাহায্যে যদি কোনো দিন ৮০০ কোটি আলো-বছর দূরের কোনো রেডিও-তারাজগতের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো দুটি তত্ত্বের মধ্যে কোনো একটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। বিবর্তনতত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের গঠনপর্বের ঐ প্রথম অধ্যায়ে তারাজগতের ঘনত্ব (বর্তমানে একটি তারাজগত থেকে আর একটি তারাজগত, যেমন আমাদের ছায়াপথ থেকে এ্যাণ্ড্রোমিডার দূরত্ব কুড়ি লক্ষ আলো-বছর;) অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক দূরত্ব ছিল অনেক কম। Steady-state তত্ত্ব অনুযায়ী তা হবার কথা নয়, যেহেতু মহাবিশ্বের চেহারাটা বরাবর একই রকম রয়েছে, কাজেই যে-কোনো সময়ে যে-কোনো স্থানে তার ঘনত্ব একই রূপে থাকবার কথা।

নয়

আধুনিক নিউক্লিয়ার (পরমাণুকেন্দ্রীন সংক্রান্ত) পদার্থবিজ্ঞানের একটি নতুন আবিষ্কার 'Anti-matter' বা বিপরীত-বস্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব করেছে। (সাধারণ বস্তুর পরমাণু যেমন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদির সমবায়ে তৈরি, বিপরীত বস্তুর পরমাণু তেমনি অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন ও অ্যান্টি-ইলেকট্রন বা পজিট্রনের সমবায়ে তৈরি ; এই বিপরীত বস্তুকণাদের অন্যান্য ধর্ম সাধারণ বস্তুকণাদের মতোই, শুধু তাদের বিদ্যুৎশক্তি বিপরীতধর্মী।) বস্তুকণাদের গতিবর্ধক যন্ত্রে (particle accelerators) একটি বিশেষ অবস্থায় এদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বিপরীত-বস্তু সাধারণ বস্তুর সান্নিধ্যে এলেই একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে বসবে (annihilation)। অথচ এরা যে সামগ্রিক বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত তাতে সন্দেহ নেই এবং মহাবিশ্বে এরকম বহু তারাজগতের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয়, যারা গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বিপরীত-বস্তুর সমবায়ে। তার মানে এই বিপরীত-বস্তু কোথাও না কোথাও সৃষ্টি লাভ করে চলেছে। এ যেমন একদিকে steady-state তত্ত্বের অনুকূলে মত প্রকাশ করছে, তেমনি 'বিবর্তন-তত্ত্বে'র ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ সমস্যা উত্থাপন করেছে। 'প্রাথমিক পরমাণু' থেকেই যদি মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে তার মধ্যে সমগ্র বস্তু ও বিপরীত-বস্তু একই সঙ্গে থাকার কথা। অথচ সেক্ষেত্রে তারা একে অপরকে ধ্বংস করে বসত। বিবর্তনতত্ত্বের কয়েকজন সমর্থক অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন।

পাঠক অধ্যাপক লভেলের বইখানা থেকে বর্তমান জ্যোর্তিবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত সহজ ও সুখপাঠ্য বর্ণনা লাভ করবেন। জগজিত সিং-এর বইতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। নক্ষত্রজগতের বিবর্তন, গ্রহজগতের সৃষ্টি ও মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি একটু জটিল হলেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে আলোচনা করেছেন। একজন ভারতীয় যে একটি জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কতখানি নিপুণ লেখনী ধারণ করতে পারেন, শুধু সেটুকু জানার জন্যেই এই বইখানা পড়া উচিত।

শান্তিময় রায়

বিপ্লববাদের আদি ইতিহাস

সাম্প্রতিক কালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ইতিহাস প্রণয়ন আরম্ভ হয়েছে। সরকারি বেসরকারি গবেষকরা বিষয়টি নানাদিক থেকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিপ্লবী দলগুলির ভূমিকা নিয়ে এখন পর্যন্ত বিশেষ কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা হয় নি। অনেকে এই বিষয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন; (সুপ্রকাশ রায় রচিত—'ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস') বিষয়টি কীভাবে দাঁড় করানো যায় এই নিয়ে আলোচনাও করেছেন। এখানে বিপ্লবী কথাটা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি বা দল সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সমজাতীয় কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের উচ্ছেদকল্পে সচেষ্ট হয়েছেন—সেই সব প্রচেষ্টাকে এখানে বিপ্লবী প্রচেষ্টা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ-শাসক এই কর্মপ্রচেষ্টাকে সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করেছিল। এই থেকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কথাটা সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। ইতিহাসবিজ্ঞানে বিপ্লববাদ কথাটা অবশ্য আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছে, তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে। তথ্যের প্রাচুর্য এত যে এইগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে কোনো কিছু দাঁড় করানো খুব কঠিন কাজ। যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে বিপ্লবীদের লিখিত স্মৃতিকথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। উল্লেখযোগ্য স্মৃতিকথার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি মনে রাখার মতো: অরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী', উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা', ডঃ ভূপেন দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', শচীন সান্যালের 'বন্দীজীবন', সতীশ পাকড়াশীর 'অগ্নিযুগের কথা' প্রভৃতি। কিন্তু এই স্মৃতিকথাগুলির উপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করার অসুবিধা আছে।

---

(১) **বিপ্লবীজীবন স্মৃতিকথা**—ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। (২) **জেলে ত্রিশ বছর ও স্বাধীনতাসংগ্রাম**—ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী।

অনেক সময় এগুলি পরস্পরবিরোধী ও অতিরঞ্জিত হওয়াতে গবেষণার পক্ষে অযোগ্যপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই আশা করেছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশ বিভাগের গোপন রিপোর্টগুলি হয়তো-বা এই সমস্যার খানিকটা সমাধান দিতে পারবে।

কিন্তু সেই দিক থেকেও নিরুৎসাহ হবার কারণ ঘটেছে। খবর নিয়ে জানা গেল যে পশ্চিম বাংলায় রক্ষিত পুলিশের অনেক মূল্যবান গোপনীয় দলিল-দস্তাবেজ '৪৭ সালের অগাস্ট মাসের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় দপ্তরের গোপন মহাফেজখানা উৎসাহী গবেষকদের কাছে প্রায় দুর্ভেদ্য। লালফিতার বজ্রআঁটুনি ও আমলাতান্ত্রিক মানহানিকর আচরণ— অনেক গবেষককে এই দিক থেকে নিরুৎসাহ করে। দু-একজন ভাগ্যবানের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই মূল্যবান উপাদান বাদ দিলে বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথাগুলির তাৎপর্যও কিছু কম নয়। যদিও বিদ্বজ্জনের মনোভাব এই স্মৃতিকথাগুলি সম্পর্কে অনুকূল নয়—তবুও এইগুলিকে তুলনামূলকভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নিশ্চয়ই মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনেক বিখ্যাত বিপ্লবীই স্মৃতিকথা লিখেছেন। এর মধ্যে বেশির ভাগই ইতিহাস রচনার দিক থেকে অযোগ্য। অনেকগুলির লেখার ধরন রম্যরচনামূলক—আবার কোনো কোনো স্মৃতিকথার অংশবিশেষ ইতিহাস রচনার দিক থেকে উপযুক্ত হতে পারে। যেমন— ডঃ ভূপেন দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', শচীন সান্যালের 'বন্দীজীবন', সতীশ পাকড়াশীর 'অগ্নিযুগের কথা' ইত্যাদি। শ্রীঅরবিন্দ ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন ঘোষের স্মৃতিকথায় বিপ্লববাদের আদি যুগের অনেক টুকরো কাহিনী এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে। বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমি ও গুপ্ত সমিতির জন্মকাহিনী এই স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করে লেখা যায় না। কারাজীবনের লাঞ্ছনা কত নিঃশঙ্কচিত্তে ও নির্বিকার ভাবে আত্মস্থ করা যায় তার সাক্ষ্য মিলবে এর পাতায় পাতায়। ভারতবন্ধু জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে এই স্মৃতিকথার মূল্য সমধিক।

সাম্প্রতিক কালে দুটি বিখ্যাত বিপ্লবীর স্মৃতিকথা ডঃ যাদুগোপাল

মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' ও ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী রচিত 'জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম' বাঙালী পাঠক সমাজের নিকটে পরিবেশিত হয়েছে। যদিও যতখানি সমাদৃত হওয়া উচিত ছিল ততখানি হয় নি, তবুও এই গ্রন্থ দুটি বিপ্লববাদের ইতিহাস-রচনায় নানা কারণে নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে।

প্রথমত, দুজন রচয়িতাই বাংলার দুটি প্রখ্যাত বিপ্লবী দলের অবিসম্বাদী নেতা। এই দল দুটি হচ্ছে অনুশীলন ও যুগান্তর। প্রায় একই সময়ে এঁরা দুজনেই দলের নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ চক্রের মধ্যে স্থানলাভ করেন।

দ্বিতীয়ত, এঁরা দুজনেই বাংলা দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, সততা ও স্থিতধীর জন্য সর্বজনীন শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রারম্ভিক কাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী এঁরা বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর ছাপ রেখে গিয়েছেন।

তৃতীয়ত, এঁরা দুজনেই স্বল্পবাক, প্রচারবিমুখ, আত্মঘোষণায় অপারগ ও নিস্পৃহ ঔদার্যের দ্বারা সমৃদ্ধ। জাহির করা এঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আবার, ছোট্ট ঘটনার মধ্যে তাৎপর্য অনুসন্ধানে এঁদের দক্ষতা স্বভাবজাত। এঁরা ঘটনাকে যেমন ভাবে দেখেছেন তেমনি ভাবে এঁকে রেখেছেন। স্থান বিশেষে হয়তো এঁদের ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটেছে। কিন্তু এটা স্মৃতিকথায় না হয়ে পারে না। স্মৃতিকথা এ না হলে অসার, নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে। স্মৃতিকথা ইতিহাস নয়।

অনেকে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রারম্ভকালকে পলাশী যুদ্ধের দশ বৎসর পর নন্দকুমার ও জগমোহন দত্তের ফাঁসি থেকে আরম্ভ করতে চেয়েছেন। ডঃ দত্ত তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে লিখেছেন যে "নন্দকুমারের সময় হইতে ভারত বিদেশী কবলমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।" ডঃ মুখোপাধ্যায় কিন্তু ভিন্ন মতের আভাস দিয়েছেন। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, চুয়ার, কোল, সাঁওতাল, পাইক, সর্বশেষে সিপাহীবিদ্রোহে এই প্রথম সংগ্রামের যবনিকা পড়ে। এই কারণে ডঃ দত্ত তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম'। যদিও ডঃ দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদী বিশ্লেষণী-পদ্ধতি, তবুও তাঁর এই মত আধুনিক ইতিহাসে বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং এই দিক থেকে ডঃ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকা ও যে সময়-বিভাগ করেছেন তা নিশ্চিতভাবে

যুক্তিসঙ্গত। তিনি লিখেছেন: "ইংরেজ আমলে যে আন্দোলন হয় তার বিকাশ তিন ধাপে দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রচেষ্টায় সর্বত্র বাধা দিয়ে আসা হয়েছে। তাকে সহজে কোথাও বসতে দেওয়া হয় নি। ১৭৭২-১৮৫৪ সাল এইভাবে যায়। তারপর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ১৮৫৫-১৯০৪ সাল অবধি। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে বা নতুন আপদকে যেখানে পারা যায় সেখানে স্থানভ্রষ্ট করে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। তারপর এল তৃতীয় স্তর। ইংরেজ রাজ্যকে অন্তগত করে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ১৯০৫-১৯৪৪ অবধি তার সময়।"

বিপ্লবী আন্দোলনে পটভূমি রচনায় ডঃ দত্তের গ্রন্থে দু-একটি মূল্যবান তথ্য থাকলেও (যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাজনৈতিক সহানুভূতি "বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি স্থাপনায় ছিল") সুপরিকল্পিত ভাবে তিনি এর কোনো সামাজিক বিশ্লেষণ দেন নি। কিন্তু ডঃ মুখার্জি পরিকল্পনাবিহীন বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এক বিশেষ পটভূমিকায় বিপ্লবী আন্দোলনকে যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন তা যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "কর্নওয়ালিসের সময় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমাজে নতুন প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকের উদ্ভব হয়। এই জমিদাররা মধ্যসত্ব হল। তারপর ১৮৩৩ সালে ইংরেজদের জমিজিরাৎ খরিদ করে সম্পত্তির মালিকানির অধিকার দেওয়া হয়। তাতে আরও গোলযোগ সৃষ্টি হল। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর পর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তারতম্য সমাজে এল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবার প্রকৃত সুবিস্তৃত প্রতিপত্তি দাঁড়িয়ে গেল। পরে অবশ্য এর ফলে দেশে এল নবজাগরণ। ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে তাদের তৈরি বুদ্ধিজীবীদের মনান্তর, মতান্তর ও সংঘর্ষ ক্রমেই বেড়ে চলল।" তিনি দেখিয়েছেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলাবিজয়ের পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লুণ্ঠতরাজের ফলে এল মন্বন্তর। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৮০৬ সালে এক হাজার পঁচাশী কোটি টাকা খাজনা আদায়। পূর্বে ত্রিশ বছরে ঐ পরিমাণ টাকা বিলাতে যায়। "এর ফল এই দাঁড়াল যে, ভারতের লোক শিল্পচ্যুত হয়ে ক্রমেই জমিতে চাষীর সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হল। পলাশী যুদ্ধের পর মন্বন্তর, কুশাসন, ভূমি-বণ্টনের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে সমাজে ওলটপালট আসে।"

"আর্থিক ক্ষতি, সমাজে অসম্মান, রাজনীতির আসনে অনাদর, কৃষ্টি বা ধর্মের আসনে ঘৃণার বা তাচ্ছিল্যের বর্ষণ—জনমনকে চঞ্চল, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও মত্ত করে তুলল। বিপ্লবের জন্ম হল এবং কলেবর বৃদ্ধি হতে লাগল!"

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে-ভাবে নতুন শক্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তার পূর্বাভাস মিলবে ডঃ মুখার্জির এই ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনায়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই আসে নীল আন্দোলন। "পঞ্চাশ লক্ষ লোক (কৃষক) একজোট হয়ে নীল-চাষ করতে অরাজী হল। দেশব্যাপী কৃষকদের প্রথম ধর্মঘট। এই আন্দোলন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে হয়।"

"১৮৬৩ সালে ওহাবী আন্দোলনের ইংরেজবিদ্বেষী রূপ বিশেষ ভাবে দেখা যায়।" "১৮৬৫ সালে পাঞ্জাবে 'কুকা' আন্দোলন। এই নিরস্ত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন বাবা রামসিংহ।" "১৮৬৮ বীটন সভায় তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী ইংরেজকে ভারত ছাড়ার কথা বলেন।" ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বনের ভাব স্বদেশবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বিশেষ চেষ্টা হয়।

১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সুরেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের যুগ। সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল —বঙ্কিমবাবু কর্নেল ডকিন নামে গোরা সৈনিকের হাতে অপমানিত হলেন। তিনি ইংরেজ আমলের বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার কথা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৭২-৭৩ জমিদাররা অতিরিক্ত কর বসায় এবং প্রজাদের জর্জরিত করে। "তার ফলে পাবনায় ভীষণ প্রজা বিদ্রোহ হয়। ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে ছাত্র আন্দোলন সুরু করেন—এবং প্রথম ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়—। ১৮৭৬ খৃঃ রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন হয়। ১৮৭৮ সালে দেশী সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধের আইন হল। ১৮৭৯ সালে অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হল। ১৮৮২ সালে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল আন্দোলন হয়। ১৮৮৩ সালে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে কলকাতায় নিখিল ভারতীয় এসোসিয়েসনের বৈঠক বসে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম। ১৮৮৩ সালে হাইকোর্টের "অবমাননার অছিলায় সুরেন্দ্রনাথের ছমাস কারাদণ্ড হয়। দেশের জন্য এই প্রথম কারাদণ্ড। পি. মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করে আনবার চেষ্টা করেন। ১৮৯০ সালে মনিপুর বিদ্রোহের নেতা টিকেন্দ্রজিতের বীরোচিত গর্বে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ—সারা ভারতে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দেয়।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে— ইংরেজ রাজের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প বেতনের কেরানীদের দুর্দশা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার উপর প্রতিবৎসর শত শত ছাত্র স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করিয়া তোলে"। এই বিক্ষুব্ধ শিক্ষিত "ভদ্রলোক" শ্রেণীর কথাই রাওলাট কমিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্রেণীর সামাজিক উৎস ও মানসিক পরিবেশ এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয়ে সাহায্য করে। এই দিক থেকে গবেষণার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও এই বিশ্লেষণের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগে গুপ্ত সমিতির উদ্ভব সম্পর্কে ডঃ দত্তের জবানবন্দী ডঃ মুখার্জি পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, যোগেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদের বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রথম রূপ প্রকাশ পায় 'ম্যাটসিনি ক্লাস' গঠনের মধ্য দিয়ে। ডঃ মুখার্জি এই ক্লাসের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ —অরবিন্দ-রচিত 'ভবানী মন্দির' নিয়ে বাংলা দেশে আসেন। কিন্তু 'ভবানী মন্দির' জাতীয় গোপন কেন্দ্র কখনো স্থাপন করা সম্ভব হয় না। এর পরেই প্রমথ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। 'ভবানী মন্দিরের' সম্পর্কে কোনো সমর্থনসূচক তথ্যের অভাব আছে। তবে দুমকায় রোহিনী পাহাড়ের কেন্দ্র ও ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনায় 'ভবানী মন্দিরে'র সুনিশ্চিত প্রভাব প্রতীয়মান হয়। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনকালে বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম সম্মেলন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে আহূত হয় বলে কোনো কোনো মহল দাবী করেন। এর সভাপতিত্ব করেন প্রমথনাথ মিত্র। প্রতিটি জিলা হতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র সতীশ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, নিরালম্ব স্বামী প্রভৃতি কয়েকজন প্রথম গুপ্তসমিতি গঠন করেন। বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তীর মতে—বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের প্রেরণায় এই দলের নাম দেওয়া হয় 'অনুশীলন'। অনুশীলনই বাংলার প্রথম বিপ্লবী দল। ডঃ দত্ত ও ডাঃ মুখার্জির মতে বাংলা দেশের পূর্বে পূর্বভারতে মহারাষ্ট্রে সর্বপ্রথম বিপ্লববাদের বীজ

রোপিত হয়। তিনি বলেছেন "বিপ্লবী বর্ত্মের আগুন মহারাষ্ট্র থেকে আসে বাংলায়, বাংলা থেকে যায় পাঞ্জাবে।...পুনার ঠাকুর সাহেব এর প্রতিষ্ঠাতা। অরবিন্দ তাঁর কাছে দীক্ষিত হন।"

বালগঙ্গাধর তিলক বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি করেন। পুনার ঠাকুর সাহেব ও চিতপাবন পরিবারের চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় মহারাষ্ট্রে প্রথম গুপ্ত সমিতির উদ্বোধন করেন। এঁদের নেতৃত্বে ১৮৯৮ সালে প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডর্স্টকে হত্যা করা হয় (১৮৯৮ সালে), (১৯০২ থেকে ১৯০৫)। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ ভগিনী নিবেদিতা ইউরোপীয় বিপ্লবী ভাবধারায় প্রথম প্রেরণা লাভ করেন। বিশেষ করে ভগিনী নিবেদিতা ইউরোপীয় বিপ্লবী কুলতিলক ক্রপটকিনের রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিতা ছিলেন। তাছাড়া আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে, ভারতের বিপ্লববাদের পথিকৃৎ-এর মধ্যে একজন রূপে স্থান লাভ করেছেন। রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে যে পশ্চিমী বিপ্লবী চিন্তার ধারা ভারতের বিশেষ করে বাংলার ভাবজগতকে আলোড়িত করেছিল—তারই এক নতুন অধ্যায় সুরু হল ১৮৯৩ সালের পর থেকে। ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ভাবের আদানপ্রদান এই সময়ে সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়। ভারতের বিপ্লবী চিন্তার মধ্যে উগ্র ভারতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারসাম্য—উগ্র ভারতীয়তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। ডঃ মুখোপাধ্যায় এই সমস্যাটির গুরুত্ব না দিয়ে একটি গুরুতর সমস্যা এড়িয়ে গেছেন। 'বিপ্লবী' ত্রৈলক্য চক্রবর্তীর রাজনৈতিক মতামত হিন্দুধর্মের প্রচ্ছায়ায় আবৃত। এই দিক থেকে ডঃ দত্তের মত অতি সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন "বিপ্লববাদ ধর্মের আকার ধারণ করে" মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসব, বাংলায় শিবাজী উৎসব, গুপ্তসমিতি সভ্যদের দীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের নিয়মাচার দ্বারা প্রভাবান্বিত। শ্রদ্ধেয় ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে এই সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

তিনি লিখেছেন যে "প্রতিজ্ঞা করণের সময় সাধারণত কোনো দেবী মন্দিরে লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে দীক্ষা দেওয়া হইত।...পুলিনবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে রমনা-সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়িতে বা বুড়া শিবের মন্দিরে দীক্ষা দিতেন।...মস্তকে গীতা স্থাপন করা হইত। গুরু, শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই

হাতে প্রতিজ্ঞাপত্র ধরিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতেন। আমি বাহ্রা ডাকাতির পূর্বে পুলিনবাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি।"

রুশিয়ার নিহিলিস্ট ভাবধারা বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' আদর্শ ও ধ্যান ধারণা অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-জনিত প্রচণ্ড বিক্ষোভে "চন্দ্রকলার ন্যায় এই দল ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল।"

এই একমাত্র দলের প্রচারপত্র হিসেবে ছিল 'যুগান্তর'। ১৯০৬ সালে সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদ-পদ্ধতি নিয়ে মতান্তর হয়। "এখনই রণংদেহি" নিয়ে বারীনবাবুদের সঙ্গে মিত্তির সাহেব একমত হতে পারেন নি। তিনি আরও ভালো করে সংগঠন গড়ে তোলা ও সুদূরবিস্তারী করার পক্ষে ছিলেন। ১৯০৭ সাল থেকে বারীনবাবু আলাদা করে নিজের একটি গ্রুপ বা দল গড়ে তোলেন। "১৯০৭ সালের আগষ্টে বন্দেমাতরম্ কাগজে বিবৃতি দিয়ে বারীনবাবুরা মুরারী পুকুর বাগানে মারণাস্ত্র তৈরির জন্য আলাদা হয়ে রইলেন। তাঁরা এই সময় যুগান্তর কাগজ চালনার জন্য বিশেষ কিছু করতেন না। কবিরাজ অনাথ রায়, অতীন বসু, নরেন শেঠ প্রভৃতির সাহায্যে এবং কিরণ মুখোপাধ্যায়, নিখিল রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত প্রভৃতির কর্মশক্তিতে কাগজ চলতে লাগল। এঁদের তখন কোনো কোনো লোক বলত যুগান্তরওলা বা যুগান্তরের লোক। ঠিক ১৯১০ সালে সরকারি দপ্তরে 'যুগান্তর' গ্রুপ নামটা পাওয়া যায়। 'হাওড়া ষড়যন্ত্র' মামলায় সর্বপ্রথম এই নাম ব্যবহার করা হয়।"

ডঃ দত্ত দাবি করেছেন যে যুগান্তর নাম তাঁহার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করে তিনি এই নাম নির্ধারিত করেছিলেন। এই নামটি তিনি ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস থেকে ধার করেছেন।

ডঃ দত্ত লিখেছেন: "যুগান্তরের পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতিই ছিল। ইহাই তাঁহাদের কাগজ। এই সময়ে যাঁহারা পি. মিত্রের তাঁবেদার ছিলেন ও যাঁহারা লাঠি ঘুরাইতেন তাঁহারা একদল হইলেন; তাছাড়া বঙ্গের সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কার্য করিতাম। এই প্রকারে বঙ্গে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্বপ্রথমে দলাদলির ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও তাহাদের

শাখাসমূহ পি. মিত্রের সরাসরি অধীন ছিল; তাহা ছাড়া বঙ্গে যে সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের সকলেই আমাদের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কর্ম করিতেন। এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিকের লোক বেশি ছিল। অথচ বাৎসরিক কনফারেন্সে সকলেই পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনে মিলিতাম।"

প্রখ্যাত প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে ১৯১০ সালে মৈমনসিংহে হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর দল নিজেদের যুগান্তর আখ্যা দেন।

ডঃ মুখার্জির মতে "সত্যিই এরকম কোনো গ্রুপভাবে দল ছিল না।" যুগান্তর কাগজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ডঃ দত্তের নাম করেন নি। তিনি বলেছেন যে "সত্যি বোমা পিস্তলের ব্যাপার নিয়ে ডুবে থাকার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার জন্য গোড়ায় যুগান্তরের স্থাপয়িতা ও পরিচালকরা ১৯০৮ সালে যে বড় মামলায় পড়লেন তার নাম ছিল 'আলিপুর বোমা মামলা'। সে সময় 'যুগান্তর গ্রুপ' নামে কাউকে আদালতের কাঠগড়ায় দেখা যায় না। কিন্তু ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্রের সময় আসামীর মধ্যে ছিলেন তারানাথ রায় চৌধুরী, কেশব দে। এঁরা সরাসরি যুগান্তর কাগজের শেষদিককার লোক। আসলে 'যুগান্তর' দলের স্থাপয়িতা অরবিন্দ-বারীন্দ্র প্রমুখ। অবশ্য এই নাম নিয়ে দল তাঁরাও করেন নি। ইতিহাসের গতিতে ১৯১৫ সালের পর এই নাম এসে যায়।"

১৯৪৫ সালে বাংলার গভর্ণর কেসি তদানীন্তন বড়লাট ওয়াভেল-কে এই দল সম্পর্কে যে গোপন দলিল পাঠিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ এইরূপ "বারীন্দ্র ঘোষ ও আরও জনকয়েক মিলিত হইয়া 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া হিন্দু যুবকদের আধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার শেখাতে থাকেন। তাঁরা প্রচার করিতে লাগিলেন—বৃটিশ এদেশে শাসন করছে ছল আর বলের সাহায্যে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই যুগান্তর দল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সংগঠনশীল সমিতিতে পরিণত হয়। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে এরূপ বাছা বাছা তীক্ষ্ণধী যুবক দেখা যায় না। এই দলের মধ্যেই ছিলেন বৃটেনের সত্যকার দুর্জয় শত্রু।"

বৈপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী দাবি করেছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের

পূর্ব পর্যন্ত অনুশীলন সমিতিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেটা আইনগতভাবে সঠিক। কারণ যুগান্তরের প্রায় সব সভ্যই অনুশীলন দলের থেকে উদ্ভূত। এবং সরকারি ভাবে যুগান্তরের স্বীকৃতি আসে অনেক পরে। কিন্তু আইনের কথা দিয়ে ইতিহাস বিচার হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনুশীলন সমিতির মধ্যে যুগান্তর জন্মলাভ করে বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ল বিকেন্দ্রিক ভাবে। নিরালম্ব স্বামী ও পরে যতীন মুখার্জি এদের নেতা হন।

১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাস গ্রেপ্তার হন। অনুশীলন সমিতির প্রধান সঞ্চালক পি. মিত্র এই সময়ে হঠাৎ মারা যান। ১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। এর কিছু পর "ঢাকার অনুশীলন সমিতি নামটা বেজে উঠল।" এই পুনর্গঠিত অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন বিপ্লবী পুলিন দাস। ডঃ মুখার্জি এই পুনর্গঠিত সমিতি সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন: "১৯১১ সাল থেকে বাংলা দেশে বিপ্লবীদের অবসাদ ও অন্ধকারের দুর্দিনে আলো জেলে রেখেছিলেন বলে আমি নতুন গড়া অনুশীলনের প্রশংসাবাদী আরও বেশি করে।" ১৮-২৪ বছর বয়স্ক যুবক কয়েকজন হলেন এর সারথি। তাঁরা বিদ্বান ছিলেন না, অর্থসম্পন্ন ছিলেন না, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন নি, জনসমাজে অপরিচিত। কিন্তু কি প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লব দিয়ে দেশ স্বাধীন করার নেশায় মশগুল!···নব হোতা ও উদ্‌গাতা মহারাজ ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, রবি সেন ও অমৃত হাজরা···বিশেষ করে নরেন সেনের মাথা ও মহারাজের উদার হৃদয় একত্র না হলে আমরা অনুশীলনকে এমন করে পেতাম না।" বাংলার লাট কেসি এদের সম্পর্কে গোপন চিঠিতে লিখেছেন: "এদের প্রধান ঘাটি ঢাকায় এবং এই সমিতি প্রদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠন। ইহাদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। এঁদের সভ্যও অনেক, বিভিন্ন প্রদেশে এঁদের শাখা-প্রশাখা আছে।" নব অনুশীলন স্বতন্ত্র ভাবে পরিচিত হয় তাঁদের নতুন প্রচারপত্র দিয়ে। তাঁরা কাগজের নাম রাখলেন 'স্বাধীন ভারত'।

বাংলার প্রধান দুইটি বিপ্লবী দলের আদিকালের ইতিবৃত্ত আলোচনা ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

এ সম্পর্কে আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

১৯০২-১০ সালের মধ্যে যে সব বিপ্লবী দল গড়ে উঠল তাকে দুটি শিবিরে ভাগ করা যায়। একটি অনুশীলন—যার প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকায়। অপরটি সন্ধ্যা ও যুগান্তর কাগজকে কেন্দ্র করে—নাম হয় যুগান্তর দল।

"প্রথমটি ছিল সকেন্দ্রিক। দ্বিতীয়টি ছিল বিকেন্দ্রিক।" আত্মোন্নতি সমিতি (ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি) মেদিনীপুরের সত্যেন বসুর দল, মৈমনসিংহের সাধনা সমিতি, উত্তরবঙ্গের যতীন রায়ের দল, মাদারীপুরের পূর্ণ দাসের দল, বরিশালে প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর দল, চন্দননগরের মতিলাল রায়ের দল যুগান্তর দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকে। এদের সম্মিলিত নেতা ছিলেন প্রথমে অরবিন্দ ঘোষ তারপর নিরালম্ব স্বামী পরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন গুপ্ত ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী। পরে এঁরা এদের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। অন্যদিকে প্রমথ মিত্রের মৃত্যুর পর অনুশীলনের নেতৃত্বভার বিপ্লবী নরেন সেন ও মহারাজের স্কন্ধে অর্পিত হয়। অমৃত হাজরা ছিলেন এদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। প্রথমবার ফ্রেজার হত্যার চেষ্টা নারানগড়ে ১৯০৭— ফ্রেজার সাহেবকে দ্বিতীয়বার ওভারটুন হলে হত্যার চেষ্টা ১৯০৮—আই. বি. সাব ইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জির হত্যা (১৯০৮), আলিপুর বোমা মামলা; হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১০), কিংসফোর্ড হত্যা মামলা, চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার চেষ্টা (১৯০৮), নরেন গোসাঁই হত্যা (১৯০৮), শামশুল আলম হত্যা (১৯১০) ইত্যাদি যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নিদর্শন। অন্যদিকে (১৯০৭) এলেনকে হত্যার চেষ্টা; নড়িয়া ডাকাতি (১৯০৮), বাহ্রা ডাকাতি (১৯০৮), ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১০); রাজাবাজার বোমা মামলা ইত্যাদি অনুশীলন দলের কার্যকলাপের পরিচয় বহন করে। ১৯০৯ সালে জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের নিম্নলিখিত দলগুলি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়—ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি।

তাহলে ১৯০২ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যেই বাংলার বিপ্লববাদের আদি কাণ্ডে বিপ্লবী দল গঠনের অধ্যায় শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে আরম্ভ হয় নতুন প্রস্তুতি—নতুন সংগ্রাম।

প্রদ্যোৎ গুহ

কলিকাতার আদিপর্ব

দিল্লী-লণ্ডন বা মস্কো-লেনিনগ্রাদের মতো অত পুরনো না না হলেও শহর কলকাতার বয়সও কম করে দুশো বছর হল। হঠাৎ গজানো এই শহর প্রায় নিজের খেয়াল-খুশী মতো গড়ে উঠেছে কোনো নগর পরিকল্পনাকারের অপেক্ষা না রেখে, অনেকটা যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই। দিল্লীর মতো এই শহরের পথে-ঘাটে হয়তো ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ তেমন করে ছড়ানো নেই, নেই হয়তো তেমন কোনো ট্যুরিস্ট-আকর্ষণকারী স্থাপত্য বৈভব, এমনকি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়ন-লোভন সমারোহেরও হয়তো অভাব আছে। হয়তো কিপলিং-এর কথাই ঠিক :

Thus the midday halt of Charnok—more's the pity
Grew a city
As the fungus sprouts chaotic from its bed,
So it spread
Chance directed, chance erected, laid and built
On the silt
Palace, mire, hovel-poverty and pride
Side by side

তবু একথাও সত্য, এই শহরের অলিতে-গলিতে, প্রতি ধূলিকণায় মিশে আছে ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও। সে ইতিহাস ইংরেজ আগমন ও সাম্রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস, সে ইতিহাস সাম্রাজ্যবিস্তারের অভিঘাতে ভারতীয় সামাজিক অচলায়তন ভেঙে পড়ার ইতিহাস, সে ইতিহাস আবার বাঙলা তথা ভারতের নবজাগৃতিরও ইতিহাস এবং গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস তো বটেই। দুঃখের বিষয় যে শহর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

টাউন কলিকাতার কড়চা : বিনয় ঘোষ। বিহার সাহিত্যভবন। ছ টাকা।
সুতানুটি সমাচার : বিনয় ঘোষ। বাক-সাহিত্য। বারো টাকা।

দোলনা এবং গোরস্থান—সেই শহরের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস অদ্যাবধি লেখা হল না। রম্যরচনা গ্রন্থে অবশ্য এ-বিষয়ে দু-একটি লেখা হয়েছে কিন্তু তা থেকে আমরা জানতে পারি না কী করে সত্য হয়ে উঠল কিপলিং-এর এই বর্ণনা :

Once two-hundred years ago the traders came meek and tame
Where his timid foot first halted there he stayed
Till mere trade
Grew to Empire and he sent his armies forth
South and north
Till the country from Peshwar to Ceylon
Was his own.

জানতে পারি না, কারা এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা, কিভাবে তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, কিভাবে প্রভাবিত করেছে অপরের জীবনযাত্রা এবং এই শহরের ব্যক্তিত্ব কতটা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জানতে পারি না, সাম্রাজ্যের যারা জনক, প্রতিপালক, নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তারাই আবার কী ভাবে সৃষ্টি করেছে তাদের গোরকুণ্দেরও, কেমন করে তারা গোকুলে বেড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত "পেশওয়ার থেকে সিংহল" অব্দি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপর টেনে দিয়েছে যবনিকা। অথচ উপকরণের কিন্তু অভাব ছিল না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তো চলত দলিল-দস্তাবেজের উপরই। তদুপরি সেকালের সাহেব-বিবিরাও স্মৃতিকথা কম লিখে যান নি। এমন কি 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তেও সেকালের সামাজিক জীবনের প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায়। এই সব দলিল-দস্তাবেজ স্মৃতিকথা ইত্যাদির সাহায্যে কলকাতার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করা কঠিন ছিল না। এবং শ্রীবিনয় ঘোষ একাজ অনায়াসে করতে পারতেন।

কিন্তু সে কাজে এখনও হাত না দিলেও, বিনয়বাবু তাঁর কিছু টুকরো লেখায় শহর কলকাতার আদি ইতিহাস এবং সেকালের জীবনযাত্রার উপর কৌতূহলোদ্দীপক আলো ফেলেছেন। এমনি কিছু টুকরো লেখাই সংকলিত হয়েছে 'টাউন কলকাতার কড়চা' গ্রন্থে। সবশুদ্ধ ন'টি রচনা আছে 'টাউন কলকাতার কড়চা'য়। প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রের তাগিদে রচিত হওয়ায় তার কিছু ছাপ অবশ্যম্ভাবীভাবেই পড়েছে এগুলির উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও

তথ্য সমাবেশে, দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে প্রবন্ধগুলি সাংবাদিকতার স্তর উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, প্রবন্ধগুলি শুধু অলস কৌতূহল মেটাবার জন্যই রচিত নয়, এগুলি চিন্তার খোরাক জোগায়, নতুন গবেষণার দিগন্ত নির্দেশ করে। বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাববশত এখানে শুধু গ্রন্থসূচী উদ্‌ধৃত করছি:

> ট্যাভার্ণ ও কফি হাউস। সাহেব নবাবদের টাউন। নতুন বাঙালী বড়লোক। পাল্কি ও ল্যাণ্ডোর যুগ। ক্রীতদাস ও কুলিমজুর। নতুন শহরে পুরাতন ভৃত্য। ডুয়েল। সেদিনের ইংরেজ বিচারক। মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্য।

এই সূচী থেকেই আলোচিত বিষয়ের বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে।

কিন্তু স্থানাভাবের অজুহাতে দুটি প্রবন্ধের অনুল্লেখ তবু অসমীচীন হবে। সে প্রবন্ধ দুটি হল: 'নতুন বাঙালী বড়লোক' ও 'মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্য'। প্রথম প্রবন্ধটিতে সেকালের কলকাতার কয়েকটি ধনাঢ্য পরিবারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, দেখান হয়েছে কী ভাবে তাঁরা প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন এবং কী ভাবে তার অপব্যয় করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সেকালে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বলতে যাদের বোঝাত—সরকারবাবু, কেরানিবাবু, মুহুরি ও বুব্বুলিয়া, চীনাবাজারের দোকানদার ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সকলেরই জানা আছে উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ মধ্যবিত্ত-ভিত্তিক। মধ্যশ্রেণীর দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা, সীমাবদ্ধতা এই নবজাগৃতিতে প্রতিফলিত। বাংলার নবজাগরণ কেন ইওরোপের রেনেসাঁসের মতো প্রাণবন্ত হয় নি, কেন তা অত সুদূরপ্রসারী হয় নি—এই প্রবন্ধ দুটিতে সে প্রশ্নের কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে। যে বাঙালী এককালে সারা ভারতের চিন্তানায়ক ছিল সে কেন জীবনসংগ্রামে পিছিয়ে পড়ল—এ-প্রবন্ধ দুটিতে তারও কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

বিনয়বাবু লিখেছেন:

> "আধুনিক যুগের সূচনা থেকে বাঙালীরা উদ্‌যোগী হয়ে সামাজিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, ইতিহাসে তার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। কিন্তু সেই অগ্রগতির ধারা যে নিরবচ্ছিন্ন ছিল না, এবং পদে পদে বিপরীত পশ্চাদ্‌গতির ধারার আঘাতে তা যে ব্যাহত হয়েছে, উনিশ শতকের জাগরণের ইতিহাসের বিস্ময়কর উত্থান ও

পতন তার প্রমাণ। সেইজন্য প্রশ্ন জাগে মনে যে, বাঙালীর রক্ষণশীলতাই আসল জাতীয় চরিত্র কিনা, এবং তার প্রগতিশীলতা নকল-নবীশের সাময়িক উচ্ছ্বাসপ্রবণতার নামান্তর কি না! একথাও মনে হয়, যে-জাতি গত দু'শ বছর ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেকালের জমিদার ও সুদখোর মহাজনের মনোবৃত্তি বর্জন করতে পারে নি, সামাজিক ক্ষেত্রে তার সত্যিকার প্রগতিশীল মনোভাব থাকতে পারে কি না!…আজকের বাংলার আর্থিক সংকট ও চাকুরিগত নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় মনোভাবের জন্য এই রক্ষণশীলতা কতখানি দায়ী তাও চিন্তার বিষয়! তা যদি হয়, তা হলে আধুনিক যুগের বাঙালী বড়লোকদের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ধারা থেকেই চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে বেশী।"

বিনয়বাবুর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকে হয়তো একমত হবেন না, তবু কথাগুলি ভেবে দেখার মতো তাতে সন্দেহ নেই।

'সুতানুটি সমাচার' মৌলিক গ্রন্থ নয়। উইলিয়ম হিকি, এলিজা ফে, ফ্যানি পার্কস ও ভিকতর জ্যাকামোর স্মৃতিকথা ও পত্রগুচ্ছের নির্বাচিত অংশের সংকলন এটি। সংকলন ও বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীবিনয় ঘোষ। তদুপরি তিনি একটি তথ্যবহুল ভূমিকাও যোগ করেছেন।

উইলিয়ম হিকির স্মৃতিকথা তথ্যের একটি স্বর্ণখনি বিশেষ। বড় বড় চারখণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুর্মূল্য। এমনকি একখণ্ডে প্রকাশিত নির্বাচিত অংশের সংকলনটিও এদেশের ক্রেতাদের পকেটের তুলনায় সুলভ নয়। বিনয়বাবু বাংলা তরজমায় এই আকর গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে পরিবেশন করে কলকাতার ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

উইলিয়ম হিকি বাংলাদেশে এসেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দে। তিনি ছিলেন তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের অ্যাটর্নি। ১৭৭৭ সন থেকে ১৮০৯ সন পর্যন্ত, মাঝে দু-একবার স্বদেশে যাওয়া ছাড়া, হিকি প্রায় একটানা কলকাতা শহরে বাস করেন। তিনি ছিলেন একান্তভাবে সামাজিক মানুষ—সর্বস্তরের ইওরোপীয়ান তো বটেই, এদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন জীবনরসিক। লাটের

বাড়ির ভোজসভা, জজের বাড়ির খানাপিনা থেকে শুরু করে ট্যাভার্ন-এর হৈ-হুল্লা, বাগান-বাড়ির সুরা নারীবিলাস সবেতেই ছিল তাঁর সমান আসক্তি। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাই ছিল বিচিত্র। তাঁর যেমন দেখার চোখ ছিল, তেমনি ছিল লেখার-কলম। বিনয়বাবু ঠিকই লিখেছেন :

> "জীবন দিয়ে জীবন দেখার এই ইচ্ছা ও আগ্রহের জন্য তাঁর জীবনস্মৃতির তথ্যগুলি আজও তপ্ত রয়েছে, কালের শীতল হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তাঁর বিবৃত লোকচরিত্রগুলি আজও এত জীবন্ত যে তাদের চলাফেরা, কথাবার্তার পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায়।"

কিছু উদাহরণ দিতে পারলে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হত। সে ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু স্থানাভাববশত সে লোভ সংবরণ করতে হল।

শ্রীমতী এলিজাবেথ ফে'র স্বামী ছিলেন একজন অ্যাডভোকেট। স্বামীর সঙ্গেই তিনি কলকাতা এসেছিলেন ১৮৭০ সালে। তাঁর জীবনের মোট ৩৬ বছরের মধ্যে ২৪ বছরই কেটেছে এদেশে। ১৮১৬ সালে এই কলকাতা শহরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস কলকাতা শহরে এসেছিলেন ১৮২২ সালের নভেম্বর মাসে। ইংলণ্ড থেকে তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং নানা দেশ ঘুরে শেষে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। তখন রাজা রামমোহন জীবিত। শ্রীমতী পার্কসের সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতায় রামমোহনকে দেখার এবং তাঁর বাড়িতে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার। শ্রীমতী পার্কস তাঁর স্মৃতিকথায় সে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখানে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

> "একদিন এক ধনিক সম্ভ্রান্ত বাঙালীবাবুর বাড়ি ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাবুর নাম রামমোহন রায়। বেশ বড় চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বাড়ি, ভোজের দিন নানাবর্ণের আলো দিয়ে সাজান হয়েছিল। চমৎকার আতসবাজীর খেলাও হয়েছিল সেদিন। আলোয় আলোকিত হয়েছিল তাঁর বাড়ি।
>
> ...বাড়ির ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র সাজানো, এবং সবই ইয়োরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ির মালিক হলেন বাঙালীবাবু (রামমোহন রায়)।"

হিকির মতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণশক্তি এবং লিপিকুশলতা না

থাকলেও শ্রীমতী ফে ও শ্রীমতী পার্কস-এর পত্রগুচ্ছে ও স্মৃতিচারণে ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যায়, যা কেবল মেয়েদের রচনাতেই পাওয়া সম্ভব। মেয়েদের রচনা বলেই এ-দুটিতে ঘর ও ঘরকন্নার অনেক অন্তরঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।

ভিকতর জ্যাকমোঁ পণ্ডিচেরীতে এসে পৌছান ১৮২৯ সালের এপ্রিল মাসে, কলকাতায় আসেন মে মাসে। তিনি ছিলেন একজন তরুণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। ফ্রান্সের 'মিউজিয়ম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'র পক্ষ থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছিল। বর্তমান সংকলনে তাঁর যে দুটি পত্রাংশ সংকলিত হয়েছে তাতে সেকালের ইওরোপীয় সমাজের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও।

'হিকি, ফে, ফ্যানি ও জ্যাকমোঁ মিলিয়ে হেস্টিংস-ফ্রান্সিসের কাল থেকে রামমোহনের কাল পর্যন্ত (১৭৭৫-১৮৩০) কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়।' 'সুতানুটি সমাচার'-এর গুরুত্ব এইখানেই। বিনয়বাবুর তরজমা খুবই সাবলীল হয়েছে, তরজমা বলে মনেই হয় না। বইটি উপন্যাসের মতো তাই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। প্রাচীন কলকাতার কিছু চিত্র এবং প্রতিকৃতি ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে। তাতে বইটির মূল্য বেড়েছে।

বিনয়বাবু লিখেছেন, "অবশ্য এছাড়াও আরও বিবরণ আছে, যেমন বিশপ হেবারের, তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জনসনের, এম্মা রবার্টস-এর এবং আরও অনেকের। জনসন ও এম্মার পর্যবেক্ষণশক্তি প্রশংসনীয়, উপাদানও তাঁদের বৃত্তান্তে যথেষ্ট আছে। কিন্তু একই কালের উপাদানের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে ভেবে এঁদের বাদ দিয়েছি।"

বিনয়বাবুর এই যুক্তির সঙ্গে কিন্তু একমত হতে পারলাম না। জনসনের বিবরণ দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, কিন্তু এম্মা রবার্টস-এর স্মৃতিকথা দেখেছি। তা থেকে কিছু অংশ সংযোজিত হলে বইটির মূল্য বাড়ত। একটু-আধটু পুনরাবৃত্তিতে কিছু এসে যায় না বরং একের বিবরণ অপরের দ্বারা সমর্থিত হলে তা প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়। আর একটু-আধটু পুনরাবৃত্তি তো এই গ্রন্থেও আছে। আশা করব, পরবর্তী সংস্করণে অন্তত এম্মা রবার্টস-এর গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ তিনি সংযোজিত করবেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

উৎস থেকে উজানে

অরুণ মিত্রের কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সময় এত নিবিড় সম্পৃক্ত যে তার মূল্যায়ন আমার পক্ষে একান্ত দুরূহ। কিন্তু, সেইজন্যেই হয়তো, তাঁর আপাতঐকিক কবিতার কোথাও এতটুকু যোজনা ঘটলে আমার স্নায়ুতে ধরা পড়ে। তাঁরি মতো একটি শিকড়ের অভিমানী একাকিত্বে প্রতিষ্ঠিত অমিয় চক্রবর্তী ও আলোক সরকার সম্পর্কেও আমার স্নায়ব আগ্রহ একই রকম। যেহেতু এই তিনজনেই ক্ষণমুহূর্তের গ্লানি থেকে মুক্ত এবং গভীর অর্থে আত্মপর্যাপ্ত সেজন্যেও আমাকে এঁরা বারংবার আকর্ষণ করেন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর পারমার্থিক প্রমা ও আলোক সরকারের দুর্মর বোধিচর্যা অরুণ মিত্রে নেই, কিংবা থাকলেও পড়োশির সঙ্গে আলাপচারিতায় সেই নিভৃত সম্বিৎসা তিনি প্রকাশ করতে চান না, আর সেকারণেই তাঁর মনের উপরে অবৈধভাবে হাত রাখতে না পেরে একশ্রেণীর পাঠকের অভিযোগ বাড়তে থাকে।

কিন্তু 'উৎসের দিকে' পড়তে গিয়ে সেই নালিশ যদিও বা ওঠে, 'ঘনিষ্ঠ তাপ' পড়লে উল্লিখিত পাঠকশ্রেণী এইরকম তৃপ্তিসূচক প্রশ্ন তুলতে বাধ্য: 'তবে কি অরুণ মিত্র তাঁর মনকে এই প্রথম আমাদের দেখতে দিলেন?' 'তৃপ্তিসূচক প্রশ্ন' কথাটির উপর জোর দিতে চাই, কেননা, এই পরিবর্তন কবিতার অন্তঃশরীরে কতটা প্রতিফলিত সেই নিরূপণ সম্পূর্ণ না হলে আজকের পাঠকের পক্ষে বলা কঠিন তিনি তাঁর অভ্যস্ত বৃত্তময়তা অতিক্রম করে আমাদের সবগুলি বাসনা চরিতার্থ করেছেন কিনা।

এক্ষেত্রে কবি ও পাঠক উভয়েরই সার্থকতা, কোলরিজের ভাষায়, depends on distinguishing the similar from the same. কবি নিজেই কি 'অভিন্ন' থেকে 'সমধর্মী'কে সন্তর্পণে বিবিক্ত করে নিতে পেরেছেন?

ঘনিষ্ঠ তাপ: অরুণ মিত্র। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

অরুণ মিত্র যদি প্রদর্শনপ্রবণ হতেন তাহলে এরকম একটা উত্তর খাড়া করা যেত: 'খুব সহজেই পেরেছেন, কেননা, পরিবর্তনমাত্রকেই তিনি অগ্রস্থতি বলে গণ্য করেন।' কিন্তু যেহেতু তিনি প্রতীকী কবিতার বীজমন্ত্রে সুদীক্ষিত, চমকপ্রদ পরিবর্তনকে তিনি ডরান। এই পর্যন্ত বলেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল, কারণ হেলে-আসা বিশ-শতকের দ্রবমান তুষারবেদিকায় দাঁড়িয়ে কে বলবে যে কোনো আন্দোলনের মুদ্রা কোনো কবির ললাটে বালকতিলকের মতো আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে? প্রতীকী কবিতার প্রৌঢ় পারমিতাও তো এখন পরিত্যক্ত। অথবা, অনৃত ও যথার্থ—কবিতাসংক্রান্ত সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে মিশে গিয়েই ঐ ধরনের কবিতা বেঁচে আছে হয়তো। অরুণ মিত্র সেই ফলশ্রুতিকেই নিজের ভিতরে ধারণ করেছেন।

'উৎসের দিকে' সংকলনে সমাহৃত সেই পারমিতার একটি উদাহরণ:

> দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
> তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো
> তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
> অনুভব করলাম।
>
> (দুপুরের সূর্য)

এই বিমগ্ন উচ্চারণের পাশে গিয়র্গ ট্রাকলের 'রাখালেরা শূন্য বনে কবর দিল সূর্যকে / একটা জেলে এসে ঠাণ্ডা দিঘিতে পাল ফেলে চাঁদটাকে তুলে আনল' অথবা অমিয় চক্রবর্তীর 'সবুজ ঘাস আর শ্যামল পাহাড় জ্বলছে দাহে/ ভাঙা বুকের ছায়াসূর্যে' প্রকাশ্যত পারম্পর্যরক্ষী। বস্তুত 'উৎসের দিকে'র অধিকাংশ স্তোত্রে যে-অনুপাতে সব-নিয়ে-এক-হয়ে-ওঠা আছে পারম্পর্যের লৌহশৃঙ্খলা সেই অনুপাতে নেই। নেই বলে ক্ষতি হয় নি নিশ্চয়ই।

কিন্তু 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র কবিতাবলীতে অরুণ মিত্র পরম্পরা রাখতে উৎসুক। পাশাপাশি দুটি নিদর্শন:

> আমি গাছের রসের মতো প্রবাহিত হই
> তোমাকে ফুটিয়ে তুলব
> জল নড়ে না একটুও
> ছায়া দোলে না কোথাও
> নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাব আমি।
>
> (কয়েকটি কথা। উৎসের দিকে)

…মনে করি জলমাটির মিল
এইবার বুঝি উদ্ভাসিত হবে,
আমার নির্জন টহলে তোমার সাক্ষাৎ পাই
প্রথম পৃথিবীর মতো তুমি
জল থেকে জাগা
উর্বর আশঙ্কায় উঁচু নিচু…

(ছায়ায় আলোয় চিহ্নিত। ঘনিষ্ঠ তাপ)

দ্বিতীয় উদাহরণে একটি যুক্তিক্রমসমহিত উপপাদ্য স্থাপিত হয়েছে। বোধহয় এমন বললেও ভুল হবে না যে এই উদাহরণে একটি বক্তব্য চৈতন্যগোচর যা প্রথমটিতে নয়। 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র বেশির ভাগ কবিতায় একটা-না-একটা বক্তব্য বিন্যস্ত হয়েছে। এবং সেই কথাবস্তু বৃহত্তর মানবিকতার দিকে উন্মুখ। 'উৎসের দিকে' ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে সেই অন্তর্দৃষ্টিকোণে উপনিষণ্ণ যাকে হপকিন্সের ভাষায় Inscape বলা যায়। 'ঘনিষ্ঠ তাপ', পক্ষান্তরে, একান্ত ধ্যানন সত্ত্বেও নির্জন স্বর্লোক থেকে অবারিত মুক্তির আস্পৃহা বহন করছে। 'উৎসের দিকে'র 'আমি বন্ধু হতে চেয়েছি/তাই দেয়ালে ঘা দিয়ে কথা বলেছি / আড়ালের ওধারে / সঙ্কেত করেছি / প্রান্তর আকাশ আর শস্যের / মোহনার' ইত্যাদি আবৃত্তিতে এই মুমুক্ষার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। এখানে তারি উদ্যত অঙ্কুর :

যে বন্ধুত্ব হৃদয়ের গহনে রেখেছিলাম
তা এখন আশ্চর্য রকম প্রত্যক্ষ।

(নিস্পন্দ শিখার সামনে। ঘনিষ্ঠ তাপ)

এই স্পষ্টতার কী প্রয়োজন ছিল? প্রতিবেশ কি নমনীয় সুস্থির হয়েছে? পরিবেশের কাছে তাঁর কি রোমান্টিক প্রত্যাশা আছে কোনো? অরুণ মিত্র তাঁর সাম্প্রতিক একটি চিঠিতে যেন এই উদ্বিগ্ন অনুমিতির উত্তর দিতে গিয়েই বলেছেন :

"আমাদের বৃহৎ পারিপার্শ্বিক কখনো কি আমাদের যথেষ্ট সংবাদ দেবে? বরং ছেঁড়াখোঁড়া গলায় কথা বলে আমাদের ধ্রুব মূল্যগুলোকে উচ্চারণ করাই উচিত।"

ঘনিষ্ঠ তাপের কবিতায়-কবিতায় এই বিচ্ছিন্ন সময়ের মধ্যেও মূল্যবোধ

উচ্চারণের অক্লান্ত অনুশীলন। যেখানে সংশয় অবক্ষয় সেখানে 'যদি হঠাৎ দেখা যায় / ভয়ভাঙা সুন্দর মাটি।'

'ঘনিষ্ঠ তাপ' পড়তে-পড়তে বারবার 'লিপিকা'কে মনে পড়ল। লিপিকায় শুদ্ধতম স্বপ্নার্তির পাশে আছে ঢেলে-সাজানোর তীব্র প্রবর্তনা। কখনো-কখনো দুয়ে মিলে এক :

> অথচ, শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পূজোর নহবত বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শানবাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা-কিছু আছে বা"
>
> (গলি)

আর, 'ঘনিষ্ঠ তাপে' :

> কিন্তু এই-ই সব নয়···সকলে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এক্ষুনি ভেঙে ফেলে নতুন করে বানাবে। দিনের আলো ফোটার দরকার নেই, পায়ের ঠোকায় যে চকমকি জ্বলবে তাই যথেষ্ট। পাষাণে বুক বাঁধে এই গলি। তখন একে আর চেনাই যায় না।
>
> (একটি গলি)

অবশ্য, লিপিকার লিরিকখচিত গদ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাপের পার্থক্য শেষোক্তের সচেতন অনাভরণত্বে। মনুষ্যত্বের বোধ দুটি চয়নেই অনুস্যূত। কিন্তু লিপিকা—রূপকঋজু দুয়েকটি আলেখ্য বাদ দিলে—যেখানে দুঃসহ কঠিনকে কোমল করে বলেছে, ঘনিষ্ঠ তাপ তাকে বস্তুসহ বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। এক-এক জায়গায় এই বিস্ময় এতই অমোঘ যে দৈনন্দিন শব্দগুলির আভ্যন্তর প্রচণ্ড শক্তি নিরীক্ষণ করে অবাক হতে হয়। এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে 'রিকশাওয়ালা' আশ্চর্যতম। পরিচিত প্রাত্যহ-পরিবেশে নির্ভর করার মতো কয়েকটি সত্য এখনো জীবিত আছে, এবং ঐ আশ্রয়দাতা নিকট-সত্যগুলিও যে মহা-অজানাকে বহন করছে, সেই কথাটি কবিতাটিতে চূড়ান্ত গ্রন্থনা পেয়েছে।

কিন্তু এই গ্রন্থনা—যা গদ্য কবিতার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা—ঘনিষ্ঠ তাপের সর্বত্র নেই। কখনো বিবরণীজ্ঞাপনের সাংবাদিকতা কখনো-বা বিশাল উপলব্ধিকে শাদামাঠা কাঠামোয় ধরে রাখবার চেষ্টা এখানে অজস্রভাবে ছড়িয়ে আছে। এটা ইচ্ছাকৃত। কবিত্ব থেকে মুক্ত করে কবিতাকে নির্ভূষণ যাথার্থ্যে নিয়ে আসার নিরীক্ষা হিসেবে এরা স্মরণীয়। এক-একবার চিরায়ত

কমনীয়তা সেই বস্তুভাষার উপর ভর করে যে একটি নতুনতর সৌন্দর্য এনেছে তার উদাহরণ কাঁটাতার, ইষ্টিশানে, মেলায়, শরতের ভোরের সীমানায়, অথই জলবাতাসে আলোর সমুদ্রে, দগ্ধ দিনে—এই সব ক্ষেত্রে নতুনত্ব দৃঢ়পিনদ্ধ। কিন্তু অন্যত্র প্রায়শই প্রসাধনবিরূপ সমতলধর্ম। দেশজ, তদ্ভব অথবা অনাদৃত শব্দের ভিড় সেই সূত্রেই। নাহলে মস্তর, দুব্বা, সমুদ্দুর, রাত্তির, পিদ্দিম, রোশনাই প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগের কোনো যুক্তি ছিল না। এই যুক্তি মেনে নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়: 'এরা কি প্রত্যহে ব্যবহার্য?' অথবা: 'গদ্য কবিতার পক্ষে এই ধরনের ঢিলেঢালা শব্দ কি অনিবার্য?' এ প্রশ্নের নিরসনের জন্য অরুণ মিত্রের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের অপেক্ষায় থাকব।

'ঘনিষ্ঠ তাপ' গ্রন্থে যা পেয়েছি সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। অসামান্য নামকরণ থেকে আরম্ভ করে আগাগোড়া মানবিকতার বীণাতার বেজে উঠেছে। বাগ্মিতার বদলে সংগীতকে প্রতিদিনের অবজ্ঞাত জীবনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িয়ে দিতে পেরেছেন বলে আমাদের অবিবেকী সময়ের মধ্যে পবিত্র ব্যতিক্রমের এই পথিককে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আর তাঁকেই তো আজ আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি যিনি আমাদের অবজ্ঞা করতে জানেন না, সৌম্য সাহস' যাঁর সকল লাবণ্যের মূলধন, যিনি সমানুভবে সমস্ত মানুষ বিষয়ে অনায়াসে বলে উঠতে পারেন: 'তারা সব আমার রক্তের দোসর।'

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সাহিত্যের উপজীব্য যে মানবজীবন এবং মহৎ সাহিত্য যে মানবিক সুখ-দুঃখের গভীর রূপ—এ বিষয়ে প্রাজ্ঞেরা ঐক্যমত্যে উপনীত হলেও শেষ পর্যন্ত প্রকরণগত বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক চলবে এবং চলাই স্বাভাবিক প্রাণের লক্ষণ। আমার ধারণায় ঐখানেই সাহিত্যিক সৃষ্টির চাবিকাঠি নিহিত। এই বিতর্ক যেদিন শেষ হয়ে যাবে—(কোনোদিন কি হবে?) হয়তো সেদিন সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকবে না; ব্রহ্মপ্রাপ্তির মতো সৃষ্টিক্রিয়াশীল মনেব অবস্থাও নির্বেদে পৌছবে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ বিতরণ না লোকশিক্ষা—এইটিও একটি চালু তর্ক। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানবমনের যে শিক্ষকতা করে থাকেন—প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা প্রাণাধিকা কান্তার আনন্দের ছলে উপদেশ দানের সঙ্গে তার প্রতিতুলনা করেছেন। সাহিত্যপাঠে যাঁরা কেবলমাত্র আনন্দই চান—তাঁদের উদ্দেশে আধুনিক কালের সমালোচক ভ্রূকুঞ্চিত করে বলতে পারেন: "Literature is not for entertainment, but for understanding." জীবনের এই গভীর উপলব্ধির মধ্যে মানুষের শুভাশুভের সঙ্কেতও আছে। এমনকি 'সাহিত্য' এই কথাটির মধ্যেও 'হিত' শব্দটি প্রচ্ছন্ন। মৈত্রেয়ী যেমন একদা প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'যা আমায় অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব?' তাঁরই প্রতিধ্বনি করে বর্তমানকালের যন্ত্রণাজর্জর সমস্যাকুল মানুষ প্রশ্ন তুলতে পারে—'যা আমার কল্যাণ করবে না তা আমার কোন্ কাজে লাগবে?'

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী দীর্ঘ দুশো সত্তর পৃষ্ঠার গ্রন্থে সাহিত্য সংসর্গিত নানা জটিল প্রশ্নের বিচারে ও সূক্ষ্ম শিল্প-ভাবনার সমন্বয়ে সাহিত্যের কল্যাণকর প্রভাবের

সাম্প্রতিক—অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা, কলিকাতা। সাড়ে আট টাকা।

কথাও মনে রেখেছেন। তিনি নিজে বাংলাদেশের একজন অগ্রগণ্য কবি। দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যের প্রকরণগত ও শিল্পগত দুইদিক নিয়েই যথেষ্ট চিন্তা করেছেন। তাই নিছক তাত্ত্বিকের চেয়ে সাম্প্রতিক কালের শিল্প-ভাবনার একজন অংশীদারের মুখে সাহিত্যের স্বরূপের ব্যাখ্যা শোনা অধিকতর মূল্যবান।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রবীন্দ্র যুগ ও আধুনিক যুগের সেতু। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাছে আধুনিক কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যাতা তিনিই। মনে পড়ে, তাঁর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমাদের অমিয় আজকাল অক্সফোর্ডের কবিদের সঙ্গে খুব হব্-নব্ করছে।" সম্ভবত তিনি এলিয়ট থেকে অডেন-ডে ল্যুইস প্রমুখ কবিদের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিলেন।

তাঁর শিল্প-স্বভাব চিরায়ত সাহিত্যের পরিমণ্ডলে লালিত। সাহিত্য তাঁর কাছে স্নেহ-প্রেম-করুণা প্রভৃতি অপরিবর্তনশীল মানবিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে মানব হৃদয়ের আবেগ, আকুতি ও অনুকাঙ্খা সমূহের সুষমাবদ্ধ সংহত রূপ। কেননা সে 'বহুকালের প্রভু, দেশকালের সে বন্দী নয়।'

তাঁর নিজের কথায় "সাহিত্যের মাটি বহুযুগের পলিতে তৈরী, তবে তা দৃঢ়, তারই উপরে নতুন ভিত গড়বো। মাটির তলে আছে দান্তের হাড়, এখন তাকে হীরের হাড় বলতে পারো, উজ্জ্বল কঠিন—যদিও অদৃশ্য গ্যয়টের দূরনিবিষ্ট দৃষ্টি চূর্ণ-চূর্ণ শাশ্বত হয়ে মাটিকে হিরন্ময় করে রেখেছে।" (য়ুরোপীয় সাময়িক সাহিত্য)

এই ঐতিহ্যচেতনাই শিল্পরুচিকে গড়ে তোলে। এই দূরনিবিষ্ট দৃষ্টি কাল থেকে কালান্তরে পেরিয়ে যায় নতুনতর সৃষ্টিশীল তাগিদে, পূর্বাচার্যের সঙ্গে উত্তর-সাধকের নাড়ীর যোগকে অক্ষুণ্ণ রেখে। এই ঐতিহ্যচেতনার অর্থ যে পিছনের দিকে ফেরা নয়—সে কথা বলাই বাহুল্য।

"...দাঁড়িয়েছি একটা প্রাচীন বটচ্ছায়ায়; পিতৃপুরুষের যুগবাহী কল্যাণ যেখানে আশ্রিত। মরুভূমিতে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলা। কিন্তু ছায়াতপে যুগ্মবাণী শুনে যাব।" [ঐ] এরপরেই সাহিত্যে যুগ-চেতনা বা যুগধর্মপালনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"হঠাৎ দেখি যে-উপমা ব্যবহার করেছি তার মানে গেছে বদ্‌লে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোমর বেঁধে লিখছি তারও গভীরে আমার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য বা আমার কালের উদ্দেশ্য, দেশ বা জাতির উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গেছে।"　　(কেন লিখি)

'সাম্প্রতিক'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধমালাকে প্রধানত চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) সাহিত্যতত্ত্বমূলক (২) সাহিত্যিক ও তাঁদের শিল্প-ভাবনা সম্বন্ধীয় (৩) রবীন্দ্র বিষয়ক এবং (৪) কয়েকটি মহান চরিত্র-চিত্র। সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধাবলীতে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী শিল্পীমানসের উপরে যুগধর্মের প্রভাব ও প্রক্রিয়ার বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। 'শিল্পদৃষ্টি', 'কাব্যে ধারণাশক্তি', 'কাব্যাদর্শ', 'দুর্যোগের সাহিত্য', 'ইওরোপীয় সামরিক সাহিত্য', 'তেরোশ পঞ্চাশের বাংলা' প্রবন্ধসমষ্টি এই দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

> "সৌমনস্যের একটি স্বচ্ছপটে প্রাত্যহিকের যথাযথ রূপ নিরীক্ষণ করা শিল্পীর স্বধর্ম। তিনি দেখান ঘটনার আবর্ত, বিচিত্রের সংঘাত-সমন্বয় অথচ স্থায়ী ভূমিকার উপরে নীলাম্বর, দৃশ্যে-অদৃশ্যে মিলিয়ে এই পার্থিব আশ্চর্যতা কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সবকে নিয়ে এই শিল্প-ধারণা; ধ্যানের বিলীনতায় প্রত্যক্ষকে হারিয়ে যে-ধরনের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা তা নয়, অথচ কাছের অসংখ্যকে কেবলমাত্র স্বার্থের ও তথ্যের বন্দীশালা বানিয়ে যে-বাস্তব তাকেও দূরে রাখা। কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু এই মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিশক্তি শিল্পীর সহজাত, অন্যের পক্ষে দুরূহ। তাই সংসারে আজ একচক্ষুর বা দিব্যচক্ষুর অত্যাচারে মানবিক শুভদৃষ্টি আচ্ছন্ন, প্রীতির আলোকে যে-দৃষ্টির প্রকাশ তাকেই বেঁধেছে মানুষের অতিবুদ্ধি। শিল্পীর মুক্তি যে কত বড়ো, তার সর্বত্রচারিতা বহুদর্শিতা মানুষের পারস্পরিক সভ্যতার পক্ষে একান্ত কাম্য সেই কথা দলীয় মতদ্বন্দ্বিতার দিনে বারবার অনুভব করতে হয়।" (শিল্পদৃষ্টি)
>
> "...রাষ্ট্রিকেরা যখন কম্যুনিস্ট-ফ্যাসিস্ট শুনছেন, ধার্মিকতার যাজক চিনছেন ধর্মচিহ্ন, এবং একান্ত আধ্যাত্মিক জানছেন সবটাই মায়া, তখন কবির চোখ কান খোলা।" (শিল্পদৃষ্টি)

রচনার তারিখ আগের হলেও বিষয়টা সাম্প্রতিক কালের পক্ষেও মর্মান্তিক সত্য। রবীন্দ্রনাথের মুক্ত, উদার স্বচ্ছদৃষ্টিভঙ্গির যোগ্য উত্তরাধিকারীর এই উক্তির নিচে অনেকেরই ঢেঁড়া সই মিলবে।

কর্মের মূলে সর্বাঙ্গীন বোধের যে শিল্প-প্রতিভা—যথার্থ শিল্পীর তাই সম্বল। বিষয়বুদ্ধির সংস্কারহীন, বিদ্বেষলেশশূন্য, আত্মপরবোধাতীত নিঃস্বার্থ আবেগই প্রকৃত শিল্পীর উপজীব্য।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী তাই মহাভারতের অর্জুনের মধ্যে প্রকৃত আর্টিস্টের সন্ধান পান। গীতার ভাষ্য বাদ দিলে সমালোচক খোলা চোখে দেখেন যে শিল্পভাবুক অর্জুন সারথি কৃষ্ণের সামনে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরাঙ্গনে প্রকৃত কবির দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। একই কালে অর্জুনের চোখে ধরা পড়েছে পুণ্যতার প্রয়োগ ও পরিণাম। অর্জুন যুগ্মদৃষ্টিতে দেখেছেন স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে দোষী-নির্দোষীর অসংখ্য মিশ্রণ। সাম্রাজ্যস্পৃহায় দুই দলই সমান।

"এমন অবস্থায় যে-কবিমানস রক্তপ্লাবনে পরাঙ্মুখ হয়ে অন্য কোনো উপায়ে মীমাংসা খোঁজে সে আগে যোদ্ধা ছিল, এখন দ্বিধাপন্ন, এতে তাকে ক্লীব বলা চলে না, চক্ষুসম্পন্ন বলতে হয়। তার প্রশ্নের জবাব কোথায়? ধর্মযুদ্ধের নামে স্ত্রীগণকে পাপলাঞ্ছনার হাতে সঁপে দিয়ে, কুল প্রদুষ্ট করে, অশুচি সংসারের "রুধিরবিদিগ্ধ" প্রলয় কলুষ রূপ বরণ করা আর যাই হোক মানবোচিত নয়।... যেখানে নিকৃষ্ট পথই খোলা রয়েছে, অন্য পথ দেখা যায় না, সেখানে অর্জুনের মতো স্তব্ধ-হয়ে-যাওয়া দৃষ্টিতেই মানুষের পরিচয়। সেখানে ব্যথিত সংশয়ের তলে-তলে মানবিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাই শিল্পীজনোচিত।" (শিল্পদৃষ্টি)

আত্মপর-বোধাতীত এই সমবেদনার দৃষ্টিই আধুনিক যুগের কবি উইলফ্রেড ওয়েনকেও দিয়ে 'strange meeting'-এর মতো বিশ্ববিশ্রুত মহৎ কবিতা সৃষ্টি করিয়েছে।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে উদ্দেশ্য ও মানবনীতির অপরিবর্ত স্বরূপ সাহিত্যে অভেদাত্মা হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু এরই পাশাপাশি প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে শিল্পীর চিদাকাশে আত্মগত ভাবনার যে রংরেঙ্গিনীর খেলা—তাকেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পংক্তিতে আসন দেওয়া বিধেয়। সাহিত্যে pluralism স্বীকৃত সত্য—একথা ফিরে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

তাঁর মতে সাহিত্যের রূপ বর্ণাঢ্য কিন্তু শ্রেয়োধর্মী—সেই শ্রেয়তা সমাজের উপস্থিত ভালোমন্দের সঙ্গে সব সময় স্পষ্টত যুক্ত না হলেও।

বলাবাহুল্য শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মার্কসিস্ট নন। 'ইওরোপীয় সামরিক সাহিত্য' নিয়ে 'উড়োতর্ক' ফেঁদে তিনি প্রতিপক্ষের জবানীতে যা বলিয়েছেন, ঠিক সেই বক্তব্য কারা বলত জানি না। তবে মার্কসবাদীদের যদি তিনি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে বলব যে এতদিনের অভিজ্ঞতার ঝাড়াই-বাছাইয়ের ফলে পূর্বেকার বহু বক্তব্যের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাঁরও নিশ্চয়ই অবিদিত

নেই যে প্রশ্নসংকুল বর্তমান শতকে বহু তর্ক-বিতর্ক এমনকি সেদিনের সোভিয়েত বিমূর্ত শিল্প-বিতর্ক প্রসঙ্গেও এমন সব বহু প্রশ্ন বহু দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে সত্যের মর্মমূলে পৌছানোর চেষ্টা চলেছে। এই প্রসঙ্গে সেই আপ্তবাক্যটিও স্মরণে রাখা দরকার যে 'সত্যের চেহারা একটা মাত্রই নয়।'

তিনি বলেছেন—"অন্যায় এবং কল্যাণের একটি মহাযুদ্ধ আছে, তারই দৃষ্টি দিয়ে তলে-তলে মূল্যবোধ জাগে; পড়ো তলস্তয়-এর মহাসামরিক উপন্যাস। শেষ ক'বছর ধরে সমগ্র য়ুরোপে দৃষ্টি আঁধিয়ে এল; শিল্পের ভঙ্গিতে গড়া হচ্ছে রক্ত পঙ্কের পুতুল। তাতে লাল বা অন্য রঙা কামুফ্লাজের বর্ণচাতুরী। খাঁটি কম্যুনিজম্‌কে বন্ধক রেখে এই সস্তা শিল্পকে চালানো হচ্ছে এরই অনুকরণ করতে চাও কি?" (য়ুরোপীয় সামরিক সাহিত্য) এসব কথা অবশ্য বহু পূর্বের সামরিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে উঠেছিল। আসলে তাঁর মতে শিল্পসাহিত্যকে সাময়িকতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। বর্তমানের ঘটনাকেন্দ্রিক অনুপ্রেরণা লাভ করেও তাকে শাশ্বতের সার্থকতা অর্জন করতে হবে। এ-প্রস্তাবে তাঁর সঙ্গে হয়তো মার্কসবাদীরাও দ্বিমত হবেন না! এমনকি লেনিনও পুশকিন ও মায়াকোভস্কির মধ্যে প্রথমজনকেই শ্রেষ্ঠতর আসন দিতেন সে কথাও ভেবে দেখার মতো।

তাঁর মতে "কাব্যলক্ষ্মী বাস্তবী, প্রত্যক্ষদর্শনা। তিনি সাম্প্রতিকী, তাঁর অন্যমূর্তিও আছে। কিন্তু তাঁকে দেখবার আলো চাই,—সেই আলোকের আকাশ কেবলমাত্র ঘটনায় নেই।"

'কেবলমাত্র ঘটনায়' যে সেই 'আলোকের আকাশ' নেই—এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত হবেন না। কাল তাঁকে লেখায়, স্বভাবও তাঁকে লেখায়—এই দ্বৈত সত্যকেই তিনি স্বীকার করেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রবন্ধমালায় এজরা পাউণ্ড, য়েট্‌স, জয়েস, হিন্দুস্তানের কবি ইকবাল, বীরসিংহ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকের কয়েকটি মনোজ্ঞ আলেখ্য আছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সমর্থক এই অপরাধে মার্কিন মনোভবনে পাউণ্ডকে বন্দী করে রাখার সময় লেখক একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণে পাউণ্ড ও তাঁর কবিতার মূল সুরটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সূত্রে সে সময় প্রকাশিত পাউণ্ডের pisan cantos নিয়ে লেখক

মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। এই কাব্য থেকে দু' একটি ছোট ছবি উদ্ধৃত করি।—

'Your eyes are like the clouds over Taishan
when some of the rain has fallen,
and half remains yet to fall.'

*　　　　*　　　　*

'Morning moon against Sunrise
like a bit of the best antient Greek Coinage.'

*　　　　*　　　　*

'When the mind swings by a grass-blade
an ants forefoot shall save you
the clover leaf smells and tastes as its flower.'

এই কবিতাই কবিকে বন্দীশালায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। শ্রীচক্রবর্তী এক জায়গায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর গীতাঞ্জলির তর্জমার মধ্যে দিয়ে, দু'চারটি ইংরেজি প্রবন্ধে ও বিশেষ করে এজরা পাউণ্ড ও য়েট্স্-এর মধ্যে দিয়ে কী ভাবে এলিয়টের উপরে ক্রিয়াশীল তা খানিকটা বোঝা যায়, কিন্তু অনুশীলনের বিষয়।···

···লর্কা এবং প্রাচীনতর ভালেরির শেষদিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রপ্রভাবান্বিত ত্রয়ী ইংরেজি কবির অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা কঠিন নয়।"

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথের উপরে বিদেশী কবিদের সূক্ষ্ম ও সুদূরতম প্রভাব আবিষ্কারের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে যে আন্দাজে ম্রিয়মান হতে হয়, লেখকের মন্তব্যে ততখানিই সান্ত্বনা লাভ করা যায়।

এলিয়টের ফোর কোয়ার্ট্রেটস্ ও কবি য়েট্স্-এর সম্বন্ধে আলোচনা দুটিও সুন্দর। য়েট্সের কবি-জীবনের ক্রমপরিণতির পর্যালোচনা করেছেন লেখক আলোচনা করেছেন, পাউণ্ডের প্রভাবে তাঁর রীতিবদলের কথা। পাউণ্ডের এই 'শিক্ষকতা' ছিল এলিয়টেরও সাফল্যের মূলে।

দিগ্বিজয়ী পাউণ্ড যেন নতুন নতুন পথ কেটেই ক্ষান্ত। কিন্তু এলিয়ট ও য়েট্স্-এর ঘরণী মন সময়মতো সোনালী ফসল নিজের নিজের গোলায় তুলতে সক্ষম হয়েছে।

পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক তাঁর 'জিভাগো' উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন, এ যেন "সংকীর্ণ অর্থে চৈতন্যসাধন—কেবলমাত্র যা মনস্তাত্ত্বিক, বা সৌন্দর্যপিপাসায় অবসরহীন—মানুষের পূর্ণদৃষ্টিকে ব্যাহত করে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের প্রতিভা অন্যতর। অনুভূতির সূক্ষ্মতম তারে কবি কালিদাস বা শেলী ধরেছিলেন মানবচিত্তের ভবিষ্যৎ। দুঃসাধ্য জাতীয় অথবা মহাজাতীয় বিপর্যয়-পারগামী উজ্জীবনকে পাস্টেরনাক এখনো গূঢ় অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন না।"

উপরন্তু এই উপন্যাসে জিভাগোর অপ্রত্যাশিত চারিত্রিক ভগ্ন বিলাসিতা লেখককে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। "একদিকে ধার্মিক গোঁড়ামি অন্যদিকে জিভাগো চরিত্র মানবিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উদভ্রান্ত বা ক্লান্ত ঔদাসীন্যে ক্ষয়শীল।" বিশেষত প্রেমকে রক্ষা করার মতো পৌরুষের অভাব বা ঔদাসীন্যের জন্যে জিভাগোকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। তাঁর মতে, আর্টের সঙ্গে সমগ্র মানুষের এবং সমাজের যে যোগসূত্র আছে তার উজ্জ্বল পরিচয় এখানে অনুপস্থিত এবং চিত্তধর্মের অভাব সেখানে মানবধর্মের প্রকাশে বাধা দিয়েছে বলেই বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও পাস্তেরনাকের সৃষ্টি সার্থক হল না।

প্যারিসে জেমস জয়েসের সঙ্গে লেখকের আলাপচারীর বর্ণনায় জয়েসের চিন্তাশীল স্মিত ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে জয়েসের ভাষাচেতনার কৌতুককর উপভোগ্য দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন।

জয়েসীয় ভাষার কিছু উদাহরণ দিই :

Satisfiction (উপন্যাস পড়ার তৃপ্তি)

Bluey-Silver ; Rainbowl ; Silvamoonlake (দেখতে, অনুভব করতে)

Clapplause (চরম উৎসাহবাচকতায়)

Shampain (শ্যাম্পেন পানের পরের ভোরের অবস্থা ?)

এরকম 'portmanteau words' আরো আছে। যা লেখকের কথায় খ্যাপামি হতে পারে কিন্তু ঝোড়ো মেঘে সোনার পাড় বসানো। যা মনে বিদ্যুতের চমক লাগায়।

যে ক'জন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন, শ্রীচক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যতত্ত্বের আলোচনায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক ও শেষলেখা'র আলোচনায় অনেক মূল্যবান নতুন কথার সন্ধান পাওয়া যাবে।

এ ছাড়াও গান্ধীজীর সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ, আইনস্টাইন, য়োহান বয়ার, এইচ্. জি. ওয়েলস্ প্রমুখ মনীষী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারীর মনোরম বর্ণনায় গ্রন্থটি অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। য়োহান বয়ারের বাড়িতে অতিথি হয়ে লেখককে যেবার রাত্রি যাপন করতে হয় তখনকার একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করছি যাতে নরোয়ের ঔপন্যাসিকের অন্তর্নিহিত চরিত্রের মাধুর্য প্রতিভাত।

"আমি তার অতিথি, কোন দূরাগত সামান্য আগন্তুক, ভোরে উঠে দেখি আমার শোবার ঘরের দরজার বাহিরে তিনি অতি সন্তর্পণে আমার জুতোজোড়া রেখে যাচ্ছেন। য়ুরোপের নিয়ম, দরজার বাহিরে জুতো রেখে দিতে হয়; হোটেলের বা বাড়ির ভৃত্যরা পরিষ্কার করে তা সকালে রেখে দেয়। আমি একান্ত আশ্চর্য হয়ে কিছু বলবার পূর্বেই তিনি বললেন, আমি গরীবের ছেলে।" চরিত্র-চিত্রটি অবিস্মরণীয়। এই সেবার অর্ঘ্য, এই মানবিক করুণাই তাঁর সাহিত্যকে অপরিসীম দরদে ভরে দিয়েছে। এ ছাড়াও ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জ থেকে সেখানকার অধিবাসী ও জীবনযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত অন্নদাশঙ্করকে লেখা একটি চিঠি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধাবলী এই প্রথম একত্রিত আকারে প্রকাশিত হলো। কয়েক বছর পূর্বে 'কবিতা'য় 'শেষের কবিতার লাবণ্য' বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল মনে পড়ে। সেই আলোচনাটিও এই গ্রন্থে প্রকাশ করতে পারলে ভালো হত।

তাঁর সূক্ষ্ম ও সৎ শিল্প-ভাবনায় সমৃদ্ধ শুদ্ধ মানসিকতার সাহচর্যে স্বস্তি পাওয়া যায়। অজস্র বিষয়-বিস্তারে ও বিচিত্র আবেদনে বাংলা সাহিত্যে 'সাম্প্রতিক' সুমুদ্রিত একটি স্মরণীয় সংযোজন।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

যাঁদের জীবনের দিকে তাকিয়ে পয়লা নজরেই প্রেমে পড়া যায়, বাংলা সাহিত্যে তেমন লোকের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে স্বল্প। সেই স্বল্পের গোষ্ঠীর অবিসংবাদিত এক নায়ক নিঃসন্দেহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এক বিচিত্র মানুষ: প্রিন্সের নাতি এবং মহর্ষির ছেলে, অভিনেতা ও প্রযোজক-সংগঠক, বহুভাষাবিদ ও অনুবাদক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক, হাস্যরসিক ও গীতা-অনুরাগী, সুরস্রষ্টা ও চিত্রশিল্পী, স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যঙ্গকারী এবং পরবর্তীকালে পরিপোষক, দেশহিতে উদ্যোগী কর্মযোগী এবং বৈরাগ্যে দেশত্যাগী নিভৃতবাসী, বিবিধ ব্যবসায়ে সক্রিয় এবং জমিদারী পরিচালনে তৎপর, ফিজিয়নমিতে আগ্রহী এবং ফ্রেনলজির চর্চাকারী, আর তাঁর বিশিষ্টতম অনুজের চোখ ফোটাবার প্রধান আলোক-উৎস।

কিন্তু হয়তো এ সবই বাহ্য। তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এ সব কিছুকে ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর কোনো একটি বা একাধিক পথ ধরে এগোলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গভীরতম কেন্দ্রদেশে পৌঁছনো যায় না। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেমে পড়া যত সহজ, তাঁকে লাভ করা তেমনি দুরূহ। তাঁর কৃতি বহুমুখী, এবং তার চেয়েও বড় কথা: তাঁর কৃতির চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর বহুমুখ কৃতিখণ্ডকে উজ্জ্বল করেও উদ্বৃত্ত অযুত রশ্মির অধিকারী। সেই বহুবিচিত্র কৃতিকে ধারণ করা দুরূহ, আর ঐ অযুত রশ্মির পরিচয় নেওয়া দুরূহতর।

সেই রশ্মির প্রাণোত্তাপ পেয়েছেন তাঁর নিকটস্থ ব্যক্তিরা। কয়েক বছর আগেও হয়তো এমন লোক ছিলেন যাঁরা সেই প্রত্যক্ষ স্মৃতির অধিকারী। এখনও হয়তো এমন দু'এক জন আছেন যাঁরা এক-হাত-ফেরৎ পরোক্ষ স্মৃতির ভাণ্ডারী। দু-দিন বাদে সেই পরোক্ষ-প্রবাহও অবসিত হয়ে যাবে। আজও

সুশীল রায়: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু কথা গল্পের আকারে কোনো কোনো মহলে প্রচলিত, দু-দিন বাদে তা অবলুপ্ত হয়ে যাবে, অথবা প্রামাণ্যতার অভাবে পরিত্যক্ত হবে। অযুত রশ্মি ঢাকা পড়ে যাবে, পড়ে থাকবে স্বকীয় 'জীবনস্মৃতি', মন্মথনাথ ঘোষের লিখিত জীবনী এবং কয়েক খণ্ড গ্রন্থাবলী, যা সম্মিলিতভাবেও ঐ অযুত রশ্মির প্রতিনিধিত্ব করে না। এই কীর্তিখণ্ডকে নেড়ে-চেড়ে তার ওজন বুঝে নেবার চেষ্টা যে-কোনো গবেষকের প্রাথমিক কর্তব্য। সেই কাজে ভালো করে হাত পড়ল এই প্রথম। সুতরাং সুশীলবাবু ধন্যবাদার্হ। এবং এ ধন্যবাদ নিছক শুষ্ক কথায় না দিয়ে শাঁসালো আকারে দিয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ডি. ফিল্-এর খেতাব দানের মাধ্যমে। কিন্তু এই সাফল্যেই যেন সুশীলবাবু আত্মতৃপ্ত হয়ে না পড়েন। তাঁর আরো একটা ধাপ যাবার আছে। জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনের ঐ অযুত-রশ্মির সমুদ্রে তাঁর অবগাহন কাম্য। এ প্রত্যাশা যে শুধু আমাদেরই তা নয়। সুশীলবাবুর থীসিসে প্রোমোটার ডঃ সুকুমার সেনও সুশীলবাবুকে সেই দুর্গম-যাত্রার আহ্বান জানিয়েছেন গ্রন্থের ভূমিকায়। ডঃ সেন বলেছেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা ও শিল্পের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে বেশি টানে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক জানতে ইচ্ছা করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমার কেমন tragic figure বলে মনে হয়। তাঁর মধ্যে যেন একটু বিষাদ ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র খেই ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন লুকিয়ে পড়লেন। সুশীলবাবু তাঁর জীবনী-সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে তৃপ্তি হল না। অনুরোধ করি, তিনি যেন আরও বছর-কয়েক গবেষণা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-মানুষটির জীবনী রচনা করেন। এ কাজে সুশীলবাবুরই অধিকার।" এই অতৃপ্তি ও অনুরোধ পাঠকদের সার্বজনীন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিষাদ যদি কিছু থেকে থাকে, তা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর নয়। তিনি মাইকেল মধুসূদনের মতো উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না, স্বভাবে তিনি আত্মপ্রচার-বিমুখ, কিছুটা রিজার্ভ। প্রথম জীবনে তাঁকে স্বচ্ছল, প্রাণবন্ত ও আনন্দময় বলেই মনে হয়—অন্তত কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দৃশ্যত তাই। কিন্তু কোথায় সেই অন্তরশায়ী গভীর বিষাদরেখা যা উভয়কে মৃত্যুর দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত করে দিল? যে-ডোর 'ভারতী'-র তোড়ার ফুলগুলিকে বেঁধে রেখেছিল, সেই ডোরের মধ্যেই চিড় খেয়ে গিয়েছিল কেমন করে? মৃত্যু আকস্মিক, কিন্তু অন্তরালে তার ক্ষেত্র-প্রস্তুতি নিঃসন্দেহে দীর্ঘকালীন। মৃত্যুর আগেই একটি

বেদনাধারা উভয়ের মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রবাহিত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেমজীবনের এই ধারা প্রায় সবটুকুই লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। কাদম্বরী দেবী তাঁর জীবনে ও মরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কতখানি স্পর্শ করেছিলেন, তা আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। ইদানীং কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা সবটুকুই রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বোঝবার জন্য নয়। কিন্তু এটি জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনের এমন একটি গ্রন্থি, যা মোচন না করলে তাঁর জীবনের ভেতর-মহলে ঢোকবার ছাড়পত্র পাওয়া দুরূহ। এই মৃত্যুর প্রভাব তাঁর জীবনে কতটা কীভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তাও পুরো আমরা জানি না। শুধু জানি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথসহ ভারতী-গোষ্ঠীর সকলে 'ভারতী' বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীর পাতায় জানালেন: 'ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।' অবশ্য স্বর্ণকুমারী দেবী এই সঙ্কটকালে 'ভারতী'র হাল ধরে তাকে রক্ষা করেন। আর জানা যায় যে স্ত্রীর মৃত্যুর এক মাস চার দিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বরিশালে স্বদেশী ষ্টিমার চালাতে গিয়েছেন। আর জানা যায় যে তিনি জীবনে পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নি। এই সব ঘটনার কতটা মৃত্যুবিষাদ-প্রভাবিত, কতটা তাঁর স্বধর্ম, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

দ্বিতীয় বিস্ময়, তাঁর কর্মজীবন, বা কর্মকে অবলম্বন করে তাঁর বিশেষ মানসিকতা। তিনি অজস্র রকমের কাজে হাত দিয়েছেন, খুব জোরালোভাবেই আঁকড়ে ধরেছেন কাজগুলোকে এবং খুব দ্রুত সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু কিছুটা সফল হয়েই তা তিনি প্রায় পরিত্যাগ করেছেন, চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য বা যশের জন্য তাঁর অভীপ্সা ছিল না। বিষাদ মাত্র নয়, যেন তার চেয়েও গভীর কিছু, এক ধরনের ঔদাসীন্য তাঁর অন্তরে বাস করত। দেশহিতকর্মে তিনি বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু একদিন কলিকাতা ত্যাগ করে নিভৃতবাসী হলেন। সাহিত্যের যশ যখন তাঁর দ্বারপ্রান্তে আগত, তখন তিনি সাহিত্য থেকে প্রায় অবসর গ্রহণ করলেন। মধুসূদন বেশি দিন বাঁচলে সাহিত্যে হয়তো প্রত্যাবর্তন করতেন, এবং তাঁকে 'অলিখিত মহাকাব্যের কবি' বলে অন্তত আমরা কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছি, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহাল তবিয়তে সাতাত্তর বছর বেঁচে থেকেও কোনো পূর্ব-আগ্রহের কর্মে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন না করে আমাদের সে-সান্ত্বনা থেকেও বঞ্চিত করে রেখে গেছেন।

তৃতীয়ত, তাঁর শেষ জীবনে রাঁচির 'শান্তিধাম'-এ স্বেচ্ছা-নির্বাসন ও

বাণপ্রস্থের মূলে কি গভীর কোনো বিষাদ ছিল? যৌবনে তিনি জীবনকে এত সপ্রেম আলিঙ্গনে বেঁধেছিলেন যে বাণপ্রস্থ যেন তার সঙ্গে খাপ খায় না। মধ্য যৌবন থেকেই একটা নিঃসঙ্গতা যেন তাঁকে ঘিরে ধরছিল। কাদম্বরী দেবী নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, একটি সন্তানও তিনি রেখে যান নি, ভাই-বোনেরা স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। কলকাতাতেই তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে ছিলেন। তাকেই সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে তিনি মোরাবাদী পাহাড়ে চলে গেলেন। সেখানে তিনি গীতারহস্যের অনুবাদ করেছেন, সম্পাদকদের অনুরোধে কিছু লিখেছেন এবং ভগবৎ-উপাসনা করেছেন। কিন্তু যৌবনের উত্তাপ যতই কমে যাক, তখনও স্নেহ-ভালোবাসার তৃষ্ণা তাঁর ছিল, সে-অভাব তিনি বোধ করতেন। তাঁর স্বভাব এই অভাবকে কোনো সময় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে দেয় নি। তবু দু-একটি চিঠির মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। তাঁব মৃত্যুর কিছু দিন আগে তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীকে একটি চিঠিতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযত নিম্ন কণ্ঠে জানিয়েছিলেন :

ভাই স্বর্ণ

তোমার আন্তরিক শুভকামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করলুম। মেজদাদা গেলেন, দিদি গেলেন, শরৎ গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা।...যতই দিন যাচ্ছে, যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্ছে, ততই স্নেহ-ভালোবাসার লোকদের আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ-ভালোবাসার মর্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি। এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

স্নেহের

নতুন দাদা

নিঃসঙ্গতা আর ঈষৎ বিষাদের ক্ষীণ একটা স্বর যেন একটু আড়াল থেকে কথা বলছে বলে মনে হয়। সেই আন্তর স্বর ভাষা পাক সুশীলবাবুর লেখনীতে—ডঃ সেনের সঙ্গে আমাদেরও এই প্রার্থনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক অবহেলিত মানুষ। সঙ্গীতে তিনি বিস্মৃত। চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে তাঁর নামোল্লেখও করা হয় না। (যেমন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত স্টাডিজ্ ইন্ দি বেঙ্গল রেনেসাঁস গ্রন্থে শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী বাংলা

দেশের চিত্রশিল্পে রেনেসাঁস বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামও উল্লেখ করেন নি।) নাটকের ইতিহাসগুলিতে মাত্র তাঁর এবং তাঁর নাটকগুলির নাম খুঁজে পাওয়া যায়। বসন্ত চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত 'জীবনস্মৃতি' এবং মন্মথনাথ বসুর জীবনীর পরে তাঁর সম্পর্কে কোনো বই লিখিত হয় নি। এই বই দুটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নানা কারণে সীমাবদ্ধ। সুতরাং সুশীলবাবুর বই হাতে পেয়ে যে কেউ খুশি হবেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন। সুশীলবাবু একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক। তাছাড়া বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত থাকায় বহু মালমসলা তাঁর কাছে সুগম। এই সুযোগকে তিনি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকখানি ছবি এ বইয়ের সম্পদ। মন্মথনাথ ঘোষের বইতেও ছবি ছিল, কিন্তু পুরনো আমলের ব্লক এবং ছাপায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষিত হয় নি। সুশীলবাবুর বইয়ের ছবি সে দিক থেকে এক কথায় চমৎকার। পরিশিষ্টে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের একটি তালিকা করেছেন সুশীলবাবু—বিভিন্ন বইয়ের সহায়তায়। আর একটি তালিকা ছবির—বর্ষানুক্রমিক পূর্ণ তালিকা। এটি সঙ্কলনে সাহায্য করেছেন অসীমকুমার ঘোষ। ভবিষ্যতে যাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান ও ছবি নিয়ে চর্চা বা আলোচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে এই তালিকা দুটি বিশেষ মূল্যবান—প্রায় অপরিহার্য বলা চলে।

বইটির কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

(১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবহেলিত ঠিকই। কিন্তু এই জাতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থের পক্ষে আক্ষেপ করেছেন লেখক অত্যন্ত বেশি। 'লেখকের কথা', ১, ২, ৩, ৪, ৫৯, ১১৪, ১৬৫, ১৭৩ ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় এই আক্ষেপ আছে।

(২) খোঁজ করলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিঠি এখনও পাওয়া সম্ভব। সেগুলি সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যেতে পারে। একটা হদিশ আমি দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ-প্রিয়নাথ পত্রাবলী সংগ্রহ ও সম্পাদনার সময় প্রিয়নাথ সেনকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারখানি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। শুনেছি, এই পত্রে সঙ্গীত-সমাজ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কথা বলেছেন। এই পত্রের জিম্মাদার খুব সম্ভবত প্রিয়নাথ-পুত্র শ্রীপ্রমোদ সেন।

(৩) বইতে নানা জায়গায় অহেতুক পুনরুক্তি আছে। তার একটা

কারণ—অধ্যায়-পরিকল্পনার ত্রুটি। যেমন, 'সমসাময়িক সমাজ ও কাল' এবং 'সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব' নামে দুটো আলাদা অধ্যায়-এর প্রয়োজন আছে কিনা সন্দেহ।

(৪) সমসাময়িক দেশ-কালের বিস্তৃত আলোচনা আছে বইটিতে। কিন্তু তার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংযোগ ও সম্পর্কের দিকটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি সর্বত্র।

(৫) অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য। অনেক নাট্যানুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্গালী নাম-ধাম-পরিস্থিতির ভিত্তিতে মুক্ত ভাবানুবাদ করেছিলেন। সেই সব ক্ষেত্রে এই তুলনা আরো বেশি জরুরী।

(৬) সুশীলবাবু লিখেছেন, "রাধাকান্ত দেব…স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক নামে একটি বইও রচনা করেছেন।" (পৃঃ ১২৫)

কিন্তু এ বই-এর রচয়িতা রাধাকান্ত দেব নন, পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার রাধাকান্ত দেবের জীবনীর ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) 'স্বপ্নময়ী'-র সংলাপ অনেকটা পদ্য ছন্দে লেখা। নাটকে কবিতার ভাষা ব্যবহারের ফল কেমন হয়েছিল— এ-আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল।

(৮) গবেষণামূলক গ্রন্থে যে রেফারেন্স বইগুলির উল্লেখ থাকে, তাতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সুশীলবাবু পাদটীকার রেফারেন্স-গ্রন্থগুলির একটিতেও পাতার সংখ্যা বসান নি।

(৯) পরিশিষ্টে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে রচনাপঞ্জী দেওয়া হয়েছে তাতে জনপ্রিয় বসুমতী সংস্করণের গ্রন্থাবলীর (১-৫) নাম উল্লেখ করা হল না কেন বুঝলাম না। এই সংস্করণের ত্রুটি আছে, এবং সব বইও অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতগুলি রচনা এতে স্থান পেয়েছে। ফলে সংস্করণটির গুরুত্ব আছে।

(১০) তত্ত্ববোধিনী, বালক, সাধনা, সাহিত্য, পুণ্য, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), সমালোচনী, ভাণ্ডার, মানসী ও মর্মবাণী, বঙ্গবাণী, মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত লেখার কতকগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই লেখাগুলির একটি তালিকা করা এবং সেগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ দরকার ছিল।

(১১) 'আত্মগঠন' অধ্যায়ে সুশীলবাবু লিখেছেন, "গীতার চর্চা গৃহে হয়েছে।" এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্য, এই সঙ্গে কেন যে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করলেন না বুঝলাম না। সত্যেন্দ্রনাথও গীতা-অনুরাগী ছিলেন, এবং ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন। ১৯০৫-এর জানুয়ারিতে এর প্রথম সংস্করণ বেরোয়। দ্বিতীয় সংস্করণ কন্যা ইন্দিরা দেবীর সহযোগিতায় ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত সংশোধন করে গিয়েছিলেন।

(১২) নব রত্নমালা সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ। সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রিয়ম্বদা দেবী প্রকাশ করেন ১৯২৫-এ। এতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচনা ছিল। এ বইটির উল্লেখ নেই রচনাপঞ্জীতে। এই সূত্রেই উল্লেখ করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্র-অনূদিত তুকারামের অভঙ্গের আলোচনাও বাদ পড়েছে।

(১৩) নবনাটক অভিনয়ের ন্যাশনাল পেপার কৃত সমালোচনা উদ্ধৃত করেছেন সুশীলবাবু। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট-এর সমালোচনা উল্লেখ করেন নি—খুব সম্ভবত সেখানে নটীবেশী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল বলে (···singing, we must confess, was not up to the mark)। আমার মনে হয়, এর উল্লেখ থাকলে কোনো ক্ষতি ছিল না। উনিশ বছর বয়সে একটি অভিনয়ে গান খারাপ গাইলেই (সমালোচকের মত যদি সত্য হয়) সঙ্গীত সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সব কৃতিত্ব ক্ষুন্ন হয়ে যায় না। বিশ্বভারতী পত্রিকা (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ) এবং জ্যোতিরিন্দ্র-অনুরাগী জীবনীকার মন্মথবাবুও এটি উল্লেখ করেছেন।

(১৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "সঙ্গীতে তাঁহার বিশিষ্ট দান—বাংলা গানে নূতন রীতিতে সুর-সংযোজনা। এই রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথে।"

রবীন্দ্রনাথও জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা

নিয়মের মধ্যে মন্দ গতিতে দস্তর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। স্বরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"

এই প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করিয়ে নতুন শক্তির সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু সুশীলবাবু সে-প্রত্যাশা পূরণ করেন নি।

(১৫) বীণাবাদিণী ও সঙ্গীতপ্রকাশিকা পত্রিকা দুটির গুরুত্ব অসামান্য। এ দুটি পত্রিকার পুরনো ফাইল মন্থন করে (যতটা সম্ভব) আলোচনা একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে আলোচনা দুঃখকরভাবে কম—ব্রজেন্দ্রনাথের একান্ত তথ্যধর্মী প্রবন্ধেও (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ২) এর চেয়ে বেশি আলোচনা আছে।

(১৬) নাট্য-আলোচনা অত্যন্ত দুর্বল। যেমন, পুরুবিক্রম সম্পর্কে সুশীলবাবু বলছেন: "যাই হোক, নাটকটি নাট্যরসে ভরা। আঘাত-প্রতিঘাত প্রেমপ্রীতি দেশদ্রোহিতা দেশানুরাগ চক্রান্ত—সবই এখানে বিদ্যমান।" নাট্যরসের এই-ই 'সব' কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

(১৭) 'পুনর্বসন্তে' শেকস্‌পিয়র-এর 'এ মিডসামার নাইটস ড্রীম'-এর ছায়াপাত ঘটেছে। শ্রীসুকুমার সেনও এ-কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯) কিন্তু সুশীলবাবু এ নিয়ে আলোচনা করেন নি।

(১৮) শেকসপিয়র্ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান প্রেরণা, নানা লেখক নানাভাবে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ পেয়েছেন। অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ প্রধান সাহিত্যরথীরা। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জুলিয়াস সিজার' অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক, এবং খুঁটিয়ে আলোচনা করলেও আমরা আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। কিন্তু সুশীলবাবু সেদিকে এক পা-ও অগ্রসর হন নি।

(১৯) রজতগিরিনন্দিনী-র একই বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনখানি নাটক আছে (হরচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ)। এদের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

(২০) 'অশ্রুমতী'-তে প্রতাপ-কন্যার সেলিম-প্রীতির জন্য নানা বিরুদ্ধ আন্দোলন হয়েছিল। আর সেই সঙ্গেই লক্ষণীয় যে অশ্রুমতী মঞ্চে সাফল্য ও

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই বৈপরীত্যের মীমাংসার একটা চেষ্টা করতে পারতেন সুশীলবাবু।

(২১) মঞ্চে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক কেমন সাড়া পেয়েছিল, তা তখনকার পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্র থেকে সংকলনের একটা চেষ্টা করতে পারতেন সুশীলবাবু। যেমন, সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী (এবং জ্যোতিরিন্দ্র-নাটকেরও নায়িকা) বিনোদিনী 'রূপ ও রঙ্গে' 'আমার অভিনেত্রী জীবন' শীর্ষক স্মৃতিকথায় সরোজিনী-অভিনয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই রকম মন্তব্য সংগ্রহের দিকে একটা নজর দিলে ভালো হত।

(২২) সুশীলবাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কোনো আলোচনা করলেন না কেন বুঝলাম না।

(২৩) প্রায় দেড় হাজার ছবির উপর আলোচনা মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠা। তাতেও রোটেনস্টাইন এবং অবনীন্দ্রনাথের পুরাতন লেখা দুটির উদ্ধৃতিই প্রধান।

(২৪) পরিশিষ্টে অশ্রুমতী ও গীতা-অনুবাদ প্রসঙ্গে চিঠিপত্রগুলি অত বিশদভাবে সাজিয়ে দেওয়ার সার্থকতা কি। সবগুলি চিঠিই তথ্য হিসাবে পুরাতন—মন্মথবাবুর বইতে সংগৃহীত। পুরাতন তথ্য তো সাধারণত সংক্ষিপ্ত উল্লেখেরই দাবি রাখে।

(২৫) সুশীলবাবু লিখেছেন, "দেশের জমিদারেরাই যখন দেশ সম্বন্ধে উদাসীন তখন দেশের মাটিতে দেশানুরাগ দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।" (পৃঃ ১৩২)। মন্তব্য অনাবশ্যক।

(২৬) ডিরোজিয়ো সম্পর্কে সুশীলবাবু লিখেছেন, "হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর (ডিরোজিয়োর) এক শিষ্যদল। মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করে তাঁরা দেশের ধর্ম ও সংস্কারকে সেকালে আঘাত করেছিলেন। ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভাঙনের নেশা হয়তো লাগিয়েছিলেন, চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে হয়তো গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রচিত এই কবিতা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতিও সঞ্চার করেছিলেন। এ দিক থেকেও ডিরোজিওর স্থান সামান্য নয়।" (পৃঃ ১৩৫) ডিরোজিয়ো সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বল মূল্যায়ন।

(২৭) সুশীলবাবু লিখেছেন, "দেশপ্রাণতা জিনিষটা আজ কাল বা পরশুর জিনিষ নয়—এ চিরকালের মানুষের মনের একটা চিরকালীন বোধ।" (পৃঃ

১৬৮) সমাজতাত্ত্বিকেরা অবশ্য একে 'চিরকালীন' বলে স্বীকার করেন না। বরং বলেন, দেশপ্রাণতা জিনিষটা অনেকটা আধুনিক কালের।

(২৮) 'বঙ্গসাহিত্যে দান' অধ্যায়টি অত্যন্ত দুর্বল।

(২৯) ডিরোজিও-র নাম 'হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও' নয়। (পৃঃ ১২৫) হেনরীর পরে 'লুই' শব্দটি আছে।

(৩০) ডিরোজিয়ো এবং তাঁর ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানের নাম 'অ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশন' নয় (পৃঃ ১২৫), অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।

(৩১) সুশীলবাবু লিখেছেন, "এই মানুষটির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) বিষয় চিন্তা করলেই আমাদের মনে হয় রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের কথা।" (পৃঃ ১৯৩) কি জানি, আমার তো মনে হয় না। বরং ওটা চিন্তা করলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছায়া আমার মনে যেমন আছে, তা অত্যন্ত বিকৃত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

(৩২) বইটির ভাষা মাঝে মাঝে হালের রম্যরচনা-ধর্মী হয়ে বিষয় অনুপাতে লঘু হয়ে পড়েছে। সুশীলবাবু কবি, শব্দ-ব্যবহারে তাঁর মনোযোগ বেশি দেওয়ার কথা। কিন্তু তা বোধহয় তিনি দেন নি। নিছক গবেষক হলে তাঁকে এ কথা বলার দরকার হত না। কিন্তু সুশীলবাবুর বড় পরিচয় শিল্পী হিসেবে। তাই কথাটা এসে পড়ল।

পরের সংস্করণে এই সব দিকে একটু দৃষ্টি দিলে সুশীলবাবু আমাদের কাছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উজ্জ্বলতর রূপ উদ্‌ঘাটিত করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

দেবেশ রায়

"অশ্বমেধের ঘোড়া" : দীপেন্দ্রনাথ

বাংলাদেশের আবহাওয়া এখন ব্যবসায়ী স্বদেশপ্রেমে মাতাল। সাহিত্যস্রষ্টা এখন সাহিত্যিক নন, খবরের কাগজের মালিক। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র, অর্থবান প্রকাশক প্রতিষ্ঠান, সরকারী বদান্যতা-পুষ্ট স্কুল-কলেজের ও আধা সরকারী গ্রন্থাগার—এই তিনের পাপচক্রে সৃষ্টিশীল সাহিত্য এখন আকাশকুসুম, এই তিনের অনুগ্রহ-বঞ্চিত জীবন্ত সাহিত্যিক এখন এদেশে খুঁজে পেতে হলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দক্ষতাও যথেষ্ট নয়।

যে-সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক এদেশের সাহিত্যের একচেটিয়া ইজারাদার, তার কোনোটিতেই কোনোদিন স্বনামে ও বেনামে দীপেন্দ্রনাথের কোনো গল্প প্রকাশিত হয় নি। যে-সকল পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, সেগুলো আকারে শীর্ণ, প্রচারে সীমিত, ও ছাপাই-বাঁধাইয়ে দরিদ্র। সে-সকল পত্রিকার একমাত্র গুণ : বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে তাঁরা বিশ্বভাবনার সঙ্গে যুক্ত করতে চান। 'পরিচয়' 'নতুন সাহিত্য'—এই দুটিই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাংলা-সাহিত্যের একজন লেখক অনেকেই এ-বিষয়ে অবহিত নন।

যাঁর দখলে দৈনিক পত্রিকার প্রচার নেই, সেই পত্রিকার তৈরি বাজার নেই, এমনকি পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে সমালোচিত হবারও নিশ্চয়তা নেই—তেমন একজন লেখকের—এই অসময়ে, যখন খবরের কাগজের কলম ও সাপ্তাহিকে পাতা অনুযায়ী নগদমূল্যে ব্যবসায়ী স্বদেশপ্রেম প্রচারই পরমপুরুষ থেকে হাঙ্গরি জেনারেশন পর্যন্ত সকল 'সাহিত্যিকের' ব্রত—একটি মৌলিক গল্পগ্রন্থ বের করার হিম্মত এক মহাদুঃসাহসী শিল্পীরই থাকতে পারে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতির পাতায় শিল্পী নেই, স্বাধীনতা নেই। শিল্পী তাঁর স্বাধীনতা নিয়ে আছেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'য়। শিল্পী যা বিশ্বাস করেন ও

অশ্বমেধের ঘোড়া। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৃজনী কলকাতা। ২.৫০ ন. প.।

যা লিখবেন তার ওপর কারো হুকুম চলবে না, তা সে যত বড় কর্তাই হোক না কেন? আর সে বিশ্বাস যদি মানবতায় বিশ্বাসের মাটি থেকে রস নিয়ে বেঁচে থাকে, তবে ছুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই তাকে পরাস্ত করে।

এ কথাগুলো দীপেন্দ্রনাথের মনে ছিল বলেই কি তিনি এই বইয়ের নাম দিয়েছেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। এই সৃষ্টিশীলতাকে রুখবার দম্ভ করতে কে সাহস করে?

গ্রন্থটির মধ্যে পাঁচটি গল্প আছে। পাঁচটি গল্পেই দীপেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা ধরা পড়ে।

১। মধ্যবিত্তেতর শ্রেণীকে নিয়ে ১৯৩০-এর পর তের-চোদ্দ বৎসর বাংলা-সাহিত্যে অসাধারণ গল্প রচিত হয়েছে। এই সময়কার বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ—বিষয়ের প্রসার। স্বাধীনতা লাভের পর, দিনে দিনে আমাদের সাহিত্য থেকে নিম্নশ্রেণী নির্বাসিত হয়েছে ও হচ্ছে। যাঁরা তাঁদের নিয়ে লিখেছেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। দীপেন্দ্রনাথের এই বইটিতে অন্তত একটি গল্পের (জটায়ু) চরিত্রগুলি নিম্নশ্রেণীর। আর একটি গল্পের চরিত্র অর্থগতভাবে প্রায় পুরোপুরিই নিম্নশ্রেণীর, মনোগতভাবে অর্ধ-মধ্যবিত্ত—'মৃত শহর। বসন্ত'। আরো একটি গল্প নিম্নশ্রেণীর দিকে গতিসম্পন্ন মধ্যশ্রেণীর শ্রেণীচ্যুতি নিয়ে রচিত—'প্রহরা'। বাকি ছুটি গল্পের চরিত্র মধ্যবিত্ত যুবক। সুতরাং বিষয়ের দিক থেকে দীপেন্দ্রনাথ নিজের শ্রেণীসীমাই শুধু উত্তীর্ণ হন নি, ১৯৩০-৪৫-এর বাংলা গল্পের একটা ঐতিহাসিক উপার্জনকে বহন করছেন।

২। তাই বলে তাঁর এই গল্পগুলি শুধুমাত্র শ্রেণীগত বা অন্তশ্রেণী চরিত্র নিয়েই নয়। তা যদি হতো, তাহলে ৩০-৪৫ এর গল্পগুলির অনুকরণ হত। বা ঐই গল্পগুলি শ্রেণীগত চারিত্র্যকে ফোটাবার জন্য একটি 'ক্রমশ প্রকাশ্য' ঘটনার নাটকীয় কাহিনীর আশ্রয়েও রচিত হয় নি। তা যদি হত, তাহলে ৩০-৪৫-এর গল্পের অনুকারকদের অনুকরণ হত। বাংলা গল্পের ঐ ঐতিহ্যকে দীপেন্দ্রনাথ নতুন সম্পদ দিয়েছেন।

'জটায়ু' গল্পটিকেই বিশ্লেষণ করলে দীপেন্দ্রনাথের উল্লিখিত ছুটি গুণ বলতে কী বোঝানো যদি পরিষ্কার হবে।

নেত্যচরণ স্বাধীনতা-দেশভাগ-দাঙ্গা ইত্যাদির পাকে-পড়া নিম্নশ্রেণীর একটি যুবক। ছুর্গাও তদনুরূপ একটি যুবতী। উভয়ের বিয়ে হয়েছে। ট্রেনে ট্রেনে

সুপুরি চোরাই চালানের সময় একবার নেত্যচরণের হাত কাটা যায়। দুর্গা তাকে খাওয়ায়। হাত কাটা যাবার পরও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সে বৎসরও কালীপুজোয় নেত্যচরণ নাচতে আসে। সেই নাচার ঘটনাটি গল্পের ঘটনা। যে ব্যাটাছেলেকে সুপুরির চোরাই চালান করতে হয় সে আর্থিকভাবে নিশ্চয়ই নিম্নশ্রেণীর। যে মেয়েকে রেস্টুরেন্টে কাজ করে সংসার চালাতে হয় সেও আর্থিকভাবে নিশ্চয়ই নিম্নশ্রেণীর। অথচ দীপেন্দ্রনাথ নেত্যচরণ ও দুর্গার দৈনন্দিন জীবনের কথা বা তাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বহু তথ্যের পরিচয় দেয়—এমন পথ এড়ালেন কেন? এই কারণে যে, তিনি শুধু একটি নিম্নশ্রেণীর জীবন জানানোর জন্য ছোট গল্প লিখতে বসেন নি। যে-জীবনসংগ্রামের অংশ ঐ নিম্নশ্রেণীর-ও জীবনসংগ্রাম, দীপেন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট তাই। সে-কারণে গল্পটিতে নেত্যচরণের নাচের এক একটা বিশেষ পর্বের অনুষঙ্গে দুর্গার জীবনের এক একটা বিশেষ পর্ব আসছে। নেত্যচরণ নাচ শুরু করেছে—দুর্গার মনে এসেছে দেশের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার, তার বাবাকে মেরে ফেলার ঘটনা। নেত্যচরণের নাচের দ্বিতীয় পর্বে দুর্গার মনে এসেছে নেত্যচরণের ঠুঁটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা। নেত্যচরণের নাচের তৃতীয় পর্বে দুর্গার মনে এসেছে রেস্টুরেন্টের কেবিনে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা। !!

এই যে নেত্যচরণের একটা, দুটো, তিনটে আগুনের বেড়ার মধ্যে ঘেরা-পড়া আর নাচার অনুষঙ্গে দুর্গার একটা, দুটো, তিনটে ঘটনার স্মৃতি—এই দুটি জড়িয়ে যাওয়া মাত্রই নেত্যচরণের নাচটা আর একটা ঘটনামাত্র থাকে না, হয়ে যায় প্রতীক। এবং তখন দুর্গা ও নেত্যচরণের জন্য কোনো আলাদা বাক্যও ব্যবহার করেন না লেখক: "নাচতে নাচতে নিত্যচরণ যেন দুর্বোধ্য বিস্ময়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। অজ্ঞাতে তার পা দ্রুত হয়ে উঠেছে।...দুর্গা স্তম্ভিত হয়ে দেখল নেত্যচরণের মাথা থেকে মালসাটা পড়ে গেল, যেন পরমবিরক্তিতে সে বাহুল্য ঝাঁড়িয়ে ফেলে দেবে।...ট্রেনের আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা যায়, বুঝি হাত বাড়ালেই দুর্গা ছুঁতে পারবে। কালো কালো পাথরকুচি, ক্ষয়া কাঠের তক্তা, চকচকে লাইন। ট্রেনের চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। নাট-বল্টুগুলো ঝনঝন করে বাজছে।...থরথর করে লাইন দুটো কাঁপছিল। থরথর করে খোয়াইগুলো কাঁপছিল। গাড়ির চাকা, নাট, বল্টু ঝনঝন ঝনঝন করে বাজছিল।" দুর্গা ও নেত্যচরণের অভিজ্ঞতার তফাৎ বোঝানো হয়েছে শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহারে। আবার যখন প্রতীক

হিসেবে ব্যবহার না করে ঘটনাটাকে বস্তুত ঘটনা হিসেবেই তিনি উপস্থিত করতে চান, তখনো তিনি অতি-স্পষ্ট : "নেত্য আজ সেজেছে। সাবান ঘষে ঘষে মাথার চুল ফাঁপিয়েছে। কপালে সিঁদুর দিয়ে ফোঁটা কেটেছে। গলায়, বাহুতে টকটকে পাকা জামের তুল্য ডবকা পুঁতির মালা।" ইত্যাদি। ৩০-৪৫-এর 'নিম্ন শ্রেণীর গল্পের' ওপর এই হচ্ছে দীপেন্দ্রনাথের যোগ। শ্রেণীগত বিষয়কে শ্রেণীর ওপরে জীবনের মধ্যে নিয়ে আসা।

অথচ এর কোনোটিই আঙ্কিক নিয়মে হচ্ছে না। দীপেন্দ্রনাথ মানুষকে, ঘটনার ভেতরের মানুষকে ধরতে চান। 'জটায়ু'তে এই ভেতরের দুর্গাকেই সবচেয়ে আগে পাঠকের সামনে তিনি দাঁড় করিয়েছেন। সে দুর্গা ভয় পায়। ভয়ের একটা অতি-উত্তেজনার মধ্যে দুর্গা আছে। কেন ভয়? এমনি সব আজেবাজে কারণে—"সেই ভয়টা, সেই ভয়টা। আবার। এখন। বুক ঢিবঢিব করছে।…ছুটির পর ফেরার পথে লোকটাকে স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে দেখেছিল। তার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা কুঁচকোল, হাসল।" কিংবা, "…নামবার সময় হঠাৎ দেখলো একটা যোয়ান ছেলে রেলিং ঘেষে দাঁড়িয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়ি ধরাতে ভুলে গেল। এই লোকটাই কি?" কেন এত অকারণ ভয়? "বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সব সময় কি একটা ষড়যন্ত্র চলছে বুঝতে পারি।" এই সূত্রে তারপর ধীরে নেত্যর নাচ ও দুর্গার জীবন। এই পদ্ধতিটাকে মনে রেখে গল্পটিকে অনুসরণ না করলে গল্পের শেষে এসে তালগোল পাকিয়ে যাবে। কেননা, সেখানে আগুনের বেড়ার ভেতরে নৃত্যরত নেত্যচরণই দুর্গার নিয়তি হয়ে গেছে। এ-সিদ্ধান্তে একমাত্র তখনই আসা সম্ভব যখন নেত্যচরণের আগুন আর দুর্গার জীবন এক বলে প্রমাণিত। এই আগুনের আলোতেই স্পষ্ট হয় রাবণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বিহঙ্গটি এই গল্পের শিরোনামে কেন? রামায়ণের সেই পক্ষী, আর নেত্য আর দুর্গা একই সংগ্রামের সঙ্গী।

'জটায়ু'-তে আমরা দেখি লেখক একটির পর একটি ঘটনা ত্যাগ করে শুধু চরিত্র আর বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চিত্রের যোগসূত্র কী ভাবে রচেছেন। ঠিক এর উল্টো ব্যাপারটা 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-য়। এ-গল্পটি একটি ঘটনা-ভিত্তিক : গোপনে-বিবাহিত স্বামীস্ত্রীর বিবাহ-বার্ষিকী উদযাপন। অনেকে মনে করেন ঘটনা-সৃষ্টির অক্ষমতাই লেখকদের ঘটনাবিমুখ করে। তাঁদের উচিত 'জটায়ু'র পরেই "অশ্বমেধের ঘোড়া" পড়া এবং বিশেষ করে ফিটনে

ওঠা থেকে গল্পের শেষাংশ পর্যন্ত কাঞ্চন-রেখার কথোপকথন ও ব্যবহারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা। তাহলেই দেখা যাবে সিচুয়েশন তৈরির কি অনায়াস-দক্ষতা দীপেন্দ্রনাথের কলমে: "...বন্ধ গাড়ি চলছে, বাইরে বৃষ্টি, আজ আমাদের বিবাহের প্রথম বার্ষিকী। আমার স্ত্রী রেখা—"...

"হাতের তেলোর ওপর মাথা রেখে ঘাড়টা পেছন দিকে ঈষৎ ঝুলিয়ে জানুর ওপর আড়াআড়ি করে পা ফেলে রেখা শিথিল ভঙ্গিতে বসেছিল। একগোছা ভেজাচুল টিকুলির মতো কুঁকড়ে ঝুলে আছে। গর্বে, আনন্দে, রেখা যেন রাজেন্দ্রাণী।

প্রায়ই আজকাল রেখাটা অপরিচিত মনে হয়।"...

'আঁচল সরে গিয়েছিল। একটা সেফটিপিন। কাঞ্চনের খুব ইচ্ছে হলো বলে, জামায় বোতাম লাগিয়ে নিতে পারো না? বলল 'কি দেখছ এমন করে?'

রেখা হাসল। বলল, 'জানো, আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম তোমার গলায় একটা তিল আছে।'

'এই অন্ধকারে?'

'হুঁ। যখন সিগারেট ধরালে, হঠাৎ তোমার'—"

এই এক একটা বাক্যের ধাক্কায় এমন একটি সিচুয়েশন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে যেখানে গল্পের শেষে এই তুজন স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে টাঙাওয়ালা বেশি পয়সা দাবি করে। দীপেন্দ্রনাথের সংলাপ রচনার শক্তি অসাধারণ। 'অশ্বমেধের ঘোড়া'তেই তার সবচেয়ে সুন্দর প্রমাণ আছে। সংলাপ-ই, এমনকি, এতোটা সিচুয়েশন গড়ে দিচ্ছে।

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটি সম্পর্কে আমার একটি আপত্তি: রেখা ও কাঞ্চন বিয়ে করেও কেন প্রকাশ করতে পারছে না সে কারণটি স্পষ্ট নয়। লেখক তু-একবার আভাসে রেখার ভয়, পরিবার ইত্যাদির কথা বলেছেন বটে কিন্তু মনে হয় যে এই কারণটিকে আরো স্পষ্টভাবে আনলে গল্পটির গঠন অনেক বেশি দৃঢ় হত।

গল্পের গঠনের দৃঢ়তার প্রতি দীপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। তার কোনো গল্পেই গল্পের মূলসূত্রের সঙ্গে যোগসূত্রহীন কোনো অংশ কিছুতেই পাওয়া যাবে না—তা সে অংশ আপাতদৃষ্টিতে যত বিচ্ছিন্নই হোক না কেন? 'মৃত শহর। বসন্ত' গল্পটির প্রথম ও উপান্ত অনুচ্ছেদ সহ ভেতরের অনেক অংশই তুর্বোধ্য মনে হয়। প্রথম অনুচ্ছেদেই শহরের মৃত্যুর বর্ণনা

দিচ্ছেন এইভাবে : "অনেকদিন ধরে ধুঁকছিল। তারপর মরে গেল। প্রথমে ঢাকনা উঠল। ধোঁয়া। পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া। পাতলা লোমের মতো সরু রেখা কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা, এবং তাতে সাপের দাঁত ছিল, যেন একটা বাঘের থাবা। আর দানবটা বেরুল। মুখ খিঁচিয়ে হাসল। বিচিত্র শব্দ করে হাসল।" ইত্যাদি। এই সাপ, বাঘ, দাঁত, কবরখানা ইত্যাদি দেখে-শুনে পাঠকের পক্ষে ভীত ও আতঙ্কিত হওয়া কিছুই বিস্ময়কর নয়। কিন্তু এরূপ একটি মৃত্যু আর কোনো এক অনির্দিষ্ট দানবের বের হওয়া আর শেয়ালগুলোর নিঃশব্দে শহরে ছড়িয়ে পড়ার বর্ণনার পরই পাঠক যদি চরণবাবুর বাড়িতে এসে দেখেন সেখানে আলো নেই, কুমারী বিলু পাগলিনী, এক বৃদ্ধ অন্ধ পরাজিত আঁকিয়ে চরণবাবু স্থবিরের মতো বসে থেকেও একটি পরস্ত্রীকে ভালোবাসেন, দূর থেকে ভালোবাসেন,—তাহলেও কি তিনি হদিশ করতে পারবেন না প্রথম অনুচ্ছেদের কবরখানার ঐ ধোঁয়াটে শেয়ালগুলো কোথায় আছে, মৃত্যুর আজ্ঞাবহ সেই ধোঁয়াটে দানবটা কি কি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। উপান্ত অনুচ্ছেদে লেখককে তাই সেই শহরের বসন্তের বন্যার কথা আবার বলে নিতে হয় :

"কবরখানাটা সমুদ্র হয়ে গেল। সমুদ্রমন্থন করে উঠল নীরবতার সুর। দেশবন্ধু স্কোয়্যার থেকে দেশপ্রিয় পার্ক এক লক্ষ সেতার একটি শোক হয়ে হেঁটে গেল। তারপর শোক ফুল হয়ে ফুটল।"

নইলে চরণবাবুর বাড়ির বসন্তের বর্ণনায় গল্পটা শেষ হতে পারত না : "আমার মনে হলো, ফিউজ না সারলে বিলুর কপালে চুলের যে-লতিটা কি একটা ফুলের মতো কুঁকড়ে আছে, তা-ই হয়তো চোখে পড়ত না।"

পাঠককে যদি এটুকু বিব্রতও না করতে হত নিঃসন্দেহে লেখক খুশি হতেন। কিন্তু এটা একটা সর্বজনীন দুর্ভাগ্য যে আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়েই সদা বিব্রত, লেখক আমাদের নিয়ে বিব্রত না হয়ে করেন কি? দীপেন্দ্রনাথের এই পাঁচটি গল্পের ভেতরকার যোগসূত্রই এই : তিনি আত্মপরিচয়লুপ্ত মানুষগুলির সঙ্গে আত্মপরিচয় সন্ধান করছেন। আত্মপরিচয়-সন্ধানী মানুষ দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্যের অন্বিষ্ট। এই অন্বেষণ বুদ্ধির পথ দিয়ে করা যায়। সে পথ বোধ করি কিছু সহজগম্য। দীপেন্দ্রনাথ নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকের আচরণে এই যন্ত্রণার ব্যাখ্যা করার চাইতে, এই যন্ত্রণাবিদ্ধ চরিত্রগুলির সঙ্গে তাদের আত্মার অনুসন্ধানে রত হতে ভালোবাসেন।

সুবোধ ঘোষ যখন সাহিত্যিক ছিলেন, 'গোত্রান্তর' নামে তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই পর্বে রচিত তাঁর আর একটি গল্পের বিষয়ও ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে পতিত একজন সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, ও তার সঙ্গিনীর মিলিত শ্রেণীচ্যুতি। এই কারণেই এ-গল্পদুটি বাংলাসাহিত্যের গর্ব, যে, সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ সাহিত্যে এসেছে, এবং এসেছে জীবনের ভাষ্য হিসেবে। দীপেন্দ্রনাথের 'প্রহরা' গল্পটির বিষয়ও এরূপ শ্রেণীপতন। গোত্রান্তরের নায়ক তার মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায়। এই স্খলন তার শ্রেণীর অন্তরঙ্গ দুর্বলতা। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? এই স্খলনের পর ব্যক্তিমানুষটির বিবেক, ব্যক্তিত্ব ও পাপবোধকে শান্ত করতে পারে কোন শ্রেণীবোধ। 'প্রহরা' গল্পটি এমন একজন মধ্যবিত্ত যুবকের কথা যে পারিবারিক দায় পালন করার জন্য অফিসের তহবিল তছরুপ করেছিল, সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বড়বাবুর ছেলে সেজে পরীক্ষা দিয়েছে—এবং এখন খুঁজে পাচ্ছে না সে কে, তার আত্মপরিচয় কি, সে বিমল না অমিয়? যে-চরিত্র নিজের নামটা পর্যন্ত জানে না, তার কথা লিখতে গেলে, এবং বুদ্ধিগত বিশ্লেষণে শেষ না করে সেই যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মপরিচয়লুপ্ত যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ফিরে যদি তার কথা লিখতে হয়—তবে লেখকের ঘাড়ে দায়িত্ব অর্শায় যে যে-করেই হোক এই যুবকটিকে এমন একটা জায়গার হদিশ দাও যেখানে সে তার আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার মন্ত্র জানতে পারবে। সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' শেষ হয় গোত্রান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই। দীপেন্দ্রনাথের গল্প শুরু হয় তার পর থেকে। গোত্রান্তরের পর সেই আহত আত্মাটিকে তিনি খোঁজেন।

নইলে 'স্বয়ংবর সভা'-র তিনবন্ধুর আড্ডাবাজিতেই অমন একটি সুন্দর গল্প গড়ে উঠত না। তিনবন্ধু মিলে গল্প করছে—কে কত খারাপ কাজ করেছে, কে কত আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছে, ইত্যাদি। তিনটি চরিত্রের একটি ঈশ্বরবিশ্বাসী, একটি ঘোর অবিশ্বাসী, একটি আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু তিনজনই সময় নামক ব্যাধের বাণবিদ্ধ তিন হংস—নিজের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পড়ছে, ক্রমাগত। তাই শেষ পর্যন্ত মেয়ে নিয়ে জুয়োখেলা। দেখা মেয়ে, শোনা মেয়ে, পথের মেয়ে, বেশ্যা, ফিল্ম স্টার—শেষ পর্যন্ত 'স্রেফ নামের ওপরে হোক। কানে শোনা, বইয়ে পড়া।'

অখিল হঠাৎ উঠে বসে সাজেস্ট করলো 'দ্রৌপদী।'··

সুধাংশু বললো ‘ভালো করে সাফ্‌ল করো।’

বিনয় ফিসফিস করে বললো ‘কাটো।’

তিনভাগে তাস পড়লো। ওরা দুজন নিজের তাস তুলে নিল। বাকি তিনটে তাসের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু ভাবল—সময়; বিনয় ভাবল, নিয়তি; অখিল ভাবল, আমি। তারপর দ্রৌপদীর জন্য শেষ বাজি আরম্ভ হলো।”

এই যে সময়-নিয়তি আর মানুষ জীবনকে জিতে নেবার জন্য লড়ছে, এই লড়াইয়ের মাঝখানে চরিত্রকে না-আনা পর্যন্ত দীপেন্দ্রনাথের ক্ষান্তি নেই। তাঁর প্রতিটি গল্পের শুরু আত্মপরিচয়লুপ্ত কতকগুলি কেন্দ্রহীন আপাত-বিশৃঙ্খল চরিত্র নিয়ে বা সিচুয়েশন নিয়ে, আর প্রতিটি গল্পের শেষ সেই লড়াইয়ের—যে লড়াই জিতে নিতে পারলে চরিত্র তার আত্মাটিকে ফিরে পাবে। এই মহৎ সংগ্রামের মধ্যে চরিত্রকে নিয়ে আসাই দীপেন্দ্রনাথের কমিটমেণ্ট। নইলে অনেকেই মজাদার ও রংদার শারীরিক গল্প লিখে থাকেন। তাঁদের গল্প মজা আর রঙেই শেষ। শেষে এসে একটা কমিটমেণ্ট উচ্চারণ করে না, যা শপথের মতো শোনাবে।

‘চর্যাপদের হরিণী’ ও ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’ আবার পড়বার পর শুধু বলতে পারি—দীপেন্দ্রনাথ লিখুন, লিখুন। আমরা পড়ি, পড়ি।

আজকের বাংলাদেশে সৎ-রচনার জন্য প্রার্থনার চাইতে বড় প্রার্থনা আর কি হতে পারে।

বইটির প্রকাশনা ব্যাপারে প্রকাশক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না। ছাপা-বাঁধাই খারাপ। মুদ্রণ-ত্রুটি প্রচুর।

গৌতম সান্যাল

শিল্প স্বাধীনতা ও সমাজ

কোনো ভাবাদর্শ অথবা মতবাদের যাথার্থ্য কেবল নিছক তাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণিত হয় না। ভাবাদর্শের প্রমাণের জন্য যে-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং তাত্ত্বিক যাথার্থ্যের যে-লক্ষণ করা হয় সেগুলিই উক্ত ভাবাদর্শ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। তবুও যখন কতগুলি প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা কোনো এক বিশেষ ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় নিষ্ঠা, সততা এবং শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তখন তা অভিনন্দনযোগ্য। এবং একথা শান্তি বসুর 'শিল্প, স্বাধীনতা ও সমাজ' গ্রন্থ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

শিল্প, স্বাধীনতা ও সমাজ—এই তিনটি বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনাই এই গ্রন্থের মূল বিষয়। প্রসঙ্গত লেখক 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'-এর দেশের আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্যের আলোচনা করেছেন, এবং উক্ত গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজনের (মূলত শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআবু সৈয়দ আইয়ুব এবং শ্রীঅম্লান দত্ত) ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। লেখকের মতে এঁরা সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছেন এবং রাজনীতির পাঁকে নেমেছেন। পরন্তু এঁদের রাজনীতি নিছক ব্যক্তিগত রাগ বিদ্বেষ জ্বালা দিয়ে তৈরি। কাজেই এঁদের আচরণ পরনিন্দার হীন গর্হিত আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। "তারাশঙ্কর ও শ্রীআইয়ুবদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হীন অপপ্রচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে" লেখক চীন-সংস্কৃতির মহত্ব বিষয়ে বিস্তারিত প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য "রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীর শিক্ষায় যেহেতু আমরা শিখেছি পর-সংস্কৃতির প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা থেকেই আত্মজ্ঞানের ও মর্যাদাবোধের জন্ম, চূড়ান্ত নোংরামি ও মনুষ্যত্বের অবমাননাতেও ভারতবর্ষ নিজের আত্মিক ঐশ্বর্য, সম্ভ্রম ও জীবনের শীল নষ্ট করবে না। প্রতিটি দেশ ও জাতির প্রাপ্য মিটিয়েই নিজের সিদ্ধিতে আত্মস্থ হবে। বর্তমানের দুর্দিন কখনই আগামীর সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে পারবে না।

কারণ আমরা জেনেছি ভারতবর্ষের 'মহৎ প্রহরী' বারবার ঘোষণা করেছেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' চীনের দুর্বিনীত সরকার ভারতের হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে কিন্তু সেই অপরাধের দায়িত্ব সমগ্র জনসাধারণের ও তাদের সংস্কৃতির নয়।" (পৃঃ ৪০) "আসলে শ্রীআইয়ুবরা স্বার্থের তাড়ায় ভুলতে চান যে···আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সুগভীর চারিত্র্যেই সাম্যবাদীরা ইতিহাসে স্থান পেতে যাচ্ছে।" (পৃঃ ৩০)

গণতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের বক্তব্য সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য হল সাম্যবাদের মতো গণতন্ত্রও আরেকটি ভুল তত্ত্ব। কাজেই সমাজ, স্বাধীনতা ও শিল্প বিষয়ে গণতান্ত্রিকদের বক্তব্য ও সাম্যবাদীদের বক্তব্যের ন্যায় বর্জনীয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্যটি লেখক ভূমিকাতেই প্রকাশ করেছেন। "শ্রীআইয়ুবরা যতই সাম্যবাদবিরোধী হন-না কেন, আসলে সাম্যবাদ ও ওঁদের বক্তব্যে কোনো ফারাক নেই। গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ ভালোমন্দ নিয়ে একই বৃক্ষের দুটি শাখামাত্র। আর বৃক্ষটি হলো ইওরোপীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারা।" (ভূমিকা, পৃষ্ঠা এক) তাঁর মতে এই দুই ভাবাদর্শই অপূর্ণ এবং ভ্রান্ত। "একমাত্র ভারতবর্ষের মহৎ সাধনা ও সিদ্ধিতেই আছে তমসা থেকে জ্যোতিতে উত্তরণের পথ।" এই ধারণার অনুবর্তী হয়ে লেখক জীবনের মূল ভিত্তিস্বরূপ তিনটি প্রত্যয়—সমাজ, স্বাধীনতা ও শিল্প বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দুঃখের বিষয় যতখানি গভীর আবেগে লেখক আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর কার্যে ব্রতী হয়েছেন ঠিক সেই পরিমাণে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট ও যুক্তিসিদ্ধ করে তুলতে পারেন নি।

দুই

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক 'সমাজ' প্রত্যয়ের আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ বিশ্লেষণের পর সমাজ-সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করে সেগুলির মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। এগুলি হল (১) মার্কসীয় মতবাদ (২) গণতান্ত্রিক মতবাদ (৩) হেগেলীয় মতবাদ ও (৪) ভারতীয় মতবাদ। সমাজ-সম্পর্কিত আলোচনাটি যথেষ্ট তথ্যবহুল এবং সেই হিসাবে মূল্যবানও; কিন্তু কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত দুর্বল পদ্ধতিতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। এরকম কতগুলি অংশের আলোচনা এখানে করার প্রয়োজন আছে।

মার্কসবাদ-প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন এলোমেলো উদ্ধৃতির সাহায্যে হরেক রকম প্রমাণ করা যায়। এবং তিনি নিজেই এই দোষে দুষ্ট করেছেন তাঁর বক্তব্যকে; পরন্তু তিনি যে সমস্ত উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করে না। লেখকের মতে: মার্কসবাদ অনুসারে মানুষ উৎপাদন-শক্তির দাস। অতএব, একটা যন্ত্রের অংশ মাত্র এবং এই বক্তব্যের দ্বারা মার্কস মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিলেন। উৎপাদন-শক্তির দাস বলতে লেখক কি বুঝেছেন জানি না—কিন্তু 'উৎপাদন-শক্তি' কথার অর্থ তিনি যদি মার্কসবাদে অন্বেষণ করতেন তাহলে দেখতে পেতেন উৎপাদন-শক্তি বলতে মার্কস যা বোঝাতে চেয়েছেন তাতে উৎপাদন-শক্তির অন্যতম অংশ হল মানুষ নিজেই। উৎপাদন-শক্তির প্রকৃত রূপ নির্ধারিত হয় মানুষের দৈহিক শক্তি, তার কর্মকুশলতা, তার শিক্ষা—এমনকি তার মানসিকতার দ্বারা। কাজেই মানুষ উৎপাদন-শক্তির দাস এই আশ্রয়স্থল থেকে লেখক যখন সিদ্ধান্ত করেন যে মানুষ যন্ত্রের অংশমাত্র এবং মানুষের মনুষ্যত্ব অস্বীকার করল—তখন এই কথাই বলতে হয় যে আশ্রয়স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে নয় তিনি অজ্ঞ অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবেই প্রকৃত তাৎপর্যকে তিনি বিকৃত করেছেন। দ্বিতীয়ত, লেখকের মতে মার্কস সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলিকে স্বীকার করলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথা স্বীকার করেন নি। এ-ধরনের মন্তব্যও মার্কসবাদ সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক। মার্কস সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা কোনো সময়েই অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলির রূপ এবং ক্রিয়াকলাপ মূলত উৎপাদন-কাঠামো ও তন্নিষ্ঠ বিভিন্ন সামাজিক ভাবাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। "মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব সামাজিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে" মার্কস-এর এ বক্তব্যটিও লেখক অজ্ঞতার জন্য অথবা বিকৃত করার ইচ্ছায় ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। লেখকের মতে এর অর্থ হল সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ জড়বস্তুর আচরণ অথবা মানবেতর অন্যান্য প্রাণীদের মতো নিছক যান্ত্রিক। প্রথমত বলা যেতে পারে যে "সামাজিক অস্তিত্ব" বলতে মার্কস সমাজের বিশেষ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাঠামোকে (যার ভেতরে ব্যক্তিগত মানুষের শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি, কর্মকুশলতা মিশে আছে) বুঝিয়েছেন এবং সামাজিক চৈতন্য বলতে তিনি সমাজাশ্রয়ী বিভিন্ন ভাবাদর্শকে বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, মার্কস একথাও অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে মূলত "সামাজিক

অস্তিত্ব" "সামাজিক চৈতন্য"কে নিয়ন্ত্রিত করলেও "সামাজিক চৈতন্য"ও "সামাজিক অস্তিত্ব"কে আচ্ছন্ন করে। তা যদি না হত তো মার্কস নিজেই "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ" স্বরূপ ভাবাদর্শের (যা "সামাজিক চৈতন্যের" অংশ স্বরূপ) কথা বলতেন না। সমাজের যে কোনো পর্যায়ে বিপ্লবের কথা এবং বিপ্লবোত্তর "সামাজিক অস্তিত্বে"র পরিবর্তনের কথাও নিতান্ত অর্থহীন হয়। বস্তু ও চৈতন্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলিও নিতান্ত তাঁর আত্মকেন্দ্রিক (solipsistic) ধারণা।

গণতন্ত্র সম্পর্কে শ্রীবসুর আলোচনার দুটি দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তাঁর মতে "পশ্চিমী গণতান্ত্রিক বক্তব্যের মূল কথাই হল সমাজ একটা চুক্তি।" শ্রীবসুর মতে যেহেতু গণতন্ত্র সমাজকে একটা চুক্তি বলে মনে করে—গণতন্ত্র সমাজকে হেয় জ্ঞান করে। 'সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'চুক্তি' শব্দটি আমরা যদি ব্যাপক এবং গভীর অর্থে দেখি তাহলে অন্তত 'সমাজ একটি চুক্তি' কেবল এই কারণেই সমাজবন্ধ সুদৃঢ় নয়—এরকম ভাববার কোনো কারণ থাকে না। গণতন্ত্র একটি আদর্শ অবস্থার চিত্র। কিন্তু কেমন করে এই অবস্থায় উপনীত হব—এ-সম্বন্ধে এ তত্ত্ব তেমন পরিস্কার নয়।

রাসেল সম্পর্কে শ্রীবসু মন্তব্য করেছেন: 'রাসেল, লক-হিউমের ঐতিহ্যে জারিত থাকায়, একবারও ভাবতে নারাজ যে শুধুমাত্র বর্তমান তথ্যের নজীরে সমগ্র সমাজের ক্রম ছকা যায় না,…।' যতদূর বুঝি রাসেল সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য যথার্থ নয়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই তা অনেকখানি স্পষ্ট হয়।

"History has perhaps its greatest value in enlarging the world of our imagination, making us, in thought and feeling, citizens of a larger universe than that of our daily preoccupations," (Russell's 'Reply to Criticisms in The Philosophy of Bertrand Russell', edited by Paul Aurthur Schilpp)

অথবা, আরও পরিষ্কার ভাবে খুঁজতে গেলে:

"There are certain social phenomena more especially those that are economic or statistical, where to a limited extent scientific laws can be discovered. But the limitations are always important." (Ibid)

মার্কসীয় ও গণতান্ত্রিক সমাজতত্ত্বের পর লেখক আলোচনা করেছেন হেগেলীয় ও 'ভারতীয়' সমাজতত্ত্বের আলোচনায়। হেগেলের বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তা অত্যন্ত অপরিস্ফুট থেকে গেছে। মার্কস-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন হেগেলের সমস্ত আলোচনাটাই ন্যায় কালের পরিমাপ নয়। অথচ হেগেলের তত্ত্বের ভেতরেই তিনি খুঁজে পেলেন সমাজবন্ধনের মূল কথাটি। পরম চিৎ-এর স্বয়ম প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায় হল পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সর্বোচ্চ পর্যায় হল তাত্ত্বিকবোধ। এই সমস্ত বিভিন্ন পর্যায় পরম-চিৎ-স্বরূপ পরম সত্তার স্বাধীনতার পরিস্ফুটন মাত্র। লৌকিক মানবসত্তার স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আসে না। পরন্তু পরমচিৎ-এর এই পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ দ্বান্দ্বিক নিয়মে হলেও তা কালিক নয়। কাজেই কোনো অবস্থাতেই পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্রে কোনো মানুষ তার ব্যক্তিগত মর্যাদা পেতে পারে না। ইতিহাস ব্যাখ্যায় যদিও হেগেল দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন তবুও দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে তিনি সময়ের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তর্কশাস্ত্রের প্রত্যয়ের মধ্যে আটকিয়ে রেখেছেন; ফলত দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সত্ত্বেও হেগেল ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ গতিকে অথবা সময়ের দিকটিকে অস্বীকার করেছেন। মার্কস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে দেখেছিলেন বস্তুর স্বরূপের অংশ হিসাবে। দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ বস্তুর স্বধর্ম। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের কথা মার্কসবাদী নন এমন বিশিষ্ট দার্শনিকেরাও স্বীকার করেছেন (যেমন স্যামুয়েল আলেকসান্দর)। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিও এই তত্ত্বের যাথার্থ্যকেই দৃঢ়তর করছে। এই পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণকে স্বীকার করতে হলে প্রথমত সময়কে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে হয় এবং দ্বন্দ্বমূলক বিকাশকে বস্তুজগতের স্বধর্মরূপে কল্পনা করতে হয় কারণ শুদ্ধ ভাবজগতে পরিমাণ ও গুণের পার্থক্য অলীক। কাজেই হেগেল সমাজবন্ধনের বস্তুগত শর্তাবলীকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপকে বিক্ষিপ্ত করেছেন। অথচ হেগেলের এই তত্ত্বেই সমাজতত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট ধারণাটি খুঁজে পান লেখক। আরও আশ্চর্য হই এই দেখে যে লেখক ইতিহাস-সম্পর্কিত ক্রোচের মতকে আবেগদীপ্ত ভাষায় গ্রহণ করে বসে আছেন গ্রন্থের আরম্ভেই। আসলে লেখক বিশেষ এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদকে হেগেলীয় তত্ত্বে প্রতিফলিত

করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। এবং এ ভাববাদ তাঁর মতে ভারতীয় ভাববাদ।

সমাজ সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা বলতে লেখক একটি বিশেষ ভাববাদী-তত্ত্বকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় ভাববাদে সমাজ সম্পর্কে ধারণাটি যে ঠিক কি তা তিনি বলেন নি। সমাজ-সম্পর্কিত ভারতীয় ভাববাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি কেবল চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের উল্লেখ করেছেন। বর্ণাশ্রমের ধারণা দ্বারা আমরা শুধু এটুকুই বুঝতে পারি যে সমাজে কতগুলি সম্পর্কের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হচ্ছে। এই সম্পর্কগুলির স্বরূপ নির্ণয় এবং তাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সাহায্যেই সমাজ-সম্পর্কিত ধারণা পরিস্ফুট হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীবসু এ ধরনের ব্যাখ্যাকে পরিহার করেছেন। ফলত সমাজ-সম্পর্কিত ভারতীয় ধারণার আসল কথাগুলিই তিনি বলেন নি। তাছাড়া ভাববাদী চিন্তাবিদেরা বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করেছেন—এর মানেই এই বোঝায় না যে বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করা মানেই ভাববাদকে স্বীকার করা। ভাববাদকে বর্জন করেও বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ লেখক করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় না কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কোনো ভাববাদী সমাজতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া 'গীতা'য় বর্ণাশ্রমের কথা বলা হলেও অনেক জায়গায় সেখানে পরমচিৎবাদের পরিপন্থী কথাও বলা হয়েছে। অনেকের মতে গীতার 'পুরুষোত্তম' এবং উপনিষদের 'পরমসত্তা'-রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন। কাজেই সমাজ-সম্পর্কিত ভারতীয় ভাববাদের বিশেষ কোনো তত্ত্ব যদি লেখক যথার্থ বলে মনে করে থাকেন তবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর দেওয়া উচিত ছিল। এই কারণে 'সমাজ'-সম্পর্কিত তাঁর সমস্ত আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

তিন

'স্বাধীনতা' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখকের মূল বক্তব্য হল: "ধর্ম-পরিমণ্ডলে বৃত্তি-নির্ভর আত্মদর্শনের কথাই স্বাধীনতার কথা।" এ বক্তব্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে লেখক স্বাধীনতা-বিষয়ক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন এবং তত্ত্বগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(১) কান্টীয় তত্ত্ব (২) গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক বক্তব্য (৩) মার্কসীয় বক্তব্য (৪) প্লেটো-এরিস্টটেলীয় বক্তব্য ও

(৫) ভারতীয় বক্তব্য। কোন সূত্র অনুসারে 'স্বাধীনতা' সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিকে উল্লিখিত পাঁচটি ভাগে লেখক ভাগ করেছেন—তা বুঝতে পারা যায় না। এ-ভাবে ভাগ করার ফলে একটি তত্ত্বের ভিতর আরেকটি তত্ত্বের বক্তব্য সহজেই এসে পড়েছে এবং এই তত্ত্বগুলির আলোচনা তাঁর মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট না করে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। মার্কসীয় বক্তব্যের অংশে বক্তব্য বিষয়টিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারলেও এই অংশের বক্তব্যই সবথেকে বেশি অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

মার্কসের বিরুদ্ধে লেখকের প্রধান আপত্তি মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন—তা আমাদের সত্যের সন্ধান দেয় না। তার কারণ "ব্যক্তির প্রথম চেতনাই তার আত্মবোধে অর্থাৎ তার চারপাশের বস্তুর অভিজ্ঞানে যাকে সে 'আমার' বলে দাবি করতে পারে।" কিন্তু লেখকের এই উক্তি কোন বিচারে আমরা মেনে নিতে পারি? বরং ব্যক্তির প্রথম চেতনাতে এ ধরনের কোনো 'আমার' বোধ তো দূরের কথা কোনো নির্দিষ্ট আমি বোধ থাকে কিনা সন্দেহ। লেখকের মতে "মার্কসের দ্বিতীয় প্রধান ভুল এই যে তিনি ব্যক্তিকে ব্যক্তি হবার দার্শনিক তত্ত্বটি দিচ্ছেন না কিন্তু বলছেন সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বাধীনতা এসে যাবে।" কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব মার্কস ব্যক্তিকে দেন নি এরকম মনে করার সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। মার্কসের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (সামাজিক) মানুষের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ বোঝায় যা শ্রেণীহীন সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজে সম্ভব নয়। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং শ্রেণীহীন সমাজের সঙ্গে সেগুলির পার্থক্য কি মার্কস তা যথেষ্ট বিশদ এবং স্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়েছেন। শ্রেণীহীন সমাজে স্বাধীনতার রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন: "সমাজ তখন হবে বস্তুর সংগঠন।" একথার অর্থ শ্রীবসু করলেন সমাজ হবে তখন একটি নিতান্তই যান্ত্রিক কাঠামো। শ্রীবসু ভুলে গেছেন যে মার্কসবাদের তত্ত্ব অনুসারে বস্তু যান্ত্রিক নিয়মে চলে না—চলে দ্বান্দ্বিক নিয়মে। তাছাড়া সমাজকে বস্তুর সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করার প্রকৃত অর্থ হল এই যে বস্তুজগতের বাহ্যশর্তাবলীগুলি ছাড়া সমাজের ওপর কোনো বাহ্য নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আর একথা গণতন্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবসু নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, "মানুষ একদিকে যেমন জড় তেমনি পশুও। সুতরাং

তার স্বাধীনতা বাকি দুটি স্তরকে মেনেই।" মার্কসীয় বক্তব্য আলোচনার শেষ করবার সময়ে লেখক মার্কসবাদ-এর সঙ্গে সঙ্গে মিলের উপযোগিতাবাদ ও ডিয়ুইর করণবাদকেও বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন। লেখকের মতে এ তিনটি তত্ত্বই অভিন্ন। তত্ত্ব তিনটি কোন এক অর্থে অভিন্ন। কারণ তিনটি তত্ত্বেই ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ হেতু জ্ঞানকে এবং লৌকিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। তত্ত্বগুলির যে দিকটি বলিষ্ঠ—সেই দিকটি বিবেচনা করেই লেখক তাদের বর্জন করতে বলছেন !

'স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে লেখকের চরম বক্তব্য হল : "ধর্মপরিমণ্ডলে বৃত্তি-নির্ভর আত্মদর্শনের কথাই স্বাধীনতার কথা।" এ বক্তব্যটিকেই তিনি ভারতীয় বক্তব্যের নির্গলিতার্থ বলে বোঝাতে চেয়েছেন। স্বভাবের পরিণতির লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রচেষ্টাই হল স্বাধীনতার প্রকাশ, এ বক্তব্য ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রকাশ পেয়েছে এবং ভারতীয় বক্তব্য এই কারণেই গ্রহণীয়। একথার প্রামাণ্যের উপস্থাপনের জন্য লেখক বিস্তৃত আলোচনা করলেও বক্তব্যটি বিন্দুমাত্রও সরল হয় নি। প্রথম কথা, "ধর্মপরিমণ্ডলে বৃত্তি-নির্ভর আত্মদর্শনের কথাই স্বাধীনতার কথা"—এই বক্তব্যটি যে কোনো মতবাদের বক্তব্যেই থাকতে পারে। কারণ, 'ধর্মপরিমণ্ডল' অথবা 'আত্মদর্শন' শব্দগুলির ব্যাখ্যা বিভিন্ন মতবাদীরা বিভিন্ন ভাবে দেবেন। 'ব্যক্তির স্বভাব' প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা বলা চলে। ভারতীয় বক্তব্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা লেখক বলতে চেয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য কিনা এ প্রশ্নের আগে সেই বৈশিষ্ট্যটিকে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা দরকার। লেখক এ কাজে ব্যর্থ হয়েছেন।

"স্বাধীনতা" শব্দটি বিভিন্ন আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত করা যায়। যদিও সেই বিভিন্ন অর্থগুলির ভেতরে একটি প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বর্তমান থাকে "স্বাধীনতা"-সম্পর্কীয় বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনার সময়ে বিভিন্ন অর্থ এবং আলোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে সচেতন না থাকলে উক্ত তত্ত্বগুলির প্রতি অবিচার করা হবে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক "স্বাধীনতার" বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে আলোচনার্থ গ্রহণ করার সময়ে একথা বিস্মৃত হয়েছেন। যে বিভিন্ন তত্ত্বগুলির অবতারণা তিনি করেছেন সেগুলি মূলত একটি অপরটি থেকে পৃথক কিনা অথবা প্রতিটি তত্ত্বেই "স্বাধীনতা"র আলোচনা কোন পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে—একথাগুলি ভেবে দেখলে তিনি তাঁর বক্তব্যকে অনেক সুস্পষ্ট করতে পারতেন।

চার

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "এই গ্রন্থের তাত্ত্বিক আলোচনা সমাজ, স্বাধীনতা ও শিল্প বিষয়ে।" কিন্তু শেষ অধ্যায় পর্যন্ত পৌঁছনোর পর প্রশ্ন ওঠে—কিছু আলোচনা করা হয়েছে দেখলাম—কিন্তু আলোচনা কি তাত্ত্বিক ? তাত্ত্বিক আলোচনার যথার্থ লক্ষণ কি এ কথা আমার অবশ্য নির্দিষ্ট ভাবে জানা নেই, কিন্তু যে-আলোচনা পরস্পর-বিরোধী এবং অস্পষ্ট বক্তব্যে বোঝাই তাকে নিশ্চয়ই তাত্ত্বিক আলোচনা বলা যায় না।

লেখকের মতে "আমাদের জীবন নেই, শিল্প আমাদের নিয়ে নয়।" "শিল্পী প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে ব্যস্ত নন, শিল্পী খোঁজেন না-জানা কথাগুলোই।" অথচ "সমাজব্যবস্থায় তাঁর (শিল্পীর) সত্তা একক, নিঃসঙ্গ, তিনি যেনো দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে দ্রষ্টা বা ঋষির মতো, দৈনন্দিনে সম্পর্ক গড়ছেন না" গণতান্ত্রিকের এই মতকেও তিনি অস্বীকার করছেন। অপরদিকে লেখক নিঃসংশয়ে ঘোষণা করছেন, "যেহেতু মার্কসবাদের স্বাধীনতা-তত্ত্ব নেই, তার শিল্পতত্ত্বও থাকতে পারে না এবং নেইও।" মার্কসবাদে স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আগেই বলেছি। শিল্প সম্বন্ধেও ঐ কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। মার্কসবাদকে গ্রহণ না করলেও তিনি যদি নিষ্ঠা সহকারে মার্কসবাদের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিকগুলির প্রতি মনোনিবেশ করতেন তাহলে বিষ্ণু দের বক্তব্যকে মার্কসবাদের বিরোধী বলে মনে হত না।

শিল্প সম্পর্কে বক্তব্যের সবশেষে লেখক বলছেন, "আসলে শিল্পের প্রক্রিয়ায় বারবার ফিরে আসতে হয় মানুষের স্বাধীনতায়, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী জীবনের উৎস, ভাববাদীর সত্যে ও ভারতবর্ষের ব্রহ্মে।" এ বক্তব্য থেকে নিহিতার্থ অনুধাবন করা খুবই দুঃসাধ্য। কারণ 'ভারতবর্ষের ব্রহ্ম' বস্তুটি কি তা আমার জানা নেই। লেখক যদি উপনিষৎ-কথিত 'ব্রহ্মে'র কথা বলতে চেয়ে থাকেন তাহলে বলতে হয় যে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদগুলিতে এই 'ব্রহ্ম' সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এমনকি ভারতীয় চিন্তাধারায় যে সমস্ত ভাববাদী তত্ত্বের পরিচয় আমরা পাই সেগুলিতেও 'ব্রহ্ম' সম্পর্কে বিরোধী বক্তব্য আছে। 'স্বাধীনতা', 'সমাজ' অথবা 'শিল্প' সম্পর্কে যখন কোনোরকম ভাববাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য কিনা সে প্রশ্নের আগে তত্ত্বটি-র নির্দিষ্ট এবং সরল ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যে-হেতু এই দ্বিতীয় বিষয়ে লেখক আমাদের হতাশ করেন, তাঁর মূল বক্তব্য (যা 'ভাববাদে'র কোনো এক বিশেষরূপ) কতখানি যুক্তিসিদ্ধ সে প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও লৌকিক জিজ্ঞাসা

আকাঙ্খার উচ্চারণে অগ্রজের সশব্দ অধিকারী হয়েও সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির সক্রিয়তা উচ্চসংস্কৃতির তুলনায় নীরব। অষ্টাদশ শতকে সুইডিস সংস্কৃতিবিদ লিনিয়াসই[১] সম্ভবত প্রথম সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সূত্রপাত করেন। তথাপি বলা যায় সমাজবিজ্ঞানের বিশিষ্ট শাখা হিসাবে লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ইংলণ্ডে 'ফোকলোর সোসাইটি'[২] স্থাপনের পূর্বে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নি। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে ব্যক্তির একক পরিপ্রেক্ষিতহীন সামাজিক ঐক্যের সম্বন্ধপাতের সচলতায় সংস্কৃতির লোকায়ত ধারা মননচর্চার ইতিহাসে পূর্ণতার সন্ধানে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয়তার প্রাথমিক প্রস্তাবনা, ফোকলোর সোসাইটি আয়োজিত তিনটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং ফোকসঙ্ সোসাইটি ও ফোকডান্স সোসাইটি সংস্থাপনে; এবং তার পরিণত প্রচেষ্টার সংহত প্রকাশ, লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির সামগ্রিক অভিধান রচনায়।[৩]

'স্ট্যানডার্ড ডিকসেনারী অব ফোকলোর' গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতির এনসাইক্লোপিডিয়া বিশেষ। ক্রমিক বর্ণবিন্যাসে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাপক সম্ভারে, বিশেষজ্ঞদের রচনায় বিভিন্ন দেশের লোক-কৃষ্টির পরিচয় ও বিচার বিশ্লেষণে গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল। এই গ্রন্থ পৃথিবীর লোকসংস্কৃতি পরিক্রমার মাধ্যমে পৃথিবীর দেব-দেবী, লোকনেতা, যাদুকর; পশুপক্ষী, উদ্ভিদ, পোকামাকড়, গ্রহ-সম্পর্কিত লোককথা; লোকনৃত্য ও সঙ্গীত; উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠান; খাদ্যরীতি ও তার তাৎপর্য;

---

(১) *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends* (Vol—1+2): Editor in chief—Maria Leach. Funk & Wagnalls Company, New York.

(২) **বাংলার লোকসাহিত্য** প্রথম খণ্ড: আলোচনা, দ্বিতীয় খণ্ড: ছড়া ॥ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ক্যালকাটা বুক হাউস।

খেলা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, অলৌকিক শক্তি, ভবিষ্যৎবক্তা, ডাইনি, যাদুরহস্য, অতীন্দ্রিয় লোকবিশ্বাস-বিষয়ক দৈত্য-রাক্ষস-পরীর কথা এবং বিভিন্ন আদিম ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ ইত্যাদির বিচিত্র সম্ভার উপস্থিত করেছে। তথ্য ও তত্ত্বের দ্বৈত সম্পর্কে প্রতিটি অধ্যায় কমবেশি জিজ্ঞাসু-মনস্কতার স্বাক্ষর বহন করে।

সংজ্ঞা-সম্পর্কিত আলোচনাচক্রে বিশেষজ্ঞদের চব্বিশটি মতামত লোক-সংস্কৃতির আত্মজিজ্ঞাসাকে মননে সুন্যস্ত করেছে। পরস্পর-বিরুদ্ধ মতামতও যথাযথ গুরুত্বে উপস্থিত করায় পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও নিজস্ব মতামত গঠনে একপেশে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করার সুযোগ থেকেছে। ঐতিহ্য-নির্ভর লিথুয়ানিয়ার লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞের মতটি ব্যাপকতায় লোকবিজ্ঞানের সমগ্র রূপটি উপস্থিত করেছে: "Folklore comprises traditional creations of peoples, primitive and civilized. These are achieved by using sounds and words in metric form and prose, and include also folk beliefs or superstitions, customs and performances, dances and plays".[8]

ব্যক্তি ও সমষ্টির ভূমিকা নির্দেশে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ জর্জ এন. ফস্টার-এর পাশাপাশি থিয়ডর এইচ. গেস্টর-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য: "Folklore is the part of a people's culture which is preserved, consciously or unconsciously, in beliefs and practices, customs and observances of general currency; in myths, legends and tales of common acceptance; and in arts and crafts which express the temper and genius of a group rather than of an individual."[৫]

লোকসাহিত্যের উদ্ভব ইতিহাসে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আপেক্ষিক সম্পর্কের মতটি আরো সম্প্রসারিত করে ম্যাগ এডওয়ার্ড লিচ বলেছেন যে সমস্ত লোক-কথার মৌল উৎসকেন্দ্র ব্যক্তিপ্রতিভায় সংস্থাপিত থাকলেও, পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া ও মৌখিক ধারার বিবর্তনে স্বাক্ষরহীন শিল্পসৃষ্টি সমবেত উৎকর্ষের বৃত্তে স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করে। জর্মান লোকসংস্কৃতির আলোচনা সম্পর্কে চার্লস ফ্রান্সিস পটার-এর প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত উক্তিটি লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়: "Folklore comprises things, acts, beliefs,

words, and lyric, didactic, or narrative themes transmitted and shaped by tradition."[৬]

লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা লোকগীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় লিখিত সাহিত্যের বর্হিপ্রাঙ্গনে জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য ও সুর সাধনার বিচিত্র প্রকাশ রূপে লোকগীতিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নগর সভ্যতার দূরে লোকায়ত ঐতিহ্যে মৌখিক ধারায় পরিস্ফুট লোকসঙ্গীত, লোকসাধারণের জীবনাচার ও আকাঙ্খার প্রতিফলনে সোচ্চার। লোকসঙ্গীতের বিভাগগুলি তত্ত্বগত ভাবে সুর, পাঠ, কথা ও সুরের সম্পর্ক, গীতরীতি, ধ্বনিতরঙ্গ, সঙ্গীতের প্রচার, যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, ঐক্যতানের বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে বিভক্ত। বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ আলোচনা করে লোকসঙ্গীতে পঙ্‌ক্তি বিশেষের পৌনপুনিক বিন্যাসের litarary form ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং লোকসঙ্গীত শিক্ষার লোকায়ত পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: "There is usually no technique of teaching, certainly no formal technique, connected with the making and singing of folk songs ; they are learned by ear, and transmitted in this fashion from generation to generation."[৭]

প্রবাদ ও ধাঁধা, শিল্প ও জীবনের পারস্পরিক অন্বয়ে অভিজ্ঞতাবিধৃত লোকজ্ঞানের বংশানুক্রমিক বাহন। প্রবাদের জন্মসূত্র রহস্যাবৃত। সাধারণত ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণে সামাজিক জ্ঞানের প্রকাশ লোকঐতিহ্যে স্বীকৃত হয়েই প্রবাদের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। অপর পক্ষে ধাঁধাকে লোকজ্ঞান-সাপেক্ষ 'thought provoking question' বলা যায়। লোকায়ত জ্ঞানের প্রচলিত উত্তরটি প্রত্যাশিত হলেও ধাঁধার মধ্যে জনসমাজের জিজ্ঞাসুমনস্কতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশ বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণ জ্ঞানের সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ হিসাবে ধাঁধা ও প্রবাদের বিস্তৃত আলোচনা শেষ পর্যন্ত উৎস সন্ধানে সমোচ্চার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

আদিম সমাজের যাদুবিশ্বাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পটভূমিকায় লোকনৃত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লোকনৃত্য-সম্পর্কিত অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোষ্ঠী ও ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্খায় উচ্চকিত লৌকিক যাদুবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সক্রিয় প্রতিভাস রূপে লোকনৃত্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে: "Folk dance is communal reaction in movement patterns to life's council cycles.

Its true magic-religions function concerns preservation of the individual and the race."[৮]

লোকসংস্কৃতি অভিধান গ্রন্থে লোকশিল্পের সমগ্র ইতিহাসটি সবিশেষ উল্লেখিত হয়েছে। রেখাগত ছন্দে লোকশিল্পে জীবনার্থের অমোঘ আকর্ষণ ব্যক্ত। সভ্যতার আদিম অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক, জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনতৃষ্ণা, দৈনন্দিন উপযোগী বস্তু প্রস্তুতের সক্রিয়তা, অস্ত্র-বাসস্থান বহুবিধ প্রয়োজন ও সৃষ্টিনিপুণতার অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় লোকশিল্পকলার বিস্তার। প্রকৃতিকে বশ করার প্রচেষ্টা ও যাদু প্রক্রিয়া লোকশিল্পের উৎসরূপে সতত সক্রিয় ছিল। আদিম শিল্পের উদ্ভব ইতিহাসে নিরক্ষরতার পরিপূরকতা সন্ধান, পরস্পর সংযোগ প্রচেষ্টা, গণনা ও স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনকে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯]

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগত আলোচনা প্রাধান্য না পেলেও, motif Index ও type Index এই পাশ্চাত্য রীতি দুটি এ গ্রন্থে সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। motif সম্পর্কে বলা হয়েছে : In folklore the term used to designate any one of the parts in to which an item of Folklore can be analyzed.[১০] লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে মটিফ নির্দেশিত হলেও লোককাহিনী অর্থাৎ কথা, গীতিকা, পুরাকাহিনী, বীরকাহিনী ইত্যাদির মধ্যেই মটিফের সবিশেষ অনুশীলন হয়েছে। কাহিনীর মটিফ সাধারণত অত্যন্ত সরল অথচ লোককথায় সতত-দৃষ্ট বস্তুনিচয়ে নিবদ্ধ থাকলেও তা নিতান্ত সাধারণ বস্তুর ঊর্ধ্বে। যেমন সাধারণ অর্থে 'মা' কোনো মটিফ নয়, কিন্তু 'নিষ্ঠুরা মা' ব্যতিক্রমের সূত্রে ফোক-মটিফ। মটিফ অন্বেষায় নিমগ্ন হলে বিশ্ব লোকসাহিত্যের মধ্যে সাধারণ ঐক্যের সূত্রটি সহজে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এবং এই সাধারণ ঐক্যের সূত্রে লোককথায় বিশিষ্ট 'টাইপে'র উদ্ভব। ব্যতিক্রম ও ঐক্যের বিভাগে লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণে মটিফ ও টাইপ পরস্পর সাপেক্ষ—In the latter, type and motif are identical.[১১]

লোকসংস্কৃতি অনুশীলন পদ্ধতি, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ বিশ্লেষণ ও নানাবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপনার সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্ব লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিগ্রো, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, বাস্ক, কেলটিস্ক, ভারতীয়, ফিনিশ, ফরাসী, ইন্দো-পারসিয়ান, ইন্দোনেশীয়,

জাপান, স্পেন, শ্লাভিক, পলিনেশিয় প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির ব্যাপক রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে। লোককথা, প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি ও লোকায়ত জীবনের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-প্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথিবীর লোকঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার স্বরূপ উদ্ঘাটন এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতির পরিচয় প্রদর্শনে ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনা পরিবেশনে দেশবিশেষের প্রকাশবৈশিষ্ট্যকে যথাযথ অনূদিত করা হয়েছে।

লোকসাহিত্য অভিধানে প্রাচ্য লোকঐতিহ্যের আলোচনা পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় নেপথ্যচারী। তন্মধ্যে ভারতীয় শাখা[১২] নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। সম্ভবত ইওরোপীয় ভাষায় অনুবাদের অভাবই এর মৌল কারণ। এ দেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা হয়েছে তাও দেশীয় ভাষার সীমায় একান্ত আবদ্ধ। আন্তর্জাতিক গবেষণায় সহায়তার জন্য সুসমৃদ্ধ ভারতীয় তথা বাংলার লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক এবং সেইগুলির রসগ্রাহী টীকাসহ অনুবাদ প্রকাশও একান্ত প্রয়োজন। জার্মান লোকসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর হান্‌শ্‌ মোদে সম্প্রতি ভারতীয় ও বিশেষ করে বাংলার লোকসাহিত্যের অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১৩] আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় উপাদানের ভাষান্তরের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করলেও, লোক-উপকরণগুলির যথাযথ সংগ্রহ ও সংরক্ষণই সম্ভবত আজকের প্রধান কাজ। কেননা শিল্পপ্রধান নগর সভ্যতার চঞ্চল আঘাতে বাংলার সংস্কৃতি ব্যাপকরূপে লোকজীবন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গ্রাম বাংলার কেন্দ্রাভিমুখী সংহতি ও কৃষিসংস্কৃতির গাঢ়বদ্ধতা আজ বিস্রস্ত। নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদে লোকসংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ত বিকাশ ব্যহত এবং নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে। এই পরিস্থিতির প্রধান কাজ দ্রুত ক্ষীয়মান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেশ ও জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অকৃত্রিম উপকরণ ও লোককৃষ্টির নিদর্শন-গুলিকে ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা। এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ করেই একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পেয়ে এসেছে তারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হয়ে যায় না। একমাত্র এগুলির মাধ্যমেই স্বদেশের সঙ্গে পরিচয়কে অন্তরঙ্গ করা সম্ভব।[১৪] এগুলিকে স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করে

রাখার কর্তব্য বিষয়ে সম্ভবত কারো মতান্তর থাকতে পারে না। কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।[১৫]

প্রেরণা ও প্রয়াসের বৃত্তে লোকসংস্কৃতিতে যে জাতীয় মানসের পরিচয় তার সহৃদয় সান্নিধ্য সন্ধান নিতান্ত সাম্প্রতিক। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথস্বষ্ট ঔৎসুক্যের ধারায় মননচর্চার ইতিহাসে দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির মান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গ্রিয়রসন, হাইমেনডুর্ফে, আর্চার, এলউইন প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতদের অবদানও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সমসাময়িক কালে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিতে লোকসংস্কৃতির সবিশেষ বিচার-বিশ্লেষণে, সমোচ্চার্য নামগুলি সম্ভবত ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

আজন্ম অনুরাগে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল যাবৎ লোকসাহিত্যের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করলেও, সামগ্রিকভাবে তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য'[১৬] রচনার নেপথ্য ইতিহাস শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্যমেলার প্রেরণা। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলার (১৯৫৩) লোকসাহিত্য শাখায় 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতিবেশী উপজাতির দান' সম্পর্কিত ভাষণ ও সেই সূত্রে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক একখানি আনুপূর্বিক লোকসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনার পরামর্শ ও অনুরোধ, ডঃ ভট্টাচার্যকে বাংলার লোকসাহিত্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। তাছাড়া ভেরিয়র এলউইনের গবেষণা-সহযোগিরূপে ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে ব্যাপক গবেষণামূলক কর্মপ্রচেষ্টাও লেখকের বর্তমান গ্রন্থ রচনায় অন্যতম নেপথ্য প্রেরণা।[১৭]

গ্রন্থ রচনায় পশ্চাৎপট অনুধাবনে, প্রেরণা ও প্রয়াসে, লেখকের যে নিষ্ঠা ও সক্রিয়তার পরিচয়, গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তার বিস্তৃত স্বাক্ষর বিদ্যমান। বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলের উপকরণ সংগ্রহ, সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এবং লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের তাত্ত্বিক আলোচনায় আলোচ্য গ্রন্থ সন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিরূপে লোকসাহিত্যকে চিহ্নিত করে লেখক লোকসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমষ্টির ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতদের বিভিন্ন মত বিশ্লেষণ করে লেখক শেষ পর্যন্ত লোকসাহিত্যকে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি বলে সিদ্ধান্ত করে বলেছেন যে, ব্যষ্টির মনে যে সকল অপরিণত ভাবের উদয়, তাই সমষ্টি লোকসাহিত্যরূপে সমাজকে পরিবেশন করে এবং বহির্মুখী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যেই লোকসাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে।[১৮] প্রসঙ্গত ডঃ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য ও উচ্চতর সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উভয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিকে আলোকপাত করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উপমায় লোকসাহিত্যকে বৃক্ষের মূল ও উচ্চসাহিত্যকে ঐ বৃক্ষের ফুল-ফল-ডাল-পালা রূপে বর্ণনা করেছেন। লেখক লোকসাহিত্যকে কেবলমাত্র উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিরূপেই বর্ণনা করেন নি সেই সঙ্গে উভয়ের ভবিষ্যৎ নির্দেশে মন্তব্য করে বলেছেন যে লিখিত সাহিত্য অপরিবর্তনীয় ও কালের ছাপে সুনির্দিষ্ট তাই তার প্রাচীন (classic) হবার সম্ভাবনা, বিপরীতক্রমে লোকসাহিত্যে মৌখিক ধারায় সতত সবল ও অক্ষুণ্ণ সজীবতায় সমুজ্জ্বল। তাই তা প্রাচীনতার সম্ভাবনারহিত।

বাংলার লোকসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যকে লেখক ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা—রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা ও পর্যালোচনাকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেছেন। বিষয় বিন্যাসের শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। ডঃ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য গবেষণায় সংখ্যাতাত্ত্বিক পাশ্চাত্যরীতির (Motif Index ও Type Index) কৃত্রিমতা এবং রসবিচারের অতিরোমান্টিকতা পরিহার করে যৌথ জীবনাচারে সংহত সমাজসংস্কৃতির মৌল পটভূমিকায় রসানুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাযুজ্য সাধন করেছেন।

রূপকথা, পুরাকাহিনী, ইতিকথা, গীতিকা, উপকথা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে ডঃ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসাহিত্যে মানব স্বীকৃতির স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। বাংলার লোকসাহিত্যে কল্পজগৎ ও বাস্তব জগতের পাশাপাশি অবস্থান বিস্ময়কর। ইওরোপীয় লোকসাহিত্যে কল্পজগতের সুখ সম্পদের পূর্ণতা যেমন ভাবে বাস্তব জগতকে বিদূরিত করে ভারতীয় তথা বাংলার লোকসাহিত্য সেইরকম করে না, এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস লোকায়ত আকাঙ্খায় রূপায়িত এবং কল্পজগৎ ও পার্থিবজগৎ লোকঐতিহ্যের প্রভাবে সাযুজ্যের স্বাক্ষর বহ করে।

লোকসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা 'গীতি' প্রসঙ্গে আলোচনাটি

বাংলা লোকসংগীতের বিপুল বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে। আঞ্চলিক গীতির মধ্যে—পটুয়া-ভাদু-ঝুমুর (পঃ বঙ্গ), জারি-ঘাটু (পূঃ বঙ্গ) গম্ভীরা-জাগ-ভাওয়াইয়া; কর্মসঙ্গীতের মধ্যে—চাষীর গান, গোরু চরানোর গান, পাটকাটা, ধানভানা, সারি প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক গীতির মধ্যে গাজন-ভাদালি-উমাসঙ্গীত প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এ-গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। গীতি অংশে ডঃ ভট্টাচার্য বারমাসী বা বারমাস্যা গীতের উৎস সম্পর্কে মৌলিক মতামত উপস্থিত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ঋতু সংগীতের বিবর্তনে বারমাস্যার উদ্ভব এই প্রচলিত মত খণ্ডন করে তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে লৌকিক গাঁথা গীতিকার ধারাতেই, পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকায় বিরহিনী নারীর সূক্ষ্ম মন-বিশ্লেষণধর্মী বারমাস্যা গীতের উদ্ভব ও বিকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে দুশান জাভিতেলও তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন—

Actually there are morerasons to attribute a folk-origin to the Bengali Baromasi than to presume a direct influence of Sanskrit poetry...the baromasi originated in folk poetry; that owing to its intrinsic attractiveness and its great popularity in Bengal, it found a place again and again in the classic literature.[১৯]

এই গ্রন্থে বহুবিধ উপমা ইত্যাদির প্রয়োগে—ব্রতর মধ্যে যাদুবিশ্বাস ও আদিম কল্যাণচেতনা, ধাঁধার মধ্যে আদিম দৈহিক সংগ্রামের কথার সংগ্রামে রূপান্তর ও তার বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগের মধ্যে জাতির সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তির আভাষ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে, গবেষক লেখক বিভিন্ন অধ্যায়ে লোকায়ত জীবন ভাবনার বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন।

তথ্য সমাবেশ ও তাত্ত্বিক আলোচনায় বিভিন্ন অধ্যায়ে পুনরুক্তি থাকলেও তা সামগ্রিক আলোচনার পরিপূরক রূপেই প্রতিভাত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গবেষণামূলক এই গ্রন্থে গবেষণার ভ্রাণ অবশ্যম্ভাবী হলেও রসাবেদনের সুরটি কখনো সঙ্গতিহীন হয় নি। প্রত্নসম্পদ ও জীবন সম্পদ অনুসন্ধানে এই গ্রন্থের মৌলিক পরিচয় নিহিত। তাই সংখ্যাগত যান্ত্রিকতা বা ভাবালুতার অতিরেকে লেখকের চিন্তা তাড়িত নয়। ক্ষেত্র বিশেষে গ্রন্থকারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ

করেও সামগ্রিক ভাবে এই গ্রন্থের বিবেকী মননে পরিতৃপ্ত হওয়া কারো পক্ষেই অসম্ভব নয়। বিবেকি-মনন ও প্রত্যয়-সুনির্দিষ্টতার জন্যই গ্রন্থকার সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেও 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য' অধ্যায়ে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের ত্রুটিগুলিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। রসবিচারের আধিক্যে লোকসাহিত্য অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথের মননে যে সমাজবিজ্ঞানগত দিকটি আচ্ছন্ন তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। বিশেষ করে সংগ্রহ কর্মে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিবর্তে আদর্শবাদী মনোভাবের অভিব্যক্তি-জনিত ত্রুটির কথা তিনি সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। তাই 'বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন' ছড়াটির একস্থানে শব্দ পরিবর্তন প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে দেখিয়েছেন কেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথ যথাযথ উপকরণ সংগ্রহে দ্বিধা ও স্বীয় নীতিবোধের দ্বারা সংশোধন বা পরিবর্তন করে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সর্বোপরি 'কবিসংগীত'কে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার ত্রুটিকে লেখক নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য গ্রন্থকার প্রক্ষিপ্তভাবে কেবলমাত্র উপরোক্ত ত্রুটিরই উল্লেখ করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ও তার সামাজিক পরিমণ্ডলটি উপস্থিত করেছেন এবং সামগ্রিক বিচারে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের মহৎ সূচনায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যরীতির তুলনামূলক ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিপন্ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অত্যুক্তি হয় না যে বাংলা ছড়ায় প্রথম সংগ্রাহক ও বিদগ্ধ সমালোচক, আজীবন লোকসাহিত্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছড়া খণ্ডটির সমর্পণ তাৎপর্যপূর্ণ। এদেশে ছড়ার সংগ্রহ বা তার প্রকাশ যখন প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অযোগ্য বলে বিবেচিত হত[২০] সেই সময়ে ছড়াসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান যে ব্যর্থ হয় নি বর্তমান বাংলা সাহিত্যে তার বিবিধ নিদর্শন বর্তমান। বিশেষত্ব ও প্রকৃতি আটটি অধ্যায়ে যথাক্রমে ঘুমপাড়ানি, ছেলেভুলানো, সেঞ্চা, কন্যা, পরিবার, প্রাকৃত জগৎ, অতিপ্রাকৃত প্রভৃতি বিষয়ে ছড়াগুলিকে বিশ্লিষ্ট করা হয়েছে এবং যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে বিচিত্র সংগ্রহ উদ্ধৃত হয়েছে। বাঙলা ছড়ার এতবড় সম্ভার এর পূর্বে কোনোদিন প্রকাশিত হয় নি। তুলনামূলক সাহিত্যের বিচারে লেখক ছড়া সমেত বাঙলার লোকসাহিত্যের সর্বত্র প্রচুর বিদেশী উপমা-উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং প্রসঙ্গত বাংলার লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন।

বাংলার লোকসাহিত্যের অনুশীলনের ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু গবেষণামূলক এই গ্রন্থের মনন সমৃদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' ও বাঙলার লোকসাহিত্য' আলোচনাটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ব্যাপক ভিত্তিতে বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও যে অনুভূত না হয় তা নয়। তবে এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়নের দাবী আমরা নিবেদন করতে পারি।

বাংলার তথা ভারতীয় লোকসংস্কৃতির যে দুটি মৌলিক গুণ আন্তর্জাতিক গবেষণায় সর্বজনস্বীকৃত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার বিপুল প্রাণশক্তি।[২১] বাংলার লোকসাহিত্যের এই অমর প্রাণশক্তি তথা সদা সচলতায় বিশ্বাস ডঃ ভট্টাচার্যের গবেষণার অন্যতম ফলশ্রুতি। তাঁর বিশ্বাস গ্রাম্য জীবনের কৃষিভিত্তিক সংহতি শিল্প সভ্যতার আঘাতে ভেঙে গেলেও নগরকেন্দ্রিক সমাজেও অদূর ভবিষ্যতে সংহতি নতুন রূপরেখায় গড়ে উঠবে। তাই তিনি বিবর্তনের ধারায় মর্মবস্তু ও রূপাঙ্গিকের বিশ্লেষণে লিখিত সাহিত্যের সর্বাধুনিকতায় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ধাঁধা ও ছড়ার আলোচনায় লৌকিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের অনুগামীরূপে সাহিত্যিক ধাঁধা ও সাহিত্যিক ছড়ার পর্যালোচনা করেন।[২২]

মুমূর্ষু লোককৃষ্টি ও জীর্ণ ভদ্রসংস্কৃতির বৈষম্যকে, সামাজিক সত্তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশের পটভূমিকায়, জনসংস্কৃতিতে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা আজ বিশ্বজনীন ঘটনা। এই ঘটনার মনন বিধৃত বৃত্তেই এদেশে বহুমুখী জীবন সত্যের সন্দর্শনে সংস্কৃতির লোকায়তিক চর্চা। ডঃ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্যের দুই খণ্ডের প্রকাশ সমেত ছয় খণ্ডের প্রতিশ্রুতি বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার সাম্প্রতিক ইতিহাসে ব্যাপক সম্ভাবনা সম্প্রসারিত করলেও, সজীব অথচ ক্রমক্ষীয়মান, সুস্থ অথচ বিড়ম্বিত লোকসাহিত্য সংস্কৃতির গবেষণা-চর্চার ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞানের সামগ্রিক অন্বেষায় আজো পরিণতির পূর্ণতা প্রত্যাশী।

---

(১) Linnaeus, 1707—78
(২) ফোকলোর সোসাইটি ১৮৭৮
(৩) ইন্টারন্যাশনাল ফোকলোর কংগ্রেস ১৮৮৯—৯৩
ফোক্ সঙ্ সোসাইটি ১৮৯৮

ফোক্ ড্যান্স সোসাইটি ১৯১১
Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend

(৪) Standard Dictionary of Folklore Vol. 1 Page 398
(৫) Ibid Vol. 1 Page 399
(৬) Ibid Vol. 1 Germanic Folklore Page 445
(৭) Ibid Vol. 2 Song : folk song and the music of folk song—Herzog Page 1044
(৮) Ibid Dance : folk and Primitive Vol. 1 Page 276
(৯) Ibid Primitive and folk art Vol. 2 Page 887
tremendous demand placed upon the graphic and plastic arts in a non-literate society, as a means of communication, record-keeping, and calculating; for as soon as early man desired to communicate to some one not present (beyond the range of gesture and speech), pictures and symbols became necessary and a whole range of art forms sprang into existence.
(১০) Ibid Vol. 2 Motif Page 753
(১১) Ibid Vol. 2 Type Page 1137
(১২) Ibid Vol. 1 Indian and Parsian Folklore and Mythology Page 517
(১৩) ডক্টর হাইন্‌শ্‌ মোদে, শারদীয় স্বাধীনতা ১৩৬৮ পৃঃ ১৪
(১৪) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত "মেয়েলি ব্রত"-এর ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৫) লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৬) বাংলার লোকসাহিত্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
(১৭) ঐ প্রথম সংস্করণের নিবেদন
(১৮) সংস্কৃত সমাজ ও লোকসাহিত্য পৃঃ ৭
(১৯) The Development of the Baromasi and the Bengali Literature, Dusan Zavitel. Folklore / April 1962 / 160
(২০) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী খুকুমণির ছড়ার ভূমিকা
বাংলার লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, ছড়া পরিশিষ্ট
(২১) If we are constantly surprised by a strange mixture of the familiar and miraculous in Indian Folklore, we are equally surprised by its vitality...
Marian W. Smith.—Indian and Persian Folklore and Mythology Page 517.
(২২) ঐ প্রথম খণ্ড ধাঁধা : লৌকিক ও সাহিত্যিক পৃঃ ৫৩০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড অষ্টম অধ্যায় সাহিত্যিক ছড়া পৃঃ ৬৫২

শঙ্খ ঘোষ

ভারতচর্চা

'বিকেলবেলা ত্রিবেদী মহাশয়ের ঘরে অধ্যাপকদের আড্ডা জমত কৃষ্ণকমলবাবুকে ঘিরে। সেখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা হতো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। এমন আলোচনা আর কোথাও আমি অন্তত শুনি নি।' এ-অভিজ্ঞতা ধূর্জটিপ্রসাদের, যখন তিনি রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেই হয়তো শেষ যুগ, তার পর থেকে ধীরে ধীরে চিন্তার জগতে শ্রমবিভাগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বাঙলা যে প্রবন্ধসম্ভারের শুরু হয়েছিল অক্ষয়কুমারের বিচিত্র জিজ্ঞাসায়, তার সম্পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই শতাব্দীর শেষার্ধে। কিন্তু আজকের দিনে আমরা বিশেষ-বিষয়ের পাণ্ডিত্যে প্রখর মনীষীদের নাম যদি-বা করতে পারি, এমন উদাহরণের উচ্চারণ নিতান্ত কঠিন হয়ে পড়ে যাঁর মধ্যে চিন্তার সেই সর্বৈব অন্বেষা প্রবল, যে-আলোচনাচক্রে 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসে'র একত্র-চর্চা সম্ভব।

উপরন্তু সংস্কৃতশিক্ষা এখন প্রায় অপাংক্তেয়। আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত ক্ষণভঙ্গুর বর্তমানের মধ্যে লুটোপুটি করে, অথবা সংস্কৃতির উৎস অন্বেষণে আজ আমরা বারংবার উনবিংশ শতকের মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু বিগত সেই শতাব্দী তাকিয়ে ছিল সমগ্র প্রাচীন ভারতের দিকে এবং 'বর্তমানকে জানার সবচেয়ে ভালো উপায় অতীতকে জানা' এই বিশ্বাসে সমগ্র অতীতের মন্থন সম্ভব হয়েছিল ইংরেজিশিক্ষিত আধুনিকদের চর্চায়। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ-অনুবাদ ছিল সেই বিরাট প্রাণস্পন্দনের এক বহিঃপ্রকাশ। জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যার রচয়িতা রমেশচন্দ্রের আড়ালে তাঁর ঐ পরিচয় আজ প্রচ্ছন্ন। বঙ্গদর্শন, প্রচার এবং নবজীবনে তখন বঙ্কিম, অক্ষয় সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র—এঁদের সমবেত রচনার

ঋগ্বেদ-সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত সংস্করণ, জ্ঞানভারতী।

মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের যে নবীন জাগরণ, তা ছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। শশধর তর্কচূড়ামণির হাস্যজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথবা চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুয়ানি এ নয়, এর মূল্য ছিল মুক্তদৃষ্টির।

বাঙলাদেশে বেদচর্চার অভাব প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের দু'এক বছর পরেই তিনি চতুর্বেদ অধ্যয়নের জন্য চতুর্ব্রাহ্মণকে কাশীতে পাঠান, রমানাথ ভট্টাচার্য তার অন্যতম। তত্ত্ববোধিনীতে ঋগ্বেদের অনুবাদও প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁরই রচিত, এবং রমানাথ সরস্বতীও সেকাজে খানিকটা এগিয়েছিলেন। এর কোনোটিই সম্পূর্ণ হতে পারে নি। ফলে 'ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্যজাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব?'—রমেশচন্দ্রের এই আক্ষেপোক্তি স্বাভাবিক মনে হয়। এ-অনুবাদের কাজে তিনি স্বয়ং যখন আকৃষ্ট হয়েছেন সে-সময়ের মধ্যে মরাঠি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় তার কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই আংশিক অনুবাদগুলি এবং ইয়োরোপীয় বেদজ্ঞদের সমকালীন ধারণাবলীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। কতদূর পর্যন্ত তাঁর নিষ্ঠা ছিল তা বুঝতে পারি চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা লক্ষ্য করলে। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রকাশিত গ্রাসমান এবং লুড্‌ভিক্-এর জার্মান দুটি সম্পূর্ণ অনুবাদের সংবাদও রাখতেন তিনি এবং এর মধ্যে অন্তত একখানি তিনি সংগ্রহ করেও নিয়েছিলেন। লাঁগ্লোয়ার ফরাসি অনুবাদ, ম্যাক্সমুলার, উইলসন, রট্, মুর, কাওয়েল, বেন্‌ফে, রোসেন, হেবস্টারগার্দ—এঁদের সকলের আলোচনা বা আংশিক অনুবাদ আয়ত্তে ছিল তাঁর। ফলে রমেশচন্দ্র যখন ঋগ্বেদ অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন, মানসিক দিক থেকে তখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

একথা ঠিক যে সায়ণের টীকাই তাঁর মূল অবলম্বন এবং রামগতি ন্যায়রত্ন বা বঙ্কিম অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করেছেন এই দেখে যে রমেশচন্দ্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ সায়ণনির্ভর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত হবে যে এই তৃপ্তি রমেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। বঙ্কিমের উক্তিমতো রমেশচন্দ্র যে 'সর্বত্র'ই সায়ণ মেনে নিয়েছেন তা হয়তো সত্যি নয়। পাদটীকায় যোজিত তাঁর দীর্ঘ মন্তব্য ও তুলনামূলক আলোচনাগুলি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব, প্রয়োজনমতো সায়ণের ব্যাখ্যা ও শব্দটীকা অগ্রাহ্য করতে আধুনিক এই অনুবাদক কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। যে-তীব্রতায় বঙ্কিম ম্যাক্সমুলার-প্রমুখ

ইয়োরোপীয় ভারতজ্ঞদের আক্রমণ করেছেন (যেমন তাঁর হেনোথীজ্‌ম্‌ তত্ত্ব প্রসঙ্গে) রমেশচন্দ্র ঠিক সে জাতীয় বিমুখতায় কখনোই তাঁদের সরিয়ে দেননি—এক হিসেবে এ হয়তো তাঁর ঔদার্যই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং সায়ণ-নির্দেশিত ঐতিহ্যনির্ভরতা, এ দুয়ের যে মধ্যপন্থাসমন্বয় পরবর্তীকালে ক্রমে গড়ে উঠেছে—রমেশচন্দ্র অস্পষ্টভাবে তারই অভিমুখী ছিলেন, এই রকম মনে হয়।

উনিশশতকের শেষ দুই দশক ভারতচর্চার এক গৌরবময় কাল। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ প্রকাশিত হবার কিছু আগে থেকেই বঙ্কিম 'প্রচারে' বেদবিষয়ক প্রবন্ধরচনায় আগ্রহী হন এবং পর পর তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সেখানে আমরা পাচ্ছি। রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদে উল্লসিত হয়ে ওঠা বঙ্কিমের পক্ষে তাই স্বাভাবিক ছিল। অনুবাদকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন : "যেমন বাইবেলের অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে এদেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে।" পুরোহিত সম্প্রদায়ের খড়্গহস্ত হয়ে ওঠার যে-উল্লেখ বঙ্কিম করেছেন তা স্বাভাবিক, বিশেষত রমেশচন্দ্র অব্রাহ্মণ, তবে সে-উত্তেজনা তো শতাব্দী-সূচনায় রামমোহনের শাস্ত্রচর্চা থেকেই অনুসৃত! কিন্তু এ-অনুবাদ জাতীয় চিত্তে বাইবেলের মতো প্রভাব বিস্তার করবে, এ হয়তো বঙ্কিমের অতি-আশা। অন্তত সাধারণ পাঠকচিত্তের সঙ্গে এর কোনো ধারাবাহিক সংযোগ রচিত হতে পারে নি। আধুনিক ভারতে, বিশেষত বাঙলায়, বেদচর্চার পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে? গত বৎসর দিল্লীতে সর্বভারতীয় বেদজ্ঞদের এক সম্মেলন পরম হতাশার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চার এই ক্ষীয়মাণতা লক্ষ্য করেছিল এবং একে রোধ করবার জন্য কয়েকটি কৃত্রিম অনুশাসনের প্রস্তাব নিয়েছে। রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদগ্রন্থ আজ যদি প্রায় অপরিচিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে উপরোক্ত অবস্থার সঙ্গে তা নিতান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নিছক ভারতচর্চার দিক থেকে রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদকর্মটি স্মরণীয়। কিন্তু তার সঙ্গে আবার লক্ষ্য করি এর শিল্পগুণ। অনুবাদক তাঁর ভূমিকায় ঋগ্বেদের ধর্মচিন্তাকে মাত্র প্রশ্রয় দেন নি, 'প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ' সুন্দর সরল মন্ত্রগুলির উল্লেখ করেছেন। এই আলোকবিভা রমেশচন্দ্র কী কৌশলে তাঁর অনুবাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন!

সমকালীন দু'একটি অনুবাদ-অংশের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে হয়তো

বেদপাঠের পরিচায়িকা হিসেবে সম্পাদকীয় ভূমিকাটি পরিচ্ছন্ন এবং উপযোগী। চব্বিশ পৃষ্ঠার এই সংহত রচনাটির মধ্যে 'সাধারণ পাঠকের বেদপরিচিতি'র প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। বেদ ও বৈদিক সাহিত্য, ঋগ্বেদসংহিতা, বৈদিকছন্দ, সামবেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা, অথর্ববেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, বেদাঙ্গ, বেদের কালনির্ণয় এই দশটি অংশে ভূমিকাটি লিখিত। বেদের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে সম্পাদক স্বয়ং কোনো আলোচনা করেন নি, কেননা এই প্রসঙ্গে আচার্য স্থনীতিকুমারের দীর্ঘ একটি আলোচনা এখানে গৃহীত। কিন্তু জ্ঞাতব্য তথ্যাবলীতে অন্যান্য বিভাগগুলি সমৃদ্ধ। ঋগ্বেদপরিচয় অংশে সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠের বিশ্লেষণ বস্তুতই আধুনিক পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং ছন্দ-প্রসঙ্গের আলোচনাও বিশেষ লক্ষণীয়। অল্প পরিসরে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে মিলিয়ে নিয়ে এ-জাতীয় আলোচনা খুব স্থলভ নয়, এদিক থেকে এই ভূমিকাটি মূল্যবান।

আরো কয়েকটি রচনা ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান সংস্করণে। স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিকসাহিত্য, তার কালপরিচয় এবং বেদচর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে দীর্ঘ একটি আলোচনা করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে পরিচায়িকা লিখেছেন। প্রবোধরাম চক্রবর্তী একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর। এছাড়া, বৈদিক ভারতের একটি মানচিত্র সঙ্গে যুক্ত থাকায় সম্পাদকীয় আয়োজন পরিপূর্ণ হয়েছে বলা যায়।

বৈদিকযুগ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রকালীন ধারণাবলীর আরো অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বা সর্বপ্রাচীনত্ব নিয়ে যে গর্ববোধ উনিশ শতকে আমরা অবিরাম দেখেছি এখন তা অনেকটা অপসৃত হবার কথা। মিতান্নি আর্যভাষা বা হিট্টি ভাষার আবিষ্কারেই বৈদিকভাষার সর্বপ্রাচীনত্ব আর গ্রাহ্য হয় না। এরও ওপর, গত দশ বছরের মধ্যে দুজন ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীনতম গ্রীকভাষার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের। ফলে সে ভাষাকেই এখন প্রাচীনতম বলতে হবে। এই বিষয়টির উল্লেখ, বেদের কাল বিষয়ে বিস্তৃত মীমাংসা, ভাষা ছন্দ ও উচ্চারণের প্রসঙ্গ: সমস্ত নিয়ে আচার্য স্থনীতিকুমারের রচনাটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। ভাষাগত বিবর্তন দেখাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি লাইনের কাল্পনিক স্তরপরম্পরা লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য ওটি তাঁর প্রায় তিরিশ বছর পূর্বের রচনাংশ।

ডক্টর দাশগুপ্তের রচনাটির শেষদিকে একটি অন্যমনস্ক প্রয়োগ চোখে পড়ে। "সমস্ত মন্ত্রগুলির অর্থ একত্রিত করিয়া গোটা ঋক্‌টি অর্থবান্ হইয়া ওঠে"— স্বভাবতই, এখানে তিনি সূক্ত কথাটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। প্রবোধরাম চক্রবর্তী-কৃত গ্রন্থপঞ্জীটির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করলে বোঝা যায় লেখক হিসেবে রমেশচন্দ্রের উৎসাহ কতোদিকে ব্যাপ্ত ছিল। দেশচেতনা ও ইতিহাসবোধ সেই উৎসাহের প্রধান অংশ, সমস্ত রচনাবলীর পটভূমিতেই ঐ বোধ প্রচ্ছন্ন। এই তালিকাটি প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলজনক তথ্যের উল্লেখ করা যায়। ঋগ্বেদসংহিতার প্রকাশকাল লিখিত হয়েছে ১৮৮৫-৮৭। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো, ভিন্ন ভিন্ন বিন্যস্ত অষ্টকগুলির ভূমিকা-রচনাকাল মূলত ছিল এইরকম: ১ আশ্বিন ১২৯২, ১ মাঘ ১২৯২, ১ চৈত্র ১২৯২, ১ বৈশাখ ১২৯৩, 3rd May 1886, 11th May 1886, 20th May 1886, এবং 26th May 1886। একমাত্র অষ্টমখণ্ডটি ছাড়া সবকটির নামপত্রে ১৮৮৫ এবং ১৮৮৬ আছে। এই তারিখ লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি কী দ্রুততায় খণ্ডগুলি প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছে। আরো বিস্ময়ের বিষয়, শেষ চারটি খণ্ড মুদ্রণকালে অনুবাদক আছেন বিদেশগামী জাহাজে, সেখান থেকে বসিষ্ঠের একটি স্তব ব্যবহার করে লিখছেন: "সমুদ্রমধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছি, জলের উপর গমনশীল নৌকায় আছি, শোভার্থ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিতেছি!"

তিন

বৃহৎ এই অনুবাদ-গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করে সম্পাদকযুগল আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশেষকৌতূহলী কোনো কোনো ব্যক্তি এ সংস্করণে দু-একটি ঐতিহাসিক অভাব বোধ করতে পারেন। এর ভবিষ্যৎ কোনো মুদ্রণ যদি সম্ভব হয়, সম্পাদক আমাদের কয়েকটি বিনীত প্রস্তাব কি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন?

বর্তমান মুদ্রণে সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়েছে রমেশচন্দ্রকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের ওপর। অনুবাদক স্বয়ং সেই সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন, তাই এর যুক্তি আছে। কিন্তু আজ যখন ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদ আমাদের হাতে পৌছবে তখন তার আকর্ষণ হবে উভয়ত। বেদচর্চার স্বতন্ত্র মূল্য একদিকে, অন্যদিকে

রমেশচন্দ্রের সৃষ্টিকর্ম হিসেবেও এর তাৎপর্য লক্ষ্য করা আজ স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে অন্য দু-একটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই নিশ্চয় এ-সংকলন প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু উক্ত সংস্করণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে বর্জিত দেখতে পাচ্ছি।

১. প্রথম সংস্করণের যে ভূমিকাটি দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রথম অষ্টকের ভূমিকা মাত্র। আলোচ্য পুনর্মুদ্রণেও যে নামপত্র ছাপা হয়েছে তাতে সকলে দেখতে পাবেন, ওটি প্রথম অষ্টকের। প্রথম প্রকাশের সময়ে রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন অষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেরিয়েছিল। এইভাবে আটটি অষ্টকে আটটি ভূমিকা মূলে পাই। পরবর্তী ভূমিকাগুলি ছোটো। কিন্তু সম্পাদকেরা সেগুলি যদি পরিশিষ্টে যোগ করে দিতেন! এর ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না। এমনকী, এমনিতে-খুব-সাধারণ ঐ ভূমিকাটিতে দু-একটি ভারি কৌতূহলপ্রদ খবর পাওয়া যাচ্ছে। যেমন একটি : "প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে লাংলোয়া-কৃত ফরাসি অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদসংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ আর কোনও ভাষায় নাই। ঋগ্বেদসংহিতা জার্মান ভাষায়ও সম্পূর্ণ অনুবাদিত হইয়াছে তাহা তখন আমি জানিতাম না। লড্ উইগ্ এবং গ্রাসমান এই দুইজন জার্মান পণ্ডিত অনুমান দশ বৎসর হইল ঋগ্বেদসংহিতার দুইখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রচার করেন। তাঁরা উভয়েই সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়াই এই অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রাসমান-কৃত অনুবাদখানি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, লড্ উইগ্-কৃত অনুবাদখানিও অচিরে সংগ্রহ করিবার অভিলাষ আছে।" এই ভূমিকাংশটুকুর মূল্য যে কতখানি তা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

২. রমেশচন্দ্রের যে-কৃতিত্বে আমাদের বিস্ময়, তা কেবল এই নয় যে কী অসীম ধৈর্যে এ-অনুবাদ তিনি করেছিলেন। ওরই সঙ্গে সঙ্গে যে পাদটীকা যোজনা করে গেছেন তিনি, তার আকর্ষণও কম নয়। সন্দেহ নেই যে রমেশচন্দ্রের পর আরো নতুন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এখন তাঁর অনেক উক্তি অব্যবহার্য বা নিষ্প্রয়োজন মনে হতে পারে। কিন্তু সেই কারণেই এ-টীকাগুলি বর্জিত হতে পারে না। কেননা ওর মধ্যে রমেশচন্দ্রের পঠন, পরিশ্রম, তুলনামূলক বিচার এবং ঔদার্যের যে পরিচয় ধৃত আছে তা অসামান্য। যেমন, একটি দীর্ঘ উদাহরণ নেওয়া যাক: ১।৭।৯

ঋকের টীকায়: "পঞ্চক্ষিতি অর্থ চারি জাতি ও নিষাদেরা সায়ণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন এইরূপ শব্দের সায়ণ ও যাস্ক অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, পাঠক তাহা সেই সেই স্থানে দেখিবেন। কোথাও পঞ্চজগৎ বা গন্ধর্বাদি পাঁচপ্রকার জীব অর্থ করিয়াছেন; ৮৯ সূক্তের ১০ ঋক্ ও ১০০ সূক্তের ১১ ঋক্ দেখ। সুতরাং সায়ণ পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুভব করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। চারিজাতি ও নিষাদ—এরূপ অর্থ নহে, কেননা ঋগ্বেদরচনার প্রারম্ভে চারিজাতি ছিল না, কেবলমাত্র দুই জাতি ছিল, আর্য এবং অনার্য বা দস্যু। ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষে আর্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক বা পুরোহিত শ্রেণী, রাজপুরুষগণ ও সাধারণ শ্রমজীবী বা ব্যবসায়ী লোক এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইয়াছিল, কিন্তু তখনও এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিস্থ লোকদিগের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য নিষিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এ তিনটি শ্রেণী তিনটি জাতি হয় নাই। পঞ্চক্ষিতি সম্বন্ধে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এইরূপ লিখিয়াছেন···" অতঃপর রমানাথ সরস্বতীর উদ্ধৃতি, মূর-এর Sanscrit Texts-এর উল্লেখ, ম্যাক্সমূলর ও ওয়েবারের বিস্তৃত মতামত! অথবা, এই ধরনের টীকা: "দ্বিতীয় অষ্টকে অসুর শব্দ দশবার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—" তার বিবরণ ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-নির্দেশ! পরবর্তী বেদ্চর্চায় এর মূল্য যাই হোক, এ-সমস্ত টীকা রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারাকে বুঝতে নিশ্চয় বিশেষ সাহায্য করবে।

৩. প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছিলেন: "ঋগ্বেদ হইতে আর্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্তমান হিন্দুধর্ম কিরূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদের দেবগণের প্রথম অর্থ কি এবং ঋগ্বেদের রচনার সময়ে আর্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার-ব্যবহার ছিল···সে বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে।" 'পুস্তক'রূপে এ-রচনা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু নবজীবন পত্রিকায় দীর্ঘ এক বৎসরব্যাপী প্রবন্ধে এ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন রমেশচন্দ্র। 'ঋগ্বেদের দেবগণ' নামক সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি সাম্প্রতিক সংস্করণের মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হলে কেমন হতো? সুরচিত সম্পাদকীয় ভূমিকাটি ছাড়াও আরো কয়েকটি লেখা এর অন্তর্গত হয়েছে বলেই এ-প্রশ্ন মনে উঠছে। এমন-কী, ঐতিহাসিক কৌতূহলের দিক থেকে বিচার করলে,

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বেদ' নামক রচনাটিও এর একটি উপযুক্ত পাঠ-ভূমিকা হতো কিনা, বিবেচ্য।

৪. দেব- এবং ঋষি-নামের একটি অনুক্রমণিকায় এ-সংকলন হয়তো সমৃদ্ধতর হতো। এ-কাজ বিশেষ শ্রমসাধ্য, কিন্তু শ্রমনিষ্ঠ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমরা তা দাবি করতে পারি। রমেশচন্দ্র একরকম আংশিক অনুক্রম অবশ্য রেখেছিলেন। দেবতা অথবা অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ, এই শিরোনামে ছোটো ছোটো কয়েকটি তালিকা তাঁর গ্রন্থান্তর্গত ছিল। সে তালিকাগুলি অনুবাদকের টীকা-প্রসঙ্গকে জড়িত করে নিয়ে, তাই তার থেকে সম্পূর্ণ সাহায্য পাওয়া অবশ্য সম্পাদকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি কয়েকটি প্রস্তাব মাত্র, এর দ্বারা বর্তমান সংস্করণের গৌরব লঘু হয় না। আচার্য স্নীতিকুমার ভূমিকায় যে আশা প্রকাশ করেছেন, সেখানেই এর যথার্থ মূল্য: "এই নবীন সংস্করণ দ্বারা এখন বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গভাষী পাঠকের পক্ষে ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মের মূল উৎস আলোচনা করিবার স্নযোগ আবার আসিয়াছে।" এই স্নযোগের ব্যবহার আমরা কতটা করতে পারব, তার ওপর নির্ভর করবে আমাদের ভবিষ্যৎ চরিত্রনির্মাণ। কিন্তু সেই স্নযোগ যাঁরা রচনা করে দিলেন, তাঁরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

রাম বসু

লোকসাহিত্যে বর্ষা

যন্ত্রলিত সভ্যতা, অর্থাৎ যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রচার যত বাড়ছে এবং মানুষ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে যতই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ততই লোক-সংস্কৃতির ধারা ক্ষীণতর হচ্ছে। ক্ষীণতর ধারার সামনে দাঁড়িয়ে বিদেশের বহু শিল্পী বুঝেছিলেন যে লোক-শিল্পের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। শুধুমাত্র অতীতের সাক্ষী হিসাবে নয়, মিউজিয়মের কোনো সামগ্রীর মতো করে নয়, অত্যন্ত জীবন্তভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। নৃতত্ত্ব বিদ্যার গৌরব হিসাবেও নয়; এই ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার আমাদের শিল্প-সাহিত্যের তাগিদে। বুদ্ধি-সর্বস্ব শিল্পচর্চা নিরক্ত রুগ্নতায় মৃতোমন্ন হতে বাধ্য। লোক-সংস্কৃতির আদি প্রবাহ সেই সঞ্জীবনী যা জীবনের দিব্যতায় আমাদের প্রসন্ন করে। রবীন্দ্রনাথ একভাবে এবং সাম্প্রতিক কালের বিষ্ণু দে অন্যভাবে সেই একই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ফোকলোর সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে সম্প্রতি। কিন্তু তার ব্যাপকতাও যেমন সীমাবদ্ধ, তীব্রতাও তেমন মৃদু। সরকারি শ্বেতহস্তীর শোভা যতটা, কার্যকারিতা তার তুলনায় অনুল্লেখ্য। তবু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বহু প্রণম্য পণ্ডিত এদিকে কিছু অগ্রসর হয়েছেন এবং তা নিতান্তই আত্মিক প্রয়োজনে। তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত অনেকদিন ধরে লোক-কবিতা ও লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে কাজ করে আসছেন। এই বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কাছে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং তাঁর সম্পাদিত 'ফোকলোর' পত্রিকাটি পরিচয়ের প্রয়োজন রাখে না। সম্প্রতি 'রেন ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড লোর' নামে একটা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এবং শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত এই গ্রন্থটির সম্পাদক।

Rain in Indian Life and Lore : Sankar Sen Gupta. Indian Publications Calcutta-1. Board Bound Rs. 12. Cloth Bound Rs. 14.

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু এই ব্যাপক বিষয়কে যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাহায্যে পরিবেশন করা দরকার ছিল তা সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি বলে মনে হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-জীবনে বৃষ্টির রূপ পরিষ্কার করে তোলা হয় নি। বিভিন্ন উপজাতির জীবনে বৃষ্টির গুরুত্বও উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে নি। অথচ যখন দেখি লোক-জীবনের কথা বলতে গিয়ে সেই সব উপজাতির উল্লেখ প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে ইতঃস্তত ছড়ান তখন মন অতৃপ্ত থেকেই যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ওরাও, কোল, ভূমিজ, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির জীবনে বৃষ্টির 'ম্যাজিক' প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য; বৃষ্টি সম্পর্কিত যে গান তাদের আছে তা সাহিত্যিক সম্পদেও ঐশ্বর্যবান। ছত্রিশগড়ি লোক-কবিতা এই দিকে অতুলনীয়। সম্পাদক ও বিভিন্ন প্রবন্ধকার সে-সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবের জন্যই সম্ভবত তাঁরা আমাদের কাছে সেই ঐশ্বর্যের বিভা তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছেন। মনে হয়, প্রদেশ বা রাজ্য হিসাবে নয়, উপজাতি হিসাবে যদি লোক-গীতি ও তাদের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করা হত তবে আমাদের মতো সাধারণ পাঠক আরও অনেক উপকৃত হতেন। অথচ যখন দেখি শ্রীধ্যানেশ চক্রবর্তী ও উষা চক্রবর্তী বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি স্বল্প পরিসরে চকিত পরিক্রমা করেন এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হতে হয়। অবশ্যই যেহেতু এই সংকলনটি ভারতীয় জীবনের প্রতি নিবেদিত সেহেতু বেদ, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সম্পূর্ণই যুক্তিগ্রাহ্য। এই যুক্তিকে স্বীকার করেও বলা যায় যে ব্যাপকতা এবং গভীরতার দিক থেকে দক্ষিণ ভারত কিছু কম না হলেও আলোচিত হয় না। অথবা জীবন বলতে গিয়ে কি ওই তিনটে বুড়ি ছুঁলেই ঝঞ্ঝাট মিটে যায়?

যা হয় নি তা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। শুধু এই অনুরোধ জানাই যে দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সম্পাদক যদি আমাদের মতো পাঠক, যারা এ বিষয়ে একেবারেই বিশেষজ্ঞ নন, তাদের প্রতি একটু লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা করেন তবে ভারতীয় লোক-জীবনে বৃষ্টি কি গভীর ও তাৎপর্যময় স্থান অধিকার করে আছে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিন্তু যা হয়েছে তাও কোনো অংশে কম মূল্যবান নয়, বরং বলা যায় ভারতীয় লোক-জীবন আলোচনার ক্ষেত্রে এই সংকলনটি বার বার উল্লেখের দাবি রাখে। এটি একটি মূল্যবান সংযোজন এবং সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য।

সরকারী খয়রাত না পেয়ে এবং এই জাতীয় গ্রন্থে বৃহত্তর পাঠক সমাজের জোরালো অবহেলা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা এমন আয়োজন করতে পারেন তাঁরা যে এই বিষয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এবং এই জন্য তাঁরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে সম্পাদকের দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রবন্ধে, 'রেন ব্রিংগস লাভ' আলোচনার মনোহারিত্বে এবং লোকগীতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখের দিক দিয়ে খুবই মূল্যবান। আবার এই ব্যাপক বিষয়ে, বৃষ্টির সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক নিয়ে শ্রী চণ্ডি লাহিড়ীর দায়-সারা আলোচনা এবং অতি পরিচিত দুটি ছড়ার অকৃপণ ব্যবহার মনকে পীড়িত করে। আবার গুজরাটের জীবন নিয়ে শ্রী পুষ্কর চন্দাড়ভক যে তথ্যবহুল ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেন এবং সেই সঙ্গে লোকগীতির যে ব্যাপক ব্যবহার করেন তাতে যে কোনো পাঠক পুলকিত হবেন। এই রকম আর দুটি প্রবন্ধ হল সরোজিনী বাবর-এর মহারাষ্ট্র লোকগীতিতে বৃষ্টি এবং শ্রীগণেশ চৌবের বিহার সম্পর্কে আলোচনা। অল্প পরিসরে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন গারো অঞ্চল সম্পর্কে শিবনারায়ণ কবিরাজ এবং পাঞ্জাব সম্পর্কে সাবিত্রী সারিন।

কিন্তু এই সংকলনের দুর্বলতা হল অপেক্ষাকৃত তাত্ত্বিক আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় সমীর ঘোষালের ফোক কাল্ট এবং ম্যাজিক ক্রিয়াকাণ্ড কিংবা পরেশ দাশগুপ্তের বৃষ্টি বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা। বৃষ্টির সঙ্গে প্রেম, বিরহ মিলনের সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেই সম্পর্ক তো আছে রোপণের। এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে অবশ্য। যৌনতার সঙ্গে তার স্বীকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে উক্তিও আছে। কিন্তু তা নিতান্তই মামুলী ধরনের। শুধু এই বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ থাকা উচিত ছিল না কি? বাংলা দেশে অম্বুবাচী সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে তাও কি উল্লেখের দাবি রাখে না? মনে হয় এইসব অপেক্ষাকৃত তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য একটা অংশ করে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি যদি আরও যত্ন সহকারে আলোচিত হত তবে পাঠক সাধারণ আরও উপকৃত হতেন। তার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব দ্বিতীয় সংস্করণের এবং প্রথম সংস্করণের এই অতৃপ্ত আনন্দ নিয়ে খুশি থাকব সাময়িকভাবে।

পরিচয়

শারদীয় সংখ্যা

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৩
আশ্বিন, ১৩৭০

সূচীপত্র

সূচীপত্র

স্কেচ ও ছবি

সোমনাথ হোড়, বিজন চৌধুরী, শ্যামল দত্ত রায়
সনৎ কর, নিখিলেশ দাস, সৌরেন মিত্র

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

শরতের শিশিরভেজা সকাল।
আকাশের সাদা মেঘে
হাল্কা হাসির ঢেউ, শিউলিফুলের
গন্ধে খুসির আমেজ।
সোনারঙ দিনের
হাসিখুসির মেলায়
উৎসবের আনন্দ সার্থক হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

[সোমনাথ রে
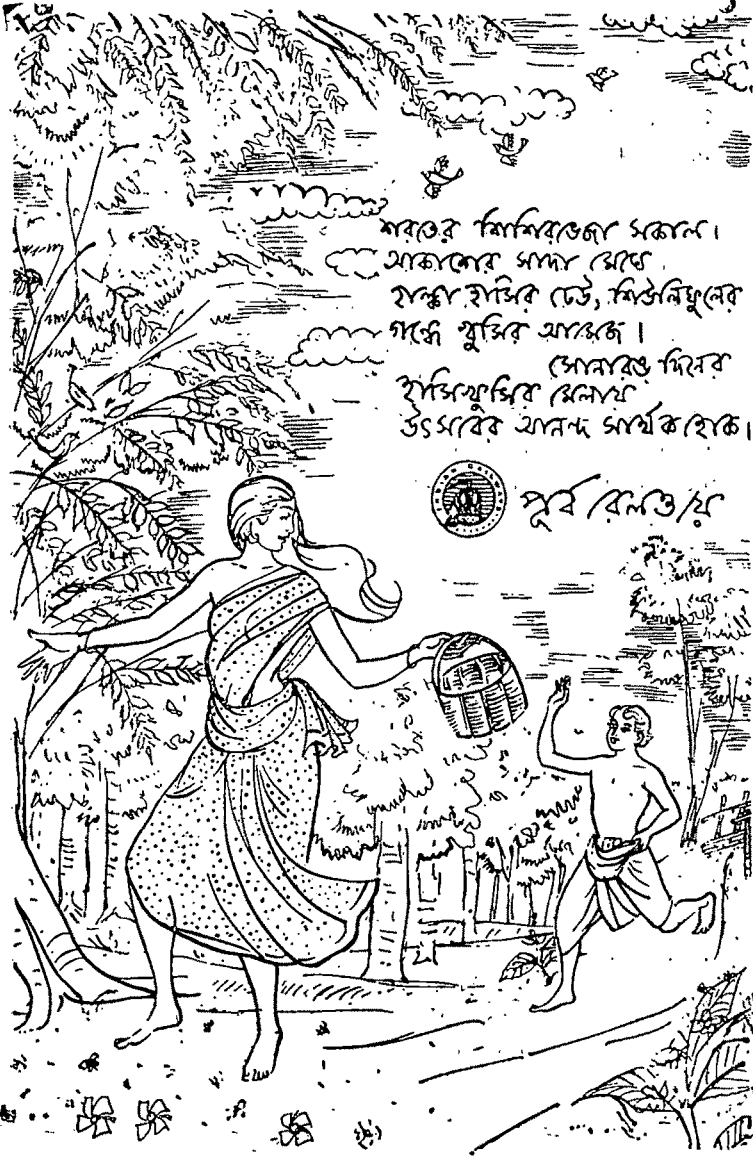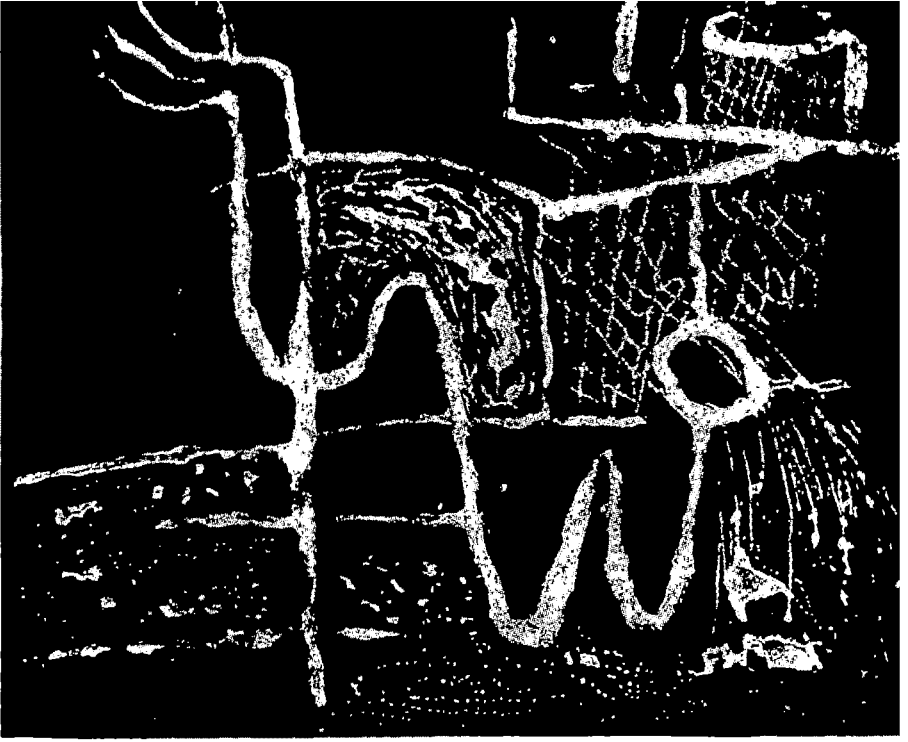
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অপ্রকাশিত উপন্যাসের খসড়া

উপন্যাসের নাম সম্ভবত রাখিব—বিষ। বদলাইতেও পারি।

ভাগ্যের অপূর্ব যোগাযোগে বাঙালী ছেলেদের—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে—কখনও পরের ইচ্ছায় কখনও নিজে সাধ করিয়া যে বিভিন্ন প্রকারের বিষ পান করিয়া জীবনকে বিষাক্ত করিতে হয় মোটামুটি তাহাই হইবে উপন্যাসের ভিত্তি। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং জীবনের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত কতগুলি যুবক হইবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। ইহাদের মধ্যে দুটি চরিত্রের উপর বিশেষভাবে জোর দিব। একজন বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান ছেলে, বড় হইবার সুযোগেরও তাহার কোন অভাব নাই—না অর্থের, না পৃষ্ঠপোষকতার, না ইচ্ছার। জীবনে সে কিছু করিতে চায়—বড় কিছু। সেজন্য চেষ্টাও করে। তবু কিছুই করিতে পারে না। জীবনের বৃহত্তর মহত্তর বিকাশের বিপুল কামনা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া সে ব্যর্থ নিরর্থক জীবন যাপন করে। রাজমিস্ত্রি গৃহনির্মাণের কৌশল না জানিলে যেমন বিরাট রাজপ্রাসাদ নির্মাণের উপকরণ লইয়া ছোট একটি একতলা বাড়িও গড়িয়া তুলিতে পারে না—তাহাকে কেবল অর্থহীন সৃষ্টির ভাঙাগড়া লইয়াই থাকিতে হয়—এই ছেলেটিও তেমনভাবে কোনোদিকে নিজেকে কাজে লাগাইতে পারে না। কেন এমন হয়, মাটিতে পা পাতিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে মস্ত পালোয়ানের গায়ের জোর যেমন নিরর্থক হইয়া থাকে তেমনিভাবে এই ছেলেটির শক্তিমান মনটিও কেন অশক্ত হইয়া যায়—ইহার চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে উপন্যাসে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা থাকিবে। অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দু-একটির উল্লেখ করিতে পারি। একটি কারণ, হৃদয়মনের গঠনে সঙ্গতির অভাব, সামঞ্জস্যের অভাব। নিজের মধ্যেই তাহার এমনি ভিন্নমুখী বিপরীত

শক্তি আছে যাহা পরস্পরকে সংহত করিয়া রাখে। দ্বিতীয় কারণ, শিক্ষার দোষে, দুষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শের দোষে, বাস্তবতার সহিত বিকৃত সম্বন্ধ। এমনি অনেক কিছু।

আরেকটি প্রধান চরিত্র মধ্যবিত্ত সংসারের একটি ছেলে। যে অ আ শিখিবার সময় জানিয়া রাখে একদিন বি. এ. পাশ করিয়া খুব মোটা মাহিনায় —একশ দেড়শ টাকায় চাকরি করিয়া সুখে দিন কাটাইবে। ইহার চরিত্র অনেকটা হইবে বাংলার অধিকাংশ স্কুল-কলেজে-পড়া ছেলেদের চরিত্রের প্রতিচ্ছবির মত। তবে ইহার জীবনের কথা লিখিতে বসিয়া যে বেকার সমস্যাই বড় করিয়া দিব তাহা নহে—এ যুগের ছেলেদের কিরকম খিচুরি-পাকানো প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে, নিজস্বতা বিসর্জন দিয়া কিভাবে ধার-করা টুকরা টুকরা চরিত্রে নিজেদের চরিত্র গড়িয়া তোলে, ডাঁটা-ছেঁড়া পদ্মের মত অবলম্বনহীনভাবে কিভাবে ভাসিয়া বেড়ায়—এই সমস্ত ফুটাইবার চেষ্টা করিব। ইহার পারিবারিক জীবনের উপর উপন্যাসের যবনিকা তুলিব। একটি ঠাকুরদাদা (সেকেলে বৃদ্ধের টাইপ), বাপ মা ভাইবোন, সুখ দুঃখ ভাল মন্দ জড়ানো সংসার। ঠাকুরদাদার চরিত্র একটু বিশিষ্ট হইবে, কারণ নাতির প্রতি গভীর মমতার সূত্রে তাহার ও নাতিটির চরিত্রের কতগুলি বিস্ময়কর বিরুদ্ধতা ফুটাইবার সুযোগ গ্রহণ করিব।

আরও অনেক চরিত্র থাকিবে। বর্তমান বাঙালী সমাজের একটু ছায়াপাত হইবে—উপন্যাসের পরিপূর্ণতার জন্য যে সমস্ত প্রয়োজন। কয়েকটি স্বাভাবিক নারী চরিত্র থাকিবে। ঘটনা ইত্যাদি তো থাকিবেই।

দুই

১। গল্পের মূল বিষয়—সেকেলে ধরনের এক রাজার নায়েব ম্যানেজার বা দেওয়ানের উস্কানিতে রাজার বিরাট এক এরোড্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রজার চাষের জমি বেদখলের চেষ্টার ফলে প্রজার সঙ্গে সংঘর্ষ।

২। রাজার সেকেলে জাব্বাজোব্বা-পরিহিত গদিতে আসীন দেওয়ান দুগ্ধ পান করলে—গদীতে গুটিসুটি পাকিয়ে মরে আছেন দেখা গেল—"ক" দেওয়ান-পদপ্রার্থী—এ তার ষড়যন্ত্র—রাজবাড়িতে বিষদান গুম খুন ইত্যাদি কত কাণ্ড চলে তার একটা ইঙ্গিত।

৩। "ক" দেওয়ানের গদিতে বসতে যাবে সব ঠিকঠাক, দূরে ব্রিটিশ

[illegible]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তাক্ষর

প্রতিনিধি একটু আঙুল নাড়ল—"ক" বাতিল হল—এল সায়েব ম্যানেজার "খ" —ব্যর্থতার জ্বালায় "ক" প্রতিহিংসার মতলব ভাঁজে—ক্রমাগত পায়চারি করে ঘরের মধ্যে—নতুন ম্যানেজার "খ"র জন্য হল চেয়ার টেবিলের আধুনিক আপিসের ব্যবস্থা—"ক" প্রজাদের তলে তলে ক্ষেপিয়ে তোলে—

৪। 'খ'র ইঞ্জিনিয়ার লোকজন নিয়ে এরোড্রামের জমির সীমানা মাপতে যায়—প্রজারা লাঙল নিয়ে জমিতে এসেছে—তাদের বলা হয় জমি চষা বন্ধ করতে—তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছে—একসঙ্গে প্রতিবাদ করে…

৫। জমি বিক্রির খতে কেউ সই বা টিপসই দেবে না—"ক" তাদের পক্ষে তো আছেই আর আছে তাদেরই নায়ক 'গ'—যার বহু বাড়িও এরোড্রামের এলাকার মধ্যে পড়ে—'ক'কে পক্ষে পেয়ে সকলে উৎসাহী কিন্তু 'গ'র ওপরেই তাদের আসল বিশ্বাস—

৬। 'ক'কে ডাকিয়ে 'খ' ঘুষ দেয় এরোড্রোম সংক্রান্ত মোটা টাকার একটা contract—সঙ্গে সঙ্গে 'ক' মত বদলায়—অনুগত হয় রাজার—বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রজাদের উস্কায় জমি বেচতে—তাকে বাতিল করে এবার প্রজারা 'গ'কে নেতা করে—(একজন প্রজা খতে সই করে—অন্য বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে contrast হিসাবে এই ভীরু কাপুরুষ চোরের মত চেহারা ও প্রকৃতির চরিত্রটি গল্পে সামান্য অংশ নেবে)

৭। এদিকে প্রজারা জমি তৈরী করে চলেছে চাষের জন্য—জীবনধারা বয়ে চলেছে নিজস্ব ধারায়—'গ'র সুন্দরী অল্পবয়সী স্ত্রী 'অ' শিশু নিয়ে সংসারের কাজ—বুড়ো শ্বশুরের সেবা করছে—রাজার হাতির মাহুত 'ঘ'র মেয়ে তার সই 'আ'র সঙ্গে হাসিতামাসা করছে···

৮। 'গ'কে লোভ দেখানো ভয় দেখানো হল—জমি সে বেচবে না—রাত্রে আগুন লাগল 'গ'র বাড়িতে—মোটা মাটির দেয়ালের ঘরে 'গ' সপরিবারে বন্দী—এদিকে 'ক' ও 'খ'র ষড়যন্ত্র আগে থেকে ঠিক হয়ে ছিল—ভাড়া করা একদল লোক হৈ হৈ করে ছুটে গিয়ে 'গ'র জ্বলন্ত বাড়ি ঘিরে ফেলেছে আগুন নেভাবার ছুতায়—

লোক দেখিয়ে জল এনে ঢেলে দিচ্ছে মাটিতে—প্রজারা কেউ ঘেঁষতে পারছে না কাছে, "হট যাও—হট যাও" করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুন নেভাবার মিথ্যা চেষ্টা ও ছুটোছুটি আরও বাড়িয়ে দিয়ে—ঘরের মধ্যে কাস্তে খন্তি যা আছে নিয়ে 'গ'রা পাগলের মত চেষ্টা করছে পাথরের মত শক্ত দেয়াল খুঁড়তে, বাইরে থেকে বন্ধ করা দরজা ভাঙতে—চালায় লক লক করছে আগুনের শিখা—দূরে রাজপ্রাসাদে রাজা ও 'খ' ও 'ক' মদের গ্লাস হাতে চেয়ে দেখছে আগুন—'খ' পিঠ চাপড়ে দিল রাজা ও 'ক'র—রাজা শুয়ে পড়ল অনুগতের মত—'ক' আরও বেশী—

'আ' তার বাপ 'ঘ'র সাহায্যে ছুটল বড় হাতিটা নিয়ে—হাতি দেয়াল ভেঙে উদ্ধার করল 'গ'কে···

৯। 'ঘ' পেল প্রচণ্ড নির্যাতন—দূর করে দেওয়া হল তাকে—হাতি 'ঘ'র প্রাণের দোসর—আজ কতকাল সে ওদের মাহুত—কেঁদে কেঁদে শেষে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল মেয়েকে সাথে করে—

১০। ক্ষেতে চারা বড় হয়েছে—আগামী ফসলের স্বপ্ন দেখছে প্রজা—'গ'কে আবার বোঝাবার চেষ্টা হল—জমি বেচতে সে রাজী হোক—সকলকে রাজী করাক—ফসল কাটা পর্যন্ত এরোড্রোমের কাজ বন্ধ থাকবে—জমির উপযুক্ত মূল্য সবাই পাবে—'গ' রাজী নয়।

'গ' বাড়ি নেই নতুন মাহুত রাতের অন্ধকারে হাতি নিয়ে এল 'গ'র ক্ষেতের ফসল তছনছ করতে—'গ'র বাবা টাঙ্গি নিয়ে ছুটে গেল···আঘাত করল মদ্দা হাতিটার মাথায় দিশেহারা হয়ে—শেষে গেল হাতির পায়ে—আঘাতের বেদনায় ছুটল হাতি—সামনে পড়ল শিশু কোলে 'অ'—শুঁড়ে জড়িয়ে

তাকে ছুঁড়ে দিল—শিশুটি মরল…(হাতি দূরে পুরানো মাহুতের কাছে চলে গেল, এটাও দেখানো চলে—মিলনের আনন্দ উল্লাস)

১১। 'খ'র লোক কুড়িয়ে নিয়ে গেল 'অ'কে…

১২। 'গ' ফিরে এল…প্রতিবেশীরা মূক…বাড়ি শূন্য

১৩। রাতের আঁধারে 'গ' গিয়েছে 'অ'কে খুঁজতে—খুঁজে না পাক 'ক' বা 'খ'কে খুন করবে সঙ্গের ছোরা বসিয়ে—সে ধরা পড়ল—বন্দী হল প্রাসাদের পুরানো অংশের এক ঘরে—কানে এল 'অ'র ক্ষীণ কান্না—পাগলের মত মুক্তির চেষ্টা করতে পেল গুপ্ত পথ—ওপরে আরেক ঘরে এল—সে ঘরেও একজন বন্দী—রাজার আত্মীয়—পাগল—ঘর থেকে বার হবার পথ নেই—পাশের ঘরে 'অ' আর্তনাদ করছে—'খ' অত্যাচার করতে উদ্যত—কয়েক ইঞ্চি এক ঘুলতির ফাঁকে ওঘরের একটু অংশ চোখে পড়ে মাত্র—

১৪। 'গ' কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে খবর ছড়িয়েছিল প্রজাদের মধ্যে—দল বেঁধে তারা কিছুক্ষণ পরেই অনুসরণ করেছে তাকে। হাতি ফিরিয়ে নিয়ে 'আ' ও তার বাবা। বন্ধ গেটের সামনে প্রজারা 'ও' ও 'অ'র মুক্তি চায়—সে শব্দ পৌঁছায় 'গ'র কাছে—বন্দুক নিয়ে 'খ' ও রক্ষীরা ভেতরে প্রস্তুত —মাথা দিয়ে হাতি গেট ভাঙতে চেষ্টা করে—'খ'র গুলিতে মরতে হয় তাকে —কিন্তু গেট তখন ভেঙ্গে গেছে—বন্যার মত প্রজারা ছুটেছে লাঠি বন্দুক অগ্রাহ্য করে—'ক' 'খ' ভেঙে যায় কুটোর মত—'গ' ও 'অ'কে মুক্ত করে আনে প্রজারা…

অতি অল্প সময়ে কল্পনা করা—অনেক অদল বদল পালিশ দরকার।

সত্যজিৎ রায়-কৃত চিত্রনাট্য

মহানগর

প্রথম দৃশ্য

কলকাতা, ১৯৫২ সাল। শীতকালের সন্ধ্যা। কালীঘাটের নেপাল ভট্টাচার্যি লেন-এ একটা কাটা ঘুড়ি পড়ছে। একদল ছেলে সেই ঘুড়ির উদ্দেশে হৈ-হল্লা ছুটোপাটি করছে।

সুব্রত মজুমদার (বয়স বছর বত্রিশ) ছেলেদের ভিড় ভেদ করে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

সুব্রতর বাড়ি। প্রিয়গোপালের ঘর।

প্রিয়গোপাল (বয়স ৬৫) সন্ধ্যার আলোতে তার ঘরের কোনায় বসে ডিকশনারি খুলে commonsense crosswords করছে।

সুব্রত : (নেপথ্যে) পিণ্টু!

সুব্রতর গলা শুনে প্রিয়গোপাল crossword থেকে মুখ তুলে ঘরের দরজার দিকে চায়।

প্রিয় : কে, ভোম্বল ?

সুব্রত প্রিয়গোপালের দরজার বাইরে থামে।

সুব্রত : বাবা।

প্রিয় : টেলিফোন করেছিলি ?

সুব্রত : কাকে ?

প্রিয় : তোকে বললাম না—আমার এক ছাত্র চোখের ডাক্তার হয়েছে···

সুব্রত : ছাত্র বলে কি আর বিনি পয়সায় চোখ দেখে চশমা করে দেবে বাবা ?

প্রিয় : আহা, কিছুটা consider তো করতে পারে !

সুব্রত : আমি তো বলেইছি বাবা—এদিকে একটু সুবিধে হলেই আপনার চশমার ব্যবস্থা করে দেবো।

প্রিয়গোপাল একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে আবার crossword-এ মনোনিবেশ করে।

সুব্রতর ঘর।

সুব্রতর বোন বাণী (বয়স ১৪) টেবিলে বসে পড়াশুনা করছে। তার কলমে ভালো লেখা হচ্ছে না। কালি ফুরিয়েছে কি? বাণী কলমটা ঝাড়া দিতেই একগাদা কালি মেঝেতে পড়ে। বাণী জিভ কেটে দেরাজ খুলে একটা ন্যাকড়া বার করে। পিছনের দরজা দিয়ে ছেলে পিণ্টুকে (৬ বছর) কোলে নিয়ে সুব্রতর প্রবেশ। সুব্রত পিণ্টুকে কোল থেকে খাটের উপর নামায়।

সুব্রত : আর তোমার কী চাই ?

পিণ্টু : আমার টিকিট ?

সুব্রত : টিকিট ?

সুব্রত কোটের পকেট থেকে তুটো ট্রামের টিকিট বার করে পিণ্টুকে দেয়।

সুব্রত : এই নাও—একটা হলদে, একটা কালো !

সুব্রত তার কোটটা খুলে খাটের পিছনের দেয়ালের আলনাতে ঝুলনো মাত্র বাণী এসে তার পকেট থেকে একটা ফাউণ্টেনপেন বার করে নেয়। পিণ্টু পিসির দিকে কটমট করে চায়।

পিণ্টু : বাবার পেন নিয়েচ কেন ?

বাণী : (ভেংচি দিয়ে) হ্যাৎ !

বাণী তার বইখাতা নিয়ে পাশের ঘরে যাবার পথে সুব্রত তার বিনুনিটা খপ করে ধরে ফেলে।

বাণী : আঃ—ছাড়ো !

সুব্রত বিনুনি ছাড়ে না।

সুব্রত : পরীক্ষার আর কত দেরি ?

বাণী : দেড় মাস।

সুব্রত : বাবার কাছে পড়েছিস ?

বাণী : হ্যাঁ।

সুব্রত : কতক্ষণ ?

বাণী : দু ঘণ্টা।

সুব্রত : ধমক খেইছিস ?

বাণী : না।

সুব্রত বাণীর বিনুনি ছেড়ে দু হাতে সস্নেহে তার কাঁধ ধরে কাছে টেনে আনে।

সুব্রত : কী হবে আর পড়ে ?

বাণী : কেন ?

সুব্রত : সেই তো হাঁড়ি ঠেলতে হবে—বৌদির মতো !

আরতি (২৭ বছর বয়স) চা হাতে দরজা দিয়ে ঢোকে।

আরতি : (বাণীর উদ্দেশে) বেচারা !

বাণী দাদার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পাশের ঘরের দিকে রওনা দেয়।

বাণী : আমাদের তো শেখায়।

সুব্রত : কী ?

বাণী : হাঁড়ি ঠেলা—Domestic Science !

আরতি সুব্রতকে চা দিয়ে ছেলেকে গরম জামা পরায়। সুব্রত চা নিয়ে খাটে বসে।

সুব্রত : Earning memberকে এইভাবে neglect করছ ? সেই কখন এসেছি !

আরতি : কী করব। চা ফুরিয়েচে খেয়াল ছিল না। এই তো আধ ঘণ্টা আগে অতসীদিদের বাড়িতে গিয়ে—

সুব্রত : চেয়ে আনলে ?
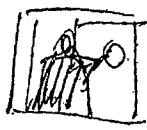
সত্যজিৎ রায়ের খাতা থেকে
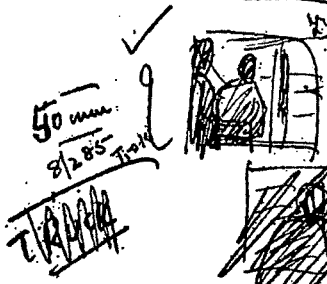
আরতি : উপায় কী ? আপিস থেকে এসে চা না পেলে তো কুরুক্ষেত্র বাধাতে।

সুব্রত : দুর্—তুমি আর prestige-টেস্টিজ···(চায়ে চুমুক দেয়) এ চাও তো বলিহারি ! ওরা আসলে হাড়কিপটে।

সুব্রত চা শেষ না করেই উঠে পড়ে। আরতি একটা মিক্সচারের বোতল ঝাঁকিয়ে কাঁচের গেলাসে ওষুধ ঢালছে। সুব্রত এগিয়ে এসে হাতের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখে।

আরতি : বাবা কী বলছিলেন ?

সুব্রত : সেই আবার চশমা ! সন্ধে করে বসে crosswordগুলো করবেন—কিছু টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, আর চোখের মাথাটি খাচ্ছেন।

আরতি : বেচারি ! একটা কিছু তো করতে হবে মানুষটাকে !

আরতি জানালার দিকে যায় কুঁজো থেকে জল ঢালতে।

সুব্রত : এখন কিন্তু ইচ্ছে করলে একটা টিউশনি করতে পারেন। বলতে নেই—তোমার নার্সিং-এর গুণে···

আরতি জল আর ওষুধ নিয়ে এগিয়ে আসে।

আরতি : আমি করতে দিলে তো।···মাথার কাপড়টা একটু দিয়ে দাও না !

সুব্রত আরতির ঘোমটাটা টেনে দেয়।

সুব্রত : আমিও কি চাই নাকি। কেবল সংসারের কথাটা ভেবে···

আরতি : এই শোনো—মার জর্দা এনেছ ?

সুব্রত : (জিভ কেটে) ইস্ !

আরতি : ছি ছি—এত করে বলে দিলেন।

সুব্রত : ঠিক আছে, ওটা আমি manage করে নেবোখন। তুমি ওদিকটা দেখো তো—চশমার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো বাবা তবু তোমার কথা শোনেন টোনেন। যাও।

আরতি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রিয়গোপালের ঘর। প্রিয়গোপাল এখনও ল্যাম্পটা না জ্বালিয়েই কাজ করছেন। আরতি ওষুধটা রেখে ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দেয়।

আরতি : এটা খেয়ে নিন বাবা।

প্রিয়গোপাল ডিকশনারি বন্ধ করেন।

প্রিয় : আর কদ্দিন চলবে মা—তোমার এই তেতোপ্যাথি ?

আরতি প্রিয়গোপালের বিছানাটা পেতে দেয়।

আরতি : শরীরটা সারিয়ে নিতে হবে বাবা !

প্রিয় : এই অকেজো মানুষের শরীর নিয়ে কী হবে বলো বৌমা। কাজে তো লাগতে পারব না কোনোদিন !

আরতি : একটু হেঁটে চলেও বেড়াতে পারেন। পার্ক আছে—সকাল সন্ধে গিয়ে তো বসতেও পারেন।

প্রিয় : ও বসে দেখেছি বৌমা। যত বাজে লোকের আড্ডা। বুড়োরা পর্যন্ত কেবল gossip আর পরনিন্দা।

প্রিয়গোপাল ওষুধটা খেয়ে মুখ বিকৃত করে।

প্রিয় : তুমি ভোম্বলকে একটু বলবে বৌমা ?

আরতি প্রিয়গোপালের কোটটা ঝেড়ে আলনায় ঝুলিয়ে রাখে।

আরতি : চশমা ?

প্রিয় : হ্যাঁ। ভোম্বল আর আমার কথা শোনে না। সে কেমন জানি বদলে গেছে।

আরতি প্রিয়গোপালের দিকে এগিয়ে আসে।

আরতি : আপনিও তো কথা শোনেন না, বাবা। সন্ধে করে যে ওইসবগুলো নিয়ে বসেন ! ইস্—দেখুন তো—চোখ দুটো লাল হয়েছে !

প্রিয় : হ্যাঁ—ওই চোখের জন্যেই তো…

আরতি : দাঁড়ান, আমি একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসি। আপনি বেশ করে একটু ঝাপটা দিন দিকি।

আরতি দরজার দিকে চলে যায়।

দাওয়া।

সরোজিনী (৫৫ বছর) ক্যামেরার দিকের কোণে বসে রান্না করছে। বিপরীত কোণে প্রিয়গোপালের ঘর থেকে আরতি বেরিয়ে আসে।

আরতি : এবার আপনি উঠুন মা। আপনার আবার কোমর ধরে যাবে। মাছটা আমিই করে নেবো'খন।

উঠোনের দিক থেকে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে সুব্রত দাওয়ায় উঠে আসে।

সুব্রত : মাছের কী হচ্ছে কি ?

সরো : তুই যা ভালোবাসিস তাই।

সুব্রত : দমপোক্ত ?

আরতি : হ্যাঁ গো হ্যাঁ !

সুব্রত : (আঙুল দিয়ে আরতির দিকে দেখিয়ে) তা সে ও রাঁধতে যাবে কেন ? না না না। এমনিতে তো হপ্তায় তিনদিন মাছ···

সরো : ও কি পারে না রাঁধতে রে ? পারে—

সুব্রত : না না মা। ও সব risk-এর মধ্যে গিয়ে লাভ নেই···

আরতি : ঠিক আছে মা। আপনিই রাঁধুন। কাল না হয় সারাদিন বিশ্রাম নেবেন।

আরতি ঘটিতে করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে প্রিয়গোপালের ঘরের দিকে চলে যায়।

সুব্রতর ঘর।

সুব্রত দাওয়া থেকে এসে তার জহর কোটটা আলনা থেকে নিয়ে সেটা পরে। তারপর আয়নায় দেখে চুল আঁচড়ায়। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আরতির প্রবেশ।

আরতি : বেরোচ্ছ ?

সুব্রত : যাই একবার—ছাত্রের বাড়ি ঘুরে আসি যদি বাকি মাইনেটা মেলে।…আমার কোটের পকেটে কিছু খুচরো আছে—দাও না গো।

আরতি পকেট থেকে খুচরো বার করে এনে সুব্রতকে দেয়।

সুব্রত : তোমার treasury কী বলে ?

আরতি : আর তিনদিনের বাজার খরচ আছে।

সুব্রত : বাণীর দু মাসের fees বাকি।

আরতি : জানি।

সুব্রত : তাই ভাবলাম একবার…

আরতি : শোনো—

সুব্রত : কী ?

আরতি : অবনী ঠাকুরপোর কাছে কিছু ধার চাইবে বলেছিলে না ?

সুব্রত : ওদের ব্যাপারটা জান না ?

আরতী : কী ?

সুব্রত : (গলা নামিয়ে) ওদেরও ঘাড়ে কিছু পুষ্যি এসে জুটেছে। ফলে দুজনকেই দশটা পাঁচটা করতে হচ্ছে।

আরতি : দুজনে মানে ?

সুব্রত : Husband and wife !…চলি। ফিরতে আটটা সাড়ে আটটা।

সুব্রত চলে যায়।

আরতি দরজার মুখটায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখে চিন্তা ঘনিয়ে এসেছে।

। প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

মাতৃভাষা

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু,
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

হায়দরাবাদে আপনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা "মাতৃভাষা" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ও তার এক কপি আপনি আমাকে সাদরে উপহার দিয়েছেন। এর জন্যে যদি আমি ধন্যবাদ দিই তাহলে সেটা মামুলী শোনাবে। আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর।

শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষাই হওয়া উচিত এটা আপনার বহুকালের মত। আপনার পুরোনো মতই আপনি নতুন করে ব্যক্ত করেছেন। ভুল বোঝার কোনো অবকাশ রাখেন নি। অথচ এই নিয়ে ভুল বোঝারও বিরাম নেই। অনেক কটু কথাই আপনাকে শুনতে হচ্ছে। আরো শুনতে হবে। কারণ আপনি একটা বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। বিতর্কটা যদি শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে হতো তাহলে তা অত তীব্র হতো না। তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আরো পাঁচটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারা যায় না।

বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইংরেজদের আমলেও ছিল। যারা ডাক্তারি পাশ করত তাদের বলা হতো ভি. এল. এম. এস। ছেলেবেলায় এরকম ডাক্তার জনা-তিনেক দেখেছি। তখনকার দিনে যাকে মাইনর পাশ বলা হতো তার একটা স্বদেশী সংস্করণও ছিল। তার নাম মিডল ভার্নাকুলার। এম. ভি. পাশ করে কেউ কেউ হাই স্কুলে আসত। তাদের বসিয়ে দেওয়া হতো কয়েক ক্লাস নিচে। তারা ইংরেজি শিখে নিয়ে পরে প্রমোশন পেতো।

তা ছাড়া ছিল মাদ্রাসা, মক্তব ও টোল। এখনো আছে। জনগণকে আপনি ইচ্ছা করলে মাদ্রাসায়, মক্তবে ও টোলে পড়াতে পারেন। সেসব ভার্নাকুলার স্কুল, ভার্নাকুলার মেডিকাল স্কুল অন্য নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আজ এই মুহূর্তেই কোটি কোটি বালক-বালিকাকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করতে পারা যায়। এর জন্যে শুধু এইটুকু করলেই যথেষ্ট হবে যে শিক্ষকদের বা অধ্যাপকদের নির্দেশ দেওয়া হবে ইংরেজি বই দেখে মাতৃভাষায় পড়াতে ও পরীক্ষকদের

নির্দেশ দেওয়া হবে মাতৃভাষায় প্রশ্ন করতে, উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে। পরে ইংরেজি বইয়ের বদলে মাতৃভাষায় বই লিখিয়ে নেওয়া হবে।

কিন্তু আপনার ভার্নাকুলার স্কুলের বা কলেজের সঙ্গে সঙ্গে যদি একসার ইংরেজি স্কুল বা কলেজ থেকে যায়, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যদি সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়, তা হলে দেখবেন তাদেরই বাজারদর ও সামাজিক মর্যাদা বেশি। স্বাধীনতার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জনগণের জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যম বরাদ্দ করেছে। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যম নিষেধ করে দেয় নি। কলকাতা শহরেই অনেকগুলি নতুন স্কুল হয়েছে, সেখানে ইংরেজিতে পড়ানো হয়। চারগুণ খরচ, তবু ছেলেমেয়ের ভিড়। বিহারে তো হিন্দীর জয়জয়কার। কিন্তু মিশনারিদের স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়ে গেছে। বাপ মা হিন্দীর অধ্যাপক অধ্যাপিকা, মেয়েকে দিয়েছেন কনভেণ্ট স্কুলে। কটক থেকে এক মন্ত্রী এসেছিলেন শান্তিনিকেতন দেখতে। বললেন তাঁর দুই ছেলেকে তিনি দিয়েছেন দিল্লীতে, কোনো এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে।

ইদানীং শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে বাংলা মাধ্যমের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইংরেজি মাধ্যমও প্রবর্তিত হয়েছে। যারা দূর থেকে আসবে তাদের জন্যে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাংলা মাধ্যমে এতকাল যারা পড়ে এসেছে তাদের কেউ কেউ এক বছর লোকসান দিয়েও ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে চায়। কেন এই দুর্মতি? বাঙালীর মেয়ে কেন বাংলা মাধ্যম ছেড়ে ইংরেজি মাধ্যম বরণ করে? আমার মেয়ে নয়, আমি এর উত্তর দিতে পারিনে।

আপনি বৈজ্ঞানিক মানুষ। তথ্য নিয়ে আপনার কারবার। তথ্য হচ্ছে এই যে, বালক-বালিকাদের মধ্যেও দু মত দেখা যায়। তাদের গুরুজনদের মধ্যেও। ইংরেজি মাধ্যম অস্বাভাবিক ও ব্যয়সাপেক্ষ। তা সত্ত্বেও বাপ মা ছেলেমেয়েকে কনভেণ্ট স্কুলে পাঠায়, মিশনারি স্কুলে দেয়, ক্ষমতায় কুলোয় তো দেরাদুনে রাখে। আপনি হয়তো ভাবছেন এরা ইঙ্গবঙ্গ। না, এরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, কেউ কেউ সাম্যবাদী। কারো কারো মতবাদ সাম্প্রদায়িক। ইংরেজের উপর যারা হাড়ে হাড়ে চটা ইংরেজির উপর তাদের অন্ধ নির্ভরতা। তাদের বিশ্বাস ইংরেজি ধরনের শিক্ষাই সত্যিকার শিক্ষা, দেশী ধরনের শিক্ষা তারই একটা সুলভ সংস্করণ। যেমন সেকালের সেই ভি. এল. এম. এস.।

জোর জবরদস্তি করে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল কলেজ উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা যদি না করেন, যদি "বাঁচো আর বাঁচাও" নীতি মেনে সেগুলিকেও টিকে থাকতে দেন, তা হলে দেখবেন হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী সেই সব স্কুল কলেজেই পড়তে চাইবে। ইংরেজিতে পাঠ্যপুস্তক অসংখ্য। মাতৃভাষায় অত নয়। সুতরাং শিখবেও তারা বেশি। যতদিন না গায়ের জোরে ইংরেজি মাধ্যমের মূলোৎপাটন হচ্ছে ততদিন কতক লোক ওর পক্ষপাতী ও পৃষ্ঠপোষক থেকে যাবেই। প্রতিযোগিতায় তাকে হটানো সহজ নয়। বরং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে-ই সহায়।

যে দেশে হিন্দীভাষীর সঙ্গে তামিলভাষীর প্রতিযোগিতা, বঙ্গভাষীর সঙ্গে উর্দুভাষীর প্রতিযোগিতা সে-দেশে ইংরেজিকে কতক লোক শত্রু না ভেবে মিত্র ভাববেই। জাপানে বা জার্মানিতে এ সমস্যা নেই, কারণ ভাষা তাদের আমাদের মতো চোদ্দ-পনেরোটা নয়, একটাই। জাপানের বা জার্মানির উদাহরণ আমাদের জনগণের কাজে লাগতে পারে, তারা প্রতিযোগিতায় নামে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রতিদিন প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। কতরকম পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। চাকরিতে বহাল হতে হয়। চাকরি রাখতে হয়। প্রমোশন আশা করতে হয়। মাতৃভাষার মাধ্যম বড় জোর পশ্চিম বঙ্গে ফলপ্রদ হবে, কিন্তু সারা ভারতে? হিন্দীভাষীরা এর উত্তরে বলবেন, হিন্দীই জনপথ তথা রাজপথ। সবাইকে হিন্দী মাধ্যম মেনে নিতে হবে। কিন্তু হিন্দী কি বাঙালীর মাতৃভাষা? তামিলের মাতৃভাষা? ইংরেজি মাধ্যমের পরিবর্তে হিন্দী মাধ্যম প্রবর্তন কি মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এদের বেলা?

প্রতিযোগিতার বালাই যদি না থাকত, প্রতিযোগিতার পরিসর যদি ভারতব্যাপী না হতো, তাহলে যে যার মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষালাভ করলে ভালোই হতো। কিন্তু আমরা জানি যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি ধাপেই প্রতিযোগিতা। শিক্ষা শেষ হলে চাকরির জন্যে প্রতিযোগিতা। চাকরি জুটে গেলে প্রমোশনের জন্যে প্রতিযোগিতা। সুতরাং প্রতিযোগিতার উপর দৃষ্টি রেখেই পড়াশুনা করতে হয়। জনগণের জীবনে এ সমস্যা নেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে তো আছে। এই শ্রেণীটা যতদিন থাকবে, এ সমস্যা যতদিন থাকবে, ততদিন শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত অনিবার্য। একদল তর্ক করবেন ইংরেজি রাখার পক্ষে, আরেক দল ইংরেজি হটানোর পক্ষে। তবে এটাও দেখছি যে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজি সকলের কবুল।

আমি জোর জবরদস্তির সমর্থন করব না। আমি বলব, এক-একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটা মাধ্যম হোক। কোনোটার তামিল, কোনোটার তেলেগু, কোনোটার হিন্দী, কোনোটার বাংলা। সেইসঙ্গে কোনো কোনোটার ইংরেজি। যাদের বদলির চাকরি তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি পছন্দ করবে। সারা ভারতে যদি চারটে ইংরেজি মাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয় থাকে ও তাদের অধীনে চার সেট স্কুল কলেজ থাকে তা হলেই যথেষ্ট। বিশ ত্রিশ বছর পরে লোকে ফল দেখে বুঝবে ইংরেজি মাধ্যম ভালো কি মন্দ। যদি ভালো হয়ে থাকে তা হলে আরো কিছুকাল থাকবে। বরাবরও থেকে যেতে পারে। ইংরেজির অপরাধ তো এই যে ওটা বিদেশী ভাষা। আরবী-ফারসীরও সেই একই অপরাধ, উর্দুর অপরাধও তার কাছাকাছি যায়। "বিদেশী" বিশেষণটা শিক্ষার ক্ষেত্রে বড়ই শ্রুতিকটু। বিদেশীর কাছে যদি শেখবার থাকে তবে শিখতে হবে, চাইকি আরো পঞ্চাশ বছর।

সশ্রদ্ধ নমস্কার। ইতি। ভবদীয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

[শ্যামল দত্তরায়

সনৎ কর]

গোপাল হালদার

মস্কৌতে তিনটি দিন

শুক্রবার, শনিবার, রবিবার—তিনটি দিন, এই জুলাই (১৯৬৩) মাসের ১৯শে, ২০শে, ২১শে মস্কৌতে কাটালাম—বিচিত্র ঘটনায় ভরা দিন তিনটি। বলশোই থিয়েটরে মায়কভ্স্কির ৭০ বার্ষিক জয়ন্তী উৎসব; শনিবার সকাল ১০টায় সকোল্নকি পার্কে বিদেশে এই সর্বপ্রথম 'ভারতীয় প্রদর্শনী'র উদ্বোধন, আর রবিবার সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি সভা।

মস্কৌর আবহাওয়া

ঘটনার অভাব মস্কৌতে অবশ্য কোনো সময়েই নেই। ইতিহাসের এক-পা আজ মস্কৌতে আরেক পা ওয়াশিংটনে। সেই পা-তোলা পা-ফেলায় নাকি পৃথিবীর পদাবলী আজ রচিত হয় আবার তাতেই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয় অন্যান্য দেশের জীবনযাত্রা। মস্কৌতেও তো এই সময়েই চলছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের শাস্ত্রীয় বিচার—অর্থাৎ তর্ক-বিতর্ক। (শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্বেই তা স্থগিত থাকে অর্থাৎ বন্ধ হয়।) অন্যদিকে—সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে মার্কিন-ব্রিটিশদের আণবিক অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা—ওটা অবশ্য শস্ত্র-বিচার। এ সব হল রুদ্ধ কক্ষের 'ঘটনা', সাধারণের তাতে প্রবেশ নেই। কিন্তু সাধারণ কান পেতে আছে তার খবরাখবরের জন্য। তবে সাধারণের চক্ষু অন্যত্র—ক্রীড়াঙ্গনে আর নাট্যমঞ্চে। 'লেনিন স্টেডিয়াম'-এ আরম্ভ হয়েছে শনিবার থেকে সোভিয়েত ক্রীড়াকৃতীদের সঙ্গে মার্কিন ক্রীড়াকৃতীদের দৌড়-ঝাঁপের প্রতিযোগিতা; আর ক্রেমলিনের 'কিনো থিয়েটরে' ৭ই জুলাই থেকে চলছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। স্টেডিয়ামে ছুটছে হাজারে হাজারে মানুষ—সেখানে লাখো লোকের ভিড়। কিন্তু ক্রেমলিনের চিত্র-ভবনে স্থান আর কত? 'ঠাঁই নাই

ঠাঁই নাই ছোট সে তরী'। হাজার ছয় ভাগ্যবান পেয়েছিল তার উদ্বোধন উৎসবের নিমন্ত্রণ, আর শত পাঁচেক করে কিনো-কুশল দর্শক পেয়েছে দিন-ভর পাঁচ-সাতটি করে উৎসবের চলচ্চিত্রগুলো দেখবার সুযোগ। 'জোগাড়ে' মানুষের জয় সর্বত্র। তার বাইরেকার উৎসাহী মানুষেরা তাই সর্বদেশের মতোই দু-চার শতে ভিড় করে থাকে সকাল থেকে নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত ক্রেমলিনের ফটকের দুধারে, 'মস্কো হোটেলের' দুয়ারের দু-পাশে। তারা 'তারকা'-দর্শনার্থী। প্রতীক্ষা তাদের ব্যর্থ হয় না কারণ 'তারকারাও' ভক্তদের প্রতি বিমুখা নন। তবে অনেক দেশের তুলনায় সম্ভবত দর্শনার্থীর সংখ্যা এখানে কম, কারণ পথের যানবাহনের গতায়াত দেখছি অব্যাহত; ফুটপাতের পদযাত্রীর পক্ষেও ব্যূহভেদ দুঃসাধ্য নয়। আমাদের দেশের তুলনায় নিশ্চয়ই মস্কোর মানুষ কলরব-কুণ্ঠিত, সকল দেশের তুলনাতেই সম্ভবত সংহত; এমনকি এ দেশেরও উৎসাহীদের তুলনায় পূর্বাপেক্ষা সংযত। কারণ, 'তারকারা' অসম্ভব অনায়াসে গতায়াত করছেন, হয়তো বা তাতে হতাশও তাঁরা হচ্ছেন। কারণ, বছর দশ পূর্বে নার্গিস্ যখন মস্কো কেন, লেনিনগ্রাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বর্ধিত হতে যান তখন ছাত্র-ছাত্রীদের উন্মাদ তারকা-পূজায় তাঁর রেশমি স্কার্ফ গিয়েছিল উড়ে—শত সহস্রের নির্মাল্য জুগিয়ে সেই রম্যাংশুকের আর কিছুই ছিল না যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উদ্ধার করেন। হয়তো তারপরে বারো বৎসর গিয়েছে; আর এবারের উৎসবেরও বারোদিন যাচ্ছে; তারকা-উন্মাদদের উৎসাহও আর তাপমাত্রায় তত ঊর্ধ্বারূঢ় নয়।

অথবা কারণটা বাস্তব তাপমাত্রা। জুলাই-আগস্ট রুশ দেশের গ্রীষ্মকাল। অর্থাৎ নির্মেঘ দিনও একসঙ্গে তখন দু-চারদিন পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ স্বল্পান্ধকার রজনী আরামদায়িনী। 'ইন সাচ্-এ নাইট্'—আর 'এমন দিনেও'—যারা 'দাচা'য় বা পল্লীভবনে বিশ্রাম করতে যান নি, 'দক্ষিণে' বা অন্য কোথাও আরাম করে রৌদ্রদগ্ধ হয়ে ধন্য হতে পাচ্ছেন না, সেই মস্কো-লেনিনগ্রাদের পুরবাসী ও পুরবাসিনীরাও নদীর ধারে, শহরতলীতে, ছায়াচ্ছন্ন বনে-উদ্যানে—আর নিতান্ত অভাবে, পথেঘাটেও বান্ধব-বান্ধবীর সঙ্গে 'গুল্যাচ' করে গ্রীষ্মোপভোগ করেন। এই গুল্যাচ্ শব্দটি অননুবাদ্য। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যেমন 'আড্ডা' রুশদের নাকি তেমনি বৈশিষ্ট্য বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে 'গুল্যাচ্'—হেঁটে ঘুরে-বেড়ানো, পদচারণা, গোষ্ঠীসুখ উপভোগ থেকে 'পূর্বরাগ', 'অনুরাগ', 'অভিসার' প্রভৃতি অনেক শব্দ মিলিয়ে

নিলেও এ শব্দের অর্থ সে সব ছাড়িয়ে যাবে (একই কালে গুল্যাচ ওসবই এবং আরও কিছু)। গ্রীষ্ম রুশদের সেই গুল্যাচের মধুমাস। হাল্কা জুতো-কাপড়ে ওরা যেন শীতের রোমশ খোলস ছাড়িয়ে বাঁচে—আঃ! শুধু শার্ট-ট্রাউজারে ঘুরে-বেড়ানো কী আরাম! কিন্তু প্রায়ই আরাম সুলভ নয়; অন্তত তা ক্ষণস্থায়ী না হোক স্বল্পস্থায়ী। দু-এক প্রহর পরেই আসে হঠাৎ মেঘ, এক-আধ পশ্‌লা চকিত বৃষ্টি, কিম্বা এক-আধ ঘণ্টার বজ্রাড়ম্বর বর্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে লাগে শীতের স্পর্শ, পশম ওঠে গায়ে। বর্ষাতির বস্তায় দেহ পুরে নিয়ে সর্দি ও ঠাণ্ডার থেকে তাকে রক্ষা করতে হয়। গত বৎসর তো গ্রীষ্মটা প্রায় ঝড়ে-বাদলে বর্ষাই হয়ে উঠেছিল—বরং শরৎকাল হয়ে উঠেছিল রৌদ্রের আঁচ-লাগা নাতিশীতল গ্রীষ্মাবশেষ। এবার প্রকৃতি নিয়মনীতি অনুযায়ীই চলছিলেন—কিন্তু জুন থেকে জুলাই-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত কাটিয়ে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। লেনিনগ্রাদেও বুধ-বৃহস্পতিবারে এই সদা-শৈত্য-শঙ্কিত বঙ্গ-সন্তানের মনে হয়েছিল—অন্তত দিনের বেলা একবার (শীতের) ট্রাউজার, মোজা-জুতোর সঙ্গে শার্ট গায়ে বেরিয়ে দেখলে হয় না? মস্কৌতে সে কল্পনা হয়ে গেল বাস্তব সুবিবেচনা। তাপমাত্রা আরও উর্ধ্বগামী। দিনের বেলার রোদ আর মিষ্টি নেই; বাতাস বন্ধ। রাস্তার পিচ গলিত না হলেও তপ্ত, উষ্ণ নিঃশ্বাসে তাপদায়ক। দোপাটা-কপাট, জানালা দিয়ে যাঁদের গৃহকক্ষ সুরক্ষিত না করলে নয়, সাধ্য কি তাঁদের এখন এই ২৮° সেন্টিগ্রেড্-এ গ্রীষ্মোপভোগ করবেন? ঘরে পাখা নেই, মোটা কালো পর্দায় আলো ঠেকানো চলে, কিন্তু গ্রীষ্ম ঠেকানো যায় না। লেনিনগ্রাদে এমন দিনে ঘর্মযোগেই কর্ম সাধ্য হয়। মস্কৌতেও দেখছি কর্মযোগীরা এই সপ্তাহান্তে সবাই অপ্রত্যাশিতরূপে ঘর্মযুক্ত। রুশদের সমাজে সাধারণভাবে টাই-কলার এখনো অপরিহার্য হয়ে ওঠে নি। জুন-জুলাই মাসে অনেক সময়েই হোটেলে-রেস্টুরেন্টে দেখেছি ও-দুই বস্তুতে রুশ আহারার্থীরা বন্দী নন। কণ্ঠে রজ্জুবদ্ধ একমাত্র রুশ পরিবেশকরা আর আমাদের মতো ইংরেজানুগত বিদেশীয়রা। তাপমাত্রা বাড়ছে, ফিল্ম ফেস্টিবল্-এর শিল্পীদের বেশভূষাও 'ফিল্মি' হয়ে উঠবার অবকাশ লাভ করছে। কিন্তু অসুবিধা তাদের যারা দর্শনার্থী। তপনদেব নির্দয়, পবনদেব নিস্তব্ধ। পথ-পীচ্-এর তপ্ত অভিশাপ কুড়িয়ে আর মাথায় রৌদ্রের প্রখর তাপ বহন করে তারকা-তপস্যায় কয়জন সিদ্ধিলাভ করতে পারবে? অনেকেই পরাজিত হচ্ছে।

শনিবার তো শেষ পর্যন্ত তাপ ৩২° সেন্টিগ্রেড্-এ এসে উঠল। মস্কৌ হয়ে উঠল কলকাতা—সেদিনটা সত্যিই ভারতীয় আব্‌হাওয়া রুশীয় রাজধানীতে দেখা দিল। সে পক্ষে যুক্তিও ছিল—সকালবেলাই ভারতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হচ্ছে। মুক্ত আকাশের নিচে তার আয়োজন ভারতীয় রীতিতে। ভারতীয় আবহাওয়ার তাড়নাতেই তখন রুশ ও ভারতীয় অতিথিরা কখনো মুখ রক্ষা করছেন কাগজে-পত্রে মাথা ও মুখ ঢেকে, কখনো পার্শ্বের সুশ্যাম বৃক্ষচ্ছায়ায় পালিয়ে। বৈচিত্র্যের কথা বললে এই প্রাকৃতিক পরিহাসও কম বিচিত্র নয়—রাশিয়ার বক্ষে ভারতীয় গ্রীষ্মের এই প্রাদুর্ভাব। অন্তত আমার চক্ষে তা নতুন, আর আমার পক্ষে তা বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তবে ঘটনা বলতে আমি এই প্রাকৃতিক অবস্থার কথা বলছি না, বলছি মানবীয় প্রয়াস-প্রচেষ্টার কথা। বিশেষ করে, তিন দিনের ওই তিনটি আয়োজনের কথা—মায়কভ্‌স্কি জয়ন্তী, ভারতীয় প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব।

মায়কভ্‌স্কি জয়ন্তী

বৃহস্পতিবার (১৮ই জুলাই) দ্বিপ্রহরে মস্কোর লেখক সংঘ থেকে হঠাৎ টেলিফোন-এ আহ্বান এল—'আজই চলে এসো, কাল মায়কভ্‌স্কি উৎসবে তুমি ও তোমার স্ত্রীর উপস্থিতি প্রার্থনীয়। মস্কো হোটেলে চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে।' খবরটা একেবারে অভাবনীয় ছিল না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত। মাস দুই পূর্বে মস্কৌ থেকে লেনিনগ্রাদ এসেছি। আসবার সময় জেনেছিলাম—জুলাই মাসে চলচ্চিত্র উৎসবে আমার দর্শক হিসাবে নিমন্ত্রণ হতে পারে। আর মায়কভ্‌স্কি জয়ন্তীতেও হতে পারে আমাদের নিমন্ত্রণ; আমি সাহিত্যিক অতিথি হিসাবে, আর অরুণা মায়কভস্কির কিছু কবিতার অনুবাদিকা রূপে। তারপরে সে বিষয়ে আর সংবাদ পাই নি। কথাটা মনে থাকলেও তার সময় অপগত হয়েছিল। যেমন হঠাৎ চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির চোখে পড়ল নিমন্ত্রণ করতে বাকি রয়ে গিয়েছে, তেমনি হঠাৎ লেখক সংঘের মনে পড়ল—ত্বরিত দূরভাষণে তাড়না করা ছাড়া আর উপায় নেই। এমনি শেষ মুহূর্তের দিকে হঠাৎ মনে-পড়া যেমন আমাদের একটা দুরারোগ্য রোগ, এই সাম্যবাদের দেশেরও তেমনি এ একটা বিষম কার্যধারা। এটাও আশ্চর্য কিছু নয়। তবে হঠাৎ আহ্বান পেয়ে এরূপ নিমন্ত্রণে যাতায়াত করা বিদেশীয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য। মাত্র ঘণ্টা দশেকের

সময়—ঘণ্টা তিনের মধ্যে তবু ছাড়পত্রের পৃষ্ঠায় যাত্রার অনুমোদন থেকে ট্রেনের অমূল্য টিকেট সংগ্রহ সবই হয়ে গেল। একটা সত্যই আশ্চর্য ঘটনা—একটা 'রুশীয় মিরাকল'। তবে এরূপ আশ্চর্য ঘটনাও আবার এদেশে কম ঘটে না। তারাশঙ্করবাবুর মুখে শুনেছিলাম তাঁর অভিজ্ঞতা। ১৯৫৮-এর অক্টোবর মাসে তাশখন্দ থেকে তিনি সাহিত্য সম্মেলন শেষ হতেই প্লেনে চলে আসছিলেন দেশের বাড়িতে পুজোয়। সব ঠিক। প্লেনে উঠতে গিয়ে দেখলেন সোভিয়েত রাজ্য ত্যাগের অনুমোদনপত্র তাঁর জন্য সংগ্রহ করা হয় নি। ভারপ্রাপ্ত দোভাষিণী নির্বাক, স্তব্ধ। এয়ারপোর্টের কর্মচারীও নিরুপায়। ভোররাত্রিতে কি করে এ অনুমোদন কেউ এখন পাবে? অভ্যুপগমকারী এক সম্মেলন-কর্মী প্রাণপণে টেলিফোন নিয়ে কাকে তবু খুঁজতে লাগল। যাত্রীরা বিদায় নিচ্ছে, ডাক পড়েছে, প্লেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—তারাশঙ্কর হতাশ হয়ে আসনে গিয়ে বসলেন। হঠাৎ টেলিফোনধারী কর্মী লাফিয়ে উঠল, টেলিফোন দিলে কর্মচারীর হাতে; তারাশঙ্করবাবুকে বমাল বগলদাবা করে প্রায় ঘোড়দৌড় করিয়ে প্লেনের দিকে নিয়ে ছুটে চলল তার সঙ্গী সম্মেলন-কর্মীটি। প্লেন তখন গর্জাতে আরম্ভ করছে। সিঁড়ি আবার লাগল তার গায়ে—তারাশঙ্কর উঠে গেলেন প্লেনে। কী অভাবনীয় কৌশলে? কার সাধ্য দেয় এ সময়ে এমন রাজ্যত্যাগের অনুমোদন-আদেশ? উজবেগ রাষ্ট্রের সভাপতি রাশিদফ ছিলেন সাহিত্য সম্মেলনেরও সভাপতি। নিজেও লেখক। নিশীথ রাত্রে ভোজনশালার আপ্যায়ন শেষ করে এসে তিনি শয্যাগ্রহণ করেছিলেন—চোখে মাত্র ঘুম এসেছে। এমন সময় জরুরী টেলিফোন বেজে উঠল। শুনলেন এয়ারপোর্টের শেষ মুহূর্তে ধরা-পড়া ত্রুটির কথা। অমনি আদেশ দিলেন "গাস্‌পাদিন ব্যানার্জিকে সসম্মানে তুলে দাও এক্ষুনি।" মিরাকল ঘটল। ত্রুটি শোধরানো গেল। অবশ্য ত্রুটি না ঘটলে ও-মিরাকলও ঘটত না। পাপী না থাকলে যেমন পতিতপাবন বেকার হয়ে পড়েন। অবশ্য পতিতপাবনও সব সময়ে পাপীর কথা মনে রাখেন না। তখন আর মিরাকল ঘটে না। অঘটন আমার ভাগ্যেও ঘটেছে, কিন্তু সব সময়ে নয়। এ যাত্রায়ও দু-এক ঘাটে বুঝে না-বুঝে ভাবনায় হাবু-ডুবু খেতে হয়েছে, তা উল্লেখ না করলেও স্বীকার্য।

মস্কৌ হোটেলে বসে আমন্ত্রণকারীদের প্রথমে দু-চার ঘণ্টা খোঁজ পেলাম না। কী করব দুজনায় ভাবছি। অথৈ জলে না হোক এক-পা জলে তো।

কোথায় কখন মায়কভ্স্কি উৎসব? এমন সময় বেলা ১২টার পরে লেখক সংঘের ফোন পেলাম। অভিনন্দন, উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাঁরা জানালেন—সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বলশোই থিয়েটরে মায়কভ্স্কির জয়ন্তী সভা। আমাদের দুজনাকে তাতে আর কিছুই করতে হবে না কেবল সভাপতি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সেই পত্র প্রোগ্রাম নিয়ে লোক যাচ্ছে। পত্র ও প্রোগ্রাম পেতে-পেতে তবু পাঁচটা বেজে গেল। অবশ্য সে অবসরে আমাদের ভারতীয় দূতাবাস থেকেও পরদিনের প্রদর্শনীর উদ্বোধনের আমন্ত্রণ-পত্র লাভ হল। হল না—চলচ্চিত্র উৎসবের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, তাঁদের পক্ষেও হল না অতিথি-অভিজ্ঞান, দর্শনীপত্র প্রভৃতি আমাদের হস্তার্পণ করা। মস্কৌ হোটেলেই তাঁদের কেন্দ্র আর আমরাও তাঁদেরই অতিথি। সত্যই গির্জার যত সান্নিধ্যে যার বাস ঈশ্বর তার পক্ষে ততই সুদূর।

বলশোই থিয়েটর হোটেলের নিকটেই। মস্কৌর প্রধান রঙ্গালয়। রুশ সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎসব এখানে পালন করাই নিয়ম। রবীন্দ্র শতবার্ষিক জন্মোৎসবও এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে এঁরা গণ্য করেন বলে। সে উৎসবে ভারতবর্ষের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি রুশদের নিকট এখনো দুঃখের কারণ। মায়কভ্স্কি জয়ন্তীতে আমাদের উপস্থিতি ঘটনাচক্রে; হয়তো ঘটনাচক্রেই উপস্থিত ছিলেন সভাপতি পরিষদের অন্য সদস্য কবি ফৈজ আহমদ ফৈজ। সাধারণ রুশদের পক্ষে এরূপ সভায় প্রবেশপত্র সংগ্রহও কঠিন, রুশ সাহিত্যের বিদেশীয় ছাত্ররা বরং সে সুযোগ পেতেও পারেন। বলশোই থিয়েটরের ছয়-তলা প্রেক্ষাগৃহ নর-নারীতে সমাকীর্ণ। মায়কভ্স্কি রুশদের প্রিয় কবি। সভাপতি পরিষদের সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করতেই ছয়-তলা থেকে করতালিতে সম্মানিত হলাম। কিন্তু রুশ সাহিত্য ভালোবাসলেও রুশভাষা আমার অজ্ঞাত, তাতে সব প্রবন্ধ বক্তৃতা শুনে বোঝা অরুণার পক্ষেও সহজ নয়। সভাপতি মণ্ডলের অন্যদের সঙ্গেও বাক্যালাপ অবাধ হল যখন লেখক সংঘের মীরা সালগানিক এসে আমাদের মাঝখানে বসলেন, দোভাষিণীর কাজ করতে লাগলেন। না হলে চেনা হলেও আমার পার্শ্বস্থ কবি এ্যালেক্সি সুরকভ্-এর সঙ্গেও আমার আলাপ সম্ভব হত না, নিকোলাই তিখনভ-এর সঙ্গেও যেমন শুধু নমস্কার বিনিময় (দবাস্তভুইতে) ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হয় নি। এন. এস. তিখনভই উৎসব সমিতির সভাপতি—লেখক সংঘ, সংস্কৃতি মন্ত্রণাবিভাগ, বিজ্ঞান পরিষদ

মিলে এই উৎসব সমিতি—শুধু শাসন-বিভাগীয় ব্যাপার নয়—'আমাদের পঃ বঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব সমিতি'র মতো। অবশ্য কিছুই আবার সরকার-সম্পর্কহীনও নয়; তাই আমাদের মতো স্বতন্ত্র অজস্র উৎসব সমিতিও গঠিত হয় না। একই সমিতির নেতৃত্বে চালিত হয় নানা অনুষ্ঠান। সভার উদ্বোধন করেন তিখনভ একটি নাতি-দীর্ঘ ভাষণে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী সোভিয়েত সংঘের কয়েকটি রাজ্যের একজন করে লেখক সংঘের খ্যাতনামা প্রতিনিধি মায়কভ্স্কির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করবেন। এ্যালেক্সি সুরকভ্ লেখক সংঘের সম্পাদক রূপে শেষ বক্তা। তাঁর ভাষণে আলোচনার সমাপ্তি হবে। এটি আলোচনার অংশ। এর পরেকার পর্বে আবৃত্তিতে, সুরে-গানে, অভিনয়ে, শিল্পীরা করবেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা—মায়কভ্স্কির লেখার পরিবেশন।

মায়াকভ্স্কি (১৮৯৩-১৯৩০) রুশদের প্রিয় কবি। অবশ্য তাঁদের বড় কবি আরও আছেন। কিন্তু সোভিয়েত যুগের রুশদের কাছে ভ্লাদিমির মায়কভ্স্কিই প্রিয়তম। তার কারণ তিনি রুশ বিপ্লবের কবি। তাঁর সমসাময়িক কবিরা অনেকে অক্টোবর বিপ্লবকে অভিনন্দন করেছিলেন। আলেকজেণ্ডার ব্লকও (১৮৮০-১৯২৩ ইং) এরূপ কবি; কবি হিসাবেও তাঁর যশঃ অম্লান। সের্গেই এসেনিন্‌ও (১৮৯৫-১৯২৫) সুবিখ্যাত; আর ভাগ্যের তাড়নায়-ও তিনি প্রায় মায়কভস্কির দোসর। দু-জনাই জীবন ক্ষয় করেছেন আত্মহত্যা করে, পাঁচ বৎসর আগে আর পরে। ভ্লাদিমির মায়কভ্স্কির সঙ্গে 'ভবিষ্যদ্বাদী' কবিগোষ্ঠীর, পরে 'লেফ্‌গোষ্ঠীর' সতীর্থ ছিলেন বরিস পাস্তেরনাক (১৮৯০-১৯৬২)। শুধু রাজনৈতিক কোলাহলের জন্য তাঁর খ্যাতি নয়, পাস্তেরনাকের জীবনব্যাপী কাব্যসাধনা রুশ সাহিত্যিকেরা সকলেই শ্রদ্ধা করেন। তিনিও বিপ্লবকে স্বাগত করেছিলেন। এঁদের প্রত্যেকেরই কবিপ্রতিভা স্বীকৃত। আর কে ছোট কে বড়, সম্ভবত তা প্রত্যেকের রুচির ও রসাদর্শের উপর নির্ভর করবে। তবে মোটের উপর মায়কভ্স্কিই সর্বাধিক প্রিয়। কারণ, তিনি বিপ্লবের বাণীকে মূর্ত করেছেন তাঁর প্রবল প্রাণশক্তি দিয়ে! উৎসবের প্রোগ্রামের পাতায় মায়কভ্স্কির 'হারশো' ('বেশ') নামে সুবিখ্যাত কবিতাটি থেকে উদ্ধৃত হয়েছে অসম পাঁচ পংক্তির উক্তি : "আমি শক্তিময় এই আমার কবিতা দিয়ে গেলাম তোমাদের হাতে, হে সংগ্রামী শ্রেণী।" এই কথাটা তাঁর কবিকর্মের সত্যকার বর্ণনা, তাঁর কবিপ্রাণেরও সংকল্প। এ জন্যই সোভিয়েত

নেতৃত্ব ও সোভিয়েত জনসাধারণের নিকট মায়কভস্কির সমাদর সর্বাধিক। তিনি বিপ্লবের কবি, বিপ্লবী পার্টির কবি, বিপ্লবী শ্রেণীর কবি।

মায়কভ্‌স্কির কবিতার নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বাঙলায়ও একটি অনুবাদ গ্রন্থ আছে। তবু আরও একটু যত্ন করে মূল থেকে তার বঙ্গানুবাদ এখন আমাদের করা উচিত। অবশ্য তা সহজসাধ্য হবে না। কারণ, কবিতা জিনিসটারই অনুবাদ প্রায় অসম্ভব, তার ওপরে মায়কভ্‌স্কির কবিতার। এ উৎসবের ভাষণ শুনতে-শুনতে তাই আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—মায়কভ্‌স্কির কবিতার অনুবাদ কি সম্ভব? তিখনভ (জন্ম ১৮৯৬) কবি, সুরকভও (জন্ম ১৮৯৯) কবি, তিখনভ তো প্রায় মায়কভ্‌স্কির বয়সেরই কবি, সুরকভও বেশি কনিষ্ঠ নন। ঝড়-ঝাপটায় তাঁদেরও জীবন কম বিক্ষত হয় নি। দু-জনায় এঁরা পার্টিভুক্ত, তেমনি কমিউনিস্ট কবি। কিন্তু মায়কভ্‌স্কির মতো বিপ্লবের বীরবাণী তাঁদের নয়।

বিপ্লবের স্পর্ধিত প্রয়াস ও প্রকাশই হল মায়কভ্‌স্কির কাব্যের বিষয়, সে কবিতার প্রাণ, তার আত্মা। স্পর্ধার তখন অন্ত নেই। পূর্বেকার পৃথিবীকে ভেঙেচুরে ফেলা চাই, না হলে তাকে নতুন করে ঢেলে সাজা যাবে কি করে? বিপ্লবের কাব্যেও তাই বিনা দ্বিধায় পরিত্যাজ্য সকল সনাতন কাব্যাদর্শ, কাব্য-বিষয়, কাব্যরীতি। চাই না পুরনো বিষয়, ক্লাসিক্‌সের সংযম সংহতি, সৌন্দর্য-সুষমা; লিরিকের কামনা-বাসনার গুঞ্জরণ। বিপ্লবের দুর্মদ উদ্দামতা, শক্তির প্রচণ্ড স্ফুরণ, লালিত্য-বর্জিত ঔদ্ধত্য, মানুষের অবিকৃত পরিচয়বাহী উচ্চকণ্ঠের চিৎকার, পথঘাটের অমসৃণ দৃঢ় উক্তি। 'সিম্বলিস্ট'দের অধ্যাত্মবাদ বিপ্লবী দৃষ্টিতে বিষম ভ্রান্তি, বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রায় চক্রান্ত। 'একমিস্ট'দের ঘষা-মাজা বিশুদ্ধতা, বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য অবক্ষয়ের কাব্য-বিলাস। খনির, জমির, কল-কারখানার খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনদর্শনও এসবে নেই, জীবনভঙ্গিমাও এসব কৃত্রিম মসৃণতায় রূপায়িত হতে পারে না। বিপ্লবের বাণী স্পর্ধার বাণী; নতুনের জয়ধ্বনি। চাই তাই সেই বীর্যময় ঔদ্ধত্যের উপযোগী নতুন কাব্যরীতি—উদ্দাম, অ-সম দৃকৃপাতহীন স্পর্ধায়, কাঠিন্যে কর্কশতায় অকুণ্ঠিত। শুধু বিপ্লবের বাণী ঘোষণাই নয়, বিপ্লবের এই বাণীরূপ রচনাও মায়কভ্‌স্কির কীর্তি। 'সিম্বলিস্ট'দের কাব্যধারায় উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত রুশ কাব্যরীতিতে আধুনিকতার স্পর্শ লাগছিল—বিপ্লবের পরে নানা গোষ্ঠীর অবশ্য উৎকট পরীক্ষা-নিরীক্ষারও

অন্ত ছিল না। কিন্তু মায়কভ্স্কি সেই আধুনিকতারও মোড় ঘুরিয়ে দিলেন—শ্রেণী বিপ্লবের কাব্যে ছন্দ ভেঙে, বাক্য খণ্ডিত করে, ধ্বনির সংঘর্ষ ঘটিয়ে, শব্দের অদ্ভুত গর্জন জাগিয়ে, আর অদ্ভুত খণ্ড খণ্ড রূপকল্প জুগিয়ে একটা নতুন কাব্যরীতি তিনি প্রণয়ণ করেন। 'আধুনিক কবিতা' বলতে যে সূক্ষ্ম অতি-প্রকর্ষিত কাব্যরূপ বুঝায়, ভাবে বা রূপে মায়কভ্স্কির কবিতা মোটেই তা নয়। অস্ফুটতা, দুর্বোধ্যতা, এতে অসহ্য। উদ্দেশ্যহীন কবিতা লেখার প্রশ্নই তাতে ওঠে না—বিপ্লবী শ্রেণীকে বাণীর বজ্র-বিদ্যুৎ-ঐশ্বর্যে অপরাজেয় করে তোলাই কবির উদ্দেশ্য। মন বুদ্ধি অন্তরের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশেরও চেষ্টা তার নেই। ঘরে বসে পড়বার মতো কবিতা তাঁর নয়। আবৃত্তিতে জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ, উদ্বেলিত করার জন্যই যেন তা রচিত। এ জন্যই রুশ সমালোচকরা বলেন পড়তে না জানলে মায়কভ্স্কির কবিতা নিরর্থক মনে হবে—সোচ্চার প্রচার। মায়কভ্স্কির কবিতা হচ্ছে সমগ্রভাবে যুগের কথা, বিশেষ করে বিপ্লবী শ্রেণীর কথা, আরও বিশেষ করে বিপ্লবী পার্টির কথা। আবার, মায়কভ্স্কির দৃষ্টিতে বিপ্লব ও বিপ্লবী পার্টি এক হয়ে গিয়েছে বিপ্লবী নেতৃত্বে, আর সে নেতৃত্বেরই জীবন্তমূর্তি লেনিন। বলা বাহুল্য, এ কবিতা শুধু সোভিয়েত মানুষেরই মনের কথা নয়, বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্বেরও অভিপ্রেত কথা।

কবিতা মাত্রই হবে উদ্দেশ্যের সোচ্চার সাক্ষ্য? কিম্বা বিপ্লবের কবিতা হবে—আবেগ যন্ত্রণা ছাড়িয়ে—শুধু একাগ্র শ্রেণী-চেতনার কবিতা—এ কথা অবশ্য এখনকার দিনের কমিউনিস্টরা অনেকেই মনে করেন না। মায়কভ্স্কি যদি সত্যকার কবি না হতেন কিম্বা সত্যই তিনি যদি বিপ্লবগত-চিত্ত না হতেন, তাহলে এ রকমের কবিতা হয়ে যেত বাগ্মিতা। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক কবিই তা করে বসেন। ভাগ্যক্রমে মায়কভ্স্কি শুধু জন্মগত কবি ছিলেন না, ছিলেন জন্মগত বিপ্লবী কবি। তবু বিপ্লব বীর্যময় স্পর্ধার পর্ব ছাড়িয়ে যখন স্থির সংগঠনের অনুশাসন পর্বে প্রকাশ করে, তখন কতটা তাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে এরূপ বিপ্লবী কবির প্রাণ? স্তালিন-পর্বের 'একরাজ্যে সমাজতন্ত্র' গঠনের কালে ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে মায়কভ্স্কি আত্মহত্যা করলেন কেন? বিপ্লবের বিপর্যয় দেখে? না তাঁর অস্থির প্রতিভা আর সে পর্বের আয়োজনে উদ্যোগে নিজ স্পর্ধার, ঔদ্ধত্যের, উন্মাদনার কোনো অবলম্বন পেল না বলে? তিখনভ প্রভৃতি

সতীর্থদের ভাষণে এ প্রশ্নের আলোচনা থাকা সম্ভব নয়, ছিলও না। তবে মায়কভ্‌স্কির প্রতি তাঁরা সুবিচার করেন। বিপ্লবের কবি হিসাবেই মায়কভস্কিকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

তিখনভের পরে প্রথম বললেন জর্জিয়ার লেখক সংঘের সভাপতি কবি ইরাকলি আবাশিদ্‌জে—ইনিও আমাদের পরিচিত। তাঁদের বিশেষ দাবি মায়কভ্‌স্কির উপর, কারণ মায়কভ্‌স্কি জর্জিয়ায় জন্মান, বাল্যকাল কাটান সেখানে। সে দেশের প্রতিও তাঁর মমতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর কাব্যের প্রভাব অন্যত্রও প্রচুর। বিইলী রুশিয়ার কবি পেত্রুস ব্রোবকা, লাটভিয়ার কবি এড়ুয়ার্দস্‌ মেঝেলাইডিস, উক্রেনিয়ার কবি দমিত্রি পাব্‌লিচ্‌কো এমনকি তাজিকস্তানের কবিও মায়কভস্কির সেই প্রভাবের কথা জানালেন। কখনো অনুবাদও শোনালেন, কখনো মূল উদ্ধৃতও করলেন নিজ নিজ ভাষায়। সুরকভের বক্তৃতা সর্বশেষে, তা সংক্ষিপ্ত কিন্তু উপাদেয়। আর তিনিই শ্রোতাদের জানালেন সভাপতিমণ্ডলের বিদেশীয়দের পরিচয়—পাকিস্তানের কবি ফৈজ আহমদ ফৈজ, ও বাঙলার আমাদের দুজনার, যারা "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষার মানুষ।" মনে মনে বুঝলাম—এর তুল্য পরিচয় আর নেই। আর, এ-পরিচয় উল্লেখ না করে যে রুশ কবিও পারলেন না তাতেই বুঝা যায় দুটি কথা—একটা যা আমি বহুবার বলি—পৃথিবীতে আমাদের বাঙালীদের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষার মানুষ—the tongue that tagore spake. দ্বিতীয় কথাটা এই—রুশ সাহিত্যিকরা অন্তত রবীন্দ্রনাথের ভাষার মূল্য বোঝেন, যদিও রুশ রাষ্ট্রশাসকরা হিন্দীকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাতে ক্ষোভের কারণ নেই। যার যে হিসাবে মূল্য তা যথাযথ স্বীকৃত হলে আপত্তির কারণ কোথায়?

সুরকভ্‌ সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাষণটি শেষ করলেন একটি সুন্দর বাক্যে। "এতক্ষণ আপনাদের কাছে আমরা মায়কভ্‌স্কির কথা বলেছি। এখন মায়কভস্কিই আপনাদের কাছে কথা বলবেন।"

অর্থাৎ উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল। রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে আমরা এসে বসলাম দর্শকের আসনে আর মঞ্চে এলেন আবৃত্তিকার শিল্পী, সঙ্গীতকার, অভিনেতারা, একে-একে। সকলেই সুযোগ্য। প্রথমে আবৃত্তি—সুদীর্ঘ কবিতা সেই 'ভ্লাদিমির ইলিচ্‌ লেনিন'। সুবিখ্যাত কবিতা। আবৃত্তির কথাই তাই বলা উচিত। এমন সুদীর্ঘ কবিতা যে বিদেশীর কাছেও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল তার কারণ আবৃত্তির উৎকর্ষ। লোক-শিল্পী বালাশোভ্‌ সচেতন ভাবেই

কথনো মায়কভ্স্কির ও কথনো লেনিনের স্মরণীয় ভঙ্গির ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন আবৃত্তির সঙ্গে। কিন্তু নাটকীয়তা ছিল না তাঁর কণ্ঠস্বরে বা ভঙ্গিতে, অথচ আবেগের একটু স্পর্শ ছিল। শব্দ ও বাক্য জড়িয়ে বা হারিয়ে যাচ্ছিল না সে স্পর্শে। প্রতিটি শব্দের সুস্পষ্ট উচ্চারণ এই অজ্ঞের কানেও সুশ্রাব্য করে তুলল কবিতা দুটিকে। আবৃত্তি আরও দু-একজন করেন। হারাশোর খানিকটা আবৃত্তি করেন শিল্পী সোচরাকিন।

মায়কভ্স্কির লেখা গানও পিয়ানোর সঙ্গে গাওয়া হল। পুরনো দিনের প্রসিদ্ধ কৌতুক অভিনেতা ইলিনস্কি রঙ্গমঞ্চে ঢুকতেই বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হলেন। তিনি মায়কভ্স্কির কবিতা আবৃত্তিতে সিদ্ধকাম। অবশ্য আজ বার্ধক্যে আর বিশেষ নতুন চেষ্টা করলেন না। দুটি ছোট কবিতা আবৃত্তি করলেন। দুটি কৌতুক নাট্যের অভিনয় হল—একটি রাজনৈতিক চালবাজদের বিষয়ে মায়কভ্স্কির বিদ্রূপ-নাটিকা; আরটিও তাই—নাম 'ছারপোকা', ধনিকশ্রেণীর প্রতি লাজরব-এ বিদ্রূপবাণ। ভাষা না বুঝলেও, সুর না জানলেও, অভিনয় ও গান উপভোগ করতে পেরেছি।

রাত্রি দশটায় উৎসব শেষ হল। পরিচিতদের সঙ্গে বিদায় তাড়াতাড়ি নিলাম। বলশোই থিয়েটরের বদ্ধ গৃহে এই 'ভারতীয় গ্রীষ্ম' উৎসাহবর্ধক নয়। বিশেষ আলাপ কারো সঙ্গে করবার সময় হল না—ফৈজের সঙ্গে ছাড়া। যতই দু রাষ্ট্র হোক, আমরা এক দেশের মানুষ। সে ভারতমহাভূমি। আলাপ ছাড়া আলোচনার অবকাশ এ উপলক্ষে বিশেষ ছিল না। কারণ, মায়কভ্স্কি স্বয়ং হলেন সোভিয়েত কাব্যাদর্শের কবি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্ঘস্বীকৃত শিল্প ও সাহিত্য নীতির তো তিনি এক সার্থক নিদর্শন। তাঁর জয়ন্তীতে সে নীতিরও পরোক্ষ প্রচার আপনা থেকেই অনিবার্য। উৎসবেও তাঁদের দেখি নি যাঁদের আমরা এদিকে প্রতিবাদী বলে ভাবতে পারি—এরেনবুর্গ বা এভ্তুশেংকো—হয়তো গ্রীষ্ম-বিনোদনে তাঁরা মস্কোর বাইরে আছেন। কারণ, একটা কথা জানি—নতুন ধরনের কবিতা লেখা বন্ধ হয় নি। আর একটা কথা, কবি ও বক্তারা লেখক সংঘের কর্তৃপুরুষ, শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে একমত। কিন্তু বিতর্কের জল ঘোলাবার চেষ্টা দেখলাম না তাঁদের কারুর। উৎসবের তাল কাটে নি, বেসুরো হয় নি সাহিত্য-আলোচনা অতি-প্রচারে। প্রসন্ন চিত্তে সভাগৃহ থেকে বাইরে এলাম। মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসের স্পর্শে দেহও স্নিগ্ধ হল।

"অনুভারত"

ভারতীয় প্রদর্শনীর স্থান সকোল্‌নিক্‌ পার্কের চার নম্বর মণ্ডপে। শনিবার (২০শে জুলাই) সকাল দশটায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন। সকোল্‌নিক্‌ বিরাট এলাকা—এরূপ প্রদর্শনীসমূহের স্থান তাতেই হয়। উচ্চোচ্চারিত শব্দে একটু দূর থেকেই বুঝতে পারলাম সভা আরম্ভ হচ্ছে—আমাদের রাষ্ট্রদূত কৌল মহাশয় অতিথিদের স্বাগত করছেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রেরিত বাণী পঠিত হচ্ছে।

প্রদর্শনী ক্ষেত্রের তোরণে আছে অশোকস্তম্ভের অনুকরণে একটি স্তম্ভ—শিখরে সেই চার-সিংহ। তারপর 'মুঘল উদ্যানের' অনুরূপ একটি জল-ভরা 'বাগ্', আর মণ্ডপের দ্বারদেশে দু-দিকে প্লাস্টারের তৈরি দুটি বিরাট হস্তী—সুশোভিত, অলঙ্কৃত, পৃষ্ঠোপরি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম। সানাই ও আল্‌পনার ব্যবস্থা থাকলে সব সুসম্পূর্ণ হত। সামনে মুক্ত আকাশের তলে সভা। চন্দ্রাতপের তলে বসেছেন প্রধানগণ। রুশদের মধ্যে ক্রুশ্চভ ও মিকোয়ানকে চিনতে দেরি হয় নি, তবু দেখে চমৎকৃত হতে হল। শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও রাজপুরুষরা নয়, সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধানরাও উপস্থিত—মস্কৌতে ভারতের প্রতি প্রীতি কত গভীর তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমাদের পক্ষ থেকে এসেছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ, মিসেস বি. কে. নেহরু, (ইন্দিরাও ক-দিন পরেই আসবেন), কালই তা জানতাম, দূতাবাসের সবাই ছুটছিলেন এয়ারপোর্টে তাঁদের জন্য। তা ছাড়াও মঞ্চে দেখছিলাম শ্রীমতী অরুণা আশফ আলীকে—নারী-সম্মেলনের পরে তিনি এখনো দেশে ফেরেন নি।

আমাদের রাষ্ট্রদূত কৌল মহাশয়ের স্বাগত ভাষণটি ছিল সুন্দর ও ছোট; তার রুশ-অনুবাদ করেছিলেন দূতাবাসের প্রথম সচিব শ্রীযুক্ত জৈন। ভাষণের একটি দিক—অভিনন্দন ও সহায়ক সুহৃদদের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। অন্যদিক রাজনৈতিক বাচন। দুইই সুসম্বদ্ধ—এই প্রদর্শনীতে ভারতীয় জীবনের তিনটি বিভাগেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে—ভারতের স্বকীয় উদ্যোগের, ভারত-সোভিয়েত দ্বৈত প্রচেষ্টার, আর অপরাপর জাতির সঙ্গে ভারতের সংযুক্ত প্রয়াসের।

> "শান্তির মতোই স্বাচ্ছল্য বর্তমান পৃথিবীতে অবিভাজ্য। মানুষের ভাগ্য আজ একসঙ্গে গ্রথিত। বহুজাতির জীবনযাত্রায় ভারসাম্যের অভাব

ঘটলে বিরোধ বিদ্রোহও বাধবে। আমরা তাই সব বন্ধু-দেশের কাছে কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে কৃতজ্ঞ সোভিয়েত সংঘের কাছে এঁদের সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য।"

রাষ্ট্রদূত কৌল মহাশয় বুদ্ধিমান, সুপুরুষ, তাঁর বলবার ভঙ্গিও চমৎকার। এ কথা অবশ্য আমাদের মন্ত্রী মানুভাই শাহ্-এর সম্বন্ধেও সত্য। তাঁর বক্তৃতাটি বিশেষ করে আর্থিক উদ্যোগ বিষয়ক। সোভিয়েত-ভারতের আর্থিক যোগাযোগের তথ্যে সমৃদ্ধ। স্বভাবতই একটু দীর্ঘ হতে বাধ্য, তবু অতিদীর্ঘ নয়। ৩৮টি ভারত-সোভিয়েত প্রকল্পের কথা বেশি বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না, শ্রোতাদের পক্ষে সানুবাদ তা শোনাও হত ক্লান্তিকর। তা উৎপাদন না করে তিনি বক্তব্য সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পেরেছেন এটি আনন্দের কথা।

সত্যই একটা ব্যাপার নতুন। ভারত বা সোভিয়েত, কোনো রাষ্ট্রের নেতারাই বক্তৃতা করতে কৃপণ নন। নেতারা কেন, উপনেতারাও বক্তৃতা আরম্ভ করলে থামতে জানেন না। (আমরা লেখকরাই কি থামতে জানি?) কিন্তু এ সভায় কারও বক্তৃতাই ক্লান্তিকর হল না। তবে সব থেকে চিত্তাকর্ষক হল ক্রুশ্চভ-এর বক্তৃতা। একেই তো তাঁর কথা শুনতে সকলেরই আগ্রহ। তার ওপরে তিনি অনেক সময়েই হাসি-তামাসা করতে পারেন সাধারণ মানুষের মতো। মোটা-সোটা, গোল-গাল টাকপড়া মানুষটি গোমরামুখো নন; নেতাদের গুরুগম্ভীর চালে চলতেও বেশি অভ্যস্ত নন। তাই তিনি যখন একেবারে আসরে বসে গল্প করার স্বরে আরম্ভ করলেন বলতে যে, ভারতের সঙ্গে একযোগে শিল্প গঠন করতে পেরে তিনি খুশি। ভিলাই ইংরাজদের তৈরি দুর্গাপুর, জার্মানদের তৈরি রুঢ়কেলার থেকে ভালো হয়েছে; ভিলাই গড়তে গিয়ে তাঁরা তাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ধনতন্ত্রের থেকে সমাজতন্ত্র বেশি ভালো কল-কারখানা গড়তে পারে,—তখন নিজে হেসে, অন্যদের হাসিয়ে তিনি সকলকে সহজ করে নিজের কাছে টেনে নিলেন। সম্ভবত তাঁর রঙ্গব্যঙ্গ, কথার ভঙ্গি, সহজ সুর, প্রবাদ-প্রবচন-ছড়ানো সাধারণগ্রাহ্য কৌতুক, এ-সবে রুশ জনসাধারণ তাঁকে নিজেদেরই একজন বলে চিনতে পারে—স্তালিনের মতো ভয়ে-ভক্তিতে তাঁকে দূরে থেকে দেখতে হয় না—ক্রুশ্চভকে একরকম আপনার লোক বলে বুঝতে পেরে তারা স্বস্তিও বোধ করে। এইটিই ক্রুশ্চভ-এর ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের একটা প্রধান

অবলম্বন। কিন্তু বক্তৃতায় তো ক্রুশ্চভও কম নন। সেই ক্রুশ্চভ এ সভায় বক্তৃতা করলেন অল্পক্ষণ। বক্তৃতা না বলে তাকে কথা-বলা বলা উচিত। তবে কাজের কথাও তাতে ছিল—সোভিয়েতের অনেক প্রয়োজন, ভারত সে সব প্রয়োজনের জিনিস গড়ুক, আর সোভিয়েত তা কিনবে—মিনিট পনেরোর মধ্যে হাল্কা সুরে কাজের কথাও বলতে তিনি ভুলে গেলেন না।

কী হল বক্তৃতা-ব্যাঘ্রদের? সম্ভবত সভার অন্যদের যা হয়েছিল। মাথার উপরে ভারতবর্ষীয় গ্রীষ্মাকাশ ও সূর্যদেব, চন্দ্রাতপেও নেতাদের বিশেষ আরাম হবার কথা নয়। অন্যরা তো কাগজে ঢেকে মাথা মুখ রৌদ্র থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। আসন থেকে উঠে পাশের বাগানে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন—সেখানে বক্তৃতাও শোনা যায়, গরমের কথাও বলা যায়, আবার আলাপ-পরিচয়ও হয় পরস্পরে। কারণ, ভারত-সম্পর্কিত দেশী-বিদেশী সকল মানুষই এসেছেন এই উৎসবে। হাজারখানেক আসনে বসলেও শ-পাঁচেক এই পাশের বাগানেই দাঁড়িয়ে আরাম করছেন।

ক্রুশ্চভই প্রদর্শনীদ্বার উন্মোচন করলেন। পিছনে-পিছনে সবাই প্রবেশ করলেন এই কাচের মণ্ডপে। ডানদিকে ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভারতের বিখ্যাত জীবজন্তু। দেয়াল-জোড়া ভারতের সুপরিচিত প্রাচীন স্থাপত্য ভাস্কর্য ও শিল্পের মনোরম প্রতিলিপি। সুনির্বাচিত, আর সুপ্রণীত। লোকজীবন, লোকশিল্পের ও লোকনৃত্যের নানা চিত্র, নিদর্শন। অতীত ভারত ও বর্তমান ভারত—দুই ভারতের জীবনযাত্রাই চিত্রে, চার্টে, পটে, অঙ্কে প্রকাশিত। অবশ্য এ হচ্ছে প্রবেশ-গৃহের কথা। পরিচিত বহু পণ্যের নিদর্শনও তাতে রয়েছে। কৃষিজাত, যন্ত্রজাত ও হস্তনির্মিত বহু উৎপন্ন দ্রব্য বিরাট এক ঘরে। ভিলাই, রুড়কেলা, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, সিন্ধ্রি প্রভৃতির শিল্প-জাতের সঙ্গে আছে নানা ছোট-বড় শিল্পের পণ্য ও উপজাতের নমুনা। টিনে, কাচের বোতলে ফলজাত খাদ্য, যন্ত্রচালিত লঘুশিল্পের পণ্যই এসেছে বেশি। গুরুশিল্প, যানবাহনের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি জিনিস, অন্য যন্ত্রপাতি, আর যন্ত্র-তৈরির যন্ত্রও যা আমাদের দেশে নতুন নির্মিত হচ্ছে তারও পরিচয় কিছু না পাওয়া যাবে এমন নয়। সম্ভবত রুশদের তাই হবে বিচার্য। তবে দোতলাতেই বেশি আকৃষ্ট হবে মস্কোর মানুষ—সেখানে বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন-

সমূহ। আর সে নিদর্শনসমূহ সূক্ষ্মতায়, বৈচিত্র্যে— নানা দিকেই নয়ন-মনোমুগ্ধকর। তবু মনে হবে—আরও এলে হত। কিন্তু সব কি আসতে পারে? আমাদের বস্ত্রশিল্পের ঐশ্বর্য যে অপরিমিত। ভারতের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য কোন্ দিকেই বা অবজ্ঞেয়। তার একটা ধারণা দেওয়া ছাড়া এরূপ প্রদর্শনীতে আর কি সম্ভব? প্রায় ৮৫০টি প্রতিষ্ঠান এ প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছে, মোট প্রায় ১০ লক্ষ নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনীর জন্য 'সাজিয়ে' মেয়েও এসেছেন, 'মডেল' হয়ে ঘুরে বেড়াবেন। দিল্লীর 'মোতিমহল' ভারতীয় খাদ্য পরিবেশন করবেন—এটা কিন্তু দেশী-বিদেশী কারও কাছেই সামান্য কথা নয়। শত দেড়েক আমাদের ব্যবসায়ী এ উপলক্ষে এসেছেন মস্কৌতে। অন্য দিকে এসেছেন শান্তি বর্ধনের প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই-এর 'লিটল ব্যালে' নৃত্যদল—তাঁদের নৃত্য-প্রদর্শনী হবে। বঙ্গভাষায় প্রকাশিত বইপত্রের প্রদর্শনীও আছে—তাতে (লেখকের মতো) বামপন্থী, কংগ্রেসপন্থী, দক্ষিণপন্থী—নানা পন্থীর বইও সজ্জিত। ছয়টি ভারতীয় চলচ্চিত্রও দেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে তার মধ্যে আছে 'অপুর সংসার', 'অভিযান' প্রভৃতি। এ সবের জন্যই কি কম আগ্রহ? মানুভাই কথাটি মিথ্যা বলেন নি—এ প্রদর্শনী যেন একটি 'লিটল ইণ্ডিয়া'—অনুভারত। সোভিয়েত সংস্কৃতিপত্রিকা প্রায় তাই বলছেন—'সকোলনিকে ভারত'।

গরম অসহ্য হচ্ছিল। অসহ্যই হত, কিন্তু অতিথি-অভ্যাগত সকলের জন্যই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করেছেন। ভারতীয়রা তাই সব সহ্য করতে প্রস্তুত; রুশেরাও দেখলাম ভারতীয় ভোজ্য-পেয়ের নামে সেরূপ কষ্টসহিষ্ণু। কেউ নিরাশ হলেন না। অবশ্য তার পূর্বে সপারিষদ ক্রুশ্চভ মহাশয়ও কম আকর্ষণ জোগান নি—সূক্ষ্ম হাল্কা শাল দেখে বললেন "পঞ্চাশ বছরেও আমি এ জিনিস তৈরি করতে পারতাম না।" ভারতীয় 'মডেল'দের সঙ্গে তিনি ফটোগ্রাফ তুললেন—হলিউডের রূপসীদের সঙ্গে তো তিনি খালি-গা হয়েই তাঁদের জুড়ী হতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও ফটোগ্রাফারদের জানালেন, "ভয় নেই—আমি যাচ্ছি না—তুলুন ফটো।" কখনো মিকোয়ানকে খোঁচা দিচ্ছিলেন—"চারদিকেই দেখছি সুন্দরী। ছাখো, ছাখো, মিকোয়ানকে নিয়ে সাবধান থেকো।" ঘণ্টাখানেক পরে ক্রুশ্চভ প্রস্থান করলে অতিথিদের আহার আরম্ভ হল। সত্যই দেশী-বিদেশী চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ঢালাও ব্যবস্থা। অতিথিরাও সর্বরকমেই তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না।

অভাব ছিল কেবল আমের—তা থাকলে বোধ হয় জনতা দাঙ্গা বাধিয়ে দিত। এমনিতেই তন্দুরী মুর্গীর জন্য ছুটোছুটি বেধে গিয়েছে। পানীয় সম্পর্কেও আগ্রহ প্রচুর। রুশদের তাঁদের রুশীয় পানীয়ের সঙ্গে এই ভারতীয় পানীয়ের তুলনামূলক আলোচনায় বেশ উৎসাহী দেখলাম। ভারতীয়দের দু-একজনা যে আশ্চর্য আতিথেয়তায়, পানভোজনে একটু অতিভাষী বা অসংলগ্নভাষী হয়ে পড়বেন, তাও আশ্চর্য নয়। যাই হোক, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' এই কোলাহলে-কলরবে আনন্দে-উল্লাসে উদ্বোধন উৎসবের পরিসমাপ্তি ভালো ভাবেই হয়েছে।

'ভালো হলে আরও ভালো হত'—এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায়। 'অনুভারত' তো ভারত নয়, কিন্তু মোটের উপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আয়োজন প্রশংসনীয়। আরও আনন্দের কথা—শিষ্টাচারে, শৃঙ্খলায় উদ্বোধন হয়েছে সুন্দর। শেষ অবধি সব যদি সুনির্বাহিত হয় তাহলে মস্কোর এই অনুভারত লক্ষ লক্ষ বিদেশীয়দের মনে মহাভারতেব প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করবে।

চলচ্চিত্র উৎসব—বিচারপর্ব

অতিথি ও চলচ্চিত্র-কমিটির শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল শনিবার অপরাহ্নে। একটা কারণ, আমরা এসেছি দেরিতে, চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ প্রায় তখন শেষ হয়ে আসছিল। এসেও পাই নি অবকাশ—অন্য দুটি উৎসবের আকর্ষণে। চলচ্চিত্র আপিসের খোঁজ পেতেও তাই দেরি হল। না ছিল ততক্ষণ প্রবেশপত্র, না ভোজনশালার কুপন। পাথেয়ের মতো ভোজন-দক্ষিণাও নিজেরাই দিয়ে যাচ্ছি। পরিচয় যখন ঘটল তখন চিত্রপ্রদর্শনী শেষ হয়েছে—আরম্ভ হচ্ছে বিচারকদের বৈঠক। উৎসবের তারকা ও উৎসাহী ও শিল্পীদের গতায়াত, আচার-আচরণও কম উপভোগ্য নয়। হয়তো বা কোনো কোনো ছবির থেকে বেশি উপভোগ্য। 'কমিদি হিউম্যান'-এর আস্বাদন লাভ করা যায়। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছিল—কোন্‌টা ছবি—যা শুধুই ছবি, শুধু পটে লিখা, না এই সামনে বিচরণশীল, সঞ্চরণশীল—রক্রগতি, নক্রগতি, চক্রগতি—অর্ধেক মানবী বা বারো আনা ছবি। করবার কিছু ছিল না, লেনিনগ্রাদ ফিরবারই ইচ্ছা। কিন্তু কমিটির সম্পাদকদের অনুরোধে রবিবারে সন্ধ্যা সাতটায় শেষ অধিবেশনে যোগদান স্থির করলাম।

ততক্ষণ দেখি এই 'কমিদি হিউম্যান'। আর ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে বসে একটু আড্ডা দিই। একটা বেলা চলচ্চিত্র-উৎসবের ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা জমল—জানতাম, শ্রীসত্যজিৎ রায় বিচারকমণ্ডলীতে আহূত হয়ে সস্ত্রীক এসেছেন। তাছাড়া খাজা আহমদ আব্বাসেরও আসবার কথা, আর এসেছিলেন উত্তর প্রদেশের চিত্র-মালিক শ্রী বন্সাল সস্ত্রীক, সভ্রাতৃক; আর বোম্বাই-এর মিঃ শাহ এবং দুজন বাঙালী শ্রীযুক্ত অজয় কর ('সাত পাকে বাঁধা'র প্রযোজক) ও শ্রীযুক্ত নির্মল দে। এঁদেরও চিত্র দেখা শেষ হয়ে গিয়েছে—এখন মস্কৌ লেনিনগ্রাদ দেখা চলছে, সঙ্গে চলছে একটু-একটু সোভিয়েত-জীবনের বিচার, গবেষণা। নিজের মতো করে সকলেই দেশটা বুঝতে চান, বুঝতেও পারেন—যাদৃশী ভাবনা যস্য।

সত্যজিৎ ব্যস্ত। দেখা হলেও কথা বিশেষ হয় নি। বুঝলাম—জর্জি চুকরাই ও ডনস্কোই প্রভৃতি একালের ও গতকালের শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই তাঁর যথেষ্ট পরিচয়-সৌহার্দ্য, আলাপ-আলোচনা হয়েছে। লেখক-সংঘেরও তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ আছে জানি। কাজের তাড়ায় তাঁকে দেশে ফিরতে হবে অবিলম্বে, কিন্তু এদেশের শিল্পাধ্যক্ষরা তাঁকে আরও চান। অন্যেরাও অনেকেই চান তাঁর চিত্র।

'অনেকে'—কিন্তু জনসাধারণ কিনা বলতে পারব না। জনসাধারণ দেখছি সকল দেশেই রুচিতে, শিল্পবোধে প্রায় এক স্তরের; তফাৎ যা তা উনিশ-বিশের। বিশেষ করে সিনেমা আবার সে রুচি ও রসবোধকে একই ছাঁচে ঢেলে প্রায় অভিন্ন করে তুলেছে। 'আওরাৎ' এ-দেশের মানুষকে পাগল করে, 'লভ ইন সিমলা' দেখেও এরা খুশি। আবার, শুনলাম 'দুই কন্যা' (এক কন্যা বর্জিতা হওয়াতে) এদের মন স্পর্শ করতে পারে নি। তবে এমন লোকও অনেক দেখেছি যাঁরা সত্যজিৎ-এর ছবি দেখতে চান। মস্কৌর ভারতীয় প্রদর্শনীতে এরূপ কিছু রুশ 'অপুর সংসার' ও 'অভিযান' দেখতে পাবেন। কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করেন—কেন তাঁর চিত্র এ দেশে আসে না? উত্তর শুধু এ বলে দিলে অন্যায় হবে যে—'এ দেশের মানুষ তা চায় না।' আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাধারণ মানুষ যদি তা দেখে বুঝতে পারে তাহলে এ দেশের লোক বুঝবে না কেন? তফাৎ যখন উনিশ-বিশের। আমার ধারণা দুটি কারণ—এ দেশের জন্য যে রুশ কর্মচারীরা ভারতে চিত্রনির্বাচন করেন তাঁরা তাঁদের ধারণা-মতোই ছবি স্বদেশের জন্য

নির্বাচন করেন—সদুদ্দেশ্যমূলক, কৃত্রিম, হৈ-রৈ মূঢ়তা তাঁদের বেশি পসন্দ। শিল্প বিষয়ে তাঁরা নিরঙ্কুশ। আবার, আমাদের দেশে (আধা-সরকারিভাবে) যে-কর্তৃপক্ষ বিদেশের জন্য ছবি সুপারিশ বা বাছাই করেন, তাঁদেরও রুচি বা বুদ্ধি এর বেশি উন্নত নয়। বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় যে-ছবি তাঁরা পাঠান তা থেকেও তা বুঝি। সত্যজিৎ রায়-এরও বৈদেশিক স্বীকৃতিলাভের পূর্বে যা সমাদর তা ভারতের এই প্রভু-মহলে হয় নি, হয়েছিল একেবারে জনসাধারণের কাছেও নয়, প্রধানত শিক্ষিত সাধারণের সমাজে। এদেশেও তাই শিক্ষিত কিছু লোক হয়তো তাঁর ছবি চাইবেন, জনসাধারণ নয়। তবে দেখতে-দেখতে আবার দর্শকের চোখ খুলে যায়—যেমন আমাদেরও দেখতে-দেখতে রুচি-বিকার ঘটে 'হলিউড'-এর আর বোম্বাই ফিলমের তাড়নায়। অন্তত চোখ খুলে দেবার চেষ্টাও করতেই হয়। তার জন্যই তো দরকার—চিত্র-প্রতিযোগিতার উৎসব, আর ফিল্ম সোসাইটি। আর, যতই থাকুক জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা, খাঁটি শিল্পী জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর শিল্পসত্যকে বেশি খাটো করতে রাজি হন না। বোধহয় এরেনবুর্গেরই (?) এ-মর্মের উক্তি—লক্ষ লোকের জন্যও ছবি আঁকা হোক, হোক সহস্রের জন্যও এবং দু-দশ জনের জন্যও—লক্ষকে লক্ষের কোঠায় আবদ্ধ না রেখে সহস্রের কোঠায়, এমনকি, দু-দশজনের কোঠায় তুলে দেওয়া নাহলে সম্ভব হবে কি করে? এজন্যই দু-দশজনের ছবি বাতিল করে দিলেও সকলেরই মান যায় গুলিয়ে। এ সত্য বোধহয় মস্কোর এই তৃতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিল্পাধ্যক্ষদের উপলব্ধি হওয়া স্বাভাবিক।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আরও অন্য দেশেও হয়। তার তুলনায় মস্কোর উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই—এখানে উৎসবের উদ্দেশ্য শিল্প-মানবতা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব—এই নীতি অনুসারী চিত্রসমূহেরই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। এ উদ্দেশ্য স্বভাবতই আজকের জগতের সর্বমান্য উদ্দেশ্য। গোঁড়ামি না করলে এতে শ্রেষ্ঠ শিল্পকলারই প্রতিষ্ঠা হবার কথা। কারণ, শ্রেষ্ঠ শিল্পকলাতে মানবতার প্রকাশ থাকবেই; আর পরোক্ষে বিশ্ব-শান্তি ও ভ্রাতৃত্বেরও পরিচয় থাকবে। কিন্তু গোঁড়ামি করলে—শিল্পের উপর চাপানো হবে পরোক্ষে নয় প্রত্যক্ষে, এ-সব উদ্দেশ্য প্রচারের দায়িত্ব। অর্থাৎ শুধু প্রকাশ করলেই হবে কেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে। চোখে আঙুল দিলে নিশ্চয়ই দেখাবার

চেষ্টার পরাকাষ্ঠা হয় কিন্তু দর্শকের তাতে সুবিধা হয় না, আর যাই হোক তা দেখারও সুবিধা হয় না। প্রকাশই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রচার, আর প্রচারও প্রকাশ হয়ে উঠলেই হয় শিল্পকলা—হয় মহাভারত, রামায়ণ। সোভিয়েত শিল্পকলা তার গৌরবের যুগে তাই হয়েছিল। আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন থেকে ডনস্কোই পর্যন্ত নামগুলো তাতেই আমাদের মতো দর্শকের কাছেও এত প্রিয়। কিন্তু তারপর? শিল্পী নেই তা নয়, মাঝে-মাঝে এখনো এক-একবার তাঁদের পরিচয়ে চমৎকৃত হই। কিন্তু প্রকাশধর্ম রাহুগ্রাসে পড়ে যাচ্ছে প্রচারের তাড়নায়। ফলে যা হচ্ছে তা এই চলচ্চিত্রের উৎসবেই দেখা গেল—সোভিয়েত চলচ্চিত্র দুটি প্রায় প্রতিযোগিতায় ঠাঁই-ই পায় নি বললে অন্যায় হবে না। সোভিয়েত শিল্প-রসিকরা বুঝেছেন কী তাঁদের অবস্থা। সোভিয়েত প্রচার-শাস্ত্রীদেরও তা না বুঝে চলবে কি?

মস্কোর বড় বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মতোই চলচ্চিত্র উৎসবেও বিরাট সমারোহ। তা হবারই কথা। লেনিনের ভাষায় চলচ্চিত্রই হচ্ছে এ যুগের সর্বপ্রধান শিল্প। এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন প্রায় ১৩৩০ জন শিল্পী কর্মী অতিথি, গুণী দর্শক। অর্ধেক অবশ্য বিভিন্ন সোভিয়েত অঙ্গরাজ্যের মোট ৬৩টি দেশের নাগরিক। ৪১টি দেশের চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। তবে প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই হয়েছে ৪৯টি চিত্র; মানবতা, শান্তি, ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য এদের স্বীকৃত। প্রত্যেক দেশের ১টি করে, কেবল সোভিয়েতের ২টি—'বালুয়েভ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ', এবং 'মালশূন্য মালগাড়ি' ('আমরা দুজন'-এর পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত মালগাড়িই দেখানো হয়, আর তা রৌপ্যপদকও লাভ করেছে)। আরও ৪১টি চিত্র আছে প্রতিযোগিতার বাইরে—তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত চিত্র ছিল।

ভালো ছবির অভাব নেই; তবু ছবি দেখে-দেখে বিচারকরাও ক্লান্ত, বিচারও কম কষ্টসাধ্য নয়। ক্লান্তির একটা কারণ—শান্তির ও ভ্রাতৃত্বের নামে যে সব ছবি বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী দেশের শিল্পীরা উপস্থাপিত করেছেন তা প্রায়ই গত মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত—যুদ্ধ, যুদ্ধের বিভীষিকা ও নানা দুর্দশাই তার অবলম্বন; প্রধান ভাব—দেশরক্ষা, দেশপ্রীতি। মহাযুদ্ধের স্মৃতি এদের মনে চেপে আছে। কিন্তু সকল দেশের চিত্রে যদি যুদ্ধ ও ফ্যাশিস্ত আক্রমণ প্রধান অবলম্বন হয় তাহলে সে-সব ছবি বৈচিত্র্যহীন হবে। দেশরক্ষার ছবিও শান্তির ছবি হতে পারে, কিন্তু শান্তিরও

একমাত্র অবলম্বন কি দেশরক্ষা? এই 'এ্যাপ্রোচ' বা দৃষ্টিকোণের একঘেয়েমি ও বিষয়বস্তুর একঘেয়েমি সোভিয়েত দেশ থেকে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। একাকারত্ব বা পুনঃপৌনিকতা জীবনের ধর্ম নয়, আর্টেরও নয়। প্রকাশ-কলায় অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য থাকলে কতকটা এই একঘেয়েমি কাটে। কিন্তু সেদিকেও সোভিয়েত শিল্পাদর্শকে ক্রমে পেয়ে বসেছে ক্লাসিক সারল্যের নামে বৈশিষ্ট্যহীনতা, সহজবোধ্যতার নামে অতিস্পষ্টতা, লক্ষ মানুষকে তাদের স্তরেই মেনে নেওয়ার ঝোঁক। অতএব প্রকাশের অভিনবত্বেও আগ্রহ কম। এরূপ ছবির পর ছবি দেখতে-দেখতে ক্লান্ত হবে না এমন দর্শক কম।

প্রতিযোগিতার ছবির বিচারও তাই বলে একেবারে সুসাধ্য নয়। কোনটা হবে মুখ্য মানদণ্ড—চিত্রকলা হিসাবে উৎকর্ষ, না, বক্তব্য সম্বন্ধে উৎকর্ষ? যদি শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শই হয় প্রথম মান্য, তাহলে শিল্পকৌশল, তাতে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের কথা উঠবে পরে। যদি শিল্পকৌশলই হয় প্রথম কথা, তাহলে সে মাপকাঠিতে যা সমুন্নত, তা প্রথম গ্রাহ্য করে, তারপর দেখতে হবে মানবতা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের দাবি কতটা রক্ষা হয়েছে কোন্ চিত্রে। শুনেছি বিচারকমণ্ডলী এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যায় বহুক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। অন্য সকল পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁদের মত স্থির করতে দেরি হয় নি, দেরি হয় মহাপারিতোষিক বা বলশোই প্রাইজ-এর চিত্র সম্বন্ধে।

বিচারকরা একদিকে সাতজন যে-চিত্রকে প্রধান পারিতোষিকের যোগ্য মনে করেন সোভিয়েত ও সোশ্যালিস্ট দেশের অন্য সাতজন তাকে বিশেষ পুরস্কার দিতে রাজী; কারণ তা উৎকৃষ্ট চিত্র। কিন্তু শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের চিত্র বলে মানতে অস্বীকৃত। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, অন্য সাতজনও বলেন যে, সত্যই শান্তি বা ভ্রাতৃত্বের চিত্র তাকে বলা দুঃসাধ্য; আর চিত্রটি সাধারণ দর্শকের পক্ষেও নিশ্চয়ই বেশ দুর্বোধ্য। কিন্তু 'শিল্পাদর্শে মানবতা' আছে, আর আছে কলানৈপুণ্য, সূক্ষ্মতা, প্রকাশের কৃতিত্ব। অনেক আলোচনার পরে সমাজতন্ত্রী দেশের লোকেরাই অপরদের রায় মেনে নিলেন। ফেদিরিকো ফেলিনির চিত্র 'সাড়ে আট' মহাপারিতোষিক লাভ করল।

অপরাপর চিত্র সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল না, তাই সোভিয়েত যে চলচ্চিত্র

শিল্পকলার দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে, এ-কথা সোভিয়েত বিচারকরাও অনুভব করেছেন, বলতে হবে। কারণ, প্রথম শ্রেণীর একটি পুরস্কারও (স্বর্ণপদক) কোনো সোভিয়েত চিত্র পায় নি, পেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর (রৌপ্যপদক) পুরস্কার। অবশ্য কোনো কোনো পুরস্কার তবু হয়তো শিল্পকলা ছাড়া অন্য কারণেও দেওয়া হয়েছে—প্রতিযোগিতার বাইরে যে-সব প্রদর্শিত হয় ও পুরস্কৃত হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য অনেকটা এরূপ অন্য কারণে—তা প্রায় বলাও হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চিত্র ছিল 'সাতপাকে বাঁধা'—অ-ভারতীয় লোকদের মানবতার, শান্তির বা ভ্রাতৃত্বের দিক থেকে এ চিত্র আকৃষ্ট করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তবে অভিনয়ে সুচিত্রা সেন তাতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, আর বিচারকমণ্ডলী তাঁকেই নারীভূমিকার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে একটি রৌপ্যপদক উপহার দিয়েছেন। ভারতকে সকলেই স্বীকৃতি দিতে চায়। স্বীকৃতি অকারণ নয়। আমরাও সকলে তাতে গৌরব বোধ করেছি।

রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় ক্রেমলিন-এর বিরাট সভাগৃহে উৎসবের শেষ অধিবেশনে যখন গেলাম তখন উৎফুল্ল চিত্তেই গেলাম। ভারতবর্ষও অবজ্ঞাত নয়, আর উৎসবটি সর্বব্যাপী মতৈক্যে ও সহযোগিতায় ও সহমর্মিতায় সার্থক। একটা আনন্দোজ্জ্বল প্রসন্নতা দর্শকদের ও শিল্পীদের মুখে। মঞ্চে যখন মহাকাশচারী নারী (ভেলেন্টিনা) ও পুরুষেরা, সভানেত্রী মন্ত্রী য়ে. এ. ফুর্ৎসেবা, উৎসব-কর্তৃপক্ষ এ. বি. রোমানভ ও বিচারক-পরিষদের সদস্যরা প্রবেশ করলেন তখন স্বচ্ছন্দ মনে তাঁদের সম্বর্ধনা করলেন সবাই। বিচার-পরিষদের প্রধান হিসাবে গে. চুকরাই জানালেন প্রতিযোগিতার বিচারফল—আর ই. কোপালিন ঘোষণা করলেন তদ্ভিন্ন অন্য চিত্রসমূহের পুরস্কারের কথা। একে-একে পুরস্কৃতরা পারিতোষিক গ্রহণ করতে এলেন, সম্বর্ধিত হলেন, নিজের মতো করে জানালেন ধন্যবাদ। কখনো সহাস্য বিনয়ে দর্শক ও কর্তৃপক্ষের দিকে তাকিয়ে, কখনো শিল্পিসুলভ সপ্রতিভ কথায় ও গতি-ভঙ্গিতে চমৎকৃতি জাগিয়ে। মোটের উপর দীর্ঘ সময়টা ক্লান্তি বোধ হল না। আর একটা 'চিত্র' দেখলাম বললেও চলে—সেই বড় চিত্রেরই অপরাংশ যা হোটেলে এই শিল্পী ও তারকাদের গতায়াতে, আচার-আচরণে, কথায়-ভঙ্গিতে আমাদের চোখের সামনে তিনদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে—'কমিদি ইউম্যার'-এর সচেতন দিক।

মহাপারিতোষিক পেয়েছে ইতালীয় পরিচালক শিল্পী ফেদেরিকো ফেলিনির

'সাড়ে আট' নামীয় চিত্র। বিচারকদের মতে "সত্যান্বেষী শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে" তা সার্থক। এ চিত্র নিয়েই সব চেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে, এতদিন। না হবার কারণ নেই। চিত্রটি দুর্বোধ্য না হয়েও যায় না— এর নায়কও চিত্র-পরিচালক (নাম—মার্সেলো মাস্ত্রোইনিনি)। তাকে আশ্রয় করে এ চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক দুর্নীতি কবলিত সমাজে শিল্পস্রষ্টার অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফেলিনির এর পূর্বেকার চিত্রের নাম 'মধুর জীবন'। সভায় প্রসন্ন শিষ্টাচারের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি পারিতোষিক গ্রহণ করেন। মস্কোর সাংবাদিকদের কাছে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, চিত্রটির বক্তব্য—"মানুষের আত্মদৌর্বল্যের ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ওপর তার জয়লাভ, মানুষের অধ্যাত্ম শক্তিতে আস্থা।" বক্তব্য ঠিকই। কিন্তু তা বোধগম্য হবে কয় জনার? লক্ষের নয়। সহস্রেরও পক্ষে কষ্টসাধ্য। কারণ, এ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে জটিল কৌশলে। ভাবনার, কল্পনার, স্বপ্নের, স্মৃতির, আশার, বাসনার—নানা অলক্ষিত মানসিক তরঙ্গের প্রবাহ; সমস্তটা মিলে শিল্পীচৈতন্য যেন এক ঘূর্ণাবর্ত— ব্যাহত, বিভ্রান্ত, বিমথিত, প্রলুব্ধ শিল্পীচিত্ত আত্মরতিতে আবদ্ধ। প্রকাশের তাড়নায় অস্থির অথচ বলবার বিষয় তার কি জানা নেই। এ যে গল্প কবিতার 'নতুন রীতি'কেও ছাড়িয়ে যায়। শিল্পী বা তার সমধর্মীদের কাছে যেমনি তা সত্য; তেমনি এই একান্ত ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্বে ও তার একান্ত ব্যক্তিগত প্রকাশ রীতিতে অন্য দশজনের সহমর্মী হয়ে ওঠা সহজ নয়। শিল্পীর অকৃত্রিমতা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তেমনি বিষাদময় তাঁর ব্যর্থতার এই দ্বিধাহীন স্বীকৃতি— পরিণামে 'জয়লাভের' কথা কল্পনাসাপেক্ষ। তাই এ চিত্রের উপভোগ সে-পরিমাণেই সম্ভব যে-পরিমাণে এই একান্ত বক্তব্য ও এই একান্ত রীতির সঙ্গে দর্শক একাত্ম হতে পারেন। মস্কোতে যে সব চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে—বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী দেশের চিত্রসমূহে—জীবন এই বিষয়ীগত (সাবজেকটিব) দৃষ্টিতে সে সব চিত্রে দেখা নয়, বিষয়গত (অবজেকটিব) দৃষ্টিতে দেখা। সেই কৌশল আঙ্গিকেই প্রকাশিত। আর এসব চিত্র যে আবার যুদ্ধ ও দেশরক্ষা-আশ্রয়ী তাও বলছি। কাজেই ফেলেনির চিত্র হচ্ছে শিল্প হিসাবে তাদের থেকে পৃথগ্‌ধর্মী।

মানুষের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব এই দুর্নীতিগ্রস্ত কালের ঘাত-প্রতিঘাতে জটিলতর হয়েছে, এ সত্যটা আজ না বলতে পারলে কোনো শিল্পই সুস্থ বোধ করে না। জীবনসত্যকে অকপটে বলতে পারছে বলেও মনে করে না। সমাজতন্ত্রী কেন,

হলিউড্ ও বোম্বাই চিত্রশিল্পীদেরও বোঝা উচিত সাতপাকে-বাঁধা নরনারীরও জীবন এ যুগে সাত শত যন্ত্রণায় পাক খাচ্ছে। এই হল যুগসত্য এবং জীবনসত্য। ফেলিনিকে সম্মানিত করার অর্থ তাই দুর্বোধ্যতাকে সম্মানিত করা নয়, বরং শিল্পের এই নতুন সমস্যা ও তার প্রকাশ-প্রচেষ্টাকে স্বাগত করা, এইরূপ মনে করতে পারি।

সম্মানিত অন্য চিত্রগুলো নিয়ে প্রশ্ন নেই। তিনটি স্বর্ণপদকের মধ্যে প্রথমটি পেয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার 'মৃত্যুর নাম এঙ্গেলচেন' (বা 'আমরাও ভুলি নাই ?') দ্বিতীয়টি যুগোস্লাভিয়ার 'কোজারা' আর তৃতীয়টি জাপানের 'বাজে মেয়ে'। রৌপ্য পদকের মধ্যে একটি পেয়েছে সোভিয়েতের 'মালশূন্য মালগাড়ী'। যে চিত্রটি সোভিয়েত ঘটা করে প্রথমেই দেখিয়েছিল 'বালুয়েভের সঙ্গে সাক্ষাৎ' তা কোনো পুরস্কার পায় নি—এইটি চিন্তনীয়। অর্থাৎ সোভিয়েতের শিল্পদৃষ্টিতে কোথাও বিভ্রান্তি ঘটছে। জীবনকে ওরকম ছকে বাঁধা দৃষ্টিতে দেখার, মানুষকে ভালোমন্দ ঠিক করে মোটা মোটা দাগে আঁকার দিন চলে গিয়েছে। বিশেষত আবার সে-দেখা ও সে-আঁকায় যদি না থাকে যথেষ্ট প্রাণ-সম্পদ। অন্য রৌপ্য পদকের একটি পেয়েছে পোল্যাণ্ডের 'কালো ডানা', অন্যটি হাঙ্গেরি'র 'ট্রেনের একটি কাহিনী'। বিস্তৃত পুরস্কার তালিকা দিয়ে লাভ নেই—তবে প্রধান অভিনেতারূপে রৌপ্যপদক পেয়েছে মার্কিন দেশের স্টেভ্ ম্যাক্‌কুইন আর (পূর্বেই বলেছি) প্রধান অভিনেত্রীরূপে ভারতের সুচিত্রা সেন।

ভারতবর্ষের থেকে শ্রীযুক্ত বন্‌সাল সুচিত্রা সেনের হয়ে পারিতোষিকটি গ্রহণ করেন—পরিচালক শ্রীযুক্ত অজয় কর তাঁর পার্শ্বে ছিলেন (দর্শকদের অপরিচিত)। সুচিত্রা সেন উপস্থিত থাকলে যে সম্বর্ধনা পেতেন তা হয়তো জীবনে বিস্মৃত হতে পারতেন না। অন্যান্য অভিনেত্রীরা কেউ-কেউ যাঁরা কিছু না কিছু পুরস্কার বা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের দর্শনে—রূপে হোক, বেশভূষায় হোক, সাবলীল বা চটুল আচরণে হোক; যে কারণেই হোক—যে জয়ধ্বনি বাজছিল তাতে মনে হয়—একে ভারতীয়, শাড়ি-সজ্জিতা, তাতে আবার সর্বাগ্রগণ্য অভিনেত্রীরূপে পুরস্কৃতা সুচিত্রা সেন ক্রেমলিনের সভায় অসামান্য উল্লাস ও উৎসাহের সঞ্চার করতেন। আপাতত সে সভাতে আমরা বিশেষ করে তৃপ্ত হলাম—ইন্দোনেশিয়ার মতো দু-একটি অভিনেত্রীর রূপে, ফরাসী অভিনেত্রী মিসেস্ সিমোন সিনোরিয়ার সপ্রতিভ স্বচ্ছন্দ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনে, (কর্তৃপক্ষ ও কলামনিষদের প্রত্যেককে তিনি দুগালে চুমো খেয়ে সভায় একটা উৎসবের ঢেউ তুলে দেন), আর জাপানী 'হিরোশিমার পামর' চিত্রের শিল্পী জাপানী শান্তিনেতার স্মরণীয় উক্তিতে "হিরোশিমা আর নয়।" হাঁ, এই রকম কথা।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শশী-শান্তির আজকের দিন

শান্তি সদরেই ছিল, কড়া-নাড়ার আওয়াজে ওপরে উঠে যায়। বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দেখে তরতরিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দেয়।

চড়া গলায় শশী বলে, 'আচ্ছা মানুষ তো!'

শান্তি বলে, 'ভেতরে এসো।'

'ভেতরে এসো! কটা বাজল খেয়াল আছে?'

শশী হাত বাড়িয়ে ঘড়ি দেখায়, ঘড়িসমেত কবজি চেপে ধরে শান্তি তাকে ভেতরে টেনে নেয়।

খিল দিতে দিতে বলে, 'আমি তো সেই চারটে থেকে রেডি হয়ে আছি।' শশীর মুখোমুখি তাকায়। নিজেকে দেখায়।

সেই শাড়ি সেই ব্লাউজ। কুঙ্কুমের টিপ। ডগডগে সিন্দুর। নতুন ছাঁদে খোঁপা—বেলফুলের মালা জড়ানো যায় এমন ছাঁদে। হোক রোল্ডগোল্ডের, খাসা মানিয়েছে হারছড়া! লকেটটা যেন—

লকেটের নষ্টামি শায়েস্তা করার জন্যে শশী উসকে উঠছিল, মুখ টিপে শান্তি হেসে পিছিয়ে যাওয়ায় হয়ে যায় গুম।

শুধু সেজেগুজে রেডি হয়ে থাকলেই হল?

'পাঁচটায় তোমার মীট করার কথা। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমার পা ব্যথা হয়ে গেল, আর এদিকে তুমি—'

'কী করব বলো! আমি কি ইচ্ছে করে—'

ইচ্ছে করে কথা রাখেনি, শশীও বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রোগ্রামটা তো ভেস্তে গেল? কথা না-রাখতে পারাতেই গেল? হাজার ইচ্ছে থাকলেও কথা না-রাখতে পারাতে?

তবে আর ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম?

শান্তির কাতর কৈফিয়তেও শশীর তাই মন মানে না।

'হঠাৎ একটা কাজে—'

'কাজ কাজ আর কাজ!' শশী গজগজ করে। পাছার নাগালে চেয়ার, তবু খানিকটা সরে গিয়ে হড়হড়িয়ে চেয়ার টেনে জানান্ দিয়ে বসে। 'চাকরি কর যখন কাজ থাকবে না!' গাল ফোলায়। ভোঁস করে শ্বাসও ছাড়ে।

সে চাকরির খোঁটা দিচ্ছে ভেবে মানুষটা অভিমান করল? হায় ভগবান! শান্তি দরজায় গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওপরের সিঁড়ি দেখে দরজা ভেজিয়ে চটপট ফিরে এসে পিছন থেকে শশীর গলা জড়িয়ে ধরে।

'আমার ঘাট হয়েছে। মাপ চাইছি।'

'ছাড়ো—ভালো লাগে না!'

'পায়ে ধরতে হবে? বলো?'

'হয়েছে! আর ন্যাকামি—'

'আজকের দিনে আমায় বকছ?' শশীর মাথায় শান্তি হাত বুলোয়। মাথাটা বুকের সাথে চেপে ধরে। মাথায় থুতনি রাখে। ঘষে।

'না, তুমিই বলো—'

'ফের!'

প্রোগ্রাম ভেস্তে-যাওয়ার আপসোস শশীর তবু যায় না। শান্তির সোহাগে দেহের রক্ত ছলবলিয়ে উঠলেও না।

আচমকা উঠে-দাঁড়িয়ে শান্তিকে তছনছ করে সোহাগের প্রচণ্ড প্রতিদান দিয়েও না।

শান্তিই বলুক, এতদিন ধরে প্ল্যান-করা প্রোগ্রাম ভেস্তে গেলে হবে না আপসোস? সাতটা নয় পাঁচটা নয়—সম্বৎসরে এই একটা দিন! প্রথম বছরের প্রথম দিন! তাও যদি বরবাদ হয়, আপসোস হওয়া অন্যায়?

আপসোস কি শান্তিরও হচ্ছে না? বলুক—না? শশীকে বুকে হাত রাখতে দিয়ে বলুক?

দুই থাবা বাড়িয়ে শশী উঠছিল, কিন্তু শান্তি এমনই চোখ পাকায় যে ধপ করে বসে পড়ে থতমত খেয়ে বলে, 'না—মানে—তুমিই—'

'বেশ তো', মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে শান্তি বলে, 'সারা রাত আজ আপসোসের শোধ তুলো।'

'সারা রাত?' দুই ভুরু শশীর উঠে যায় কপালে।

'অবিশ্যি', শান্তি গালে টোল খাওয়ায়, 'আপত্তি থাকলে—'

'আপত্তি !' শশী বিষম খায়।

'অসুবিধে ? তাহলে দশটার মধ্যেই—'

'পারমিশান পেয়েছ ? অ্যাঁ, পেয়েছ পারমিশান ?' নাচবে না তুড়িলাফ দেবে শশী বেচারা দিশে পায় না। 'দি গ্র্যাণ্ড ! থ্রি চিয়ার্স ফর জবাদি—'

'আস্তে !'

'যাবো নাকি ? তোমার জবাদিকে গিয়ে একটা প্রণাম ঠুকে আসব ?'

জর্দার কৌটো পেয়ে জবাদি খুশি হয়েছে। শশীর প্রণাম পেলে খুশির মাত্রা বাড়বে। কিন্তু পারমিশান দেওয়ার ষোল আনা বাহাদুরিই কি জবাদির পাওনা ?

'যাই বল, দেখতে ধুমসী হলে কী হবে, তোমার জবাদির মনটা কিন্তু—'

ওই মেয়েটা—তাপসী না অতসী—সময়মত না খালাস হলে জবাদির পারমিশানেও কিছু এসে-যেত ?

'ঈশ, সকালে, এমন-কি পাঁচটার আগেও যদি খবরটা আমায় দিতে পারতে !'

সুতরাং প্রণাম করতে হলে ওই তাপসী না অতসীকেও করতে হয়। তাকে প্রণাম করলে—

'কথা বলছ না কেন ?'

সোফার দিকে তাকিয়ে গায়ে শান্তির কাঁটা দেয়। ভাগ্যিশ বেশি আরামের লোভে শশী সোফায় গিয়ে আজ বসে নি ! ভাগ্যিশ !

'আগে খবর পেলে টিকিট দুটো বেচে না দিয়ে নাইট শোয়ে বদলে নিতাম। দিব্যি সিনেমা-ফিনেমা দেখে—'

শান্তি বলে, 'রঘু ঠিক সময়ে এলে টিকিট বেচার দরকার হত না।'

'রঘু ?'

ভুল হয়ে গেছে—রঘু নয়, রঘুর বদলী। রঘু তো এখন জেলের ঘানি টানছে।

'রঘু আসবে মানে ?'

শান্তি জবাব দেয় না।

'ব্যাপার কী ?'

ব্যাপারটা মুখ ফুটে বলার নয়। শশী অবশ্য সব জানে, কিন্তু জেনেও যখন না-জানার ভান করে থাকে, থাকতে ভালোবাসে—শান্তির কি উচিত পষ্টাপষ্টি জানানো ?

কিন্তু শশীর কৌতূহল আজ বড়ই জোরালো।

তার কথামত সাজগোজ করেও কার জন্যে প্রতীক্ষা করছে? কার জন্যে কথার খেলাপ করেছে? শান্তির কাছে কি শশীর চেয়ে তার দাম বেশি?

শশীর জেরা শান্তি গায়ে মাখে না। 'নিশ্চয় আসবে।' সহজ সুরে বলে, 'সন্ধ্যে হয়েছে, এখুনি এসে যাবে।'

'কে আসবে?'

'আসবে একজন।'

'কেন আসবে?'

'দরকার আছে।'

'দরকারটা কী জানতে পাই না?'

'সব কথা তোমার জানার দরকার!' নির্ভেজাল ধমকই দেয়, দিয়ে ফিক করে হাসেও নির্ভেজাল।

ধমকের ক্ষতি কিন্তু তবু পূরণ হয় না। মুখ শশীর থমথমে হয়ে ওঠে।

তাকে শান্তি পর ভাবে? এত পর যে বিশ্বাস করে কথাটা বলতে পারছে না?

শশীকে অবিশ্বাস করে শান্তি!

আজকের দিনে শান্তির এই ব্যবহার!

'তাহলে', কেশে অভিমান উথলে তুলে সখেদে শশী বলে, 'যার আসার কথা আছে সে না এলে তুমি—'

'বললুম না আসবে! বেলাবেলি সাহস পায় নি, এখন নিশ্চয়—'

'যদি না আসে?'

'গরজের চোটে আসবে।' টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে তার থেকে দশ টাকার দুটি নোট বের করে শান্তি দেখায়। 'এর টানে আসবে।'

'কিন্তু ধরো', শশী সওয়ালের জিদ ধরে, 'ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যদি না আসতে পারে? টাকার টান ভীষণ টান, সেই টানে বাড়ি থেকে বারও হল—কিন্তু রাস্তায় বেমক্কা গাড়ি-চাপা পড়ে যদি? গাড়ি-চাপা পড়ে হর্দম লোক মরছে তো? ইচ্ছে করেও কেউ গাড়ি-চাপা পড়ে না। তাহলে?'

'তাহলে তোমার মাথা!'

'উঁহু, এড়িয়ে গেলে চলবে না। ধরো—'

'কেন মিছে বকবক করছ বলো তো! কেন বুঝছ না যে কাজটা ভীষণ জরুরী। ও না এলে—'

'হুম!'

বিড়ি-খোর শশী আজ পাঁচটা ক্যাপস্টান কিনেছিল। সিগারেট পাঁচটি কখন কখন খাবে ঠিক করে রেখেছিল। কী ভাবে মুখ বুজে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বে, ঠোঁটে সিগারেট চেপে কথা বলবে—মনে মনে তার মহড়াও দিয়ে রেখেছিল।

এখানে এখন সিগারেট খাওয়ার কথা নয়। তবু ধরায়। প্রোগ্রামই যখন ভেস্তে গেল কী লাভ আর ওগুলো মজুত করে রেখে!

চড়চড় টানের চোটে মুখে আগুনের আঁচ লাগলে আধখানা সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরায়। ফের টান মারে চড়চড়।

পাঁচ মিনিটেই পাঁচটি যদি কাবার হয়ে যায়, যাক! যাক যাক যাক!

আজকের দিনে শান্তির এই ব্যবহার! আজকের দিনে!

'তবে আর আমি ঝুটমুট বসে থাকি কেন?' উঠে দাঁড়ায়। 'চলি।'

'বোসো বলছি!'

পা বাড়ায়।

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু—ভালো হচ্ছে না!'

দরজা খোলে।

'যেও না! যেও না! গেলে আমার মরা মুখ দেখ!'

কাঁদ-কাঁদ গলায় চরম দিব্যি দিয়ে শশীকে শান্তি থামায় বটে, টেনে এনে বসায়ও—কিন্তু নিজে বোধ করে বড়ই দিশেহারা।

সত্যিই যদি না আসে লোকটা? গাড়ি-চাপা না পড়ুক, না-আসার নানান কারণ থাকতে পারে। টাকার লোভে প্রথমে রাজী হলেও ভয় পেয়ে পরে পিছিয়ে যাওয়া আশ্চর্য না!

তাহলে উপায়? উপায় তাহলে?

জবাদিকে কিছু বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠবে: বড় না তখন দরদ দেখিয়েছিলি! গরিবের কথা মনে ধরল না! অবনী ডাক্তারের ওপর সর্দারি! সামলা এখন! তোর লোক আসে নি আমি তার কী করব? তোর দায় তুই বোঝ। নিজে নিয়ে যা।

নিজে?

সোফার দিকে চোখ পড়তেই হাত-পা শান্তির পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।

দরদ! অকথ্য আক্রোশ জাগে নিজের ওপর।

কেন সে দেখাতে গিয়েছিল দরদ? টুকরো টুকরো করে কেটে রক্তের গামলায় ফেলতে-দেখাটা সইতে পারে না? না দেখলেই হত।

জবাদিকে যদি বলত, ওই সময়টা আমি থাকব না জবাদি, ডাক্তার চলে গেলে সলিউশন ঢেলে ঘেঁটেঘুটে রক্ত মাংস এক করে দেওয়ার কাজটা তুমিই কোরো—নির্ঘাত রাজী হয়ে যেত।

এ কাজ করতে জবাদির নাকি মজা লাগে। তার ওপর কুড়িটা টাকা।

এখন গিয়ে জবাদির পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে? ভীষণ বোকামি করে ফেলেছি জবাদি, আমায় উদ্ধার করো জবাদি—নাকের জলে চোখের জলে বলবে?

লাভ নেই। যতই ভালোবাসুক, তার ওপর টেক্কা-দেওয়াকে জবাদি ক্ষমা করবে না। মাতৃভবনের কথা ভেবে কাজের ভারটা নেবে বটে, শান্তিকেও দেবে খারিজ করে।

যেমন দিয়েছে সুবাসিনীকে। আশাকে। নেকী-মেকী মেয়ে থাকার চেয়ে না-থাকা ভালো।

মাতৃভবন যখন শুরু হয়েছিল তখন কোথায় ছিল সুবাসিনী আশা শান্তি? জবা ঘোষ একাই তখন চালায় নি?

রঘুর ব্যাপারের পর হরলাল উধাও হয়ে গেলে নতুন চাকর না রেখে চালাচ্ছে না?

ঠিকে ঝি আর ঠাকুরটা থাকলেই যথেষ্ট। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—কোন্ কাজ অসাধ্য জবা ঘোষের?

'কী হয়েছে তোমার বলো তো?' শান্তির চোখ-মুখ দেখে শশী সদয় হয়।

নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে শান্তি নামকাওয়াস্তে মাথা নাড়ে।

'নিশ্চয় কিছু হয়েছে, নিশ্চয়। বলবে না? আমাকেও বলবে না?' শান্তির দুই কাঁধে শশী হাত রাখে। 'শান্তি!'

বড় মধুর হয়ে ডাকটা বাজে। ছোঁয়াটা বড়ই ভরসা আনে। পায়রার মত এক ফোঁটা ওই বুক—এই শান্তির সবচেয়ে সবসেরা আশ্রয়। একমাত্র আশ্রয় এখন।

ডিসপেনসারির নরক থেকে শশীই তাকে উদ্ধার করেছে, এখনও উদ্ধার তাকে শশীই করতে পারে।

শশীর চেয়ে আপন শান্তির দুনিয়ায় আর কে ?

'বউ !'

তবু যেটুকু দ্বিধা ছিল বউ ডাকে উবে যায়। শান্তি সরে দাঁড়ায়, চোখের ইশারায় সোফার পেছনটা দেখিয়ে দেয়।

'কী ?'

'ওখানে।'

'কী ওখানে ?' স্বামী এগোয়।

'না না না,' তার জামার খুঁট চেপে ধরে গাটছড়া-বাঁধা বউ চলে পিছে পিছে, 'তুমি ছুঁও না ছুঁও না—'

উঁকিঝুঁকি মেরে সোফা আর দেওয়ালের ফাঁক থেকে শশী বের করে আনে রেশনের থলেটা।

'রেখে দাও ! শিগগীর—শিগগীর তুমি—'

শান্তির চাপা-আর্তনাদে কান না দিয়ে থলের মুখ খুলে দেখে।

'এই ব্যাপার ! এটা নেবার লোক আসেনি বলে—'

'রাখলে !'

থলে ছিনিয়ে নিতে যায় শান্তি, মাথার ওপর থলে তুলে ধরে দোলায় শশী, 'এই মোট আমি বইতে পারব না ? ভাব কী আমাকে !'

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু !'

'এই মোটের মজুরি বিশ টাকা !'

'এখনও বলছি—'

'এর জন্যে আমাদের আজকের দিন মাঠে মারা যাবে ! এসো।'

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

কোনরকম সেন্টিমেণ্টকে লাই দিলে শশীর মত মানুষের চলে ? আপিসে তিরিশ লেখা থাকলেও, শান্তি আটাশ জানলেও—আসলে বয়েসটা তার পঁয়ত্রিশ নয় ?

বিশ বছরে বাপ মরতে পনেরোটা বছর সংসারের ঘাটে-ঘাটে নাকানি-

চুবানি কম খেয়েছে? দুনিয়ার হালহকিকত জেনে-বুঝে সেয়ানা হয়ে-ওঠার মত নাকানি-চুবানি?

নাকানি-চুবানি অনেক খেয়েছে শান্তিও। কিন্তু মেয়েমানুষ কিনা, দুইয়ে দুইয়ে চারের অনিবার্য যোগফলটা মাঝে মাঝে তাই মানতে চায় না।

মাতৃভবনের নাম শুনে তাই বেঁকে বসেছিল।

পাখি-পড়ার মত করে শশীকে তখন বোঝাতে হয়ঃ কাজটা অন্যায়? শোনো কথা! মাতৃভবনগুলি না থাকলে বোকা-বেহিসেবী মেয়েগুলোর অবস্থা কী হত? হাতুড়েদের পাল্লায় পড়ত। ফলে ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন। কেলেঙ্কারিরও একশেষ।

বিপদের ঝুঁকি? পাগল না মাথাখারাপ! মিহিরের মত মানুষরা পেছনে আছে না? শশীর বন্ধু না মিহির? দৈবাৎ দু-একটা কেস ধরা পড়ে বটে, পুলিশকে হাতে রাখতে পুলিশের মান রাখতে ধরা-পড়ানো হয়, ফাঁসে কিন্তু চুনোপুঁটিরা। ও ব্যাপারে শান্তি সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুক।

ঃ আর, নিজেদের কথাটাও ভাবো। রক্তমাংসের মানুষ যখন খিদে তেষ্টা আছে!

শান্তি থাপ্পড় তুলেছিল।

ঃ অবিশ্যি যদি বল কত লোক তো হোটেলে খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু হোটেলে খাওয়ায় রিস্ক নেই? খরচ-খর্চা বেশি না?

শান্তি থাপ্পড় হাঁকিয়েছিল। হোক জগা শশীর বন্ধু, রেণু শান্তির সখী, তবু তাদের সামনে এ সব কথা! মনটা শশীর পাঁকে ভরা। মুখটা শশীর নর্দমা।

জগা-রেণুর সামনে থাপ্পড় হাঁকালেও আড়ালে কিন্তু গালে হাত বুলোয়। থুতুর মলমে গাল থকথকে করে দেয়। কেন শশী অত কথা বলে? শান্তিই কি অবুঝ!

শান্তি যে কত বুঝসুঝ অনেক তার প্রমাণ দিয়েছে। একেকটা প্রমাণ এমনই তুখোর যে শশী হেন মানুষও থ হয়ে গেছে।

তবু যে কেন মাঝে মাঝে অবুঝপনা করে! ফার্স্ট হয়ে ক্লাস ফাইভে প্রমোশন পেয়েও প্রথম ভাগ পড়তে পারে না? ফের অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করতে হয়।

শান্তিকে নতুন করে বোঝাবার জন্যে শশী পাশ ফেরে, তারাপদ বলে ওঠে, 'আরেঃ শশী না ? পেছন থেকেই আমার মনে হয়েছিল—'

তড়বড় করে করে এগিয়ে আসে, সবজান্তার মতো ঘাড় নেড়ে নেড়ে শশীর সাথে কথা বলে, চোখ ছুটি কিন্তু তারাপদর শান্তির গা বেয়ে ওঠা-নামা করে।

গ্রাম সুবাদে কাকা। বাপের ভাইকে শশীর এখন বউয়ের ভাই বানাতে প্রাণ চায়। কোন দিন যে পাত্তা দেয় না, সে এসেছে এখন আগবাড়িয়ে শশীর সাথে আলাপ জমাতে !

'তারপর, তুমি এ পাড়ায় ?'

'এই।' শশী দেখনহাসি হাসে। পাড়াটা তোর বাপের ?

'অনেকদিন পরে দেখা হল, না ?'

'আজ্ঞে !' যেভাবে শান্তিকে আগাপাশতলা চোখ দিয়ে চাটছে, এগিয়ে যাবে ? শান্তির সাথে কোন সম্পর্ক নেই বুঝিয়ে দেবে ?

'খবরাখবর ভালো ?'

'আজ্ঞে।' কিন্তু শান্তি যে ছাই নাক অব্দি ঘোমটা টেনে কলাবউটি বনে দাঁড়িয়ে পড়ল ! শশী সরে পড়ার চেষ্টা করলে 'ওগো ওগো' বলে হামলে ওঠে যদি ?

'বৌদি ভালো আছে ? তার হাঁপানিটা—?'

'এই !' তবে কি দেবে শান্তির পরিচয় ? শশী বিয়ে করেছে শুনলে তারাপদ তাজ্জব হবে।

আবার, যদি শোনে বউটা পরের, পীরিত করছে শশী—তাজ্জবতর।

তারাপদকে তাজ্জব, না তাজ্জবতর কী করবে—শশী দোটানায় পড়ে যায়।

তাজ্জব করলে কালই বর্ধমানের মশাগ্রামে হইহই ব্যাপার রইরই কাণ্ড। নাওয়া-খাওয়া শিকেয় তুলে ছেলেকে মা শাপশাপান্ত শুরু করবে। ভাইবোনেরা দাদার বাপান্ত করে ছাড়বে। পাড়াপড়শীর জিভ দাঁতের কামড়ে দু-টুকরো হওয়ার যো হবে।

এত স্বার্থপর শশী ! এমন অমানুষ ! বুড়ো মায়ের রোগে ওষুধ জোটে না, আইবুড়ো বোন দুটোর বর জোটে না, ভাইটার ইশকুলের মাইনে জোটে না, ছেঁড়াখোঁড়া পরে আধপেটা খেয়ে কোনোমতে ওরা দিন কাটায়—

আর শশী কিনা বিয়ে করে বসেছে! গোপনে বিয়ে করেছে! বিয়ে করে বউ নিয়ে কলকাতায় ফুর্তি মারছে!

তাজ্জবতর করলে অবিশ্যি আলাদা ব্যাপার।

পরের বউ দিয়ে নিজের বউয়ের অভাব যদি মেটায়, মেটাক। ঝক্কিঝামেলা থাকছে না। মুখে মামুলী ধিক্কার দিলেও মনে মনে চাই-কি তারিফই করবে।

'তুমি সেই মাড়োয়ারীর ফার্মেই—?'

শশী সায় দেয়। তুমি! তুই বলেও পোঁছে না, এখন তুমি!

'সেই মেসেই আছ?'

সায় দেয়। না, তোর তৃতীয় পক্ষের মাগীটার সাথে আছি!

'এ মাসে বুঝি ম্যানেজার?'

'আজ্ঞে?'

'বাজার করতে বেরিয়েছ কিনা—'

হাতের থলের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে ওঠে।

'তা সব বাজারের এক হাল বাবা। লোকে বলে বটে শ্যামবাজারে তরিতরকারি শস্তা—'

থলেটা হঠাৎ অসহ্য ভারী মনে হয়। অকথ্য ভারী! থরথর করে থলে-ধরা হাতটা কাঁপে। কাঁপতে কাঁপতে ছিঁড়ে পড়তে চায়।

থলেটা বাঁ হাতে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে কনুইয়ে যেন চিড়িক পাড়ে, হাতের মুঠো অবশ হয়ে আসে।

ফের চালান করে ডান হাতে।

কিন্তু ডান হাত কি আর শশীর বশে!

ঘন ঘন থলে হাত বদল করে।

করতে করতে—

করতে করতে ওজনটা থলের উবে যায়।

'আহাহা—পড়ে গেল যে!'

থলে কুড়িয়ে দেয়ার জন্যে তারাপদ উবু হয়, এক ধাক্কায় তাকে হটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি শশী থলে তুলে নেয়।

নিয়ে হাসে। ধাক্কা-মারার মাপ-চাওয়া হাসি।

মহা গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেলে দু পাটি দাঁত বের করে থাকাই রেহাই পাবার উপায় বলে হাসে।

'চলি কাকা।' হাসি মুখে হাঁটা শুরু করে।

বড় বড় পা ফেলে বটে, কিন্তু কেবলি ভয় হয়, এই বুঝি ডান পা সামনের আর বাঁ পা পিছনের দিকে পিছলে গিয়ে ঘটোৎকচ বনে যেতে হয়! কিম্বা দুই হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়!

দোকানপাট লোকজন আলোর রোশনাই—চারপাশে তাকিয়ে গলা শুকিয়ে আসে, কানে আগুন ছোটে, বুকে হাতুড়ি পড়ে।

ছেলেবেলায় আমবাগানে প্রথম বিড়ি ফোঁকার সময় মনে হয়েছিল সবাই দেখে ফেলল। গাছে গাছে গুরুজনরা ওৎ পেতে আছে। আজও মনে হয় ওৎ পেতে আছে আশপাশের সবাই। তক্কে তক্কে আছে। বেকায়দায় পড়েছে কি পাকড়াও করবে।

ঘাসপাতা চিবিয়ে, ঘাসপাতার সাথে ছাগলের নাদি চিবিয়েও সেদিন মনে হয়েছিল—যায় নি বিড়ির গন্ধ। বাড়ি গেলেই ধরা পড়ে যাবে।

গিয়েওতোছিল? মুখে বিড়ির গন্ধে না হলেও বিড়ির আগুনে কাপড় ফুটো হয়ে যাওয়ায়?

শেষ অবধি সামাল তো দিতে পারেনি?

আনাড়ী বলে পারেনি?

আনাড়ী এই ব্যাপারেও। কে বলতে পারে কোন দিকে মারাত্মক কোন আনাড়ীপনা করে বসে নি?

পাশে শান্তিকে দেখে নয়, তার হাতের থলের জন্যেই তারাপদ এগিয়ে আসেনি কে বলতে পারে?—মেয়েমানুষ দেখলেই যে-মানুষ ছোঁক ছোঁক করে, বুকে টেনে নিয়ে 'মা মা' করে সারা দেহ খাবলে খাবলে স্নেহ মমতা আশীর্বাদে ঝাড়ে—শান্তিকে সে রেহাই দিল? বারেক না ছুঁয়েই দিল?

'চলি কাকা।' বলে ফেলে রেখে এলেও পিছু নেয়নি তার গ্যারান্টি কোথায়?

তারাপদর ছোটঠাকুর্দা না পুলিশের দারোগা ছিল?

পুলিশের কথা মনে হতেই হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে যায়। তার ওপর পুলিশের বাঁশির আওয়াজ!

মোড়ের মাথায় কাকতাড়ুয়ার মত দু হাত তুলে পুলিশকে দাঁড়াতে দেখে, সঙ্গে সঙ্গে ডান পাশে একটা লরীকে ভড়কে গিয়ে ব্রেক কষে থেমে পড়তে দেখে শশী ভির্মিই খাচ্ছিল—ভাগ্যিশ লরীর পেছনে একটা খালি ট্যাক্সিও

দাঁড়িয়ে পরে, আর 'এসো' বলে ডাক দিয়েই শান্তি চটপট গিয়ে ট্যাক্সির দরজা খুলে উঠে পড়ে তাকেও উদ্ধার করে!

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

'সব ব্যাপারে তোমার গোঁয়াতুর্মি।' ট্যাক্সি চলা শুরু করলে শান্তি কয়ে ওঠে ফোঁস। 'পই পই করে তখন মানা করলাম—'

সবার ওপর টেক্কা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে, ছুটো ট্রাম একটা স্টেট বাস পিছে ফেলে এল—এবার শশীর পরোয়া কাকে।

শশী বলে, 'তোমার মানা শুনলে রাতভর ওই ঘরেই থাকতে হত।'

'হত হত।' পিত্তি শান্তির জ্বলে যায়। বাহাদুর! বাহাদুরির যা নমুনা দেখাতে শুরু করেছিল! 'এখন এটা নিয়ে কী করবে শুনি?'

'হিল্লে একটা হবে।' বুকের বোতাম খুলে ছাতিকে শশী হাওয়া খাওয়ায়।

'হবে? কী করে হবে?'

'দেখ না।'

'আর কত দেখাবে!'

'চটো কেন?'

'না চটবে না! যত্ত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড!'

শশীর কিন্তু তা মনে হয় না। ট্যাক্সির গদীতে চিৎ হয়ে দু পাশে দু হাত ছড়িয়ে হু হু হাওয়ায় তার আত্মবিশ্বাস ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে ওঠে।

খানিক আগের ব্যাপারটা ভেবে হাসিই পায়।

সিগারেট ধরায়।

আয়েস করে টান দিয়ে বলে, 'তিরিশ দিন গাধার খাটনি খেটে সাকুল্যে পাই একশো বিরানব্বুই। তাও আজকালকার চাকরি, কবে আছে কবে ফক্কা। অথচ—' থলেটায় পায়ের ঠোক্কর দেয়, 'এ রকম গোটা দশেক রোজ পাচার করতে পারলে দশ কুড়িং—তোফা কাজ!'

'তোফা কাজ? বলিহারি প্রবৃত্তি!'

'অফিসেই বা কী পুজোআর্চা করি? মালিকের চুরি-জোচ্চুরিতে শাকরেদ-গিরি। ওতে পাপ নেই?'

'তবে আর কি। এই কাজেই লেগে যাও। তোফা কাজ যখন!'

নিজের ভুল বুঝতে পারে। বুঝতে পারে শান্তির মুখ ভ্যাঙানোতে নয়, নিজেরই বুদ্ধি দিয়ে। অভিজ্ঞতা দিয়ে।

চুরি-জোচ্চুরিরতে যত পাকাপোক্ত শাকরেদই হয়ে উঠুক, খোদ মালিক হয়ে বসা শশীর পক্ষে অসম্ভব। শশীদের পক্ষে অসম্ভব।

আজ একটা থলে পাচারের গরজ বলে ডাক পড়েছে, কিন্তু কাল যদি পাড়ায় পাড়ায় মাতৃভবন গজিয়ে ওঠে, রোজ হাজারে হাজারে থলে পাচারের প্রয়োজন হয়—পাত্তা পাবে?

নাকি লরীফরী কিনে অফিস ফেঁদে বসে থলে-পাচারের দস্তুরমত একটা কারবার শুরু করার মুরোদই হবে?

থলে-পাচারের কারবারে রিস্ক আছে? থাকুক না। বিশ-ত্রিশ টাকার জন্যে রিস্ক নেওয়া পোষায় না। কিন্তু বিশ-ত্রিশ হাজারের জন্যে? লাখের জন্যে?

ধরা পড়লে লোকনিন্দা? চাঁদির জুতোয় সব ঠাণ্ডা!

মঠ-মন্দির বানিয়ে দিলে ভগবান অব্দি স্পীকটি নট!

শান্তি শ্বাস ছাড়ে।

'কী হল?'

'ভালো লাগছে না! কেন যে তুমি—'

'এত সহজে কেন ঘাবড়ে যাও বলো তো।' সরে আসে। শান্তির একটি হাত কোলে তুলে নেয়। 'আজকের দিনে কেন মন খারাপ করছ।'

'আজকের দিনটাই অপয়া।'

'আজকের দিনের নিন্দে করো না, শান্তি। এখনও তো ফুরিয়ে যায়নি।'

বাঁ হাত শান্তির কাঁধে রাখে, ডান হাতে শান্তিকে কাছে টানে।

মুখ তুলে শান্তি এলিয়ে পড়ে।

তবু শশী চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে। এখন না এখন না—রাস্তার কেউ তাদের দিকে তাকানো মাত্র জাপ্টে ধরে আচ্ছা করে চুমো খাবে।

পথচলতি এমন দৃশ্য আকছার দেখে দেখে নিজেরও কিনা একদিন ওই দৃশ্যের নায়ক সাজার সাধ শশীর বহুদিনের।

গাড়ি-চাপা লোকদের দেখে রাস্তার লোকেরা যদি মুখে গালাগাল দিয়ে মনে মনে হাহাকারই না করে ওঠে—লাভ তবে গাড়ি-চাপার !

বউ বা লাভারকে নিয়ে গাড়িতে যাওয়ার !

।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে চলে যাচ্ছিল, ড্রাইভারের ডাকে ফিরে দাঁড়ায়, তারপর পড়ি-মরি করে দৌড়ে গিয়ে হাত থেকে তার থলেটা এক রকম ছিনিয়ে নেয়।

ট্যাক্সি চলে যায়।

শশী থরথর।

'আবার !' চোখ শান্তির ঠিকরে আসে। 'কী সর্বনাশ হচ্ছিল বলো তো !'

শশী হাসে। ঠোঁট-ফাঁটার হাসি।

'হাসছ !'

হাসি ছাড়া উপায় ! আহাম্মুকে হাসি ছাড়া।

'যদি টের পেত ?'

'পায়নি তো।' টের না-পাওয়ানোর বাহাদুরিটা যেন শশীর।

'পায়নি তো !' মুখ ঝামটা দিয়েও মন মানে না, ডাক ছেড়ে শান্তি কাঁদতে চায়। 'আজ একটা কাণ্ড না করে—'

'আঃ !'

'দু জনেরই হাতে হাতকড়া না ফেলে—'

'চুপ করো !'

'চুপ—?'

'তবে চেঁচাও। চেঁচিয়ে লোক জমাও। দাও আমায় ধরিয়ে। তাই তো চাও।'

অগত্যা চুপ করতে হয়। চুপচাপ শশীর পাশে পাশে যেতে হয়। মাথা হেঁট করে। চোখ প্রায় বুজে।

রাস্তা পেরিয়ে শশী বলে, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি গিয়ে টিকেট কাটিয়ে আনি।'

শশী যাবে টিকিট কাটতে ? ওই ভিড়ে থলে হাতে টিকিট কাটতে ?

হর্দম মাথা নাড়ে। গোঙানির স্বরে প্রতিবাদ করে: আগে শশী ওটার ব্যবস্থা করুক, তারপর টিকিটফিকিট। নইলে সে চলে যাবে। এক্ষুনি এক্ষুনি এক্ষুনি চলে যাবে।

দু-দুবার ওই কাণ্ডের পর গোঁয়ার্তুমির শখ এখনও মিটল না?

শান্তির মেয়েমানুষিপনায় চটে যাচ্ছিল, কিন্তু চটে গেলে এখন হিতে বিপরীত হবে বুঝে পরমপুরুষের মত প্রশান্ত হয়ে যায়।

'কেন মিছে ঘাবড়াচ্ছ। হুট করে কিছু করা যায়, না করা উচিত? অন্ধকারে ডাস্টবিন দেখে ফেলতে হবে। এখানে—'

'যেখানে আছে চলো। আগে ওটা—'

'ফিরে এসে টিকিট পাওয়া যাবে না। এসেছি যখন—'

যুক্তি দেখায়: টিকিট কাটানোটা নিতান্তই দরকার। সারা রাত ভাঁড়ার ঘরখানা ছেড়ে দেবে—রেনুকে খুশী করা উচিত নয়? আগে থেকে কিছু বলাকওয়া নেই, হুট করে গিয়ে 'আজ রাতে আমরা থাকব' বললে রেনু রাজী হবে?

উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিলেও, ফুলশয্যার জন্যে শোবার ঘরখানা ছেড়ে দিলেও, প্রথম প্রথম রববার-রববার নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দুজনকে ঘরে পুরে দিয়ে মিনিট বিশ-পঁচিশের জন্যে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে আটকে রাখলেও ইদানীং রেনু মুখ বেঁকাচ্ছে না?

এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, আরেক জোরা দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে—সেই হিংসেয় দুজনেই ওরা ছটফটাচ্ছে না?

তাই শশী আজকের দিনে জগার ওখানে যাওয়ার কথা ভাবেও নি। যদি জগা আজও বলে, 'ছেলেমেয়েরা এখনও ঘুমোয় নি, ঘণ্টা খানেক ঘুরে আয়,' বা যদি রেনু ঠোঁট উল্টে পরামর্শ দেয়, 'এভাবে আর কতদিন চলবে, এবার সংসার পাত'—মেজাজ খিঁচড়ে যাবে।

তাই শশী ঠিক করেছিল আজ আর বিশ-পঁচিশ মিনিটের জন্যে জগার ওখানে যাওয়া নয়। আজ সিনেমা দেখবে। রেস্তরাঁয় খাবে। ট্যাক্সিতে বেড়াবে। ময়দানে হাঁটবে। গঙ্গার ধরে বসবে। রিক্সায় ফিরবে।

আজ শুধু হাত ধরে থাকা। আর কথা বলা। আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা: একদিন এই লুকোচুরির শেষ হবে। জাগতিক নিয়মেই মা

একদিন ছেলের আগে মরে যাবে। যেভাবেই হোক বোন দুটোরও বিয়ে হবে। ভাইটা মানুষ হলে ভালো, সাবালক হয়ে বখে গেলেও কিছু যায় আসে না। তখন শশী ঝাড়া হাত-পা। তখন শশীকে পায় কে!

ভবিষ্যতের স্বপ্নে বেহেড হয়ে আজকের দিনটা কাবার করে দেবে।

তখন তো আর জানত না যে শান্তি সারা রাতের পারমিশান পাবে।

রেনুকে এখন খুশী না করে উপায় আছে? ওকে ভাগ না দিলে এখন পুরো আনন্দটাই বরবাদ হয়ে যাবে না? শান্তিই বলুক?

শান্তি বলে, 'সবই বুঝি। কিন্তু—'

'কিন্তুর কিছু নেই, শান্তি।'

'আমার ভালো লাগছে না।'

'ভালো কি আমারই লাগছে।' থলেটা পেছনে সরিয়ে ভালো না-লাগার কারণটা আড়াল করে। 'কিন্তু উপায় কি বলো! লক্ষ্মিটি, তুমি দাঁড়াও; কেমন? আমি যাব আর আসব।'

শান্তিকে আর কথা বলার ফুর্সৎ না দিয়ে সরে পড়ে।

ফুটপাথে শিকড় নামিয়ে শান্তি আঁতিপাতি তাকায়: শশীকে কেউ লক্ষ্য করছে না তো? ভিড়ে কী বেমানান দেখ মানুষটা! সকলেরই পরনে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, কিন্তু ওকে মনে হয় ভীষণ সেজেছে। কালো হাড়গিলে চেহারায় বাফতার পাঞ্জাবী তাঁতের ধুতি। ঘাড়-তুলে চুল-ছঁটা। পাতা-কেটে মাথা আঁচড়ানো। আর হাতে কিনা পুরনো রেশনের থলে! কী বেখাপ্পা! কী বেখাপ্পা!

অথচ ওই সাজের দায়িত্ব শশীর নয়। শশী আব্দার ধরেছিল বিয়ের দিনের শাড়ি-ব্লাউজ শান্তিকে পরতে হবে। বিয়ের দিনের সাজে শান্তিকে সাজতে হবে। শান্তিও তখন পাল্টা আব্দার না জানালে মানুষটা দুঃখ পেত না?

বউয়ের কাছে স্বামী আব্দার জানালে স্বামীর কাছে বউও যদি না আব্দার জানায় বজায় থাকে ভাব?

স্বামীর বেহায়াপনায় লজ্জা পেলেও মাঝে মাঝে বেহায়াপনা বউকেও করতে হয় না? বুঝিয়ে দিতে হয় না ভালোবাসাটা একতরফা নয়?

শশী ফিরে এসে বলে, 'টু নাইনটি ছাড়া পেলাম না।'

'মানে দু-টাকা নব্বই—'

'আরেকটু দেরি হলে এও পেতাম না। ওই ট্রাম আসছে, চলো।'

'ট্রামে?'

'ট্রামই ভালো, বেশ ভিড়, বুঝলে না?'

ভিড়ের মাহাত্ম্য শান্তি জানে। এখন যদি শশী গা ঘেঁষে দাঁড়ায় চারদিক থেকে সিটি বেজে উঠবে, কিন্তু ভিড় থেকে আগলাবার জন্যে ট্রামে যদি তাকে জড়িয়ে ধরে থাকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করবে না। নিজে আগে নেমে হাত ধরে ট্রাম থেকে নামানোর সময় তাকে যদি বুকে টেনে নেয়—সবাই ভাববে পড়ার হাত থেকে সামলাল।

তবু ইতস্তত করে: ট্রামে গেলে ডাস্টবিন পাবে কোথায়? পেলেও কাজ হবে?

শান্তি বলে, 'না, ট্যাক্সি করো।'

'এখানে ট্যাক্সি! ক্ষেপেছ?'

'তবে হেঁটে চল।'

'হেঁটে? আর ইউ ম্যাড! এতটা পথ হাঁটতে পারবে? তারপর কটা বেজেছে জানো? হেঁটে গেলে—'

'তাহলে রিকশা।'

'রিকশা? তা অবিশ্যি পেতে পার। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে না? রেনুকেও তো হাতের কাজ সেরে রেডিফেডি হতে—'

'হোক দেরি।'

ট্রামে-বাসে ওঠাও মুশকিল। শশী রিকশাই করে। শান্তিকে তুলে দিয়ে থলেটা শান্তির হাতে দিয়ে নিজে ওঠে।

শশী ওঠা মাত্র থলেটা শান্তি ফিরিয়ে দেয়।

'যে-রাস্তায় ডাস্টবিন আছে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে বল।'

'আমি কি কর্পোরেশনের ধাঙ্গড় যে কোন্ রাস্তায়—।' শশী গজগজ করে। 'থলেটা একেবারে কোলে বসিয়ে দিলে, পায়ের কাছে ফেলে রাখতে পারতে না?'

'বাঃ রে, শাড়ি ঠিক করার জন্যে—'

'বুঝেছি বুঝেছি!'

'তুমি তো সবই বোঝ।'

'বুঝি বইকি!'

দুজনেই গুম।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

গুম হয়ে গেলেও রাস্তার দুপাশে ডাস্টবিন কিন্তু দুজনেই খোঁজে। অন্ধকারে যুৎসই ডাস্টবিন।

কালী দত্ত লেন এসে যায়, যুতসই ডাস্টবিন তবু মেলে না।

মোড়ে রিকশা থামিয়ে থলে হাতে শশী নামে। ডাস্টবিন যখন আবিষ্কার করতে পারে নি, থলের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।

'তুমি রিকশায় থাক, আমি গিয়ে টিকিটটা দিয়ে আসি। বলব, তোমায় আনতে মাতৃভবনে যেতে হবে, জগা যেন রেনুকে ট্রামে তুলে দেয়—ঠিক সময় সিনেমার সামনে আমি থাকব। এটার জন্যে ভেব না। ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করব। ডাস্টবিন না মেলে, গঙ্গা আছে। হ্যাঁ—আর যদি পাড়ায় ধরা পড়ি, আমি একা ফাঁসব। কারও নাম আমি করব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার কোনও ভয় নেই।'

নাকেমুখে কথা বলে হন-হন করে চলে যায়।

খোঁচা দিয়ে গেল? তা দিতে পারে। ও গোঁয়াতু্মি করেছে বলে শান্তি এখন সব দায়দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে না?

কিন্তু গোড়ায় গলদ কি শান্তি করে নি? তার দরদই কি যত নষ্টের গোড়া নয়? নিজেকে শান্তির মনে হয় বড়ই স্বার্থপর।

জ্যান্ত বাচ্চার গলায় যে ফরসেপের চাপ দেখতে পারে মরা বাচ্চাকে টুকরো টুকরো করে কাটা সে দেখতে পারে না? বুক-ভরা তার এত দরদ? দরদ!

দরদ নয়, দরদ নয়—দরদের আদিখ্যেতা!

'যদি ধরা পড়ি একা ফাঁসব, তোমার কোনও ভয় নেই—' বুক চিতিয়ে স্বামী বলল। স্ত্রী হিসেবে তারও কি বলা উচিত ছিল না—'ওটা আমার কাছে রেখে যাও?'

বললে, মাত্র একবার বললে, নিশ্চয় রাখত না, তবে খুশী হত।

শান্তির মনটাও তাহলে এমন খচখচ করত না।

ব্যাগ খুলে দশ টাকার নোট দুটি বের করে। আসা মাত্র শশীর পকেটে গুঁজে দেবে।

পকেটে নয়, হাতে। এক হাতে একটি হাত ধরে আরেক হাতে।

তারপর দু-হাত দু-হাতে মুঠো করে ধরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দেবে। পারলে একটা চিমটিও দিয়ে দেবে।

বেহিসেবী আজ খরচ করবে বলে দু-মাস মানুষটা টিফিন বাদ দিয়েছে। এক পা-ও আজ হাঁটবে না বলে দু-মাস আফিস থেকে হেঁটে ফিরেছে। কতই বা জমেছে তাতে! বিশটা টাকা উপরি পেলে নিশ্চয় বর্তে যাবে।

এমনিতেও তো টাকাটা ওরই পাওনা?

শশীকে আসতে দেখে টাকা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসে।

শশী এসে জানায়, 'হোপলেস! সব ম্যাসাকার!'

'রেনু বাড়িতে নেই?'

'থাকবে না কেন। মা জামাইবাবু অব্দি আছে। বড়দাও শুনলাম আসছে। জগার কলেরা?'

'কলেরা?'

'ঠিক কলেরা নয়, তবে সিরিয়াস ব্যাপার! শালা! শালাকে কদ্দিন বলেছি তেলেভাজাটাজা খাসনি। খিদে পায় ভরপেট জল খা—'

'তাহলে?'

'আর তাহলে!'

দুজনে দুজনের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

'আমার একবার যাওয়া উচিত না?'

'যা ভালো বোঝ!'

'এতদূর এলাম—'

'সেটা ওরা কেউ জানে না। ভাগ্যিশ থলেটা হাতে ছিল। বললাম, মেসের বাজার করতে বেরিয়েছি, তাড়াতাড়ি আছে।'

ভীষণ চালাকি করে এসেও শশীকে কিন্তু বড়ই মনমরা দেখায়। বিপন্ন বন্ধুর বউকে ধাপ্পা দিয়ে এল? না না করেও জগা আর জগার বউ তো তাদের জন্যে কম করে নি? আর আজকের দিনে দু-দণ্ড ওদের কাছে থাকল না?

আজকের দিনে! দাঁতে দাঁত ঘষে। ইচ্ছে করে সামনের রকটাকে ধোপার পাট বানিয়ে থলেটাকে আচ্ছাসে এক আছাড় মারে। এক আছাড়েই মানুষের বাচ্চাটাকে মাংসের একটা পিণ্ড করে ফেলে। এমনই তালগোল

পাকানো পিণ্ড যে মানুষের না পাঁটার না গোরুর না ভেড়ার সনাক্ত করার যো না থাকে।

'তাহলে ?'

'তোমার যেতে ইচ্ছে করছে? তাহলে যাও বরং। বাইরে রাত কাটাবার পারমিশন পেয়েছ, একজন নার্স থাকলে ওদেরও সুবিধে।'

নার্স? শান্তি কি রেনুর সখী নয়? রেনুদের অসুখেবিসুখে কোনদিন সে নার্সগিরি করেনি, কিন্তু সখী হিসেবে তার কম উপকার করেছে রেনু ?

রেনুই না তাকে ভদ্রভাবে বাঁচার পথ বাৎলে দেয়? বুঝিয়েসুঝিয়ে শশীর সাথে প্রেম করায়? প্রেম করিয়ে বিয়ে দেয়?

ইদানীং অবিশ্যি ঠেশ দিয়ে কথা বলে, এড়াতে চায়, কিন্তু রেনু না থাকলে কোথায় থাকত শান্তির সিঁথির সিন্দুর সাধের স্বামী স্বপ্নের সংসার!

রেনুর বুদ্ধি না শুনলে ওই ডিসপেনসারিতেই থাকতে হত। আর কিছুদিন ওখানে থাকলে পাড়ায় টি-টি পড়ে যেত।

নতুন নার্সের স্বাদ পেতে কেশব দত্তই টি টি ফেলত।

রমার মত শান্তিকেও তাহলে শেষ পর্যন্ত নার্সগিরি ছেড়ে—।

'আমি যাই।'

'গেলে সহজে আসতে পারবে না কিন্তু।'

'পারব। ধরে তো রাখবে না।'

'যাও তবে। তুমি যাও, আমিও এটার গতি করার চেষ্টা করি।'

নামতে গিয়েও নামে না। ওই থলে নিয়ে শশী পথে পথে ডাস্টবিন খুঁজবে আর সে বসে থাকবে রেনুর ঘরে? বিপদের ঝুঁকি এড়াতে সরে পড়ল, শশীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সরে পড়ল—ভাববে না ?

ভাবা আশ্চর্য না। রেনু সখী, শশী স্বামী।

'থাক গে!'

'না, যাওয়া তোমার কর্তব্য।' হঠাৎ শশী যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। ভারিক্কি গলায় বলে, 'শান্তি, আমরা যাই করি না কেন কর্তব্য করে যেতেই হবে। নিজের মন্দ করে পরের ভালো করার নামই কর্তব্য। পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলি দাও—পদ্যে পড়নি? দুনিয়ার তা-বড় তা-বড় জ্ঞানীগুণীরা এই কথা বলে। নিজে না থাকতে পারলেও রিকশা-ভাড়া

রেখে বাকি যা ছিল—তের টাকার মতো—রেন্থর হাতে দিয়ে এসেছি। তুমি এখন—'

'দিয়েছ? টাকা দিয়ে এসেছ?'

'ওই অবস্থায় মুখ ফুটে চাইলে না দিয়ে পারা যায়? পরোপকারের চেয়ে মহৎ কাজ তুনিয়ায় আছে?'

যাক! শান্তি স্বস্তি পায়। মূল্য ধরে দিলে সংসারে কোন্ কাজটা ঠেকে থাকে! কোন্ কাজের জাত যায়! টাকা যখন নিয়ে এসেছে তখন তার না গেলেও চলবে। শশীকে ফেলে না গেলে।

'টাকার জন্তে তুমি ভেব না।' অত করে জমানো টাকাগুলি বেমক্কা বেহাত হয়ে যাওয়াতে মনটা শশীর বিগড়ে গেছে বুঝে ভরসাও দেয়।

'আর ভাবব কেন? আমাদের প্রোগ্রামের বারোটা বেজে গেছে—এখন ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে। শুধু টিকিট তিনটে আর থলেটার—'

'সিনেমায় যাবে না?'

'এরপর সিনেমা! বোম্বাইয়া লদকালদকি এর পরও বসে দেখতে পারবে? সিনেমা ভাঙবে রাত বারোটায়, তখন? তারপর?'

'ধরো, আমি তোমায় টাকা দিলাম—পাঁচ—দশ—পনের—কুড়ি—টাকা একুশেক যদি দি? আমিও তো চাকরি করি? আজকের দিন তো তোমার একার নয়? না-হয় তুমি ধার নাও—ধার—যেদিন হয় শোধ করবে—দাঁড়িয়ে কেন, উঠে এস। এস! এস না!'

শশী রিকশায় উঠবে কি, রিকশাওলা আর সওয়ারি বইতে নারাজ। শান্তিকেই উল্টে রিকশা থেকে নামতে হয়।

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে তুজনে হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে শশীর অজান্তে ব্যাগ খুলে খুচরো যা ছিল সব মুঠো করে বের করে।

শুধু দশ টাকার নোট তুটি দিলে শশীকে মুদ্দোফরাস বানিয়ে দেওয়া হয় না?

'ওকি?'

শশীর বুক-পকেট থেকে হাত বের করতে গিয়ে পকেটটা নাড়িয়ে দিয়ে শান্তি বলে, 'একুশ টাকা আনা বারোর মতো হবে।'

'তুমি কি হোটেলের ঘর ভাড়া নিতে বলছ?' কাতর গলায় শশী শুধায়, 'তুমি না আমার বিয়ে-করা বউ?'

শান্তিরই কথা। জগাদা সেদিন ঘণ্টাখানেক পরে যেতে বললে ক্ষেপে গিয়ে শশী যখন হোটেলের কথা তোলে, শান্তি রুখে উঠেছিল; শান্তি কি বাজারে মেয়েমানুষ? শশীর বিয়ে-করা বউ না? বউকে নিয়ে কোন স্বামী হোটেলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে?

আজ কিন্তু শশীর কথা শুনেও শোনে না।

'তার ওপর এই থলে! আগে এটার গতি করতে হবে। নাকি এই থলে নিয়ে রাত কাটাবে?' বলে থলেটা শশী মুখের কাছে তুলিয়ে দেয়।

শান্তির আঁতকে ওঠা উচিত।

আঁতকায় না কিন্তু। ওই থলের জন্যে আজকের দিনটা নষ্ট হয়ে যেতে দেবে? সত্যিই কি পারে না ওই থলে নিয়ে রাত কাটাতে? ওই থলে বুকে করে রাত ভোর করে দিতে? যদি ভাবে ওটা থলে নয়, কাঁথা। কাঁথায় জড়ানো মরা নয়, ঘুমন্ত শিশু। অতসী বা তাপসী নয়, শান্তিই সেই শিশুর মা।—যদি ভাবে?

ঘুমন্ত ছেলে বুকে নিয়ে রাত কি মা কাটায় না? ছেলে বুকে নিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে স্বপ্ন দেখে?

হোটেলে হোক হোটেলে, ফুটপাথে হোক ফুটপাথে। স্বামী আর সন্তান পেলে মেয়েমানুষের আর কী চাই!

শশী বলে, 'হোটেলের ঘাৎঘোৎ আমি ঠিক জানি না। তাও এত রাতে কোথায় হোটেল খুঁজব? তার চেয়ে আজকের দিনটা পরোপকার করেই কাটানো যাক। কী বল?' শান্তির বলার তোয়াক্কা না করেই ফের বলে, 'টিকিট তিনটে কাউকে দিয়ে এবার পরোপকার করি। তারপর থলেটা হাওড়ার ব্রীজ থেকে বিসর্জন দিয়ে গঙ্গা মাঈকী হাওয়া খেতে-খেতে সামনের বছরের আজকের দিনের প্রোগ্রাম ছকে নিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি গিয়ে আমার তক্তাপোষে চিৎপটাং হই। মাথার বালিশকে পাশবালিশ করে পাশবালিশকে তুমি ভেবে রাত কাবার করে দি। খাসা হবে!'

ফুলের গন্ধে এদিক-ওদিক চেয়ে শান্তি দেখে ফুলের দোকান। রাশি রাশি ফুলের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে—শশীর ফরমাসে খোঁপা বেঁধেছে সে এমন ছাঁদে বেলফুলের মালা যেন জড়ানো যায়।

নিজের হাতে খোঁপায় মালা জড়িয়ে দেবে আর রিকশায় নিজেই পরে খোঁপা ভেঙে ফেলে মালা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলবে দস্যুর মত, রাস্তায় রাস্তায় ফুল ছড়িয়ে যাবে—এও ছিল শশীর প্রোগ্রামে।

দোকানের পাশে এসে ফুলের গন্ধের ঝাপটায় মাথাটা তার ঝিমঝিম করে উঠলেও শশীর ভ্রূক্ষেপ নেই—শান্তি দেখে। আর লম্বা শ্বাস টানে।

। ষষ্ঠ অধ্যায় ।

'আর কতদূর ?'

'এই তো এসে গেছি।'

সত্যিই এবার এসে গেছে। মস্ত গেট। গেটের পাশে নেম-প্লেট। বাংলায় লেখা মিহির চৌধুরীর নাম।

'তুমি এটা রাখবে ?'

'আমি ? দাও।'

শান্তির হাতে থলে দিয়ে শশী কলিং বেল টেপে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে শুরু হয়ে যায় কুকুরের হাঁকডাক।

'অ্যালসেসিয়ান।'

'অ।'

'মিহির বাড়িতে আছে কিনা কে জানে।'

'অ।' শান্তি কথা খুঁজে পায় না। শশী চলে গেলে এই থলে হাতে একা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভেবেই বুকটা ধড়াস ধড়াস শুরু করেছে।

কী দরকার ছিল বন্ধুকে টিকিট দিতে এতখানি পথ দাবড়ে আসার ? টিকিটের দাম বন্ধুর কাছে চাইতে পারবে না। দিতে চাইলেও নিতে পারবে না। ওই টিকিট, সুতরাং, দলামোচড়া করে ফেলে দিলে কী এসে যেত ?

ফেলে দিতে মন না চায় জমিয়ে রাখত। আজকের দিনের স্মৃতি করে রাখত।

পরোপকার ! কোনো মানে হয় গায়ে-পড়ে এমন পরোপকারের !

বন্ধু ! মিহির চৌধুরী শশীর বন্ধু !

গেট খুলে চাকর মুখ বাড়ায়, 'কাকে চাই ?'

'মণ্টু—'

'বাবুর শরীর—'

বাধা দিয়ে শশী বলে, 'গিয়ে বল শশীবাবু এসেছে। জরুরী দরকার।'

চাকর চলে যেতে শান্তিকে বলে, 'শরীর ভালো নেই মানে বুঝলে না? টানছে।'

'বাড়িতে? বউ আছে না?'

'ওর বাপ সোনাগাছিতে হার্টফেল করতে বউ-ই হুকুম দিয়েছে বাইরে খাওয়া চলবে না। এত বড় বাড়ি, এন্তার ঘর—'

গেট খানিকটা ফাঁক করে আঙুল দিয়ে দিয়ে শশী ঘরগুলো চেনায়। কোন্‌টা বৈঠকখানা, কোন্‌টায় ছেলে মাস্টারের কাছে পড়ে, কোন্‌টায় মেয়ে ওস্তাদজীর সামনে সরগম সাধে, কোন্‌টায়—

একতলার সব ঘরই যদিও অন্ধকার কিন্তু শশীর বিশদ বিবরণে প্রতিটি ঘর যেন হুবহু শান্তির চোখে ভাসে। দামী আসবাবে সাজানো প্রতিটি ঘর।

'মিহির ইচ্ছে করলে দোতলাটা নিজের জন্যে রেখে তিনটে ফ্ল্যাট করে একতলা ভাড়া দিতে পারে। কমসে-কম ছ-শো টাকা—'

'দেয় না কেন?'

'প্রেস্টিজ!'

তা বটে। চৌধুরীদের নামডাক আগে থেকেই, তার ওপর মিহির চৌধুরী তো একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছে। সে কেন বসতবাড়িতে ভাড়াটে বসাবে?

টাকার দরকার পড়ে আরেকটা মাতৃভবন খুলবে। টাকাকে টাকা, সেই সাথে পরোপকার। দেশের সেবা।

চাকর এসে বলে, 'চলুন।'

'ঘুরে আসি। তুমি ভেতরে এসে দাঁড়াও না।'

শশী চলে যেতেই শান্তির ফের থলেটার কথা খেয়াল হয়। চটপট কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ে।

ডান দিক থেকে গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করে ওঠে কুকুরটা।

টের পেয়ে গেছে? নইলে হঠাৎ ডাক থামিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে মুখ উঁচিয়ে তুলল কেন? জিভটা ওভাবে লকলকাচ্ছে কেন?

পড় তো পড় রাস্তার আলোটা এসে ওর মুখের ওপর পড়েছে। চারপাশে অন্ধকার, শুধু ওর মুখে আলো! কী ভয়ঙ্কর!

এসব কুকুরের সাথে শান্তির পরিচয় নেই। তবে এটা জানে যে গরিবগুর্বো মানুষের চেয়ে এদের দাম বেশি। দস্তুরমত তোয়াজে এদের রাখতে হয়।

এসব কুকুরের খেদমতের জন্যে মানুষ পুষতে হয়।

একেকটা কুকুরের জন্যে নাকি ষাট-সত্তর খরচ পড়ে।

ষাট-সত্তর! শান্তি আপসোসের শ্বাস ফেলে: মানুষের সেবার চেয়ে কুকুরের খেদমত করার চাকরি কত সুখের!

ওই কুকুরের নিজস্ব একখানা ঘর! আরেকটি শ্বাস খসায়: কুকুর হওয়া আরও সুখের! বড়লোকের কুকুর হওয়া।

চেন-বাঁধা দেখে পায় পায় এগোয়: পারে না? শশী-শান্তি ওই ঘরে আজকের রাতটা কাটাতে পারে না?

ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখার জন্যে আরও দু-পা এগোতেই! আহ্লাদে কুকুরটা লেজ লটপট করে, মাটিতে মাথা ঘষে, সোহাগী কেঁউ কেঁউ করে।

কুকুরের নাক নাকি মানুষের চেয়ে সেয়ানা। থলের ভেতর যা আছে টের পেয়ে গেছে? তাই জিভে লালা ঝরানো শুরু করেছে?

দেবে? থলেটা ওর সামনে উপুড় করে অঞ্জলি দেবে? যত ভালোই খাক, যত যত যত যত দামী খাবারই থাক—এমন দামী খাবার নিশ্চয় জন্মেও খায় নি।

আজকের দিনটা বড় স্মরণীয় শশী-শান্তির, পরের উপকার করায় দারুণ পুণ্য। স্মরণীয় এই দিনে দু-দুটো বন্ধুর উপকার করল শশী, শান্তি করুক এর উপকার। এই খাবার খেলে ওর জীবনেও আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চাই-কি শশী-শান্তির চেয়ে অনেক অনেক অনেক বেশি স্মরণীয়।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি—প্রায়ই শশী আওড়ায়। পরের জন্যে শশী নাকি প্রাণও দিতে পারে, যদি বোঝে প্রাণ না দিয়ে পার নেই।

শান্তি পারে না এই থলেটা ওকে দিতে?

কিন্তু—। খটকা লাগে। সংসারের জন্যে শশী মুখে রক্ত তুলছে, সংসারটা ওর কাছে কৃতজ্ঞ। মা ছেলেঅন্ত প্রাণ, ভাই-বোনেরা দাদা বলতে অজ্ঞান। এর নাম কৃতজ্ঞতা।

রেনুকে টাকা দিয়ে এল। কৃতজ্ঞতায় রেনু ফের ঘর ছেড়ে দেবে। ফের সখী সখী ভাব করবে। দিন কয়েক হলেও।

বন্ধুকে টিকিট দিতে গেল, বলা যায় না, কৃতজ্ঞতায় অধীর হয়ে বন্ধু হয়তো বন্ধুকে কোলে বসিয়ে মদের গেলাস মুখের কাছে তুলে ধরেছে।

টাটকা টাটকা কৃতজ্ঞতার ভারি দাম!

কিন্তু কুকুরটা? থলের খাদ্য পেলে ওর কৃতজ্ঞতা জাগবে? কৃতজ্ঞতার বশে আজকের রাতের জন্যে ঘরখানা ছেড়ে দেবে?

কী দরকার তবে কুকুরের উপকার করার! ওর সাথে রক্তের সম্পর্ক নয়। ও বন্ধু নয়, সখী নয়। পাড়াপড়শীও নয়। নিন্দা-প্রশংসা কিছুই করার সাধ্য ওর নেই।

অকারণে পরের উপকার করার মানে হয় না। কোন মানে হয় না।

থলেটা বুকে চেপে ধরে।

এইভাবে বুকে করে রাখবে। দেবে না গঙ্গায় ফেলে দিতে। ঘরে নিয়ে যাবে। সারা রাত বুকে করে রাখবে।

থলে নয়, কাঁথা। কাঁথায় জড়ানো শিশু।

মরা?

জ্যান্তই তো জন্মেছিল? এই শিশুকে দেখেই না তখন মনে পড়ে গিয়েছিল আরেকটি শিশুর কথা?

আরেকটি শিশুর কথা!

কেশব দত্তর ধাপ্পায় না ভুললে যে-শিশু এতদিন—

থলেটা বুকের সাথে মিশিয়ে দিতে চায়।

'মিহির ড্যাম গ্ল্যাড। বউকে বললে আমার সাথে সিনেমায় যাবে। আসলে বুঝলে না—ঘণ্টা তিনেক বেপরোয়া। সিনেমায় যাবে ও কোন্ দুঃখে। ও করবে সিনেমা। ও কি—ও দিকে কী দেখছ?'

'কুকুর!'

'মিহিরের বাপের আমলে দারোয়ান ছিল। কিন্তু মিহির সেকেলে চাল পছন্দ করে না কিনা—তাই—শিগগীর কেটে পড়ি চলো। ও এখুনি আসছে। এসে যদি তোমায় দেখে—বুঝলে না—টং হয়ে আছে তো!'

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যদিও-বা একটা বাস এল, ওঠা দূরের কথা—কাছে এগোয় সাধ্য কার!

'চলো, হাঁটাই যাক।'

'আর হাঁটতে পারছি না গো!'

স্বাভাবিক। হাজার হলেও মেয়েমানুষ। এত বড় ধকল সয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে এই ঢের।

বউয়ের জন্যে স্বামীর মন টনটন করে।

বলে, 'হাঁটতে আমিও পারছি না। আর খিদেও যা পেয়েছে না!'

পাবে না! সেই কখন নাকে-মুখে খেয়ে অপিস গেছে, রাত এই সাড়ে নটা পর্যন্ত একটা দানাও দাঁতে আর কাটে নি।

আজ যে দুজনের একসাথে খাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল! দুজনের দুজনকে খাইয়ে দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল!

স্বামীর জন্যে বউয়ের মন টনটন করে।

দুজন দুজনের হাত ধরে।

হাত ধরে বুকে জড়িয়ে ধরার সাধ মেটায়।

'আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না!'

'ভালো কি আমারই লাগছে!'

দুজনেরই কানে কথাটা বড়ই পুরনো বলে বাজে।

'কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলাম!'

'বলো, কার মুখ দেখে আমরা জন্মেছিলাম!'

বাঁ হাতে শশী রুমাল বের করে ঘাড়-গলা রগড়ায়।

ডান হাতে শান্তি আঁচলের খুঁটে মুখ ঘষে।

'ওই—খালি ট্যাক্সি বোধ হয়। চলো, আগে হাওড়া থেকে—'

'না। তুমি আগে খাবে চলো।'

'আপদটা আগে—'

আপদ! শশীর হাত ছেড়ে দিয়ে দুহাতে শান্তি থলেটা কোলে করে। আঁচলের আড়াল করে।

আপদ কেন? মরা বলে? কিন্তু শান্তি যে একটা মরা ছেলেরই মা হতে পারবে তার কোন গ্যারাণ্টি আছে?

শান্তি তো অতসী বা তাপসী নয়! শান্তির কপালে কোন মাতৃভবন জোটে নি! বিলেত-ফেরত ডাক্তারও না।

এই ছেলেকেই শান্তি বুকে করে রাখবে। এই হবে শশী-শান্তির সন্তান।

কাল সকালে পচতে শুরু করবে? করুক।

বিকেলে গলতে শুরু করবে? করুক।

পরশু সকালে পচে-গলে মাংসের কাদা হয়ে উঠবে? উঠুক উঠুক উঠুক।

সারা গায়ে সেই গলিত মাংসের কাদা মাখবে। শশীকেও মাখাবে। সেই কাদা যে শশী-শান্তির সাধ-স্বপ্নের চন্দন!

হাত তোলা সত্ত্বেও ট্যাক্সি না থামায় শশী চটে যায়। 'দেখলে! লাল আলো জ্বলছে, তবু—ও কী?'

থলেতে চুমো খাচ্ছিল শান্তি, মুখ তোলে।

মুখখানা তার মা-যশোদার মতো মহীয়সী দেখায়।

॥ অষ্টম বা শেষ অধ্যায় ॥

অন্যদিন শশী-শান্তি রেস্তরাঁয় যায় কেবিনের আশায়।

দু কাপ চা, বড় জোর একটি ভেজিটেবল চপ—পালা করে কখনো শান্তি কখনো শশী পেট খারাপের অজুহাতে একটা চপের খরচ বাঁচায়—সামনে রেখে যতক্ষণ পারে কাটায়।

বসে পাশাপাশি। পর্দা টেনেটুনে।

আজ মুখোমুখি। পর্দা সরিয়ে।

আজ যে শুধু খাওয়া। স্রেফ গেলা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেটের হাঁ বোজানো। একসাথে দু-হাত না চালালে সম্ভব তা?

দু-হাত না চালালে সম্ভব মোরগ-মোসল্লম বাগে আনা? দু-হাত চালাতে হলে দু-পাশ ফাঁকা রাখা দরকার না?

পাঁচজনে দেখবে? দেখুক দেখুক। শশী-শান্তিও যে এমন ডাকসাইটে রেস্তরাঁয় আসতে পারে দেখুক।

শান্তির নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে? শশীকে ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে? ক্ষতি কী! আজকের দিনটা তো শশী-শান্তির স্মরণীয় দিন!

কিন্তু হায়, কে জানত, প্লেটে-বসানো আস্ত মুরগিটা টেবিলে বয় নামানো মাত্র 'এটা কী!' বলে শান্তি ভূত দেখার মত চমকে উঠবে!

কে জানত, বাঁ হাতে কাঁটা দিয়ে মুরগির ঘাড় ঠেসে ধরে ডান হাতে শশী ছুরি চালানো মাত্র 'না না না!' করে আর্ত-চিৎকারে উঠে দাঁড়াবে!

'শান্তি!'

'সরাও—সরাও—শিগগীর ওটা—' বলতে বলতে কথা জড়িয়ে যাবে, হিষ্টিরিয়া রোগীর মতো গোঁ গোঁ করতে করতে চোখ উল্টে দাঁত কপাটি লেগে টলে পড়বে—কে জানত!

ট্যাক্সিতে স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে বউ হাউ হাউ করে কাঁদে।

পিঠে অনর্গল হাত বুলিয়ে বুলিয়ে স্বামী দেয় সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা দেয় নিজেকেও।

আজকের দিনটা শেষ পর্যন্ত বৃথা যায় নি। টাকা দিয়ে এক বন্ধুর উপকার করা হয়েছে, টিকিট দিয়ে আরেক বন্ধুর।

যে-থলে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিল, তাই দিয়েও ফাঁকতালে কেমন রেস্তরাঁর উপকার করা হয়ে গেল!

ভাগ্যিশ শান্তি নাটুকে কাণ্ডটা বাধিয়েছিল!

কিলো ছুই-আড়াই মাংস। চপ-কাটলেট-কারি হতে পারে। কোর্মা-কোপ্তা হতে পারে।

বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাবুমশায়রা তরিবত করে খাবে।

খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে: সবার উপরে মানুষ সত্য!

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কস্‌বাদ ও মুক্তমতি

কমিউনিজমের জুজু সারা ইয়োরোপকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে, এই হল ১৮৪৮ সালে লেখা কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রথম কথা। তারপর থেকে ছুনিয়ার সব ঘাটে কত জল বয়ে গেছে, অদলবদল ঘটেছে অজস্র, গোটা জগৎ জুড়ে অন্তত ছুটো যুদ্ধ হয়েছে এমন ধরনের যা পূর্বে ছিল প্রায় অভাবনীয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতিতে পর্যন্ত পরিবর্তন এসেছে—১৭৮৯-৯৪ সালে ফরাসী দেশে যে গণজাগরণকে মনে হয়েছিল বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা, তাকে গুণগতভাবে ছাপিয়ে উঠল মেহনতী মানুষের ক্রমবর্ধমান অভিযান, যা আপাতপরাজয় সত্ত্বেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল অপরাজেয়। ১৮৭১ সালে প্যারিস 'কম্যুন্‌'-কে অবলম্বন করে শ্রমজীবী জনতার নিছক নিজস্ব অভ্যুত্থানকে মার্কস্‌ অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে শুধু মর্ত্যে নয়, যেন স্বর্গে পর্যন্ত তারা ঝটিতি বিস্তার করে দিয়েছিল। এরই দেদীপ্যমান সংস্করণ হল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব, যা শুধু রুশ সাম্রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ আয়তনে নবজীবনের বীজ বপন করে ক্ষান্ত হল না, বিশ্বসাম্রাজ্যতন্ত্রের সমগ্র কাঠামোতে ফাটল ধরাল, সর্বদেশের নির্জিত মানুষকে জানাল 'দিন আগত ঐ'। শোষণ-কারাগারের লৌহকপাট তারপর থেকে ভেঙে পড়তে আরম্ভ হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে পৃথিবীর জনতা দিকে দিকে নবশক্তির উন্মেষে আজ সমুজ্জ্বল। মহাচীনের বিপুল ভূখণ্ডকে এখন সাম্যবাদীরা নিয়ন্ত্রিত করছে, জগতের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ধনতন্ত্রের পূর্ণবিলুপ্তি ঘটেছে, আর বহুকালের শৃঙ্খল চূর্ণ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার মানুষ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্ববশ জীবন গড়তে গিয়ে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সমাজবাদী ধারায় অর্থব্যবস্থা নির্মাণের অবশ্যম্ভাবিতাকে উপলব্ধি করছে। কবিকল্পনার কাছে ঋণ নিয়ে বলতে ইচ্ছা যায় যে আজ নবযুগের চারণ যেন শোনাচ্ছে: "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হউক জয়!"

অবশ্য ইতিহাসের রথচক্র চলে এসেছে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা' দিয়ে, তার যাত্রায় সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ তো পড়ে না, আর জীবন তো এই বিশ্বেরই মতো সতত সঞ্চরমাণ—একেবারে এককভাবে মানুষ হয়তো বহু সাধনায় নিজের চিত্তকে অবিক্ষিপ্ত রেখে তুরীয় প্রশান্তির আস্বাদ পেতে পারে, কিন্তু বহু-জনাকীর্ণ সমাজ কোনও অচঞ্চল বিন্দুতে স্থির, নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না। সাম্যবাদ সর্বত্র পূর্ণ সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও তো সমাজজীবন পরিণতির স্থাণুত্বে পর্যবসিত হতে পারে না। সাম্যবাদের পরিপূর্ণ সার্থকতার চেহারা নিয়ে চিত্তবিলাস করেছিলেন আকাশবিহারী মনীষীরা, যাঁরা মনঃসৃষ্ট "ইউটোপিয়া"-র মাধ্যমে সমসাময়িক জীবনের গ্লানি ও অন্যায়কে ধিক্কৃত করেছিলেন এমন সময়ে যখন সাম্যবাদ অনেকটা আয়ত্তের বাইরেই ছিল। সাম্যবাদ নিয়ে আকাশকুসুম রচনার আজ কারণ নেই, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদের পরিণত রূপ সম্বন্ধে কারুকল্পনারও কোনো তাগিদ নেই। সবচেয়ে প্রয়োজন আজ হল যে সাম্যবাদের সাফল্য সম্ভাবনা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বলেই আমরা তার বর্তমান গতিপথকে যথাসাধ্য নিষ্কণ্টক ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত যেন করতে পারি, বিগত দিনের অভিজ্ঞতাকে অনাগত দিনের সৌকর্যসাধনে প্রযুক্ত করতে পারি, এবং এখনও তার প্রগতিকে যে বহুবিধ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা আমাদের চিন্তায়, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের সমাজগঠনের মধ্যে সন্নিহিত হয়ে রয়েছে, তাকে যেন অপসৃত করতে পারি। এ কাজ বড়ো সহজ নয়, সামান্য নয়—যারা সাম্যবাদী তাদেরই চিন্তায় এবং আচরণে বহু দৌর্বল্য, বহু বিকৃতি, বহু অসঙ্গতি, অন্যায় ও অপরাধ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে এবং আজও দিয়ে থাকে, আর সাম্যবাদের যারা শত্রু, যাদের বহুরূপে আমরা সর্বদেশে এখনও দেখি, তাদেরও তূণে যে সবকটি শর আজ ব্যর্থ তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে রাখি যে কথা ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা শ্রীযুক্ত তোগলিয়াত্তি কিছুকাল আগে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছিলেন : "যে আশা পূরণ হয়েছে তারই শুধু প্রতীক আমরা নই, আমাদের আন্দোলনে অবয়ব লাভ করেছে একটি নিশ্চিতি, একটি বর্ধমান, অগ্রগামী শক্তি।"

কেউ হয়তো রহস্য করে বলবেন যে লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে এই নিশ্চিতি হল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাম্যবাদের প্রকৃত সাদৃশ্য, আর এই নিশ্চিতির কথা জোর গলায় বলতে না পারলে বোধ হয় বহুজনকে চরম উন্মাদনার আস্বাদ

দিয়ে কাজে নামানো যায় না—সে-নিশ্চিতি ভগবানের কিংবা ইতিহাসের নামেই ধর্ম এবং কমিউনিজম প্রচার করে এসেছে। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে কতকগুলি সৌসাদৃশ্য থাকলেও কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ক্যাথলিক গির্জার মতো সংস্থার বনিয়াদী ব্যাপারে একেবারে গরমিল রয়েছে। স্বীকার করতে হবে যে নানা কারণে অনেক শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীও তাঁদের তত্ত্ব ও কর্ম নিয়ে যন্ত্রবৎ বিচার করে থাকেন, সহজ, সাধারণ মানুষের মনে যে বহু প্রশ্ন ওঠে তাকে হয়তো অজ্ঞাতে উপেক্ষা করে বসেন, সাম্যবাদকে সমাজবিবর্তনপ্রসঙ্গে অনিবার্য জেনে যেন নির্ভর করেন ইতিহাসের অকাট্য ধারার উপর, ভুলে যান ইতিহাস অতিমানবিক কোনো প্রত্যয় নয়, ইতিহাস স্বয়ম্ভূ নয়, তার স্রষ্টা হল মানুষ। দোষে-গুণে গড়া, সংস্কারের বাঁধনে-বাঁধা অথচ এগিয়ে-চলার-তাগিদে-সাড়া-দেওয়া মানুষ। সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, রুশদেশের রূপান্তর সংসাধন কালে, লেনিন-স্তালিনের যুগে কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্ব- ও কর্ম- সম্বন্ধীয় কাঠিন্য ও কঠোরতা অবশ্য বোধগম্য, কিন্তু বর্তমানে, বিশ্বের সামাজিক ভারসাম্য যখন কমিউনিজমের অনুকূল না হওয়ার কোনো হেতু নেই, তখন প্রাক্তন এবং সম্ভবত অনিবার্য কঠোরতা ও কাঠিন্যকে বহুলাংশে বর্জন বোধ হয় করা যেতে পারে। এমনও হয়তো বলা যায়, অত্যন্ত সবিনয়ে ও কথঞ্চিৎ কুণ্ঠা নিয়ে বলা যায় যে সাম্যবাদের বিশ্ববীক্ষা নিয়ে কার্ল মার্কস্‌ তাঁর পূর্ণ বক্তব্য সাজিয়ে রেখে যেতে পারেন নি। ফয়েরবাখ সম্বন্ধে সূত্রগুলিতে কিংবা তাঁর পত্রাবলীর অংশবিশেষে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি রবিরশ্মির মতোই সমাজসত্যকে উদ্ভাসিত করেছে, কিন্তু তার সর্বত্রবিস্তারী সম্প্রসারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। একাধারে অপূর্ব মনীষা ও চিকীর্ষার অধিকারী হয়েও মহামতি লেনিনকে বাস্তব সমস্যা নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এমনই জড়িত হয়ে থাকতে হয়েছিল যে তাঁর অবদান অমূল্য হলেও দৈনন্দিন কর্মের অসম্ভব চাপে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ পরিবেশেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। ঠিক তাঁর তুলনীয় প্রতিভা আর দেখা যায় নি, এবং রুশদেশে, চীনে ও অন্যত্র নানা ঐতিহাসিক কারণে কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা অনেকাংশে অপরিহার্য হওয়ায় সাম্যবাদের স্বচ্ছন্দ তত্ত্বগত ক্রমবিকাশ কথঞ্চিৎ ব্যাহত হয়েছে। এখনও এ-বাধা কাটে নি ; চীনের কমিউনিস্ট নায়কেরা মার্কস্‌বাদের পবিত্রতা রক্ষার নামে তত্ত্ব ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই যেন দুরাচারে প্রবৃত্ত

হয়েছেন, আর সোভিয়েত পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ব্যাপক ও মৌলিক পর্যালোচনা হচ্ছে না, সমসাময়িক কর্তব্যের দোহাই দিয়ে দুরূহ চিন্তার বালাই থেকে রেহাই পাওয়াই যেন তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। মাঝে মাঝে পোলাণ্ডের মতো স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দেশ থেকে কিছু কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে, কিংবা ইতালির মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে কমিউনিস্ট পার্টি জনতার সঙ্গে প্রকৃত আত্মীয় প্রতিষ্ঠার ফলে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নব নব উন্মেষের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। মনে হয় আশা করা বাতুলতা, কিন্তু ইচ্ছা হয় আশা করতে যে আমাদের এই ভারতবর্ষের মতো দেশ, যা অতিবৃদ্ধ হলেও কখনও আত্মিক দিক থেকে জরদ্গব হয়ে পড়ে নি, যা বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের শুধু সন্ধান করে নি তাকে স্থাপনও করতে পেরেছে; যে দেশে দৈন্য সত্ত্বেও আছে দীপ্তি, যেখানে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কথা সহজ, স্বাভাবিক সুরে প্রোক্ত হয়েছে, সে-দেশ মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষাকে সত্য, শিব, সুন্দর এই তিন গুণে সজ্জিত করতে সাহায্য করবে।

সম্প্রতি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে লেখা এক সুদীর্ঘ পত্র প্রচারিত হয়েছে, যাতে নানা কথার মধ্যে আছে কোনো কোনো কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে প্রখর ভর্ৎসনা। চীনে ব্যাপক বিপ্লব সংঘটনের সার্থকতম শক্তিরূপে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি প্রভূত পরিমাণে আত্মগরিমাবোধ যে রাখে, তার পরিচয় অবশ্য সম্প্রতি প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, পূর্বোক্ত পত্রের একস্থানে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নামোল্লেখ না থাকলেও প্রায় নিঃসন্দেহ লাগে যে কটাক্ষটা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। "এমন পার্টি আজ কোনো কোনো দেশে আছে, যারা নিজের দেশের সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজস্ব অনুশীলন করে না, অন্য দেশ থেকে নির্ধারিত নীতির প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকে, তার ফলে কাজের ক্ষেত্রে হাতড়ানো ছাড়া আর বেশি কিছু করে উঠতে পারে না"—ঠিক তরজমা না হলেও এমনই ধরনের কথা পিকিং থেকে শোনানো হয়েছে। আজ অবশ্য প্রায় সব দেশের কমিউনিস্টরা পিকিং-মার্কা ফতোয়া (আর তার ফলাফল) লক্ষ্য করে শুধু যে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ভেবে বিচলিত তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পিকিং-এর চিঠিতে যে-দোষের কথা বলা হয়েছে সে-দোষে বেশ কিছুটা যে আমরা দোষী, তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ ঘটবে। ভারতবর্ষের

মতো দেশের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদায় বিশ্রীভাবে আঘাত করে আর দুনিয়া জুড়ে সর্বনাশা যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনাকে উস্‌কে দিতে পর্যন্ত তৈরি থাকার ভাব দেখিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছে, তা আমাদের চোখে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাই বলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা নিজেদের দোষত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে অচেতন বা উদাসীন থাকলে ক্ষতি হবে তাদেরই এবং তাদের দেশের।

শুধু কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক যুগে এদেশের জীবনে প্রায় সর্ব ব্যাপারে বিদেশের মুখাপেক্ষিতা একটা প্রচণ্ড অভিশাপ বই কিছু নয়। দুশো বছরের পরাধীনতা ভারতবর্ষকে এমনভাবে কক্ষচ্যুত করেছিল যে এখনও সে-দুর্দশার প্রতিকার আমরা করতে পারি নি। ইংরেজশাসন জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেছিল—পূর্ববর্তী যুগে সামাজিক যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা যে কম ছিল তা নয়, কিন্তু তখন অন্তত জীবনের ধারার একটা সামঞ্জস্য ছিল, এমন পরিস্থিতি হাজির হয় নি যখন অতীত হল বিচ্ছিন্ন, বর্তমান হল দুঃসহ আর ভবিষ্যৎ ঘনান্ধকার। মরা হাড়ে ভেলকি খেলাবার শক্তি এই প্রাচীন দেশের ছিল বলেই আমরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাই নি, কিন্তু নিদারুণ দাম আমাদের দিতে হয়েছে ইতিহাসের এই কশাঘাতে। তাই ব্যতিক্রম সত্ত্বেও আমাদের দেশে গত একশো বছরের চিন্তায় আর মনীষায় দেখা দিয়েছে সেই দোষ যাকে গান্ধীজী নাম দিয়েছিলেন 'দাস-মনোভাব'। তাই এখনও আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি—এবং এই ধারণারই প্রতিফলন অনিবার্যভাবে পড়েছে সরকারি কাজকর্মে—যে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি ভাষাকেই চালু রাখা চাই, অন্তত উচ্চস্তরে তো বটেই। তাই এখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস যে বিলাতের পার্লামেণ্ট-মার্কা ব্যবস্থা হল সবচেয়ে সরেশ—আমরা ভুলে যাই যে আমাদের মতো দেশের পরিস্থিতিতে আছে এমন ধরনের স্বকীয়তা, যা দাবি করে শাসনরীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা, যে-চিন্তা নিয়ে হয়তো বা কিছু পরিমাণে চেষ্টা হচ্ছে আফ্রিকা এবং এশিয়ার কোনো কোনো দেশে, যাদের সম্বন্ধে আমাদের নাকতোলা ছাড়া অন্য মনোভাব নেই, ইংরেজের যোগ্য শিষ্যরূপে আমাদের অপরিব্যক্ত অহঙ্কার এত বেশি! ইংরেজ রাজত্বের যুগে আমাদের উপরে যে চাপ পড়েছিল তার ফলে এদেশের শিরদাঁড়া ভাঙে নি

বটে, কিন্তু কিছু কিছু মচকে যে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আত্মশক্তি সম্বন্ধে অনাস্থা আমরা প্রায় যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—শুধু ভারতীয় কমিউনিস্টরা নয়, অল্পাধিক পরিমাণে এই বোঝা আমাদের সকলেরই ঘাড়ে পড়েছে, তার ভার সম্বন্ধে আমরা সর্বদা সচেতন না থাকলেও এ-কথা সত্য।

গণ্ডগোল আরও বেড়েছে সম্ভবত এজন্য যে মাঝে মাঝে শ্রদ্ধেয় মার্কস্‌-বাদীদের কাছেই আমাদের শুনতে হয় যে কমিউনিজম ব্যাপারটা হল পশ্চিমী ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত—যার অর্থ হল এই যে আমাদের মতো দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়া হল কমিউনিজমের প্রতিকূল, আর তাই একেবারে তুলনীয় না হলেও ডিরোজিও-র যুগে যেমন বাঙালী বিদ্বানরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে নেমেছিলেন, খানিকটা তেমনই ভাবে আজকের নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের পাশ্চাত্য ধারাকে আত্মস্থ করতে হবে। বর্তমান পৃথিবী হল সীমিত; অর্থব্যবস্থা আজ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছে; অতএব মূলত পশ্চিমী ইতিহাস থেকে উদ্ভূত কমিউনিজম আজ সঙ্গতভাবেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে—মোটামুটি এ-ধরনের যুক্তি অনেকের মনে আছে। উলটো দিক থেকে আবার সম্প্রতি প্রকাশিত এক চিন্তাশীল গ্রন্থে বিদগ্ধ লেখক পরম আন্তরিকতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "গণতন্ত্র আর সাম্যবাদ ভালোমন্দ নিয়ে একই বৃক্ষের দুটি শাখা মাত্র, আর বৃক্ষটি হল য়ুরোপীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারা"—যে-ধারা আজ শান্তি আনতে পারে না, স্বাধীনতাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করতে পারে না, "একমাত্র ভারতবর্ষের মহৎ সাধনা ও সিদ্ধিতেই আছে তমসা থেকে জ্যোতিতে উত্তরণের পথ।" (শান্তি বসু, 'শিল্প, স্বাধীনতা ও সমাজ', ১৩৭০)।

ভারতবর্ষের সাধনা এমনই মহীয়সী যে অতি সহজেই এবং তার একান্ত স্বল্প আস্বাদন সত্ত্বেও আমাদের দুর্গতিবিহ্বল চিত্ত সেখান থেকে সান্ত্বনা সংগ্রহ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অতুলন চিত্র অনেকের মনে পড়তে পারে: "ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে-প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।" আবার যখন সাম্যবাদী বিদ্বানদের কাছে শুনি যে কমিউনিজম দূরে থাক, এ দেশের যে-পরম্পরা,

যে-ঐতিহ্য, তার সঙ্গে মানবিকতারও (humanism) কোনো সামঞ্জস্য নেই, তখন ধীর ভাষায় তাঁদের কাছে মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে-লিখিত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস পড়বার সুপারিশ করতে মন যায় না, মন রুষ্ট আর বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় এ-ধরনের অশ্লাঘ্য ও উদ্ভট একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে। কিন্তু প্ররোচনাকে সাবধানে এড়িয়ে গিয়েই তো ভাবতে হয়—ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিকথায় শুধু তার সাধনার সংবাদ নেই, সঙ্গে সঙ্গে আছে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত বেদনা ও ব্যর্থতার এমন মর্মন্তুদ কাহিনী যে সাধনার যজ্ঞধূমও তাকে আচ্ছাদন করে রাখতে পারে নি। বৃহদাকার গ্রন্থেও এই প্রসঙ্গের পূর্ণবিশ্লেষণ দুরূহ, কিন্তু অস্বীকার তো করা যায় না যে আমাদের ঐতিহ্যের মহত্ত্বের মাদকতা প্রায়ই আমাদের বাস্তব জীবনের অপার বিড়ম্বনাকে বিস্মৃত হয়ে থাকতে সাহায্য করেছে। একাদশ শতাব্দী থেকে এদেশে অল বরুনির মতো কোনো মনীষীকে দেখা যায় নি, যিনি ব্রত, দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কিংবা ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্ত, কাব্য ইত্যাদি নিয়ে মানসিক কসরত না করে সমাজদেহে যে রোগ প্রবেশ করেছিল তার নির্ণয়-চেষ্টায় প্রকৃত প্রস্তাবে নেমেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার ক্ষেত্র থেকে ভারতবাসী যেন বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। শিবাজীর মতো বিচক্ষণ ও বাস্তববিশারদ ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র কিনতেন বিদেশীদের কাছ থেকে, এদেশে তার কারখানা নির্মাণে অগ্রসর হন নি। নৌবাহিনী ব্যাপারে তো খাস দিল্লীর প্রবলপরাক্রান্ত মুঘল বাদশাহ উদাসীন ছিলেন।

বহুকাল যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন অতীত সম্বন্ধে বর্তমানের পক্ষে রায় দেওয়া সহজ নিশ্চয়ই, হয়তো অন্যায়ও বটে। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনা নানা বিপত্তি সত্ত্বেও অন্তত কথঞ্চিৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের উত্তরাধিকার রূপে এসেছে বলেই অকুণ্ঠে বলা দরকার, সেই সাধনার বিস্ময়কর গরিমা সত্ত্বেও বলা দরকার, যে তাতে ফাঁক ছিল অনেক, হয়তো ফাঁকিও ছিল—এতে অপ্রসন্ন বা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, মানুষ কোথাও কোন কালে তো নিখুঁত হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মনে ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার যে প্রবল কর্তৃপক্ষীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকায়তবাদ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের বঞ্চিত জনতার জীবনবোধকে প্রকাশের প্রয়াস করেছে—ভাষার যে-পরিচ্ছদ লোকায়তিকেরা তাঁদের বক্তব্যকে পরিয়েছিলেন তা হয়তো সর্বদা মনোহারী নয়, কিন্তু স্মরণীয় হল এই যে সুচতুরভাবে পরিকল্পিত অবজ্ঞা এবং সঙ্গে সঙ্গে

শাসনযন্ত্রের দমনব্যবস্থা প্রয়োগ করেও লোকায়তবাদকে এদেশের জীবন থেকে লুপ্ত করা সম্ভব হয় নি, ভারতমানস থেকে তাকে মুছে দেওয়া যায় নি। কোনো কোনো দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন এই লোকায়তিকদেরই উত্তরাধিকার পেয়েছে। সমাজে কায়েমী স্বার্থ রয়েছে বহু বিভিন্ন পরিচ্ছদে—মনের ক্ষেত্রেও কায়েমী স্বার্থের অস্তিত্ব বড়ো কম লক্ষ্য করার মতো নয়। এই স্বার্থপুঞ্জের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান বিভিন্ন আকারে যুগে যুগে ঘটেছে। বর্তমান শিল্পযুগে নির্বিত্তের দল বিত্তবানদের স্বার্থে এবং নির্দেশে পরিচালিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বদেশে আগুয়ান্ হয়েছে। লোকায়তিকদের মতোই তাদের বাক্যে, তাদের আচরণে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত উষ্মা-জনিত অশালীনতা যদি দেখা যায় তো কেবল বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন পরিবেশে দেবাসুর যুদ্ধ চলছে বর্তমান যুগে—সমুদ্রমন্থনপর্ব এখনও সমাপ্ত হয় নি, অমৃত ও গরল এখনও উত্থিত হচ্ছে, দলিত মানুষ আজ দেবতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, কিন্তু কোনো মহাদেব এসে তার পক্ষ নিয়ে হলাহল গলাধঃকরণ করবে না, দুরূহ কর্তব্য নিজেই সমাধা করে তাকে তার নিজের কঠিন পরিচয় দিতে হবে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, 'না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি।'... বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই।...মানুষের যোগ যদি সংযোগ হয় তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ।" ('শিক্ষার বাহন' ১৩২২) স্বচ্ছ, সহজ এই কটি কথার মধ্যে যেন আজকের সকল বক্তব্যের মর্মবস্তু রয়ে গেছে।

বাস্তবিকই আজ পৃথিবী আকারে ছোট হয়ে গেছে, দেশ থেকে দেশান্তরে যাওয়া সময়ের দিক থেকে সামান্য ব্যাপার। যে মস্কো ভূগোল আর মনের হিসাবে আমাদের দেশ থেকে কত দূর ছিল, আজ তা যেন প্রতিবেশীর মতো। দিল্লী থেকে হাওয়াই জাহাজ তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আকাশে পাড়ি দিয়ে মস্কোতে পৌঁছে যায়। কিন্তু শুধু দৌড়ে এর ওর কাছে হাজির হওয়া তো বড়ো কথা নয়, দরকার হচ্ছে যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পরস্পরের "সংযোগ"। হিটলার দর্পভরে বলতেন যে 'ব্রেকফাস্ট' খাবেন হলাণ্ডে, 'লাঞ্চ' করবেন বেলজিয়মে, আর রাত্রের 'ডিনার' ফ্রান্সে—কারণ সব কটা দেশ হবে তাঁর তাঁবেদার। এ হল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দুর্যোগ" কারণ এ তো মানুষে মানুষে

মিলনের ছবি নয়, বহু দেশের গলায় শিকল বেঁধে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পৈশাচিক আনন্দ। এই ধরনেরই "দুর্যোগ" বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থপুষ্টির জন্য লালায়িত বেশ কিছু লোক এখনও জগতে বহাল তবিয়তেই বাস করছে, আর সেজন্যই "দুর্যোগ" নিবারণ করে "সংযোগ"-এর দিনকে এগিয়ে আনার প্রয়োজন আর গুরুত্ব এত বেশি।

"জানাতেই মুক্তি" ভারতবর্ষের এই ঋষিবাক্য যে কত মহার্ঘ তা বাগাড়ম্বরের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের চিন্তায় জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞানের পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনীহা যে সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। এরই সঙ্গে ভাবা যাক প্রাচীন গ্রীকদের কথা—"জ্ঞানই শক্তি"। নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং ব্যবহারিক জীবনে, নিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, এই হল মানুষের অগ্রগতির মর্ম। প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞান মানুষকে শক্তি দিয়েছে বহু ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে পরাভূত করতে, সমাজকে সচেতন করেছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্কের উপর প্রকৃত আলোকপাত করেছে। এই জ্ঞান বিনা সমাজবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি চিন্তা ও কর্মধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করত না, বাস্তবজীবনে যে অসংখ্য প্রতিবন্ধক আজও সমাজের সুষ্ঠু রূপায়নের পথে কঠোর ও কঠিন কণ্টকস্বরূপ, তাকে অপসৃত করার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে মানুষ সমসমাজের স্বপ্ন দেখতে পারত বটে, কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে পারত না। অন্তত ১৮৪৮ সাল থেকে বলা যায় যে মানুষের জ্ঞান এমন স্তরে তখন উঠেছিল যে সমাজ জীবন ব্যাপারে তার প্রকৃত মুক্তিকে যেন সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, আর পেরেছিল বলেই সাম্যবাদের কল্পনাকে আকাশকুসুমের স্তর থেকে নামিয়ে বাস্তব নিশ্চিতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে বিপ্লবের মূল্য দিতে প্রস্তুত না থেকে কিংবা সে-মূল্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি দেখে বা অনুমান করে আতঙ্কিত হয়ে বহু সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সাম্যবাদকে সমাজ-ব্যাধির প্রকৃত সদুত্তর বলে স্বীকার করেও গ্রহণ করতে পারেন নি।

নাম করার দরকার নেই, কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে আমাদের দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় মনীষী কথোপকথনব্যপদেশে বলেছিলেন মনে আছে "তোমাদের কমিউনিজ্‌ম্ থেকে শ্রেণী সংগ্রামের কথাগুলো সরিয়ে দাও, তাহলে আমিও

কমিউনিস্ট !" অবশ্য ইংলণ্ডে অধ্যাপক টনি-র (Tawney) মতো ধীরস্থির মনীষী একবার বলেছিলেন ছোট ছোট কিস্তিতে সোশালিজমের দিকে এগিয়ে যাবার প্রসঙ্গে : "আস্তে আস্তে খোসা ছাড়িয়ে পেঁয়াজ খাওয়া যায় বটে, কিন্তু জ্যান্ত বাঘ কামড়াবার শক্তি রাখে—তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একে একে খসিয়ে আনা সম্ভব নয়।"

যাই হোক্, শুধুমাত্র শুভবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে এবং সমাজবিবর্তনের যে ইতিহাস বহু ক্ষেত্রে মর্মন্তুদ তার সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় স্থাপন না করে যাঁরা সাম্যবাদের প্রতি অল্পাধিক আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে মাঝে মাঝে একেবারে সাম্যবাদ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। বিপ্লব যখন ঘটতে থাকে, তখন তার মূল্যদান সম্বন্ধে তবু তাঁরা কতকটা বুঝতে পারেন ; যুদ্ধকালে যেমন দোষী-নির্দোষ-নির্বিশেষে বহুজনের যন্ত্রণা, প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটে থাকে, তেমনই বিপ্লব সংঘটনকালে কিছু আতিশয্য ও অপকর্ম মার্জনা করতে এবং তার কারণ উপলব্ধি করতে তাঁরা হয়তো প্রস্তুত। কিন্তু বিপ্লব সফল হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে অন্যায় ও অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে তাঁরা প্রায়শ এমনই বিচলিত হন যে বিপ্লবের সার্থকতা সম্বন্ধেই প্রভূত সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে। কয়েক বৎসর ধরে সোভিয়েত দেশে বিপ্লবী সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণের অজুহাতে অজস্র অপকর্ম সম্বন্ধে তথ্য এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে, নীতিগত দিক থেকে তার বিচার বিষয়ে অযত্ন সহকারেই প্রচারিত হয়েছে, তার ফলে বহু সদ্‌বুদ্ধি ব্যক্তি একান্ত বিচলিত হয়ে সাম্যবাদের ভিত্তিবস্তু সম্বন্ধে পর্যন্ত সন্দিহান হতে আরম্ভ করেছেন—সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনের মূল্য যদি ইতিহাস এমনই সমধিক বলে প্রমাণ করে থাকে তো সেই মূল্য দিয়ে যথোপযুক্ত প্রতিদান মিলেছে কিনা এই সন্দেহ প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আজকের প্রশ্নবিহ্বল পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রয়োজন যে অনুপাতবোধ তা যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি, চিন্তার ভারসাম্য যেন খণ্ডিত না হয়, আর সমাজ ব্যাপারে মৌলিক মূল্যচেতনা যেন বিকৃত না হয়ে পড়ে। বহুকাল আগে মার্কস বলেছিলেন : "দার্শনিকেরা নানাভাবে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কাজ হল জগৎকে বদলে দেওয়া।" কিন্তু এ-কাজ তো সহজ নয় ; পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি মানুষের ইতিহাসে যে জঞ্জাল জমেছে তাকে সরিয়ে দিতে পারা তো সামান্য কর্ম নয়—আর কখনও কি মানুষ এই মাটির পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে, না হতে চাইবে ?

নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—যা ভালো মনে করা যায় সেই দিকে এগিয়ে যাওয়া এটাই তো সংগ্রাম, আর এই সংগ্রামই তো জীবন, সংগ্রামহীনতা হল মৃত্যু, যে-কথা একবার বলেছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ।

ইতিহাসের রুদ্ররূপ দেখে বাস্তবিকই মনে হতে পারে যে তাকে এড়িয়ে যেতে পারাই হল ভালো, কিন্তু মানুষ চাইলেই কি তার ইচ্ছা পূরণ হয়ে থাকে? রুশ বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার অল্প কয়েক বৎসর পরে বার্ট্রাণ্ড্‌ রাসেল্‌ সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে "The Theory and Practice of Bolshevism." নামে একটি গ্রন্থে তাঁর প্রতিকূল সমালোচনা প্রচার করেছিলেন। মনে আছে, কার্ল্‌ রাদেক্‌ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন যে রাসেল্‌ সাহেব "নিজের গৃহকোণে আগুনের সামনে পা রেখে আরামে কোনো বই পড়ছেন এবং পাইপ টানছেন, এ-ছবি সহজে কল্পনা করতে পারি, কারণ বলশেভিক বিপ্লবকে ধিক্কার জানিয়ে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা, যারা এই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লিপ্ত, তাদের তো আর অত সহজে ছুটি নেই!" বাস্তবিকই যাঁরা একটু গভীরভাবে সাম্যবাদ বিষয়ে চিন্তার চেষ্টা করছেন তাঁদের পক্ষে মনে রাখা দরকার যে চিত্তের কথঞ্চিৎ ঔদার্য ও প্রসার থাকলে সাম্যবাদের ন্যায় জীবনদর্শনকে গ্রহণ করা দুরূহ নয়, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ব্যাপারে যে কত সমস্যা, কত কঠিনতা, এবং দোলায়মানতা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত স্থিরীকরণের একান্ত গুরুত্ব দেখা দিয়েছে এবং দেবে, তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা চিন্তরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁরা অনেকেই কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সেই চিন্তার রূপায়ন সম্বন্ধে এমনই উদাসীন যে সমাজজীবনে সমস্যা যখন এসে দেখা দেয় তখন সেই চিন্তা যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কী তা ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আনা যায় না। এই ধরনের চিন্তায় যাঁরা সন্তুষ্ট, তাঁরা অবশ্য নিজেদের বিচারবুদ্ধির নির্ভুলতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাস্তব জীবনে তার পরীক্ষা ঘটে না, ক্রমাগত দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয় তাঁদেরই যাঁরা ব্যবহারিক জীবনে সাম্যবাদী হওয়ার চেষ্টা করছেন, পরীক্ষায় যাঁরা অবশ্য সর্বদাই উত্তীর্ণ হতে পারেন না, কিন্তু নিয়ত কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েই তাঁদের সমাজচিন্তা পরীক্ষিত হচ্ছে, সংশোধিত হচ্ছে, সুসংস্কৃত হচ্ছে, অল্পাধিক প্রয়োগ-সাফল্য অর্জন করে ইতিহাসের রথচক্রকে এগিয়ে দিচ্ছে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে স্তালিন যুগের

শেষ পর্বে বহুবিধ অন্যায়, অনাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যে অকরুণ আত্মসমালোচনা হয়েছিল, তারই জের টেনে আরও অনেক কথা সেদেশ থেকে এবং সেখানকার সোসালিস্ট ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত অপকর্ম সম্বন্ধে জানা গেছে। না বলে উপায় নেই যে সোভিয়েত দেশের বর্তমান কর্তৃপক্ষীয়েরা এ-বিষয়ে যে সব কথা বলেছেন এবং মাঝে মাঝে কয়েকটি কাজও করেছেন, যার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। যে-অপকর্ম ঘটেছে, সে-সম্বন্ধে অন্তত মোটামুটিভাবে জানা দরকার যে ব্যাপক বিচারে তা অনিবার্য ছিল কিংবা নিবার্য ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ঘটনার কথা না তুলে সমগ্র বিচারে যদি স্থির হয় যে ঘটনাবলী ছিল অন্তত মোটামুটিভাবে অনিবার্য, তো তার অর্থ হয় একরূপ। কিন্তু তার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ হয় যদি বিচারে স্থির হয় যে অপ্রিয় ঘটনাবলী নিবার্য ছিল অথচ নিবারিত হয় নি, অর্থাৎ ব্যবস্থায় এমন গলদ ছিল যে অত্যন্ত কদর্য ঘটনাও নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নিবারিত হয় নি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সোভিয়েত দেশ থেকে কিংবা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা লক্ষ্য করা যায় নি। বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সোভিয়েতের একান্ত দুঃসময়ে, যখন শত্রুবেষ্টিত সোভিয়েত দেশের বিলোপ সাধনের জন্য জগৎজোড়া ষড়যন্ত্র ও আয়োজন অনবরত চলছিল, তখন মানুষের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতকে মনে রেখে যাঁরা অকুণ্ঠে, অপ্রতিভ না হয়ে, এবং কখনও কখনও পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়ার পূর্বে, সোভিয়েতের পক্ষ সমর্থন করা প্রকৃত মানবিক কর্তব্য মনে করে এসেছেন, তাঁরাই আজ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কোনো ত্রুটি দেখলে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে সংকুচিত হবেন না, কারণ দুনিয়ার চেহারা আজ বদলেছে, সোভিয়েত আজ সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর অবস্থায় নেই, সমাজবাদ পৃথিবীর একতৃতীয়াংশে শক্তি স্থাপন করে বর্তমান যুগের ইতিহাসকে শুধু প্রভাবিত নয়, নিয়ন্ত্রিত করারও সাধ্য রাখে।

কিন্তু সোভিয়েত এবং অন্যান্য সোস্যালিস্ট দেশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিচারে ত্রুটি যতই দেখা যাক না কেন, সন্দেহ নেই যে গুণগতভাবে ইতিহাসে নতুন এক সমাজের অবস্থিতি আজ তার অকাট্য প্রভাব বিস্তার করছে। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ ওয়েব সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে যখন লেখেন যে "দুনিয়ার সব চেয়ে সমানাধিকারমূলক ও সর্বব্যাপী গণতন্ত্র" সেখানে স্থাপিত

হয়েছে, তখন তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিচারে হয়তো কিছু আতিশয্য ছিল, কিন্তু মূলগত দিক থেকে কোনো ভ্রান্তি ছিল না। মনে পড়ে যায় বহুদিন পূর্বে মহামতি রম্যাঁ রলাঁর কথা; সোভিয়েত দেশকে আক্রমণ করার কলরব যখন চতুর্দিকে, তখন রলাঁ বলেন যে তাঁর বুড়ো চোখে অশ্রুজল বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে কিন্তু সোভিয়েতের বিপদ শুনলে তিনি বলে উঠবেন: "সোভিয়েতকে বাঁচাতে হবে নইলে মৃত্যুবরণ করব।" সোশ্যালিস্ট সমাজ স্থাপন ব্যাপারে ইতিহাসে নতুন পদক্ষেপ ঘটিয়েছে সোভিয়েত। যদি তার দোষের কথা আজ শোনা যায় তো মনে রাখতে হবে: "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

হঠাৎ এক একটা খবর বেরোয় যা থেকে সোশ্যালিস্ট সমাজের গুণগত প্রভেদ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৫।৪।৬৩ তারিখের 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজের একটি ছোট্ট কোণে দেখা গেল যে পূর্ব সাইবীরিয়ার রাজধানী ইর্‌কুট্‌স্কে প্রধান গ্রন্থাগারে এক প্রদর্শনী হচ্ছে—বিষয় হল "কবি বায়রনের জন্ম থেকে ১৭৫ বৎসর"! ঐ কাগজেরই মন্তব্য দেখলাম যে অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত 'বড্‌লিয়ান্‌' গ্রন্থাগারে যে প্রদর্শনীর কথা কল্পনা করা যায় না, তাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন এক অঞ্চলে যা হল উত্তর ক্যানাডার মতো দুরধিগম্য, যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত স্থান! ছোট্ট এই ঘটনা, কিন্তু এর তাৎপর্যের শেষ নেই। হয়তো কারও কারও মনে পড়বে স্তালিনযুগে প্রোক্ত যে কথা বলেছিলেন আইরিশ লেখক শোন্‌ ও-কেসি। তিনি বলেন যে দুটো কারণে তিনি সোভিয়েতের বন্ধু—এক হল যে আধুনিক ফরাসী চিত্রের সংগ্রহ সোভিয়েত দেশে যা আছে তা অতুলনীয়, আর দ্বিতীয় হল যে শিশু ও নারীদের বিষয়ে সোভিয়েত শাসনের বিবিধ ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কিছু অন্য কোনো দেশে নেই।

বিপ্লবকালে এবং বিপ্লবোত্তর যুগে বহু নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত সোভিয়েত দেশ থেকে মিলেছে সন্দেহ নেই। কোনো একটিমাত্র অপকর্মেরও গুরুত্ব হ্রাস করতে চাওয়া ঠিক হবে না—"res sacra homo" (মানুষের অস্তিত্ব হল পুণ্যবস্তু), খ্রীষ্টান ধর্মের মূলগত এই কথা, যে-কথা ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় ও অন্যান্য চিন্তায় বিভিন্ন রূপে সুপ্রকাশ, মার্কসবাদের মূল বক্তব্যে তা একেবারেই অস্বীকৃত নয়। মার্কসের রচনায় অগণিত পরিচয় রয়েছে যে কমিউনিজম্‌ তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, ব্যক্তিসত্তা

আর সমাজজীবন থেকে বিচ্যুতির বিড়ম্বনা ভোগ করবে না (The reintegration or return of man to himself, transcendence of human self-alienation)। কিন্তু সমাজের ইতিহাস বিচারে ভুললে চলবে না যে কত অন্যায়, অনাচার, অবিচার, অপকর্ম ঘটেছে অনিবার্যভাবে—যুদ্ধের তাণ্ডবে, শক্তির মদমত্ততায়, হিংসার তাণ্ডবে, ক্রূরতার পরাকাষ্ঠায়। যে-ভারতবর্ষে ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে, সে দেশে এবং সর্বদেশে কি নিষ্ঠুরতার নিদর্শন ইতিহাসে অল্প? শূলে চড়ানো, ক্রুশবিদ্ধ করা, জীবন্ত কবর কিম্বা পুড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো কিম্বা ঘোড়া চালিয়ে দেওয়া, গ্যাসে-ভরা ঘরে পূরে দেওয়া—আরও কত উপায়ে সেকালে ও একালে সমাজপতিরা দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে থেকেছেন। আর যুদ্ধ? মহাভারতের যুদ্ধ কিম্বা ট্রয়ের যুদ্ধ গোলাপজল ছড়িয়ে লড়া হয়নি, আর আধুনিক যুগে যুদ্ধেরই অঙ্গীভূত দুষ্কর্ম হিসাবে কার না মনে পড়বে আউশ্‌ভিৎস-এর (Auschwitz) কথা, যেখানে হিটলারি দানবতা চল্লিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছিল জঘন্য পদ্ধতিতে, কিম্বা হিরোশিমা যেখানে এক বোমা ফেলে আড়াই লক্ষ লোকের মৃত্যু ও বহু লক্ষের জীবনমৃত্যুর ব্যবস্থা হয়েছিল? এ-সব কথা সৎ মানুষের মনে মাঝে মাঝে এসে কি ভিড় করে না? এ জন্যই তো বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার লিখেছিলেন:

> "মানুষ না থাকলে পৃথিবীটা হত আরও অনেক মধুর, অনেক তাজা। যখন সেপ্টেম্বরের সকালে সূর্যোদয়ের সময় শিশিরকণা হীরের মতো ঝলমল করে ওঠে, তখন প্রতিটি ঘাসের ডগায় দেখা যায় সৌন্দর্য আর অনবদ্য পবিত্রতা। ভাবতে ভয় করে যে বহু পাপী চক্ষু এই সৌন্দর্যকে দেখছে, আর তাদের কদর্য ও নিষ্ঠুর অহমিকার ছটায় তার মধুরিমাকে কলঙ্কিত করছে। আমি বুঝি না যে-ভগবান এই শোভা নিজে দেখছেন তিনি কেমন করে এতদিন ধরে বরদাস্ত করে এসেছেন সেই মানুষকে, যে দাবি করে যে সে ভগবানেরই প্রতিমূর্তিরূপে গঠিত হয়েছে!"

যুগ যুগ ধরে মানুষ সংগ্রাম করে এসেছে সমাজের রূপান্তরকল্পে—সে-সংগ্রাম প্রায়শ চলেছে অচেতনভাবে, কিন্তু এর বিরাম নেই। তার ইতিহাসে কালিমার অন্ত নেই, এত কালিমা যে অনুপাতবোধ বিস্মৃত হয়ে সেদিকে তাকালে আত্মাবলোপ ভিন্ন সৎ মানুষের গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

আছে গরিমা—এমন গরিমা যা যুগ যুগ ধরে শুভ বুদ্ধির সঙ্গে. আদর্শ, আবেগ, নিষ্ঠা, স্বার্থবিসর্জন, সর্বজীবে মমতা প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণ—দুর্বল মানুষেরই মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে। রামায়ণে বাল্মীকি রামের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন ঃ "কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ কর্ম যৎ শুভম্"—এই কর্মভূমি আমরা পেয়েছি, সৎকর্ম হল আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্য প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই নতুন অভ্যুদয় আমাদের এই বিশ্বে ঘটবে। অনেক ব্যাপার এখনও অকাট্য, অনেক ক্ষেত্রে এখনও আমরা স্ববশ নই—কিন্তু উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ এমন স্তরে আজ উপনীত হওয়ার শক্তি রাখে যেখানে "সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বং আত্মবশং সুখং," এই মহাবাক্য অনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। একথাই মার্কস্ লিখে গেছেন 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ঃ "Beyond it (the realm of necessity) begins that development of human energy which is an end in itself, the true realm of freedom, which however can blossom only with this realm of necessity as its basis." (ইংরেজী সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ৮০০)

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে নানাদেশে বহু গুণীজন সাম্যবাদের আকর্ষণে অনেকটা রাস্তা এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই আবার পিছিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। আরও সম্প্রতি সাম্যবাদের বিচিত্রবীর্য কীর্তিকে প্রশস্তি জানিয়েও অনেকে তার কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে এমনই বীতরাগ যে শত্রুপক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে যোগ দিয়ে ফেলতেও যেন তাঁদের সংকোচ তেমন নেই। আমাদের দেশে প্রায় বৎসরাধিককাল কমিউনিস্ট চীনের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বহু বুদ্ধিজীবী সাম্যবাদ সম্বন্ধে চকিতে (এবং বহুক্ষেত্রে চিন্তাব্যতিরেকে) এমনই বিরূপ হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের বক্তব্যে অস্বচ্ছতা ও নীতিদৈন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকররূপে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই দুরবস্থার জন্য চিন্তা এবং কর্মের ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিস্টদের বহুবিধ ত্রুটি ও অকর্মণ্যতা যে বহুলপরিমাণে দায়ী, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু দোষ ও দায়িত্ব আরোপণে তুষ্ট হয়ে থাকা অনুচিত। এ-বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা কিছু সম্ভব কিনা, তাই নিয়ে চিন্তা হোক।

যাঁরা কমিউনিস্ট নন, তাঁরা স্বীকার করবেন ভরসা করি যে সংগঠন যতই গণ্ডগোলের কারণ হোক না কেন, সংগঠন বিনা সমাজজীবনে সংহত পদ্ধতিতে কোনো রূপান্তর সংঘটন সম্ভব নয়। স্বয়ং ট্রট্স্কি একবার বলেছিলেন :

"I cannot be right against the Party"—হয়তো আমি যা ভাবছি, তাই ঠিক, কিন্তু পার্টিকে যদি তা না বোঝানো যায় তো আমার অভ্রান্ত চিন্তাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। কেউ কেউ এ-ধরনের কথা শুনে বিরক্ত হবেন, কিন্তু সংগঠন ব্যাপারে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি প্রায় অপরিহার্য মনে হলেও সংগঠন বিনা ব্যাপক ভিত্তিতে শুভ কিম্বা অশুভ কোনো কর্মই সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। বর্তমানে তো এদেশে দেখা যায় যে চিন্তাক্ষেত্রে কমিউনিজম্‌কে নিঃস্ব এবং হাস্যাস্পদ প্রমাণ করে একেবারে জব্দ করার চেষ্টায় যাঁরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে লেগেছেন, তাঁরা আমেরিকার পুঁজিপতিদের প্রসাদে পুষ্ট সংস্থার বিবিধ সাহায্য নিতে একটুও ইতস্তত করছেন না, Congress of Cultural Freedom নামক প্রতিষ্ঠানটির কথা এই ব্যপদেশে সকলেরই মনে পড়বে। যাই হোক্, কেবল সাংগঠনিক আনুগত্যের জন্য কমিউনিস্টদের মুণ্ডপাত যাঁরা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে নাচার। কমিউনিজমের প্রকৃত বক্তব্য এবং বর্তমান পৃথিবীতে তার অপার গুরুত্ব সম্বন্ধে মূলগত মতভেদ সত্ত্বেও যাঁরা অল্পাধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁদেরই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথার আভাস দেওয়ার ক্ষীণ প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধে করা গেছে।

প্রথিতযশা অধ্যাপক আর. এচ্. টনি (R. H. Tawney) একবার বলেছিলেন যে তিনি সোশ্যালিস্ট এই কারণে যে নীতির দিক থেকে ধনতন্ত্র বর্জনীয়, আর যদি কেউ জবাব দেয় যে ধনতন্ত্রের আমলে তো সমাজের কাজ বেশ চলে যায়, তাহলে তিনি বলবেন যে ব্যাপারটা সেজন্যই আরও বিশ্রী। আমাদের দেশেও অনেকে অবশ্য এই ভাবে চিন্তা করে থাকেন, এবং হয়তো কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁদের বিরূপতার কারণ হল এই যে তাঁরা ভাবেন কমিউনিস্টরা চায় যে মানুষ কাজ করুক ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে (তার গূঢ়ার্থ যাই হোক না কেন) আর যেহেতু ইতিহাস কমিউনিজমের অনিবার্য সাফল্য সম্বন্ধে রায় দিয়ে বসে আছে, সেহেতু ইতিহাসের হাতিয়ার হওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। ঠিক এ-ধরনে কথা না বলা হলেও ইতিহাসের দোহাই দিতে গিয়ে কমিউনিস্টরা অনেক সময় যে মানুষের মজ্জাগত ন্যায়বোধকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, তা অস্বীকার করা যায় না। ১৯৬২ সালের জুন সংখ্যা "Polish Perspectives" মাসিকপত্রে এই বিষয়ে মার্কসবাদী দার্শনিক Marek Fritzhand-এর মূল্যবান্ প্রবন্ধ থেকে বিস্তৃত উদ্‌ধৃতি আছে—এর আলোচনা করতে গেলে আবার বিস্তৃত রচনা প্রয়োজন। শুধু বলা যায় যে বর্তমান

পরিস্থিতিতে একথা স্পষ্ট যে পূর্ববর্তী যুগে, বিপ্লবের প্রয়োজনবোধে, যে কথা বলা হয়েছে এবং যে কায়দায় বলা হয়েছে, তা আজ অনেকটা অচল। ইতিহাসের ধারা বুঝতে গিয়ে যদি বলা হয় এই যে ইতিহাস নামে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উপর ভরসা রেখে ব্যক্তিমানসে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক সম্বন্ধে অচেতন থাকি তো অঘটন ঘটারই আশঙ্কা। আজ আমরা বুঝি যে ইতিহাস এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে পূর্বের চেয়ে আরও স্বাধীন এবং আরও সচেতন ভাবে মানুষ তার নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা লাভ করেছে। যে-মুক্তমতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কার্ল মার্কসের রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে, সেই মুক্তমতি নিয়ে আজ সমাজে সর্ববিধ শুভবুদ্ধিকে একত্রিত করে "বহুজনহিতায়" প্রয়োগ করতে হবে।

'Polish Perspectives' পত্রিকার মে, ১৯৬৩ সংখ্যায় আছে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্কের আলোচনা। আজকের পোলাণ্ড নিঃসন্দিগ্ধভাবেই সমাজবাদকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও পোলাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী ধর্মে বিশ্বাস রাখে, ক্যাথলিক বলে নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নয়। যারা বয়সে তরুণ, তাদেরও মধ্যে সম্প্রতি অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে শতকরা ৭০ জনেরও বেশি ক্যাথলিক বলে নিজেদের বর্ণনা করেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকেও ক্যাথলিক ধর্ম বহু শতাব্দী ধরে পোলাণ্ডে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। আজও পোলাণ্ডে গেলে গির্জায় উপাসকদের সহজে ও বহুল সংখ্যাতেই দেখা যাবে। পোলাণ্ডের বর্তমান নেতা শ্রীযুক্ত গোমুল্‌কা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পূর্বেও ক্যাথলিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মোটামুটি বোঝাপড়া একরকম চলেছিল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে সাধারণ ভাবে সাম্যবাদীরা প্রাক্তন একটি বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তা হল এই যে সোশ্যালিজম্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বাড়বে, সুতরাং যারা শত্রু কিম্বা চিন্তাধারাগত বা অন্য কারণে শত্রু হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তাদের দমন করতে হবে। এই ঘটনার তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সোশ্যালিজমের অগ্রগতির ফলে শ্রেণীসংঘর্ষ যদি কঠোরতর না হয়ে বরং হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে, পূর্বতন শ্রেণীপরিস্থিতি যদি ক্রমশ অন্তর্ধান করতে থাকে, তো অনুকূল অবস্থায় ক্যাথলিক চার্চের মতো প্রতিষ্ঠান বিত্তবান্ শ্রেণীর সঙ্গে তার সুদীর্ঘ সম্পর্কের ঐতিহ্য সত্ত্বেও সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্তোষজনক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। সম্প্রতি গোমুল্‌কা তাই বলেছিলেন: "ধর্মবিশ্বাস ব্যাপারে রোমান্ ক্যাথলিক

পথে যদি চার্চ চলে তো আমরা আপত্তি করি না। তবে আমরা চাই যে পোলাণ্ডের জনতা তার স্বকীয় গণতন্ত্রকে বিকশিত করবার জন্য যে পথে চলেছে, চার্চও সেই পথ অনুসরণ করুক।" মূলগত চিন্তাধারা সম্পর্কে কমিউনিজম্ আর ক্যাথলিসিজম্ একত্রিত হচ্ছে, এ-কথা বলা বা ভাবা বাতুলতা। কেবল যে সাময়িকভাবে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পোলাণ্ডের কমিউনিস্টরা চার্চের সহযোগিতা সংগ্রহের এক কৌশল অবলম্বন করেছে, তা বলাও অন্যায় হবে। মার্কস্‌বাদী ও খ্রীষ্টান চিত্তবৃত্তির মৌলিক স্তরেও কোনও সংমিশ্রণের চেষ্টা হচ্ছে না। যা হচ্ছে তার তাৎপর্য অনেক—কারণ বিভিন্ন অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে যদি কমিউনিস্ট এবং ধর্মবিশ্বাসীদের মিলন সম্ভব হয় তো তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটুক। মানবিকতার যে সম্প্রসারণ কমিউনিস্টদের কাম্য, তাকে সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত করতে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংযোগ হবে না কেন?

পোলাণ্ডের মতো দেশে যদি এ-প্রশ্ন এভাবে উঠে থাকে তো আমাদের দেশে এর অনুশীলন কি সঙ্গত নয়? ভারতবর্ষ পৃথিবীর সব চেয়ে বিরাট ও জনাকীর্ণ দেশগুলির মধ্যে চীনের পরই দ্বিতীয় স্থান নিয়ে আছে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের অবশ্য কর্তব্য কি নয় এমন চিন্তাধারা উত্থাপনের চেষ্টা করা, যার ফলে আফ্রিকা ও এশিয়ার সদ্যস্বাধীন দেশগুলির কাছে চীন-কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রখর, সংগ্রামপ্রধান, শ্রেণীসংঘর্ষমূলক, আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করার মতো অটল অতি-বিপ্লববাদের বিকল্প কোনও মার্কস্‌বাদসম্মত বক্তব্য উপস্থাপিত হতে পারে? এ-বিষয়ে আমাদের অক্ষমতা অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এই দায়িত্ব যে আজ উপস্থিত, তা কি সহজে অস্বীকার করা যায়?

বুঝি না কেন ভারতবর্ষের মার্কস্‌বাদীরা ভ্রান্তিভয়ে ভীত অবস্থায় আমাদের এই বিপুল ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে কিঞ্চিৎ মুক্তমতি হয়ে কর্মপথে নামতে চাইবেন না, আমাদেরই স্বকীয় চিন্তার যে-পরম্পরা তার কথা নিজেরা স্মরণ করবেন না, অপরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আজকের সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে তাঁদের সহযোগিতা অর্জন করবেন না। সিদ্ধান্তের কথা ভিন্ন, কিন্তু ইয়োরোপের সাম্যবাদী মহলে খ্রীষ্টান ধর্মসংস্থার ইতিহাস আলোচনা হয়েছে; Clement of Alexandria, Tertullian, Cyprian, Ambrose, Augustine প্রভৃতি সাধুর বক্তব্য সম্বন্ধে বিচার তাঁরা করেছেন সমাজবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

এ-ঘটনা ঘটেছে বলেই তো আজ পোলাণ্ডে সাম্যবাদের হয়তো সব চেয়ে জোরালো বিরোধী ক্যাথলিক চার্চেরও উষ্মা শীতল হয়ে আসছে। বেদে, উপনিষদে, রামায়ণ-মহাভারতে, বিবিধ পুরাণে, মুসলিম ধর্মচিন্তা ও নিত্যকর্ম-বিধানে, অগণিত সাধুসন্তের জীবন ও উপদেশে মনুষ্যধর্ম সম্পর্কে যে মূল্যায়ণ মাঝে মাঝে অসঙ্গতিদুষ্ট হয়েও জাজ্বল্যমান, তাকে, মানুষের এগিয়ে চলা হল যে আন্দোলনের মূল কথা, তার সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টায় আমরা লিপ্ত হব না কেন? কোথায় কোন ভুল করে ফেলে গণ্ডগোল ঘটাব, এই আশঙ্কায় চিন্তাজ্বর থেকে নিস্তার লাভের চেষ্টাই তো এদেশে সাম্যবাদের চর্চাকে পঙ্গু করে রেখেছে। কমিউনিস্ট জগতের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথাই স্পষ্ট যে গুরুবাদী জড়তা পরিহার করে স্বচ্ছ, সুস্থ, মুক্তচিন্তার যুগ আরম্ভ হতে চলেছে। কিন্তু তা হবে না, যদি আমরা আমাদের নিজস্ব ভূমিকায় নামতে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি। ইতিমধ্যে তো কালস্রোত বয়ে চলেছে, আর শুনতে যদি চাই তো আমরা শুনতে পারি স্কন্দ পুরাণের কথা :

পরিনির্মস্থ বাগজালং নির্ণীতমিদমিব হি।
নোপকারাৎ পরো ধর্মো নাপকারাদঘং পরং॥

"বাক্যজাল মথিত করে একথাই নির্ণীত হয় যে পরের উপকার সাধনের চেয়ে বড়ো ধর্ম কিছু নেই আর অপকার করার চেয়ে বড়ো পাপ কিছু নেই।"

বিষ্ণু দে

হে দিনের সূর্য

হে দিনের সূর্য! ছিলে প্রতিদিন এক অদ্বিতীয়,
তোমার নয়ন তাই অন্ধকারে নিত্য
অগণন চোখ দিয়ে প্রতিরাত্রে নভোনীল চিত্ত
জ্বেলে দিত হে সূর্য, হে নির্বিত্তের প্রিয়!

আজ খুঁজি তোমার সে অযুত নক্ষত্র-জ্বালা রাত্রি,
অমাবস্যা আজ কেন মাত্র অন্ধকার?
তুমি কি একান্ত শূন্য বিরিক্তির মহাকাশে যাত্রী?
নাকি, সে আরেক বিশ্বে অন্য কোনও পূর্ণিমাকে পেয়েছে আবার?

সে কেন

...but a post that dogs defile.—Yeats

জবাব দেয় না, শুধু হাসে, অন্যমনে হাসেও না বুঝি।
অথচ তা অহংকারও নয়, শুধু চৈতন্যের সংহত বিহার;
যে প্রসার নৈর্ব্যক্তিক, যা আমরা শিল্পকর্মে খুঁজি,
যে গতিতে সৃষ্টি পায় স্থির-বিন্দু নির্লোভ স্পৃহার।

অবজ্ঞা? তাই বা কাকে? তার মন তার কৃত্য দায়
শুধু আলো জ্বেলে যাওয়া রাজপথে শুভ্র দীপাধারে।
সে কেন দেখবে বলো চোরাকাণা গলির আঁধারে
কোথা কোন্ কোণে ল্যাম্পপোস্টে কোন্ কুকুর কি নোংরা ছড়ায়?

বিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রাণবিজ্ঞান

মৃত্যুর দিনেও দেখি স্বপ্নসাধ মেটেনি, মেটে না।
আলোকিত পিপাসার গর্ভে কাল মহাকাল আয়ু
জীবনের স্বাদ চায় বহুকে একের মধ্যে চেনা,
বহুতেও এক কাঁপে একাত্ম শোণিত শিরা স্নায়ু।
অমৃতকে পেতে হলে জাগতিক শৈব অভিজ্ঞানে
প্রশান্তির দীপ্তি চাই অণুতে ও বৃহতে বিজ্ঞানে।

একটি রোগীর প্রাণ বাঁচাতে সজাগ হাঁসপাতালে
ডাক্তারের কী উদ্বেগ ! মাতৃরূপা নার্স অচঞ্চল !
শুভ্র শৃঙ্খলায় প্রাণ উজ্জীবিত স্নিগ্ধ দীপ জ্বালে
নব্য আয়ুর্বেদে লোকময়তায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল।
রোগী বোঝে শান্তিসুখ ফিরে এসে মৃত্যুমুখ থেকে
পরাজিত যম কাঁপে অন্ধকারে কালোমুখ ঢেকে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্থায়িত্ব

আশৈশব স্থায়িত্বে আস্থা নেই, তবুও চেয়েছি
অন্তহীন গোধূলি আর শেষহীন তীর্যক রেখার
তারা চাঁদ আকাশগঙ্গার ঘাসের শিশিরভরা মাঠের আকাশ।
পেয়েছি কি পাইনি কি সমান্তরালের শিখাগুলি
খুসির সন্ধান আর ঘাসের অঞ্জলি !

লরির ক্ষণিক হেডলাইটে : ডাস্টবিন, বাস্তহারা পরিবার:
অন্ধকার অরণ্যে মুছে গেলো।
খিড়কির অন্ধকারে কারা এলো গেলো।

তারা ছিলো এক দিন তারা নেই
স্থায়িত্বের বিন্দুবিন্দু শিশির কণায়।
মেঘ আসে জল জমে চোখের তারায়-তারায় ?
কোন গোধূলির ছায়া পৃথিবীর সর্বাঙ্গ বিছিয়ে
ভেসে গেলো ?
অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।
কে এলো কে গেলো !

দেখেছি প্রাণীর জন্ম, দেখেছি তাদের মৃত্যু
দেখেছি আশৈশব
স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা ভরা কত শব।
লরির ক্ষণিক হেডলাইটে
ডাস্টবিনে মাঠে পুকুরের ঘাটে।

কেন তবু স্থায়িত্বে আশ্বাস
কেন বল স্থায়িত্বে বিশ্বাস ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশ

গঙ্গানদী প্রবাহিত ; প্রবাহিত চিতা, শবদেহ
হরিধ্বনি। প্রবাহিত পুণ্যকামী পুরুষ, নারীর
পদচিহ্ন। নর্দমার চেয়ে পূতিগন্ধময় জলে
শান্তি। হাঁটু-অব্দি স্নানে স্নিগ্ধ হচ্ছে পাপীর শরীর ;

পাপ যাচ্ছে রসাতলে ; আত্মা হচ্ছে পদ্মের মতন।
পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে থুথু, মল, গলিত কুকুর ;
তবু প্রবাহিত···প্রাণ প্রবাহিত। স্বদেশ আমার ;
মুখ দেখ ! এই তোর নদী, তোর পবিত্র মুকুর,

কলকাতার খাল ; যাতে আমরা বুক রাখছি জন্মান্তর !
প্রবাহিত মনুষ্যত্ব···নরকের গর্ভের ভিতর ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রক্ত, ভয় এবং সন্দেহ

রক্ত ভয় বিহ্বলতা এবং সন্দেহ
প্রত্যয়ের স্থিরতায় ডুবিয়ে এবার
মগ্ন হব, দৃশ্যে যাব, দূর নক্ষত্রের
অভিষ্ট উজানে।

অতীতের পাণ্ডুলিপিগুলো একধারে
ভূলুণ্ঠিত, এখন কৈশোর
স্মৃতিম্লান, ডুবুরীরা এখন কোথায়!
বিকীর্ণ ধুলোয় পুষ্পাধার
বর্ণহীন, ফুলের কোমল প্রসন্নতা
স্বপ্নভঙ্গে, সন্তপ্ত শিবিরে
কোথাও গভীরে বিমলিন।

সমস্ত প্রহর যেন দূরান্তিক স্মৃতির বাঁধনে
নিঃসঙ্গ দীপের মতো
কেঁপে কেঁপে ওঠে। আবর্ত উচ্ছল
কখনো কখনো:
মন্থিত শব্দের উচ্চারণে।

গাছপালা শান্ত প্রতিবেশী। দীর্ঘকাল
মুক্ত প্রতীক্ষায়
সজ্জিত, উন্মুখ।
অথচ হাওয়ার মুখে এখনো বাচাল
হাহা ধ্বনি, পথের আড়ালে
গোপন হিংসায় আততায়ী
শানায় নিজেকে।

রক্ত ভয় বিহ্বলতা এবং সন্দেহ
প্রত্যয়ের স্থির জলে ভাসিয়ে এখন
আকণ্ঠ নিমগ্ন হব ; যাব দৃশ্যে, যাব অন্তরালে
জলের উজ্জ্বল ধারা সেখানে নদীতে,
অভিষ্ট উজানে ॥

রাম বসু

উত্তরের অপেক্ষা রাখি না

উত্তরের অপেক্ষা রাখি না। নগ্নতট, নির্জন, স্মৃতি, নিজের মধ্যে ফিরে আসা। উত্তরের অপেক্ষা রাখি না। মাটি, তোমার কৃষ্ণ-গোলাপ, নূন ও ব্যর্থতা কপালের উদীপ্ত রচনা। পুষ্পিত বয়ান ধ্বংসের অশীর্বাদে নত। সমুদ্রের নৌকার নাম আনন্দ। শিলালিপি, অনুশাসন নেই বলে দায়িত্ব বড় বেশি। আমি বিশ্বাস করি না মেঘের মসলিনে মোড়া সোনার কৌটো হল বিশ্ব। বরং নিরাসক্ত নিলীমায় নগ্ন আর্তনাদ রেখে যাব।

প্রেতাত্মাকে বয়ে এনেছি আগুনের গোড়ায়। বিপর্যস্ত মানচিত্রে এক তাপস প্রেমিক মারা গেল নক্ষত্রের শীতলতায়। প্রেম ও ইচ্ছায়, আলিঙ্গন ও শৃঙ্খলায় অনেক নষ্ট-মুখ গাছের গোড়ায়। আর গাছ তার অস্তিত্বের প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়েছে জায়মান তামসে। তার বেদনা এত গাঢ় যে উচ্চারিত হলেই ঝরে যাবে। তার চেয়ে সমুদ্র শাঁকের শুভ্র দীর্ঘশ্বাস ঝাঝির অবাধে মুক্ত কর। যেন বুড়ো অন্ধ কাল নিশিথিনীর পায় জলজ্বল করে। যেন বালিয়াড়ির সমগ্রতায় রূপ পায় প্রেমিকের অপরিমিত শব।

যতটুকু ধরতে পারি ততটুকুই জীবন্ত। তা ছাড়া আর সব আধ-ভোলা স্বপ্নের মত অবাস্তব। যা স্পষ্ট নয় তা সঞ্চিত আছে গাছের গুঁড়িতে। জাদুমন্ত্রে গুঁড়ি ফাঁক হয়ে গেলে সেই তাপস তার অবিশ্বাস্য অক্ষি-গোলক ফিরিয়ে দিতে পারে নি কৃষ্ণ-গোলাপকে। স্তবকের শাণিত উচ্ছ্বাস, দুঃখের কল্লোল, যাবতীয় বিভূতি জলস্রোতে সজ্জিত। তাই গোধূলির অরণ্য, নক্ষত্রের আর্দ্র, বীণার আলাপ, নিজের ছায়াকে বয়ে নিয়ে যাব অন্তিমের দিকে। তার জন্যে এত কাতরতা কেন?

ঘোর কেটে যাক। চার পাশের জাল স্বচ্ছ হোক। নিষাদের মুখোমুখি তাকাই। বুকের গুহায় চিরকালীন বৃষ্টি। সে তো পাখির কূজনে তৃষিত নয়। তাই পাতা ঝরার কাল আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। তখনই বলা যায়: কুহকিনী, জয় করতে আমি আসি নি। শিয়রের কাছে এক ভাড় স্বপ্ন রেখে ঘুমাতেও যাই না। নক্ষত্রের শীতলতা ভ্রাম্যমান দেবদূতের চোখের বিস্ফার। আমি কর্ণের মুখ দেখতে পাই।

উত্তরের অপেক্ষা রাখি না। নগ্নতট, নির্জন, স্মৃতি, নিজের মধ্যে ফিরে আসা।

অসীম রায়

হে পদ্মা আমার

(আগরতলায় উড়ে যাবার পর)

দশ হাজার ফুট উচ্চে মেঘের প্রবল বাহার—
সাদা ধব্‌ধবে নীলাভ গোলাপী স্বচ্ছ পাহাড়
যেমনি সরেছে দুচোখ জুড়ানো নিবিড় সবুজ,
আহা কি ভুবনব্যাপ্ত ধানের ধাঁধানো সবুজ!
আর এ কি জল, এ কি বিস্তৃত তরল শোভা,
বুকে পালতোলা বিন্দু বিন্দু নৌকোর সার—

হে পদ্মা আমার!
তুমি কোন কূপমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিময়ী শিখা,
কোন অনির্বাণ স্বপ্ন, শুভ্র গুপ্ত পারিজাত
রৌদ্রেও ঝরে না।

চেক পোস্ট বর্ডার সব ধুয়ে গেছে বিজয়ী সবুজে,
মধ্যে আছে আমাদেরই হৃদয়ের বাদামী বিদ্যুৎ
হে পদ্মা আমার
ঝলকিত যতদিন থাকি।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সিঁড়ি

চতুর্দিকে শব্দিত পৃথিবী।
মাতাল শহর ফাটে বেলেল্লা চীৎকারে;
ফুটবল-ক্রিকেট তর্ক, রাজনীতির নির্লজ্জ ভাঁড়ামি,
কোথাও অরক্ষণীয়া গলা-সাধা রোদসী যৌবন,

বেহালা-বাদক যুবা একই স্বরগ্রামে প্রাণপণ
ছড় টেনে যায় ; প্রতিদিন এক পেশা। জানে অন্তর্যামী,
কত শব্দভেদী বাণ বুকে বেঁধে কাতারে কাতারে।

শব্দের উত্তপ্ত মরু পেরিয়ে উধাও
কোথায় পালাবে ? তুমি যেদিকেই চাও
নেইক নিস্তার। নেই পিপাসার জলের মতন
নৈঃশব্দের কণা ; শব্দ-তরঙ্গের মাতঙ্গ-মাতন
শান্তির কমল-বন পায়ে দলে উন্মত্ত বৃংহনে
মদস্রাবী মত্ত নিষ্পেষণে।

হে রাত্রি, হে নৈঃশব্দের সম্রাজ্ঞী আমার !
তুমি শুধু পারো, জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে সুকৌশলে
ছড়াতে নিশুতি মন্ত্র, ঢেকে নিতে নিদ্রার আঁচলে
এই সব পঙ্গপালে অতলান্ত গহ্বরে আবার।
তোমার দু-চোখে জ্বলে যে বৈদূর্যমণি
শীতল প্রভাবে তার সব প্রাণী হোক বশীভূত।

তৃতীয় প্রহরে স্তব্ধ চরাচরে, পেচকও যখনি
মূষিক খোঁজে না, দেখি দেবতারও ঘুমন্ত করুণ
শান্ত মুখচ্ছবি ; শুধু কবি থাক সেই মন্ত্রপূত
অন্ধকারে জেগে থাক একা একা বানাতে স্বর্গের
অভ্রভেদী সিঁড়ি, যার ধাপ বেয়ে চুরি করে ফের
মর্তে এনে দিতে পারে এক টুকরো চাঁদের আগুন।

গোলাম কুদ্দুস

পানপাত্র

আমার ঘরের দেওয়ালে একটি মাত্র ছবি টাঙানো আছে। তাকালেই চোখে পড়ে, ফ্রেমে আঁটা অনন্ত নীল আকাশ, আর তার মধ্যে স্থাপিত একটি ইরাণী পানপাত্র।

ইচ্ছে করেই এমনভাবে টাঙিয়েছি যাতে জানালা দিয়ে সকালের সোনালী রোদ এসে পড়ে ওর উপর। আমার বিছানাটা এমনভাবে পেতেছি যাতে সকালে ঘুম থেকে চোখ মেলেই ওটা দেখতে পাই, আর রাত্রে ঘুমতে যাওয়ার আগে ওটা দৃষ্টিগোচর হয়।

এটা ছবিটিকে মর্যাদা দান, অথবা, যে-চিত্রকরের কাছ থেকে উপহার পেয়েছি, তার প্রতি আমার ভালোবাসা প্রকাশ? কিম্বা দুটোই জড়িয়ে রয়েছে? ছবিটির যদি মন কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা আদৌ না থাকত, তবু আমি কি কেবল ভালোবাসার টানেই এমনি করে ওটাকে টাঙিয়ে রাখতাম?

শুনেছি ফার্সি কবিতায় সুরা জীবনের প্রতীক, 'জাম' বা পানপাত্র তারই আধার। চিত্রকর আধারকে স্থাপন করেছেন অসীমের মাঝখানে। ওমর খৈয়ামের সাকীরা যেন আকাশের ঘননীল যবনিকার আড়ালে দাঁড়িয়ে পানপাত্রটি এগিয়ে দিয়ে বলছে, ভরে নাও অনাদ্যন্ত অফুরন্ত সুধায়! এই নতুন ব্যাখ্যায় চিত্রকরের বাহাদুরী আছে। কিন্তু সেখানেই তিনি থামেন নি, ছবিটির নিচে কিছুটা 'রুবাই'য়ের ঢংয়ে লিখেছেন—

হাতে মোর ভরা 'জাম' দেখছ,
দুনিয়ার মানা কেন মানব?
যদি কেউ কেড়ে নেয় 'জাম'টা
কেয়ামত আমি ডেকে আনব।

প্রথম প্রথম ছবিটির দিকে তাকালেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠত। ও-যেন প্রতি মুহূর্তে জীবন-উপভোগের বিরামহীন আহ্বান, রসহীনতার বিরুদ্ধে

উদ্ধত ইশারা। ও-যেন প্রেম আর প্রকৃতির গোপন সৃষ্টি রহস্যের চিরন্তন আকুতি।

কিন্তু আজকাল ছবিটি আমাকে তেমন আনন্দ দিতে পারে না। ওটার দিকে তাকালেই মনে একটা সূক্ষ্ম ব্যথার দোলা লাগে। অদৃশ্য সাকীর বদলে আমার লক্ষীছাড়া আর্টিস্ট পরেশের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। বহুকাল তার খোঁজখবর পাইনে। লোকটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে, তা পর্যন্ত জানার উপায় নেই। চিঠি লিখলে উত্তর আসে না।

অবশ্য বিধাতা বোধ হয় পরেশকে ছবি আঁকতে বলেন নি। তিনি তাকে মস্ত এক লোহা কারখানায় কঠিন লোহা গলানোর ভার দিয়েছেন। তাই ভাবি, খোদার উপর খোদকারি কতদিন তিনি সহ্য করবেন? ফার্নেসের আগুনের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পরেশ কতদিন তার শিল্পী সত্তা বজায় রাখতে পারবে? সেই যে 'তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে' বাউল-গান শুনেছিলাম, তা কি পরেশের জীবনে রূপক না হয়ে রূপ নেবে?

উদ্বেগবশত যখনই পরেশের কথা ভাবতে বসি তখন আমার কেবলি মনে হয়, ভিতরের আগুনও তাকে কম ভোগায় নি। কী যে দুরন্ত প্রাণাবেগ তাকে দেশ থেকে দেশান্তরে কর্ম থেকে কর্মান্তরে চালনা করেছে!

পরেশ খুব অল্প বয়সেই মা-বাবাকে হারায়। বাল্যকাল তার অতিবাহিত হয় দাদার কাছে জামসেদপুরে। তিনি ছিলেন সেখানে কারখানার ফোরম্যান।

পরেশদের বাসার কাছেই থাকতেন এক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর স্ত্রী ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। ভদ্রমহিলা নিঃসন্তান ছিলেন। পরেশ তাঁর কাছে পেত অবাধ প্রশ্রয়। সেও তাঁর কাছে বসে প্রতিদিন তাঁর অনুকরণে ছবি আঁকত ফলে ক্রমাগত সে কালি ঢেলে কাগজ ছিঁড়ে একটা দক্ষকাণ্ড বাধিয়ে নিজ শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিত।

একবার জার্মানদম্পতি বোম্বাইয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় পরেশকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে পরেশের সব কিছুইতেই বিস্ময় বোধ হল। কিন্তু সব চেয়ে তার ভালো লাগল সমুদ্রে বেড়ানো। জার্মানদম্পতি একদিন দশ টাকার টিকিট কেটে তাকে নিয়ে জাহাজে করে শখের সমুদ্রবিহারে গিয়েছিলেন।

পরেশ বাড়ি ফিরে যতই তার আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেল ততই লক্ষ্য করল তার দাদা নিজেদের অতীত ঐশ্বর্যের কাহিনী পুনরাবৃত্তিতেই বেশি

সুখ পায়। খুলনা জেলার কোন এক অখ্যাত গ্রামে তাদের বিখ্যাত পরিবারের সেই গৌরবের ভগ্নাবশেষ আজো নাকি বিদ্যমান। অতীতের হাতি ঘোড়া লাঠিয়াল বরকন্দাজ আজ আর নেই, তবে এখনো নাকি মস্ত মস্ত দালানকোঠা এবং জীর্ণ ফাটলের মধ্য দিয়ে ইতিহাস তার প্রমাণ-শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। সে সব একবার স্বচক্ষে দেখে আসার প্রবল ইচ্ছা পরেশের মনে জেগে উঠল। সে কাউকে কিছু না বলে একদিন ট্রেনে চেপে বসল।

কোলকাতায় পৌঁছে হঠাৎ তার বোম্বাই শহর এবং জাহাজ চড়ার কথা মনে পড়ল। জাহাজে ওঠার নেশা তাকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে গঙ্গার ধারে এসে হাঁটতে লাগল। একটা জায়গায় লোকের ভিড় দেখে সে আকৃষ্ট হল। সেখান থেকে লোকেরা সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একটা জাহাজে গিয়ে উঠছে। সেও বিনা দ্বিধায় চড়ে বসল সেই জাহাজে।

কিন্তু জাহাজ আর ফেরার নাম করে না। দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। পরেশ ভয়ে সঙ্কোচে লজ্জায় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না। শুধু লোকের কথাবার্তায় তার মনে হল, এ এক রেঙ্গুনগামী জাহাজ।

টিকিট এবং জরিমানা হিসাবে পরেশকে যা গচ্ছা দিতে হল তাতে তার তহবিল এসে দাঁড়াল শূন্যের কোঠায়। জাহাজের যাত্রীরা তাকে মৌখিক সহানুভূতি দেখাতে কার্পণ্য করে নি, কিন্তু বন্দরে নেমেই কে কোথায় মিলিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরিবেশে পরেশ যখন পদার্পণ করল তখন তার বয়স মাত্র তের বৎসর।

সে বেশ কিছুক্ষণ শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল। তারপর এক সময় একটা বড় রাস্তার মোড়ে ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে তার ভীষণ কান্না পেল। উদ্দেশ্য-হীনভাবে সে হাঁটছে, আর তার দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে অঝোর ধারায়।

এক ব্যক্তি তার কাঁধে হাত দিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, খোকা তোমার কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?

খোকার তাতে কান্না আরো বেড়ে গেল। সামান্য কিছু তথ্য উদ্ধার করে ও বাকীটা অনুমান করে নিয়ে তিনি যখন পরেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সঙ্গে যাবে?

তখন পরেশ সানন্দেই মাথা নাড়ল। পরেশ তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে গিয়ে উঠল।

কেউ কেউ একেই বলেন ভবিতব্য। কারণ এই উদারহৃদয় মানুষটি একজন জাপানী আর্টিস্ট এবং মাত্র সেই দিনই রেঙ্গুনে এসে পৌছেচেন।

তিনি রেঙ্গুনেই স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসলেন। হয়তো তাঁর শহরটা ভালো লেগেছিল, কিম্বা অন্য কোনো কারণ ছিল। অবস্থা তাঁর নিশ্চয়ই স্বচ্ছল। কারণ একদিন দেখা গেল, তিনি পরেশকে জুনিয়ার কেম্ব্রিজে ভর্তি করে দিয়েছেন!

পরেশের সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হল না। কয়েকমাস পরেই জাপানের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখে আর্টিস্ট স্বদেশযাত্রা করলেন। পরেশও চলল তাঁর সঙ্গে।

দেশে ফিরে আর্টিস্টকে যুদ্ধে যোগ দিতে হল। পরেশ তখন পড়ল ফাঁপরে।

অনেক চেষ্টার পর একটা স্টেজ ডেকরেশনের কাজ পেল সে। কেউ যদি ভবিষ্যতে ভারত-জাপান সম্পর্কের ইতিহাস লেখে সে কি খুঁজে দেখবে এক কিশোর বালকই প্রথম ভারতীয় যে জাপানী রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় অংশগ্রহণ করেছিল?

হিরোশিমায় যখন বোমা পড়ে তখন পরেশের সেখানেই থাকার কথা। কিন্তু কী এক কারণে তাকে শহরের বাইরে কাছেই একটা জায়গায় যেতে হয়। বাঁচাটাও যে নেহাৎ অ্যাকসিডেন্ট, এটা তার দৃষ্টান্ত। তবু পরেশই বোধ হয় সেই ভারতীয় নাগরিক যে অ্যাটম বোমা পতনকালে তার সবচেয়ে সন্নিকটে বাস করছিল। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের গবেষণায় কি এ ঘটনার উল্লেখ থাকবে? মনে তো হয় না। সে জাপানপ্রবাসী কোনো বিখ্যাত ভারতীয় নয়। সে বয়সেও ছোট, লোকও ছোট।

অবশ্য সে যদি হিরোশিমায় ভস্মে পরিণত হত তাহলে আজ আমি তার উপর ঘি ঢালার প্রয়োজন আছে বলে ভাবতেও পারতাম না। অখ্যাত অজ্ঞাত বহু আর্টিস্টই হয়তো সেখানে পরমাণুত্ব লাভ করেছে, কে তাদের খবর রাখে?

পরেশ বেঁচে গিয়ে দিব্যি হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। রঙ্গমঞ্চ সজ্জার কাজ করতে করতে তার মনে হল, আলোকসম্পাতের কাজটা ভালো হচ্ছে না। আলোকসম্পাতের কাজ করতে গিয়ে তার মনে হল, ইলেকট্রিকের কাজটা ভালো জানলে অনেক সুবিধে হয়। আর্টিস্ট পাকা ইলেকট্রিসিয়ান হয়ে উঠল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এটাই হল তার কোয়ালিফিকেশন। ওরই জোরে সে থাইল্যাণ্ডে এক বৃটিশ ইলেকট্রিক ফার্মে চাকরী পেল।

সে এবার হাওয়াই জাহাজে রওয়ানা হল শ্যামদেশের উদ্দেশে। কিন্তু পথেই ঘটল বিমান দুর্ঘটনা। যাত্রী এবং ক্রু সবাই মারা গেল, তিনজন শুধু গুরুতর ভাবে আহত হয়ে কোনোমতে রক্ষা পেল। এই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে পরেশ একজন। দেখা যাচ্ছে আমাদের পরেশ ফাটাকপাল নিয়ে না জন্মালেও কপালের জোরে কী করে যেন প্রত্যেকবার বেঁচে যাচ্ছে।

হাসপাতালে গিয়ে নাটকটা আরো জমে উঠল। তিনজন আহতের বাড়ি তিন দেশে। ভারত, বর্মা এবং সিংহলে। পাশাপাশি তিনটি বেডে তিন দেশের তিনজন মানুষ যদি অমন মৃত্যুগহ্বর পার হয়ে কয়েকমাস এক সঙ্গে বাস করে তাহলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের পাকা বনিয়াদ সৃষ্টি হলে অবাক হওয়ার কি আছে? তিনজনই তিনজনকে প্রতিশ্রুতি দিল, আমরা চিরকাল পরস্পরের বন্ধু থাকব এবং পরস্পরের দেশে বেড়াতে যাব।

পরেশকে প্রথমেই টান দিল বর্মা। পিছনের স্মৃতির আলো কি তার সামনের আলেয়া হয়ে দেখা দিল?

বর্মার বন্ধু তাকে বলল, এখানেই থেকে যাও। সেও উত্তর দিল, তথাস্তু। কিন্তু জীবিকা?

কি করে যে তার মাথায় সাবান বানানোর নেশা ঢুকল কে জানে। বর্মার সুলভ এবং সহজলভ্য চালের গুড়ো মিশিয়ে সে এক ধরনের সাবান তৈরি করল। তার দাম শস্তা, অথচ কাপড় ভালো পরিষ্কার হয়। আশেপাশের দোকানদারেরা তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল। সে তাদের অল্প অল্প পুঁজি নিয়ে গড়ে তুলল এক কো-অপারেটিভ। দোকানদারেরা দেখল মালিক এবং বিক্রেতা হিসাবে দু-তরফা মুনাফা। তারা গাছেরও খেতে লাগল, তলারও কুড়োতে লাগল।

কাঠের জন্য বর্মা বিখ্যাত। মস্ত মস্ত বিদেশী বিলেতী কোম্পানি আসর জমিয়ে বসেছে। পরেশের এদের কিছু কিছু কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। তার চালের গুঁড়োর জাদু ভালো লাগছিল না। সে কাঠের কোম্পানিতে একটা চাকরী জুটিয়ে নিল। এই কোম্পানির আফ্রিকার সঙ্গে ছিল 'বার্মিজ টিকে'র ব্যবসা। তারা পরেশকে তাদের এজেন্ট করে পাঠাল মোজাম্বিক এবং আঙ্গোলায়। পরেশ এবার এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে পাড়ি দিল।

কিন্তু কাঠের কারবার কতদিন তাকে ধরে রাখতে পারে? তার সিংহলের

বন্ধুর কথা মনে পড়ল। সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যাত্রা করল সিংহলে।

কিছুদিন লঙ্কাবাসের পর তার মনে হল, যখন দেশের এত কাছে এসে পড়েছি তখন ঘরে ফিরে বন্ধুদের সেখানে নেমন্তন্ন করলে দোষ কি ?

কিন্তু ঘর বলতে তখন আর কিছু নেই। দাদা মারা গেছেন। আর সেই সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সব কিছু।

পরেশ আবার পথে নামল। এবার ভারত-সফর। পায়ে হেঁটে ট্রেনে বাসে মোটরে চেপে উঠের পিঠে সওয়ার হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিমে সে পাড়ি দিল।

ইন্দোর কি উজ্জয়িনীর কোন একটা জায়গায় তার বাহালুল শাহ লোদী নামে এক জহুরীর সঙ্গে রীতিমত আলাপ জমে উঠল। সে লোদীর অ্যাসিসটেণ্ট হয়ে ঘুরতে লাগল নেটিভ স্টেটগুলোতে। রাণীরা অনেক সময় লজ্জা এবং সঙ্কোচবশত বাইরে কোথাও তাদের জহরত বিক্রি করতে চায় না, তারা বিশ্বস্ত এবং বৃদ্ধ জহুরী খোঁজে, তাদের ডেকে পাঠায় অন্দর মহলে। এ-দিক দিয়ে লোদীর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। পরেশও যেতে লাগল তার সঙ্গে সব জায়গায়। এই ভাবে বহু নেটিভ স্টেটের রাজবাড়ির অন্দর মহলের নাড়ি নক্ষত্র এবং বাদ-বিসম্বাদের কথা তার জানা হয়ে গেল।

মধ্যপ্রদেশে কী করে যেন পরেশ ভারত সেবক সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। তার সুপ্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা যা একবার বর্মায় সাবানের কো-অপারেটিভ গঠনে প্রকাশ পেয়েছিল, তা আর একবার অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এমন একটা বিশ্ব ভবঘুরেকে তারা গোটা রাজ্যের ভারত সেবক সমাজের সম্পাদক নির্বাচিত করল। এই সূত্রেই সে অনেক রাজনীতিকের সান্নিধ্যে এসে পড়ল। ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে, জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের মণ্ডপ সাজানোর প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হল তার উপর।

দল থাকলেই দলাদলি থাকে। পরেশ তা জানে কিন্তু মন তার মানে না। ফলে দলের মধ্যেকার ঝগড়াঝাটিতে বিরক্ত হয়ে সে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে লম্বা পাড়ি দিল বোম্বাইয়ে।

সেখানে দেহপোজীবিনীদের এক অন্ধকার পল্লীতে তার আলো জ্বালানোর কাজ জুটল। অর্থাৎ কিনা সে এক পেট্রোম্যাক্স মেরামতের দোকানে চাকরী পেল।

পরেশ অল্পদিনের মধ্যেই পেট্রোম্যাক্সের এমন একটা প্যাটার্ন আবিষ্কার করল যাতে কম তেলে পোড়ে, কিন্তু বেশি আলো হয়। কিন্তু পরেশকে বেঁধে রাখবে কে? একদিন সে প্যাটার্নটা অল্প টাকায় বিক্রি করে দিল। মুসাফির বেরিয়ে পড়ল পথের ডাকে পথের প্রেমে।

ঘুরতে ঘুরতে এল নাগপুরে। কী জানি তার মধ্যে কী গুণ দেখে মুসলমানরা তাকে খুব খাতির করতে লাগল। হয়তো তারা তার লম্বা দাড়ি দেখে মোহিত হয়েছিল! তার প্রতি তাদের বিশ্বাস এমন পর্যায়ে উঠল যে, মাতব্বরেরা তাকে মস্ত এক ওয়াকফ প্রপার্টির মতোয়াল্লি করে দিল। এই সময় থেকেই পরেশ হিন্দী আর উর্দ্দুতে গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখতে শুরু করল। নাগপুরের কাগজগুলোতে তা কিছু কিছু প্রকাশিতও হল। অবশ্য মধ্যপ্রদেশের বন জঙ্গলের নেশাই পরেশকে সব থেকে বেশি পেয়ে বসল। সে ফাঁক পেলেই একা একা অরণ্যসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

নাগপুর থেকেও একসময় তার ডেরা উঠল। সে ঠিক করল যেখান থেকে যাত্রা শুরু সেখানেই যাত্রা শেষ করবে। সে জামসেদপুরে আস্তানা গাড়বে।

পরেশ ট্রেনে চেপে সেখানেই যাচ্ছিল। পথের মধ্যে শুনতে পেল ভিলাইতে এক মস্ত ইস্পাত কারখানা হচ্ছে। তখন তার মনে হল, লোহা কারখানায় চাকরী করেই যখন খেতে হবে তখন নতুন জায়গায় নতুন কারখানাতেই কাজ করা কি ভালো নয়? সে 'দুর্গ' স্টেশনে নেমে পড়ল।

ভিলাইতেই পরেশের সঙ্গে আমার আলাপ।

আমাদের সেই প্রথম আলাপের কথা তোমার মনে আছে, পরেশ?

কে একজন আমাকে বলল, একজন শ্রমিক ভারি সুন্দর ছবি আঁকে, আপনাকে দেখাতে চায়। তা ছাড়া লোকটি এমন কাগজ কেটে কেটেও ছবি বানাতে পারে যে আপনি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

অনতিবিলম্বে তুমি এসে হাজির হলে। তোমার মনে আছে পরেশ, তোমার সাজপোশাক দেখে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—আপনি কি দ্বিতীয় ভ্যানগগ!

তুমি হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলে। তোমার পরণে ময়লা কাপড়, মুখে কালো কুচকুচে দাড়ি। হঠাৎ মুসলমান মোল্লা বলে ভ্রম হয়। শুধু তোমার চোখ দুটি দেখে আশ্বস্ত হওয়া যায়। তাতে বুদ্ধির কী শানিত

দীপ্তি! তুমি হাসতে হাসতেই বললে, আপনারা আমাকে না চিনলেও আমাদের বাসার হিন্দুস্তানী চাকর ঠিকই চিনেছে।

কি রকম?

আমার টেবিলের উপর আছে রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি। চাকরটা এসে পর্যন্ত ওটাকে কেবলি ঘুরিয়েফিরিয়ে দেঁখে। একদিন আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে বল দেখি? সে অম্লানবদনে উত্তর দিল, কেন তোমার ভাই। আমি তাজ্জব হয়ে বললাম, আমার ভাই! সে আমার বিস্ময়কে ভান মনে করে আরো নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, জরুর তোমার ভাই! লেকিন বুড্ডা হো গয়া। আমি বললাম, ভাই কি করে বুঝলি? সে উত্তর দিল, নইলে টেবিলে রেখেচ কেন? তোমার মতোই মুখে দাড়ি! আমাকে হাসতে দেখে সে নিজের কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে প্রশ্ন করল, তোমার ভাই এখানে আসে না কেন? কোথায় থাকে? আমি জবাব দিলাম, সে অনেক দূরে, সেখান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না। চাকরটা নির্বিবাদে বলল, তুমি ঝুট বলছ। অবশ্য চাকরটা এক হিসাবে হয়তো ঠিকই বলেছে। জানেন আমি বাংলাদেশের বাইরে থাকতে থাকতে বাংলা ভাষাটা ভুলতেই বসেছিলাম? রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর জোয়ারে নতুন করে আবার শিখতে আরম্ভ করেছি।

আমি প্রশ্ন করলাম, দাড়ি দেখে এখানকার রাশিয়ান সাহেবরা কিছু বলে না?

দাড়ির উপর তাদের খুব ভক্তি!

সত্যি!

নয়তো কি? আমার দাড়ি দেখেই নিশ্চয় ওরা আমাকে কৃতকর্মা ভেবেছিল। এই যে ভিলাই দেখছেন তার তখন চিহ্নমাত্র ছিল না। তখনো কিছু শুরু হয় নি। আমাকে দেখেই এক রুশ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ক্রেন চালাতে পারেন? আমি বললাম, দু-দিনেই শিখে নেব। তিনি হেসে বললেন, আমিও তাই অনুমান করছিলাম। তাঁরা তখন আমাকে বিশাখাপত্তন—যাকে আপনারা বলেন ভিজেগাপট্টম—সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সোভিয়েত জাহাজ থেকে ক্রেনযোগে যন্ত্রপাতি নামাতে হবে। আমার একার কি সাধ্য? আমি জনচারকে ট্রেনিং দিয়ে ক্রেন-অপারেটর করে নিলাম। জানেন, আমার মতো লোকের হাত দিয়ে

প্রথম দিকে ভিলাই-এর অর্ধেকের বেশি যন্ত্রপাতি ভারতের মাটি স্পর্শ করেছে? তাই আমার মতো ভিলাই কারখানার গোটাটা কেউ বোধ হয় জানে না। আমার কাজে রাশিয়ানরা খুব খুশি ছিল। আমার বহু ছবি তুলে তারা সোভিয়েতের কাগজে ছাপতে পাঠাত। আর তার তলায় ওরা লিখত—একজন ভারতীয় শ্রমিক।

পাশ থেকে একজন ফোড়ন কাটল—কিন্তু কোনো মেয়ে তোমার দিকে এগুবে না বলে দিচ্ছি।

আর একজন বলল, মজার ব্যাপার কি জানেন, পরেশের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ অনেকগুলো এসেছে, কিন্তু ঐ হতভাগা এমনভাবে নিজের বর্ণনা দিয়ে দিয়ে পাত্রীদের কাছে চিঠি লেখে যে, তারা ভয়ে পিছিয়ে যায়।

তুমি তখন দাড়িতে হাত বুলিয়ে সহাস্যে বলেছিলে, শেষে বিয়ের পরে বৌ পালিয়ে যাক, সে আমি চাইনে। এবার থেকে আমার আস্তানাটার চেহারাও মেয়ে আর মেয়ের বাপকে ডেকে দেখাতে হবে। নইলে বৌ যে এসে বলবে, এ কোন নরকের মধ্যে আমাকে নিয়ে এলে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

আমি তখন উৎসাহিত হয়ে বললাম, চল তাহলে আর্টিস্টের ডেরা দেখে আসি।

কিন্তু পথে বেরিয়েই বুঝলাম ভুল করেছি। কী যে রোদের তাপ! তখন ভিলাই-এর টেম্পারেচার ১১৮ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে।

আমার তবু ছাতা ছিল। তুমি চলেছিলে ভ্রূক্ষেপহীন খালি মাথায়। তোমার দিকে ছাতাটা একটু এগিয়ে ধরতেই তুমি সরে গিয়ে বললে, লাগবে না, দরকার নেই।

আমি বোধ হয় একটু হেসেছিলাম। তুমি তৎক্ষণাৎ বললে, জানি কেন আপনি হাসছেন। কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

আমি কি ভাবছি?

আপনি ভাবছেন দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে কষ্টটা আমার কষ্ট বলেই বোধ হয় না! আর আপনার ধারণা আমি ভাবছি, এতদিন যখন আমার মাথায় কেউ ছাতা ধরে নি তখন এই ক্ষণিকের ছায়াদান না হলেও চলবে! কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মন এ-রকম মান-অভিমানে ভরা নয়। আমাকে যে-কেবিনে বসে ক্রেন চালাতে হয় তার নিচে ফার্নেসের উত্তাপ

থাকে ষোল শ ডিগ্রি। তাই বাইরের এই রোদটা আমার তেমন গায়েই লাগে না।

তোমার কথা শুনে মনে হল, এ তো খুবই স্বাভাবিক! কিন্তু এ-রকম যে একটা ব্যাপার থাকতে পারে তা আগে কখনো ভেবে দেখি নি। তোমার কথা শুনে আমার ভারতে কর্মরত শীতপ্রধান দেশের সেই সব বিশেষজ্ঞদের কথা মনে পড়ল যাদের তোমার মতোই অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। জানি না তাদের দেশে ইস্পাত কারখানায় উত্তাপ নিরোধের ব্যবস্থা আরো উন্নত কিনা। তবে আগে কেবলি মনে হত, এই সব শীতপ্রধান দেশের লোকগুলোকে আমাদের দেশে টেনে এনে আমরা যেন এদের অহেতুক এক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। এখন মনে হচ্ছে, ওদের নিজের দেশেও হয়তো এই ধরনের উত্তাপের অনেকখানি সহ্য করতে হয়।

তোমাকে আমি বললাম, তোমাদের ক্রেনের কেবিনগুলো আমি দেখেছি। মাসের পর মাস অত গরমে কাজ করলে মাথা ঠিক থাকে ?

তুমি স্মিত হেসে বললে, আমি তো ঐ গরমে কেবিনে বসে গালিব পড়ে শেষ করলাম। আমি তো ওখানে বসেই আমার যা-কিছু ভাবনা ভাবি, যা-কিছু লেখা লিখি। জায়গাটা আমার বাসার চেয়ে অন্তত নির্জন। কেউ ডিস্টার্ব করতে আসে না।

আমি কী বলব কিছুক্ষণ ভেবে পেলাম না। মনে হল, দুনিয়ায় কত রকম যে আছে! পরে বললাম, উত্তাপের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু ঐ রকম একটা মেকানিক্যাল ওয়ার্ক যেখানে করতে হয়, সব সময় যেখানে ঠিক ঠিক হাত-পা নাড়াচাড়া প্রয়োজন, সেখানে কি করে মাথায় চিন্তা আসে ? আর কাব্যপাঠের এমন মনোরম জায়গা আর হয় না! ওখানে বসে কি করেই বা লেখা আসে, তা আমি ভেবে পাই না। আমাকে তুমি অবাক করে দিয়েছ। তুমি সত্যি বলছ ?

তুমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললে, ঐ তো! ঐ ভুল চার্লি চ্যাপলিনও করেছিলেন! 'মডার্ন টাইমস'-এ তিনি যে-ভাবে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত হওয়ার ছবি দেখিয়েছেন, তা আমার কাছে আদৌ সত্য বলে বোধ হয় না। মেকানিক্যাল ওয়ার্কে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা নিয়ে আর ভাবতে হয় না। তখন মাথা যথেষ্ট ছুটি পায়। অনেক কিছু

চিন্তা করতে পারে। মানুষের ব্রেনের বড় অদ্ভুত ক্ষমতা। একে কিছুতেই খাটো করে দেখানো উচিত নয়। সবই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। চার্লি চ্যাপলিনের অভিজ্ঞতা থাকলে ব্যাপারটা আর একটু ঘুরিয়ে দেখাতেন। অবশ্য যেখানে কাজের চাপ শরীরকে একেবারে অবসন্ন করে দেয় সেখানে অন্য কথা।

আমি খুশি হয়ে তোমাকে বললাম, তোমার অদ্ভুত অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা! আর আমার সব চেয়ে ভালো লাগছে, তুমি সব অবস্থাতেই চিন্তা কর।

তুমি বিষণ্ণ মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, অভিজ্ঞতা যে কত রকমের হল তাই ভাবি। নিজেকে মাঝে মাঝে বলি, গোর্কির জীবনে কি এর চেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছিল?

আমি বললাম, তুমি বুঝি গোর্কির লেখা পড়?

তুমি বললে, হাতের কাছে যা পাই।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এল। আমি বললাম, তাহলে তুমিও কেন গোর্কির মতো নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা লেখ না?

তুমি আমার কথাটাকে আমল না দিয়ে বললে, তা যে সব ন্যাকা ন্যাকা মেয়ের গল্প আজকাল পড়ছি, তার চেয়ে নিজের জীবনী লেখা ভালো। আগে তবু দেশে এক একটা বলিষ্ঠ রোমান্টিক ঘটনা ঘটত। সেকালের বীরেরা কেমন জোর করে বিয়ের আসন থেকে কনেকে সহস্র লোকের চোখের সামনে দিয়ে তুলে নিয়ে যেত। তারপর ঘোড়ার পীঠে চেপে দিত ছুট! এখন সব কেমন যেন মিনমিনে, নির্জীব। আর এই দেখুন প্রায়ই কাগজে পড়া যায়—কলকাতা শহরে বস্তির একখানা ঘরে এক ডজন লোক বাস করছে, উদ্বাস্তুদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, লোক চাকরি পাচ্ছে না শিক্ষা পাচ্ছে না, শিক্ষকদের হাড়ির হাল হয়েছে। কাগজ খুললেই কেবল এই সব। সবদিকে কেবল মেয়েলি কান্না। কেবলি বোঝাবার চেষ্টা কী ভীষণ কষ্টে আছি! আমি পড়ি আর হাসি। এরা একেই বলে দুঃখ আর কষ্ট! তাহলে কেউ হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকে? এদের কারুর মরুভূমিতে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যায় নি, এরা কেউ সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে ওঠে নি। এরা ক-জন বনে-জঙ্গলে সাপ-বাঘের মুখে পড়েছে? এরা কেবল বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরতে জানে। আরে বাবা, উঠে দাঁড়া! ছুটে যা! বিপদের মুখে পড়! তবে তো বুঝি।

তোমার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে আমি আবার বললাম, কিন্তু তুমি তোমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী লেখার কথাটা ভালোভাবে ভেবে দেখো। অনেক কথা বলে ওটাকে যেন চাপা দিতে চেয়ো না।

তুমি এবার বীরত্বের স্বর ছেড়ে দিয়ে কেমন অসহায়ের মতো বললে, কিন্তু আমাদের জীবনের কথা কে শুনতে চায়! এর কি দাম আছে! আমি কে!

আমি বললাম, তুমি যদি আর কিছু না-ও হও একজন সাধারণ মানুষ তো বটে। আর সাধারণ মানুষের জীবনের সৌন্দর্য এবং মূল্য তুলে ধরাই যুগবদলের একটা বড় কাজ। এটা স্বীকার করো তো, সাধারণ মানুষ তার নিজের মূল্য এখনো বোঝে নি বলেই যাবতীয় সমস্যা সমাধান এত কঠিন বলে মনে হচ্ছে? যাক তোমাকে লেকচার দিতে চাই নে।

তুমি বললে, আপনাকে আমি আমার জীবনবৃত্তান্ত কিছু বলেছি, আর কী লেখার আছে? আমাকে বুঝিয়ে দিন!

আমি বললাম, আমার কাছে চালাকী করতে এসো না। আমি কি বলতে চাইছি তা তুমি জানো।

তুমি নিরীহভাবে বললে, সত্যি জানি না।

আমি তখন স্বরগ্রাম একটু উঁচু পর্দায় চড়িয়েই বললাম, তোমার জামসেদপুরের বাল্যকালের অজস্র ঘটনার আমাকে কতটুকু বলেছ, জানো না? আর এ-সব কথা মুখে মুখে কতটা বলা যায়? তোমার বর্মাপ্রবাসের বিচিত্রবার্তা কতটুকু আমাকে দিয়েছ? আমরা শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছি ও-দেশের কিছু প্রবাসী বাঙালীর কথা, কিন্তু একজন কিশোরের চোখে কখনো কি দেখেছি বর্মাকে? কিম্বা ধরো জাপানের কথা। আমি কয়েকজন ভারতীয়ের জাপান-ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়লাম, কিন্তু তুমি তো সেখানে ভ্রমণ করতে যাও নি, তুমি থেকেছ, দেখেছ, লোকের সঙ্গে মিশেছ, জীবিকা অর্জন করেছ, সুখে-দুঃখে কাল কাটিয়েছ। ভেবে দেখ তো সে জীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কত মূল্য। তারপর আছে তোমার সেই হাসপাতালের বন্ধুদের কাহিনী। আফ্রিকার আঙ্গোলা, রাজপুতানার মরুভূমি, নেটিভ স্টেটের রানীদের অদ্ভুত জীবনকথা—সব লিখলে কি মহাভারতের মতো শোনাবে না?

লক্ষ্য করলাম, তুমি খুব নিবিষ্টচিত্তে আমার কথা শুনছ। আমি তখন

উৎসাহিত হয়ে বললাম, আর এই যে নতুন মহাভারত গড়ে উঠছে, তার কথা তোমার মতো লোকেরা না লিখলে কে লিখবে ?

মহাভারতটা কি ?

ভিলাই ! ভিলাই ! এবং ভিলাই-এর মতো আরো অনেক কিছু। চোখের সামনের জিনিসটা দেখছ না ? তুমি কি জানো না সমাজতান্ত্রিক দেশের লোকদের সঙ্গে মিলে এই যে আমাদের দেশের লোকেরা বিরাট বিরাট শিল্প গড়ে তুলছে এবং তাতে আমাদের দুই দেশের কর্মীদের মধ্যে যে মানবিক ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে, তার সাহিত্যিক মূল্য কি হতে পারে ? তুমি কি মনে করো তোমার মতো লোকেরা এখানে শুধু লোহা গালিয়ে তার কর্তব্য সমাপন করতে পারে ? অথচ তোমরা এখানে যারা কাজ করো তারা না লিখলে বাইরে থেকে এসে কে লিখবে ?

তুমি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, সত্যি ঐ রাশিয়ানদের দিয়ে কত কাহিনী যে লেখা যায়। একবার হয়েছে কি, সরস্বতী পুজোর দিন ওদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে। ওরা তো খুব সাজগোজ করে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঠিক সময়ে এসে হাজির। এদিকে ভারতীয় টাইমটেবলের কথা তো জানেনই—বিলম্বিত তালে কাজ হচ্ছে। তখনো পুজোর মণ্ডপে একখানা চেয়ার আসে নি—শুধু চট বিছানো রয়েছে। ফলে সবাই কাচুমাচু। তখন কে যেন ওদের বলল—এ-সব ব্যাপারে মাটিতে বসাই ভারতীয় কাস্টম। "ও ভারতীয় কাস্টম ! ঠিক আছে, ঠিক আছে", বলেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে ময়লা চটের উপরই বসে পড়ল ! জানেন, ভারতীয় কাস্টম শুনলেই ওরা ভয়ে জড়োসড়ো। কেবল ভয় কখন কার মনে আঘাত লাগে !

আমি বললাম, এ-সব খুচরো খুচরো শুনে লাভ কি—তুমি লেখো সব গুছিয়ে। কিন্তু তখন তোমাকে থামানো দায়, তোমার দিল খুলে গেছে। তুমি বলতে লাগলে—ওদের দুর্বলতার কথাও লিখব কিন্তু। কয়েকবার এমন হয়েছে যে, যখন হয়তো ওদের কেউ কিছুতেই একটা মেশিন-পার্ট জয়েন করতে পারছে না, তখন আমাকে এসে বলেছে আমি যেন রাত্রিতে গিয়ে ওদের সাহায্য করি ! যাতে কেউ টের না পায়, কেউ দেখে না ফেলে ! এই লজ্জার মানে কি হয় ? এই সব আমি লিখব কিন্তু।

আমি বললাম, সব লেখো, সব ! কিন্তু লেখো। কিন্তু এর পরেও তোমাকে থামানো গেল না। তুমি বলেই চললে—এক এক সময় ওরা ঠিক

ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করে! নিজেদের মধ্যে কাজের গাফিলতি দেখলে ওরা রাগারাগি করে, শাস্তি দেয়—কিন্তু ভারতীয় কেউ যদি কাজে ফাঁকি দেয় ওরা কিচ্ছু বলবে না, অভিমানে শুধু গাল ফুলিয়ে থাকবে! আর কথাবার্তা বন্ধ করে অন্যের কাজ নিজেরাই করতে শুরু করবে! সেইজন্যই ওদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে কিছুদিন পর কাজের স্রোতে ভেসে না গিয়ে উপায় থাকে না। তখন কম মাইনে বা ভবিষ্যৎ বেকারির ভাবনা আপাতত কিছুই মনে থাকে না। এখানে সব শ্রমিকের এই অভিজ্ঞতা। ওরা খায়ও গাদা-গাদা, কাজও করে ভূতের মতো। বলে, না খেলে এনার্জি আসবে কোত্থেকে? ওদের মেয়েরা বাড়ির সব কাজ করে, বাজার করা ঘর মোছা ছেলে মানুষ করা—সব। অথচ একটা চাকর রাখে না। এত বছর হয়ে গেল, কেউ বলতে পারবে না ভিলাই-এ ওদের একজনের বাড়িতেও কেউ কোনো চাকরবাকর দেখেছে। সব কাজ নিজেরা করে। অথচ সামান্য একজন ভারতীয় অফিসারেরও চাকরবাকর না হলে চলে না। একবার হয়েছে কি শুনুন—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, রক্ষে করো! আর শুনতে পারব না। তোমার লেখা পড়ে বাকিটা জেনে নেব।

তুমি একটু চুপ করে থেকে নরম গলায় বললে, আমি ভেবে দেখব, চেষ্টা করব। কিন্তু আমাকেই শুধু বলছেন কেন? আরো তো কত লোক আছে।

সত্যি কি আছে? হয়তো আছে, হয়তো নেই। বলা যায়? আর আমি কি করে জানব? সেও তো তোমাদের জানার কথা।

এইবার আপনি ফাঁপরে পড়েছেন।

আমি তখন তোমাকে অনেক কথা বলেছিলাম। তুমি তো জানো, শ্রমিকদের মধ্য থেকে বড় শিল্পী সাহিত্যিকের উদয় কেন আমি মনে-প্রাণে কামনা করি। আর এও ঠিক যে, ব্যাপারটা সহজ নয়। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যে কল্পনাশক্তি, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার প্রয়োজন তার সমাবেশ কি দুর্লভ নয়? আর আমাদের শ্রমিকদের যে প্রতিকূল অবস্থায় বাস করতে হয় তাতে এই সমাবেশ প্রায় অসম্ভব। তবে দেশে আজ যখন বৃহৎ শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু কিছু শিক্ষিত শ্রমিক খানিকটা সহনীয় অবস্থায় বাস করতে পারছে, তখন নতুন কিছু আশা করা কি একেবারে অন্যায়?

তুমি বললে, কিন্তু এতে আমার প্রশ্নের জবাব হল না।

আমি বললাম, আমার বলাটা শেষ করতে দাও। লেখকের আর যে-বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন এবং যা না থাকলে আর সব ব্যর্থ হয়ে যায় তা হচ্ছে—স্বাধীনতা। কথাটা এক হিসেবে খুব পুরনো। কিন্তু তুমি তো জানো এই ভিলাইতে সাহিত্যিক-প্রচেষ্টা যে কিছু নেই তা নয়, এখানে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা দেখছি, একটা পত্রিকাও বের হয়েছে। কিন্তু তুমি কি লক্ষ্য করনি, স্থানীয় সাহিত্যিকদের নিজেদের বাস্তব জীবনের কাহিনী লিখতে বললেই বলেন, ওটা বলবেন না, স্বাধীনতা নেই। কেন নেই? কে কেড়ে নিয়েছে! এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব মেলে না। কিন্তু ভূতের ভয়ের মতো 'বস' বা উপরওয়ালাদের অশরীরী আত্মা সবসময় নীচের লোকদের ঘাড়ে চেপে বসে থাকে। এ-কথা অস্বীকার করার উপায় আছে? এটা শুধু ভিলাইয়ের ব্যাপার নয়, সর্বত্রই এই। অথচ ঐ ওপরওয়ালাদের সম্পর্কেই শ্রমিকদের বলার কথা বেশি থাকে—ওদের সঙ্গেই সংঘর্ষ, ওদের উপরেই রাগ এবং ওদের নিয়েই নানা মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা জড়িত থাকে। স্বাধীনতার ওরাই মূর্তিমান প্রতিবাদ বলে অনেকের কাছে প্রতিভাত। সেই ব্যাপারটাই যখন লেখা যাবে না, তখন স্বাধীনতার কথা অনেকের কাছে অর্থহীন মনে হয়। তাদের কাছে স্বাধীনতা থেকেও নেই।

তুমি বললে, খুব সত্যি কথা। কিন্তু—

আমি বললাম, তার আগে তুমি এই কথাটার জবাব দাও—চাকরী হারাবার অদৃশ্য ভয় যাদের অহরহ দুর্বল করে রাখে তাদের কাছ থেকে তুমি কতটা আশা করতে পারো? এ-ভয় দূর করার ব্যবস্থা দরকার—কিন্তু তা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ? এখানে আমি আপাতত একটি মাত্র লোককে দেখছি—আরো হয়ত আছে, আমি জানি না—যার চাকরী হারানোর ভয় নেই। সেই ব্যক্তির কাছেই আমার দাবি। সে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবে কিনা আমি জানতে চাই।

তুমি বললে, আপনি ঠিকই ধরেছেন। চাকরী হারানোর ভয় আমার নেই। আমি এত রকমের কাজ জানি যে, সারা জীবন দেখছি চাকরী আমাকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু তা দিয়েই কি হবে?

আমি জবাব দিলাম, কাজ করার আগেই কি সার্টিফিকেট চাও?

তুমি শুধু হাসলে। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করছিলাম, বেশ কিছু শ্রমিক পথে তোমাকে নমস্কার জানিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, দেখছ তো তুমি কে!

ওরা আমাকে ভালোবাসে।

কেন ?

তুমি এড়িয়ে গিয়ে বললে, বোধ হয় ভালো ব্যবহারের জন্য।

তখনো আমার ধারণা ছিল না যে, ভালো ব্যবহারের মানে হচ্ছে ভিলাই-এর পত্তনকালে এদের অনেককেই তুমি ক্রেন চালাতে তালিম দিয়েছ এবং তারপর তারা চাকরী পেয়েছে।

অবশেষে তোমার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে সব কিছুর উপর যেন ধুলো জমে আছে। চারদিকে এমন বিশৃঙ্খলা এবং অযত্নের ছাপ যাতে মনে করা অসঙ্গত নয় যে, লক্ষ্মীর হাতের স্পর্শ অবিলম্বে দরকার! তোমার সঙ্গীরা বলল, এ তো তবু ভালো দেখছেন, আগের অবস্থা যদি দেখতেন।

কিন্তু আপনারা কি করতে আছেন ? আপনারা কি নন্দীভৃঙ্গির ভূমিকা নিয়েছেন ?

আমরা কি করব ? ডজন ডজন লোক ঘরে ঢুকবে, থাকবে, খাবে, যখন খুশি আসবে যাবে! ভিলাই-এ প্রথম দিকে যদি আসতেন দেখতে পেতেন কী হুলুস্থুল কাণ্ড! হোটেল-টোটেল কিছু নেই, শত শত লোক আসছে চাকরীর খোঁজে, তারা কোথায় থাকবে ? যেখানে সেখানে পথের ধারে তারা পড়ে থাকে। আর আমাদের পরেশবাবুর স্বভাব জানতে পেরে দলের পর দল এসে উঠছে এই আস্তানায়। যার যেমন খুশি সে সেইভাবে ঘরের মেঝেয় তোলা উনুনে রান্না করছে। সে যদি আপনি দেখতেন! ধোঁয়ায় আপনি চোখ মেলতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের পরেশবাবু নির্বিকার। আমরা কি করব বলুন ?

পরেশ, তোমার বন্ধুরা কেউ কেউ আমাকে জনান্তিকে এ-কথাও জানিয়েছে যে, যেহেতু বাসায় রান্নার ভালো ব্যবস্থা নেই সেহেতু তুমি মাসের প্রথম দিকে কয়েকদিন হোটেলে ঢুকে মনের সুখে আহার করো এবং সঙ্গী জুটলে তাদেরও খাওয়াও। আর কেউ টাকা চাইলেই দেদার দান করো। কেউ তোমার টাকা নিয়ে কোনোদিন শোধ করে না, কারণ তুমি ফেরত চাও না। তোমার ফিলজফি খুব পরিষ্কার। টাকা নেই বলেই তো লোকে ঋণ করে এবং তাদের ঘরের উঠোনে হঠাৎ টাকার গাছও জন্মায় না যে ঝাকুনি দিলেই ঝুপ-ঝুপ করে পড়বে আর তারা ঋণ শোধ করবে।

ফেরার পথে তুমি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললে, আমি তিন হাজার

এমন শব্দ জোগাড় করেছি যার হেরফের পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র একই রকম। আমি প্রমাণ করতে চাই, পৃথিবীর মানুষের ভাষার ঐক্য যা ভাবা হয়, তার থেকে অনেক বেশি দৃঢ়। তারা বোধ হয় এককালে একই জায়গায় বাস করত। যাই হোক, ভবিষ্যতে তারা যে একই ভাষা বলবে তা আমি প্রমাণ করতে চাই।

তুমি পৃথিবীর সব ভাষা জানো না কি ?

আমার ভবঘুরে জীবনে দেশ দেশান্তরের মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে ভাষা সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ জন্মায়। সেই থেকেই আমি এ-নিয়ে খাটছি। এ-বিষয়ে আপনি কোনো পরামর্শ দিতে পারেন ?

পারি! তুমি গোল্লায় যাও! নরকের তাপে বসে কবিতা পড়বে, টাকা পয়সা দু-হাতে বিলিয়ে দিয়ে মাসের অর্ধেক দিন আধপেটা খাবে, ঘরকে গোয়ালঘর বানিয়ে পৃথিবীর ভাষা চর্চা করবে—তোমাকে কে পরামর্শ দেবে ? এ-রকম ভাবে চললে কতদিন কাজের যোগ্যতা থাকবে ? স্বাস্থ্যই বা টিঁকবে কি করে ?

তুমি বললে, আমার কক্ষণো অসুখ করে না।

শুনে সত্যি আমার একটু রাগ হল। আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। তখন তুমি বোধ হয় আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বললে, দেখবেন আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা ঠিকই লিখব। কথা দিচ্ছি।

তারপর তুমি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, এই দেখুন, আমার একটা ছোট্ট গল্প, আজই লিখেছি।

দেখলাম জাপানী কবিতা যেমন ক্ষুদ্রাবয়ব ঝিনুকের মতো, তোমার গল্পেও তেমনি জাপানী সংক্ষিপ্ততা বর্তমান। গল্পের নাম 'সমান্তরাল': একটা গাড়ি আর এক গাড়োয়ান। টানছে দুই গরু। টানতে কি পারে ? গাড়োয়ান চাবুক মারে। গাড়ি ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মিশিয়ে যায় দিগন্তে। পিছনে রেখে যায় দুটি চাকার দাগ। ওরা কোনো দিন মিলবে না।

কোলকাতায় ফিরে এলাম।

তোমাকে পত্র লিখলাম। উত্তর নেই। আবার লিখলাম, আবারও তুমি নিরুত্তর। ভাবলাম, এও বুঝি এক প্রকারের সমান্তরাল! কিন্তু আমার পত্র-চাবুক খেয়ে তোমার নট-নড়নচড়ন, এই যা পার্থক্য।

শেষে আমি লিখলাম, যদি উত্তর না আসে তাহলে তোমার ঐ ইরাণী পানপাত্র আমি দেওয়াল থেকে টেনে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব কিন্তু !

তখন তোমার উত্তর এল। তুমি লিখলে—'জাম'টা দেওয়াল থেকে নামিয়ে রাখতে চাইছেন। মনের দেওয়াল থেকে নামিয়ে রাখতে পারবেন কি ? মানুষের জীবনের ঘটনাগুলো সুখের বা দুঃখের যাই হোক না কেন, স্মৃতি হয়ে মাঝে মাঝে সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াবেই।

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'তোমাকে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি বলেই অমন অনুরোধ করেছি।' আপনার ভালোবাসা আমার কাম্য, কিন্তু আপনার শ্রদ্ধা আমি চাই না। চাই স্নেহ। আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

কঠিন কাজ করার পর লেখার সময় কম। পরিবেশও ভালো নয়। তাছাড়া ছোটবেলার ঘটনাগুলো গুছিয়ে লিখতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। আমি আজ পর্যন্ত কথার খেলাপ করিনি। লেখা নিশ্চয়ই পাঠাব।

এরপর তুমি পুনশ্চ দিয়ে লিখেছ—বিয়ের কথা এখনো পাকা হয় নি। তবে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আবার কিছুকাল তোমার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আবার কয়েকটা পত্রাঘাতের পর উত্তর এল :

আপনার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি এবং আপনার কথা মতো আরম্ভও করে দিয়েছি। কিছুদিনের মধ্যেই অল্পসল্প করে লিখে পাঠাব। তাড়াতাড়ি লিখে পাঠানো সম্ভব হবে না। কারণ আপনার অজানা নয়। কতটুকুই বা সময় পাই। আগুনের সাথে লড়াই করে লিখতে হবে।

কয়েকটা ঘটনা আপনাকে জানাব না। কারণ অনেক। তবে সেই ঘটনার জন্য লেখার বিশেষ পার্থক্য হবে না। সম্ভব হলে ঘটনাগুলো অন্যের মারফত প্রকাশ করব।

কি ভাবে আরম্ভ করা যায় বলুন তো ? একেবারে ছোটবেলা থেকে ? একটু বুঝতে পারার সময় থেকে লিখব ? একটু একটু বুঝতে পারার সময়কার ঘটনাগুলো অস্পষ্ট হবে। তার মধ্যে যতটা মনে পড়ছে ততটাই লিখব—না, অস্পষ্ট অংশটুকুও লিখব ?

ভালো কথা, আমার দেওয়া উপহারটা সম্পর্কে কলকাতাবাসীর মতামত কী ? কলকাতা বাংলা সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির কেন্দ্র। তাই আমি জানতে চাই ঐ ধরনের শিল্প সম্বন্ধে বাঙালীদের মতামত !

এই কদিনে আরো কতকগুলো রুবাই লিখে ফেললাম। কলকাতা গেলে পড়ে শোনাব। চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে উত্তর চাই।

পরেশ, তুমি সাথে সাথেই উত্তর পেয়েছিলে। কিন্তু প্রত্যুত্তর দাও নি! কয়েক মাস পরে তোমার এক অনবদ্য পত্র পেলাম :

অন্যায় হয়েছে, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। আপনার পর পর দুটো চিঠির আমি জবাব দিই নি। তবে মনে এখনো ভরসা আছে, উত্তর না পাওয়ায় আপনি শুধু রাগই করেছেন, এবং কারণ জানতে পারলেই আপনি ক্ষমা করবেন।

প্রথমত, আপনি ভালোভাবেই জানেন, আমি এক কাজের মানুষ নই। যদিও কাজগুলো খুব মহত্বপূর্ণ নয়, তবু করতে হয়। আমি যা করি দেশের জন্য করি—তা নয়। আশেপাশে যারা আছে, যাদের নিয়ে আমার বর্তমান কাটছে, তাদের ছোট ছোট অভাব অভিযোগ সমস্যার সমাধান আমাকেই করতে হয়।

যেমন, অফিসাররা মাইনে বাড়ান না, থাকার ঘরের বন্দোবস্ত করেন না, আরো অনেক কিছু করেন না, বা প্রাপ্য অধিকার দেন না, যা অনায়াসেই দিতে পারেন। দেন—একটু ভুল করলেই চার্জশীট! আর আমাকে দিতে হয় তার উত্তর লিখে।

আমরা মানুষ। সময়ে অসময়ে ভুল হবেই। ভুল হয় নানা ধরনের। চার্জশীটের ক্ষেত্রফলও ছোট বড়। তার উত্তর হরেকরকম।

ছুটি। একটা সমস্যা। সবাই ছুটি চায়—পায় না। তারও দরখাস্ত আমাকেই লিখে দিতে হয়। আর এই ছুটির জন্য দরখাস্ত লেখায় আমার থাকে আপত্তি। কারণ—কারণ লিখতে হয়—মিথ্যা কারণ।

তাহলে একটা মজার গল্প বলি। আজ পর্যন্ত আমি যতগুলি ছুটির আর্জি লিখেছি তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ কারণ দেখানো হয়েছে মা-বাবার অসুখের। প্রিয়ার অসুখের কথা কেউ উল্লেখ করে না। একবার এক মজদুর ছুটি নিল মা মারা গেছেন বলে। দ্বিতীয়বার ছুটির আর্জি করল ঐ একই কারণে। অফিসার যখন জিজ্ঞাসা করল, তোমার মায়ের মৃত্যু তো একবার হয়েছে?

লোকটা রেগে জবাব দেয়—আমাকে বলছেন কেন? বাবাকে গিয়ে বলুন। তিনটে বিয়ে করতে কে বলেছিল?

আর একটা ভার আমার উপর এসে পড়েছে। না কাঁধ থেকে নামাতে পারছি, না বইতে পারছি। কোনোমতে পা সামলে চলছি। দেখা যাক কতদূর বওয়া যায়। যারা ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল তাদের কয়জন ইণ্টারভিউ পেয়েছে স্থায়ী চাকরির জন্যে। ঘর থেকে তারা যে পুঁজি নিয়ে এসেছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে কয়েকদিনের মধ্যেই। এদিকে ইণ্টারভিউ-এর ফলাফল এখনো বার হয় নি। ফলে আগে আমার ঘর ছিল সরাইখানা, এখন হয়েছে—এতিমখানা।

কিন্তু আমি হাতেম নই। না যিশু, যে এক টুকরো রুটি দিয়ে হাজার লোকের পেট ভরাবে। কৃষ্ণ হলেও কথা ছিল—দ্রৌপদীর হাড়ি ভরে দিতাম। আমি এক সাধারণ মানুষ—সহনশক্তি সীমিত।

তালি-দেওয়া জুতো, রিপু-করা প্যাণ্ট, হাতে সেলাই করে মেরামত-করা শার্টের দিকে যখন চোখ পড়ে, চেয়ে চেয়ে ভাবি—আমার ভবঘুরে জীবনটাই ছিল ভালো। অনেক সময় মনে হয় এই বিপদ থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে; ফকির হওয়া না হয় আমীর। কিন্তু তাতেও বিপদ কম নয়। মাল হাতে মসজিদের সামনে আস্তানা গেড়ে বসলেও মালের উপর নজর ঠিকই থাকবে। তা ছাড়া সৌন্দর্য সেখানেও বর্তমান। যেখানে মাল (অর্থ) ও সৌন্দর্য বর্তমান, সেখানে ষড়রিপুর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। তখন দাড়ি ছিড়বে পাবলিক।

আমীর হলেও একদিন দাড়ি চেপে ধরবে পাবলিক। বলবে—মাল জমিয়েছে, কালাবাজার করে, এর মুখে চুনকালি মাখাও! চাকরি করে আমীর হলে বলবে—ঘুষের মাল, শালাকে ঘুষি মারো। এতদূর এগুতে যদি পাবালক অক্ষম হয় ঘৃণায় নাক সিঁটকে ছারপোকার জাতে নামিয়ে দিয়ে বলবে, রক্তচোষক!

বর্তমানে আর এক নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে। আমি লীডর (নেতা) হয়ে গেছি। এই পথ ধরে আমীর হতে পারলে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আরামে থাকা যায়। সম্মানও আছে। তবে বিপদও আছে। বড় পিছোল। মাঝে মাঝে কাঁটা-মনসা গাছ বাঘের থাবার মতো উঁচিয়ে আছে। তবে একটু হিসেব করে চললে ব্যাঙ্কে সহধর্মিনীর নামের খাতায় অঙ্ক বাড়ে। মরলে পাবলিক পীর বলে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে। জন্মদিনে মালা চড়ায়। সাকরেদরা চিৎকার করে গুণ গায়। যেন ট্রেনের ফেরিওয়ালা—দু-পয়সার চেষ্টা।

আমি লীডর নই। আমায় রাতারাতি করা হয়েছে। এই লীডারি বোঝাটা আমার মাথায় কেন চাপানো হয়েছে—কারণ আমারই অজানা। আমার বর্তমান অবস্থা—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

আর একবার বলছি—আমি লীডর নই। হতে চাই না। আমি পড়তে চাই। লিখতে চাই। আঁকতে চাই। কাগজ কাটতে চাই। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে চাই। শান্তি চাই।

আপনি যে কাজের ভার আমাকে দিয়েছেন, কাজ কিন্তু বন্ধ নেই। চলছে, তবে ঢিমে তালে। যদিও অনেক কারণ বলেছি, কিন্তু এখনো আসল কারণ বলা হয় নি। আসল কারণ হচ্ছে—চোখ। প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল—একটা ছোট গরম লোহার মসচার (moister) চোখে পড়েছিল, যার জন্যে বেশ কষ্ট পেলাম। এখন অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু বেশি লেখাপড়া করা ডাক্তারদের বারণ। চিকিৎসা শেষে চশমা নিতে হবে।

অনেক লিখলাম। এবার চোখকে একটু বিশ্রাম দি। টনটন করছে। হয়তো এক্ষুনি মাথা ধরবে।

আশা করি আপনি ভালো আছেন। দেরি করে চিঠি লেখার জন্য আপনি যেন দেরি করে উত্তর পাঠাবেন না। উত্তর তাড়াতাড়ি চাই। এটা ছোট ভাইয়ের স্নেহের দাবি।

পরেশ, এই তোমার শেষ পত্র। শেষ পত্র? সত্যিই কি তাই? মন একে কিছুতেই শেষ বলে মেনে নিতে রাজী হয় না। তোমাকে এর পর অনেক পত্র লিখেছি—এক বছর কোনো জবাব নেই। লক্ষ্মী ভাই, স্তব্ধ হয়ে থেকো না, সেখানেই থাকো যেভাবেই থাকো সাড়া দাও। তোমাকে আমি কিছু লিখতে বলব না।

অথচ যে লোকের মধ্যে থাকে, তাদের জন্য কাজ করে, তাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তাদেরই তো লেখা উচিত। কিন্তু লোকের দাবি মেটাতে মেটাতেই সময় এবং উৎসাহ নিঃশেষ হয়। এর সমাধান আমি কি করে দিতে পারি?

পরেশ, 'মানস-মুকুল' যদি আগুনে পুড়েই যায়, তবু বলব তুমি বেঁচে থাক, সুখী হও। কারণ আমি জানি এই সমাজ বহু প্রতিভার সমাধিস্থল।

আর যদি শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠেলে ফেলে উঠতে পারো?

সুশোভন সরকার

সংশোধন-পুনরাবৃত্তি-সম্প্রসারণ

মার্কস্‌বাদী চিন্তার ইতিহাসে অন্তর্দ্বন্দ্ব একটা লক্ষণীয় ব্যাপার, ডায়ালেক্‌টিকাল অন্তর্বিরোধ থেকে পার্টির অগ্রগতি পর্যন্ত রক্ষা পায় নি। 'শোধনবাদ' নামে একটি শ্রুতিকটু শব্দ সম্প্রতি খুব প্রচলিত এবং মস্কো-বিবৃতির একটা অংশের উপর বিশেষ জোর দিয়ে অনেকে বিনা প্রশ্নে বলে থাকেন যে সেটাই হল প্রধান বিপদ, তাকে খণ্ডন করাই কমিউনিস্ট মহলের আজকের দিনে চরম কর্তব্য। এটা-ওটা-অন্যকিছু হল শোধনবাদী মতামত, হামেশাই এমন কথা শোনা যায়। অথচ শোধনবাদ বস্তুটি কি তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না, শব্দটা হয়ে দাঁড়ায় গালাগালির ব্যাপার। 'মতান্ধতা' আর একটি সংজ্ঞা, তার সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু ১৯৬০ সালে মস্কো-বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে এই বিপদ কোনও কোনও অবস্থায় প্রধান সমস্যা হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য অনেকের বিশ্বাস যে এটা তেমন কিছু আশঙ্কার কারণ নয়, সাধারণ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র। সুতরাং এ-ও এক সম্ভাব্য বিচ্যুতি এই পর্যন্ত স্বীকার করে তাঁরা ক্ষান্ত থাকেন, তার পর 'প্রধান শত্রু' নিপাতে হয়ে ওঠেন উত্তেজিত। ১৯৬০-এর বিচার ১৯৬৩ সালেও যে অচল না থাকতে পারে এমন সন্দেহ পোষণ করলে নাকি মস্কো-বিবৃতি লঙ্ঘন করা হল, চীনা নেতৃত্ব সরবে তাই প্রচার করেন। বিবৃতির অন্যান্য অংশ যে তাঁদের দ্বারাই লঙ্ঘিত হচ্ছে এ-সম্বন্ধে অবশ্য নীরব থাকাই তাঁরা ভাবেন বুদ্ধিমানেব কাজ। একদেশদর্শিতা যে ডায়ালেক্‌টিকাল দৃষ্টির পরিপন্থী, প্রবীণ অভিজ্ঞ নেতারা পর্যন্ত জেদের বশে অথবা স্বার্থের তাড়নায় সেই সহজ সত্যটুকু ভুলতে বসেন।

মার্কস্‌বাদ এক নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম, মার্কসের অনুগামীদের মনের মধ্যেও অবিরাম লড়াই চলে কোনটা সঠিক নীতি, কোনটাই বা বিকৃতি এই নিয়ে। এজন্য দুঃখ করা অসঙ্গত, বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলার প্রকৃতিই এরূপ। কিন্তু ক্ষোভ স্বাভাবিক, যখন দেখা যায় যে মার্কস্‌বাদের অতি-সরলীকরণ পদে পদে

সামনে এসে দাঁড়ায়। ইংরাজিতে একেই বলে vulgarisation, যার বিরুদ্ধে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বরাবর লড়ে এসেছেন। আন্দোলনের উত্তেজনায় সাধারণ-মানসে খানিকটা অতি-সরলীকরণ অনিবার্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিষেধক থাকা উচিত চিন্তাশীল মনে, চিন্তার অনুশীলনে। বিশ্লেষণী চিন্তার এই অভাবটাই দেশে দেশে বার বার উপস্থিত হয়, ফলে মার্কস্‌বাদে এসে পড়ে জড়তা। কর্তৃস্থানীয়েরা চিন্তার জড়তার প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, কারণ তাতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সহজ হয়। প্রশ্ন ও আলোচনার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বাঁধাবুলির আশ্রয় খোঁজা নিশ্চয় অনেক বেশি নিরাপদ। অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুললে তাকে গালমন্দ দিয়ে নিবৃত্ত করলে, তার উপর নিন্দাসূচক একটা তকমা এঁটে দিতে পারলে মানসিক পরিশ্রম থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দুই

ইতিহাসের ছাত্র মার্কস্‌বাদে তিনটি ঝোঁক লক্ষ্য করে থাকবেন, তাদের নাম দেওয়া যাক সংশোধন, পুনরাবৃত্তি এবং সম্প্রসারণ। প্রচলিত শব্দ শোধনবাদের সারমর্ম হল সংশোধন—অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে মার্কস্‌তত্ত্বের মূলনীতিগুলি কিম্বা কোনো কোনো মূলসূত্র সংশোধিত করবার প্রয়োজন হয়েছে, কারণ পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে তার মধ্যে গলদ ছিল, কিম্বা সূত্রবিশেষ সেকেলে হয়ে পড়েছে। আজ যাকে মতান্ধতা বলা হয় তার সারকথা হল পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ আগেকার কোনো সিদ্ধান্তকে আজকের দিনে জোর দিয়ে আবার বলা, বিশ্বাস করা যে আলোচ্য অবস্থায় পরিবর্তনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বিচার বিশ্লেষণের পর পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করার নাম সম্প্রসারণ, কিন্তু তার বিশেষত্ব হল এই মত যে মূলসূত্র পরিবর্তিত করতে হয় না, বদল আসে প্রয়োগনীতিতে, বাহ্যিক প্রকাশে, বাস্তব অবস্থার অনুযায়ী কর্মপদ্ধতির মধ্যে। পারিপার্শ্বিক জগৎ যেহেতু এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, বিশ্লেষণী শক্তি যেহেতু গভীরতর হওয়াটাই স্বাভাবিক, সেই জন্য গত দিনের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার বার বার আবশ্যক হয়ে পড়ে। সম্প্রসারণের মধ্যে লজ্জার কিছু নেই, কারণ বিজ্ঞান গতিশীল এবং মার্কস্‌বাদের দাবি হল বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম্ গৌরবজনক এই সংজ্ঞাটুকু। মার্কস্‌বাদ ভাবাবেগ মাত্র নয়।

মার্কস্‌বাদকে বিজ্ঞান বলে মানতে হলে সম্প্রসারণ একটা অবশ্যম্ভাবী এবং আবশ্যিক ঝোঁক, এর অভাবে তার গতিপথ হবে অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

আমরা দেখতে পাই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসছে থিওরি বিশেষের পতন অভ্যুদয়, প্রাকৃত অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে আসে ব্যাখ্যার পূর্ণতর বিন্যাস। এতে করে বিজ্ঞান অশুদ্ধ হয়ে যায় না, কারণ বিজ্ঞানের সারসত্য হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বিচারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। থিওরির অদলবদলে বিজ্ঞানের মূলসূত্রের ক্ষতি হয় না, ক্ষতি আসে যখন বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিটাই বর্জিত হতে থাকে, যেমন যদি আমরা বাহ্যিক জগতের ব্যাখ্যায় অপার্থিব যুক্তিবিচার-বহির্ভূত অলৌকিক প্রসঙ্গের আশ্রয় নিতে থাকি। মার্কসীয় সম্প্রসারণেও তেমনি থিওরি বিশেষ, সাময়িক সিদ্ধান্ত, বিশিষ্ট যুগোপযোগী নির্দেশ পরিত্যক্ত হতে পারে অবস্থা পরিবর্তন কিম্বা গভীরতর জ্ঞানের ফল হিসাবে। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল বিশ্বাস তাতে বর্জিত হয় না, ঠিক যেমন বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ বিজ্ঞানকে ব্যর্থ বা সেকেলে প্রমাণ করে না।

মার্কস্‌বাদের প্রাণশক্তি হল এই সম্প্রসারণের ঝোঁক। কিন্তু পরিবর্তন যখন মূলনীতি, বিচারপদ্ধতি বা মৌলিক দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সেটা আর সম্প্রসারণ থাকে না, হয়ে ওঠে সংশোধন। আর কোনো কিছু বদলাতে গেলেই যখন গেল গেল রব ওঠে, মূল দৃষ্টি ও বিশেষ সিদ্ধান্ত যখন একাকার হয়ে যায় তখন আমরা দেখি পুনরাবৃত্তিকে। সম্প্রসারণ মার্কস্‌বাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বলে সংশোধন এবং পুনরাবৃত্তি দুটিই হল বিরোধী ঝোঁক অর্থাৎ মূল মার্কস্‌তত্ত্ব থেকে বিচ্যুতি। মার্কস্‌বাদের গোটা ইতিহাসে এই উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চলে এসেছে। এর মধ্যে একটাকে প্রধান বিপদ বলাটাই অবৈজ্ঞানিক ও অসঙ্গত। তেমন সংজ্ঞা আসে যখন শুধু বৈষয়িক কারণে আপস করতে হয় নিছক ঐক্যের খাতিরে। ঠিক এক মুহূর্তে অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্য একটিকে প্রধান বিপদ বলে গণ্য করতে হতেও পারে, কিন্তু পরক্ষণেই অপরটির মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়া খুবই স্বাভাবিক। মার্কস্‌বাদকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে রাখতে হলে উভয় বিপদ সম্বন্ধে সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। একটির বিপক্ষে অভিযান সীমাবদ্ধ রাখলে অপরটির মধ্যে গিয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

অতি-সরলীকরণের অবাস্তবতা আমরা এর মধ্যেই দেখতে পাই। আসলে পুনরাবৃত্তি বা মতান্ধতা একটা প্রতিরোধ-প্রবৃত্তি। তার আপত্তি পরিবর্তনেরই বিরুদ্ধে, সে-পরিবর্তন সংশোধন হোক বা সম্প্রসারণ হোক এ-বিচার আর তখন থাকে না। তার কাছে সংশোধন সম্প্রসারণ দুই-ই শোধনবাদের

কালিমায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। মার্কস্‌বাদের প্রামাণিক সাহিত্য থেকে তখন সংশোধনের প্রতিকূল সমস্ত সমালোচনা সযত্নে উদ্ধৃত করে সজোরে প্রচার হতে থাকে। সেই প্রামাণিক সাহিত্যের যে সবটাই পাঠ করে বিচার করতে হবে, এ-কথা আর কে মনে রাখে। তার অপর অংশে যে বিপরীত যুক্তি আছে সে-কথাটুকু অনভিজ্ঞ লোকের কাছে চেপে গেলেই হল। অতি-সরলীকরণে মার্কসীয় বিজ্ঞানের এই অধঃপতন একটা প্রধান বিপদ নয়, এই কথাটাই হাস্যকর।

অতি-সরলীকরণের অপর প্রধান বিপদ সংশোধন। সংশোধন প্রয়োজনীয় মনে হওয়া মাত্র সব কিছুই পরিত্যাজ্য মনে হতে থাকে। তখন আক্রমণ চলে শুধু পুনরাবৃত্তির উপর নয়, সম্প্রসারণে যে মৌলিক দৃষ্টি অনুসৃত হয়, তার উপরও আঘাত পড়ে। Doubt everything এই মন্ত্রে সব কিছুই অবিশ্বাস করা হয়, মূলসূত্র কেন পরিত্যাজ্য, কিসে অবৈজ্ঞানিক সে-বিচারটুকুরও অবসর থাকে না। বিশুদ্ধ অজ্ঞেয়বাদে কোনো কিছুই প্রমাণ করা চলে না, বিমূর্ত তর্কের রাজ্যে বিজ্ঞানকেও উড়িয়ে দেওয়া যায়—এ-সব তখন বিস্মৃত হতে হয়। সংশোধনী বৃত্তি অবশ্য সাধারণত বিশেষ কোনও মূলতত্ত্বকে বর্জন করতে পারলেই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু যেহেতু বিশিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিতে মূলতত্ত্বগুলি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট তাই একটি ত্যাগ করলে অপরের যাথার্থ্যও শিথিল হয়ে আসে।

অতি-সরলীকরণের আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সংশোধনী প্রবৃত্তিটাই সুবিধাবাদ, এমন কথার রেওয়াজ আছে। মার্কস্‌বাদী অর্থে সুবিধাবাদ হল সাময়িক কোনও স্বার্থের সন্ধানে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন করা। স্পষ্টতই বোঝা যায় উপরোক্ত উভয় বিচ্যুতিই সুবিধাবাদে পরিণত হতে পারে। মতান্ধ পুনরুক্তিতেই যে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আহত হবে না, এমন কথা কেন বিশ্বাস করতে হবে? সংকীর্ণতার পাঁকে পড়লে সম্ভাব্য মিত্রশ্রেণী বা গোষ্ঠীকে হারাতে বসলে সামগ্রিক স্বার্থ কি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়? অথচ শোধনবাদ=সুবিধাবাদ, এই সমীকরণ কি প্রচলিত নয়?

তারপর শোনা যায় সংশোধনী ঝোঁক হল প্রতিক্রিয়াপ্রবণ সংস্কারসর্বস্ব রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থা, আর তার বিপরীত অবস্থানমাত্র হল প্রগতি-মার্কা বিপ্লবী প্রাগ্রসর বামমার্গ। অথচ লেনিন যখন মার্কস্‌বাদ সম্প্রসারণ করে সাম্রাজ্যতন্ত্র-অধ্যুষিত জগতে রুশবিপ্লবের প্রস্তুতি ও সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন

তখন কাউট্‌স্কি প্রমুখ প্রতিপক্ষের আপত্তি ওঠে এই বলে যে মার্কসের নীতি সংশোধিত হতে চলেছে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'গোঁড়া' মার্কস্‌বাদীর, পুনরাবৃত্তির। তাঁরা বলতেন অনগ্রসর দেশে শ্রমিক-বিপ্লব সম্ভব নয়, চাষীদের উপর নির্ভর করা চলে না, মার্কস্ কখনই পূর্বাঞ্চলে বিপ্লব শুরু হবার কথা ভাবেন নি, ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠিত মার্কসীয় মহলে যে-সম্ভাবনা কল্পিত হয় নি, সেদিন তাকে সংশোধনবাদ আখ্যা দান অস্বাভাবিক ছিল না। সংশোধন কেবল দক্ষিণ থেকে আসতে পারে, এ-ই বা কেমন কথা? মূলনীতিকে বামদিকে বিকৃত করা সমানই সম্ভব। বিপ্লবের সংজ্ঞাটাকেই ধরা যাক। মার্কস্‌বাদে বিপ্লবের মৌলিক অর্থ হল বিরাট ব্যাপক দ্রুত পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর। অগ্রগতির বেগ স্বভাবতই অসমান, পরিবর্তন ধীরে ধীরে হতে থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ এক লাফে অনেকটা পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয়, বিপ্লবের স্বরূপ হল এই। বাস্তবে ঠিক কি উপায়ে বিপ্লব আসবে সেটা কিন্তু মূলতত্ত্বের অন্তর্গত নয়, কারণ সে তো নিশ্চয় নির্ভর করবে বিশেষ অবস্থার উপর। অথচ এই মার্কসীয় বিশ্লেষণকে বাম দিকে সংশোধন করে অনেকে বলেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহ অথবা প্রকাশ্য যুদ্ধ অর্থাৎ অস্ত্র-প্রয়োগ ভিন্ন বিপ্লব আসতে পারে না। মার্কস্-এঙ্গেলস্ ভেবেছিলেন পশ্চিমের কোনও কোনও উন্নত অসামরিক গণতান্ত্রিক দেশে গৃহযুদ্ধ বিনা বিপ্লব সম্ভব; সাম্রাজ্যতন্ত্রের পৃথিবী শাসনের দিনে লেনিন বললেন বিপ্লব সশস্ত্র হবে; লেনিনোত্তর যুগে যখন সমাজবাদী শিবির প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে তখন আবার বিনাযুদ্ধে বিপ্লবের সম্ভাবনা আসছে—এর মধ্যে মৌলিক অসঙ্গতি কোথায়?

তাছাড়া তীব্র বামপন্থী বিপ্লবমার্গ সরাসরি মার্কস্‌বাদকেই ব্যাহত করতে পারে, ইতিহাসে এ-দৃষ্টান্তেরই কি অভাব আছে? শ্রমিক আন্দোলনে ব্লাঙ্কির নির্বিচার বিদ্রোহতত্ত্বের বিপক্ষে স্বয়ং মার্কস্‌কে কি দীর্ঘ সংগ্রাম চালাতে হয় নি? বাকুনিনের বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদকে কি মার্কস্ কখনও ক্ষমা করতে পেরেছিলেন? মার্কস্-এঙ্গেলস্ কি সংস্কারসর্বস্ব লাসালী দক্ষিণপন্থা থেকে তাকে কম পরিত্যাজ্য মনে করতেন? এনার্কো-সিণ্ডিকালিজম্-এর উগ্র বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে স্তালিন কি তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী পরিচালনা করেন নি? শিশুসুলভ বামপন্থী কমিউনিজম্‌কে লেনিন কি তর্কে ছিন্নভিন্ন করে দেন নি? গোঁড়া মার্কস্‌বাদের নামেই তো ট্রট্‌স্কির বামপন্থা লেনিন-স্তালিনের একদেশে

সমাজতন্ত্র গঠন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বৈদেশিক নীতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আর আজকের দিনে চীনা বিপ্লববাদই তো নতুন দিনের আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে ভেদসৃষ্টি করে চলেছে। বামপন্থা= মার্কসবাদ এই সমীকরণও তাই অগ্রাহ্য।

অতি-সরলীকরণের চাপে এ-কথাও শুনি যে সংশোধনই হল বুর্জোয়া ইডিওলজির প্রমাণ। কিন্তু লেনিন কি বার বার দেখান নি যে অতি-বিপ্লববাদও সেই ভাবধারার আর এক প্রকাশ? পেটিবুর্জোয়া মহলে অতি-বিপ্লবী কথাবার্তা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। নিছক বিপ্লবী আস্ফালনে মার্কস্ কখনই পথভ্রষ্ট হতেন না, সংস্কারসর্বস্বতার মতন এ-ও তাঁর পরিত্যাজ্য ছিল। আসলে অতি-দক্ষিণ ও অতি-বাম মতামত কোনোটাই মার্কস্‌বাদ নয়। বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এই দুই আপাতবিরোধী দৃষ্টি সমগোত্রীয় বলে প্রতিপন্ন হতে পারে, দুই বিচ্যুতির সঙ্গে সমান ভাবে লড়তে হয়, এই হল মার্কস্‌বাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। অতি-সরলীকরণের মোহে আমরা এ-সব কথা ভুলতে বসেছি, কারণ মার্কস্‌বাদের বনিয়াদী শিক্ষা শোচনীয় ভাবে অবহেলিত হয়েছে। অতিবামপন্থাও বুর্জোয়া ভাববিলাস হতে বাধা নেই বললে কিছু অন্যায় হয় না।

তিন

কোনও মতবাদ বৈজ্ঞানিক হলে এক স্থানে দাঁড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করলে চলে না। গভীরতর বিশ্লেষণে ব্যাপকতর পর্যবেক্ষণে সঠিক বাস্তব অবস্থা বুঝবার প্রচেষ্টায় তাকে হতে হয় সমৃদ্ধতর, সম্প্রসারিত। বিজ্ঞানের দস্তুরই হল এই, এতে করে বৈজ্ঞানিক বিশেষ দৃষ্টিটুকু ব্যাহত হয় না। এর জন্য চাই সজাগ মন, অনুসন্ধানী প্রবৃত্তি। সাম্যবাদী ঘোষণাপত্রের ১৮৭২ সালের ভূমিকাতে আছে—"মূলনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ সব সময় এবং সর্বত্র নির্ভর করবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থার উপর।"

মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ তাঁদের দীর্ঘ জীবনে তাই স্বমত সম্প্রসারিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এর দৃষ্টান্ত পাই প্রথম আন্তর্জাতিকের ব্যাপকতম শ্রমিক-ঐক্য গঠনের প্রচেষ্টায়, প্যারিস কমিউনের চূড়ান্ত বিপ্লব মুহূর্তে ক্ষমতা অধিকারের তত্ত্বে, গথা প্রোগ্রামের সমালোচনায় সমাজতন্ত্র গঠনে পর্যায়ক্রমের ভিতর, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সূচনায় দেশে দেশে গণতান্ত্রিক

সংগঠন গড়ে তোলার মধ্যে। তাঁদের উপযুক্ত শিষ্য লেনিন সেদিনের গোঁড়ামি ত্যাগ করে মতবাদের সম্প্রসারণ আনলেন পার্টি শৃঙ্খলা গঠনে, পশ্চাদপদ দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণে, পরিণত সাম্রাজ্যতন্ত্রের নতুন যুগের উপযোগী বিপ্লবী কর্মপন্থায়, বিশ্ববিপ্লবের জন্য অপেক্ষা না করে এক দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সংকল্পে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে স্তালিন বাস্তব কর্মপন্থা সম্প্রসারিত করে চলেন গোঁড়ামি পরিহার করেই। ডিমিট্রভের যুক্ত ফ্রন্টও সম্প্রসারণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নতুন অবস্থায় জনগণতন্ত্রের নতুন তত্ত্ব প্রচার করেন স্বয়ং মাও। সোভিয়েত বিংশ কংগ্রেসে নতুন যুগের স্বরূপ-নির্ণয়, তার উপযোগী নতুন কর্মপদ্ধতির প্রবর্তন তাই নতুন সম্প্রসারণের চেষ্টা। পুনরাবৃত্তির মোহে বিনা বিচারে তাকে প্রত্যাখ্যান করা গোঁড়ামির পরিচায়ক, মার্কস্‌বাদের ঐতিহ্যবিরোধী।

কিন্তু সম্প্রসারণ সংশোধন নয় এ-কথার প্রমাণ কি? এখানে সমস্যা আসে মূলনীতি, মার্কসীয় দৃষ্টি ঠিক কি বস্তু? মূলনীতি হল সেই দৃষ্টি যেটা ঐতিহাসিক যুগনিরপেক্ষ, পরিবর্তনশীল বিশেষ অবস্থার সঙ্গে যা পরিবর্তিত হবার প্রয়োজন থাকে না। একে পরিহার করার নামই হল সংশোধন, নতুন কিছু বক্তব্যমাত্র যেজন্য শোধনবাদ নয়। এমনকি এক যুগে সংশোধন বলে নিন্দিত প্রস্তাব পরে পরিবর্তিত অবস্থার যুগে বর্জনীয় নাও হতে পারে যদি মূলদৃষ্টি ব্যাহত না হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে সংশোধন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমে আসে মার্কসীয় দর্শনের কথা। বস্তুবাদী দর্শন হল যুগনিরপেক্ষ তত্ত্ব। জগৎসংসার বাস্তব পদার্থ, বস্তুর অস্তিত্ব চেতনার উপর নির্ভর করে না, শারীরিক আধার-বর্জিত চিন্তা অবাস্তব কথা। এর বিরোধী মত অর্থাৎ ভাববাদ মেনে নেওয়া সংশোধনের চিহ্ন, 'এম্‌পিরিও ক্রিটিসিজম্‌' গ্রন্থে লেনিন যাকে আক্রমণ করেছিলেন। পরিবর্তনের অন্তহীন প্রবাহ, বস্তু বা চিন্তার মধ্যে অন্তর্বিরোধ, পরিবর্তনের অসমান গতি ইত্যাদি, অর্থাৎ ডায়ালেক্‌টিক্সের মর্মকথা-ও এক যুগ থেকে যুগান্তরে বদলে যায় না। ডায়ালেক্‌টিকসকে অস্বীকার করলে, যান্ত্রিক জড়বাদে ঝুঁকলে তাই মার্কস্‌বাদকে সংশোধন করা হয়।

তারপর ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা, এটাও হল বিশেষ যুগনিরপেক্ষ।

সমাজজীবন নির্ভর করে উৎপাদনের প্রকৃতির উপর, সেই প্রকৃতির মধ্যে আছে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সম্বন্ধ, উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিবর্তনে উৎপাদন-সম্পর্ক বদলে চলে, ফলে উৎপাদনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হলে সমাজের উপরতলা রূপান্তরিত হয়—এই সব হল মার্কসবাদী দৃষ্টির কথা। একে পরিহার করলে আসবে সংশোধন। সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেণীভেদ বাস্তব সত্য, সভ্যসমাজের উন্মেষ থেকে সাম্যতন্ত্রের শ্রেণীহীন সমাজ গঠন পর্যন্ত শ্রেণীপার্থক্য থাকে ইতিহাসের মূলে, শ্রেণীবিরোধের প্রকাশ্য বা গোপন তীব্র বা প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব আছে শ্রেণীসমাজে, শ্রেণীগত স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে ইতিহাসের মৌল ব্যাখ্যা চলে না—এই সব পরিত্যাগ করাও হল মার্কসবাদের সংশোধন।

শ্রেণীসমাজে সাক্ষাৎ উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ধন মালিকদের সম্পত্তি হয়ে পড়ার নাম শোষণ। ধনতান্ত্রিক সমাজে উদ্বৃত্ত মূল্যের মারফৎ সেই শোষণ সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া অস্বীকার করার নামও সংশোধন। অন্তর্বিরোধ নিশ্চিহ্ন করে ধনতন্ত্র স্থায়ী ও মজবুত হয়ে উঠতে পারে না। অন্তর্বিরোধের চাপে আবশ্যিক ভাবেই সমাজতন্ত্র মালিকানা-প্রথা রদ করে ধনতন্ত্রের স্থান নিতে পারবে। আর্থিক এই বিশ্লেষণ বর্জন করলে সংশোধন এসে পড়ে, তখন সমাজতন্ত্রকে মনে হয় ভাববিলাস, সমাজের বাস্তব ও স্বাভাবিক পরিণতি নয়। বার্ন্‌স্টাইনের সুবিখ্যাত সংশোধনবাদের মধ্যে ছিল এই ঝোঁক।

স্টেট আবির্ভূত হয় শ্রেণীসমাজে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত মালিকানা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তার বাহ্যিক রূপ যাই হোক না, মূল প্রকৃতি হল শাসিতদের উপর শাসকের প্রয়োজনমাফিক বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা। সংশোধন-নীতি স্টেটের এই স্বরূপ ভুলে যেতে পারে, যেমন হয়েছিল গথা প্রোগ্রামে। ধনতান্ত্রিক সমাজে আত্মরক্ষার জন্য শ্রমিক-আন্দোলন প্রয়োজন। দৈনন্দিন আন্দোলনের সঙ্গে ভবিষ্যতের সমাজবাদের আদর্শকে মেলাতে পারানো হল মার্কসবাদের মর্মবস্তু, এরফুর্ট কর্মসূচীতে কাউটস্কির সংজ্ঞা হল এই। একে ভুলতে বসাও হবে সংশোধন।

শ্রমিক আন্দোলনে আর্থিক ও রাজনৈতিক লড়াই একসঙ্গে চালাতে হয়। একটাকে তুচ্ছ করে অন্যের উপর মনোনিবেশ করা সংশোধনী প্রবৃত্তি, তার দৃষ্টান্ত লাসালীয় রাজনীতিসর্বস্বতা অথবা ইকনমিস্টদের আর্থিক সংগ্রামে আবদ্ধ থাকা। শ্রমিক আন্দোলনকে ঠিক মতে চালিত করার জন্য দরকার হয়

শ্রমিকদের নিজস্ব পার্টি। সংশোধনী নীতিতে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যেতে পারে। ঘোর বিপ্লব, বিশুদ্ধ শ্রমিক বিপ্লবের নামেও এ-কথা বলা অসম্ভব নয়—যেটা দেখা যায় এনার্কো-সিণ্ডিকালিস্টদের ক্ষেত্রে বামপন্থী সংশোধনের রূপে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোদ্ধা মিত্রদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে। ঠিক কি ভাবে এই ব্যাপার সম্পন্ন হবে সেটা নিশ্চয় নির্ভর করবে বাস্তব অবস্থার উপর। এটা বিস্মৃত হলে বিশেষ যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের চিরন্তন পুনরাবৃত্তিই শুধু ঘটে না, মূলনীতির বামমার্গীয় সংশোধনও সম্ভব হতে পারে—অস্ত্রপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী এই বিশ্বাস তার নিদর্শন। বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব মার্কসবাদের অঙ্গ। কাউট্স্কীয় সংশোধন একেই অস্বীকার করেছিল, অথচ এখানেও পুনরুক্তির বিচ্যুতি আসতে থাকে যখন ঐতিহাসিক পরিচিত ছকের নির্বিচার অনুসরণের দাবি ওঠে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য মার্কসবাদের মূল নীতি। এর সংশোধন আসতে পারে দুই বিপরীত দিক থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সংস্কারবাদী সোশাল ডেমক্রাটরা যুদ্ধমান নিজ নিজ সরকারের সমর্থনে সেদিনের বিপ্লবের সম্ভাবনাকে আহত করেছিল। আবার আজ দেখি বিপ্লবী চীনা নেতৃত্ব নিজেদের স্বার্থ-সন্ধানে আন্তর্জাতিক প্রগতি-শিবিরে ফাটল ধরাতে উদ্যত শ্রমিক ঐক্যের নামে। সামান্য স্বার্থের অনুসরণে শ্রমিক ঐক্যের ডাক, তাকে দেশাভিমান চরিতার্থ করতে বা অপর কোনও অপ্রকাশ্য অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা মার্কসবাদের সংশোধন বৈকি, একে ঢাকতে বিপ্লবের ধ্বজা যতই ওড়ানো হোক না কেন। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য আন্তর্জাতিক কর্তব্য, কিন্তু তার মধ্যে দায়িত্ববোধ বিসর্জন দিলে মূলতত্ত্বকে রক্ষা করা যায় না।

বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র গঠন দীর্ঘ দিনের ব্যাপার, যুগব্যাপী সাধনা। এ-কথা বিস্মৃত হয়ে এক লাফে সমাজতন্ত্র নির্মাণের আশা অবাস্তব অতি-বাম সংশোধনী প্রবৃত্তি। সমাজতন্ত্রের গড়ে ওঠার ইতিহাসে দুই পর্যায় আসে, মার্কস যার নাম দিয়েছিলেন নিছক সমাজতন্ত্র ও পূর্ণ সাম্যতন্ত্র। দুই পর্যায়ে উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন নীতি আলাদা। নিম্নতর প্রথম স্তরে শ্রেণীভেদ লোপ পায় না, যদিও শ্রেণীবিরোধ স্তিমিত হয়ে আসে শ্রমরত জনতার পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে। উচ্চতর দ্বিতীয় স্তরেরই লক্ষণ হল সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ। দুই পর্যায়ের মূলনীতি সংশোধন করলে দাঁড়াবে—হয় সাম্যতন্ত্রী সমাজের আগমন-

আশা ছেড়ে দেওয়ার দক্ষিণী ঝোঁক কিম্বা অচিরে সাম্যতন্ত্র-প্রত্যাশার বামপন্থী আগ্রহ। সর্বশেষে আসে দমনশক্তি-নির্ভর রাষ্ট্রযন্ত্রের শেষ পর্যন্ত অবসানের মূলতত্ত্ব। এর বামপন্থী সংশোধন হল স্টেট-উচ্ছেদের এনার্কিস্ট-সুলভ মতিগতি। আর দক্ষিণ দিকে এর সংশোধন হবে স্টেট চিরকাল বজায় থাকবে এই বিশ্বাস, অর্থাৎ বাহুবলাশ্রয়ী রাষ্ট্রশক্তি যে জন-সমাজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থামাত্রে পর্যবসিত হতে পারে এমন আদর্শ ত্যাগ করা।

মূলনীতি সংশোধনের সম্ভাব্য নানা রূপের বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য হল এই সত্য ফুটিয়ে তোলা যে নতুন চিন্তামাত্র শোধনবাদের পরিচায়ক নয়। বস্তুত পুনরাবৃত্তির মোহে সঙ্গত সম্প্রসারণকেও শোধনবাদী বলে নিন্দিত করা নিতান্তই সহজ। স্থির ভাবে বিচার করলে তাই মতান্ধতাও কম বিপজ্জনক বলে পরিগণিত হবে না। অথচ সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকাটা বার বার বিপ্লবী মনের চিহ্ন বলে পার পেয়ে যায়। এর মধ্যেও কি আমরা মার্কসবাদের বিকৃতি দেখি না ?

গোঁড়া পুনরাবৃত্তির অনেক কিছু লক্ষণ। কর্মকৌশল সম্পর্কে এক যুগের সিদ্ধান্তকে বাস্তব অবস্থা বদলের পরও টেনে চলা যায়। যুগ বিশেষের সার্থক সফল নীতিকে তখন প্রতিপন্ন করা হয় বরাবরের ব্যাপার বলে। গোঁড়ামির প্রকৃতি হল পরিবর্তন দেখতে বা মানতে না চাওয়া, নতুন অবস্থার সর্বাঙ্গীণ বিচারের বদলে আংশিক মূল্যায়নে সন্তুষ্ট থাকা, পুরনো দিনের সংকল্প পুনর্বিচারের মানসিক কষ্ট থেকে বিরত হওয়া। তার সমর্থনে তখন প্রামাণিক উদ্ধৃতির স্রোত বয়ে যায় যেমন দেখা গেল 'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবি হোক'-এর সাম্প্রতিক অভিযানে। ইম্পিরিয়ালিজম-এর বিশ্লেষণে লেনিন যে পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন তার মধ্যে অন্তত দুইটির আজ আর অস্তিত্ব নেই— আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রী মনোপলি এখন আর পৃথিবী ভাগ করে প্রভুত্ব করছে না, ধনবাদী মহাশক্তিগুলির মধ্যে সারা জগৎ আর বিভক্ত নয়। অর্ধ জগৎ যখন প্রায় সমাজতন্ত্রী হয়ে যাবার উপক্রম করছে, বিস্তৃত কলোনি অঞ্চল যখন সাম্রাজ্যতন্ত্রের কক্ষচ্যুত হয়েছে, তখন নতুন যুগের কথা ভাবা কি মার্কসবাদের সংশোধন, না সে-সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করাটাই গোঁড়া পুনরাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ ?

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন চিরদিন অভ্যস্ত চিন্তার গণ্ডি ছাড়িয়ে পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন, মার্কসবাদের ঐতিহ্য এইখানে। তাঁদের হাতে সাম্যবাদ তাই

ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে সমৃদ্ধতর, যথার্থতর হয়ে উঠতে পেরেছিল। স্তালিন-জীবনের গৌরবময় অধ্যায়ে দেখি গোঁড়ামি কাটিয়ে উঠবার ক্ষমতা। ডিমিট্রভ পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের মোড় ফিরিয়ে দিতে ফাশিস্ট বিপদের পর্যায়ে। চীন-বিপ্লবে সাফল্য এসেছিল মাও-এর গতানুগতিক পথ ত্যাগের সাহসে। অথচ আজকের দিনে চীন-নেতৃত্ব সম্প্রসারণের বিপক্ষে গোঁড়া বামপন্থী বিপ্লববাদের ধ্বজা তুলে পুনরাবৃত্তির পথে ঝুঁকেছেন। শেষের দিকে স্তালিনের যে-সংকীর্ণতা এসে পড়েছিল, এ যেন তারই পুনরাগম। সেই সংকীর্ণতায় বিজ্ঞানের দিক থেকে অনেক ক্ষতি। এতে করে মানবিক-বাদের সঙ্গে মার্কসবাদের ঘনিষ্ট যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, সাম্প্রতিক ধনবাদের সার্থক বিশ্লেষণ হয় ব্যাহত, বিভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থা বিচারে আসে শৈথিল্য, পদে পদে জনমতের প্রকৃত মূল্যায়নের বদলে চলে তার উপর মন-গড়া সিদ্ধান্ত আরোপের প্রয়াস, পার্টির মধ্যে আলোচনার কণ্ঠরোধ করে প্রসারিত হতে থাকে আপ্তবাক্যের প্রচার, নেতাদের গ্রাস করে পদাধিকার বজায় রাখার মোহ। সংশোধনের মতন সংকীর্ণতাও সর্বথা পরিত্যাজ্য, মার্কসবাদী মহলে এই চেতনাকে প্রবলতর করে তুলবার প্রয়োজন এসেছে। মার্কসবাদের পুনরুজ্জীবন আসতে পারে এই শাশ্বত পথেই।

দেবেশ রায়

যুযুৎসু

ইণ্টারভিউ ঘরের পাশে রেলিঙে হেলান দিয়ে মণীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। ঘরের দরজা খোলামাত্র একজন বেরিয়ে এল। বেয়ারা বেরিয়ে এসে ডাকল "নারায়ণ সাহা"। মণীন্দ্রনাথ আরো একবার দেখল বেয়ারাটির আপাদমস্তক খাকি। টুপি, জামা, প্যাণ্ট। জামার বুক-পকেটে লেখা এম. ই. সি। অর্থাৎ মহীনগর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। মণীন্দ্রনাথ আবার রেলিঙে ঠেস দিল। চাকরিটা হলে, বোধহয় হবেই, আমাকে ঐ খাকি টুপি, জামা, ও প্যাণ্ট পরতে হবে, জামার বুক-পকেটে লাল সুতো দিয়ে লেখা থাকবে এম. ই. সি। নারায়ণ সাহা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে বেয়ারা। দরজা বন্ধ হল।

মণীন্দ্রনাথের চুল কিছু কাঁচা, কিছু পাকা, পাট করে আঁচড়ানো লম্বা। অস্নাত এই সকালেও সিঁথিটি আমরণ কুমারীর সিঁথির মতো স্পষ্ট। গায়ে একটি সাবান-কাচা পাঞ্জাবি, কাচার সময় নীল কিছু অতিরিক্ত পড়েছে, বাজে কাপড় অতিরিক্ত কাচায় দু-এক জায়গায় ফেঁসে গেছে। তবু পাঞ্জাবিতে একরকমের ভাঁজ বোঝা যায়। একটি নকল নীল রেশমি চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর। পায়ে প্রায়-রোজ সাবানকাচা রবারের স্যাণ্ডেল। ধুতিটি কোঁচা দিয়ে পরা, পকেটে পোরা, মোটা কাপড়ের পুষ্ট কোঁচার ফলে পকেট, এবং চশমার ফলে মুখ, ভারি দেখায়। দাড়ি কামানো, যেন ব্লেডের খরচের দাগ গালে লেগে আছে।

যে বেঞ্চি পাতা তাতে জায়গা সত্ত্বেও অনেকে বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। মণীন্দ্রনাথ একা-একা রেলিঙে হেলান দিয়ে, দরজার পাশেই, যাতে খাকি উর্দি-পরা বেয়ারা তার নাম পুরো উচ্চারণ করার পূর্বেই সে ঢুকতে পারে। নিজের নামটাকে বেয়ারার জিভ থেকে বাঁচাবার জন্য এত বেছে দাঁড়ালেও মণীন্দ্রনাথ ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে শরীরটাকে ঐ খাকি উর্দিতে ঢাকতে। মহীনগর কলেজে, যেখানে সে বর্তমানে বেয়ারার চাকরি করে, উর্দি নেই

[বিজন চৌধুরী

[নিখিল বিশ্বাস
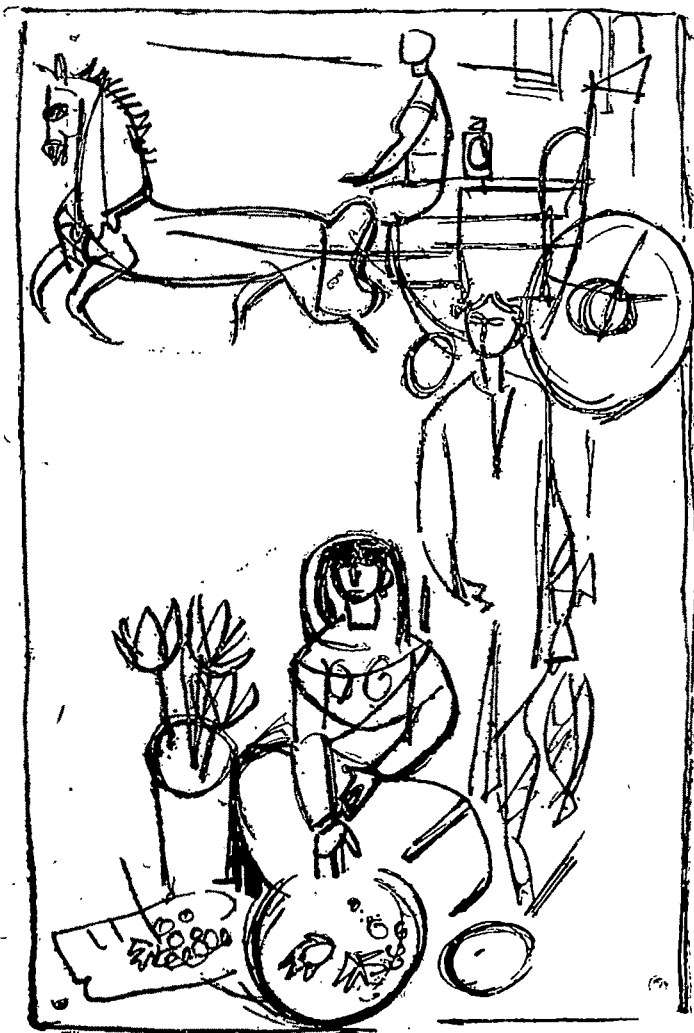
[নিখিলেশ দাস

[সৌরেন মিত্র

কিন্তু ডাক আছে। কেউ যাতে নাম ধরে ডাকতে না পারে সে-জন্য ডাক শেষ হবার আগেই সাড়া দেওয়ার অভ্যাস মণীন্দ্রনাথের আয়ত্তে।

ঘরের দরজা খুলল। নারায়ণ সাহা বেরিয়ে এল। বেয়ারা হাঁকল "বেচু মাহাতো।" আমাকে ঐ উর্দি পরতে হবে, টুপি, জামা, এবং প্যাণ্ট বেচু মাহাতো প্রবেশ করল।

মণীন্দ্রনাথের বয়স একচল্লিশ। সুতরাং নতুন চাকরিতে ঢোকা তার পক্ষে অসুবিধাজনক। কিন্তু এই চাকরিটা পাবার জন্য যা যা করণীয় সে তা তা করেছে। কমিটিতে রঘু মিত্তির আছে। রঘু মিত্তিরও মানিকগঞ্জের লোক। সুতরাং তার সঙ্গে তিনদিন দেখা করে ব্যবস্থা পাকিয়েছে। কমিটিতে সুরেন ভৌমিক আছে। সুরেন ভৌমিকও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং তারও সঙ্গে দু-দিন দেখা করে ব্যবস্থা পাকিয়েছে। এ-চাকরিটা বড় দরকার মণীন্দ্রনাথ চৌধুরীর। কারণ সরকারি চাকরি, মাইনে বেশি, ও বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ভালো। তারো চেয়ে বড় দরকার মহীনগর কলেজের চাকরিটা ছাড়ার, কারণ, নিজের মেয়ের পায়ের তলায় তাকে বসতে হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নতুন খুলেছে, দশটা বেয়ারা নেবে, সুতরাং এখানেই ভালো। তদুপরি এখানে তার ছেলেটার পড়তে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, ক্লাস নাইনে দু-বার ফেল মেরেছে।

"মণিদা" সুবোধ এসে দাঁড়াল।

"উঁ"

"শালা প্রিন্সিপ্যাল ট্যার পেয়েসে" মণীন্দ্রনাথের মুখ বিড়ির ধোঁয়ায় ঢেকে গেল।

"কী"।

"আমরা সবাই ইন্টারভিউ দিস্‌সি।"

"কেন ?"

"রমেনকে বলেসে—"

"ও।"

"দেখ না শালা, উনি তো অন্য কলেজে সটকাতি চাস্‌সে, আর, আমরা এলেই দোষ।"

"তুই না এলেই পারতি"—মণীন্দ্রনাথের অভ্যাস বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাউকে কাউকে 'তুই' বলা—কোনো-কোনো প্রফেসর তাকে তুমি বলে, এতে সেটা পুষিয়ে যায়—"কলেজে এদ্দিনের চাকরি।"

"হুস্, ওটা কি সাকরি নাকি, এখানে থাখো না, জামা-কাপড়ের ঠেলা, শালা, সাকরি হলি তো একখান্ উর্দি পাব, জামা কাপড় আর কিনতে হবে না"—সুবোধ চলে যাবার জন্য ঘুরেই বলল, "হেঃ, মাহাতো আইস্চে।

পরনে চকোলেট রঙের প্যাণ্ট, কোমরে বেণ্ট, মাথার চুল তেল-জলে ফোলানো। বুক-পকেটে চিরুণি, রুমাল ও সিগারেটের প্যাকেট। মণীন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়াল। সুবোধ বলল, "কীরে মাহাতো, তুই-ও ইণ্টারভিউ দিবি নাকি?"

মাহাতো পান-খাওয়া দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে বলল, "না আরে মণি, সোনো, সোনো, তুমিও এসেছ।" মাহাতোর বয়স বড় জোর উনিশ। সে মণীন্দ্রনাথকে 'তুমি' বলে। দোষ মণীন্দ্রনাথেরই, কেননা, সেই প্রথম তাকে 'তুমি' বলেছিল। মণীন্দ্রনাথ কোনো জবাব দিল না। সুবোধ বলল "তোমার বাবা কী, সমানে কেমিস্ট্রিরির মাল বেসো আর সিনেমা মারো, আর আমাদের—"

মাহাতো—"তা তোমরাও হামার মতো গোড়া এ-বি-সি-ডি জানলে মারতে পারতে—"

মণীন্দ্রনাথ মাথা ঘুরিয়ে বলল—"আস্তে আস্তে।"

মাহাতো—"তোবে মনি তোমার চাকরি হোবে না, তুমি সাইকেল জানো না, আর এনজিন্য়ার কোলেজে বেয়ারা হোবে, উ চোলে না, সুবোধ যাবি নাকি, বাইস্কোপে।"

দরজা খুলল। মণীন্দ্রনাথ সচেতন হল। মাহাতো বললো—"সালা উরদিটা তো বড় লাইস।"

বেয়ারা হাঁকল, "সুবোধ নন্দী।"

মাহাতো মণীন্দ্রনাথের কানে কানে বলল, "তো সালা এ-কোলেজে তো মেয়ে নাই, কে দেখবে উ উর্দি।"

মহীন্দ্রনাথ বললো, "আঃ চুপ করো।" মণীন্দ্রনাথের মেয়েও মহীনগর কলেজে পড়ে। মাহাতো হেসে অন্যান্যদের দিকে চলে গেল, অপ্রতিরোধ্য হাসিতে এই প্রমাণ করে যে মণীন্দ্রনাথও বেয়ারা, তাছাড়া আর কিছুই নয়। যেন এই কথাটা মণীন্দ্রনাথকে আরো প্রকৃষ্ট ও চরমভাবে বোঝাবার জন্যই তখনই সম্মুখ দিয়ে তিন-চারজন উর্দিপরা বেয়ারা গল্প করতে করতে

চলে গেল এবং দরজা খুলে গেল এবং তার নাম সম্পূর্ণতই উর্দি থেকে বেরিয়ে এল "মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী।" যে-নামটাকে বাঁচাবার জন্য মণীন্দ্রনাথ একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির মতো এই স্থানটা বেছে নিয়েছে, যেখানে বেয়ারাদের সঙ্গে তাকে বসতে না-হলেও, যে-কোনো মুহূর্তে তার নাম ডাকলেই সাড়া দিতে পারে। অনধিকার প্রবেশের এবং দখলের এত অভিজ্ঞতা মণীন্দ্রনাথেরই আছে যে, সে মুহূর্তে বুঝবে, এখানে দাঁড়ানোর অধিকার নেই বোঝামাত্র তন্মুহূর্তে টুক করে খসে পড়বে, কেউ টের পাবে না। অর্থাৎ এতদিন বেঁচে থেকে নীরবে, পা-টিপেটিপে প্রবেশ করে সবার আড়ালে কিছু হাতানো বা গুটোনো, এবং কেউ টের পাওয়া মাত্রই আবার নীরবে ও পা-টিপেটিপে প্রস্থানই যে জীবন এটুকুই মণীন্দ্রনাথের শিক্ষা।

এ-কথাও মণীন্দ্রনাথের অবিদিত নয় যে তার নাম ও পোশাক অনেকক্ষেত্রেই প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। নাম ও পোশাক ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এটাকে বাঁচাবার জন্যই তার এত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা। অথচ ঐ নাম ও পোশাক যেখানে তাকে স্বচ্ছন্দ করে, সেখানে তার প্রবেশ নিষেধ। যেখানে তার প্রবেশ আছে, সেখানে ঐ নাম ও পোশাক তাকে স্বচ্ছন্দ করে না। 'এটুকু ব্যবসায়জ্ঞান মণীন্দ্রনাথের আছে যে, দু' একটি ক্ষেত্রে সে অন্যদের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ সুযোগ যে আদায় করতে পারে, তার কারণও এই নাম ও এই পোশাক।

কিন্তু এখানে এসে যা দেখছে তাতে তার নাম ও পোশাক-ই বিপদগ্রস্ত। কলেজে তার মেয়ে পড়ে, তার বন্ধুরা অনেক সময় 'তুমি' করে কথা বলে, তার ক্লাসে অনেকসময় চক ডাস্টার দিয়ে আসতে হয়, এমনকি এই সেদিন কী এক ফোটো তোলার সময় মেয়ে বসেছে চেয়ারে, তাকে বসতে হয়েছে মাটিতে—এগুলো, তার নাম আর পোশাকের বিজ্ঞপ্তিকে অতিক্রম করে নেহাতই এক বেয়ারা বানিয়ে দিয়েছে, অথচ তা থেকে মুক্তি পেতে এখানে এসে দেখছে পরতে হবে উর্দি, আর নাম হবে বেয়ারা।

অথচ এখানে পেনসন আছে, এবং তার মেয়ে নেই। মণীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বে পড়েছে।

এমন সময় ইণ্টারভিয়ু ঘরের দরজা খুলল। রেলিঙের ভর ছেড়ে দিয়ে মণীন্দ্রনাথ সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং পা এগিয়ে রাখল। ইণ্টারভিয়ু ঘরের দরজা বন্ধ করে বেয়ারা 'মণি' পর্যন্ত হাঁকতেই দ্রুত এগিয়ে গেলেও বেয়ারা

চেঁচাল, "চৌধুরী।" দরজা খুলে ধরল বেয়ারা। নামের বুকে আঘাত নিয়ে মণীন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরটা অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। সুতরাং শীতবোধ হল। লম্বা টেবিলের ওপাশে সারি সারি চেয়ার। দু-একজন ধুতি-পরা মানুষ, রঘু মিত্তির একজন, চেয়ারের ওপর পা তুলে বসে। টেবিলের এ-পাশে, পদপ্রার্থীদের জন্য একটি টুল। মণীন্দ্রনাথের পোশাক-আশাক ঘরটির মধ্যে কিছু অসোয়াস্তি সৃষ্টি করল। সামনের ভদ্রলোক হাতের পেন্সিলটা দিয়ে টুল নির্দেশ করে দিলেন।

"নাম ?"

"শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী।"

"কলেজে কতদিনের চাকরি হল ?"

"ছয় বছর স্যার।"

"এতদিনের চাকরি ছেড়ে, এই বয়সে, বয়স কত ?"

"একচল্লিশ স্যার।"

"কলেজের চাকরি" প্রশ্নকর্তা একটু ইতস্তত করার পর যোগ করলেন "ছাড়া হচ্ছে কেন ?"

"স্যর। পেন্সন নেই, ইনক্রিমেণ্ট নেই, মাইনেও কম" মণীন্দ্রনাথ তির্যগ দৃষ্টিপাত করল রঘু মিত্তির ও সুরেন ভৌমিকের দিকে—

"সাইকেল চড়া জানা আছে ?"

"আজ্ঞে না স্যর। শিখে নেবো।"

অনেকগুলো স্বর একসঙ্গে হেসে উঠল, এবং তাদের সবার মুখের ওপর দিয়ে মণীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ঘুরে এল।

"এই বয়সে ?"

"যাও, যাও, তোমাকে আর সাইকেল চড়তে হবে না, নেক্সট্ ম্যান" সুরেন ভৌমিক লাল পেন্সিলে সম্মুখের কাগজে টিক্ দিল। শেষ পর্যন্ত এই ভদ্দরলোকটিকে 'তুমি' বলা হয়েছে এতেই খুশি হয়ে মণীন্দ্রনাথের পুরোবর্তী ভদ্রলোক বললেন "ঠিক আছে—তুমি এসো।" হাত তুলে নমস্কার করে বেরিয়ে যাবার জন্য বেয়ারার সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ দরজার দিকে ফিরল। টুল থেকে দরজা পর্যন্ত কয়েকটিমাত্র পদক্ষেপ দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূমি অতিক্রম করতে-করতে বড়-বড় সাধকের মতো মণীন্দ্রনাথের আত্মা তার দেহ ছেড়ে ঐ উর্দির মধ্যে প্রবেশ করল। পুরাতন মণীন্দ্রনাথ নতুন উর্দিপরা মনীন্দ্রনাথকে চিনতেই

পারল না। পুরাতন মণীন্দ্রনাথের সুবিন্যস্ত চুল টুপিতে ঢাকা। তার ভদ্দরলোকি কোঁচা প্যাণ্ট হয়ে গেছে। এবং শেষ পর্যন্ত বুক-পকেটের ওপর লাল সুতোতে খোদাই-করা এম. ই. সি—তিনটি ইংরেজি অক্ষর বিস্তৃত হতে-হতে মণীন্দ্রনাথ চৌধুরীর এই সন্ধি-নিষ্পন্ন পদবী-বিশিষ্ট নামটিকেই নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর করে দিল, এবং মণীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম-আত্মা মাত্র ঐ লাল সুতো দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হয়ে কতকগুলি খোদিত প্রস্তর ফলকের সঙ্গে এক আলমারির তাকে গিয়ে বসল। তারপর এক ছোকরা ঐ লাল সুতোয় লেখা এম. ই. সি—বর্ণত্রয়কেই মণীন্দ্রনাথ চৌধুরীর পরিচয় হিসেবে স্থায়ী-চিহ্ন দিতে গেলে মণীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম আত্মা তারস্বরে চিৎকার করে আত্মপরিচয় দিতে গেল কিন্তু পেঁয়াজের খোলসগুলো একটার পর একটা উঠিয়ে ফেললেও যেমন ভেতরে পেঁয়াজ পাওয়া যায় না, তেমনি, লালসুতোয় রচিত এম. ই. সি এই ইংরেজি বর্ণত্রয়কে খুলে ফেলার পর ভেতরে মণীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম আত্মা-মহাশয়কে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এম্. এন্. সি—মণীন্দ্রনাথ চৌধুরীর নামের এই আদ্যক্ষরত্রয় ও এম-ই-সি—মহীনগর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নামের এই আদ্যক্ষরত্রয়ের মধ্যে মাত্র মধ্যবর্ণের গোলমাল, বাকি সব মিত্রাক্ষর, এবং সেই কারণেই এম. ই. সি খুলেও আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে—এই প্রকার একটি যুক্তিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সান্ত্বনায় নির্ভর করে মণীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম আত্মা পুনরায় এম. ই. সি বর্ণত্রয়ের দেহের অভ্যন্তরে নিজেকে খুঁজে পেল।

তারপর সেই সূক্ষ্ম আত্মা নগদ টাকাওয়ালা উদ্বাস্তুর মতো ভ্রমণে বের হল, নিজের বসবাসের উপযোগী একটা জায়গা খুঁজে বের করতে। আর নিজের জন্য একটি নতুন বাস্তুভিটার সন্ধানে বেরিয়ে মণীন্দ্রনাথ দেখল, সে যে এতদিন ভদ্রলোক বলে পরিচিত ছিল, তার এত সত্য কারণ নেই, যাতে করে, দেশ বদল হলেও, দেশভাগ হলেও, দেশ স্বাধীন হলেও, সেই ভদ্রলোকত্ব অপরিবর্তিত থাকবে। সে যে এতদিন শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী নামে পরিচিত ছিল সেটাও এত সত্য নয় যে, দেশ বদল হলেও, দেশ ভাগ হলেও, দেশ স্বাধীন হলেও—অপরিবর্তিত থাকবে। তখন থেকেই মণীন্দ্রনাথ অমুক কলোনীর অমুক নং প্লট, অমুক রেজিস্ট্রেশন নং, অমুক নথিভুক্ত, ইত্যাদি বিচিত্র পরিচয়ের আড়ালে আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করেছে, এবং নিজেকে কোনো সময়ই স্পষ্ট না রেখে সর্বদাই সন্নিহিত রাখার এক অসাধারণ অভ্যাস মণীন্দ্রনাথ অর্জন করেছে, মণীন্দ্রনাথের জানা ছিল না যে, ভদ্দরলোক শ্রেণী থেকে পতন

এত স্বাভাবিক, অনিবার্য ও নিয়তিকল্প। সেটা জানার পর থেকেই মণীন্দ্রনাথ সেই স্বাভাবিক অনিবার্য ও নিয়তিকল্প পতনকে যতদূর সম্ভব বেদনাহীন করার চেষ্টা করেছে। সেদিক থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মণীন্দ্রনাথের অনেক মিল আছে।

প্রথমে কন্‌ট্রোলের দোকানে খাতা লেখার কাজ। তারপর চাউল ইত্যাদি এত বেশি উৎপন্ন হওয়া শুরু করল যে মণীন্দ্রনাথের পক্ষে দোকানে খাতা লেখা অনাবশ্যক হয়ে উঠল। কন্‌ট্রোল উঠে গেল। তারপর এক ওষুধের দোকানে কম্‌পাউণ্ডারি। কয়েকটা মিক্‌শ্চার তৈরি ডাক্তার নিজেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে ডাক্তারের দোকান আর এক পার্টনারের টাকায় বড় হতেই মণীন্দ্রনাথ ছাঁটাই। সিনেমা হলে গেট-কিপারি শুরু করেছিল। কিন্তু চার মাস মাইনে ছাড়া কাজ করার পর সেটা ছাড়তে হল। সেখানকার কর্মচারীরা নাকি এখনো বাকি মাইনে আদায়ের আন্দোলন করছে। আরো কী কী করেছে তার হদিশ মণীন্দ্রনাথের নিজেরও মনে নেই। অবশেষে মহীনগর কলেজের চাকরি। এই চাকরিতে শেষ পর্যন্ত থাকার একটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দুটি বিষয় বাদ সাধছে। এক: মণীন্দ্রনাথের মেয়ে, দুই: ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চাকরিতে পেন্সন।

এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু যোগবিয়োগ করে মণীন্দ্রনাথ স্থির করতে পারছে না কিংকর্তব্যম্। কলেজ ছেড়ে এলে মেয়ের কলেজের মাইনে দিতে হবে, মাসে পনর টাকা, যোগ, খাতা-বই-পত্র ইত্যাদি আরো খরচ। আর এখানে এলে পেন্সন আছে, মাইনেও হয়তো কিছু বেশি। কিন্তু উর্দি। কিন্তু মেয়ের জন্য সেই অতিরিক্ত খরচ। এ-সবের চাইতে অদৃশ্য অথচ এত হিসেব-নিকেশের চাইতেও অনেক বেশি বাস্তব আরো একটি চিন্তা মণীন্দ্রনাথকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায়, পরিশ্রমে, নানাপ্রকার কূটনৈতিক চালে, এবং কিছু কিছু আত্মসমর্পণ দ্বারা লব্ধ সহানুভূতির ফলে, মণীন্দ্রনাথ মহীনগর কলেজে তার জন্য এমন একটা পৃথক্ সত্তা নির্দিষ্ট রাখতে পেরেছে যাতে বেয়ারাদের থেকে তার একটু পার্থক্য রক্ষা করে চলতে পারে, এবং কেরানীবাবুদের সঙ্গে মোটামুটি একটি শ্রেণীগত সাম্য দেখাতে পারে—কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভাবসাব এত নিরপেক্ষ ও ব্যক্তিত্বশূন্য ও যান্ত্রিক, যে, মণীন্দ্রনাথের যে-ব্যক্তিত্ব অন্য-সাপেক্ষ ও করুণা সহানুভূতি

ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, সে ব্যক্তিত্ব এখানে, মারা যাবে।

অথচ মণীন্দ্রনাথ যখন অ্যাপলাই করেছিল, যখন তদারক করেছিল, একের পর এক ইণ্টারভিয়ু বোর্ডের মেম্বারদের বাড়ি-বাড়ি যাতায়াত করেছিল, তখন, সে পুরোদস্তর বেয়ারা। এবং বেয়ারার চাকরিতে অধিকতর নিশ্চিন্তি, অধিকতর উন্নতি, অধিকতর স্থায়িত্ব—এ-সবই তার হিসেবের মধ্যে ছিল। দুই ধরনের হিসেব-নিকেশে মনীন্দ্রনাথ বেদিশ।

যতদিন তার মেয়ে কলেজে ভর্তি হয় নি, ততোদিন কোনো সমস্যাই ছিল না। সমস্ত ঘটনাটাই, অর্থাৎ মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই নাম নিয়ে বেয়ারার চাকরি করার ঘটনাটি, তার নিজের ব্যাপার মাত্র ছিল, নিজের বেয়ারাত্ব গোপন করা ও ভদ্দরলোকত্ব জাহির করা—সবগুলোর একমাত্র নায়ক ও দর্শক ছিল সে। কিন্তু গত বৎসর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় পাশ করে মেয়ে যেদিন থেকে কলেজে ঢুকেছে সেদিন থেকে সমস্ত ব্যাপারটি একা তার হাতে নেই। একই সঙ্গে, একই কলেজে মেয়ের বাপ হওয়া আর মেয়ের বেয়ারা হওয়া বড় বেশি অনভ্যস্ত বলেই বড় বেশি অস্বস্তি দেয়। আর কোনোকিছুতে লজ্জা নেই। কোঁচা আছে, স্যাণ্ডেল আছে—বর্মের মতো। কিন্তু অফিসঘরে বেল বাজলেই যে থাড়া হয়ে ভেতরে ঢুকতে হয় এবং মেয়েদের কমনরুমে নোটিশ টাঙাবার জন্য যে ঢুকতে হয় সেটাই খুব লজ্জার কথা। বড়বাবুকে বলে কয়ে অফিসঘর ছেড়ে সে লাইব্রেরিতে ডিউটি নিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল যে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আরো বেশি প্রত্যক্ষ, হাতে-হাতে বই যোগাতে হয়, আর লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক প্রথম দিন থেকেই মণীন্দ্রনাথকে 'তুমি' বলেন। সাতদিন যেতে না যেতে মণীন্দ্রনাথ পুনরায় অফিসে ফিরে এসেছিল। অথচ মেয়েটি সারাদিন কলেজ করার পর, কলেজ থেকে সোজা যায় টাইপ স্কুলে। একঘণ্টা টাইপ শিখে একেবারে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরে। সারাদিন তার পেটে কিছু পড়ে না। সন্ধ্যার পর মেয়ে বাড়ি ফেরার আগেই মণীন্দ্রনাথ পুরোদস্তর বাবা হয়ে বসে থাকে।

মণীন্দ্রনাথ হয়তো মেয়ের বাবা হয়ে দিব্যি শুয়ে আছে, হাঁটুর ওপর লুঙি তুলে, এ-হেন সময়ে মেয়ের এক বন্ধু বাড়িতে এল। হাঁটুর ওপর লুঙি নামাতে মণীন্দ্রনাথের আপত্তি নেই, কারণ, সেটা ভদ্রতা এবং মণীন্দ্রনাথ ভদ্দরলোক। কিন্তু মেয়ের বন্ধু মানে কলেজের ছাত্রী তার বাড়িতে এলে বাধ্য হয়ে

মণীন্দ্রনাথকেই অন্য ঘরে চলে যেতে হয়। মেয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ায় নিজের বাড়িতেও যে মাঝেমধ্যে তাকে কলেজের বেয়ারা হয়ে যেতে হয়!

বাড়ি ফেরামাত্র মায়া এসে জিজ্ঞাসা করল—"কী বাবা, ইণ্টারভিয়ু কেমন হল?" "এই হল একরকম।" "কতজন ছিল?"—পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলেছিলেন মণীন্দ্র, মায়া সেটাতে হাত বাড়িয়ে শুধোল। "বহু, সবই তো নতুন, আমাদের কলেজেরও দেখলাম সবাই দিচ্ছে"—মায়ার বাড়িয়ে দেওয়া লুঙিটা নিতে নিতে মণীন্দ্রনাথ। "তোমার হবে তো?" "কী জানি, সুরেন ভৌমিক, রঘু মিত্তির তো ছিল, জিজ্ঞাসাবাদও বেশি কিছু করলো না, তবে আমি ভাবছি, পেলেও নেব কিনা"—ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মণীন্দ্রনাথ আর ছাড়া ধুতি তুলতে তুলতে মায়া বললেন, "কেন বাবা?" "দেখলাম ওখানে একেবারে উর্দিফুর্দি পড়ে সাহেব-সুবোর কারবার, এই বয়সে কি আর ও-সব পোষায় নাকি, তার ওপর আবার সাইকেল চড়া শিখতে হবে, তবে পেন্সন ছিল, চাকরিটা ভালো, মাইনেও বেশি—" বারান্দায় সিঁড়ির ওপর বসে মণীন্দ্রনাথ বললেন। "উর্দি মানে কলেজের নাম লেখা?" পেছনে এসে মায়া প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"এ-রাম, তোমাকে ও-সব পরতে হবে না, তোমাকে চাকরিও করতে হবে না—আর দু বছর এ কলেজেই থাকবো, তারপর তো আমিই পাশ করে বের হব।"

মণীন্দ্রনাথ চট্ করে দাঁড়িয়ে উঠে মায়ার দিকে ফিরে চেঁচানো শুরু করল—"কেন, আমি উর্দি পরলে তোমার সম্মানে লাগবে, ছেলে-মেয়েদের সামনে তোমার মাথা নিচু হবে যে তোমার বাবা উর্দি-পরা বেয়ারা, বেয়ারাই যখন হয়েছি, বামুনের ছেলে যখন যত সব ছোটজাতের পায়ে তেল ঘষতেই পেরেছি, তখন আর আমার আছে কি। পরব, উর্দিই পরব, উর্দি পরে তোর কলেজে যাব, উঃ দু দিনের বৈরাগী, ভাতকে বলে অন্ন, বেয়ারার মেয়ে, বাপ উর্দি পরলে মেয়ের সম্মান থাকে না—"

মণীন্দ্রনাথের চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘর থেকে মায়ার মা, এবং বাচ্চা-কাচ্চারা যারা এধার-ওধার ছিল, উঠোনে ভিড় করে দাঁড়াল, প্রথমে, মায়া একটু ঘাবড়েছে, তারপর একটু পেছু হটে, এবং শেষে ঘরের মধ্যে চলে যায়। অথচ

মণীন্দ্রনাথের প্রতিটি কথাই ঠিক। অথচ মণীন্দ্রনাথ নিজেকে, গত বারো-চোদ্দ বছরের ঘটনার নানা গতিকে, চতুষ্পার্শ্বের সঙ্গে নিজের উত্থান-পতনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, নিজের প্রাক্তন শ্রেণীর প্রতিনিধি ঠাওরালো মেয়েটিকে, যে-মেয়েটি জন্মের পর থেকে দোকানি, কম্পাউণ্ডার ও বেয়ারার মেয়ে হয়েই বেড়ে উঠেছে। কলেজের ছাত্রীত্বই যেন তাকে রাতারাতি এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ রেগে উঠে মণীন্দ্রনাথ অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল। মায়া, ভেতরে, চৌকিতে পা ঝুলিয়ে, ঘাড় নুইয়ে যেভাবে বসেছিল তাতে এটা স্পষ্ট যে সে অবসন্ন।

মায়া এবং মণীন্দ্রনাথ, এ বাড়ির ভবিষ্যতের ও বর্তমানের উপার্জনকারীদ্বয়, যেন সমস্ত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন একটি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, যেখানে, তাদের দুজনের মধ্যে পারিবারিক বা মানসিক কোনো বন্ধন নেই, নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রামের বন্ধন ব্যতীত, কেননা জীবনযাত্রার যে কেন্দ্র থেকে মণীন্দ্রনাথ ক্রম-নিম্নগামী, মায়া জীবনযাত্রার সেই কেন্দ্রের দিকেই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাৎস্যন্যায়ের পর

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলতে বুঝি দুটি ঐতিহাসিক কালের মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু প্রাচীন বাংলা আর আদি মধ্যযুগের বাংলা, এই দুয়ের যুগসন্ধি এত জটিল ও অস্পষ্ট যে তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। গুপ্তযুগের পূর্বে এবং গুপ্তশাসনের শেষ ভাগে বাংলা দেশের ধারাবাহিক এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী গুপ্ত-বংশ নামে পরিচিত রাজাদের সময় উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ গৌড় নামে প্রসিদ্ধ হয়। এবং সেই বিশিষ্ট জনপদে শশাঙ্কই প্রথম গৌড়-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কই যে বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি এবং বাহুবলে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও বঙ্গদেশের গৌরব ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে এবং প্রায় একশো বছর ধরে সেখানে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। বাংলার রাজতন্ত্র বিনষ্ট হয় এবং আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে সেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে, যখন গোপাল রাজপদে নির্বাচিত হন। অতএব এই একশো বছর কালকে বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ অথবা সঙ্কটকাল বলে অভিহিত করা যায়। এই যুগসন্ধির বৈশিষ্ট্য হল আত্মবিরোধ, অনৈক্য আর সেই সুযোগে বাইরের শত্রুপক্ষের একাধিক আক্রমণ।

'সকল-উত্তরাপথ-নাথ' হর্ষবর্ধনের মৃত্যু থেকে পাল-রাজত্বের সূচনা পর্যন্ত একশো বছর বাংলার ইতিহাসে একটি অন্ধকার যুগ। এ যুগের কোনও পরিষ্কার ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। গৌড়, বঙ্গ এবং সমতট রাজ্যে তখন কোনো নরপতির একাধিপত্য ছিল না, সার্বভৌম অধিকার তো দূরের কথা। তবে এ যুগের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় যে সব মৌলিক উপাদান থেকে, তার মধ্যে বৌদ্ধ লামা তারানাথের বিবরণ, কহলনের রাজ-তরঙ্গিণী, বাক্‌পতি রাজের গৌড়বহো. এবং সমসাময়িক লিপিগুলিই প্রধান। বহিঃশত্রুদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বাংলা

দেশ তখন বিধ্বস্ত। তিব্বত-রাজ, পরবর্তী গুপ্তবংশ, শৈল রাজবংশ, কনৌজরাজ যশোবর্মা, কাশ্মীর-পতি ললিতাদিত্য, নেপালের লিচ্ছবিরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিশালী নরপতি গৌড়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করেন। এই সব সমরাভিযানের সাফল্য কতটা নিশ্চিত, তা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাবে সমর্থিত সত্য হিসাবে অনেক ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত গ্রাহ্য করেন নি। তবে এ-কথা ঠিক, লামা তারানাথ এই সময়কার সমগ্র বাংলা দেশে যে ঘোরতর নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার বর্ণনা করেছেন, তা মোটেই কল্পিত কাহিনী নয়।

যে অভূতপূর্ব অরাজকতায় বাংলা দেশ প্রায় শত বৎসর কাল ধরে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তাকে প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে 'মাৎস্য-ন্যায়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মাৎস্য-ন্যায়ের অর্থ হল সেই ন্যায় বা যুক্তি, যার বলে বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যদের গ্রাস করে। কোনো জলাশয়ের বড় মাছগুলি যেমন যথাসুখে বিচরণ করে এবং ছোট মাছগুলিকে যথেচ্ছ গ্রাস করে, বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রেও তেমনি শক্তিশালী দল বা ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। দুর্বলের ওপর বলীর অত্যাচার তখনই সম্ভব যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙ্গে পড়বার জোগাড়, যখন সমষ্টির চেয়ে স্বার্থপর ও ক্ষমতামত্ত ব্যষ্টির প্রভাব বড় হয়ে ওঠে। তখন সর্বময় কর্তৃত্ব, শাসন-শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতার বদলে দলীয় প্রাধান্য, শক্তিমত্তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ স্বীকার করানো হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের দৃঢ় বিন্যাস তখন ছিন্নপ্রায়। একদিকে সামন্তবর্গের উচ্ছৃঙ্খল লোলুপতা, অপরদিকে সম্প্রদায় বিশেষের, যেমন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, নাগরিক-বণিক আপন আপন অধিকার-রক্ষায় ও বিস্তারে সচেষ্ট এবং স্বয়ং-প্রধান। এই হল নৈরাজ্য অথবা ঘোরতর মাৎস্য-ন্যায়ের বাস্তব চিত্র। এবং তার মধ্যে যে ন্যায়ের যুক্তি, তা শান্তি রক্ষার শাসন-শৃঙ্খলার ও সুবিচারের যুক্তি নয়। শুধু বাহুবলের সমর্থন, অব্যবস্থিত পরিস্থিতির সুবিধাবাদী প্রয়োগের এবং স্বার্থশক্তির অপব্যবহারের অছিলা।

রাষ্ট্র ও সমাজের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার উল্লেখ শুধু তারানাথের বর্ণনায় নয়, ঐ সময়কার কোনো কোনো লিপিতেও পাওয়া যায়। এই দুর্দিনে বাঙালী জাতি শুভবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার যে পরিচয় দিয়েছিল, তার মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও ব্যবহারের একটি সুলক্ষণ ইঙ্গিত দেখা যায়। সেটি হল, দলগত স্বার্থের মোহ অতিক্রম করে সমগ্র জনপদের মঙ্গলচেষ্টা। বাঙালীরা মিলেমিশে কোনও কাজ করতে পারে না, ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত কারণ ছাড়া মিলিত প্রচেষ্টায় নামতে জানে না, সে অপবাদ অন্তত সর্বতোভাবে সত্য নয়, এ-কথা বঙ্গবাসীরা

সেদিন প্রমাণ করেছিল। সামন্ততন্ত্রের কুফল প্রত্যক্ষ করেই, দেশের প্রবীণ নেতারা আত্মকলহ ভুলে একজন সাধারণ বংশোদ্ভূত কিন্তু শক্তিমান্ পুরুষকে রাজপদে নির্বাচিত করলেন এবং জনসাধারণও সে নির্বাচনকে সাগ্রহে স্বীকার করে নেয়। খালিমপুর লিপিতে আছে যে মাৎস্যন্যায়-প্রতিকারের আশায় 'প্রকৃতিপুঞ্জ' গোপালকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করে। বলা বাহুল্য, এই প্রকৃতিপুঞ্জ অর্থাৎ প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন সামন্ত-নায়কেরা, যেমন ইংলণ্ডে মহা-সনন্দ পেশ করার সময়ে নেতৃত্ব করেন ব্যারন সম্প্রদায় ও নগর-ব্যবসায়ীর দল। সামন্ত শ্রেণীর নায়কদের এই নেতৃত্ব বা প্রতিনিধিত্ব কতদূর সার্থক ও গণ-ভিত্তিক, তা সন্দেহের বিষয়। তবু কার্য-কারণ ও ফলাফল বিবেচনা করলে এ-কথা মানতে হবে যে গোপালের নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে শুধু সন্ধিক্ষণ নয়, একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

ইংলণ্ডের পঞ্চদশ শতকে 'প্যাস্টন পত্রাবলী' যেমন গৃহযুদ্ধ আর সামন্তচক্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভয়াবহ অরাজকতার পরিচয় দিয়েছে, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পেও তেমনি বাংলায় শতাধিক বৎসরব্যাপী নৈরাজ্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বিবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত গৌড়তন্ত্রে নতুন জীবন সঞ্চার করলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুলগৌরবহীন দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, বপ্যটের পুত্র গোপাল। বহুকাল পরে দেশে একটি দৃঢ় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রবর্তনই হচ্ছে গোপালের প্রধান কীর্তি। নিপুণ যোদ্ধা ও নায়ক হিসাবে তাঁর খ্যাতির চেয়ে, গঠনমূলক রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ হিসাবেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। কারণ, মাৎস্য-ন্যায়ের যুগে নৈরাজ্যের আনুষঙ্গিক ফল, সামন্ত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় দেশের জনসাধারণের যে চরম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ হয়েছিল, এ-কথা নিশ্চিত। আর গোপালই সেই রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থনীতিক অবনতি এবং অনিশ্চয়তার কবল থেকে গৌড়-বঙ্গকে মুক্ত করেন, এটাও ঐতিহাসিক তথ্য।

গোপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সুদীর্ঘ চারশত বছর রাজত্ব করেন। ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি খ্যাতনামা নরপতিদের কীর্তিকথা, সাম্রাজ্য-বিস্তার, পশ্চিমে গুর্জর আর দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট বংশের সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারতের অধিকার নিয়ে ত্রিকোণ যুদ্ধ ও শক্তি পরীক্ষা, রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের ইতিকথা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। ইতিহাস-পাঠকের কাছে এ-সব কথা সুপরিচিত। আমাদের আলোচ্য—মাৎস্যন্যায়ের পর পাল রাজাদের আমলে

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি যুগ-সঙ্কট অতিক্রম করে কি ভাবে সুস্পষ্ট ও স্থিতিশীল আকার ধারণ করল, তারই ইঙ্গিত দেওয়া। পাল-পূর্ব যুগে বাংলার চেহারা অর্থাৎ গৌড়, স্বাধীন বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি পঞ্চ রাজ্যে বিভক্ত বাংলার শিথিল ও অনিশ্চিত খণ্ডিত জীবন—আর পাল যুগে এবং পরবর্তী সেন রাজাদের আমলে, বাংলার সর্বাঙ্গীণ ও অভূতপূর্ব উন্নতি এবং উত্তর ভারতের ইতিহাসে বাংলার বিশিষ্ট দান—এ দুটির তুলনা ও প্রতিতুলনা করলেই এই ঐতিহাসিক লগ্নান্তরের গুরুত্ব ধরা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পালবংশের উৎপত্তি ছিল সাধারণ, অনভিজাত। পাল রাজারা তাঁদের কোনও লিপি বা অনুশাসনে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আপনাদের দৈববংশসম্ভূত বলে ঘোষণা করেন নি। সে যাইহোক, পাল রাজত্ব কি কারণে বাংলার ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে, এবার তার উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত, একটি ভূখণ্ড বা জনপদ হিসাবে বাংলার প্রাচীনত্ব যতই থাকুক, জাতি হিসাবে, একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সমাজ-ভুক্ত স্থানীয় জনসমষ্টি হিসাবে, বাংলার প্রথম সুস্পষ্ট ও সুন্যস্ত চিত্র-পরিচয় শুরু হয় পাল-যুগেই। বাংলার শ্রেণী-সমাজ-বিন্যাস নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে এই সময় থেকেই। এবং সেই রূপ-পরিগ্রহের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে—বাংলার প্রথম ভাষা ও সাহিত্যের নমুনা 'চর্যাপদ'গুলিতে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই সব বৌদ্ধ গান-দোঁহা থেকেই বাংলার শাক্ত বৈষ্ণব বাউল গানের জন্ম। এইখান থেকেই জানা যায়—পাল-যুগে কৃষিনির্ভর দেশে ভূম্যধিকারী গৃহস্থের সঙ্গতিপন্ন অবস্থা, ভূমিহীন গৃহস্থ কৃষক ও শ্রমিকবর্গের অসচ্ছল জীবন, দরিদ্র জনসাধারণের অনটন-দৈন্য, কৃষিজীবী গ্রামীণ সমাজ এবং কারিগরী শিল্পের কথা—কামার কুমোর স্যাকরা শাঁখারী তাঁতিদের সংঘ-রচনা, সে যুগে বাঙালীর বেশভূষা, খাদ্য-পানীয়, আমোদ-প্রমোদ, যানবাহন—মোট কথা বাঙালীর জীবনযাত্রার প্রথম রূপরেখা। দ্বিতীয়ত—বাংলার বাণিজ্য ও শিল্পগৌরবের সূচনা এই যুগ থেকেই। তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-ঐশ্বর্য, সুবর্ণভূমি অঞ্চলে বাঙালী নাবিকদের অভিযান আর পাথর ও ধাতুর মূর্তিগঠনে, বিশেষ করে পোড়া মাটির কাজে, সেকালের ভাস্কর্যশিল্পের নমুনার কথা সুপরিচিত। ধীমান ও বীতপাল, মণ্ডখদাস বিমলদাস বিষ্ণুদাস ও কর্ণভদ্র প্রভৃতি শিল্পীদের কৃতিত্ব এই যুগেই প্রদর্শিত হয়েছে এবং স্থাপত্যশিল্প সৌন্দর্যের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে মন্দির স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষে।

তারপর, বাংলায় ও বাংলার বাইরে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্ভব হয়েছিল পালবংশের রাজত্বকালে, বিশেষ করে বাংলায় মন্ত্রযান বজ্রযান চক্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের প্রসার। বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, সোমপুর আর নালন্দার মহাবিদ্যাপীঠে বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা, মহাপণ্ডিত শান্তিপাদ ও অতীশ দীপঙ্করের

আবির্ভাব, তিব্বতের সঙ্গে বাংলার গভীর সংস্পর্শ এ যুগের বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও পাল রাজাদের পৌরাণিক ধর্মের প্রতি আনুকূল্যের ফলেই বাংলার প্রাচীন আর্যেতর সমাজের সঙ্গে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় শুরু হয়েছিল, সেইটেই বড় কথা. এবং তার একাধিক প্রমাণ রয়েছে গৌড় লেখমালায়, বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে। তাই সব দিক থেকে মাৎস্যন্যায়ের পর পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা একটি নতুন, ঐতিহাসিক যুগের সূত্র বলেই গ্রহণ করতে হবে। বাংলার সামাজিক এবং অনেকখানি জাতীয় অস্তিত্বের স্ফুরণ, আর রাষ্ট্রীয় নিশ্চিতি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা সংহতির নির্মাণের দিক থেকে পাল যুগের ঐতিহাসিক সার্থকতা। পাল যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র সামন্তধর্মী, সন্দেহ নেই। মধ্য যুগের গোড়ার দিকে এই চেহারাই পাওয়া যাবে, হয়তো কোনো কোনো দেশে আরও খারাপ। সমাজ রাষ্ট্রের এই রূপ-বিন্যাস ও বিকাশ ঐতিহাসিক গতিতে চালিত। সামন্ততন্ত্রের মতো এক য়ুরোপীয় ক্যাটিগরি ভারতীয় ইতিহাসে প্রয়োগ না-করেও বলা চলে যে পালদের আগে গুপ্ত আমলেই সামন্তধর্মী রাষ্ট্র ও সমাজ, অর্থাৎ সামন্তচক্রের সূত্রপাত হয়েছিল এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সেই কালপর্বের দান সামান্য নয়।

প্রাচীন ভারতের শাসনপদ্ধতির কাঠামো এবং কার্যক্রম পাল যুগে বিশেষ বদলায় নি। কেবল পূর্ববর্তী মাৎস্যন্যায়ের কুফলগুলি দূর করার জন্য দৃঢ় ও সংবদ্ধ শাসন প্রবর্তন করা হয়। পঞ্চদশ শতকে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের পর, ফর্টেস্ক্যু যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুমোদন করে গেছেন, সেটাও এই ধরনের পরিস্থিতির প্রতিকার-কল্পে। ভূমিদান প্রসঙ্গে খালিমপুর শাসনলিপিতে 'রাজন্', 'রাজপুত্র' 'রাজনক' থেকে শুরু করে কোট্টপাল পর্যন্ত যে আটচল্লিশ রকম রাজপুরুষের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় দেশ শাসনে আমলাতন্ত্র এবং বিভিন্ন বিভাগের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। সামন্তচক্র তো ছিলই এবং সময়ে সময়ে তাদের চক্রান্তে রাজবংশের দুর্বলতা, অধোগতি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। তবে 'দশগ্রামিক' কথাটির ব্যবহার থেকে প্রমাণিত হয় যে স্থানীয় শাসন-ভিত্তি এবং গ্রামাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অস্বীকৃত হয় নি।

ইতিহাসে পাল যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মাৎস্যন্যায়ের পর স্বাভাবিক নিয়মে এই রাজবংশ এক শক্ত বনিয়াদ রচনার চেষ্টা করেন এবং কালক্রমে বাংলা দেশকে উত্তর ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এই সময়ে বাংলা দেশ তার নিজস্ব সত্তা, রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে ধর্মসাধনা, কাব্যানুরক্তি ও শ্রেণী-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে। এককথায়, ঐতিহাসিক বঙ্গ ও তার মানস-মণ্ডল এই পাল আমলেই স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট রূপ পেতে আরম্ভ করেছে। গরুড়-স্তম্ভ লিপিতে মহারাজ দেবপালের যে পরিচিতি পাই, 'উৎকলিত-উৎকলকুলং খর্বীকৃত-দ্রাবিড়গুর্জরদর্পং হৃতহূনগর্বং' তার মধ্যে শক্তিমত্তার বিজয়গৌরব ছাড়া একটু প্রাদেশিক অভিমানের সুর ধরা যায় না কি?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফুল

সামনেটা অন্ধকার। গাছপালার কালো কালো ছায়ায় কিছু নজরে আসে না। সন্ধ্যেটা সবে পেরিয়ে যেতে না যেতেই যেন অমাবস্যার মধ্যরাত মুখ থুবড়ে পড়েছে চারদিকে। দারুণ গুমোট—শ্বাস নিতেও কষ্ট হয় যেন। তার ওপর বলরাম দাসের আবার হাঁপানির টান আছে। একরাশ মশা এসে ছেঁকে ধরেছে, বার-কয়েক চড়-চাপড় দিয়ে শেষে বিরক্ত হয়ে থেমে গেছে বলরাম। রক্ত কী আছে যে খাবি। হাড়ে হুল্ ঠেকে ভোঁতা হয়ে গেলে নিজেরাই পালাতে পথ পাবিনে।

অমাবস্যার মতো অন্ধকার—তিথি যে কী ভগবানই জানেন। গুমোটে গাছের একটা পাতা নড়ছে না। সামনের হলুদে এঁটেল মাটির বাঁধটাকে একটা মস্ত ময়াল সাপের মতো লাগে—যেন হরিণ-টরিণ গিলে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। সেই অনেককাল আগে একবার দেখেছিল সুন্দরবনের জঙ্গলে। সাপের উপমাটা নিজেরই ভালো লাগে বলরামের, বাঁধের কাদার ভেতরে গোরু-মোষের পায়ের দাগে দাগে যেখানে দু-এক টুকরো জল চিকচিক করছে, সেগুলোকে ঠিক ময়াল সাপের গায়ের চক্করের মতো দেখায়।

এতক্ষণ কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে রামায়ণ পড়ছিল বলরাম, ক্লান্ত হয়ে বন্ধ করেছে একটু আগেই, ডিবেটাও নিবিয়ে দিয়েছে—যা দাম হয়েছে তেলের। বাতাস নেই, পোড়া ল্যাম্পের গন্ধটা যেন এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে ফিরে ফিরে। বলরামের বিরক্তি লাগে। বাঁধের ওপর মানুষের গলা শোনা যায়। ওদিকের ঝুপসী বটগাছটার আড়াল পেরিয়ে লণ্ঠনের আলো আসতে থাকে। আরো কাছে এলে চেনা যায়, নিতাই, রামচন্দ্র, খোঁড়া মুরারি। কাঁধে জাল।

—এই যে মুরারি, মাছ-টাছ কেমন ?

লোক তিনটে চমকে ওঠে। বলরামের বাড়ি অন্ধকার—দাওয়া অন্ধকার, গাছের ছায়ায় কালোয় কালো। তার ভেতরে হঠাৎ এই ডাক যেন কেমন ভূতুড়ে বলে মনে হয়।

—কে, বলরাম কাকা?—খোঁড়া মুরারি জবাব দেয়: কী করছ আঁধারে বসে বসে?

—কী আর করব, মশা তাড়াচ্ছি। মাছ কি রকম পেলি?

—মাছ!—তিন জনেই দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর রামচন্দ্রের গলা শোনা যায়।

—সারাদিন খেটে সেরটাক তপ্‌সে আর কিছু চুণো মাছ। নদী শেষ হয়ে গেছে। আমরাও শেষ হতে চললাম।

ছুটো কথা। সব কথা বলা হয়ে যায় তার ভেতরে। একটা নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায় যেন।

মুরারি বলে, নতুন পুল হচ্ছে আবার। তার ওপর বাবুদের মোটর দৌড়োবে। বাকী আর কিছুই থাকবে না।

—হুঁ, পুলও আর লাগবে না তখন।—এতক্ষণে নিতাই কথা বলে: তখন শুকনো চড়ার ওপর দিয়েই মোটর যেতে পারবে।

—ঈস্—কী যে হল দেশটার।—বলরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—জলের দেশ ছিল দাদা, এবার শুকনো খট্‌খটে হয়ে যাবে—একেবারে বীরভুম-বাঁকড়োর মতন। আর দেরী নেই।

—ক্লান্ত পায়ে লোক তিনটে এগিয়ে যায়, বাঁধের ওপর দিয়ে লণ্ঠনের আলোটা দূরে মিলিয়ে আসে। গুমোট অন্ধকারে বলরামকে ঘিরে ঘিরে গুঞ্জন চলতে থাকে মশার। কোত্থেকে একটানা চাপা আওয়াজ পাওয়া যায়—ঠক্ ঠক্ ঠকাস। রাতের বেলাতেও শুকনো ডাল ঠোকরাচ্ছে নাকি কাঠঠোক্‌রা? কিছুই বিশ্বাস নেই, দিনকাল যে-ভাবে বদলে যাচ্ছে সব সম্ভব হতে পারে এখন।

কী অন্ধকার! ঝুপ্‌সী গাছপালায় জোনাক পর্যন্ত জ্বলছে না। নদীর মাছের সঙ্গে জোনাকগুলো পর্যন্ত উধাও হল নাকি? কে জানে!

ভাবতে ভাবতে চোখ ঘোর-ঘোর হয়ে আসে। এই তল্লাটের ছু-ধারে ছুই নদী—বাঁধ বেঁধে সামাল দিতে হত। বর্ষায় ছু-পাশ থেকে ছুটে আসত মাটি-গোলা জলের তোড়, ফেনায় ফেনায় একাকার, কী মাতলামো জলের—কী তার ডাক। বাঁধে কোথায় একটু ফাটল ধরল কি আর কথা নেই, বেরোও—কে আছো কোথায়, বেরিয়ে এসো। মাটি ফেলো, চট গুঁজে দাও, বাঁধ পাহারা দাও—রাত নেই, দিন নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সামাল্-সামাল্! একটু ভুল করেছ কি গ্রাম গেল, গোরুবাছুর গেল, মানুষ গেল, হাজার হাজার বিঘের ধান গেল, পুকুর গেল, সব গেল!

যেবার যেত, সেবার তো দেশ শ্মশান। অবিশ্যি এ তল্লাটে অমন সর্বনেশে বান কখনো ডাকেনি, কিন্তু খেত-খামার ভেসেছে অনেকবার, ফসল নষ্ট হয়েছে, গোরু-ছাগলের প্রাণ গেছে। বর্ষার ভরা মাঠ নতুন ধানে ছলো-ছলো করত আনন্দে, ধান ক্ষেতে ছটাং ছটাং করে চিংড়ি লাফিয়ে উঠত, নিরীহ ঢোঁড়া থেকে শুরু করে মারাত্মক পান বোড়া সাপের আমদানি হত—তবু চোখ যেন জুড়িয়ে যেত চারদিকে তাকিয়ে; আবার রাতে সব নিঝুম হয়ে গেলে যখন খ্যাপা জলের গজরানি শোনা যেত বাঁধের গায়ে, তখন দুর-দুর করত বুকের ভেতর, যদি কোথাও একটুখানিও চিড় ধরে, তা হলে—

তারপর বর্ষার পাগলামি থেমে এলে ভরা নদী। মাঠের ফসলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাছের ফসল। তখন নদী একেবারে মায়ের মতো। রূপোয় গড়া চকচকে ইলিশ, সোনার তৈরি তপ্‌সে মাছের ঝাঁক। নদীতে নৌকোর সার। সুন্দরবনে বহর যাচ্ছে—মধু আনতে, মোম আনতে, গোলপাতা আনতে।

নদী এখনো আছে। কিন্তু সে চেহারাই আর নেই। চড়া পড়ে যাচ্ছে তার বুক জুড়ে। নৌকো এখনো যায়, লঞ্চ এখনো চলে, কিন্তু দিন ফুরিয়ে এল তার। যে নদী ছিল গাঁয়ের কোল ঘেঁষে, সে এখন আধমাইল দূরে সরে গেছে। বর্ষায় জল আসে এখনো, বাঁধে ধাক্কা দেয়, ভয়ও হয়তো দেখায় এক-আধটু, কিন্তু সে তেজই আর নেই। এখন আশ্বিনেই তার মরণদশা শুরু হয়ে যায়।

আর ও-পাশের সেই পাগলা পাহাড়ে নদীটা? চিরকালের দুখের দরিয়া? বুনো ঘোড়ার মতো তার সেই হড়্‌পা বান?

কিছুই নেই। বছরে আটমাস প্রায় শুকনো খাঁড়ির মতো পড়ে থাকে। আর কোনোদিন সে গ্রাম-ক্ষেত-খামার ভাসিয়ে দিয়ে প্রলয়কাণ্ড করতে পারবে না। তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে।

ভালোই হয়েছে। আর বান ডাকবে না কোনোদিন। কিন্তু—

একটা টর্চের আলো পড়ে।

—বলরামদা বসে নাকি?

—কে ও?

—আমি ব্রজ। ব্রজবাসী।

ব্রজ নেমে আসে বাঁধ থেকে। টর্চের আলো ফেলে একটা চারপাই টেনে নেয় বসবার জন্যে।

—ইকি, চারদিক আঁধার করে ভূতের মতো বসে আছো যে ?

—কী করব, কেরোসিনের যা দাম।

—তা বটে, তা বটে।—টর্চ রেখে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ব্রজবাসী বলরামকে এগিয়ে দেয় একটা।

—খাব ?—দ্বিধা করে বিড়িটা নেয় বলরাম : খেলেই তো কাশতে আরম্ভ করব। তা দিয়েছিস যখন, খাই।

বিড়ি ধরায় দু-জনে। ব্রজবাসীর বসন্তের দাগধরা মুখটা দেশলাইয়ের আলোয় অদ্ভুত দেখায়। আর বলরাম যা বলেছিল ঠিক তাই, বিড়ির ধোঁয়াটা গলায় গিয়ে লাগতেই খক খক করে কাশতে শুরু করে।

তারপর, কাশিটা একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলি ব্রজ ?

—যাব আর কোথায়! ওপারের গঞ্জে একবার দেখে এলাম হাল-চাল।

—ধানের খবর কী ?

—আরো চড়বে।

—আরো চড়বে!—বিড়িটায় জোরে টান দিতে গিয়ে গলায় ধাক্কা লাগে আবার, কাশিটা থামতেই চায় না বলরামের। বিড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাঁজরা চেপে ধরে কাশতে থাকে, জল গড়িয়ে আসে চোখ বেয়ে। ব্রজবাসী বলে, ঈস্—ঈস্—সত্যি দাদা, এসব আর তুমি খেয়ো নি।

—খাইনে তো!—হাঁপাতে হাঁপাতে বলরাম বলে, তুই দিলি তাই লোভ সামলাতে পারলুম না।

ব্রজ অপ্রতিভ হয়, বলরাম কাটিয়ে নেয় সেটা। বলে, কী বলছিলি, ধানের দর আরো চড়বে ?

—তাই তো শুনে এলুম।

—মানুষ বাঁচবে কী করে ?

—না বাঁচলে মরবে। নইলে মরতে মরতে টিঁকে থাকবে। এমনি করেই তো চলে আসছে।

তা চলে আসছে বটে। কিন্তু কতদিন আর চলবে ? দু-জনেই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। এতক্ষণের গুমোট ভেঙে ঝিরঝিরে হাওয়া দেয় একটু, গাছের পাতা নড়ে, কোথা থেকে সেই আওয়াজটা আসে : ঠকাঠক্—ঠকাঠক্—ঠক্ ঠক্—

—ওটা কিসের আওয়াজ রে ব্রজ ?

ব্রজ কান পেতে শোনে কিছুক্ষণ। বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না—কোনো পোকা-টোকা হবে বোধ হয়।

—পোকার ডাক? এত জোর?

—কে জানে!

হয়তো তাই হবে। সবই তো বদলে যাচ্ছে এখন। হয়তো কোনো নতুন পোকার আমদানি হয়েছে এ তল্লাটে। অনেক কিছু ঘটবে এরপর—অনেক কিছু। বলরাম যেন হাওয়ায় হাওয়ায় গন্ধ পাচ্ছে তার। নইলে এমন হয় যে সারাটা দিন নদীতে জাল ফেলেও সেরটাক তপ্‌সে পাওয়া যায় না? অথচ, দশ বছর আগেও মাছের ভারে জাল ছিঁড়ে পরত এই নদীতেই—এখন স্বপ্নের মতো লাগে।

—ব্রজ!

—কী বলছ?

—তোর দাদা কেমন আছে? নবদ্বীপ?

—ভালোই আছে এখন। ফুলের চাষ আরো বাড়িয়েছে।

—তাই নাকি?—কোথায় একটা ঘা লাগে বলরামের: ওই এক নেশা ধরেছে সকলের। ফসলে সব্‌জীতে মন নেই আর—খালি ফুল।

—কী করবে বলো?—ব্রজ বিড়িটায় শেষ টান দেয়: কলকাতার বাজারে দারুণ চাহিদা। কত বিয়ে, কত ঘটা, কত সভা—কত মড়া—রোজ ফুল চাই রাশ রাশ। বেশ ভালো চাষ বলরাম দা। কাঁচা পয়সা হাতে আসে অনেক।

হঠাৎ উত্তপ্ত আর উত্তেজিত হয় বলরাম। মাথার মধ্যে জ্বালা করে ওঠে। এতক্ষণ পরে মশাগুলোকে আবার মারবার জন্যে সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দেয় নিজের গায়ে।

—কাঁচা পয়সা! ফসল না থাকলে পয়সা চিবিয়ে খাবে নাকি?

—উপায় কী, দাদা?—অন্ধকারে ব্রজবাসীর স্বর বিষণ্ণ মনে হয়: জমিগুলো সব তো পড়েছে ও-ধারে। জল সরকারী বাঁধে আটকে আছে, কখন দয়া করে ছাড়ে কে জানে। মাটি শুকিয়ে সারা। ফসলের জল নিয়ে নানা হাঙ্গামা। দায়ে পড়েই ফুলের চাষ করতে হয়। ঝঞ্ঝাটও কম। তা ছাড়া চাহিদা—ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলে যায় ব্রজবাসী।

অকাট্য যুক্তি। বলরাম নিজেও জানে না তা নয়। তবু একটা বোবা যন্ত্রণা গোঙাতে থাকে বুকের ভেতর। ফসলের বদলে ফুল ধরেছে। শহর কলকাতা ফুলের জন্যে পাগল। বিয়ের ফুল, সভায় ফুল, বড়ো মানুষ কেউ মরলে

থরে থরে ফুল। রোজ সকালে শহরের পথের ধারে পচা আর শুকনো ফুলের রাশ। কী হবে ফসলের জন্যে পরিশ্রম করে ?

আবার চুপচাপ। মশা কামড়ায়। নদীর দিক থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া আসে। অন্ধকার গাছপালায় সাড়া ওঠে। চড়া গলায় প্যাঁচা চেঁচিয়ে ওঠে একটা।

ব্রজবাসী বলে, তোমারে সত্যি বলছি দাদা। মাটিই আলাদা হয়ে গেছে এখন।' আগে বিঘে প্রতি যা ফলন হত, এখন তার অর্ধেক। সরকারী সার পাই—কিন্তু সে চেহারাই আর নেই জমির। মাটি মরে যাচ্ছে।

তাই বটে—মাটি মরে যাচ্ছে। জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, বুড়ী মায়ের স্তনের দুধ যেমন করে শুকিয়ে যায়। এই রাত, এই অন্ধকার, ওই অচেনা অদ্ভুত পোকাটার ঠকাঠক্ আওয়াজ —সব মিলে সেই মৃত্যুটা অনুভব করছে বলরাম, অনুভব করছে বুকের ভেতর—টের পাচ্ছে রক্তে।

নিঃশ্বাস ফেলে ব্রজবাসী উঠে দাঁড়ায়।

—চলি দাদা।—আবার টর্চটা জ্বালে, একবার তাকায় এদিক-ওদিক।

—ঘর-দোরও তো অন্ধকার দেখছি। কেউ নেই নাকি বাড়িতে ?

বলরামের যেন ঘোর ভাঙে। পাঁজরায় টনটন করে সেই যন্ত্রণা। কথা কইতেও কষ্ট হয় যেন।

—বৌমার ভাইয়ের অসুখ, তাকে দেখতে গেছে। রাখাল গেছে সদরে। একাই পাহারা দিচ্ছি বসে বসে।

—ও।

ব্রজবাসী বাঁধের দিকে উঠে যায়। টর্চের আলোটা জলে-কাদায় ভরা পথের ওপর দিয়ে ঝলকাতে ঝলকাতে এগোয়, অনেকক্ষণ ধরে ব্রজবাসীর পায়ের রবারের জুতোটার ছপছপানি কানে আসে। এক ভাবেই বসে থাকে বলরাম। আবার চোখে ঘোর ঘনায়, মনটা ফিরে যায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে—বুক ভরা দুধ নিয়ে তরুণী মায়ের মতো হেসে ওঠে নদীটা, ভরা জালে রূপালি-সোনালি মাছ ঝলকায়—নৌকোর বহর চলে সুন্দরবনে, মধু-মোম-গোলপাতা—ধান-কাঠ। মাঠভরা ধানে ছলছল জল, ঢোঁড়া সাপের তাড়া খেয়ে ধেনো-চিংড়ি ছট্‌ফট্ করে লাফিয়ে উঠছে, পুকুরের নতুন জলে এক ঝাঁক খরশুলা মাছ এসেছে কোথা থেকে—

—কে ?—আবার চমকে উঠতে হয়।

কখন যেন রাখাল এসেছে, সে টেরও পায় নি। কালিপড়া লণ্ঠনটা নামিয়ে দিয়ে রাখাল বিরক্ত হয়ে বলে, শালার ইলেকট্রিক্ লাইনের নিকুচি করেছে, দেড় ঘণ্টা রাস্তায় ফেলে রাখল। তা ঘরদোর একেবারে অমাবস্যে করে রেখেছ কেন বাবা—একটা পিদ্দিমও তো জ্বেলে রাখতে হয়। নইলে গেরস্ত ঘরে লক্ষ্মী থাকে কখনো?

গজ গজ করতে করতে ভেতরে যায়, আলো জ্বালে, জামা-কাপড় ছাড়ে। তারপর একটা গামছা কাঁধে করে বেরিয়ে আসে বাইরে। যেটায় ব্রজবাসী বসে ছিল, সেই চারপাইটাই টেনে নেয়।

—দিনকাল যা হচ্ছে। আর এই জলের কষ্ট। ঘেন্না ধরে গেল।

বলরাম জবাব দেয় না। হাওয়াটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। সেই গুমোট গরম, সেই মশার ঝাঁক। যেন দম আটকে আসে। মাটি মরে যাচ্ছে, নদী মরে যাচ্ছে, সব শুকনো আর জীর্ণ হয়ে আসছে। বলরাম দৃষ্টিটা সামনে ছড়িয়ে দেয়। বাঁধটাকে একটা বিরাট ময়াল সাপের মতো মনে হয়, হরিণ গিলে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। এঁটেল্ মাটির গর্তে জল-কাদা চিকচিক করে—সাপের পিঠে চক্করের মতো দেখায়।

রাখাল মুঠো খুলে এগিয়ে দেয় বাপের দিকে।

—কী নিয়ে এলাম, দ্যাখো।

পাতলা কয়েকটা কাগজের মোড়ক। কিছু কালো কালো বীজ। বলরামের শরীর শিউরে ওঠে হঠাৎ।

—কী বীজ রে? কী হবে এতে?

—ফুলের বীজ। সবাই চাষ করছে। রাখালকে উৎসাহিত মনে হয়: আমরাই বা ছাড়ি কেন? লাগিয়ে দেব কাঠা দুই ভুঁইতে। দেখি কী হয়।

ইচ্ছে হয়, হিংস্র ক্রোধে ইচ্ছে হয়, বীজগুলো হাত থেকে কেড়ে নেয় রাখালের, পিষে ফেলে পায়ের তলায়, কিন্তু পারে না। বলরাম যেখানে ছিল, সেইখানে, সেইভাবেই বসে থাকে। মাটি মরে যাচ্ছে। মরার আগে মুখ দিয়ে আঁজলা-আঁজলা রক্ত উঠছে তার—ফুল ফুটছে! আর শহরে তো মড়াকে ফুল দিয়েই ঢেকে নিয়ে যায়—এত বড়ো মরা মাটিকে সাজাতে সাজাতে অনেক ফুল দরকার—অনেক ফুল!

সেই মৃত্যুর ছবিটা দেখতে দেখতে চোখ বুজে আসে বলরামের। আর ঠক্-ঠকাঠক্ শব্দে সেই অজানা পোকাটা ডাকতে থাকে।

ডাকতেই থাকে।

মিছিলের শহর

মিছিলে মিছিলে

পেছনে পড়ে রইল অফুরন্ত খেলার মাঠ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় রোদে জলে মাথায় ছাতি ধরে দাঁড়ানো বড় বড় রেনট্রি গাছ, বর্ষায় পুঁটিমাছের ছিপ ফেলবার অসংখ্য নয়ানজুলি, ডাকবাংলোর আঙিনায় দেবগণের মর্ত্যে আগমনের ভঙ্গিতে সাহেব মেম, দেবদারুর পাতায় সাজানো তোরণ, ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়িতে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে বিলি করা অন্ত-শেষ-রজনী লেখা লাল নীল কাগজ, রাত্তিরে সার্কাসের বাঘের গর্জন, ট্রেজারির সামনে দিয়ে অন্ধকারে যেতে যেতে বন্দুকধারী সেপাইয়ের গা-ছমছম-করা হু-কাম-দার হাঁক, প্রতিমা ভাসানোর দিন নৌকোয় হারমোনিয়াম বাজিয়ে কাছে থেকে দূরে চলে যাওয়া গান, রমজানের মাসে দূরের রাস্তা দিয়ে গা দুলিয়ে দুলিয়ে উটের দলের দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া, সকালে শিউলি আর বিকেলে বকুল ফুল কুড়োতে ছোটা, পৌষ সংক্রান্তিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পিঠে খাওয়া, সিন্নির লোভে সত্যনারায়ণের পাঁচালি শুনতে যাওয়া, এ-পাড়া ও-পাড়ায় আটকলাইতে কুলো ভেঙে বেড়ানো, মোরগের ডাকে চোখ মেলে ভোরের আজান শোনা, তারের বেড়ায় রোদ পড়ে শিশির ঝলমল করা, সন্ধ্যেবেলায় পুকুর থেকে হাঁসগুলোকে ঘরে তোলবার জন্যে চই-চই ডাক, কুয়োতলা আলো করে সন্ধ্যামণি ফুল ফোটা, জ্যোচ্ছনা রাত্তিরে রণ্‌পায়ে হেঁটে বেড়ানো, কুকুরশোঁকার জঙ্গলে জোনাকির ঝিকিমিকি, রাত দুপুরে হঠাৎ কোথাও আগুন লাগার চিৎকার, টমটমের চাকায় আর ঘোড়ার নাল-বাঁধানো খুরে নদীর ব্রিজের ওপর গুম গুম শব্দ—

মফস্বলের খোলামেলা একটা ছোট্ট আত্মীয়স্বজন শহর। দশ-এগারো বছরের একটা ছেলেকে সেখান থেকে তুলে এনে এই প্রকাণ্ড শহরের একটা এঁদো

গলির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। সুইচ টিপে ফুস্‌মন্তরে ঘরের আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে, কল খুলে জল এনে, ট্রামের চাকায় শহর দেখিয়ে, হাতে গরম জিলিপির ঠোঙা গুঁজে দিয়ে, পার্কের বেঞ্চিতে বসিয়ে শালপাতার গায়ে কুলপি বরফ ঢেলে, রাস্তায় কাটা ঘুড়ির পেছনে ছুটিয়ে, ফেরিওয়ালাদের রকমারি ডাকহাঁক শুনিয়ে, একটা একটা করে গ্যাসের আলোয় সন্ধ্যে জ্বেলে, দোরে দোরে বাঁকা লাঠি আর কালো আলখাল্লায় তস্‌বি-গলায়-দেওয়া মুশকিল-আশান ঘুরিয়ে, খোলা ম্যানহোলে দড়ি-বাঁধা মানুষ অদৃশ্য করে, হাইড্রেন্টের মুখ থেকে জলের ফোয়ারা তুলে—এই শহরটা তাকে ভোলাতে লাগল।

ভাব হতে হতেও হয় না। আকাট দেয়ালগুলো সামনে দাঁড়িয়ে বাদ সাধে। দেয়ালে দেয়ালে চামচিকের মতো কেবলি ঠোকর খেতে থাকে তার চোখদুটো। ঠোকর খেতে খেতে, ঠোকর খেতে খেতে একদিন এক অবাক কাণ্ড! দেয়ালের গায়ে কারা যেন সেঁটে দিয়ে গেছে একটা হাতে-লেখা কাগজ। কাগজের এক কোণে যেন কথা কইছে একটা মন্ত্র: বন্দেমাতরম্।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা নতুন রকমের ভিড়। এক বাড়ির নয়, এক পাড়ার নয়—এক জায়গা থেকে আসে নি। কিন্তু একই জায়গায় যাবে বলে তারা বেরিয়েছে। নিশানাটা মনে করে রাখার জন্যেই লাঠির গায় গিঁঠ দিয়ে তিন রঙের নিশানটা সামনে ধরে আছে।

ছেলেটার যে ভালোবাসা প্রথম দেয়াল ধরে দাঁড়াতে শিখেছিল, দিনে দিনে তা মিছিলের সঙ্গে বড় হয়ে পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে শিখল। সেই সঙ্গে আরেকটা নিশান, আরেকটা রং, আরেকটা নিশানা ছোট থেকে বড় হতে লাগল।

মিছিলের পায়ে পায়ে শান-বাঁধানো রাস্তায় একটা নতুন সুর বেজে উঠল। মুঠো-করা হাতের ওঠাপড়ায় এক নতুন শপথ। বন্দনা নয়, বিপ্লব। যারা সকলের পেছনে পড়ে ছিল, দৃপ্ত পায়ে তারা এসে দাঁড়াল সকলের সামনে। কলকাতায় দেখা দিল নতুন দিন—পয়লা মে। হাওয়ায় দুলতে দুলতে গেল লাল রং, তার নিচে তেলকালিমাখা মানুষ।

সেই নতুন মিছিলে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এই শহরটাকে আজও সে উল্টেপাল্টে নেড়েচেড়ে দেখছে। আশ্চর্য ভয়ঙ্কর সুন্দর এই শহর। চোখে তার এক সুন্দর স্বপ্ন। ভীষণ বলিষ্ঠ দুটো হাত অন্যায় আর অবিচারের শিকড় ধরে টানছে। আর অসংখ্য রক্তাক্ত স্মৃতি বুকে নিয়ে ছিন্নভিন্ন আকাশ ব্যাকুল হয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লালদীঘির ধারে

ক্লাইভের নাচঘর নিশ্চিহ্ন। প্রাচীনতায়, জীর্ণতায় এই ফুর্তি-কুঠির সমবয়সী যারা, তাদের অনেকে আগেই লোপাট হয়েছে। অনেক সাবেকী বাড়ির রেলিঙ-এর হাত চামড়া উঠে অস্থিসার। দরজার কাছে খোদাই করা নাম যেন দুর্বোধ অক্ষরমালা। পাশা-পাশি নতুন বাড়ির তেজী দেমাক। ব্রাসো দিয়ে ঘসা নতুন ফলকে অভিনব হরফ। একটি আমলের ভাঙচোর, অবশিষ্ট। একটি অধ্যায়ের কৈশোর মিশ্র উদ্যমে যৌবনের সমীপবর্তী।

ব্যবসা বাণিজ্য ঘুড়ি ওড়ানো নয়। হলে ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুড়ি ওড়ানোর প্রশস্ত জায়গা হত। ঘুড়িগুলো উড়ত দূরে দূরে। আসানসোলে, রাণীগঞ্জে, দার্জিলিঙে, ডিগবয়ে। লাটাই হাতে দাঁড়িয়ে থাকত সব পাকা ঘড়িয়াল। সুতো ছাড়ত গোছাত কখনো ঢিলে কখনো টান। কঠিন প্যাঁচের খেলায় কেউ কাটা পড়ত, কেউ কাটত।

বাড়িগুলো উঁচু, উচ্চাশার মতো। মস্ত প্রশস্ত ঘর, বারান্দা, অনেক সিঁড়ি, ঘুলঘুলি, আনাচ-কানাচে গর্হিত অন্ধকার।

দীঘির পার ঘুরে লোহার রেলিঙ-এর শক্ত বেড়া টান টান দাঁড়িয়ে। জল যেন আয়না। লালদীঘির জলে মুখ দেখে ডালহৌসি। জলে ছায়া পড়ে, ছায়া নড়ে। অনেক পুরুষের, মেয়েমানুষের স্থির, চঞ্চল, সহজ, জটিল ছায়া। কখনো বা শব ভেসে ওঠে।

একখানা পা রাখার জায়গা মৃত্যুর কত নিকটে। একখানা ভাসানো হাত অগাধ শূন্যতা-আশ্রিত। অথচ যেন নিয়তি-ধাবিত মানুষ, এদিকে ঊর্ধ্ব-মুখ। উদ্‌ভ্রান্ত, নিরুপায় অথচ নির্দেশিত। যেন এক প্রবল দ্রুত গড্ডল প্রবাহে ভাসমান এবং সমস্ত মহিমা ধূলায় লুণ্ঠিত।

রোজ রোজ আর পারা যায় না হে

ধান খেয়েছে মুরগি যাবে কোথায়
দেখুন না, ছুঁচ গলাবার জায়গা আছে
জামা-কাপড় একদিনের বেশি পরার উপায় আছে
ঝুলছি, পায়ে পায়ে একটু এগোন।
কী সময়টাই না পড়েছে।
হাওয়া-টাওয়া সব পাল্টে যাচ্ছে হে
দেখুন··· ।

শীতের দিনে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে গায়ে রোদ্দুর লেপে, ঘুরে দেখতে দেখতে আমগাছে বোল এসে যায় এবং গ্রীষ্মে পুড়ে পুড়ে তখন পিপাসা পায়। গ্রীষ্মে পাথুরে বাড়িগুলো গায়ের ওপর উত্তাপের বমি ঢালে। এবং সেই গরম গায়ে মেখে সমস্ত শহর যেন সারা গায়ে ফোস্কা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুপুরবেলা একসময় গর্তের মুখগুলো খোলে। তখন পিলপিল করে পিঁপড়ের মতো মানুষ ভেতর থেকে বাইরে আসে। কাণ পেতে থাকলে কচি শশা চিবোনোর কচ কচ শব্দ শোনা যায়। অথবা একগাল মুড়ি চিবোনোর শব্দ। অথবা দেখা যায় গোল গোল করে কাটা কলার টুকরোয় কিম্বা রঙ-মাখানো পেঁপের গায়ে কাঠি ফুটিয়ে খাওয়া। কেউ উদাসীন কেউ আকর্ষিত এবং দুয়ে পাশাপাশি হাঁটে। অনেকে খাবারের দোকানে বসে মোলায়েম সন্দেশে হলুদ দাঁত বসায়। তখন তাদের মাড়ি মুখের লালায় ভিজে সুখকর ভাবে ওঠানামা করে।

ঠাণ্ডা ঘর থেকে রাস্তার রোদ্দুরে ও হাওয়ায় ডুবলে মানুষের মুখের একটা আলগা ঘোলা রঙ ধুয়ে গিয়ে কেমন স্বচ্ছ সতেজ হয়। দেহ অনেক হাল্কা লাগে। বহু কিছু অধীন মনে হয়; এমন, যেন আয়ত্তে আছে। কেননা ফিরে গেলেই পুরনো খোঁয়াড়ের সেই বোটকা গন্ধ নাকে ঢোকে যেখানে সায়েবের কোটের ফুটোয় বড়বাবুর বাগানের গোলাপ। অথবা সবচেয়ে শৌখিন সাজানো সভ্য ঘরের মধ্যে মুখোস পরে বসে আছে পাকা ফেরেফবাজ।

বুড়িকে দেখলে মনে হয় না মানুষ। মনে হয় কাল-প্রতিমা। গায়ের রঙ অন্ধকারই যেন। কেশদাম নদীকূলের কাশগুচ্ছ। মুখের এক জায়গায় থুতনির কাছে একটা তিল। সেই উৎস থেকে উঠেছে একটি মাত্র দাড়ি, নিঃসঙ্গ। একদিনের কালো সেই কেশ-সহোদরা কালক্রমে আজ সাদা। কৌতূহলী কোনো ঘটনাচক্রে এক দৈনিক পত্রিকায় বুড়ির তসবির ছাপা

হয়েছিল। তার বিবিধ ক্ষমতা ও ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় তারিফও ছিল হয়তো। সেটিকে সযত্নে বাঁধিয়ে বুড়ি নিজের সামনে নিজেকে স্থাপিত করেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা উপাদান। মনুষ্য করোটি, পশু নখ, পশু লোম, নানা আকারের অস্থি ও পঞ্জর। রাস্তার ওপর এইসব ভয়ঙ্কর উপাদানের শৃঙ্খলাবিধানে নিয়ত ব্যস্ত বুড়ি যেন, পরিহাস-মগ্নতার অন্তরালে কাণ পেতে প্রাচীন ঘণ্টার শ্লথ বিমর্ষ সময়নির্দেশ শোনে।

পানউলির সারা গা ঘামে চপচপ করছে। ব্লাউজটা লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে, ফলে অনেকেই যা চায়, দেখার সুবিধে হয়েছে। কেননা দেহ যেমন যেমন উঁচুনিচু, জামাটাও ঠিক তেমন তেমন বসে গেছে। আসলে শরীর এবং জামা আলাদা নয় আর। এক বাবু তখন খুব কাছে উবু হয়ে বসে পান চাইল। আর তার চোখদুটো তখন পানউলির দেহ খাওয়ার কাজ করছিল। পানউলি যদিও জানত বাবুটির চোখদুটো কোথায়, তবু তার নিজের চোখদুটো পানের ওপরই ছিল, কেননা পানউলি জানে বাবুরা ওরকম করে। একজনের পর একজন বাবু এরকম আসে যায়। কেউ কেউ কথাও পাড়ে এবং সবকিছু সহজ মসৃণতা পায়। আবার অনেকে এইসব সোনার দিন পার হয়ে এসে প্রদোষে পৌঁচেছে। তাদের গায়ের চামড়া এখন গোসাপের তুল্য। কোনো কোনো বাবু তাদের কাছে গিয়ে বলে—কি গো, তোমার তো কাল গেছে, ষোল-বছরি নাতনী আছে ঘরে?"

পুরনো টেলিফোন অফিসের বাড়িটার গা ঘেঁসে পাদুকাসেবিরা পঙ্‌ক্তি-বদ্ধ। পশুচর্মের উজ্জ্বলতা বিকাশে তাদের সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত এবং কাতর। তার উল্টোদিকে সেই বাড়িটা যার দোতলায় যুদ্ধের সময় গজিয়ে-ওঠা একটা ফেলপরা ব্যাঙ্কের অফিস ছিল। এখন সেখানে অন্য আপিস। সম্ভবত পরীক্ষা পাশের জন্য আদা-নুন খেয়ে লেগেছে।

রাস্তার ওপর শায়িত মানুষের এক পরিণাম। তার দেহ রেখাযুক্ত একটি রূপমাত্র। যদিও মানুষী তবু নগ্নতার সমস্ত কৌতূহল ও লালসা হিম, পাথর। দড়ির মতো পাকানো কর্কশ দেহে উচ্চ নীচ ভেদাভেদলুপ্ত এক অসাড় সাম্য। তার চোখে এখনো দৃষ্টি, বুকে এখনও স্পন্দন, উরুতে মন্দ মন্দ গতি। যেন প্রত্যাবর্তনের দিকে তার চলা। তাই গুঁড়ি মেরে এগোয়। এগোতে চায় একটা দেয়ালের কাছে। আস্তে আস্তে সবই শ্লথ হয়ে আসে এবং তার চোখের পাতায় গাঢ় প্রবল আঠা জমে। তার শিয়রে বসে আছে ভবিতব্য।

ভবিতব্যের মতো ক্ষুধা। মুখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে কস পড়ে শান-বাঁধা রাস্তায়। কয়েকটা মাছি উড়ে আসে। ক্রমশ মাথায় চোখে মুখে শিথিল হয়ে আসা, আল্‌গা হয়ে যাওয়া পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাওয়া। নিত্যই দূরে নিকটে এরকম বা অনুরূপ প্রতিবেশী অতিক্রমের অশেষ বৃত্ত। অভ্যস্ত হয়ে হয়ে এখন আমরা এক শীতল স্বভাবে পরিণত। আমরা এক অনাক্রম্য হৃদয় নির্মাণে নিয়োজিত যেন। অর্ধ-পশুর চেতনার আচ্ছন্নতার ঘোরে বা অর্ধ-দেবতার উত্তীর্ণ মহিমায় এই স্থান প্লাবিত। এই কঙ্কাল-সমান মানুষীর তিল তিল হামাগুড়ি, চতুর্দিকে পাথর খনি স্বর্ণ রৌপ্য তামা, প্রভৃত শোভা শালীনতা সঙ্কল্প এবং সবকিছুর মর্মান্তিক অসাড় শূন্যতা ঘিরে জলাশয়ের তলবর্তী রুদ্ধশ্বাসের ভেসে ওঠার তীব্র করুণ আকাঙ্ক্ষার মতো কিছু থাকে যেন।

একসময় পুলিশ হাত দেখায়। পর পর গাড়িগুলো থমকে দাঁড়ায়। একটা পাগল গান গেয়ে ওঠে—"পালাবার পথ নাই।" গেঞ্জিঅলা, ফলঅলা ছুটে পালায়। সেই পাগলের গান আর গড়িয়ে-পড়া হাসি যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো লালদিঘীর দেয়ালে ধাক্কা মারে।

এটা আত্মবিক্রয়ের বাজার হে। আত্মাবিক্রয়ের বাজার। মনে হয় কোনো জলধারার মুখ পাথরচাপা। দিনগুলো এক এক করে যাচ্ছে, যাচ্ছে। তারপর নিঃস্ব একটাও দিন আর থাকবে না। তখন দিনান্ত। আমরা অস্থিরতা হারিয়ে শিথিল। প্রতিদিন রুগ্ন, দুমড়ানো তারের মতো স্নায়ু, কখনো বা কলের মতো নিঁখুত এবং প্রাণহীন। দিনে দিনে পুরনো হয়ে যেতে হয়। ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, বুকে হাত দিলে বোঝা যায়। বুকের নিচের সেই হৃদয়।

সেই গর্তে ইঁদুরগুলো পোয়াতি হয়। সেই অন্ধকারে ইঁদুরগুলো প্রসব করে। চোখের সামনে পুরনো থামগুলো শত্রুর মতো দাঁড়িয়ে। হাতি লাগিয়ে উপড়ে-ফেলা দেখতে খুব আনন্দ।

বড় ডাকঘরের গোল সাদা গম্বুজের ওপর শতাব্দীর প্রাচীনতা। মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর ফুর্তিবাজ গাছ। সবুজ, খুশি এবং শিহরিত। ওরা যেন ধনবতী প্রৌঢ়ার ছোকরা প্রেমিক।

সেণ্ট জনস্‌ চার্চের চূড়ায় ঘড়িটা দূর থেকে দেখা যায়। সময় বড় জীর্ণ করে। সর্বগ্রাসী মহাকাল সিংহের দাঁতেরও খায় ধার। গির্জার বাগানে মালি খাটে। মেহদিগাছগুলো সমান করে ছাঁটা। কলাবতী গাছে ফুল,

দোপাটি গাছে ফুল। দু-দিকে রাস্তা। রেলিঙ-এর গায়ে সাজানো বই। কোকশাস্ত্র, হঠযোগ, সরল চিকিৎসা। বাড়ির বারান্দায় জ্যোতিষী। কারো খাঁচায় ময়না বা টুনটুনি, কারো হাতে সিঁদুর-লেপা কুলো আর কাঁচি। কারো কপালে শুদ্ধ তিলক। স্থির উপবেশনে মনঃসংযোগ হাতের রেখায়। ধাবমান রেখার রহস্য উদ্‌ঘাটনে জ্যোতিষীর কপালে কুঞ্চন কখনো বা মুখে হাসি। মাঝে মাঝে নির্বিকার নিরীহ নিষ্পাপ ষাঁড়গুলোর কথা মনে হয়।

লালদীঘি আর দীঘি নেই, জলে জলে নদী, কলকাতা ভাসছে, কবে বা ডুববে। বাতিগুলো জলের ওপর ভৌতিক আলো ফেলে। পর পর ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে। জল আকাশ থেকে পড়ছে এবং পাতাল থেকে উঠছে। রিক্সাঅলা ঘুঙুরখানা হাতলে ঠুকে টুং টাং আওয়াজ করে। চড়া ভাড়া হাঁকে। পাৎলুন তখন আওয়ারা এবং জুতো দস্তানা। দু-একটা বাস স্টীমার-এর মতো ঢেউ তুলে পালায়। মাঝে মাঝে দু-একটা বিকল গাড়ি জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং কেউ কেউ দেরিতে বাড়ি ফেরার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না ভেবে ভয়ানক খুশি হয়।

দাঁড়ানো জল থাকে না, নেমে যায়। ধীরে ধীরে অন্ধকার, অন্ধকারের মতো একাকীত্ব, একাকীত্বের মতো বিষাদ যেন বিস্তৃত হয়। নির্জন লালদীঘি হর্ম্যবহুল প্রয়োজনের পরিত্যক্ত পুরী, এখন অপার নিঃসঙ্গ, কখনো বা ছায়ার মতো একটি বা দুটি লোক, মেয়েটি, ট্রাম কি বাস থেকে নেমে শীতল আলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে সেইখানে যায় যেখানে কানে মুখে কাজের কথা। তারা যেন দুই বা ততোধিক পৃথিবীর একটিতে করুণাবশত বাসিন্দা হয়। তার প্রতি পরিত্যক্ত জ্ঞানে দয়ালু। এখানে সারাদিন কড়ায় গণ্ডায় কাজের কথা, কাজের কাজ এবং কারবার, সর্বক্ষণই। তাই সমস্ত মুহূর্ত খনিজ, মুদ্রামণ্ডিত। দিনগত উদ্যম যারা এখানে উপুড় করে গেল তারা এখন অন্য দোলায়, দহনে। মাঝে মাঝে কোনো অফিসের ক্লাবঘরে আলো জ্বলে। এবং কোনো ভাড়াটে নটী অভিনয়ে প্রণয়ের কথা বলে। এবং অগণিত নাটুকে প্রাণ কাণ খাড়া করে শোনে। আর সংখ্যাহীন সভ্য বা সনাতন বেতনভোগী অথবা চাকুরী অফিসের দরজার সামনে দিনের পর দিন দাঁড়ানো নিষ্ফল-সন্ধানী, বিরহিত বিক্ষত ভারবাহী মানুষ কোনো ঐক্যে বা একাকীত্বে নিয়তির মতো ক্লান্তির সম্মুখে দাঁড়ায়। অনিদ্রায়, অবদমনে ডোবে।

দিনের প্রতিধ্বনি, তাপ মুছে লালদীঘির জল নিয়ত নির্জনতা এবং সুদূর তারার নিরুত্তাপ আগুন বিম্বিত করে।

চিত্ত ঘোষ

যেতে যেতে

'আজ ছুটি, ভেবেছিলাম বাস একটু হাল্কা থাকবে।'

'ওঃ, ছুটি—না? কেন?'

'বাঃ, আজ যে জন্মাষ্টমী—শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন।'

শ্রীকৃষ্ণ কথাটার ওপর একটু জোর দিয়ে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন।

যাঁর সঙ্গে বাসে পাশাপাশি বসে কথা হচ্ছিল সেই অন্যমনস্ক বেকার সঙ্গীটি হাই তুলে গা-ছাড়া গলায়—'জন্মাতে দাও!' বলে আড়মোড়া ভাঙলেন।

এমন করে কথাটা বললেন যেন গৌতম বুদ্ধ, যিশু খৃষ্ট, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ—সবাই একসঙ্গে একই অবতারের দেহে আবির্ভূত হয়েও—কিস্সু করতে পারবেন না।

কোথাও যে কিছু হবার নয় সে কথাটা আলিপুরের ট্রামের একেবারে সামনের সিটে বসা দুটি ছেলেমেয়ের মুখে অন্যভাবে শোনা গেল। ছেলেটি তার বান্ধবীকে (ইংরেজিতে যাদের গার্লফ্রেণ্ড বলে) বলছিল—'চল চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখে আসি—ছিয়ানব্বই হাজার টাকা দাম!' বান্ধবীটি হি হি করে হেসে উঠল—'দুর বোকারাম সে তো স্বাধীনতা দিবসে দেখাবে—১৫ই আগস্ট!' 'ও হ্যাঁ—স্বাধীনতা দিবস!' ভাবখানা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের একটা দিনকে আবার দিবস বলা কেন? তাই বোধহয় ছেলেটি মস্ত একটা হাই তুলছে দেখে মেয়েটি বলে উঠল—'এত দূর তো নিয়ে এলে এবার একটু প্রেমের কথাটথা বল!' তার কচি মুখে এ কথাটা এমন ডেঁপো ব্যবসায়ীর মতো শোনাল যে পেছনের সিটে বসা মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি যেন একটু বেশি

জোরেই চমকে উঠলেন। ঐ বয়সে ওঁর বোধ করি কিছু ঘটে থাকবে। কিন্তু সে যুগে মেয়েরা তো—! ভদ্রলোক আবার সোজা হয়ে বসলেন।

'ও মশাই শুনেছেন?—ঐ যে—ও দাদা, শুনেছেন? নয় নয় নয় নয় (৯৯৯৯) নম্বর টিকিট স্টেট বাসের প্রাইজ পেল!' ঝুলতে ঝুলতে টিফিনের কৌটো আঁকড়ে পানের পিচ্ ফেলে কেরাণীবাবুটি হ্যাঃ হ্যাঃ করে হেসে ফেললেন।

ওঁরই পায়ে পা বাধিয়ে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি মুচ্কি হাসলেন। তারপর একটু উঁচু স্বরে গলাটা বেঁধে নিয়ে লেডিস সিটের দিকে আড়চোখে চেয়ে রস-নিঙ্ড়ানো গলায় বললেন—'তা মন্ত্রীমশাই তো আপনার মতো ছাঁ-পোষা নন।—রীতিমত ব্যাচিলার—প্রায় সাধু বললেও চলে। নয় নয় বলা অব্যেশ হয়ে গেছে। নয় ছয় নয় ছয় নম্বরটা উনি নিজে হাতে তুললে কি বিশ্রী শোনাত বলুন দেখি? হাজার হোক' টিকিটের দাম চড়চড় করে বাড়ছে—নয় ছয় নয় ছয় তুলে কি দেশে হতাশার ঝড় তুলবেন? শেষে ওঁকেই না কামরাজ প্ল্যানে ফেলে দেয়।'

'আমাদের কামরাজ বাপু কামরাঙাও বটে।' বলে হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে নিজের রসিকতায় হাসতে হাসতে অন্য ভদ্রলোকটি মেয়েদের দিকে তাকালেন।

যে মেয়েরা রসিকতা শুনলেন তাঁদের অনেককেই হাসি চেপে বসে থাকতে হল। বাসে আবার ছেলেদের রসিকতায় হাসলে বাঙলা দেশের মেয়েদের বদনাম হয়। ওঁদের এবার নিজেদের মধ্যেই আলোচনার গুঞ্জন শোনা গেল।

'সবচাইতে বদমাইশ হচ্ছে মাঝবয়সী লোকগুলো। সব সময় লেডিস সিট ঘেঁষে দাঁড়াবে।'

'ঐ জন্যেই তো আমি ইয়াং ছেলে ছাড়া পাশে বসতে দিই না।'

এক 'ইয়াং ছেলে' কথাগুলো শুনেছিল। পাশের বন্ধুকে কানে কানে বলল, 'ঐ বিগত-যৌবনা ছাগল-খাওয়া লিপ্স্টিক মাখা রক্ষেকালি আমায় মাসোহারা দিলেও আমি ওর পাশে বসছিনে।'

বন্ধুটি পরম নাস্তিকের মতো নিস্পৃহ গলায় বলে গেল—'আরে, কিসে কি এসে যায়?"

বলা বাহুল্য বাসটা টু-বি। এর প্যাসেঞ্জারদের ধরনটা ঐ একটু শিক্ষিত কিন্তু 'হা হতস্মি' মাখানো। এ বাসে যদি পকেটমার ধরা পড়ে তো আপনি একটুও না ঘাবড়ে সুসজ্জিতা কোনো মহিলাকে সন্দেহবশে ধরতে পারেন।

এ বাসের কনডাকৃটর্ সায়েব নিয়ত ইংরেজি বলে আপনাকে অবাক করবেন। অথবা ভুল ইংরেজি বলে মুশ্‌কিলে ফেলবেন।

"বেঁধে—লেডিস্" হাঁক শুনেই একাধিক জোড়া চোখ এবার কোন্ গৌরবে বহুবচনযুক্ত লেডি উঠছেন দেখবার জন্যে ন নম্বর বাসের সামনের দরজার দিকে চোখ ফেরালেন। নানা চোখে নানা চাহনি। কেউ লেডিস সিটে আশঙ্কায় 'উঠি উঠি' ভাব নিয়ে বসে আছেন। তাঁদের চোখে আতঙ্ক। কেউ বেজার মুখে 'সরিসরি' করেও সরছেন না। চোখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটু কৌতুহল। আর কারুর বা এত ভিড়েও মুখে হাসি। চোখে 'আর একটি মেয়ে দেখেছি'-র তৃপ্তি। মেয়েরাও ছেলেদের চাইতে কম তাকাচ্ছে না। কি শাড়ি, কি জামা, কি রঙের লিপ্‌স্টিক, কিরকম কার চুল বাঁধা—সর্বোপরি—কেমন দেখতে মেয়েটি!

কিন্তু নাঃ, সকলের আশার গুড়ে বালি দিয়ে ঘটি আর গামছার পুঁটলি হাতে উঠলেন বছর পঞ্চাশের এক দড়ি-পাকানো চেহারার ভদ্রমহিলা। সঙ্গে একগুষ্টি ছেলেপুলে আর গুটি দুই তেলে-সিঁদুরে ভেজা ভেজা বউ। উঠেই মহিলা তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করলেন—'আরে বাবা ইকি? মাইয়াদের ছিট্‌গুলি ছাইর‍্যা দিতে বলেন না—।' 'আমি পাশে বসুম—অ দিদিমা।' চ্যাঁ ভ্যাঁ, ঠেলাঠেলির মধ্যে ভিড়ের ব্যূহ ভেদ করে বউ দুটি সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত 'বাঁ দিকের ৫নং লেডিস সিটটা দাদা'-য় জায়গা পেতেই সবাই যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বৃদ্ধা বসলেন আপিসগামী একটি মেয়ের পাশে। ভিজে গামছার পুঁটলিটি সিটে রাখতেই হট্টগোল বেধে গেল।

'একি করছেন—ভিজে গামছা—আমাকে সারাদিন এই শাড়ি পরে আপিস করতে হবে।'

'শালগ্রাম শিলা আছে কালীঘাটে যাচ্ছি।' মেয়েটির উত্তেজনাকে থমকে দিতে বৃদ্ধা বললেন।

'চামড়ার সিটে শালগ্রাম শিলা?'

বোঁ করে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে ভদ্রমহিলা একটু যেন অপ্রস্তুত মুখেই তাকালেন।

'আপিস টাইমে বেরোন কেন—অন্য সময় যেতে পারেন না?'

'ক্যান্?'

'ভিড় কম থাকে।'

'পয়সা দিয়া যামু তার আবার সময় অসময়, ভিড় কি? তোমাগো এই সব আপিসের মাইআগো বড় ফুটানি দেখি! ক্যান্ আমাগো কাজ কাম নাই খাওয়ান-দাওয়ান নাই? চশমা পইর‍্যা ভাবছ এক্কেরে—!'

'টিকিট' কনডাকৃটর সায়েব হাঁকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাট স্টপ এসে গেল। গিঁট খুলে পয়সা গুণে দিতে দিতে বাসের সকলে ধৈর্যহারা। বাস দাঁড়িয়ে। হুড়োমুড়ি বেধেছে—'লাইমা পর্ লাইমা পর্' রবে মস্ত বাহিনী নামছে। কনডাকৃটর নির্বিকার—'ভাড়াটা—একি তিনজনের কেন? সাতটা তো ছেলেমেয়েই।' আপিসগামী মেয়েটি বলে উঠল 'আহা ছেড়ে দিন না।' বৃদ্ধা গিঁট বেঁধে নিতে নিতে বললেন, 'কও দিন দেখি মা।' বলে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার পেছু হটে এসে মেয়েটিকে বললেন—'মনে কিছু কইরো না—বাড়িতে চাকুরে পোলাটার বড় অসুখ—কালীঘাটে মানত করছি—মনটা তাই ভালো নাই।'

বৃদ্ধা নেমে গেলেন। আপিসগামী মেয়েটি একটু বিমনা হয়ে গেল।

ন নং বাস আবার চলল একেক পাড়া থেকে একেক ধরনের লোক তুলতে। যাদবপুরে উঠবে উদ্বাস্তু কলোনির মেয়ে-পুরুষ। ল্যান্সডাইনের স্টপে টাই-পরা 'বিফোর-টাইম' আপিস যাওয়া কালো মাদ্রাজি ভদ্রমণ্ডলী, ড্রেন-পাইপ প্যান্ট পরা বাঙালী ছাত্র, সুসজ্জিতা ছাত্রী, শিক্ষিকা, চাকুরে মেয়ে। পার্ক স্ট্রীটের কাছে এলেই চোঁচাচু সালোয়ার কামিন আর ফ্রক-পরা মেয়ে তুলতে হবে। এদের জগাখিচুড়ী উচ্চারণের ইংরেজি না শুনলে বোঝাই যাবে না যে এরা খাঁটি মেমসায়েব নয়। সেণ্ট্রাল এ্যাভেনিউতে গুজরাটি, মাড়োয়ারি, হিন্দুস্থানী এসে বাসের ভোল পাল্টে দেবে। 'ভাও কেতনা' অথবা 'আজ বাজারমে'— ইত্যাদি আলোচনা উঠবে। ভুপেন বোস এ্যাভেনিউতে একেবারে 'শ্যামবাজারি' জনতা! 'ও মশাই, বলি একটু এগিয়ে গেলে কি বুকে কষ্ট হয়?' টিট্‌কিরি শুনবেন। অল্পবয়সী কনডাকৃটর হাসবেন—'অনেকবার বলেছি দাদা, কিন্তু জানেনই তো ঐখানটায় দাঁড়ালেই অনেকের পায় শেকড় গজায়। আপনি বরং ওঁদের টপকে যান।' প্রথমে ভদ্রলোক ফিক করে হাসবেন। তারপর টপ্‌কে যেতে যেতে উঁচু কিন্তু ফিস্‌ফিস্ করার ধরনে লেডিস সিটের কাছে দণ্ডায়মান কোনো ভদ্রলোককে বলবেন—'ছিঃ বড়দা, এই বয়েসে!'

উল্টোডাঙ্গার আগেই আবার যাদবপুরের ধরনের ভিড় উঠবে—'বাধেন—বাধেন, লামুম !'

'ছাড়ুন ছাড়ুন পা-টা পাচ্ছি না যে ?'

'কোন পা-টা দাদা ?' শান্ত গলায় পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন।

ভিড়ে যাঁর পা হারিয়েছে তিনি ব্যস্ত হয়ে বলেন—'ঐ বাঁ পা-টা।'

'ঠিক হয়েছে। সেটা আমার পায়ের ওপর রয়েছে। নরম নরম বোধ করছেন না ? ওটা আমারই পা। সরিয়ে নিন—পা খুঁজে পাবেন।'

'ওঃ'। সরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচির মতো মুখ করে কেটে পড়তে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। টু-সি এক্সপ্রেস—লাস্ট এক্সপ্রেস ! ভিড়ে একেবারে ঠাসা।

'তুলে নে না ?'

'কাকে ?'

ততক্ষণে সেই কেউ উঠে পড়েছে রড্ ধরে—'একটু পা রাখার জায়গা !' পা রাখার জায়গা পেতে না পেতে আর একজনের আঙুল ঠেকাবার জায়গা করে দিয়ে তাকে টেনে তোলা হল।

'ইস সন্তোষটা উঠতে পারল না।'

'আহা ভদ্রলোকের আজ দেদার লেট হবে।'

লাস্ট স্টপ। এর পর আর থামবে না। টেনে নিয়ে যাবে ডালহৌসি স্কোয়ার। হাতকাটা গেঞ্জি-পরা তুরন্ত যুবক ড্রাইভারটির চোখ বাঘের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। হাজরার ট্র্যাফিক লাইটটা এড়াতে পারলে তবেই 'রাইট টাইমে' পৌছতে পারবে। কিন্তু···পেছন ফিরে সে সিংহের মতো হাঁকল 'কি হচ্ছে কি পার্টনার—গাধা বোট না এক্সপ্রেস ?' পার্টনার মানে কন্‌ডাক্‌টর সায়েব অসহায় ভঙ্গি করে উত্তর দিল—'মেয়ে দেখে থামলে কেন ব্রাদার ? লেডিস ওঠালেই গোলমাল। উল্টো পথে ভবানীপুর যাবে—না নামিয়ে দিয়ে উপায় কি ?'

'জলদি কর !'

ট্র্যাফিক আটকাল। উত্তেজনায় ঘাড়ের লোম ফুলে উঠছে। ড্রাইভারের ঠিক পেছন থেকে শুঁটকো ভদ্রলোক ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন—'লাইসেন্স কি ঠেলা গাড়ির নাকি ড্রাইভার সায়েব ? ২২ নয়া পয়সার জায়গায় ২৮ নয়া পয়সা ভাড়া দিচ্ছি খেয়াল আছে ?'

হুঙ্কার এল :

'সাড়ে দশটায় না পৌঁছতে পারলে পয়সা ফেরৎ দেব।' যেমনি বলিষ্ঠ যুবকটি তেমনি তার গলার স্বর। একটি মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ড্রাইভারটিকে দেখছে। আর মেয়েটিকে দেখছে ছুটি ছেলে। একটি ছেলের চোখের ঈর্ষা ঘন হয়ে উঠেছে। দেখে অন্য ছেলেটি বলল :

'এই জন্যেই মেয়েরা ড্রাইভারদের সঙ্গে পালায়। লোকটা সত্যি—ম্যান্‌লি বটে।'

ট্রামটা পার্ক স্ট্রীটের কাছে পৌঁছতেই একটি ম্রিয়মান 'ডুব্‌লা' মেয়ের হাত ধরে মা উঠলেন—'ওমা তুমি ?'

'হ্যাঁ অনেকদিন পরে। বাঃ মেয়ে বুঝি ? কোন্ স্কুলে ?' বান্ধবী জিজ্ঞেস করলেন। ভারি সুন্দর 'স্যামন পিঙ্ক' রঙের শাড়ি পরেছেন। লিপ্‌স্টিকের রঙ একটু ফ্যাকাশে। চোখের কোণের কাজল আকাশের দিকে তোলা। মোটা করে ভুরু আঁকা। একটু তেলতেলা গোলাপী রঙ গালে। চুলের 'বুফাঁ' কেয়ারিতে একটু নতুনত্ব—খুব বেশি তোলা নয়। শাড়ি লোটাচ্ছে। জামার হাতা ইঞ্চি প্রমাণ।

মেয়ের মা-ও সেজেছেন। কিন্তু পাল্লা তেমন ভারি নয়। মেয়েকে কি স্কুলে দিয়েছেন নামটা বললেন। বলার সময় গলা কেঁপে গেল এমন লোভনীয় স্কুল। ৫০্ টাকার ওপর মাসে মাইনে—'ইংলিশ মিডিয়াম।'

বান্ধবী হাসলেন—'বাঃ, বেশ ম্যানেজ করেছ তো। কিন্তু বেচারাকে (ইংরিজি স্বরে টেনে কথাটা বললেন) ট্রামে কেন ? গাড়ি গ্যারাজে ?'

'এখনও কেনাই হয় নি।'

'Really !' বান্ধবী হাসলেন—'তোমার সেই ultra-left কথাবার্তা কোথায় গেল ? মনে আছে তুমি debate করেছিলে—Bengali should be the medium of instruction. আমি ইংলিশ মিডিয়ামের পক্ষে বলেছিলাম। সেদিন আমি ভোটে হেরেছিলাম। আজ কিন্তু তুমি bowled out !—ও হো চলি। গাড়িটা ছেলেকে আনতে গেছে। একদিন এসো। উনি আবার আপিস বদলেছেন জানো তো ? হ্যাঁ, পি. আর. ও. তে।

ট্রামটা এগিয়ে গিয়ে থমকে আটকে গেল। সড়্‌সড়্ সড়াৎ! ব্যস ! গেছে, তার খুলেছে।

'এ্যাঃ ! হল তো ? মাঝ পথে এখন উপায় ?' ভদ্রলোক উতলা হয়ে পড়লেন।

'যেই ভয় কর তুমি সেই ভদ্র কালি আমি! ট্রাম ছাড়া উঠবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন। এখন নিন ঠেলা—বাস দেখুন। ছোটলোকের ভিড় বলে ট্রামে চড়ার শোধ আজ তুলবে!'

বাসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চৌরঙ্গির ওপর লাভের মধ্যে একখানা বাসেরই ব্রেক ডাউন হল। নাঃ, আর ব্রেক ডাউন দেখলে ঐ দুই ভদ্রলোক হয়তো বা চেঁচিয়েই উঠবেন।

জল থৈ থৈ। ৭৮ নং প্রাইভেট বাসে ঠুসে ঠুসে লোক তুলে নিল কন্ডাকটর—'আসুন বাবু, চিড়িয়ার মোড়, এস্ট্যাটিস্টিকাল, বন্হুগলি, ব্যারাকপুর! চলে আসুন চলে আসুন।'

জাহাজের মতো বয়ে চলেছে বাস। ঠাসা মানুষের ভিড়। একজন ছেলে নিঃশ্বাস নিতে না পেরে এক মহিলার প্রায় কোলের বাচ্চাটাকে চেপ্টে ফেলেছিল আর কি! কিন্তু ড্রাইভার শের-কী-বাচ্চার মতো চালাচ্ছে। এঁকে বেঁকে ঝাঁকিয়ে নিতে আবার ছেলেটি ঠিকমতো দাঁড়িয়ে পড়ে ভালোমত নিঃশ্বাস ফেলল।

'একটা টাকা আস্ত করে দাও তো'—এক মুঠো খুচরো পয়সা কনডাকটরকে দিয়ে অন্ধ ভিখারি ছেলেটি চাইল। বহুদিন ধরে এ অঞ্চলে ভিক্ষে করে। থাকে ব্যারাকপুরে। কন্ডাকটর খুচরোটা নিয়ে নিল। নোটখানা পেয়ে অন্ধ চোখের সামনে মেলে ধরে টাকাটাকে আদর করল ছেলেটি। ভিক্ষের একটা দুটো নয়া পয়সা বেড়ে বেড়ে তার এখন দিন শেষে নোট ঘরে আসে।

'আ মোলো, আজ ট্রাম বাস কোথায় পাবি রে মেয়ে—আজ যে হরতাল। কাগজে বলেছে এস্ট্রাইক।'

ছ নং বাস স্টপে দাঁড়িয়ে একদল মেয়ে হাঁটতে শুরু করল। ট্রাম লাইন খাঁ খাঁ করছে। দু-জন মজুর ওদের পেরিয়ে গেল। বোধ হয় হরতালের পাণ্ডা। মুখে তৃপ্তি ফুটে উঠেছে।

'হরতাল হবে নি? মানুষ আর কত সহ্য করবে? মোদের গাঁয়ে তো এমন টানাটানি—যেতে ইচ্ছে করে নি। সব গেলেই চেপে ধরে। ভাবে শহর থেকে বুঝি কোঁচড় ভরে টাকা এনেছে।'

টালিগঞ্জ ব্রীজের ধারে চেনা বস্তির মেয়েদের সঙ্গে দেখা। কেউ ঠিকের কাজ করে। কেউ বা সব সময়ের লোক।

'কোথায় যাচ্ছ গা হেঁটে হেঁটে ?'

'ঐ তিকোন পার্কেটে নাকি রাধাকৃষ্ণ আসবেন। তাই গান শুনতে যাচ্ছি।'

'খুব ভিড় হয়েছে দেখে এনু।'

'তাই নাকি ?'

'গাড়িতে দেখনু দু-জনে বসে আছে।'

'রাধা আর কিষ্ণ দু-জনেই ? দেখতে কেমন গা ?'

ওদের কথা শুনছিল একটি যুবক মজুর। হেসে উঠল—

'আচ্ছা মুক্‌খু তো। রাধাকৃষ্ণণ হল আমাদের দেশের প্রেসিডেণ্ট।'

'তাই্ বল! প্রেসিডেন্সি ? আমি বলি বুঝি কোনো বোষ্টম ঠাকুরের পালাগান হবে। তাই হেঁটে এনু। তা প্রেসিডেন্সিকে নিয়ে এত ভিড় কেন র‍্যা ? আমাদের গাঁয়েরটা তো চুরি করে কোটা বাড়ি তুলেছে। রিলিফের চাল আটা ফাঁক!'

মজুরটি জিভ কাটল—

'আ ছি ছি! এ কেন তা হবে—এ যে মস্ত লোক।'

'তাহলে চ'রে। গয়নার দোকানে ১৪ ক্যারেটের গয়না দেখে আসি।'

শহরের আকাশ জুড়ে মেঘ। পশ্চিম আকাশ লাল লাল হয়ে উঠতেই চার নং বাসে গুঁতোগুঁতি মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। এ বাসে প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। টালিগঞ্জগামী বাসের বেশির ভাগই ক্যালকাটা ফর্‌টি-র বাসিন্দা।

জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন বাবুটি। হঠাৎ ঘ্যাচ্! বাস যাবে না। কেন, কেন, কি ব্যাপার ?'

'হরিবোল! এত জল ? বিষ্টি হচ্ছিল, না ?'

'বলেন কি ? লক্ষ্য করেন নি ?'

প্রথম ভদ্রলোক ভয়ানক চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন—'কিন্তু যাই কি করে—এক হাঁটু যে!'

"সেতো হবেই। কথায় বলে চার নং বাসে বসে কাঁদলে টালিগঞ্জ ব্রীজের তলা ভেসে যায়। নিউ আলিপুর ঘুরে যান।'

'সে কি আর হবার উপায় আছে ? স্ত্রীর ব্যথা—মানে—আপিসে খবর—'

অনেকেই আলোচনা শুনছিলেন। বাস একটু দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে নেবে ভাবছে।

একজন রসিক যাত্রী গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'ক নম্বর।'

হুড়মুড় করে নামতে নামতে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—'ছ নম্বর।'

'বাঃ! চলে যান সাঁতরে।'

'জুতোটা—ঐ একটাই।'

ব্রীজের সামনে যাত্রী ওঠাবার তালে দাঁড়িয়েছিল এক নব্য ঠেলাওয়ালা। প্যাণ্ট গোটানো। রঙচঙে শার্ট গায়ে। সে বলে উঠল—'আসুন না, ছ নয়াতে পার করে দিচ্ছি।'

'ছ নয়া? বল কি? গত বছর তিন নয়াতে পার হয়েছি।'

'গত বছরের সঙ্গে এ বছরের তুলনা? চালের দাম?'

'তাই বুঝি আমাদের ঘাড়ে—'

'আরে উঠে পড়ুন। একটা টিরিপ দিয়ে দিই।'

টালিগঞ্জ ব্রীজের তলায় এক কোমর জলে ছেলেটি টিরিপ দেওয়া শুরু করল। ঠেলা গাড়িটায় জল ঠেকে ঠেকে।

'উঠে পড়ুন!'

ভদ্রলোক উঠে বসলেন। আরও অনেকে। বাসটা হুস্ হুস্ করে উল্টোমুখে পালাল।

নর্দমার জল ছিট্‌কে ঠেলা চলেছে। ছেলেটি গাইছে—'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা…'

'বাঃ বেশ গাও তো হে।'

'আনমনা যেন দিক বালিকা…'

স্ত্রীর ব্যথার কথা সম্পূর্ণ ভুলে ভদ্রলোক চড়া স্বরে ঠেলাওয়ালার গলায় গলা মেলালেন—

'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী…'

তরণীখানি যখন ওপারে পৌছল তার ঢের আগে কলকাতায় একটি নবজাত শিশু ষষ্ঠ সন্তানের গৌরব নিয়ে জন্মেছে।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পোশাক-আশাক

শহর কলকাতার মানুষের পোশাকে রঙের অভাব এক বিদেশী লেখকের চোখকে পীড়া দিয়েছিল। শুধু শাদা আর ধূসর। ধূসর অর্থাৎ আধময়লা শাদা: 'ডাল', বড়ো 'ডাল' বিদেশী লেখক আপশোষ করেছিলেন।

বিদেশী লেখক কলকাতা দেখতে এসেছিলেন বছর ত্রিশেক আগে। তখনও ধুতি-পাঞ্জাবির যুগ ছিল। 'হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-বুট' পরা বাঙালি কদাচিৎ চোখে পড়ত। পাঞ্জাবির উপর তখন কেউ কেউ চাদর চড়াতেন। আর কত যে বাহার ছিল চাদরের। কেউ পাকানো চাদর গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন, কেউ ফাঁসের মতো করে গেড়ো দিতেন, কেউ পাটকরা চাদরের এক প্রান্ত সামনে ঝুলিয়ে অপর প্রান্ত বগলের তলা দিয়ে চালিয়ে দিতেন পেছনে। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় কোনো জনপ্রিয় মাসিকপত্রে চাদরের মারপ্যাচের সুন্দর একপ্রস্থ কার্টুন দেখেছিলাম। সম্ভবত চঞ্চলের আঁকা কিংবা হয়তো বিনয়কৃষ্ণের। কেউ কেউ অবশ্য পাঞ্জাবির বদলে পরতেন শার্ট। কেউবা আবার শার্ট ধুতির ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন। প্যাণ্টালুনের মতো বেল্ট বাধতেন কোমরে। তার ওপর গলাবন্ধ, এমন কি ওপন ব্রেস্ট, কোট পরতেন। এই ছিল মার্চেণ্ট আপিসের জ্যেষ্ঠ কেরানির রাজবেশ। নিশ্চয়ই রঙছুট—'ডাল', বড় 'ডাল' এ পোশাক।

আর মেয়েরা পরতেন ঢাকাই বুটি, শান্তিপুরী, টাঙ্গাইল কি ধনেখালির শাড়ি। বড়জোর মুর্শিদাবাদ সিল্ক কি গরদ, উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য বেনারসি নাইলন, সিফন তো দূরে থাক, চকচকে গাঢ় রঙের ব্যাঙ্গালোর সিল্কেরও তখন চল হয় নি। বিদেশীর চোখের রঙের ঝিলিক লাগবে কোথা থেকে!

কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ। আজ যদি সেই বিদেশী আসতেন শহরে,

কলকাতার এসপ্লানেডে যে কোনো দিন সন্ধ্যায় ঘুরে যেতেন একবার, হলফ করে বলতে পারি, তাঁর আপশোষের কারণ ঘটত না। আর শুধু চৌরঙ্গি কেন, বালিগঞ্জ কি বাগবাজার, শ্যামবাজার কি ভবানীপুর, এমন কি বড়বাজার —রঙের অভাব কোথায় !

নাইলন, সিফন, র কটন তো বটেই, মেয়েদের শ্রীঅঙ্গে কি লাগেনি রুজ লিপস্টিকের পরশ। নেই আর সেই পাতা কেটে কান ঢেকে চুল বাধবার দিন, এমন কি সাপের উপমা সেই বিনুনিও আজ অদৃশ্য হতে চলল। নাপতেনিরা এখন কিংবদন্তী। তার বদলে এখন বিউটি-পারলার, পার্মিং, বব, পাকানো পাকানো কার্ল, বিচিত্র হেয়ার-ডু। পারফিউমারি তেল এখন আউট অফ ডেট। শ্যাম্পু করা রুক্ষ ফাঁপানো চুল এখন বড়জোর চুড়ো করে বাধা যেতে পারে—তপস্বিনী গৌরীর মতো। 'কালার ফুল' নিশ্চয়ই। কিন্তু রঙ কি লেগেছে শুধু 'দ্বিতীয় প্রাণির' কেশে এবং বেশেই ? আদমের ড্রেসে নয় ? 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা' প্রবাদ বাক্যটি কখনও সত্য ছিল কিনা জানিনা, এখন যে মিথ্যে তা জোর গলায় বলতে পারি। নিজের রুচি অনুযায়ী খানা খেতে পারি, কজনে এবং কদিন ? খানা খেতে রুচি ছাড়া লাগে রুপায়া। কজনের তা অঢেল আছে ? আর পোশাক ? এই যে আমরা ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে কামিজ-পাৎলুন ধরেছি তা কি পরের রুচিকে খুশী করবার জন্যে ?

নেই আর সেই ঘোড়ায়-টানা ট্রামের যুগের মন্দমন্থর জীবনযাত্রা, এক-ঘেয়েমি কাটাবার জন্য নোট বেধে ঘুড়ি ওড়ানো, রাত্রে বারবণিতালয়ে হুল্লোড়। যন্ত্রযুগের উদ্বোধনে জীবনের গতি দ্রুত হয়েছিল আগেই। আর এখন তো একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে গেলেও ছুটতে হয় উর্ধ্বশ্বাসে। ট্রামে

ভিড়, বাসে ভিড়, গা-গতর আস্ত নিয়ে ওঠা-নামা করতেই প্রাণান্ত। গোরুর গাড়ির যুগের ধুতি-পাঞ্জাবি এর সঙ্গে তাল রাখবে কি করে!

আমরা পোশাক বদলেছি প্রয়োজনের তাগিদেই, 'হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-বুট' পরে 'বিলেতি বাঁদর' সাজার জন্য নয়। তার দরকারই বা কি! সাহেব-স্থবোরা তো সেই কবেই বিদেয় নিয়েছে এ-দেশ থেকে!

আর এ-পোশাককে সাহেবি নাম দিলে তারা দেবে না ঠুকে একনম্বর মানহানির মামলা! হ্যাট নেই, কোট নেই, এমন কি বুটও না,—শুধু একজোড়া প্যাণ্ট, উর্ধাঙ্গে শার্ট কিংবা হাওয়াই শার্ট, এক বন্ধুর ভাষায় ম্যাটারনিটি জ্যাকেট, পায়ে কাবুলি কি কোলাপুরি চপ্পল—এই পোশাককে সাহেবি নাম দিলে মরা সাহেবও যে পার্ক স্ট্রীটের কবরে নড়ে উঠবে!

কিন্তু পোশাকের বিবর্তনের এই সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যা টেনে বড় করবার প্রয়োজন নেই। এখানে তা হবে ধান ভানতে শিবের গীত। প্রয়োজনের তাগিদে আমরা ধুতি ছেড়ে পাৎলুন ধরতে পারি কিন্তু ড্রেন পাইপ, রেয়ন, নাইলন, টেরিলিন, ছুঁচলো ইতালিয়ান জুতো—প্রয়োজনের কোন স্থত্রে এর ব্যাখ্যা করা যাবে?

আমি রঙ-কানা নই, কোন ছুঁৎমার্গও নেই আমার ও-সম্পর্কে। বলতে কি, সন্ধ্যার চৌরঙ্গির রামধনু-রঙা জগতে নরনারীর টেকনিকলার মিছিল দেখতে আমার ভালোই লাগে। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়, প্রশ্নটা হল, আমরা কি অতিমাত্রায় পোশাক-সচেতন হয়ে উঠছি?

গত কয়েক বছরের মধ্যে চোখের সামনে চৌরঙ্গি জুড়ে গজিয়ে উঠতে দেখলাম কতগুলি ঝলমলে হাল-ফ্যাশনের পোশাকের দোকান আর তাতে ভিড়ের কমতি নেই। সরকারি হিসেব অনুসারেই যে-দেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় পনেরো আনারও কম সে-দেশে এই পোশাক-সচেতনতা কী স্বাস্থ্যের লক্ষণ?

পাড়ার দরজির দোকানের জামায় আমাদের এখন আর মন ওঠে না। মেটেবুরুজের দরজির অন্ন উঠল বলে। এখন আমাদের চাই হাতে-গরম বিলেতি ডিজাইনে বোম্বাইয়ে তৈরি ঝলমলে কামিজ, হাওয়াই কামিজ। আর এ-সব জামা-কাপড় এখন এমন সব লোকের গায়েও দেখি যাদের আয় এমন কি দিনে পনেরো আনাও নয়।

আমি অবশ্য দারিদ্র্যবিলাসী নই, সম্পদের প্রদর্শন যদি ভালগারিটি হয়,

দারিদ্র্য নিয়ে বিলাস করাটাও তাই। দারিদ্র্যকে আমরা অবশ্য মেনে নিতে বাধ্য হই—সে অন্য কথা। কিন্তু ঝলমলে পোশাকেই কি দারিদ্র্য ঢাকা পড়ে? না প্রকট হয় আরও?

তিরিশ বছর পরে আর এক বিদেশী লেখক এদেশে এসেছিলেন কিছুকাল আগে।

তাঁকে কোনো প্রকাশক নাকি বলেছিলেন, শহর কলকাতা আভিজাত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং একরূপ বিনা যুদ্ধে।

কিন্তু এই সেদিনও কি তারা ট্রাম পোড়ায় নি? বিমূঢ় লেখক জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

হ্যাঁ, কিন্তু তাও পাঁচ-সাত বছর পরে···

আশঙ্কা হয় প্রকাশক হয়তো ঠিক জায়গাতেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

প্রদ্যোৎ গুহ

'মিছিলের শহর'-এর ছবিগুলি এঁকেছেন নিখিলেশ দাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

"মৃণালকান্তির আত্মচরিত"

ভূমিকা

মৃণালকান্তি আমাকে অনেক গলিঘুঁজি, চোরাপথ, ভাঁটিখানা, বেশ্যাদের আস্তানা, হিজড়েদের আড্ডা চিনিয়েছিল। এইভাবে চেনা রাস্তা ভুলিয়ে অচেনা রাস্তায় সে বহুবার আমাকে নিয়ে গেছে। মনে আছে অনেকদিন মৃণালকান্তির সঙ্গে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রিফিউজিদের বিবাহ, সঙ্গম, জন্ম এবং মৃত্যু দেখব বলে দাঁড়িয়ে থেকেছি। উপকরণের খোঁজে এইভাবে সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। যতদূর জানা যায় মৃণালকান্তি তখন তার আত্মজীবনী রচনায় ব্যস্ত ছিল। তার সেই আত্মজীবনীর কিছু কিছু পৃষ্ঠা আমি পড়ে দেখেছি। সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও স্বপ্ন—এই ছিল তার আত্মজীবনীর উপকরণ এবং এইসব নিয়ে সে এত বেশি উত্তেজিত থাকত যে কখনো রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে তার মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কপাল টিপে রেখে এমন ভাবে তাকাত যেন চিনতে পারছে না। তার রুক্ষ চোয়াল, গাল-ভাঙা মুখের ওপর নীল শিরাগুলি দেখা যেত। কখনো আমি তাকে বলতাম "তোমাকে মাঝে মাঝে ভীষণ অচেনা মনে হয় হে মৃণালকান্তি, বাস্তবিক!" পকেট থেকে জাদুকরের মতো নিমেষে একটা রুমাল বের করে মৃণালকান্তি তার মুখের বিষণ্ণতা ও ক্লান্তি চাপা দিয়ে বলত "কোথাও যাচ্ছ! কিংবা খুব ব্যস্ত কি?" আমি "না" জানালে সে বলত "তবে এসো, একটু চা খাওয়া যাক।" নির্জন অচেনা নিঃশব্দ কোনো রেস্তরাঁয় আমরা মুখোমুখী বসতাম আর তখন মৃণালকান্তি কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সদ্যলেখা তার আত্মজীবনীর পৃষ্ঠাগুলি বের করে আমাকে পড়তে দিত।

আমার মনে হয় আত্মজীবনী বলতে যা বোঝায় মৃণালকান্তি ঠিক তা লেখেনি। এইরকম জনশ্রুতি আছে যে মৃণালকান্তি প্রায়ই স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা আক্রান্ত হত। এই সম্বন্ধে সে নিজে লিখে গেছে "আমার মনে হয় স্মৃতি এবং স্বপ্ন—এই দুইটি শব্দ আমাদের সচেতন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাপপুণ্যময় এ জগতে স্মৃতি এবং স্বপ্ন সকলেরই স্বাভাবিক অবলম্বন। বাস্তবিক

ঠিকমতো অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে আমাদের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা, দার্শনিক প্রবন্ধ, ইস্পাতের কারখানা এবং দুরবীক্ষণ যন্ত্র স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা রচিত।" মনে হয় এইখানে মৃণালকান্তি স্মৃতি অর্থে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং স্বপ্ন অর্থে কল্পনা বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আমার অনুমান এইমাত্র যে মৃণালকান্তির স্মৃতি ও স্বপ্ন খুব স্বাভাবিক স্তরে ছিল না, কেননা সে নিজেই অন্যত্র লিখেছে "...কিন্তু আমার আত্মজীবনী বাস্তবিক ইস্পাতের কারখানা, প্রেমের কবিতা কিংবা দার্শনিক প্রবন্ধ নয়। ইহার ভিতরে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের দু-একটা লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও বাস্তবিক ইহাকে ষোলো আনা দুরবীক্ষণ যন্ত্রও বলিতে পারা যায় না। যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে তাহারা প্রেমের কবিতা এবং দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু আত্মজীবনী রচনার চেষ্টা কদাচ করে না। আমার মতো মানুষের আত্মজীবনীর মূল্য কি তা—যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে—তাহাদের কাছে বোধগম্য নয়। কেননা, যে স্মৃতি এবং স্বপ্ন অতীতে একদা আমাদের ইস্পাতের কারখানা ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহা আমার ভিতরে উপস্থিত থাকিলে আমার যাবতীয় পণ্ডশ্রম একটিমাত্র আত্মজীবনী রচনাতেই কেন্দ্রীভূত হইল কেন! তাও স্থির প্রত্যয়জাত কিংবা অঙ্কের মতো নির্ভুল কোনো কিছু এই রচনাতে নাই—বরং এর সর্বত্র রচয়িতার তীব্র সন্দেহমাত্র উপস্থিত আছে। কোনো ঘটনায় মাথার ভিতরে চকিতে বিস্ফোরণ ঘটিলে তাহার আলোতে যতদূর দেখা যায় ততদূর হইতে আমার স্মৃতি ও স্বপ্নগুলি আহরণ করিতেছি। মাঝে মাঝে ভ্রম হয় আমি কতদূর অর্থহীন তাহা জানিবার আগ্রহেই আমি এই আত্মজীবনী রচনা করিতেছি।"

আখ্যান

ছায়া ছিল খুব হিসেবী মেয়ে। যাদবপুরের কোন রিফিউজী কলোনী থেকে ছায়া কলকাতায় মাস্টারি করতে আসত। মৃণালকান্তি পরিচয় করিয়ে দিলে আমি ছায়াকে প্রথম দেখে বড় হতাশ হই। টলটলে চোখ ছিল না ছায়ার—শীতকালে শুকনো ঠোঁটের ওপর মামড়ি দেখা যেত। শরীরে মেয়েদের যে সব আকর্ষণ থাকে তার কোনোটাই ছিল না। খুব ঘন ঘন সিনেমা দেখত ছায়া—সব বাঙলা ছবিই তার মোটামুটি ভালো লাগত। কখনো কোনো কবিতার লাইন ছায়া বলেছিল কি! আমার মনে পড়ে না। প্রথমবার পরিচয় করিয়ে

দেওয়ার সময় মৃণালকান্তি "এই ছায়া। আমার—" বলে কথা শেষ করবার আগেই —মনে পড়ে ছায়া বলল "থাক আর বলতে হবে না, উনি বুঝতে পারছেন।" মৃণালকান্তির সামনে প্রথমদিনই ছায়া আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল "আমি খুব বেশি খাই না," বলেছিল "আমার ছোট বোন গান জানে, আপনার সঙ্গে বেশ মানায়।" প্রতি বৃহস্পতিবার আর শনিবার সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সে মৃণালকান্তির সঙ্গে থাকত। ঐ দু দিন তার টিউশনি ছিল না। সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরে ছায়া বাড়ি ফিরত—যদিও, ছায়ার হাতে কখনো ঘড়ি দেখিনি। যেমন টনটনে ছিল তার সময়জ্ঞান তেমনি বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল ছায়ার। মৃণালকান্তি ডায়েরী লিখছে জেনে সে মধ্যে মধ্যে তার ডায়েরী পড়তে চাইত। মৃণালকান্তির আত্মজীবনীর সবটুকু আমি পড়িনি। ছায়াকে কোথা থেকে কেন জোগাড় করেছিল—সে আমি জানি না। মনে পড়ে তার আত্মজীবনীর কোথাও ছায়ার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার আগে সে লিখেছিল "…কোনোদিন কোনো যুবতী মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়া যাই নাই—যাহাতে মনে হয় চতুষ্পার্শ্বস্থ সবকিছু আমাদের কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে। আমি কখনো মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়াছিলাম। সমান বুদ্ধিমতী সমান বয়স্কা কোনো মহিলার সঙ্গে হাঁটিয়া গেলে এমন মনে হইবে কি যে এই মুহূর্তগুলি আমার সবচেয়ে প্রিয়; যেন আমরা সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি! মনে হইবে কি যে আমি কখনো মৃত্যুশোক অনুভব করি নাই! নিজেকে ক্ষুদ্রজীবী শিশুর মতো মনে হইবে কি যে তাহার প্রিয়জনদের দেহে ক্ষুদ্র হস্ত পদের দ্বারা প্রবল আঘাত করিয়া জানাইতে চাহে—আমি আছি!…"

মনে হয় ছায়া ক্রমশ মৃণালকান্তি সম্পর্কে হতাশ হচ্ছিল। মৃণালকান্তি ছিল প্রায় বেকার। কোনো এক ছোট্ট প্রকাশকের দোকানে সে কিছুদিন কাজ করেছিল। মাঝে মাঝে বইয়ের প্যাকেট বয়ে নিয়ে তাকে এখানে ওখানে পৌঁছে দিতে হত। কিন্তু খুব গরীব সে ছিল না। তার বাবার জমানো কিছু টাকা সে পেয়েছিল, ভাইবোন না থাকাতে পাকিস্তানের জমিজমা বিক্রি করে কিছু টাকার নিরঙ্কুশ মালিকানা সে পেয়েছিল। এইসব বন্দোবস্ত তার মা মৃত্যুর আগেই তার জন্য করে যান। নইলে ষাট টাকা মাইনে পেয়ে বেনেটোলা লেন-এর যে ঘরটা ভাড়া করে সে থাকত তার ত্রিশ টাকা ভাড়া দিয়ে দিলে পাইস হোটেল, সিগারেট এবং প্রতিদিনের পয়সা তার থাকত না।

মৃণালকান্তি বেহিসেবী ছিল না, কিন্তু সম্ভবত ছায়া চাইত—বিয়ের পর মৃণালকান্তি তাকে চাকরী ছেড়ে দিতে বলুক, এবং দোকানের শো-কেসে সাজানো কিছু কিছু জিনিসপত্র মৃণালকান্তির ঘরে থাক। বিয়ে করার কথা ছায়া এত বেশি ভেবেছিল যে একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অন্ধকারে মুখ রেখে বলে "আমি চাই তুমি এমন কোনো কাজ্ করো যাতে আমাকে ছেড়ে তোমাকে অনেকদিনের জন্যে দূরে চলে যেতে হয়। আমি বেশ তোমার অপেক্ষায় থাকব।" অন্যদিন শিয়ালদায় ট্রেন লেট আছে জেনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে বলেছিল "অফিস থেকে ফিরে এলে পিছু পিছু অফিসের পিওন ফাইল নিয়ে আসে—দেখতে আমার বেশ লাগে।"

মৃণালকান্তি ছায়াকে কখনো খুব দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, ছায়া রাজী হয় নি। মনে হয় নানা পরিবেশে সে ছায়াকে দেখতে চাইত। কি দেখতে চাইত মৃণালকান্তি! ঠিক কি চাইত তা আমি জানি না, তবে তার আত্মজীবনীর কোনো এক জায়গায় আমি পড়েছিলাম, একদিন লিণ্ডসে স্ট্রীটের এক দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাচের শো-কেসে একটা মেয়ের 'ডামি' দেখে মুখটা খুব পরিচিত মনে হওয়ায় সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে লিখেছে "ইহাকে আমি কোথায় দেখিয়াছি! এইরূপ প্রাণহীন প্রস্তরবৎ মূর্তি নয়, আমি অবশ্যই ইহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, ইহাকে হাসিতে ও কথা বলিতে দেখিয়াছি। ইহাকে আমি বিষাদগ্রস্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না। এমন মাঝে মাঝে হয়। গতকালের কথা কতবার ভুলিয়া গিয়াছি। স্টেট বাসে কে আমার পাশে বসিয়াছিল—তাহার মুখ দেখি নাই, কণ্ডাক্টরের হাতে পয়সা গুনিয়া দিয়া টিকিট লইয়াছি—কৈ কোনো কণ্ডাক্টরের মুখ তো মনে পড়ে না! মনে হয় কতকাল মানুষের সহিত আমি কিছুই বিনিময় করি নাই।" তারপর মৃণালকান্তি লিখছে "মনে হয় এই মুখে কোথাও বিষণ্ণতা ছিল। দীর্ঘকাল কাচের আবরণে ঢাকা থাকিতে থাকিতে সেই আবরণ ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার ইচ্ছা জন্মায় নাই বলিয়া কি এই বিষাদ! মনে পড়ে যাহাদের মুখে বিষণ্ণতা ছিল না তাহাদের সহিত কখনো আমার বন্ধুত্ব হয় নাই। বোধকরি সেইজন্যই সুবলের মুখ আমি ভুলিয়া যাই নাই।" এরপর মৃণালকান্তি সুবলের কথা অনেকটা লিখেছে। সুবল চমৎকার গল্প বলতে পারত। স্কুলে অনেকে সুবলকে ঘিরে বসে গল্প শুনত। বলতে বলতে সে ইচ্ছেমতো গল্পটাকে বড় কিংবা ছোটো করতে পারত, বদলে দিতে

পারত, গল্পটা যেদিকে যাচ্ছিল ঠিক তার উল্টোদিকে নিয়ে যেতে পারত। তার গল্প শুনে সবচেয়ে যে বেশি মুগ্ধ হয়ে যেত সে ছিল মৃণালকান্তি। সুবলের গায়ে নানা জায়গায় কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী ঘা ছিল—যা কখনো শুকোত না; মাঝে মাঝে ঘা বেয়ে রক্ত পড়ত, প্রায়ই খোস পাঁচড়ায় ভুগত সুবল, এবং কাছ থেকে কথা বললে সুবলের মুখ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ পাওয়া যেত। মৃণালকান্তি তাকে ঘেন্না করত। সেই সুবল একবার তার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। মৃণালকান্তি লিখছে "সহসা আমার ভিতরে সে কী সঞ্চার করিয়াছিল! চকিত বিস্ফোরণের আলোয় আমি কী দেখিতে পাইয়াছিলাম! মনে পড়ে না। সুবলকে দেখিতাম—স্কুলের সিঁড়িতে সে একা বসিয়া আছে, গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়া একা একা ফিরিতেছে। আমি আর তাহার কাছে যাই নাই।" দীর্ঘদিন—প্রায় আঠারো-উনিশ বছর পর সুবলকে সে আবার দেখেছিল, কলকাতায় সিনেমা হলের কর্মীরা মিছিল বের করলে সেই মিছিলে সুবলের মুখ চকিতে ভেসে যাচ্ছিল। সুবল কোন সিনেমা হলে 'গেট কিপার' হয়েছিল। সে লিখছে "একদা ছেলেবেলায় মুখোমুখী হইয়া সহসা শূন্য বোধ করিলে যাহা আমরা করিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি আমাকে গভীরে আহত করিল। আজ আবার দেখা হইলে আমরা পরস্পর কি বিনিময় করিব! কিন্তু এতদিন পর সুবলকে আমি পুনরায় হাজার লোকের মিছিল হইতে চিনিয়া বাহির করিয়াছি। আমি কী দেখিয়াছিলাম! মনে হয় সুবলের মুখের সেই বিষাদ কখনো পাল্টায় নাই, মনে হয় একাকী, কিংবা বহুজনের সঙ্গে মিলিয়া বরাবরই সুবলের কি একটা কথা বলিবার ছিল—ছেলেবেলায় তাহার গল্পের ভিতর দিয়া, চুম্বনের ভিতর দিয়া, শেষ যৌবনে আর্ত শ্লোগান ও উৎক্ষিপ্ত বাহুর ভিতর দিয়া সে সেই কথাই বলিয়া চলিয়াছে। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিলাম। দেখা হইলে আজ আমরা পুনরায় চুম্বন না বিষণ্ণতা বিনিময় করিব! ভিড়ের ভিতরে আত্মগোপন করিতে করিতে আমার মনে হইল আজ আমি পুনরায় সুবলকে ভালোবাসিতে পারিতেছি।"

তেমন করে মৃণালকান্তিকে ছায়ার কিছু বলবার ছিল কি? যতদূর জানি বিষণ্ণতা ছায়ার ভিতর কোথাও ছিল না। বিভিন্ন চুম্বনের আলাদা আস্বাদ মৃণালকান্তি টের পেত কিনা আমি জানি না। সুবলের কথা শেষ করে মৃণালকান্তি লিখছে "কিন্তু বাস্তবিক ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—এই ডামির মুখে আনন্দ বা বিষাদ কিছুই নাই। প্রাণহীনতা আছে মাত্র। এই প্রতিমার

মতো মুখের সহিত অলৌকিক চিত্ত বিনিময় সম্ভব নহে। দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের বাজনায় কেবল ইহার তাৎক্ষণিক বিষণ্ণতা ধ্বনিত হয়।"

মনে হয় ছায়ার ভিতর তবু কিছু খুঁজে পেয়েছিল মৃণালকান্তি যা তার ডামির মুখের বিষণ্ণতার মতো তাৎক্ষণিক। মৃণালকান্তির আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি কোনো শনিবার ময়দান থেকে বেরিয়ে ফিরবার পথে বৃষ্টি নামলে ছায়া ওর আগে আগে দ্রুত হাঁটছিল। ছায়া কোনো 'শেড' খুঁজছিল—মৃণালকান্তি ওকে দাঁড়াতে দিল না। ওরা সাবধানে হাঁটছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছিল। ছায়ার শাড়ির কলপ্ ভিজে গিয়ে শাড়িটা ওর রোগা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ওকে দেখাচ্ছিল হঠাৎ চোপসানো, ভেজা একটা চড়াই পাখির মতো। ময়ূর তার পেখম গুটিয়ে নিলে হঠাৎ তার পিছনে যে শূন্যতা দেখা দেয়—মৃণালকান্তি লিখছে "ছায়ার সম্মুখে সেইরূপ শূন্যতার ভিতর দিয়া দেখা গেল একজন ট্রাফিক পুলিশ একটা কানা ভিখিরির ছেলেকে হাত ধরিয়া রাস্তা পার করিয়া দিতেছে। ছায়া এইসব কিছুই দেখিল না। দেখিল না তাহার সম্মুখে ক্ষণস্থায়ী সেই কম্পমান দৃশ্যের পশ্চাৎভূমিতে তাহার ঘাড়ের তিনটা হাড় উঁচু হইয়া আছে, চূর্ণ চুলের উপর জলের ফোঁটার উপর সহসা প্রলয় প্রতিভাত হইতেছে। আমি মনে মনে তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম—এখন তোমার চতুর চোখ আমার দিকে ফিরাইও না, সোজা হাঁটিয়া যাও—আমি তোমার পিছনে এইরূপে শাশ্বতকাল হাঁটিতে থাকিব। কিন্তু কোথায় যেন বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। ছায়া মুখ ফিরাইয়া আমাকে কি বলিতেছিল—আমি শুনি নাই। শুধু চূর্ণ দৃশ্যের উপর, জলে প্রতিভাত বিশ্বের উপর হইতে ডামির মুখের ক্ষণস্থায়ী বিষণ্ণতা ভাঁটার টানে নামিয়া যাইতেছিল।"

সেই রাতে ফিরে এসে মৃণালকান্তি লিখেছিল "আমার বাবা সুধাকর হালদার ছিলেন দারোগা। তাঁহার মফঃস্বলভ্রমণের জন্য একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়া ছিল। আমি একটু বড় হইলে আমার রোগা রোগা হাত পায়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল খুব শক্ত সমর্থ হইয়া গড়িয়া না উঠিলে তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তি জীবনে এমনকি দারোগাও হইতে পারিবে না। তাই আমার ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য আমাকে একদিন সেই ঘোড়ায় সওয়ার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মনে পড়ে আমি ভয়ে অনেক চীৎকার ও কান্নাকাটি করিয়াছিলাম। অবশেষে ঘোড়াটা আমাকে এক মাঠের ভিতরে আনিয়া পিঠ

হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অনেক বড় হওয়ার পরও সেই দুঃস্বপ্নকে আমি ভুলিয়া যাই নাই। অনেকবার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়াছে। মনে হয় জাগরণেও সেই পতনের অনুভূতি আমাকে কখনো ঝাঁকি দিয়া যায়। সংশয় হয় আমি শাশ্বতকাল একটিমাত্র ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি না তো!" তারপর সুধাকর হালদারের কথা লিখতে গিয়ে মৃণালকান্তি দীর্ঘ বর্ণনা করেছিল। শেষে সে লিখছে "···তখনো আমি ছোট, মফঃস্বল হইতে ঘোড়ার পিঠে একা ফিরিবার পথে কাহারা মাছের জাল ছুঁড়িয়া তাঁহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং সেইখানেই লাঠিপেটা করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। বনতলীর নির্জন মাঠের ভিতর সেই গ্রাম্য দারোগা-হত্যার ঘটনাতেই সম্ভবত সুধাকর হালদার তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তির অনুভূতিগুলি প্রথম ও শেষবারের মতো প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। মনে পড়ে মায়ের মৃত্যুতে তেমন ঘনঘটা কিছুই ছিল না। কলিকাতার এক ভাড়াটে বাড়িতে তাঁহার চেষ্টাহীন নিঃশব্দ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বাড়িওয়ালাই কিছু লোকজন ডাকিয়া আনিয়াছিল। শোক না, বৈরাগ্যও না—বিরাট এক মিশ্র জনতার ভিতর দিয়া খোলা রাস্তায় উজ্জ্বল রৌদ্রে আমার রোগা ছোট্ট মায়ের মৃতদেহের অনুগমন করিয়া যাইতে আমার লজ্জা করিতেছিল। আমি কাহার জন্য শোক করিব, কাহাকে ভালোবাসিব! পৃথিবীর যে প্রকাণ্ড মিশ্র জনতার ভিতর আমি রহিয়াছি তাহাদের কয়জন জানে যে একজন মৃণালকান্তির একজন মা ছিল এবং মৃণালকান্তির সেই রোগা, ছোট্ট, দুর্বল মা আর নাই!" মৃণালকান্তি লিখেছিল "নিজেকে এমন উদ্বাস্তু মনে হয় কেন! কখনো নিশ্চিতভাবে কেন বলিতে পারি না—আমি ভালোবাসি! ভালোবাসি না—এ কথাও সংশয়ে কতবার বলা হয় নাই!"

গড়িয়াহাটার দিকে কোথায় যেন মৃণালকান্তির সোনাকাকা গেঞ্জী ফিরি করে বেড়াত। তার এইরকম কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। বিধবা 'রাঙ্গামাসী', বাবার খুড়তুতো ভাই সোনাকাকা, বড়পিসি, গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশাই ইত্যাদি এবং যাদবপুর, টালিগঞ্জ, কসবা, মধ্যমগ্রাম কিংবা আরো দূরে তার আরো আত্মীয়রা ছিল। কখনো কারো সঙ্গে দেখা হলে আর কাউকে মনে পড়ত তখন খেয়াল করে খোঁজ নিত, একদিন গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে আসবে বলে কথা দিত। প্রায়ই যাওয়া হয়নি।

কখনো কারো অভাব শুনলে দু-পাঁচ টাকা সাহায্য পাঠিয়েছে, কখনো পাঠানো হয়নি। কলেজ স্ট্রীটে ছায়ার সঙ্গে একদিন রাস্তা পার হতে গেলে কাঁধে গেঞ্জীর বোঝা নিয়ে সোনাকাকা পথ আটকাল—দু-জনকে একসঙ্গে দেখেও। আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সোনাকাকা "বিয়া করস্ নাই!" মৃণালকান্তি লিখছে "সোনাকাকাকে কষ্টে চিনিতে পারিয়া আমি সিগারেট ফেলিয়া দিলাম। তবে কি আমি আস্তে আস্তে প্রিয়জনদের মুখগুলি ভুলিয়া যাইতেছি! মনে পড়ে হাওড়া স্টেশনে একজন তাহার বিড়ি ধরাইতে আমার সিগারেটটা চাহিয়া লইয়াছিল। কেমন সন্দেহ হওয়ায় আমি আর সিগারেটটা ফেরৎ না লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। মনে হইল, ইহাকে আমি কখনো জ্যাঠা বলিয়া ডাকিতাম কি! আত্মীয়দের মুখ ক্রমশ ভুলিতেছি। 'রাঙ্গামাসী'র মুখ মনে পড়ে না। কবে যেন বড়পিসি আমাকে বলিয়াছিল "মনু, বাইরে চলাফিরা কর, একখান পঞ্জিকা রাখ্‌ছ তো!" ছায়া কি ভাবিল জানি না। সে আমাকে কিছু বলে নাই। আমি পকেটে হাত দিতে গেলে সোনাকাকা আমার হাত আটকাইল "মনু, তরেই তো আমার খাওনের কথা।" তাহার পর ছায়ার সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটিয়া গেলাম। মনে পড়ে না কোনোদিন আমার মানুষকে ভালোবাসিবার সর্বব্যাপী সাধ হইয়াছিল কিনা।"

অন্য একদিনের কথা মৃণালকান্তি লিখেছিল। দুপুরবেলায় এসপ্ল্যানেডে একটা ফাঁকা রেস্তরাঁয় সে বসে ছিল। সেটা একটা মাদ্রাজী রেস্তরাঁ। কিছুক্ষণ আগে সে দ্বিতীয়বার স্টেনলেস স্টীলের কাপ থেকে গরম চা খেয়েছে। তাঁর ঠোঁট জ্বলছিল। বাইরে সবকিছুই খুব আলোকিত, উত্তপ্ত এবং ছায়াহীন। রেস্তরাঁর ভিতরটা অনেক ঠাণ্ডা এবং নির্জন। সে লিখছে "যেখানে বসিয়া আমি আমার নোট লিখিতেছি সেখান হইতে রাস্তা, ময়দান, মনুমেণ্ট সবই দেখা যায়। স্টেটবাসগুলি রাস্তা গিলিতে গিলিতে যাইতেছে। আমি রাস্তায় পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। জুন মাসের দুপুর বলিয়া রাস্তায় লোকজন কম। হঠাৎ তাকাইলে—আমি সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি—এমন মনে হয়। এমন মুহূর্তগুলি আমার এত প্রিয়—যেন সবকিছুই আমাকে স্পর্শ করিয়া আছে। এমন সব মুহূর্ত হইতেই আমরা নূতন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করি। পাশের টেবিল হইতে দুজন ব্যবসায়ী উঠিয়া গেলে চর্বির পাহাড়, গলায় থাক্-থাক্ গলকম্বলওয়ালা এক পাঞ্জাবী আসিয়া বসিল। আধখোলা ঘুমচোখে সে আমাকে লিখিতে দেখিতেছে। কি লিখিতেছি আমি! এই মুহূর্তেই যেন মনে হইতেছে কাহারা আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া চিরতরে চলিয়া গিয়াছে।

"একশত বৎসর একটানা ঘুমাইবার পর সহসা জাগিয়া উঠিয়া আমি পরিচিত লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। কি বলিয়া আত্মপরিচয় দিব! আমি কাহার সন্তান! আমি বিশেষ কাহারও কি! ঐ পর্বতাকার পাঞ্জাবীটার সন্তান আমি হইলাম না কেন? আমি গাছ হই নাই কেন; আমি মাছ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই বা কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল! পরিচিত বৃত্তের বাহিরে নিজেকে আত্মপরিচয়হীন, নামগোত্রহীন বোধ হইলে ভাবিয়া দেখি আমার মুখ কাহারও মনে আছে কি! একশত বৎসর পূর্বে কবে দেখিয়াছিলাম সোনাকাকা গড়িয়াহাটার মোড় হইতে গেঞ্জী হাঁকিতে হাঁকিতে ভিড়ের ভিতর পথ চিনিয়া চলিয়াছে। ছায়াকে মনে পড়ে না! সহসা সুবলের মুখ একশত বৎসর পার হইতে হইতে বিস্ফোরিত হয়। মনে হয় অনেক মৃত মানুষ আমাদের জীবিত মানুষদের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া বে-আইনিভাবে বসবাস করিতেছে।"

মৃণালকান্তি একদিন ছায়াকে ট্রেনে তুলে দিলে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের আলো থেকে বাইরের অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছিল। জানালায় মুখ রেখে হাত বাড়িয়ে ছায়া রুমাল নাড়তে—সেই ছোট্ট সাদা দোমড়ানো রুমাল অন্ধকার থেকে ফুলের মতো ছিট্‌কে ছিট্‌কে আসছিল। মৃণালকান্তি লিখছে "মনে হয় আমাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছায়া তাহার শাড়ি, তাহার মুখ, তাহার অবয়ব ট্রেনের জানালায় একটি ব্র্যাকেটে টাঙাইয়া রাখিয়া নিজে কামরার ভিতরে কোথাও সরিয়া গিয়া বসিয়াছে। ট্রেন তাহার আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে আমার শরীরের উপর হইতে তুলিয়া লইলে, সহসা শূন্য দিগন্তপ্রসারী রেলদ্বয়ের দিকে চাহিয়া সন্দেহ হয় আমাকে কি কোনোদিনই কিছু স্পর্শ করে নাই! খুব তীব্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিংবা কোনো বোধ আমি অনুভব করি নাই! আমি কখনো খুব আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হই নাই কেন! আমি আমার হস্তপদগুলি বিপথগামী করিয়া সহসা নৃত্যে উদ্বাহু হই নাই।"

মৃণালকান্তির আত্মজীবনী আমি যতটুকু পড়েছি তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় সে খুব স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। মনে আছে সে একদিন গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর চীৎ হয়ে শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল "জানো রোগা লোকেরা নিজেকে বড্ড বেশি টের পায়! দেখো, খুব শীগগীরই আমার অসুখ হবে।" তার বেনেটোলা লেন-এর ঘরে আমি মাঝে মাঝে যেতাম। কখনো দেখেছি মৃণালকান্তি ইঁদুর আরশোলা কিংবা পিঁপড়েদের চলাফেরা লক্ষ্য করছে। কখনো

তাকে আমার খুব অচেনা মনে হত, কখনো মনে হত সে নিজেকে বড় বেশি টের পাচ্ছে। তার আত্মজীবনীর সর্বশেষ যে-ঘটনাটি আমি পড়েছিলাম তাতে মৃণালকান্তি লিখেছে···"কত তুচ্ছ মনে হয় যখন ভাবি ঘটনাটা ঘটিয়াছিল একটি আরশোলাকে লইয়া। সিঁড়ির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিয়া আরশোলাটা মরিতেছিল। তাহার প্রবীণ দেহের চারিপাশে তুলনায় বিশাল বিস্তৃত সেই সিঁড়ির উপর তাহার দেহলগ্ন ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।" আরশোলার কথা মৃণালকান্তি অনেকটা লিখেছিল। লিখেছিল "মৃত্যু মাত্রই আত্মীয়হীন, স্বজনহীন। মৃত্যুতে কোনো সহগামী নাই। তাহার সেই অর্বাচীন শরীরকে ঘিরিয়া মুহূর্তের জন্য আমার চোখের সামনে ছায়াপথ ও নীহারিকা-পুঞ্জের আর্চ্-এর মতো অর্ধবৃত্তাকার ছড়ানো তারাগুলি দুলিয়া গেল কি! মনে হয় তাহার তুচ্ছ মৃত্যুর নিকট আমাদের সম্মিলিত বাঁচিয়া থাকা নগণ্য মাত্র। ভালোবাসার, ইচ্ছার, লোভের মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়া অকস্মাৎ বৈজ্ঞানিক মহৎ শূন্যতার ভিতরে সে অগ্রসর হইতেছিল।" মৃণালকান্তির পাশে রেস্তরাঁর সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছায়া কথা বলছিল। মৃণালকান্তি লিখছে যে ছায়া তখনো বলছিল "কাল ছাত্রীর মা আমাকে একটা খাম দিল। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখি পঞ্চাশ। আমার কিন্তু চল্লিশ পাওয়ার কথা। ভাবছিলাম···" মৃণালকান্তি লিখছে "দেখিতেছিলাম ছায়ার স্যাণ্ডেল-পরা পা গোড়ালির উপর ভর করিয়া দুলিতেছে। ছায়া কথা বলিতেছে—আমি কি তাহাকে চুপ করিতে বলিব! আমি কি সকলকেই চুপ করিতে বলিব! জানি কথা শেষ করিয়া হাসির বেগে যখন সে ঝুঁকিবে তখনি ছায়ার পা আরশোলাটার উপর নামিয়া আসিবে। বলিব কী পা সরাইয়া লও। ভাবিতেছি—আমার কী হইয়াছিল! এত তুচ্ছ কথা বলার অর্থ নাই। বলিলেও ছায়া আমাকে পাগল ভাবিবে। কিন্তু আরশোলাটা অপেক্ষা করিতেছে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর হইতে কোনো কোনো নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল—এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই—সে সেই দিকে চাহিয়া আছে।" তারপর ছায়া বলছিল "বুঝলাম ছাত্রী থার্ড হয়েছে বলে এটি আমার ইন্‌ক্রিমেণ্ট···" ছায়া হাসতে যাচ্ছিল—সেই হাসির আভাস হাসি আসবার আগেই তার মুখে চোখে খেলে যেতে চকিতে—মৃণালকান্তি লিখছে "···আমি আমার সর্বস্ব দিয়া বলিতে চাহিলাম—না। সরিয়া দাঁড়াও। আমি দুই হাত বাড়াইয়া সহসা শূন্য বোধ করিয়াছিলাম। সহসা আয়নার চিড় ধরিবার শব্দ হইল। আমার প্রসারিত হাতে কেন্দ্রবিচ্যুত ছায়া বৃষ্টিতে ভিজা সিঁড়ির হইতে ফুটপাথে গড়াইয়া গেল। আমি কি ছায়াকে ধাক্কা দিয়াছিলাম! জানি না।" ভিড় জমে যাওয়ার আগেই আস্তে আস্তে ছায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কথাই বলেনি ছায়া, আঙুল তুলে মৃণালকান্তির দিকে স্থাপনও করেনি। সে চলে গিয়েছিল। আর আসেনি। মৃণালকান্তি লিখছে "সে আর আসিবে না জানিয়া তাহাকে আমার সেই মুহূর্তে বড় প্রিয় বোধ হইল। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিলাম।"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাষাবিভ্রাট ও আদিবাসীদের সমস্যা

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম কুমারধুবির বাজার এলাকায়। জায়গাটা ছোট মফঃস্বল শহর—ধানবাদ জেলায়, বিহার রাজ্যের মধ্যে। ভাষাগত অঞ্চল হিসেবে এ এলাকা হল বাঙলা আর বিহারি ভাষার (মৈথিল ও মগাহি) সীমান্তবর্তী।

এদিক ওদিক ঘুরছিলুম আর লক্ষ্য করছিলুম এ অঞ্চলের মানুষের নানান কথ্যভাষা ব্যবহারের লক্ষণগুলি। এ শহরের কাছেই বিরাট মাইথন বাঁধ। কৃষি আর বিদ্যুৎশক্তির জন্য তৈরি আধুনিক ভারতবর্ষের বড় বড় নদীবাঁধগুলির অন্যতম বৃহৎ বাঁধ এই মাইথন। এ জায়গাটা রেলপথের ওপর, কাছাকাছি রয়েছে কয়লার খনি আর কারখানা। ভারতের নানাদিক থেকে লোকজনের সমাগমে এ অঞ্চলের জনসংখ্যাও এখন ক্রমেই বাড়তির দিকে। কথ্যভাষার দিক থেকে এ-অঞ্চল বাঙলা-প্রধান। আর সে-বাঙলার স্থানীয় রূপ হল পশ্চিমী-ঘেঁষা (মানভূম); প্রশাসনিক দিক থেকে যদিও এ অঞ্চল পড়ে বিহার রাজ্যের মধ্যে। লোকসমাজের ভাষা হিসেবে আগে ইংরেজ আমলে এ জায়গার স্কুল, আদালত আর অধঃস্তন প্রশাসনিক কাজকর্মের ভাষা ছিল বাঙলা। বিহারি বুদ্ধিজীবীরা যে হিন্দী গ্রহণ করেছিলেন, তারও পূর্ণ সুযোগ ছিল বিহারীদের জন্যে। তখনও "এক রাজ্য, এক ভাষা"র নতুন মতবাদ ওঠে নি। অষ্ট্রিক ভাষা-পরিবারের অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার কোল আর মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা সাঁওতালি, এ অঞ্চলের আদিভাষা ছিল। তবু আদিবাসী সাঁওতালদের মুখের ভাষা সাঁওতালি, কোনোদিনই তাদের ঘরের বাইরে মর্যাদা লাভ করেনি, বিদ্যালয়ে নয়, আদালতে বা বাজারেও নয়।

কিন্তু, স্বাধীনতার পর সম্প্রতিকালে বিহার রাজ্যসরকারের নীতি হল সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্যই (সে তারা পরিবারে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন) শিক্ষার মাধ্যমে হবে বিহার রাজ্যের সরকারি ভাষা হিন্দী। একটি বিষয় বিশেষ করেই লক্ষ্যণীয়; তা হল এই যে, এই হিন্দী সমগ্র রাজ্যের

জনগণের কোনো অংশেরই স্বাভাবিক পারিবারিক ভাষা নয়। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল বা অনুরূপ অঞ্চল থেকে আগত বিহারে বসবাসকারী এমন জনগোষ্ঠীরই ভাষা হল হিন্দী। এভাবে হিন্দী জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত অধিকাংশেরই ওপর যাদের মাতৃভাষা বাঙলা বা অন্যান্য ভাষা ও কথ্যরীতি। সরকারি উদ্যোগ ও প্রণোদণায় এ কাজ হচ্ছে, আর এর মাধ্যমে দ্বিভাষিকতা বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিশ্চিতরূপেই বেড়ে চলেছে। হিন্দী বিস্তারের সুযোগলাভ করেছে। এখানে যে হিন্দীতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে তা হল কেতাবি-হিন্দী, অলঙ্কারবহুল বইয়ের ভাষা; বিহার রাজ্যের সর্বক্ষেত্রের জন্যই তার বিধান। কিন্তু, এর থেকে ঢের বেশি কার্যকরী হয়ে ছড়িয়ে গেছে ধীর ও নিঃশব্দ গতিতে এক ধরনের মিশেলী-হিন্দী, সংকর ভাষা, অর্থ-চলতি আর বাজারি-ভাষা হিসেবে। গত এক শতাব্দী ধরেই তা এইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, কোনো সরকারি প্রচার বা চাপসৃষ্টির অবকাশ রাখে নি।

আঠারো শতকে মোগল আমল থেকেই উত্তর ভারতে এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর্য-ভাষাভাষী ভারতের সর্বত্র এক সাধারণ-বোধ্য ভাষার চাহিদা থেকেই তার উদ্ভব। সে যুগে দিল্লীতে ছিল এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন। আর দিল্লী থেকে বিভিন্ন প্রদেশে আসতেন শাসনকর্তারা। তাঁদের সঙ্গে থাকত আমলা-পরিষদ আর ফৌজী লোকজন। উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলের ব্যবসায়ী আর বণিকরাও দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এসে ব্যবসা পত্তন করছিলেন। আর এঁদেরই মারফৎ এসে পড়েছিল দিল্লীর কথ্যরীতির এক ধরনের ভাঙা-রূপ। এই ভাবেই এ কথ্য-হিন্দীর প্রভাব বেড়েছে। স্কুল টেস্টের মিডিল (মধ্য) পাশকরা প্রাথমিক শিক্ষক যে হিন্দী শেখান (হিন্দীরই মাধ্যমে) বাঙালী, মৈথিল আর সাঁওতাল বালকদের (যাদের মাতৃভাষা অবশ্যই হিন্দী নয়), তার থেকে অনেক স্বাভাবিক ভাবে এই বাজারি হিন্দীরই প্রচলন হয়েছে বেশি। বিহারি (মগাহি, ভোজপুরী অথবা মৈথিলভাষী) শ্রমিক, দোকানদার, পুলিশ, সিপাহী, রেল কর্মচারী, রেস্তরাঁ-মালিক, ফেরিওয়ালা, সিনেমা কর্মচারী—এই ধরনেরই সব নানা পেশার মানুষ—তাদের অজানিতভাবে ছড়িয়ে চলেছে এ অঞ্চলে এই অ-শুদ্ধ ও অ-বৈয়াকরণিক বাজারি-হিন্দী। গৃহ-পরিবেশের বাইরে এ এলাকার তাই হল সর্বজনের সাধারণবোধ্য কথ্যভাষার রূপ।

কুমারধুবীর বাজার-এলাকায় পূর্ব ভারতের যে কোনো মফঃস্বল শহুরে এলাকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বিশেষত বাংলা-বিহার সীমান্ত-সংলগ্ন অঞ্চলের। একটা ধুলো-ওড়ানো রাস্তা, তার দুধারে সার দিয়ে বসেছে হরেকরকম ফেরিওয়ালা আর চাষী, তাদের পশরা সাজিয়ে। রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি দুটি বড় লরি বা বাস যাতায়াত করতে পারে। রাস্তার একদিকে কয়েকটা দোতলা বাড়ি, একতলায় দোকান আর খাবার হোটেল। অন্যদিকে রয়েছে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে অস্থায়ী চালা উঠেছে—নানান জিনিসে সাজানো স্টল আর দোকান দেওয়া হয়েছে। এখানে এলে জমায়েত-হওয়া ক্রেতা-বিক্রেতা আর অতিথি-অভ্যাগতদের মুখে বেশ কয়েকটি ভাষা আর কথ্য-রীতিরই উচ্চারণ শোনা যাবে।

প্রথমত শুনি মানভূম বাঙলা—স্থানীয় গ্রাম থেকে আসা মানুষজনের মুখে। তারা বিক্রি করতে বাজার এনেছে শাকসজী আর সংসারের জন্য তুঁষছাঁটা চাল। আশপাশের গ্রাম থেকে বাঙালী মেয়েরা বয়ে এনেছে চটের থলে ভর্তি চিড়ে আর মুড়ি। রাস্তার একপাশে সেগুলো রেখে ওজনদরে বিক্রি হচ্ছে। ফেরিওয়ালারা শস্তা মনোহারি জিনিসের দোকান পেতেছে। নানারঙে ছাপা বড় বড় ছবিও বিক্রির জন্য সাজানো। লাল-নীল-হলদে রঙে ছাপা হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, মুসলমান ক্রেতাদের জন্য মক্কার কাবার ছবি আর সকলেরই জন্য জনপ্রিয় চিত্র-তারকাদের প্রতিকৃতি। এই সব ফেরিওয়ালারা প্রধানত বিহারি হিন্দু। তারা মগাহি বা ভোজপুরিতে কথা বলছে আর যথেষ্ট খারাপ হিন্দীও বলছে। স্থানীয় বাঙলা বা মৈথিলভাষী কামারদের লোহার তৈরি নানারকম সাজসরঞ্জামের দোকানও রয়েছে। রয়েছে দর্জির দোকান। এই সব দর্জিরা বাজার-হিন্দী, মগাহি আর মৈথিলভাষী। শিখ ট্যাক্সি আর লরিচালকেরা কোনো কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় কথা বলছে পাঞ্জাবী ভাষায়। কোনো জায়গায় বা মাটিতে পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে ওষুধ-পত্তরের কৌটা সাজিয়ে মুসলমানি হাকিমি চিকিৎসক বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে চোস্ত উর্দুতে, যারা শুনছে তারা তার খুব অল্পই বুঝতে পারছে। তার একদিকে দর্শক আকর্ষণ করতে বহুবর্ণে ছাপা এক শারীরতত্ত্বের ছকও টাঙানো। হোটেলগুলিতে বিহারী অথবা পূর্ববাঙলার উদ্বাস্তু ছেলেছোকরা কর্মচারীরা চা আর খাবার এগিয়ে দিচ্ছে খরিদ্দারদের আর কথা বলছে খারাপ হিন্দী কিংবা বাঙলায়। বাঙালী ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা এসেছেন বাজারে

শাকসব্জী আর সংসারের টুকিটাকি কিনতে; বিহারি সরকারী কর্মচারীরা নানান বিহারি কথ্যভাষায় কথা বলছেন, তার সঙ্গে বাজারি হিন্দীর মিশেল। সাঁওতালরা দরাদরি করছে ডিম বা সব্জীর, তাদের কথ্যভাষা স্থানীয় বাঙলা। কলহাস্য সাঁওতালি মেয়েরা, কালো ছিপাছিপে গড়ন, পরনে আঁটোসাটো লালপেড়ে সাড়ি আর মাথায় গোঁজা কালো খোঁপায় লাল জবাফুল, চুড়িওয়ালার দোকানে চুড়ি কিনতে এসেছে। কাচের চুড়ি হাতে গলিয়ে গলিয়ে দেখছে। এই চুড়িওয়ালারা বাঙালী অথবা বিহারি, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে যখন কিছু বলাবলি করছে তখন তা সাঁওতালিতে, আর অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময়ে বাঙলায়। আর, একদিকে দাঁড়িয়ে এক সুঠাম সাঁওতালি যুবা, উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। কাঁধ-পর্যন্ত নামা বাবরি-চুল, তেল-চকচকে—কপালের দিক থেকে একটা কোনো ধাতুর আঙটির মধ্য দিয়ে উল্টে বাঁধা। এক হাতে ধরা একটা বাঁশের বাঁশী, অন্য হাতে ছড়ি। পরনে একটা সুতির জামা, তার ওপর লাল সোয়েটার। আর, হাঁটু পর্যন্ত নামা লালপেড়ে খাটো ধুতি; পা খালি।

এই সাঁওতাল তরুণ স্বভাবতই কিছু বেচাকেনা করতে এখানে আসে নি। চারপাশের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে, ভঙ্গি নির্লিপ্ত। একটা বাস দাঁড়িয়েছে কাছেই, বিহার রাজ্যসরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের—বাসের দু-দিকের গায়ে হিন্দীতে তা লেখা। তার থেকে এক কান-ফাটানো লাউডস্পীকারের আওয়াজে রেকর্ডে হিন্দী কোনো জনপ্রিয় সিনেমা-সঙ্গীত বাজান হচ্ছে কোনো এক সুকণ্ঠির গাওয়া গান। মাঝে মাঝে তা থামিয়ে শোনানো হচ্ছে রেকর্ড-করা বক্তৃতা। বিষয় হল স্বাস্থ্য, আলুচাষ ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালন সম্পর্কিত নির্দেশ। বেশ ভিড় জমে গেছে বাসটাকে ঘিরে। প্রধানত বিহারি শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরা তা শুনতে ভিড় করেছে। কিন্তু, সেই সাঁওতাল তরুণটি এই সব ব্যাপার সম্পর্কে সম্পূর্ণই উদাসীন।

এক মুহূর্তেই আমি তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারি নি। তার মনে কি ভাবনা ওঠাপড়া করছে? এ দেশ আদিতে তারই পূর্বপুরুষদের দেশ—হড় অর্থাৎ মানুষদের দেশ। অর্থাৎ কিনা কোল আর মুণ্ডা (অষ্ট্রিক) জনগোষ্ঠীর দেশ। কিন্তু দিকু অর্থাৎ অ-সাঁওতালেরা এসে নিজভূমে তাদের প্রায় পরবাসী করে তুলল। এটা হল পূর্ব-ভারতের কয়লা-খনি এলাকা, কিন্তু খনির মালিক কারা? আগে ছিল সাহেবরা—প্রধানত স্কটল্যাণ্ডের বিলাতি

সাহেব, এখন বেশির ভাগ খনির মালিক রাজস্থানের মাড়োয়ারি, ভাটিয়া আর গুজরাতের কাচ্ছীরা। কিছু কলকাতার বাঙালীবাবুও আছেন। কিন্তু, এইসব খনির শ্রমিকেরা হল প্রধানতই সাঁওতাল, তারই স্বজাতি। তাকে জানতে হয় স্থানীয় বাঙলা কথ্যভাষা—সে তার নিজ মাতৃভাষার মতোই তা গড়গড় করে বলে যেতে পারে। তার স্বজাতীয়েরা কার্যত দ্বিভাষিক হয়ে গেছে। তার ওপর তাকে জানতে হচ্ছে বাজার হিন্দী; কেননা তা না হলে বিনা কষ্টে তার পক্ষে কাজ চালানোই অসম্ভব; বহিরাগত প্রভাবশালীরা ঐ ভাষাতেই কথা বলে—বাঙলাও বলে না, আর তার ভাষা সাঁওতালি তো নয়ই।

কি ভাবছে সে? সাঁওতালি ভাষায় আমার জ্ঞানের বহর কয়েকটি শব্দ আর বাক্যেই সীমাবদ্ধ। আলাপ শুরু করবার পক্ষে তা যথেষ্ট হলেও, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া তাতে মুস্কিল। তবু, তার দিকে এগোলাম আর সাঁওতালিতেই বললাম—বেলে আমা ঞুতুম? (তোমার নাম কি?), ওকাঠেন্ অমাঃক ওড়াঃক্? (তোমার ঘর কোথায়?)। শুনে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, সাদা জু-পাটি দাঁতে হাসি খেলে গেল, আর সে সাঁওতালিতে আমার কথার জবাব দিলে। তারপর আমাকে বলতেই হল—দিকু কাজি-মে? (বাঙলা বলতে পারো তো?)। বাঙলাতেই সে উত্তর দিল,—হাঁ, সে পারে। তারপর, আমাদের কথাবার্তা বাঙলাতেই হল।

সে একজন রেল-শ্রমিক। অদক্ষ শ্রমিক, মাটি খোঁড়া আর ভরাট করার কাজে এক 'গ্যাঙে'র সঙ্গে কাজ করে। তার স্বজাতীয় অনেকেই এ কাজ করে। এই দিন সকালটা তার ছুটি, তাই এসেছে বাজারে লোকজন, দোকান-পশার দেখতে আর মজা পেতে। সে কোনো লেখাপড়া করে নি। হিন্দী বা বাঙলা লেখাপড়ার কথাই বলছে, সাঁওতালিতে লেখাপড়া আর শিক্ষা দেওয়া হবে এ রকম কোনো ধারণাই তার নেই। (ভারতীয় সংবিধানে ঘোষণা আছে যে, ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা সেই সব অঞ্চলের জনগণের মাতৃভাষার মাধ্যমে পাবার অধিকার আছে, কিন্তু, এ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে যথাযথ-ভাবে কিছুই করা হয় নি)। সে জানে না এ রকম কোথাও কোনো বিদ্যালয় আছে কি না, সাঁওতালির মাধ্যমে যেখানে লেখাপড়া শেখান হচ্ছে। সে জানে যে বিলেতি সাহেবরা ইংরেজিতে কিছু সাঁওতালি বই ছেপেছে (অর্থাৎ রোমান হরফে)। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হল সাঁওতালদের "জাত মারা" (অর্থাৎ তাদের খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা)। সাঁওতালদের কথা কেউ ভাবে না, সকলেই

তাদের উপহাস করে। সে সিনেমা দেখতেও যায় না। সিনেমা খুব মজার, তবু ছবিতে যে সব কথাবার্তা বলে তার এক বর্ণও সে বোঝে না—হয় সে সব বলে বাঙলাতে নয় "খোট্টা"য় অর্থাৎ হিন্দীতে। আর, সিনেমার গান তো সে একেবারেই পছন্দ করে না। বড্ড চীৎকার, তার থেকে তাদের নিজেদের সাঁওতালি গান তার অনেক ভালো লাগে, সাঁওতালি বাঁশী আর মাদলের সুর। তার বাপ-মা, ভাই আর ভাই-এর বউরা কিছুদূরে এক গাঁয়ে থাকে। তারা চাষের কাজই করে। খুব কষ্টেসৃষ্টে সেখানে চলে, সে রকম থেকে লাভ নেই। কোনোদিন সে একটি সাঁওতালি মেয়ে দেখে বিয়ে করবে আর তারপর 'কুলি-লাইনে' ঘর নিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই সে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে, তাতে সে আনন্দই পাবে। কিন্তু সাঁওতালদের জন্যে সাঁওতালিতে তো কিছু লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থাই নেই। সে চায় সাঁওতালরাও খুব একটা বড় জাত হয়ে উঠুক, বাঙালী বাবু কিংবা সাহেবদের মতোই, কিন্তু কে আর সাঁওতালদের জন্য ভেবে মাথাবাথা করছে।

এখানে এই সাঁওতাল যুবকটির ক্ষেত্রে ভাষার ব্যাপারে, বিশেষ করে ব্যাপক অর্থনৈতিক জীবনে ঘর ও বাইরের মধ্যে কোনো সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে তার আর পাঁচজন জাত ভাইয়ের মতো সরল, আদিম এবং চিন্তাভাবনাহীন, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে কিছুটা আত্মসমর্পণের এবং কিছুটা ভবিতব্যের মনোভাব নিয়ে। এটা কিন্তু তার ক্ষেত্রে আসলে একটি ট্রাজেডি, একটি আশাভঙ্গেরই ঘটনা, যদিও নিজে সে তা জানে না।

অল্প সংখ্যক খ্রীস্টান বা অখ্রীস্টান শিক্ষিত সাঁওতাল আছেন যাঁরা গভীর ভাবেই হোক আর ভাসাভাসাভাবেই হোক এই ট্রাজেডি অনুভব করতে পারেন। তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুসারে নিজেদের ভাষা এবং সংস্কৃতির পুনর্বাসনের প্রয়াস করছেন। কিন্তু তাঁদের একদিকে ধীর অথচ আপসহীন খ্রীষ্টীয়করণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। খ্রীস্টধর্ম চেষ্টা করছে সাঁওতালদের ধর্মবিশ্বাস হতে উদ্ভুত পুরাণকথা ও আদিম দর্শনের স্থানে বিজাতীয় এবং তাদের বুদ্ধির অগম্য খ্রীষ্টীয় পুরাণকথা ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ধর্মান্তরিতদের বিশ্বাস করতে শেখান হচ্ছে, বিদেশী পাদ্রিরা এসে তাদের 'আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠের মতো' তুলে নেবে, তাদের বাঁচাবে অনন্ত নরক থেকে, নিজধর্মে যা ছিল তাদের বিধিলিপি। আর এরই ফলে তাদের মধ্যে নিজেদের সমাজপরিবেশ সম্পর্কে এক ধরনের অস্পষ্ট অসন্তোষ সৃষ্টি করছে যা তারা কাটিয়ে ওঠার আশা করতে

পারে না। খ্রীষ্টীয়করণের মধ্যে কিছুটা হয়তো সদিচ্ছা আছে কিন্তু তা সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যপ্রসারের জন্যই কাজ করে যাচ্ছে—তা সে সাম্রাজ্যের উপর রোম, লণ্ডন বা কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠান যেই প্রভুত্ব করুক না কেন।

অন্যদিকে চারপাশের হিন্দুরা সাঁওতাল (ও অন্যান্য আদিবাসীদের) সম্পর্কে এক ধরনের নিস্পৃহ নীতি অনুসরণ করে আসছেন। এই নীতির উদ্ভব বাঁচো এবং বাঁচতে দাও এই ধরনের উদ্বেগহীন স্বচ্ছন্দ মনোভঙ্গী, যার মধ্যে প্রকৃতির সরল সন্তান হিসাবে সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতিই বরং মিশে আছে—চিন্তাহীনতা বা অনীহা নয়। এই নীতি সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই ফল উত্তর ভারতে যার সূচনা হয়েছিল সাড়ে তিনহাজার বছর আগে যখন আর্যভাষী জাতিতন্ত্রের সঙ্গে প্রাগার্য মানুষ, সাঁওতালদের অষ্ট্রিক পূর্বপুরুষ, সমধর্মী খণ্ডজাতি, এবং দ্রাবিড় ও মঙ্গোলয়েডদের সম্পর্ক, সংঘাত এবং আপস হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার অর্থ দাঁড়িয়েছিল সাঁওতাল ও অন্যান্যদের মধ্যে ধীর গতিতে সংস্কৃতির বিকাশ ও তাদের সাঙ্গীকরণ এবং মিশ্র ও বিকাশমান হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে তাদের গ্রহণ। আর্য ভাষা অবলম্বন এবং আর্যভাষীদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণের পর তারা মিশ্র হিন্দু জাতিত্বে একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করতে পারল। এই অসমান সংগ্রামে ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্ব এই ক্ষয়িষ্ণু ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে নিশ্চয়ই ছিল একটা ট্রাজেডি—যা হয়তো সাঁওতালদের চিন্তাশীল স্বজাতিপ্রেমী পূর্বপুরুষদের কাউকে কাউকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু যদিও এর বিলয় ঘটছিল, পুরোন ভাষা এবং সংস্কৃতিও এক ভাবে এর শোধ তুলেছিল—প্রাগার্য ভাষা ও সংস্কৃতির একটা সুপ্রতিষ্ঠিত উপস্তর হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং বর্তমানে যে মিশ্র হিন্দুসমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে এবং গত তিন হাজার বছরে ভারতের মাটিতে যে আর্যভাষার বিকাশ হয়েছে তাকে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আর্যের সঙ্গে অনার্যের এই মিলনের মধ্য দিয়েই ভারতের আর্যভাষা ও সংস্কৃতির চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে এবং তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আর এই হচ্ছে তার অদম্য, অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস।

ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশ সহ আগেকার কোন প্রাগার্য ভাষা এক বা একাধিক আর্যভাষার সম্মুখীন হয়েছে এই প্রক্রিয়া সেখানে এখনও বলবৎ আছে। ঘরের ভাষা পরিবার, গোষ্ঠী ও আদিবাসী জীবনের

সংকীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ। বাইরের প্রভাব এবং দাবি, বিশেষ করে আজকের এই যুগে, নিরবচ্ছিন্ন ও অনিবার্য এবং বাইরের জগতের ভাষা বা ভাষাসমূহ ঘরের ভাষার সংহতি ও চরিত্রে অপ্রতিকার্য ভাঙন ধরায়। ভাঙন ধরেছিল অবশ্য অনেক আগেই এবং সীমান্ত-ভূমিতে যেখানে দিকু বা 'বহিরাগতদের' তা তারা বাংলা, বিহারি বা হিন্দী ভাষী যাই হোক না কেন, সাঁওতালেরা প্রায় বিপর্যস্ত—সেখানে তারা দ্বিভাষী হতে বাধ্য হয়। ঘরোয়া জীবনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে কিন্তু বাইরের সব কাজের প্রয়োজনে তাদের বলতে হয় বাংলা বা বিহারি (মৈথিলি, মগাহি বা বাজার হিন্দী) ভাষা। কথ্য বা আঞ্চলিক বাংলা সাঁওতালেরা তাদের চারপাশের বাংলাভাষী গ্রামের মানুষদের মত করেই বলে তার নিজস্ব সাঁওতালি ভাষার সঙ্গে—কিন্তু তার ফলে দু ভাষারই শব্দ এবং বাক্যগঠন রীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে হয়। বিশেষ করে শব্দের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। নিজের অজ্ঞাতসারেই তারা চারপাশের ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে। দুই এক পুরুষের মধ্যে সাঁওতাল তার কথ্য সাঁওতালি একেবারে ভুলে গিয়ে উন্নততর বাংলা পুরোপুরি গ্রহণ করবে। কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চল সমূহে, সাঁওতালরা (একই অবস্থানের মুণ্ডা, ওরাওঁ ও অন্যান্যদের মতো) যেখানে বাইরের লোকের সঙ্গে অত বেশি ঘনিষ্ঠ নয়—সাঁওতালি ভাষা সেখানে সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং তার জীবৎকালও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিভাষী বা বাঙালী বনে-যাওয়া সাঁওতালরা অনিবার্যভাবে ব্যাপকতর বাংলাভাষী হিন্দুসম্প্রদায়ের অংশভুক্ত হয়ে পড়ে ; তারা হয়ে পড়ে যাকে বলা যায় হিন্দুসমাজের সাঁওতাল জাতের লোক। আর যেহেতু জাতের বিচার এখনও খুব কড়া, এদের বিবাহাদি ও খাওয়া-দাওয়া নিজেদের মধ্যেই করতে হয়।

এমন কি অতি সাধারণ কথাও বাইরে থেকে নেওয়া হচ্ছে। খ্রীস্টান পাদ্রি সাঁওতালকে বলতে শেখায় 'জিসু কিরিস্ত্ হিজুলেনা পাপিতারণতে' (যিশু খৃষ্ট পাপিদের তারণ করতে এসেছেন)। এখানে 'পাপি-তারণ' কথাটা আর্যভাষা। আইনের রক্ষকরা তাকে শেখায় পুলিস, আসামি, গারদ, চালান, হুকুম, হাকিম, বিচার, দোষী, নির্দোষ এবং এমনি ধারা সব শব্দ যেগুলি বাইরের ভাষা থেকে নেওয়া (পুলিস=ইংরেজি Police, গারদ=ইংরেজি Guard=Custody ; আসামি=accused, হুকুম=Order ও হাকিম=Judge ফার্সি আরবী শব্দ যা বাংলা ও বিহারি ভাষায় গৃহীত হয়েছে, আর 'চালান' to send up for

trial ও বিচার trial সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত আর্য শব্দ) আর এখন রাজনৈতিক কর্মীরা এসে তাকে বলে তার 'ভোট'টা (Vote) সে যেন দেয় কংগ্রেস (Congress) প্রার্থীকে (Candidate) বা কম্যুনিস্টকে (Communist), তাকে 'মজুর' বা 'মজদুর ইউনিয়নে' (Labour Union) যোগ দিতে অনুরোধ করে। দৈনন্দিন জীবনের আরও শত শত সাধারণ শব্দের সঙ্গে এই সব শব্দও ঘরের ভাষার সঙ্গে বাইরের ভাষার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর করে তুলছে।

ঘরের সঙ্গে বাইরের যখন বিরোধ বাধে সাঁওতালদের মত পিছিয়ে-পড়া এবং রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক দিক থেকে অসংগঠিত মানুষদের তরফ থেকে জোরালো কোন প্রতিরোধ আসে না। তাদের বাইরের শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অগ্রসর গোষ্ঠীগুলি, যারা নিজেদের স্বকীয়ত্ব সম্পর্কে সচেতন (ভারতবর্ষকে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যে বিভক্ত করার ফলে এবং রাজনৈতিক মতলববাজদের কারসাজিতে যারা প্রকৃত ভাষা-প্রেমিকদের সমর্থন সংগ্রহ করতে পেরেছেন) তাদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা স্বতন্ত্র আর তা আজ আশঙ্কা ও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহ্য ও ইতিহাস অনুসারে যে ভাষা ঘরের ভাষারই পরিপূরক বা সম্পূরক তার সঙ্গে ঘরের ভাষার সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা সর্বত্রই সহজ ছিল এবং এখনও আছে। কেননা সেক্ষেত্রে আবেগ বা বুদ্ধিপ্রসূত কোনো অস্বস্তি বা বিরোধিতা থাকে না। কেননা সম্পর্ক স্থাপনের একেবারে শুরুতেই সকলে মেনে নেয় যে এই ধরনের সম্পূরক ভাষার ছাপ মাতৃভাষা বা ঘরের ভাষার পক্ষে নানা দিক থেকেই কল্যাণকর। এই কারণেই ভারতীয় ভাষাসমূহে সংস্কৃত শব্দ বা ফার্সী বা স্বহিলি ভাষায় আরবিক, হিন্দুস্তানি (উর্দু) ও সিন্ধি, কাশ্মীরি ও তুর্কি ও মালয় ভাষায় ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশে কোনো আপত্তি ওঠে নি। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে ফরাসী ও ল্যাতিন শব্দ, জাপানি, কোরীয় ও ভিয়েৎনামি ভাষায় চীনা শব্দ, মঙ্গোলিয় ভাষায় তিব্বতি শব্দের ব্যাপারটাও একই ধরনের।

পরিপূরক বা সম্পূরক ভাষা, যা আবার পবিত্র বা ধর্মীয় ভাষাও, তার কথা বাদ দিলেও, যদি বাইরের বৃহত্তর জগতের ভাষা কোনো বিদেশী ভাষা হয় যা কিনা এক প্রবল সংস্কৃতির বাহক, যা নতুন বিষয়, নতুন প্রক্রিয়া ও নতুন ভাব নিয়ে আসে, জনজীবনের বিকাশের জন্য যার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—দ্বিধাগ্রস্তভাবে বা সোৎসাহে তার প্রতিও সহিষ্ণুতা

দেখাতে হয়, বস্তুর নাম বা প্রক্রিয়ার জন্য যদি নাও হয় অন্ততপক্ষে যে নতুন ভাবকে তা বহন করে আনে তার জন্যে। ঘরের কথ্যভাষা সব সময়ই হয় বাস্তবমুখী এবং তা ক্ষীণতম প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করে চলে। সে ভাষা সহজেই নতুন বস্তুর নাম-শব্দ গ্রহণ করে, নতুন ভাব-বস্তুর সহজ উপলব্ধির জন্য হয়তো পারিভাষিক-শব্দ গঠনেরও প্রয়াস পায়। ঘরের ভাষার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, তার প্রাক্ পরিচয় এবং যে মানুষেরা সে ভাষা বলে তাদের মনোভঙ্গি ও চরিত্রের উপরই নির্ভর করে সে ভাষা বাইরের ভাষার প্রতি কতটা সহিষ্ণু হবে এবং তাকে কতটা জায়গা ছেড়ে দেবে: তারা নিজেদের শব্দ-বিস্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী শব্দকে গ্রহণ করতে পারবে না দেশজ উপাদানের উপর নির্ভর করে তা হবে "সর্জন-ধর্মী ভাষা", না হবে "সংগ্রহণধর্মী ভাষা" যা তার কার্যকরি শব্দ-সম্ভার অনেক পরিমাণেই হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রচলিত শব্দ-উপাদানের সাহায্যে নতুন পরিভাষা গড়ে তোলা অপেক্ষা (নতুন বস্তু ও নতুন ভাবের জন্য) তৈরি বিদেশী শব্দ ধার করাই সহজসাধ্য বলে মনে করে। উপরন্তু এই বিদেশীয়ানা বা ঘরের ভাষার সঙ্গে বাইরের ভাষার এই দূরত্ব প্রথমোক্তের দ্বারা শেষোক্তের ভাসিয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় ভাষাসমূহের তুলনায় ভারতে ইংরাজি ভাষার সপক্ষে এইটেই সবচেয়ে জোরাল যুক্তি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে ইংরেজি বহু পদ যুগিয়েছে কিন্তু তাতে তাদের চরিত্রগত কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নি; শব্দগত ভিত্তি বা ব্যাকরণগত গঠনস্থাপত্যের পরিবর্তন হয় নি। বরং ইংরেজির সংস্পর্শে এসে বর্তমানের ভারতীয় ভাষাসমূহ আধুনিক হয়ে উঠেছে। ইংরেজি ভাষার সপক্ষে এটা একটা বড় যুক্তি, বিশেষ করে জনসাধারণের চিন্তাজগতের নেতাদের কাছে, যারা সংহতির পক্ষে। ঘরের ভাষা বাংলা এবং মরাঠি, তামিল এবং হিন্দী বা উর্দু এবং তেলেগুর সঙ্গে বাইরের ভাষা হিসাবে ইংরেজির বনিবনা সহজ হয়েছে এবং এই সব ভাষার পক্ষে তা সহায়কও হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলাভাষীরা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে এই সমঝওথার ফলে, বাংলা ভাষার উপর ইংরেজির এই প্রভাবের ফলে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে। যেহেতু গত একশ বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখকেরা প্রায় সকলেই ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন তার ফলে বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে, বাঙালী লেখকদের মধ্যে শক্তি সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন হয়েছে।

কোনো প্রধান ইন্দো-আর্য (বা দ্রাবিড়) ভাষা একই পরিবারভুক্ত অপর কোনো ভাষাকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। এর কিছুটা ব্যতিক্রম আধুনিক খারিবোলি হিন্দী সাহিত্য-ভাষা। ১৮৫০-এর পর প্রায় ৭৫ বৎসর বাংলা পদ্য ও গদ্য এই ভাষাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে, যে-সব ইন্দো-আর্য ভাষায় সাহিত্যচর্চা আর হয় না সেই সব ভাষা সংহতি হারাচ্ছে, চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে—যেমনটা ঘটছে মৈথিলি, মগাহি, ভোজপুরি, রাজস্থানি ও গাঢ়োয়ালি ভাষার ক্ষেত্রে। এইগুলি যাদের ভাষা তারা বাধ্য হচ্ছে ঘরের ভাষার সঙ্গে কেতাবি হিন্দীকে গ্রহণ করে দ্বিভাষিক হতে আর এক্ষেত্রে ঘরের ভাষা হয়ে উঠছে সংকরভাষা। তাদের কাছে ঘরের ভাষা ক্রমশ ক্রমশ হয়ে উঠছে আপভাষা এবং অধিকতর 'হিন্দী-ঘেষা', আবার হিন্দী যাঁদের জন্মগত ভাষা তাঁদের মতো স্বচ্ছন্দে হিন্দীকে তাঁরা আয়ত্তও করতে পারছেন না। ফলত তাঁরা এক ধরনের স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভোগেন। স্কুলে শেখা কেতাবি হিন্দীতে তাঁরা কোনো সত্যকারের 'প্রতোদনাত্মক সাহিত্য' সৃষ্টি করতে পেরেছেন, বলা যায় না।

দেশ এবং কাল ভেদে অবস্থার তারতম্য ঘটে। তাই ঘরের ও বাইরের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে হবে—ভাষা, যুগ ও পরিবেশ নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার কোনো নীতি বাৎলে দেবার চেষ্টা করা সঙ্গত হবে না। প্রথমত তা অনেকটাই নির্ভর করে বাইরের অর্থাৎ বুদ্ধিগত ও নন্দনতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উচ্চতর সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বাইরের ভাষায় তা যেরূপ বিধৃত তা ঘরে কতটা প্রবেশাধিকার লাভ করেছে তার উপর। কোনো কোনো সৌভাগ্যবান সম্প্রদায় বা দেশে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য উপেক্ষণীয় এবং সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে ঘর ও বাইরের মধ্যে মানিয়ে নেবার ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এটাই হয়েছে আমরা দেখতে পাই ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীসমূহের মধ্যে ও অন্যান্য অগ্রসর এক-ভাষিক দেশে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ইংরেজির উপর ল্যাতিনের একচ্ছত্র প্রভাবের দিন গত হয়েছে। বাইরের ভাষার প্রভাব—শুধু ল্যাতিন বা গ্রীকই নয়, ইওরোপীয়, এশিয় ও আফ্রিকান অন্যান্য ভাষার প্রভাবও ইংরেজি ভাষার উপর পড়ছে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক প্রবাহেই আর যেহেতু ইংরেজি আজ মহাকোষিক স্তরে পৌঁছেচে ঘরের আবহাওয়াও তাতে অনুকূল সাড়া দেয়—অন্ততপক্ষে একথা সত্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্ষেত্রে আর তারাই তো নেতৃত্ব দেয় জনসাধারণকে।*

* মূল ইংরেজি থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে অনূদিত। অনুবাদের দায়িত্ব অনুবাদকের।

মৃগাঙ্ক রায়

মেডুসা

তুমি ওর ঘোমটা খুলো না।
প্রেমের অবয়ব বড় জটিল
তাছাড়া প্রেয়সীরা স্বল্পপ্রেমী
পুরুষের কথার রং চেনে না
অথচ তিস্তার ঘাটে প্রাকসন্ধ্যায়
কল্লোলিনী জলে বসন ভাষায়
অসংখ্য পায়ের পাতা ওঠানামা করে
অনেক হাত ডাকে, অনেক আঙুল
জাফরানী ঘোমটা কণ্ঠের শেষ অবধি
চোখের ঢল কি খড়্গের অর্ধবৃত্ত ?
শুল্ক বিভাগের কর্মচারী জানে না।

চাঁদের মুখের ওপর নারকেল পাতা
কখনো এমন আশ্চর্য ঘটন ঘটে
অথচ সৌন্দর্য বলে কিছু নেই
কোন প্রেয়সী তার পুরুষের নাম জানে না
রাজীব, ঘোমটা খুলে যদি দে'খো
তার ওষ্ঠাধর অল্প হাসিতে কাঁপছে
হঠাৎ পাথর হয়ে যাবে ॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

সহজ গান

"ভন সহজ কৈসে······"

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে আমরা কে, ভেসে আছি
আজ, সদা, অন্যদিন
কিম্বা দীন মৃত্যুরই দিকে, পরিণত বয়সের ক্ষুধা নিয়ে

আমাদের ভীষণপাণ্ডটে
বলীবর্দ গণৎকার
একহাত রেখা দেখে বলে দেয় এই সব সারাৎসার
গুণে :

জীবনে ও উত্থানপতনে, ভ্রান্তি
অপনোদনের, সব
ভ্রান্তি
অপনোদনের
স্বস্ত্যয়নে বর্ধিতবিলাপ, এ বিধান ছেনেছুনে

বলে : বসে আছি, ছিলাম ও থাকব
চিরকাল

শুধু, দুইচোখ দেখবে না
ঠুলি,
ইহকাল—

পরকাল সব ছত্র
-ভঙ্গ
হয়ে নামবে, বসুধা বিরাট
এ যে জঠরে, বসুধা

হারালো রক্তের তেজ, মানবিক
মূল্য
-বোধগুলি, হৃত
পরাজিত হয়ে বলে দেয় বেধ
পরিমাপ কত, পরিণতি কিম্বা দিক-পরিধির

কোনপাড়ে, পুনর্ভব
সমুৎসুক দিন

শুধু, অর্থ নীতিহীন আর প্রশাসন, এই
নিয়ে স্থাণু
হবে চলিত সমাজ ?

শুধু রীতির শাসন, চোখবাঁধা বলদ-কাষ্ঠের যথা, রীতি
অর্থত্যক্ত, মূঢ়
মনোপলি
নাকি মহতোমুক্তিতে, শিল্পে
ব্যক্তিত্বে স্বাধীন
সমষ্টি ও ব্যষ্টি হবে যথাযথ, দিন
আর রাত্রিও যেন আহ্নিকে প্রাণবান, মুক্ত নিত্যবেগে

কম্পিতজঙ্গমে যবে স্থানকাল আপেক্ষিক সীমা,—অথচ অসীম

আমি বসে আছি, এই
কতকাল
শহরে-চাতালে, ছয়বার
ঋতু ঘুরে গেলে, ছয়
ছয়বার উঠি, আর
হুঁচোটে লুকাই মুখ
অচল যা তুলি করতলে

সেই আমাকেও জ্যোৎস্না টানে
ধুলা তার রজতকণায়
মনে হয়, মহার্ঘ ছড়ালে

তারপর, অন্ধকারে একরাত বৃষ্টির উপলে
বেজে, ভিজে
আমি জেগে উঠি ফের, আর ধীরে
বিদ্যুৎ বাড়ায় হাত
বজ্রে

বজ্রনৌকা বেয়ে গেছি আমিও তো ভেসে কোনোকাল

বজ্রে
তোমার বাজে বাঁশি, সে
কী সহজ গান ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যাত্রীসংঘ—দয়িতা যার নাম

দু হাত দিয়েই আলিঙ্গন করতে হবেই তোমায় কে বলেছে ?
আলোকচোরা পথ ছুটে যায় ঘুরে-ঘুরে ভাগীরথীর পানে :
পথের পাশে কাজল নকৃশা গ্রামের বালক বৃদ্ধ ও বনিতা
কৌতুহলে দাঁড়িয়ে থেকে খুব অসংখ্য যাত্রীসঙ্ঘেরে
ক্রমাগত রওনা করে, আবহমান যাত্রীসঙ্ঘেরে
রওনা করে দিতে-দিতেও কৌতুহলে অনাসক্ত থাকে,
প্রেমিক নামে অভিহিত প্রেমিক তেমনি হঠাৎ নিজদেহে
পায় যদি সেই বিরোধাভাস : কৌতুহলের অনাসক্তি, তবে
আলোকচোরা পথ ছুটে যায় ঘুরে-ঘুরে ভাগীরথীর পানে,
সূর্যচন্দ্রতারার নিচে যোজন যোজন স্বত্বহীনতার
স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে প্রেমিক আবালবৃদ্ধ ও বনিতা
হয়ে উঠে যাত্রীসঙ্ঘ রওনা করে—দয়িতা যার নাম ॥

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

ইয়েট্‌সের (Coole Park) পড়বার পর

ক্ষুব্ধনদীতটে আজও জরাজীর্ণ গৃহাবাস তার
রেখেছে শঙ্কিত শীতে চুন-বালিখসা দেহভার।
অলিন্দের একপাশে রং-চটা রেলিং-এর বেড়া
নাতিস্বল্প আয়তন বারান্দার একপাশে ছেঁড়া
ফরাসের গায়ে দাগ—ধুলিকীর্ণ পদচিহ্ন যথা,
নাট্যকার কবি কেউ, শিল্পীবন্ধু সহযোগী তথা
বাক্যালাপে পত্রালাপে দাবি করেছিল অমরতা ;
সময়ের গতি তার শেষাবধি হারিয়েছে দিক,
তবুও অদ্যাপি সেই দলছাড়া কয়টি শালিক
বসে এসে রেলিং-এর বিবর্ণ লোহার আসনে ;
অনেক আগের শব্দ পড়ে না তাদের কারও মনে ?

লণ্ঠনের ঘষা আলো, চায়ের পিরিচ আর গন্ধ তামাকের :
শব্দ শুধু কথা, আর শব্দের প্রতিধ্বনি ফের,
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু বন্ধু, শিল্পীর শিল্পগত টানে :
শব্দের রেশমাত্র, পিরিচের ভাঙা কাচ, পোড়া তেলটুকু লণ্ঠনের
খুঁজে মরা ব্যর্থশ্রম ; এমন কি বলে কেউ গেল কোনখানে
সেই অতি আলাপের সময়েরা, কোন পথে চলে গেল ঠিক ;
শীতের বিকালে আলো, দলছাড়া কয়টি শালিক ॥

কৃষ্ণ ধর

নায়ক না হওয়া ভাল

কেহ কেহ নায়কের মতো, কেহ কেহ গভীর সুন্দর
কেহ বা নায়ক হবে না কভু, ঈশ্বরের প্রণয় আশায়
পৃথিবী আশ্চর্য জায়গা, চিড়িয়াখানার মতো,
সকলে আবদ্ধ, কেহ ভেংচি কাটে, অভিনয়ে দক্ষতা
প্রচুর কারো, কেহ সেগুলি দেখে না, তারা নির্বিকার
হেঁটে চলে যায় জিরাফের মতো, আকাশ অনেক
উঁচু, কেহ হরিণের মতো ডাগর চোখের পাতায়
স্বপ্ন দেখে, দেখে দেখে অভিভূত হয়, তারা মরে
শিকারীর হাতে, কেহ ভালোবেসে ছলনায় মারা গেল।
ঈশ্বরের পৃথিবীতে বিচিত্র উপলগুলি স্থানচ্যুত হয়,
সমুদ্রের সংসর্গ হারায়, কৌতূহলী হাত তাহাদের
তুলে নিয়ে ঘরেতে সাজায়, সমুদ্র সেখান থেকে
বহু দূর স্মৃতি···শঙ্খচিল, গাঙচিল, গগনভেরীর ডাক···
আনন্দিত হতে গিয়ে কৌতূহলী উপলেরা বন্দী হয়ে যায়।
নায়ক না হওয়া ভাল, গভীর সুন্দর হওয়া
সুবিধার নয়, এই যুগে সকলেই অতি সাধারণ
হয়ে মিলে মিশে গায়ের ঘামের গন্ধ শুঁকে
কদাচিৎ ভালবেসে···কোনোমতে অস্তিত্ব বজায় রাখে।
তাহাদের গল্পগুলি প্রতিদিন রক্তমেখে অন্ধকার
সন্ধ্যার কাছে নতজানু হয়ে সমর্পণ করে চলে যায়।

শঙ্খ ঘোষ

চাবুক

চাবুক চাবুক সমস্ত দিন চাবুক
যাত্রী উঠুক যাত্রী চলুক নাবুক
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে চাবুক

তুই কে যে তুই আড়নয়নে হেরিস
পরখ করিস মিথ্যে মেকি বেড়ি
ঘরসংসার নারীপুরুষ হেরিস

কদম কদম রেড রোড ধা কদম
পাঁজর ভরে মধ্যম এবং অধম
ছায়াপথের উল্কা ছুটিস কদম

ঝমর্ ঝমর্ ঝমৎ ঝমৎ ঝমাস্
বছর বছর ক'রাত ক'দিন ক'মাস
সামনে কদম চাবুক হেরিস ঝমাস্

চাবুক চাবুক সমস্ত দিন চাবুক
যাত্রী উঠুক যাত্রী চলুক নাবুক···

তরুণ সান্যাল

আকাশের উপমায়

নিরবধি নতনেত্র হয়ে বুঝি আকাশ অগাধ
পক্ষ্মের তলায় রস শায়িত জীবন :
যেন স্বপ্নাতুর চক্ষু দেখে মাটি, অরণ্য, পর্বত
দেখে ঝড়, স্রোতোধারা, মন ও মনন, ঘন বন
ক্ষেত বাড়ি নগর নীহার
···কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রাতিগ, উৎস হতে উৎসার, বিস্তার

আমি যেন মনহীন, নির্মনন প্রস্তরপ্রতিম
আমি যেন নিশ্চৈতন্য পর্বত, ঝটিকা, তাপ, হিম…
আমি যেন কীট…পরে অনুরূপ কীটের আহার
বেগ হতে প্রতিবেগ হতে যাই বেগে
বৃষ্টি হয়ে জলকণা বাষ্পাধার মেঘে

আকাশ, আমার বক্ষে নিরবধি কী শূন্যতা দিলে
পুনর্বার ফিরে যাবো জলশূন্য জলাধারে
বস্তুশূন্য বস্তুর নিখিলে
দক্ষিণ হাতের স্পর্শধৃত রয়, শূন্য রয় অঙ্গুলির ম্লান পেয়ালায়
যেনবা হাওয়ার শূন্য যাত্রায়
জীবন কেন তার
ক্রীড়ার দ্বন্দ্বের নামে এতবার ধাঁধাবে গর্বিত
পীড়ার ছন্দের দামে এতবার মাতাবে মাটিতে
এ কেবল প্রতিদিনে…প্রতিদিনে…প্রতিদিনে বর্ধমান পীড়া
বালকের ওষ্ঠবায়ু চাপে স্ফীত গর্বিত বুদ্‌বুদ, ক্ষার ফেন
তাৎক্ষণিক বর্ণময় অস্তিত্বে উদ্ধত, হয়ে অতিশয় প্রীত

চক্ষুর ভিতরে পড়ে জ্যোৎস্না, পড়ে মানহাট্টানে, মস্কোয়, পিকিঙে
ছায়াছন্নতায় দূরে বন্ধুদের প্রেত মনে হয়
চক্ষুর ভিতরে সূর্যপাত বাড়ে কলকাতায়, বাগদাদে, সায়গনে
রৌদ্রময়তায় কাছে বন্ধুদের শুভ্রবেশ, কালো মনে হয়…
চক্ষুর গভীরে তবু অরণ্যানী, পর্বত মেখলা, শস্প দীপ্ত হাভানায়

আমি আরো দীর্ঘবেলা প্রস্তরে অরণ্যে ঝড়ে বায়ুবীথিকায়
দীর্ঘকাল সমুদ্রের তরঙ্গ গুহায় জারিত রব ঝিনুকে
নির্মনন বস্তুরাজ্যে প্রবল অগাধ অন্ধ শক্তির দীক্ষায়
: অতঃপর ফেটে উঠতে ফুটে উঠতে অশোকে, কিংশুকে…
যেমন অসীম দ্যো : কিন্তু নত পক্ষে নিরবধি
দেখে চন্দ্রসূর্য…হাসি অশ্রু…বায়ু, প্রস্তর প্রহারবহ নদী ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ

মহানগর

ঐ কথাই রইলো তবে! আপনি তো যাবেন বাসে,
জিপিও-র কাছে ঠিক ছ'টায় থাকবেন।

—বলতেই, ভীষণ জোরে স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে
ছুট্‌কে এলো বাতাসের তোড়···গঙ্গার বাতাসে,
কেঁপে উঠলো কয়লাঘাট, টেলিফোন বাড়ি, চার্চ লেন;
চারদিকে গম্‌গম্‌ করে শব্দ ভেঙে প্রতিধ্বনি-ধ্বনি-প্রতিধ্বনি রেখে
সকাল দশটার হাওয়া টার্মিনাসে সূক্ষ্মভোল্ট ইস্পাতের তারে
চকিতে চম্‌কিয়ে, ঘুরে ভেসে গেল ট্রাপিজে কুহকে, আকাশে।
হঠাৎ-দাঁড়ানো-এক ভয়ানক ডবলডেকারে
নরম, সতর্ক লাফে মহিলাটি উঠে চলে গেল—আসবেন, আসবেন।

এতোক্ষণে, খুব দ্রুত ভিড়ের ভিতরে, দশটার রোদ্দুরে ঠিক
দশটার ওধারে
যুবকের পায়ে-পায়ে পদধ্বনি, অন্তহীন পায়ে-পায়ে ঊর্ধ্বশ্বাস
ভিড়ের অনন্ত জোড়া-পায়ে;
দুরন্ত ঘোড়ার চাল ঠেকাতে ঠেকাতে বিস্ফারিত ডালহাউসি
চীৎকারে-চীৎকারে
ধ্বসে রইলো মৃতবৎ, রৌদ্রস্রাবে···ধর্ষণের ধূমল আঘাতে।

ততোক্ষণে, গেজেটেড্‌ পেন্সিলের কাপালিক ছোবল বাঁকায়ে
কোনোক্রমে পুনর্বার যুবাটির বুকের বাতাস
নবীন, উজ্জ্বল, স্ফীত উড়ে যায় ঠাণ্ডা···লঘু, অচিন্‌ জলের
পাড়ে-পাড়ে—
উদাস দুপুরে···দূরে—অপরাহ্ণ আসিবে কী হেমন্তকে
ভাসায়ে ভাসায়ে!

কেঁপে যায় কয়লাঘাট, স্ট্র্যাণ্ড রোড, টেলিফোন বাড়ি···চার্চ্‌ লেন
—আসবেন, ছ'টায় আসবো, আসবেন, ছ'টায় আচ্ছা, আসবেন আসবেন।

মানস রায়চৌধুরী

দিনযাপনের অংশ

চেয়ে দেখ ভালবাসা, ঠিক আমি নই, প্রায় আমার আগামী
ফুটে ওঠে সমস্ত না-লেখা কবিতার বক্ষোপরি
অদৃশ্য প্রাসাদ আরো, যে ছন্দ গাঁথেনি সেই অক্ষর-যতির মাঝখানে
সেই ইট, মায়াবী সূক্ষ্মতা যার অধিকার অনাদি ভূস্বামী
পাবে না অনন্ত গঞ্জে—আমি বৃথা আহ্নিকে আজানে
প্রত্যাশা দিয়েছি খুলে, যাবে না তবুও যদি যায় অশরীরী।

আমি নই, ভালবাসা, তবু যেন আমারই প্রচ্ছায়া
তোমার দেওয়াল ঘেঁষে হেঁটে যায়, তুমি বলো প্রতিমর্ত্য কায়া—
ভৌতিক নিঃশ্বাসচ্যুত দিনগুলি কেন যে এমন ঘটনায়
কেন যে পথের অন্ধ ভিখারীর ছদ্মবেশে অসীম শৈশব, স্তব্ধতায়
ঘরের ভিতরে আমি, কেন তুমি কখনো ভেবেছো ?

অথচ এ জটিলতা ছিদ্র করে কবির হৃদয় ফোটে মৃত্যুর গভীর
ছায়াপথে জ্বলে ওঠে নভোজাত আয়ত শিশির,
অবিরাম চোখে কাঁপে শূন্যতাপ্রসারী পথ, ভালবাসা, তুমি থাকো
আজও ওপারের
যারা একবার এসে ছুঁয়েছিলো, আমিও তাদের নই জানো
তবু কেন 'হয়ে ওঠা' সব বিসর্জন নিতে, এই তন্থ তাহলে কাদের ?

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

স্মারক

তাম্রপাত্রে রাখিয়াছি পিতামহ নির্লজ্জ্য নিয়তি।
জলস্থল শূন্যস্বর, শেষপ্রহরের যতিপাত,
নির্মম চিতায় কেউ যদি খোঁজে শার্দুলের নতি,
হে আকাশ ক্ষমা করো, বিচলিত, হিমের সন্তাপ।

গন্ধচূর্ণ দুর্গদ্বার, তৈজসের প্রাচীন বেসাতি ;
সুন্দরীর স্বর্ণরেণু চড়াদামে বিকোবে বাজারে,
ইতিমধ্যে অমরতা, বার্ধক্যের সুঠাম যযাতি,
দেবযানী রক্তে চায় তাকে, বহুমুখী অন্ধকারে।

মেদে নয় মস্তে নয় কিংবা নয় দুরূহ উচ্চাশা,
সম্ভব সফল স্পর্শে, নারী পাবে নিজের পূর্ণতা ;
অন্তরীক্ষ শূন্যঘর প্রয়োজনে শুধু একা ভাসা,
অন্তিমে ওষ্ঠই বলে জীবনের একক শূন্যতা।

তাম্রপাত্রে রাখিয়াছি পিতামহ স্বদেহের ছাই,
জন্মমৃত্যু একদেহ, প্রাচীনতা একমাত্র ঠাঁই।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

ক্রীতদাস অন্ধকার

বিপন্ন আলোর কণ্ঠ। ক্রীতদাস অন্ধকার দ্বারে
প্রতীক্ষিত। ক্রমাগত স্তব্ধতায় শীতল শরীর
সূর্যাস্তের সহচর। আগন্তুক দৃশ্যের বয়স
সতত স্রোতের পাশে প্রবাহিত। প্রকৃত প্লাবনে
সজীব নৌকার দেহ অকস্মাৎ সংঘাতমুখর।

মুখরতা স্পর্শ করি। অপসৃত তমিস্রার ক্ষত।
শকটবিহীন পথে পদক্ষেপ। দৃশ্যান্তরে আলো
ভ্রাম্যমাণ। উচ্চকিত আবির্ভাব বিনম্র বিরলে
স্পর্ধার নিকটে স্পর্শ। জনান্তিকে হৃদয়ের ঘ্রাণ।
শব্দিত নৌকার শীর্ষে দিগ্বিজয়ী কিরণসম্পাত।

প্রচুর প্রপাত আমি দেখিয়াছি। বিবিধ অম্বরে
নানারূপ মেঘধ্বনি। অন্তরালে লুপ্ত নীরবতা।
সোচ্চার আলোর কণ্ঠ। উন্মোচিত নৌকার শিখরে
স্রোতের প্রসিদ্ধ চিহ্ন। অন্ধকার দূরে ক্রীতদাস।

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

নিজের ভুবনে

জানি অরণ্য শ্যামলকান্তি
আকাশে করুণা কুসুমে শান্তি
বিপুল বিশ্ব
ললিত দৃশ্য অন্তহীন।
প্রস্তরভেদী মৌনের বেদী শূন্যে ছুটেছে বন্ধহীন॥

কোথাও আমার মায়া নেই।
সেখানে যাব না যেখানে তোমার করকমলের ছায়া নেই।

নিভৃত ব্যথায় রয়েছে নীলিমা
বাসনায় জ্বলে দূর বনসীমা
কুসুমের দল
হৃদয়ে অতল রক্তলীন।
থাকবো একাকী নিজের ভুবনে অন্তরীণ॥

প্রতি নিমেষের মৌন ভরে যা দিয়েছ তোমার জানা নেই।
নিঃস্বের আর সে-বিশ্বভার বইবার মতো ডানা নেই॥

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

দিন জ্বলছে

শিউলিতলা তোমাকে মনে পড়ছে যেন আবার।

কে যে এখানে টেনে আনলো এখনও তা কি জানি
দিনরাত্তির জলতে লাগল প্রেমের রাজধানী
প্রেতের পুরী হাতড়ে মরি, নিশুত হল জাগার,
শিউলিতলা তোমাকে মনে পড়ছে যেন আবার।

অনেক ফুল ঝরিয়েছিলাম হারিয়েছিলাম ফুল
অনেক ফুলে সাজিয়েছিলাম নিষ্করুণ চুল
তোমার বুকে রাখবে কি লো সময় হলে যাবার ?
পুষ্পবাসে কিছু কি ছিল সকল হারাবার !

দিন জ্বলছে তবু তো শেষ নয় এ পরবাস
সবুজ চিতা জ্বলতে লাগল আশ্বিনের মাস,
শিউলিতলা তোমাকে তবু মনে পড়ছে আবার।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

প্রতিবেশী

ঘরগুলি শূন্য পড়ে আছে।　হাট করা দরোজা জানালা
খাঁ খাঁ করছে চতুর্দিক, বাসিন্দারা চলে গেছে কাল
মাতাল হাওয়ার সঙ্গে ইতস্তত উড়ন্ত জঞ্জাল ;
দূরে, অন্ধকারে শুনি প্রিয়স্মৃতি বাজায় বেহালা।

অন্যদিন এ সময় স্নিগ্ধ শান্ত আবছায়া মুখ
বাতায়নপথে তাকে দেখা যেত ; আকাঙ্ক্ষিত ছবি ;
এখন শূন্যতা ঘিরে সায়াহ্নের বিষণ্ণ পূরবী
নির্জনতালোভী কিছু বাতাসেরা অত্যন্ত উৎসুক।

সকলেই চলে গেছে অন্য কোনো নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে
কোনোদিন ফিরবে না পরিত্যক্ত এই কক্ষে, একা
করতলে নিয়ে স্নিগ্ধ গোধূলির স্মিত রৌদ্ররেখা
ললাটে আঘাত করে ছায়াগুলি ক্ষোভে, পরাজয়ে।

সেইদিন শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে শুনেছি সহসা
পরিচিত পদশব্দ, শূন্যকক্ষে, বারান্দায়, ছাতের সিঁড়িতে।

তারাপদ রায়

জরিপ

এখন জরিপ হবে, তাঁবু ফেলে কানুনগো, আমিন
বসে আছে চতুর্দিকে ; খুঁটি পুঁতে চেন ফেলে ফেলে
কঠিন হিসাব হবে চুলচেরা, এই একছটাক
জমি ঠিক কার প্রাপ্য ?—তোমার স্বর্গীয় পিতামহ
পপার ছিলো হে, তুমি কিছুই পাবে না। ঐ ছায়া,
বাদাম গাছের নীচে ভিটে বাড়ি, হলুদ পুকুর,
তুমি ভালোবেসেছিলে ; কিন্তু খতিয়ানে অন্য নাম,
অন্যান্য ব্যক্তির দাবী আইনসঙ্গত ; কিছু আছে,
দখল প্রমাণ, দানপত্র, কিংবা ডিক্রি আদালতে ?
কিছু নেই, কি আশায় এই রৌদ্রে হেঁটে এসেছিলে
এত পথ, গ্রামের সীমার বাইরে সেটলমেণ্ট তাঁবু।

অথচ টাউট নও তবু কেন প্রত্যেক তাঁবুতে
ঘোরা ফেরা, বেহক সম্পত্তি নিয়ে কেন এত লোভ,
সবচেয়ে ছায়াওলা বাড়ি, সবচেয়ে ঠাণ্ডা জল
শ্যাওলার দামে ঢাকা পুরাতন হলুদ পুকুর
কেন এত লোভ করো ? উত্তরাধিকারসূত্রে তুমি
গৃহহীন, ভূমিহীন, ছায়াহীন সামান্য পপার।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বঞ্চনা

স্কুল ছুটি হয় সাড়ে দশটায়। ফিরতে ফিরতে প্রায় এগারোটা। তারপর এখানে গড়ায়, ওখানে গড়ায়। মায়ের বকুনি খেতে খেতে নাইতে যায় গোপা। খেয়ে উঠতে উঠতে বেলা প্রায় একটা। আজও তাই হল। খেয়ে উঠে বাইরের ঘরে এসে কাগজখানা নিয়ে বসল গোপা। বড় বড় খবরের চেয়ে দেশের ছোট খবরেই তার উৎসাহ বেশি। সেগুলি প্রায় গল্পের মতো। তবে সবই প্রায় করুণ রসের গল্প। কোনো একজন স্বর্ণশিল্পী আত্মহত্যা করেছে। কে একজন নার্স ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছে। কাগজওয়ালারা কি দুটো ভালো খবর দিতে পারে না? মিলনান্তক গল্পের মতো যা মধুর? পড়লে মন ভালো হয়ে যায়। তা তো নয়, বেছে বেছে যত সব অঘটন ঘটনার কথাই কাগজওয়ালারা ফলাও করে লেখে। কোথায় বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কা লাগল, কোথায় ট্রেনের সঙ্গে ট্রেনের কলিশন হয়ে শত শত লোক মারা গেল, প্লেন ধ্বংস হয়ে পাইলট আর আরোহী সব পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল এই সব খবর। গোপার মোটেই ভালো লাগে না এসব। এগুলি গোপার ছোট ভাই টিকলু খুব ভালোবাসে। ও খুব নিষ্ঠুর। গোপার চেয়ে দু বছরের ছোট তার ভাই। পড়েও দু-ক্লাস নিচে। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ওই যেন বাড়ির কর্তা। ও যেন বাবারও বাবা। কড়া-কড়া কথা বলতে ভালোবাসে টিকলু। রাস্তায় যেখানেই গোলমাল হয়, মারামারি কাটাকাটি লাগে, সেখানেই গিয়ে মুখ বাড়ায়। যেন কত বড় বীরপুরুষ। বীরত্বের মধ্যে তো লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল ডিটেকটিভ বই পড়া। খুনখারাবি মারামারি কাটাকাটির গল্পেই ওর আনন্দ। ইচ্ছা করলে বাবাকে বলে দিয়ে গোপা ওকে মার খাওয়াতে পারে। বাবা মোটেই ও-সব বই পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, 'ও-সব পড়লে বাংলা ভুলে যাবি, ভুল বানান, ভুল ব্যাকরণ শিখবি।' তিনি বেছে বেছে ভালো ভালো বই নিয়ে আসেন,

আলমারি খুলে ছেলেদের জন্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের অবনীন্দ্রনাথের বইগুলি টিকলুর সামনে এগিয়ে দেন। কিন্তু টিকলুর বয়ে গেছে ও-সব বই পড়তে। বাবা যেই অফিসে বেরিয়ে যান, মা কাজকর্ম সেরে ঘুমোন কি ও-বাড়ির মাসিমার কাছে যান সেলাই করতে, সেই ফাঁকে টিকলু রবীন্দ্রনাথের বইগুলি সরিয়ে রেখে ওই সব বই পড়ে। ইচ্ছা করলে বাবাকে কি ছোটকুদাকে বলে দিয়ে ওকে আচ্ছা করে মার খাওয়াতে পারে গোপা। কিন্তু মায়া হয়! শত হলেও ভাই তো। যতই ঝগড়া করুক, চুল ধরে টানুক, গোপাকে শাড়ি গয়না পরতে দেখলে হি হি করে হাসুক, ওকে কেউ মারলে কি বকলে গোপার ভারি মায়া হয়। মায়ের পেটের ভাই তো!

কিন্তু কাগজওয়ালাদের ওপর ভারি রাগ হয় গোপার। ওরা কি একটাও মনের মতো খবর দিতে পারে না? যা সিনেমার গল্পের মতো, মিলনান্তক উপন্যাসগুলির মতো মধুর? ওরা কি লিখতে পারে না একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসল আর ভালোবেসে বিয়ে করল? এসব খবর বুঝি খবর নয়!

বড় বড় রাজনৈতিক খবরগুলিতে গোপার কোনো উৎসাহ নেই। বড় বড় হরফওয়ালা, পাতা-জোড়া হেডিংওয়ালা সব খবর। দেশে বিদেশে কত কি কাণ্ডকারখানাই না রোজ হচ্ছে।

বাবা বললেন, 'ওইগুলিই তো পড়বি। কাগজ তো সেইজন্যেই রাখি। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িস তুই। সব খবরই তো তোর জানা দরকার। নইলে বাইরের জ্ঞান বাড়বে কী করে।'

কিন্তু জ্ঞান বাড়াবার জন্যে গোপার যেন ভারি মাথাব্যথা। বাবা বোঝেন না খেতে বসে যেমন যে যার পছন্দমতো খায়, স্কুলপাঠ্য ছাড়া পড়তে বসেও যে যার পছন্দমতো বইপত্র কাগজপত্র পড়ে। গোপা আনন্দ পেতে পেতে পড়তে চায়। এর ওপর কেউ যদি খবরদারি চালায় মস্ত বড় একটা মজাই যেন মাটি হয়ে যায় জীবনের। টিকলু যেমন বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে তার খুশিমতো বই পড়ে, গোপাও তেমনি বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে তার নিজের খুশিমতো সিনেমার বিজ্ঞাপন পড়ে আর ছোট ছোট সব খবর। এই সব খবরেই যেন সত্যিকারের মানুষের খবর পায় গোপা। দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ মরে গেছে শুনলে মনটা অবশ্যই খারাপ হয়, কিন্তু চোখের জল যেন তেমন বেরোয় না। সেবার যে এই পার্কের ধারে

একজন ট্রাফিক পুলিশ সরকারি বাসের চাকার তলায় পড়ে মারা গেল দেখে কী কষ্টই না হয়েছিল গোপার! বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। অথচ চেনেও না, জানেও না। টিকলুর সঙ্গে গোপাও গিয়েছিল দেখতে। ভিড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে গোপাও দেখে নিয়েছিল এক ঝলক। দেখা যায় না সে দৃশ্য। লম্বা-চওড়া দেহটা ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। মুখখানা থেঁতলে গিয়েছে বলেই বোধ হয় কাপড় দিয়ে কে যেন ঢেকে রেখেছে। কিন্তু হাতের বাঁশিটি কেউ ঢাকে নি। ওই বাঁশির ফুঁয়ে ফুঁয়েই তো সে বড় বড় অতিকায় গাড়িগুলির লরিগুলির গতিবিধি ঠিক রাখত। পুলিশের হাতের ওই বাঁশিটা কোনোদিনই আর বাজবে না, এ কথা ভেবেই গোপার সেদিন কান্না পেয়েছিল।

দেখে টিকলু তাকে কী ধমক, 'কিছু একটা দেখলেই কেবল ফ্যাচ ফ্যাচ করবি, এই জন্যেই তো তোকে নিয়ে কোথাও বেরোই না।'

ছোট ভাই তো নয়, ওই যেন বড় দাদা।

সেই মরা পুলিশের কথা ভেবে আজ এতদিন বাদেও গোপার মন খারাপ হয়ে গেল।

আর ঠিক সেই সময় সদর দরজার কড়া দুটো আস্তে আস্তে নড়ে উঠল।

এই ভর দুপুরে কে এল আবার।

পিঠময় ভিজে চুল ছেড়ে দিয়ে মায়ের নীল রঙের শাড়িখানা পরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বেশ আরাম করে কাগজ পড়ছিল গোপা, কড়া নাড়ার শব্দে উঠতে হল। হাতের কাগজখানা রাখল চেয়ারের হাতলের ওপর। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দোরের বাইরেই রাস্তা। আর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে একটি ছেলে। বাচ্চা ছেলে নয় যুবক। ছোটকুদার চেয়েও বয়সে বড়। এম. এ. পড়ে ছোটকুদা। তার চেয়েও দেখতে বড়। পরনে আধময়লা একটা পাজামা, গায়ে ওই রকমই ছিটের শার্ট। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি উস্কোখুস্কো। তবু দেখতে কিন্তু বেশ। অনেকটা ছোটকুদার বন্ধু দেবুদার মতো। কালো রঙের ওপর সুন্দর চেহারা। দেবুদার মতোই টানা টানা নাক চোখ; দাড়ি-টাড়ি কামানো, একরত্তি গোঁফ আছে কিন্তু ঠোঁটের ওপর। ওমা, বগলে আবার ভাঁজ করা খান-কয়েক খবরের কাগজ কেন? ছোটকুদার অনেক সময় পুরনো কাগজের দরকার হয়। ওঁরও কি তাই? ছোটকুদার অনেক

বন্ধুকেই দেখেছে বেশবাস গরিবের মতো। কিন্তু ও-সব দিকে কোনো খেয়াল নেই। এঁরও প্রায় সেই রকম অবস্থা। জামা-কাপড়ের দশা ওই। পায়ের স্যাণ্ডালজোড়াও যে কত দিনের পুরনো তার ঠিক নেই।

'দিদি, একটা কথা বলব শুনবেন ?'

ও মা দিদি বলে ডাকছে আবার। দেখ কাণ্ড। গোপা মায়ের শাড়িখানা পরেছে বলে আর হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে গেছে বলে ওই বয়সী একটি ছেলের দিদি হতে পারে নাকি সে! বলুক যা খুশি। বাবা আর মাও তো আদর করে গোপাকে মাঝে মাঝে মা বলে ডাকেন। তাই বলে সে তো আর নিজেই নিজের ঠাকুরমাও নয়, দিদিমাও নয়।

গোপা বলল, 'কী বলছেন বলুন।'

ছেলেটি বলল, 'দেখুন বলতে বড় সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু না বলেও পারছিনে। আমাকে কিছু কাগজ দিতে পারেন ? পুরনো খবরের কাগজ।'

গোপা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কাগজ! কাগজ দিয়ে কী করবেন আপনি।'

ছেলেটি বলল, 'বলছি। উঃ কী রোদ উঠেছে দেখেছেন ?'

সত্যি ভারি গরম পড়েছে আজ। ভাদ্র মাসে যেমন কড়া রোদ তেমনি পচা গরম।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই ভারি কষ্ট হচ্ছে।

গোপা একটু ইতস্তত করে বলল 'আপনি কি ভেতরে আসবেন ? এসে বসুন। এখানে হাওয়া আছে। ঈস, ঘেমে গেছেন একেবারে। পাখার পয়েণ্ট আরো বাড়িয়ে দেব ?'

ছেলেটি ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসল। একটু এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বলল, 'না না, দরকার নেই, এতেই হবে। আজ অনেক হাঁটতে হয়েছে। পাঁচ-ছ মাইল তো হবেই।'

গোপা বলল, 'পাঁচ-ছ মাইল! এই রোদের মধ্যে এমন করে ঘুরছেন কেন ? সানস্ট্রোক হতে পারে যে!'

'হলে আর কী করব বলুন। দায়ে পড়লে সবই করতে হয়। জানেন ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে লেখাপড়া শিখে আজ ভিক্ষেয় নেমেছি। আমিও বি. এস. সি. পর্যন্ত পড়েছিলাম।'

গোপা বলল, 'সে কি! ভিক্ষে! ভিক্ষে আবার কিসের। আপনার হাতে তো কোনো থলি দেখছিনে।'

ছেলেটি একটু হাসল, 'হ্যাঁ, ওইটুকুই এখন বাকি।'

গোপা দেখল ভারি সুন্দর তো ওর দাঁতগুলি। আর হাসির ভঙ্গিটিও বেশ। কিন্তু এ-হাসি যে দুঃখের হাসি গোপার তা বুঝতে বাকি রইল না। সেদিন একখানা উপন্যাসে পড়েছিল মানুষ কখনো কখনো সুখে কাঁদে দুঃখে হাসে। ভারি ভালো লেগেছে কথাটা। মুখস্থ করে রেখেছে গোপা।

'আপনি তাহলে সত্যিই ভিক্ষে করেন না?'

ছেলেটি বলল, 'না, অমনিই বলছিলাম। তবে আজকে আমি সাহায্যের জন্যে বেরিয়েছি। জীবনে এই প্রথম। একে যদি ভিক্ষে বলতে হয় বলতে পারেন।'

গোপা একটু হাসল, 'বাঃ রে, আপনি যদি না বলতে চান আমি কেন বলব। কী হয়েছে বলুন না।'

ছেলেটি বলল, 'চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আজ ছ-মাস ধরে বেকার। খুঁজে খুঁজে আসানসোলে এক কোল কোম্পানির অফিসে একটা চাকরি পেয়েছি। কেরানীগিরির কাজ। আগেই ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছিলাম। ওদের পছন্দ হয়েছে। ডেকে পাঠিয়েছে। কালই জয়েনিং ডেট। আজই বিকেলের গাড়িতে যেতে হয়, নয়তো কাল খুব ভোরে। দশটায় অফিস। কিন্তু যাব কী করে? একটি পয়সা নেই পকেটে।'

'ওমা, সে কী?'

ছেলেটি বলল, 'তাই তো ভাড়াটা জোগাড় করতে বেরিয়েছি। এ পাড়ায় আমার একজন পুরনো মাস্টারমশাই আছেন। তিনিও গরিব। তিনি নগদ কিছু দিতে পারলেন না। এই পুরনো কাগজ কখানা দিয়ে বললেন 'এগুলি বিক্রি করে নিস।' ছেলেটি ফের হাসল, 'এতে আর ক-আনার পয়সাই বা হবে। কিন্তু মাস্টারমশাইর আশীর্বাদ ফেলে দিতে তো পারি না। নিয়ে এলাম। আপনারাও তো কাগজ রাখেন। আমাকে দেবেন কিছু? দু সের তিন সের যা হয় দোকানে বিক্রি করে দেব। এইভাবে যদি গাড়ি ভাড়ার টাকাটা জোগাড় হয়।'

তক্তপোশের তলায় একটা কাঠের বাকসের মধ্যে পুরোন কাগজ সব জমিয়ে রাখে গোপারা। দু-তিন মাসের কাগজ জমলে বিক্রি করে দেয়। দিন পনের আগে বাবা সব কাগজ বেচে দিয়েছেন। এই কদিনে যা জমেছে সে আর কখানা!

গোপা সব খুলে বলল ছেলেটিকে, তারপর অসহায়ের মতো করুণভাবে বলল, 'বেশি কাগজ তো আমাদের আর নেই।'

ছেলেটি বলল, 'যা আছে তাই দিন। আমার ভাগ্য।'

পুরনো মাসিক সাপ্তাহিক কিছু ছিল। আর পনের দিনের খবরের কাগজ। সব একসঙ্গে গুছিয়ে নিয়ে গোপা ছেলেটির হাতে তুলে দিল। কী খুশিই যে হল ছেলেটি। দেখে গোপারও আনন্দ হল। মানুষের মুখে সুখের ছবি দেখতে কী সুন্দরই যে হয়!

কাউকে অবশ্য জিজ্ঞাসা না করেই কাগজগুলি দিয়ে দিল গোপা। কাকে আর জিজ্ঞাসা করবে। বাবা নেই, সাড়ে নটায় অফিসে বেরিয়েছেন। মা খেয়ে দেয়ে ও-বাড়ির মাসিমার কাছে গেছেন জামা সেলাই করতে। ঠাকুরমা কোটর ঘরে ঘুমোচ্ছেন। নাক ডাকার শব্দ হচ্ছে তাঁর। দাদা ইউনিভার্সিটিতে, টিকলু স্কুলে। এ বছর থেকে ওর দুপুরে স্কুল শুরু হয়েছে। কে আছে বাড়িতে যে জিজ্ঞাসা করবে। তাছাড়া জিজ্ঞাসা করবার আছেই বা কী। কখানা তো মাত্র কাগজ।

গোপা বলল, 'কিন্তু এই কখানা কাগজে তো আপনার কিছুই হবে না।'

ছেলেটি বলল, 'উপায় কী।'

গোপা বলল, 'আচ্ছা, আপনার বাবা মা কেউ নেই?'

'থাকবেন না কেন। আছেন। বাবা ইনভ্যালিড। দিনরাত বিছানায় পড়ে থাকেন। মা আর ছোট ভাইবোনগুলি আমার মুখ চেয়ে আছে। যদি সময়মতো গিয়ে জয়েন না করতে পারি আর যদি চাকরিটি না হয় তাহলে যে বেকার সেই বেকার। উপোস করে মরতে হবে সবাইকে।'

গোপা শিউরে উঠল। কিছুদিন আগেও কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল—বেকার যুবকের আত্মহত্যা। এক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন ভাবল গোপা। তারপর একটু হেসে বলল 'কাগজ বিক্রি করে তো আপনার বোধ হয় একটা টাকাও হবে না। আমি যদি আপনাকে কিছু দিই—'

ছেলেটি বলল, 'তাহলে তো ভালোই হয়। আমি আজই চলে যেতে পারি।'

'কত লাগবে আপনার?'

'যা আছে সেই সঙ্গে আর চার-পাঁচ টাকার মতো হলেই হয়ে যাবে। ওখানে গিয়েও তো কদিন খেতে হবে। অন্তত একবেলা তো দু-মুঠো চাই।

সেই হোটেল খরচাটা যদি নিয়ে যেতে না পারি—। এখানে আপনারা আছেন কিন্তু সেখানে আমাকে আর কে চেনে? গিয়েই তো আর সঙ্গে সঙ্গে মাইনে পাব না। এক মাস কাজ করব তবে মাইনে।'

'আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।'

গোপা তাদের শোবার ঘরে এল। এ ঘরে এক ধারে তক্তপোশ আর এক ধারে বইপত্রের র‍্যাক, পড়বার টেবিল। তাকের ওপর চাবি আছে। চাবিটা পেড়ে নিয়ে ড্রয়ার খুলল গোপা। জন্মদিনে বাবা এবার শাড়ি দেন নি। বই দিয়েছিলেন আর পাঁচ টাকার একখানা নোট। নোটখানা টেবিলের ড্রয়ারে লুকিয়ে একটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়েছে গোপা। খরচ করে নি। সিনেমা দেখবার লোভ হয়েছে অনেকবার। দেখে নি। বাবা বলেছেন, 'ও টাকা খরচ করিসনে। আমি তোকে আলাদা করে সিনেমা দেখাব।'

ব্যাগ থেকে নোটখানা বার করে সরাসরি বাইরের ঘরে চলে গেল গোপা।

ছেলেটি বসে ছিল, তার দিকে নোটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন।'

যে নিল তারও হাত কাঁপল, যে দিল তারও হাত কাঁপল। এত বড় দান জীবনে গোপা আর কাউকে করে নি।

ছেলেটি বলল, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—'

গোপা বলল, 'ওসব বলবেন না। আচ্ছা আপনার নাম ঠিকানা যদি দিয়ে যান—। মানে কখনো যদি দরকার-টরকার হয়!'

'নাম ঠিকানা?' ছেলেটি একটু থেমে গেল। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'বেশ তো। কাগজ কলম দিন। লিখে দিয়ে যাই। আমার পাইলট কলমটা দু টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি। পাঁচ টাকায় কেনা ছিল। কলমটা দিন, কি একটা পেনসিল হলেও চলবে।'

গোপাকে ছোট একখানা ডায়েরি দিয়েছেন বাবা। নোট বইয়ের মতো ব্যবহার করে। আত্মীয়স্বজনের বন্ধুদের নাম ঠিকানা, ফোন থাকলে তার নম্বর টুকে রাখা। সেই ডায়েরিটা গোপা ওকে দিল।

ছেলেটি নাম ঠিকানা লিখে দিল সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজিতেই লিখল। রামগোপাল বিশ্বাস, ৩।২।১ গোপাললাল ঠাকুর রোড।

এবার কাগজগুলি তুলে নিয়ে সে বাইরে নামল। হেসে বলল, 'কী উপকার যে করলেন।'

গোপা বলল, 'চাকরি হলে জানাবেন তো ?'

রামগোপাল বলল, 'নিশ্চয়ই জানাব। জয়েন করেই চিঠি দেব। যেমন বাড়িতে চিঠি লিখব, তেমনি আপনাদের এখানেও—'

গোপা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমার নামে লিখবেন না যেন। বাবার নামে দেবেন।' নিজেদের নাম ঠিকানাও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল গোপা।

রামগোপাল বলল 'আমার মনে থাকবে।' তারপর তাড়াতাড়ি বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। বোধ হয় এক্ষুনি গিয়ে বাস ধরবে। বিকেলের গাড়ি ধরতে হলে এখনই তো তৈরি হওয়া দরকার।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে এবার এসে ফের পাখার নিচে ইজিচেয়ারটায় বসল গোপা। কিন্তু খবরের কাগজ পড়তে আর মন বসল না। তার দোরের কাছে ঘরের মধ্যে যে ছোট ঘটনাটুকু ঘটে গেল তার মধ্যে যেন রহস্যের শেষ নেই, বিস্ময়ের শেষ নেই। আলাপ ছিল না, পরিচয় ছিল না তবু কত আপনজনের মতো। যার অত দরকার তাকে দিতে কত ভালো লাগে। ভাগ্যে টাকাটা গোপা খরচ করে ফেলে নি।

খানিক বাদে সুরমা এল ঘরে। নিজের আর মেয়ের দুটো ব্লাউসই সেলাই করে নিয়ে এসেছে।

'দেখ তো গায়ে দিয়ে।'

কিন্তু জামাটা পরবার আগে গোপা বলল, 'জানো মা, আজ কি রকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।'

'কী আবার ঘটল রে ?'

মায়ের কাছে সবই বলল গোপা। শুধু পাঁচটি টাকার কথা গোপন করে গেল।

কিন্তু তবু সুরমার কী রাগ, 'কেন তুই কাগজ দিতে গেলি ? কেন আমাকে ডাকলি নে ? তোর এত বড় সাহস হল কী করে ? চেনা নেই জানা নেই। কতজন কত মতলবে বেরোয়। যদি চুরি ডাকাতি করে পালাত ?'

গোপা বলল, 'না মা, ও ধরনের ছেলে নয়। ভদ্রলোকের ছেলে। তবে গরিব। গরিব কি আর ভালো হয় না ?'

'ভালো কী করে তুই জানলি ? চিনিস ওকে তুই ? খবরদার আর কক্ষনো এমন কোরো না। আমাকে না জানিয়ে কাউকে ঢুকতে দিয়ো না বাড়ির মধ্যে। কারো সঙ্গে কথা বলারও দরকার নেই।'

মায়ের সামনে গোপা চুপ করে রইল।

তারপর বিকেলবেলায় এল টিকলু আর ছোটকু।

সুরমাই তাদের কাছে সব বলল, 'কাণ্ড দেখ মেয়ের। দিনে দিনে ধাড়ি হচ্ছে আর যেন বুদ্ধিশুদ্ধি সব রসাতলে যাচ্ছে। কখানা কাগজের ওপর দিয়েই গেছে, এই যা রক্ষে।'

ছোটকু সব শুনে বলল, 'ঠিক সেই ছেলেটি। জোচ্চোর। কিছুদিন আগে শ্রীনাথ মুখার্জি লেনের আমার এক বন্ধুকেও অমন করে ঠকিয়ে নিয়ে গেছে। তার কাছে বলেছে, বাবার অসুখ। ওষুধ জোটে না, পথ্য জোটে না। ভিক্ষে-করা কাগজ বিক্রি করে বাপের চিকিৎসা চালাবে। আমাদের ভাগ্য ভালো কাকীমা, গোপাকেও যে ভুলিয়ে-টুলিয়ে থলির মধ্যে ভরে নিয়ে যায় নি লোকটি।'

সুরমা রাগ করে বলল, 'গেলে তো আপদ যেত।'

গোপা বলল, 'তোমরা যে অমন করছ—নাম ঠিকানা দিয়ে গেছে সে। চোর হলে কেউ কি নাম ঠিকানা দেয়?'

ছোটকু হেসে বলল, 'আর নাম ঠিকানা।'

'কই দিদি দেখি, তোর নাম ঠিকানা দেখি।'

গোপার ড্রয়ার থেকে তার ছোট্ট নোটবুকটা প্রায় জোর করেই কেড়ে নিয়ে টিকলু হেসে বলল, 'এবার আমি একটা কেস পেলাম হাতে। ডিটেকটিভ কী করে হতে হয় দেখিয়ে দেব সবাইকে। ক্লু যখন একটা পেয়ে গেছি—'

খাবারটাবার খেয়ে কোথায় যে পেরিয়ে গেল টিকলু সন্ধ্যার আগে তার আর কোনো পাত্তাই মিলল না। তার জন্যেই দুশ্চিন্তা বাড়ল সুরমার। আচ্ছা ছেলে হয়েছে যা হোক! এমন বাঁদরকে বেঁধে রাখবে কে।

কিন্তু সন্ধ্যার পরই জন দুই বন্ধুকে নিয়ে টিকলু ফের ঘরে এসে ঢুকল। মাকে বলল, 'সারা বরানগর ঘুরে এলাম মা। সব বোগাস। গোপাললাল ঠাকুর রোড ঠিকই আছে। কিন্তু যে নম্বর দিয়ে গেছে সেরকম কোনো নম্বর নেই। আর ওই নামের কোনো লোকও ধারে-কাছে কেউ থাকে না। কেউ তাকে চেনে না। যাক গে। হাতের লেখাটা তো আর লুকোতে পারবে না। আর ঘরের মধ্যে পায়ের ছাপটাপ নিশ্চয়ই পড়েছে। তারও মাপ নিয়ে রাখব।'

ছোটকু হেসে বলল, 'তুই যে একেবারে পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠলি টিকলু।'

সর্বশেষে এল হিরন্ময় সন্ধ্যা সাতটার পরে। মাড়োয়ারি ফার্মের অ্যাকাউন্টান্ট। আজ দরকারি কাজে আটকে পড়েছিল। বাসে গলদঘর্ম। আস্ত জামা-কাপড় নিয়ে কোনোরকমে এসে পৌঁছেছে।

টিকলুর যেন আর তর সয় না। বাবা আসবার সঙ্গে সঙ্গে সব কথা তাঁকে বলা চাই। শেষে মন্তব্য জুড়ে দিল, 'দিদি একটা আস্ত হাঁদা। হাঁদা নয়, হাঁদার স্ত্রীলিঙ্গে যেন কী—'

হিরন্ময় ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ! বড্ড ফাজিল হয়েছিস। ইঁচড়ে পেকে গেছিস একেবারে। যা, পড়তে বোস গিয়ে।'

আর কোনো কথা না বলে ডিটেকটিভ এবার সভয়ে অঙ্ক কষতে বসল।

এবার মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল হিরন্ময়, 'শুধু কি দুখানা কাগজ নিয়েই গেছে? টাকা-পয়সা আর কিছু নেয় নি তো?'

গোপা মুখ নিচু করে বলল, 'না।'

ওর ভঙ্গিটাই সন্দেহজনক।

'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বল গোপা। সত্যি কথা বল। সত্যি বললে আমি আর কিছু বলব না। কিন্তু মিথ্যে যদি একবার বেরিয়ে যায়—'

গোপা আর থাকতে পারল না। তীব্র জেদ আর আক্রোশের সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ দিয়েছি। পাঁচ টাকা দিয়েছি। আমার টাকা আমি দিয়েছি। তাতে আর লোকের কী? বলল যে গাড়িভাড়া লাগবে, সেখানে গিয়ে হোটেল-খরচ লাগবে—'

'আর তুই অমনি রানী রাসমণি হয়ে গেলি?' ঠাস করে মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিল হিরন্ময়। পাঁচ আঙুলের দাগ এক্ষুনি যেন জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠবে ওর গালে।

গোপা আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইল গোপা। কিছুক্ষণ আগে ঠাকুরমা সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন। তাঁকে রাগ করে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ছোটকুদা এসেছিল, মা এসেছিল। কাউকেই আমল দেয় নি। টিকলু তো ভয়ে ওর কাছেই ঘেঁষে নি আজ। গা ধোয়া হল না গোপার।

চুল বাঁধল না। আজ রাত্রে সে কিছু খাবেও না আর। যা খেয়েছে তাতেই তার পেট ভরে গেছে।

খানিক বাদে হাত-মুখ ধুয়ে, চা আর খাবারটাবার খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে হিরন্ময় নিজে এসে বসল মেয়ের কাছে। সারা পিঠে চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে। চুলে-ঢাকা মেয়ের সেই পিঠের ওপর হাত রাখল হিরন্ময়।

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে ডাকল, 'গোপা!'

গোপা নিরুত্তর রইল। তবে সন্ধিপ্রার্থী বাবার স্নেহস্পর্শে কোনো আপত্তি করল না।

'আমার ওপর রাগ করেছিস মা? কথা বল, অমন করিস না।'

গোপা বলল, 'তোমার ওপর রাগ করি নি।'

'তবে অমন করছিস কেন?'

'কী করছি? ঠকে গেলে কারো কি দুঃখ হয় না?'

হিরন্ময় বলল, 'থাকগে। তুই কোনো দুঃখ করিস নে। গেছে পাঁচ টাকা গেছে। সামনের মাসের মাইনে পেয়ে ও-টাকা তোকে আমি ফের দিয়ে দেব। শিক্ষা তো হল, অভিজ্ঞতা তো হল। দাম দিয়েই জীবনের অভিজ্ঞতা কিনতে হয়।'

গোপা চুপ করে রইল। তার মনের দুঃখ বাবাকে বোঝানো যাবে না, কাউকেই বোঝানো যাবে না। পাঁচ টাকা দিয়ে সে এই অভিজ্ঞতা কিনতে চায় নি। টিকলু যে-সব বইয়ের ভক্ত তেমন একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস কিনতে চায় নি, একখানি ক্রমশ প্রকাশ্য পরম মধুর আর পবিত্র একখানি রোমান্টিক উপন্যাস গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

প্রগতি ও কর্মসংস্থান

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষেও আমাদের দেশে বহু লোককে কাজের অভাবে অলস হয়ে বসে থাকতে হবে এবং আরো বহু লোককে তাদের কর্মক্ষমতার ও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এই সম্ভাবনার কথা শুনে আমাদের প্রথমেই মনে হয় 'তাহলে এতদিন ধরে কী হল?' প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমরা ভবিষ্যতের আশায় কত কষ্ট স্বীকার করলাম, এ সবই কি ব্যর্থ হবে? এই কয় বছরে কত কোটি কোটি টাকা খরচ, এত কলকারখানা, নদীনিয়ন্ত্রণ, আকণ্ঠ বিদেশী ঋণ, এত ট্যাক্স, মুদ্রাস্ফীতি, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, কত কী হল, এর পরও কিনা দেশের লোককে বিনা কাজে বসে থাকতে হবে? আমরা কষ্ট স্বীকার করছি এই ভেবে যে ভবিষ্যতে বেকার সমস্যা ঘুচবে, গরিব-বড়লোকের ভেদ আসবে কমে, তার কোনো সম্ভাবনার কথাই কি পরিকল্পনা-বিশারদরা বলছেন না? তাহলে কি পরিকল্পনার মধ্যেই কোনো গলদ আছে, না তার যথাযথ প্রয়োগে ত্রুটি হচ্ছে?

দীর্ঘকালের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে, শেষকালে নগদ-বিদায় হিসাবে খণ্ডিত ভারত পেয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি মাত্র ষোল বছর। আভ্যন্তরীণ সমস্যার অন্ত নেই, একদিকে খাদ্য-সংস্থানের তুলনায় অতি দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশীর হয়ে এক নিষ্ফল যুদ্ধে যোগদান করার অনিবার্য ফল হিসাবে অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি, তার উপর আছে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় প্রচুর ব্যয়সাধ্য সমরসম্ভার জোগানোর তাগাদা। স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত আমাদের দেশ ছিল বহুধা বিভক্ত; গরিব-বড়লোকের ভেদ, হিন্দু-মুসলমানে অসদ্ভাব, বর্ণহিন্দু, তপশীলভুক্তদের মধ্যে বৈষম্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শহুরে ও গ্রাম্য, বুদ্ধিজীবী ও কায়িক পরিশ্রমী সকলের মধ্যেই ছিল দুস্তর পার্থক্য। শহরের লোক গ্রামের দিকে তাকাতে শেখেনি, গ্রামের লোকদের আপনজন বলে ভাবতে শেখেনি; গ্রামের লোক এড়িয়ে চলেছে শহরের

বাবুদের। এই বিচ্ছিন্ন দেশের সকলকে একত্র করে, সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করার চেষ্টা শুরু করেই আমরা আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারব এ দুরাশা অতি বড় আশাবাদীও করবেন না। এই বিচিত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তত আংশিক সমাধান করলে তবে, আমরা যদি-বা দেশের কর্মহীনদের কাজের সংস্থানের কথা ভাবতে পারি; কিন্তু তাতেও কি সব সমস্যার কথা বলা হল? বিদেশ থেকে টাকা ধার না করলে আমাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ, বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে বিদেশীর হস্তগত; দেশের লোকের আয় এমন নয় যে তার থেকেই প্রয়োজনীয় মূলধন সঞ্চয় করা যায়। বিদেশী ঋণ ও সাহায্য পাচ্ছি যথেষ্ট, কিন্তু আমরাই তো একমাত্র দেশ নয়। আজ সারা পৃথিবীর যত অনুন্নত দেশ, সবাই মিলে চেষ্টা করছে উন্নত হবার, সকলেরই বিদেশী সাহায্য পাওয়া দরকার। আর যারা সব শক্তিশালী দেশ, তারাও আবার একদিকে যেমন সাহায্য করতে এগোচ্ছে, অপরদিকে তেমনি নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধে কি ভাবে গরিব দেশের কাছ থেকে আরো সস্তায় কাঁচামাল কেনা যায়, কত কম কাঁচামাল কিনে চলে তারই আয়োজন করছে; ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট তারই দৃষ্টান্ত। বিদেশে আমাদের রপ্তানি বাড়ানো দরকার, কিন্তু গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে রপ্তানি বাড়ছে না, আর যদিবা বাড়ছে, অনেক রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমদানির প্রয়োজন আমাদের অন্তহীন; বিদেশী ঋণ না পেলে সে টাকা শোধ করা চলে না। আবার দেশের মধ্যে যদি-বা কোনো কোনো জিনিসের উৎপাদন বাড়ছে, সে সব ভোগ করছে তারাই, যাদের হাতে গত কয়েক বছরে অনেক কাঁচা টাকা উদ্বৃত্ত এসেছে; ফলে জিনিসের দাম চলেছে বেড়ে।

এরই মধ্যে আমাদের একাধারে ভাবতে হচ্ছে বেকার সমস্যা ঘোচানোর কথা, উৎপাদন বৃদ্ধির কথা, বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা। যদি কম মূলধন নিয়োগ করে বেশি লোককে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়, দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ছে না, ফলে দেশের মধ্যে জিনিসের দাম বাড়ছে, রপ্তানী বাণিজ্যে ঘাটতি পড়ছে। আর যদি প্রথমে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দিতে হয় তাহলে বেশি মূলধন জোগাড় করে যন্ত্রের সাহায্যে যথাসম্ভব উৎপাদন বাড়াতে হয়, তার জোরে আবার যথেষ্ট লোকের কর্মসংস্থান হয় না। যত আধুনিক ভালো যন্ত্র ব্যবহার করা হবে তত কম লোকের কাজ হবে, উৎপাদন

ব্যয় কম হবে, ঘরের জিনিসের দাম কমবে, বাইরেও পাঠানো চলবে। এ এক উভয় সঙ্কট, ভিখারীর ছিন্নকন্থার মতো, একদিক ঢাকতে গেলে আরেক দিক অনাবৃত হয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এসেছেন দলে দলে আমাদের সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রের প্রয়োগ করে কিভাবে তাঁরা তাদের দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছেন, শিল্পোন্নতি ঘটিয়েছেন সে সব কথা ব্যাখ্যা করেছেন ; এঁদের অনেকের দেশেই যদিও একমাত্র যুদ্ধের সময় ছাড়া কখনো বেকার সমস্যা ঘোচে না, তবু তাঁদের কাছ থেকে আমাদের কিছু শেখবার, গ্রহণ করবার আছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা তো কোনো অংশে কম জটিল নয়। ইউরোপ আমেরিকায় যখন শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এল, তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা অনেক কম ; আমেরিকার মতো বিরাট জনশূন্য দেশে ইউরোপের উদ্বৃত্ত লোকেরা ছুটলো বসবাস করার জন্য, ইউরোপ দখল করল আফ্রিকা, এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি। ইউরোপের জনসংখ্যা বেড়েছে শিল্পবিপ্লবেরই প্রভাবে। আর আমাদের দেশে শিল্পোন্নতি শুরু হবার আগে থেকেই জনসংখ্যার চাপ, খাদ্যাভাব, বাড়তি জমির অভাব, মূলধন সঞ্চয়ের সমস্যা এই সবকিছু মিলে যে 'দুষ্টচক্র' সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান বিদেশীরাও ভেবে পান না। কোনো কোনো দেশ আছে যারা লড়াই বাঁধিয়ে লোকসংখ্যা লাঘব করে ; কোনো দেশ সাম্রাজ্য বিস্তার করে এই সমস্যা মেটায়। আজ আমাদের সব পথই বন্ধ। লড়াই করা আমাদের চিরন্তন নীতির বিরোধী, অন্যত্র লোক পাঠানোর কোনোই সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু যারা বিদেশে আছে তাদের অনেককেই দেশে ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। ম্যালথাস-এর বহু নিন্দিত মতবাদ আজ বর্জিত। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ চলেছে Freedom from Hunger আন্দোলন ; আর ধনী দরিদ্র সব দেশই চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল না থেকে ক্রমে স্বাবলম্বী হবার।

দেশে ও বিদেশে এত যে বিঘ্ন, বাধা বিপত্তি, এ সব সত্ত্বেও বিদেশী অর্থ সাহায্য পাবার ফলে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ট্যাক্স, ঋণ, deficit financing ইত্যাদি নানান পন্থা গ্রহণ করবার দরুন গত দশ-বারো বছরে আমাদের দেশে কর্মসংস্থান, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন, এ সবই বহুগুণ বেড়েছে। ১৯৬১র আদমসুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৫১র তুলনায় লোকসংখ্যা সেখানে বেড়েছে শতকরা ২১'৬৯ ভাগ, কর্মসংস্থান বেড়েছে ৩৩'৮১ ভাগ। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় হয়েছে ৬৫৬০ কোটি টাকা : কৃষি, শিল্প, সমাজ উন্নয়ন, যানবাহন প্রভৃতি বিভিন্ন

খাতে যত ব্যয় হয়েছে, আদমসুমারির হিসাবমতো বিভিন্ন কাজে শিল্প-কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে প্রায় ঐ অনুপাতে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যত মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে, তার অঙ্ক ১৯৪৯এ ছিল ১৭০৮৬ কোটি টাকা, ১৯৬০এ সেই অঙ্ক এসে দাঁড়িয়েছে ৩২১৬৪ কোটি টাকায়। আর জমির মূল্যসহ হিসাব করলে এই অঙ্ক যথাক্রমে ৩৪৯৪০ কোটি ও ৫২৪০৫ কোটি টাকা।

বহুমুখী সমস্যা এক সঙ্গেই আমাদের সমাধান করতে হবে এবং দেরি করলেও চলবে না। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি বহুকাল ধরে, এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক পরিবেশের মধ্যে যতটা অগ্রসর হতে পেরেছিলা আমাদের সেই পরিমাণই এগোতে হবে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে স্বল্পতর সময়ের ভিতর। অন্যান্য দেশে অনুসৃত নীতির তুলনায় আমাদের গৃহীত পন্থা হয়তো আপাতত ভাবে ধীরগতি ; কিন্তু এর মধ্যে অন্যান্য অনেক দেশ যা করেন সেরকম জোরজুলুম বা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার স্থান নেই। প্রাথমিক বাধা দূর করার জন্য যে সময় দিতে হবে সেই সময়টুকু পেরোতে পারলে আমাদের অগ্রগতি হবে দ্রুত, ভবিষ্যৎ বংশধররা ফলও পাবে যথাসময়ে। আজ এই প্রগতির মুখে সারা দেশ জুড়ে আলোচনা চলেছে কোন্ পন্থায় গেলে সুফল সহজে পাওয়া যাবে তাই নিয়ে। একদল বলেন সর্বপ্রথমেই সঞ্চিত আয় সমানভাবে বণ্টন এবং বেকার সমস্যার অবসান প্রয়োজন। আরেক দল বলেন সমবণ্টন বা বেকার সমস্যার প্রশ্ন আর কিছুকাল বাদে ভাবলেই চলবে, আপাতত কিভাবে দেশের কৃষি ও শিল্পের আমূল পরিবর্তন ও ধন উৎপাদন বাড়ানো যায় সেই কথাই ভাবা দরকার, এর ফলে হয়তো আরো কিছুকাল ধনবৈষম্য থাকবে, কর্মহীন লোকের সংখ্যাও কমবে না, কিন্তু কিছুকাল পরে যখন দেশের ধন উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে তখন আপনা থেকেই অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্ল্যানিং কমিশন এক মধ্যপন্থা গ্রহণ করে এগোচ্ছেন ; কোনো দিককেই একেবারে বাদ দিলে চলবে না। দশ বছরে প্রায় ৫ কোটি লোক নানা কাজে লিপ্ত হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেই সংখ্যা আরো বাড়বে। ধনবৈষম্য অনিবার্যভাবে কিছু থেকে গেলেও সরকার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে লোকের হাত থেকে উদ্বৃত্ত টাকা টেনে নিচ্ছেন। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ।

আমাদের দেশের বেকার সমস্যা মূলত হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের লোকেদের আংশিক ও বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সমস্যা এবং চাষের কাজে বহু বাড়তি লোকের ভিড়। বছরের কয়মাস চাষীদের খাটতে হবে অমানুষিক ভাবে, তখন বিশ্রাম চাইলেও উপায় নেই; তারপর বর্ষা যখন হয়ে গেল, শস্য ঘরে এল তখন এল গ্রামবাসীদের অখণ্ড দীর্ঘ অবসরের দিন। এই অবসর যতই অবাঞ্ছনীয় হোক, যতই ক্ষতিকর হোক, সেই সময় কারোরই কিছু করবার নেই। এককালে যখন কৃষি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, 'বাণিজ্যিক' কৃষির দিন যখন ছিল অজানা, তখন পল্লীবাসীরা এই অবসর মাসগুলি কুটির শিল্পের কাজে লাগতো। এখন সে দিন গেছে, নগদ টাকার বিনিময়ে শস্য যেমন যাচ্ছে 'বাজারে' তেমনি আসছে শহর থেকে তৈরি প্রয়োজনীয় ও বিলাসসামগ্রী। আজকে গ্রামাঞ্চলে গেলে দেখা যায় বড় চাষীদের অবস্থা ফিরেছে; পাকাবাড়ি, রেডিও, সাইকেল, হাতঘড়ি, সুগন্ধি তেল সবই পৌচেছে তার ঘরে। কিন্তু তারই পাশে দেখা যায় সেই পচা পুকুর, আঁকাবাঁকা সরু কর্দমাক্ত রাস্তা; যা কিছু বারোয়ারী তার প্রতি চরম ঔদাসীনতা, আর অবসর বিনোদনের জন্য মামলা মোকদ্দমা। আর যারা জমিহীন ব্যক্তি বা যাদের সামান্য মাত্র জমি তারা সেই অন্ধকারেই রয়ে গেছে। যে কয়মাস মাঠে খাটতে হবে খাটছে, বাকী কয়মাস কর্মহীনতার দুঃসহ বোঝা, আর তারই উপর, টাকার দরকার হলে মহাজনের কাছে গিয়ে দেড় গুণ পরিশোধ দেবার শর্তে ঋণ ধার নিতে হচ্ছে।

গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাবলম্বী গ্রামের কথা, বিনোবাজীও আজ সেই কথাই বলছেন, সরকারও সমবায় আন্দোলন, কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার, পঞ্চায়েৎ রাজ ইত্যাদির মারফত সেই চেষ্টায় লিপ্ত। গ্রামের লোকের মূল সমস্যা হচ্ছে কয় মাসের নিষ্ক্রিয়তা। সেই সমস্যা ঘোচাবার জন্য নানারকম চেষ্টাই চলেছে। এই সময়ে কর্ম সংস্থানের জন্য, একদল বলেন রাস্তাঘাট তৈরি, খাল পুকুর কাটানো ইত্যাদি কাজ যথাসম্ভব বেশি করে করা দরকার, আরেকদল বলেন ব্যয় বেশি হলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যা ঘরে বসে করা যায় তাই গ্রামাঞ্চলে তৈরীর ব্যবস্থা করা এবং কারখানায় সে সব উৎপাদন বন্ধ করা। অপর একদল বলেন এই সব ব্যয় হচ্ছে বেকারদের ভিক্ষা দেবারই নামান্তর, এতে দেশের ধন উৎপাদনও বৃদ্ধি হবে না, কর্মহীনতার স্থায়ী সমাধান হবে না। মানুষ চিরকালই স্বল্পতর পরিশ্রমে বেশি উৎপাদনের জন্য যন্ত্র তৈরি করেছে, আজ যদি আমরা এ-যুগে অচল কিছু হাতিয়ার দিয়ে

গ্রামের লোকদের কাজ করতে বলি তাহলে সেই ব্যবস্থা আপাতভাবে সফল হোক বা না হোক, আমরা প্রগতির মূলে আঘাত করব। এর জবাবে একদল বলেন গত একশো বছরে ইউরোপ আমেরিকা তো যান্ত্রিকতার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে, কিন্তু তাতেও কি তারা সকলের কর্মসংস্থান করতে পেরেছে? আমরা তাদের অনুকরণ কেন করি তাহলে? প্রগতিবাদীরা বলেন, তারা যে বেকার সমস্যা ঘোচাতে পারেনি তার জন্য দায়ী যন্ত্র বা বিজ্ঞান নয়, তার জন্য দায়ী সে সব দেশের সমাজপতিদের অর্থমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও লোভ। সেই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির যদি সংশোধন করা যায় তাহলে যন্ত্র ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারব।

আমাদের সরকার উভয় নীতির মধ্যে যা ভালো, তাই বেছে নিচ্ছেন। যে সব শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধিই প্রথম লক্ষ্য সে সব শিল্পে ব্যবহারের জন্য কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করছেন এবং যে সব কাজে কম যন্ত্র ব্যবহার করে বেশি পরিমাণে লোকবল নিয়োগ করলেও সমান ফল পাবার সম্ভাবনা সেই সব কাজে যথাসম্ভব আমাদের কর্মহীন লোকদের নিয়োগ করছেন। কত টাকা মূলধন নিয়োগ করলে কতজন লোকের কর্মসংস্থান হয় তাই নিয়ে বিশদভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী একই সঙ্গে বৃহৎ ও কুটির শিল্পের উন্নতির চেষ্টা চলেছে। . . . . . .

. . . .

কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মহীন লোকের সংখ্যা এতই বেশি আর তারই সঙ্গে, কৃষির কাজে আংশিকভাবে লিপ্ত লোকের পরিমাণও এত বেশি যে আগামী পনেরো কুড়ি বছরে যে পরিমাণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সে তুলনায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খুবই কম দেখা যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যাতে হ্রাস পায় তার জন্য সরকার প্রভূত চেষ্টা করছেন কিন্তু বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে সে সব চেষ্টা সত্ত্বেও আগামী কুড়ি ত্রিশ বছরের মধ্যে বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে না। . . . . . .

. . . অতএব যন্ত্রের ব্যবহার ও লোকবলের ব্যবহার সম্বন্ধে অবিলম্বে আরো বিশদভাবে গবেষণা করে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। . . যে শিল্পে যন্ত্র ব্যবহার বাড়ানো একান্ত-প্রয়োজন; এবং নিছক লোকবলের সাহায্যে সামান্য হাতিয়ার নিয়ে করা সম্ভব নয় সে সব ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে যন্ত্র আমদানি করেও আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে; আভ্যন্তরীণ

প্রয়োজন ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যেও সে সব পণ্যের ব্যবহার হবে। কাল-ভেদে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে, এবং এ সব সামগ্রীর অনেকগুলি হয়তো বড় কারখানায় ছাড়া তৈরি করা সম্ভব নয়। এ সব সামগ্রীর অনেকগুলিই পূর্বকালের হিসাব অনুযায়ী বাহুল্য বা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়লেও আজকের দিনে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিতে হয়। আর এই চাহিদা মেটাতেই নতুন নতুন শিল্প কারখানা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে অনেকটাই আপাতভাবে দ্রুততর ফল পাবার আশায় কম লোক লাগিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে কাজ সম্পন্ন করা হয় সে সব ক্ষেত্রে আরো বিচক্ষণভাবে যদি আমরা অগ্রসর না হই তাহলে আমাদের লোকসান দুই দিক দিয়ে হবে, যন্ত্র আমদানীর জন্য এবং পেট্রোলিয়ম-এর জন্যও বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে; অপর দিকে এই সব কাজ পূর্বে যারা করছিল তারা অনেকক্ষেত্রেই কর্মহীন হয়ে পড়বে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কর্মীর কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কার্যকরী হাতিয়ার প্রয়োজন এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয় সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই অবশ্যই, কিন্তু যে দেশে শিল্পোন্নয়নের আগে থেকেই জনসংখ্যার এত আধিক্য এবং বেকারের সংখ্যা বেশি সে দেশে যান্ত্রিকতার প্রচলন তখনই সার্থক যখন এর ফলে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, লোকের কর্মসংস্থানও হয়। কিন্তু উভয়ের সমন্বয় কঠিন কাজ এবং অন্যান্য কোনো দেশের সঙ্গেই তুলনা করে আমরা এমন নজির টানতে পারি না যে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে এবং যে দেশ এই উভয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বার করতে পেরেছে। আর যে দেশের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে সে দেশের কর্মপন্থা আমাদের পন্থার প্রায় বিপরীত।

প্রসঙ্গত আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। আমাদের যদি একদিকে যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা শ্রম লাঘব ও অপর দিকে পরিশ্রমের মাত্রা সমান রেখে বিজ্ঞানসম্মত বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ানো, এই দুইটির মধ্যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে হয় তাহলে আমরা অবশ্যই দ্বিতীয় পন্থা বাছব। যদি আমেরিকার মতো উভয়েরই সমন্বয় করতে পারতাম তাহলে অবশ্য কালক্রমে আমরা হয়তো নিজেদের খাদ্য সমস্যা মিটিয়েও রপ্তানির কথাও একদিন ভাবতে পারতাম। কিন্তু সেই সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমরা যন্ত্রের প্রয়োগের কথা ভাবছি না এই ভেবে যে এর ফলে

যে পরিমাণ লোকের কর্মচ্যুতি ঘটবে সেই পরিস্থিতি আমাদের কাম্য নয়। সেই জন্যেই আমাদের চিরন্তন লাঙল, গোরুকে মেনে নিয়েই আমরা ভালো বীজ, সার, জলসেচ, সমবায় কৃষি, ইত্যাদির মারফত জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করছি। একথা আমাদের মেনে নিতে হয়েছে যে গ্রামবাসীদের যত না চাষের সময়ে বিশ্রাম বা শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন হচ্ছে চাষের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাদের যে বাধ্যতামূলক বিশ্রাম বা আলস্য মেনে নিতে হচ্ছে, তাই ঘোচানো। চাষের কাজে শ্রম লাঘবের দ্বারাই অপর সময়ের বাধ্যতামূলক কর্মহীনতা আমরা ঘোচাতে পারব না। এ কথা ঠিক যে চাষের কাজের যে পরিশ্রম তা কিছু পরিমাণে লাঘব করতে পারলে কৃষকরা উপকৃত হত। আমেরিকার কৃষকরা ১৮৭০এ যেখানে সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা পরিশ্রম করত, আজ সেখানে করে মাত্র ৪৩ ঘণ্টা; অবসর ও বিশ্রামের মূল্য তারা বুঝতে শিখেছে যন্ত্র ব্যবহারে সময় সংক্ষেপ হবার ফলে। ১৮৫০এ আমেরিকার প্রতি কৃষক-পিছু যে শক্তি ব্যবহার হত তার পরিমাণ হচ্ছে ১.৮ অশ্বশক্তির সমতুল্য এবং এর সমষ্টিই ছিল প্রাণিশক্তি থেকে সংগৃহীত। ১৯৪০এ প্রতিটি আমেরিকান কৃষক ২৭.৮ অশ্বশক্তির সমতুল্য শক্তি ব্যবহার করত, তার মধ্যে ২৬.৩ অশ্বশক্তিই হচ্ছে পেট্রল-চালিত যন্ত্রের থেকে পাওয়া। এই শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা যদি আমাদের দেশে প্রয়োগ করা যেত তাহলে খুবই ভালো হত সন্দেহ নেই, কিন্তু আমেরিকা ও ভারতের জনসংখ্যার চাপ সম্পূর্ণই ভিন্ন; আমেরিকার উনবিংশ শতাব্দীতে যত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল তার বেশির ভাগেরই মূলে ছিল জনসংখ্যার স্বল্পতা। আমাদের চাষীদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে চাষের সময়ে শ্রম-লাঘব-ব্যবস্থা নয়, বাধ্যতামূলক কর্মহীনতা থেকে মুক্তি। যন্ত্রের সাহায্যে শ্রম লাঘবের চেষ্টার ফল দাঁড়াবে একাধারে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ও কৃষকদের মধ্যে আরো ব্যাপক কর্মহীনতা।

এখন এই যুক্তিতেই আমরা যদি বিভিন্ন শিল্পে লোক নিয়োগ বনাম যন্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নটি বিচার করি তাহলে দেখি বহু ক্ষেত্রেই আপাত দৃষ্টিতে যা সহজ ও লাভজনক সেই পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে: অনেক ক্ষেত্রে প্ল্যানিং কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বিচারে যন্ত্রের প্রচলন করে কর্মহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।—গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপকভাবে চালু হলেই গ্রামীণ কুটির শিল্প পুনরুদ্ধার হবে এই মতবাদে সম্পূর্ণ

আস্থাবান হলেও আমাদের একথা বিচার করে দেখতে হবে বিদ্যুৎ-চালিত কোন্ শিল্প নতুন পণ্য উৎপাদন করছে আর কোন্ শিল্প পূর্বের থেকে প্রচলিত কুটির শিল্পকে উচ্ছেদ করে, অনেকের রোজগার নষ্ট করে অল্প কয়জনের হাতে সেই অর্থ এনে দিচ্ছে। এ কথা ঠিক যে 'নতুন' ও 'পুরাতন' শিল্পের সীমারেখা নির্ধারণ করা কঠিন। এককালে যেমন জার্মানির আবিষ্কৃত রং আমাদের নীল চাষকে নিশ্চিহ্ন করে, আমেরিকার পেট্রলিয়াম ব্রিটেনে ব্যাপকভাবে কয়লাখনিতে ছাঁটাই-এর কারণ হয়, তেমনি আমাদের দেশেও বিদ্যুৎ-চালিত কাঠচেরাই কল গ্রামের পুরাতন সেই কাঠুরে বা কাঠচেরাই-এর কাজ নষ্ট করবে, প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ম আসার ফলে গ্রামাঞ্চলের কুমোর বা খেলনা প্রস্তুতকারীকে অন্নহীন করবে, কাঁসার বাসনও কালক্রমে কুটিরশিল্পের তালিকা থেকে নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু আমরা যখন দেখি যে সে সব শিল্পে নতুন জিনিস বানানোর পরিবর্তে কোনো জিনিসের শুধু শোধন বা Processing হচ্ছে সে সব শিল্পও যন্ত্রের আওতায় যাচ্ছে, তখনি মনে খটকা উপস্থিত হচ্ছে। ধান ভানা, গম পেষাই, চিঁড়ে কোটা, তেল পেষাই ইত্যাদি কাজে পঞ্চাশ বা ষাট বছর আগে যত লোক কাজ করত, আজ শস্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও সেই লোকসংখ্যা বহু কমে গেছে। বাংলা দেশে আদমসুমারি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ১৯৬১তে স্ত্রীলোক কর্মীর সংখ্যা কমে গেছে বহু পরিমাণে, অন্যান্য প্রদেশেও 'কুটির শিল্প' বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে এই সব কাজে লিপ্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কর্মলিপ্ত পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাসের গতি দেখে অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে যে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হবার ফলে প্রতি ঘরেই পুরুষের রোজগার অনেক বেড়েছে, ফলে স্ত্রীলোকেরা ঘরে বসেই থাকছে, রোজগার দরকার হচ্ছে না। এ কথাটি যদি সত্যি হয় তাহলে মাত্র মুষ্টিমেয় চাষীর ক্ষেত্রে সত্যি ; তারা অতি অল্প খরচে কম সময়ে তাদের ধান ভানিয়ে চাল করে নিচ্ছে, বেকার হয়েছে জমিবিহীন প্রতিবেশীর ঘরের লোকরা। এই গতি চলেছে অব্যাহতভাবে দেশের সর্বত্র। কুটিরশিল্প বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যে তদন্ত কমিটি সাত আট বছর আগে গঠিত হয়েছিল, তার সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে সুপ্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পগুলিকে যেন যন্ত্র আমদানির দ্বারা অকেজো করে দেওয়া না হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই এই নীতি অনুসৃত হয় নি এবং প্ল্যানিং কমিশনও এই বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কর্মসংস্থান বিষয়ে বাংলা দেশের যা অবস্থা সে কথা সুপরিচিত; শিল্পোন্নত প্রদেশে যে হারে কর্মরত লোকের মোট সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে তার থেকেই অন্যান্য প্রদেশেও এই সামঞ্জস্যহীন শিল্পোন্নতির অন্ধকার দিকটির আভাস পাওয়া যায়।

সরকারের পক্ষে যা অবিলম্বে করা দরকার তা হচ্ছে যান্ত্রিকতার প্রয়োজনীয়তা এবং স্বল্প হাতিয়ারে অধিক সংখ্যায় লোক নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির গুণাগুণ, প্রতি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিচার করে দীর্ঘমেয়াদী ভাবে সমস্যাটি সমাধানের জন্য চেষ্টা করা। যান্ত্রিকতার এক আপাত উজ্জ্বল দিক আছে যাতে আমরা অনেকেই পরবর্তী চিত্রটি দেখতে পাই না বা চাই না।

কাপড়ের কলগুলির অভিযোগ, যে অম্বর চরকা ইত্যাদির প্রচলনের ফলে বিদেশী বাজার দখল করাও গেল না, ঘরের চাহিদাও মেটানো গেল না। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক অনুসন্ধান করে দেখেছেন গত কয়েক বছর ধরেই কাপড়ের কলগুলি যত টাকা মূল্যের বিদেশী উপকরণ আমদানি করছে তার থেকে অনেক কম টাকার রপ্তানি করছে; আমরা যখন বৈদেশিক মুদ্রা রোজগারের হিসাব দেখি তখন শুধু রপ্তানির অঙ্কটিই দেখি। চরকা বা অম্বর চরকা ভালো কি মন্দ, সে কথার মধ্যে প্রবেশ না করেই একথা বলতে হয় যে আমাদের পক্ষে আখেরে যে পথ ভালো সেই পথই নিতে হবে। চরকা বা কুটির শিল্পে এযাবৎ যেরকম নজর দেওয়া হয়েছে তাতে এইসব কুটির শিল্পের সার্থকতা সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে এ কথা বলা চলে না। আর যদি ধরেই নেওয়া হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে সবকিছু উৎপাদন করাই বাঞ্ছনীয় তখন প্রশ্ন আসবে যত লোক কর্মহীন হয়ে থাকবে তারা কি করবে? আর, যাকে বলে কার্যকরী চাহিদা (Effective demand) সেই চাহিদাই বা দেশের কতজন লোকের হাতে থাকবে? বর্তমানে কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টায় যতটুকু করা হচ্ছে তা কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয় যতদিন না সরকার বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ও বাজারের সীমানা নির্ধারণ করছেন এবং কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য, এককালে যেমন দেশের কাপড়, চিনি ইত্যাদি শিল্পকে "Protection" দেওয়া হয়েছিল, তেমনি কুটির শিল্পকেও "Protection" দেন। এককালে দেশের বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য, অবাধ গতিতে বিদেশী পণ্য আনা বন্ধ হয়েছিল; সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল 'দেশীয়' স্বাবলম্বিতা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 'আপেক্ষিক

সুবিধা'র নীতি অনুসরণ করলে আজ আমাদের দেশে অনেক কারখানাই গড়ে উঠত না। ইউরোপেরও বহু দেশেই ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে স্বদেশী স্বাবলম্বনের জন্যই। কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলাকে যারা বলেন পেছনের দিকে চলা, তাঁরা 'স্বদেশী' কলের প্রচলনের সময়ে আরোপিত শুল্কনীতির কি বিরোধিতা করবেন ?

আজকের দিনে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়তো সম্ভব নয়, তাই গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ বা বিনোবাজীর প্রতি আনুগত্য দেখিয়েও আমরা তাঁদের কথা পালন করতে পারছি না। কিন্তু আমরা Community Development, গ্রামপঞ্চায়েৎ, সমবায় ইত্যাদি মারফৎ যখন গ্রামীণ জীবন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি তখন আমাদের মনস্থির করতে হয় গ্রামের লোকের আসল অভাব যেখানে, অর্থাৎ কৃষি ছাড়াও অন্য আয়ের পথ—সেখানে আমরা কতটুকু কি করছি। আগামী পনরো-কুড়ি বছরে যে পরিমাণ লোকসংখ্যা বাড়বে, এবং তার মধ্যে যতজনকে কাজ দিতে পারা যাবে এই হিসাবটি বিশ্লেষণ করে সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে।

সম্পাদকীয় নিবেদন

দেশের এক দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক দোষ ত্রুটি ঘটেছে—'পরিচয়'-এর সহৃদয় গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবৃন্দ নিজগুণে তা মার্জনা করবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে। বিজ্ঞাপিত কয়েকটি রচনা এ-সংখ্যায় পত্রস্থ করা গেল না বলে আমরা পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি 'পরিচয়'-এর আগামী কোনো সংখ্যায় এগুলি পত্রস্থ করা সম্ভব হবে।

বাংলা দেশের প্রখ্যাতনামা ও তরুণ লেখক ও শিল্পীরা 'পরিচয়'-এর আহ্বানে যেরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন তাতে আমরা নতুন প্রেরণা পেয়েছি। তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতাই আমাদের পাথেয়, মামুলি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা তার মর্যাদাহানি করব না। আশা করব 'পরিচয়' তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা থেকে কখনও বঞ্চিত হবে না।

'নাথ' প্রেসের কর্মীবৃন্দের কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। 'পরিচয়'কে নিজেদের কাগজ জ্ঞান করে তাঁরা আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন বলেই আমাদের শত অক্ষমতা সত্ত্বেও কাগজ যথাসময়ে প্রকাশিত হতে পেরেছে —একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করলে আমরা সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী হব।

পরিশেষে, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক, লেখক, এজেন্ট প্রভৃতি যাঁরা নানাভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের সকলের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

সকলের প্রতি জানাই আমাদের শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ।

পরিচয়

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৪
কার্তিক, ১৩৭০

সূচীপত্র

স্কেচ—নিখিল বিশ্বাস, বিজন চৌধুরী

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

[নিখিল বিশ্বাস

পরিচয়
বর্ষ ৩৩ ॥ সংখ্যা ৪

রণজিৎ দাশগুপ্ত

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের রূপরেখা

১৯৬৩ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর তিনটি ঘটনার জন্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও বিশেষত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে লোকসভায় প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে কৃপালনী-মাসানী-লোহিয়ার নায়কত্বে সমস্ত অ-কমিউনিস্ট বিরোধী দলের গাঁটছড়া বন্ধন এই তিনটি ঘটনার একটি। দ্বিতীয়টি হল কামরাজ পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির পুনর্গঠন। তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে মহা-আবেদনপত্রে এক কোটি স্বাক্ষর ও দুই লক্ষ মানুষের ঐতিহাসিক দিল্লী অভিযান।

এই তিনটি ঘটনাই একটি বিশেষ দিকে সুনিশ্চিতভাবে ইঙ্গিত করে—সেটি হল যে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশধারা আজ এক সন্ধিমুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই সন্ধিমুহূর্তে এদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ-বিকাশের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ও সম্যক মূল্যায়নের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান রচনায় এই প্রয়াসটিই করা হবে। তবে একটি রচনার পরিসরে এমন জটিল ও বিতর্কমূলক বিষয়ের আলোচনা কোনো কোনো দিক থেকে অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ বা কোনো কোনো সিদ্ধান্ত কিছুটা আপাতত ধরনের (tentative) হতে বাধ্য, একথা গোড়াতেই বলে রাখা উচিত।

এক

আজ একথা আর বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে এক পর্বান্তর। সেদিনের ক্ষমতা হস্তান্তর এক রাজশক্তির পরিবর্তে নেহাৎই আর এক রাজশক্তির আবির্ভাব নয়। ঐ পরিবর্তন সূচিত করেছে রাজনৈতিক বিপ্লব—সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন, ভারতীয় সামাজিক শক্তি ও আলোড়নের প্রবল আত্মপ্রতিষ্ঠা।

এই সাফল্য অবশ্য সহজে অর্জিত হয় নি। এর পিছনে ছিল এদেশের লক্ষ-কোটি মানুষের নানা মোহ, কাব্য, বীরত্ব, সৌন্দর্য, আত্মত্যাগ, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা সুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক তৎপরতা। এই বিশাল আলোড়নের নেতৃত্ব ছিল অবশ্য জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর। ফলে ১৯৪৭-এ যে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটল তাতে স্থান পেল এই বুর্জোয়া শ্রেণী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের বৈপ্লবিক প্রকৃতির দরুন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে এটি হয়েছে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন।

ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল মোচনের পর সমস্যা ছিল জটিল ও বহুবিধ। প্রথমত, যে পরিবর্তন ঘটল তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক, এবং সাম্রাজ্যবাদের ভেদ-বিভেদ নীতি ও জাতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতার দৌলতে এই স্বাধীনতাও অর্জিত হল দেশ-বিভাগ ও ভ্রাতৃহত্যার শোকাবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নানা বন্ধন, ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির চক্রব্যূহ এবং জনসাধারণের শোচনীয় জীবনমানের দরুন খণ্ডিত ভারতের এই স্বাধীনতারও বনিয়াদ ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও দুর্বল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ফেলে-যাওয়া আবর্জনাস্তূপই শুধু নয়, এর উপরে ছিল এমন কি প্রাক্-ব্রিটিশ ও প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা ও সম্পর্কের নানা অবশেষ—শত শত দেশীয় রাজ্য ও সেগুলির রাজা-রাজড়াদের সামাজিক প্রভাব, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতা কিংবা বর্ণ হিন্দুর উগ্র জাত্যাভিমান, নিম্নবর্ণের অনুন্নত অবস্থা, বহুসংখ্যক আদিম উপজাতির পশ্চাদ্‌পদতা অথবা অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য, নারীসমাজের মর্যাদাহীনতার অভিশাপ। এ সবই জাতীয় সংহতি ও প্রগতি এবং সেই হিসেবে জাতীয় স্বাধীনতারও পরিপন্থী।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করলেও তা ভারতীয় জনসাধারণের সুদীর্ঘ বিপ্লব-সাধনার শেষ কথা ছিল না। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষা ও প্রসার, এবং তারই উপায় হিসেবে-একদিকে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি রচনা, আর অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ জীবনে জাতীয় সংহতি, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি এবং অর্থনৈতিক উজ্জীবনের পরস্পর-সম্পর্কিত সমগ্রতাটি ঐ বিপ্লব-সাধনার, বা মার্কসীয় পরিভাষায়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির মর্মবস্তু। আর এ সবই ভারতীয় বিপ্লবাত্মক প্রয়াসের মূল অভীষ্ট হয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই গত ষোল বছরে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস বিচার করতে হবে ঐ অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রগতির মাপকাঠিতে।

দুই

ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও তার পরবর্তী বিকাশ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে সব বিষয় নজরে আসে তার মধ্যে অন্যতম হল দেশ-বিভাগ ও ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের অঞ্চলগত সঙ্কোচন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা অপরিসীম তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটনা যে, আসমুদ্র হিমাচল ভারত এবারেই সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হল একটি রাষ্ট্রে, একই কর্তৃপক্ষের প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের ভিত্তিতে। অতীতের যে কোনও সাম্রাজ্যের তুলনায়—তা সে মৌর্য, গুপ্ত বা মোগল যাই হোক না কেন—শুধু যে- ঐক্যই ব্যাপকতর তা নয়; অঞ্চলগত ব্যাপ্তিও অনেক বেশি। বাস্তবিকপক্ষে ব্রিটিশ আমলেও তো অখণ্ড ভারতবর্ষের দুই-পঞ্চমাংশ অঞ্চল জুড়ে দেশীয় রাজ্যগুলির উপরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল না।

ভারতীয় রাষ্ট্রের এই ঐক্য ও আঞ্চলিক সংহতি সাধন যে কত বড় কৃতিত্ব সেটা উপলব্ধি করা যায় যদি আমরা এদেশে জাতি-উপজাতি-ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য এবং বিশেষত অতীতের জের হিসেবে বিভেদাত্মক প্রবণতাগুলির কথা মনে রাখি। এই কৃতিত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরও পরিষ্কার হয় যদি একথাও স্মরণে রাখা হয় যে, প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের মহানুভবতা ও রাজনৈতিক বিজ্ঞতার ফলাও প্রচারের আড়ালে উঁকি মারছিল সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাটিকে ধ্বংস করে

দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশ-বিভাগ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ, কাশ্মীর আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জুড়ে আট কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত ছশোরও বেশি ছোট-বড় সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব, নিজাম, হরি সিং, জুনাগড়ের নবাব বা ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতির বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ইত্যাদিকে পুঁজি করে ভারতকে নয়া-উপনিবেশবাদের জালে জড়িয়ে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্ত।

কিন্তু দেশপ্রেমিক ভারতীয় জনসাধারণ, এমন কি শাসক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সে সময়ে তাঁদের সমস্ত দ্বিধা-দুর্বলতা, আপসমুখিনতা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। কাশ্মীরের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ডাল হ্রদের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম, অন্ধ্র কৃষকদের তেলেঙ্গানায় সামন্ত আধিপত্য ও রাজাকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান কিংবা ত্রিবাঙ্কুরে পুন্নাপ্রা-ভায়ালারের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগেই জানান দিয়েছিল যে, এই সামন্ত প্রভু ও তাদের রাজত্বের অবসানের দিন আসন্ন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরেও এই গণ-আন্দোলন থামল না। আর এই পরিস্থিতিতেই সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এক ব্যবস্থার জোরেই শত শত বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটল প্রায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে। সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে নিজামের প্রতিরোধ-প্রয়াস তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ল।

অবশ্য ভারত সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না এমন নয়। রাজন্যবর্গকে বিপুল পরিমাণ ভাতা দানের ব্যবস্থা রাখা হল; কাউকে রাজপ্রমুখ, কাউকে বা কোথাও রাষ্ট্রদূত বানিয়ে দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল পরগাছা শ্রেণীটির সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির চেষ্টাও গোড়ার দিকে করা হল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এই সংযুক্তিকরণের মূলগত তাৎপর্য এখানে যে, এর দ্বারা [ক] নবলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও [খ] রাজা-মহারাজা-নবাবদের রাজনৈতিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড ও সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ভেঙে দিয়ে এবং [গ] বিভেদাত্মক প্রবণতারও

অন্যতম ভিত্তিকে খর্ব করে [ঘ] এদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐক্য ও আঞ্চলিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করা হল। বলা বাহুল্য, এ সবই [ঙ] দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা ও নিরপেক্ষ করার পক্ষে পরম সহায়ক।

তিন

স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলিতেই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার ছিল হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। দেশীয় রাজা-রাজড়াদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ও শহুরে মধ্যবিত্তের বিপথে-চালিত অংশবিশেষের সাহায্যে হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের মতো প্রতিষ্ঠান নেতৃত্ব দিচ্ছিল অরাজকতা সৃষ্টিতে, দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততাকে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু এ সবের পিছনে সাম্রাজ্যবাদের যে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল তার স্বরূপটিকে বুঝতে সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাদের বুঝতে যে দেরী হয় নি তা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনী পাঠ করলেই বোঝা যায়। সে সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অভিযানের পিছনে প্রধানত এই উপলব্ধিই কাজ করছিল যে দেশময় এই অরাজকতা জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতার পক্ষে চরম বিপজ্জনক। এই উপলব্ধির থেকেই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বিকট আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত করলেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ঐক্য ও অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিও সেদিন পেছিয়ে ছিল না। আর মহাত্মা গান্ধী হয়ে দাঁড়ালেন সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি, জাতীয় চেতনা ও জাতীয় সংহতির প্রতীক। সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া বনাম জাতীয় সংহতির এই সংগ্রামের পরিণতিতে অনেক জায়গাতেই দাঙ্গার আগুন নিবতে শুরু করল, শুভবুদ্ধি ছড়িয়ে পড়তে লাগল দুই রাষ্ট্রেই, গান্ধীজীর অনশনে পাকিস্তানি নেতারাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আর জাতীয় চেতনার এই বলিষ্ঠ প্রকাশের সামনে মরিয়া, নৈরাশ্যে বিক্ষুব্ধ প্রতি-বিপ্লবী চক্রীদের আক্রমণের বলি হলেন গান্ধীজী। কিন্তু গান্ধীজীর প্রাণের বিনিময়ে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষা পেল। এর পরে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পিছু হঠতে হল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী করা হল, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিসন্ধি চিরকালের মতো

বিপর্যস্ত হয়ে গেল, আর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের মতলব বানচাল হয়ে গেল।

অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা তথা জাতীয় সংহতির সমস্যার পুরোপুরি নিরসন ঘটল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজও যে পুরো ঝেড়ে ফেলা যায় নি তার প্রমাণ সম্প্রতিকালে উত্তর ভারতে জনসঙ্ঘ, আর, এস. এস. জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি, মুসলিম লীগের নতুন তৎপরতা কিংবা জব্বলপুর, আলিগড় ইত্যাদির দাঙ্গা। আর এ সবের জন্য সরকার ও শাসক পার্টির দায়িত্ব যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতির সমস্যাকে কী ভাবে জটিল করে তোলা হয় তার সবচেয়ে ভালো নমুনা ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন প্রসঙ্গে সরকারি মনোভাব। এককালে এই ধরনের পুনর্গঠনে কংগ্রেস প্রতিশ্রুত ছিল—অথচ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর সর্বভারতীয় মারোয়াড়ি, গুজরাটি, তামিল, পার্শী বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে প্রতিশ্রুতি পূরণে অস্বীকৃতি জানানো হল। অন্ধ্র, কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদিতে ঐ সব রাজ্যের মাঝারি বুর্জোয়া সমেত সমস্ত জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরই একমাত্র একভাষী রাজ্য গঠনের দাবীটি মূলত স্বীকৃত হল। আরও বহুক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও জট আজও পুরো কাটে নি। কিন্তু এসব নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা পাওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করে জাতীয় ঐক্যকে সংহত করার তাৎপর্যকে কোনোভাবেই অতিরঞ্জিত করা সম্ভবপর নয়।

চার

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের আশু চক্রান্তের এই সব প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গেই গণপরিষদ যে সংবিধান তৈরি করল তাতে, একদিকে, 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস'-এর অবসান ঘটিয়ে ভারতকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনতাকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করা হল, আর অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলের পুলিসি রাজের পরিবর্তে একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো রচনা করা হল। অবশ্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রসুলভ নানা সীমাবদ্ধতা, গণতন্ত্র-বিরোধী বহু দিক থেকেই গেল। নতুন সংবিধানের আওতাতেও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, বিনা বিচার রাজনৈতিক কারণে আটকব্যবস্থা

কিংবা শ্রমিক-কৃষকের ন্যায্য সংগ্রামের বিরুদ্ধে নির্মম দমননীতিও অব্যাহত রইল। আর বর্তমান সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এইসব নানা সীমাবদ্ধতাকে সঙ্কীর্ণ শ্রেণী ও দলগত প্রয়োজনে জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কেমন করে ব্যবহার করা হয় তার সবচেয়ে বড় নমুনা কেরালায় কমিউনিস্ট সরকার উচ্ছেদের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের ন্যূনতম রীতি-নীতিরও হত্যা। গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুতি যে কতদূর যেতে পারে তার আর একটি নমুনা সংবিধানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে ব্রিটিশ আমলের অনুকরণে ভারত রক্ষা আইনে আটক-ব্যবস্থা।

কিন্তু আবার সাধারণভাবে 'হেবিয়াস কর্পাস' সমেত অনেকগুলি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তাদান, প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, 'ন্যায় বিচার, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র ধারণা-সম্বলিত 'নির্দেশমূলক নীতি' প্রণয়ন ইত্যাদি এই সংবিধানেরই সদর্থক বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো মহল অবশ্য এই সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ফ্যাসিস্ত বলে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু একটু খোলা মনে বিচার করলেই ধরা পড়বে যে, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতে যে-পরিমাণ গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত তা এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সবিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন হল, এই সংবিধান এবং শাসন ও সামরিক ব্যবস্থায় ভারতে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামো রচনায় সমর্থ হয়েছে যার জোরে দেখা যাচ্ছে যে, যখন এশিয়া-আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলির অধিকাংশতেই পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র ভেঙে পড়ছে, প্রাসাদ বিপ্লবের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিংবা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অভ্যুত্থান মাথা-চাড়া দিচ্ছে, সে-সময়ে যে দু-চারটি দেশ এই বিপজ্জনক ধারার থেকে আজও মুক্ত তার একটি ভারত। এই ব্যাপারের গুরুত্ব আরও উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, এই বিপজ্জনক ধারার পিছনে ওয়াশিংটন, লণ্ডন বা প্যারিসের লোভের থাবা সক্রিয় ও উদ্যত। ভারতকে অবশ্য এখনও এই থাবার আওতায় আনা যায় নি। কিন্তু ফ্রান্সের মতো দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে দ্য গলের ব্যক্তিগত শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের দেশে ১৯৫৯-এ থিমাইয়ার মতো ঘটনা অথবা চীনা-আক্রমণ পরবর্তী

রাজনৈতিক পটভূমিতে নিশ্চিন্ততার কোনো কারণ নেই। তবে আজও যে এদেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে পড়ে নি সেটা প্রমাণ করে, ভারতীয় গণতান্ত্রিক মহীরুহের শিকড় বহুদূর বিস্তৃত ও গভীরভাবে প্রোথিত। আর এই মহীরুহ তার প্রাণশক্তি সংগ্রহ করছে জাতীয় আন্দোলনের প্রবল গণতান্ত্রিক, উদারনৈতিক ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির সবলতা ও সক্রিয়তার থেকে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই ঐতিহ্যের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক গণতন্ত্রের উপাদানও বর্তমান। জাতীয় আন্দোলনের এই গণতান্ত্রিক মানস-গঠন, বিশেষত হরিজন ও সমাজে নিপীড়িত-অপমানিতদের জন্য গান্ধীজীর গভীর সহানুভূতি ও নিরন্তর তৎপরতা, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি গত কয়েক বছরে সামাজিক প্রগতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথকে প্রশস্ত করেছে। এই পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে রাজা-মহারাজা-নবাব, জমিদার-জায়গীরদার-তালুকদারদের দেশের সামাজিক জীবনে আধিপত্য অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের মেরুদণ্ডটি ভেঙে যাওয়ার দরুণ।

আজও আমাদের সামাজিক জীবনে নঙর্থক দিক অনেক রয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু এটাও একটা বৃহৎ সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ব্যাপকভাবেই চারিয়ে গেছে। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ-প্রথার অবিচার দ্রুত দূর হচ্ছে; যে-সব অংশ ও বর্ণ এতদিন ছিল সামাজিক স্তরানুক্রমের একেবারে শেষ তলায় তারাও উপরে উঠে আসছে; অসবর্ণ বিবাহ সামাজিক প্রথা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মেয়েদের আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে তো রীতিমত বিপ্লব ঘটে গেছে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে বিবাহকে একটি চুক্তির মর্যাদাদান, বহুবিবাহ প্রথার বে-আইনিকরণ, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ইত্যাদি সবই তার নমুনা। অবশ্য অতীতের বেশ কিছু অবশেষ এখনও বর্তমান, অনেক অধিকারের মূলও শুধুমাত্র আইনগত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা অনস্বীকার্য সত্য যে, সামন্ত ঐতিহ্যাশ্রয়ী সনাতন ভারত-এর শাশ্বত আদর্শ, সামাজিক চিন্তা-চেতনা ও রীতি-নীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটছে, এবং এ সবই সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাবগত সংহতি তথা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাঁচ

আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরবর্তী সমস্যার প্রকৃতি ছিল মূলত আত্মরক্ষামূলক অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী, প্রতি বিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও বিভেদাত্মক অরাজকতা প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রাথমিক বিপদের সফল অতিক্রমণ এবং সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার পর সবথেকে জরুরী হয়ে দেখা দিল রাজনৈতিক বিপ্লবের সংহতি সাধনের জটিল প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নের সমাধানে প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতি এবং উপনিবেশিকতা ও সামন্ততন্ত্রের শিকড় উপড়ে ফেলে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি রচনা ও অনুসরণের বিষয় দুটিই ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

অবশ্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয়—এ দুয়ের কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রগতির পথ সহজ ছিল না। এ ব্যাপারে বাধা-বিপত্তি শুধু বাইরে সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটি ও বৈরিতার মধ্যে ছিল তা নয়। সে-বাধার বীজ দেশের ভিতরেও ছিল। একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই নজরে পড়বে যে, ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রূপান্তর (বলা নিষ্প্রয়োজন, বুর্জোয়া কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রে এ রূপান্তরের প্রকৃতি মূলত ধনতান্ত্রিক) ঘটছে অনেকগুলি অন্তর্বিরোধের পটভূমিতে। এ সবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল :

এক। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তার দৃশ্য-অদৃশ্য নানা গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ পরগাছা সামন্ততন্ত্র ও মুৎসুদ্দি ফড়িয়াদের জোটের বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়া-সমেত সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অবশেষে সমাকীর্ণ ঔপনিবেশিক দায়ভাগের সঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই বিরোধটিই ভারতে সমাজ-বিকাশের সমসাময়িক ধারাটিকে বুঝবার চাবিকাঠি।

দুই। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যদিকে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা দ্বিবিধ; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে দ্বিধা ও আপস-মুখিনতা এবং গণ-আলোড়ন সম্পর্কে প্রবল ভীতি ও জন-বিরোধী নীতির অনুসরণ সুস্পষ্ট।

তিন। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী একটিমাত্র homogenous বা সমগোত্রীয় শ্রেণী নয়। এদের মধ্যে টাটা, বিড়লা, ওয়ালচাঁদদের মতো সর্বভারতীয় একচেটিয়াপতি রয়েছে, আবার রয়েছে প্রধানত নিজ নিজ রাজ্যের গণ্ডীর

মধ্যে সক্রিয় মাঝারি ও ছোট বুর্জোয়ারা ; কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদী ধনকুবের-সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, অনেকেই এ-জাতীয় কোনো সম্পর্কের থেকে কমবেশি মুক্ত। স্বভাবতই এদের মধ্যে আশু স্বার্থের পার্থক্য ও সংঘাত খুবই তীব্র। উপরন্তু, একচেটিয়া ধনকুবেরদের বিরোধ সমগ্র জাতির সঙ্গে, এবং এ বিরোধ বর্ধমান।

চার। ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের জন-বিরোধী গণতন্ত্র-বিরোধী দিকের দৌলতে জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমজীবী জনসাধারণের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী, মাঝারি কৃষক-সমেত কৃষকসমাজ ও শহুরে মধ্যবিত্তের বিরোধ ও সংঘর্ষ অত্যন্ত প্রবলভাবেই প্রকট।

স্বাধীন ভারতের যাত্রাপথ এই সবকটি বিরোধের অস্তিত্ব এবং এগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নানা টানাপোড়েনের জটিল প্রক্রিয়ার সর্বাত্মক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সব বিরোধ অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির মধ্যে তীক্ষ্ণ সংগ্রামের বিস্তৃত পটেই সরকারী নীতির বিবর্তন ঘটছে, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার প্রথম তিন-চার বছরেই এই সামাজিক সংগ্রামের প্রবল প্রকাশ ঘটে একদিকে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ, সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ, কাশ্মীর সমস্যার মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে, আর অন্যদিকে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে ও পরে কংগ্রেস সরকারের জন-বিরোধী ও আপসমুখীন নীতির বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত তরঙ্গে। আর এই শ্রেণী সংগ্রামেরই রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছে নানা রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রখর বিরোধিতায়—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সঙ্গে একদিকে হিন্দু মহাসভা, আর এস. এস. জনসঙ্ঘ, রামরাজ্য পরিষদ ইত্যাদির মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তির মধ্যে সংঘাতে।

আর এখানেই বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য অ-কংগ্রেসী দলের বিরোধেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে নি ; এটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্বের ভিতরেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটা খুবই তাৎপর্যসম্পন্ন যে, যদিও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নায়ক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ১৯৪৭-এর আগে এটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ; আর আজও, কংগ্রেসের থেকে বামপন্থীদের

একটা বৃহৎ অংশের বিদায়গ্রহণ এবং ভাগ্যান্বেষী, দেশের স্বার্থ-বিরোধী অনেকের যোগদানের পরও, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিপরীত শক্তি এই প্রতিষ্ঠানে সমাবেশিত; ফলে জাতীয় চরিত্রটিও অংশত বর্তমান। তদুপরি ১৯৬০-এ স্বতন্ত্র পার্টির আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসই ছিল ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা পাওয়ার আগে তো বটেই, এমন কি পরেও নেতৃত্বের ভিতরে বারে বারেই নীতিগত ও সংগঠনগত বিরোধ দানা পাকিয়েছে।

অনেক সময়েই এই বিরোধ নেহাৎই ক্ষমতার জন্য নীতিবিবর্জিত দ্বন্দ্ব। তবে তা ভিন্ন আরও এক রকমের দ্বন্দ্ব—নীতিগত সংঘাত, বাম ও দক্ষিণ, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষ কংগ্রেসের ভিতরে মাঝে মাঝেই আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এই ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশ-ধারার উপর। স্বাধীন ভারতে গোড়ার দিকে নানা কারণ মিলিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে বাম ও দক্ষিণের এই বিরোধ খুব প্রকট ছিল না। তবে কিছুটা প্রাথমিক স্তরের হলেও বিরোধ যে ছিল এবং সর্দার প্যাটেলই যে রক্ষণশীল ও দক্ষিণপন্থীদের নেতা ছিলেন তার বেশ কিছু সাক্ষ্য রয়েছে মৌলানা আজাদের 'আত্ম-জীবনী'-তে। আর প্রথম দিকের অস্ফুট দ্বন্দ্ব স্পষ্টতা ও তীব্রতা পেল প্যাটেলের মৃত্যুর পর দক্ষিণপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস সভাপতির পদে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের নির্বাচন, ট্যাণ্ডনের সঙ্গে নেহরু ও তাঁর সমর্থকদের প্রচ্ছন্ন বিরোধ, ১৯৫১তে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে নেহরু ও আজাদের একযোগে পদত্যাগ, একই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে রফি আহমেদ কিদোয়াই-এর পদত্যাগ, শেষ পর্যন্ত ট্যাণ্ডনের পদত্যাগ ও নেহরুর পক্ষ থেকে কংগ্রেস সংগঠনের প্রায় সর্বময় দায়িত্বগ্রহণ, মন্ত্রিসভায় কিদোয়াই-এর পুনরায় যোগদান ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে। আরও লক্ষণীয় যে, এই সব সাংগঠনিক রদ-বদল ও নেহরু নেতৃত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পটভূমিতেই সরকারের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি বাঁক ফিরতে শুরু করে বামের দিকে।

এ-প্রসঙ্গেই বলা উচিত যে, সে সময়েই হোক, আর তারপরেই হোক, শাসক পার্টির ভিতরে যে কোনো নীতিগত সংগ্রামে একজন দূরদর্শী বুর্জোয়া নেতা হিসেবে জওহরলালের ব্যক্তিগত ভূমিকা অসামান্য। কিন্তু

তাঁর এই ভূমিকা যে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে এবং অতীতে কিংবা বর্তমানে কংগ্রেসের ভিতরে নানা দ্বন্দ্ব সুদূরপ্রসারী নীতিগত সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছে তার পিছনে রয়েছে, প্রথমত, সত্তর-আশি বছরের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ঐতিহ্য এবং দ্বিতীয়ত, এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কৃষকসমেত বিভিন্ন বিরোধী সামাজিক শক্তি ও স্বার্থের সন্নিবেশ।

কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির উপরোক্ত সংঘাতসমূহই বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নীতি রচনা ও কার্যকরী অনুসরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেটা সম্ভবপর হয়ে উঠল মূলত বিশ্বের শক্তিবিন্যাসে মৌলিক পরিবর্তনের ফলে, বিশ্ব ইতিহাসের নিয়ন্তা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবে।

ছয়

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির বিষয়টি যদি আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক পরের বছরগুলিতে এই নীতি পুরোপুরিভাবে সাম্রাজ্যবাদী গণ্ডীর মধ্যে আটকা না থাকলেও মোটের উপরে সেটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা, নানা ত্রুটি, দুর্বলতা ও অসঙ্গতিতে ভরা। স্বাধীন ভারত 'মুক্ত দুনিয়া'র যে বিশ্বস্ত মিত্র, আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে এটা প্রমাণ করাই ছিল অনেক সময়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রয়াস। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রস্তুতির ষড়যন্ত্র কিংবা পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল নীতির ফাঁসে ভারতকে সে সময়েও জড়ানো যায় নি। আর পরবর্তীকালে আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলনে ভারতের গৌরবময় ভূমিকার পূর্বাভাস মেলে ১৯৪৬ সালেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনে। তথাপি, সে আমলের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক সীমাবদ্ধতা অবশ্য স্বীকার্য।

এই সীমাবদ্ধতা ও সরকারের অনেক কাজ—যেমন, মালয়ে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালানোর জন্য বৃটিশ সরকারকে এদেশের বুকের উপর বসে গোর্খা সৈন্য রিক্রুটের কিংবা ভিয়েৎনামে ফরাসী ফৌজ পাঠানোর জন্য এদেশের বিমানঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ দান অথবা কোরিয়ার জাতিসঙ্ঘের বেনামে মার্কিন আক্রমণের প্রতি প্রথম দিকে সমর্থন জ্ঞাপন ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনাকে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করেছে। ফলে কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়েছেন সাধারণ মানুষের এই মনোভাবকে হিসেবের মধ্যে

নিতে। এই সঙ্গে শাসকশ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানও উপলব্ধি করেছে যে, এশিয়া-আফ্রিকার অন্যত্র ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অস্তিত্ব ভারতের স্বাধীনতার পক্ষেও বিপজ্জনক এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী জোটের ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতি ও যুদ্ধোন্মাদ কার্যকলাপ ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশা-আকাঙ্ক্ষারও চরম পরিপন্থী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যত মুনাফাদারিই ঘটে থাকুক না কেন, পারমাণবিক যুদ্ধের প্রলয়ে সব সাধই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, এটা বুঝতে এদেশের দূরদর্শী বুর্জোয়া নেতাদের খুব বেশি দেরি হয় নি।

এই সব উপলব্ধি ও ইতিপূর্বে উল্লিখিত কারণসমূহের প্রভাবে স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে ঘোষিত 'নিরপেক্ষতা' প্রথমে 'সক্রিয় নিরপেক্ষতা' ও তারপর 'জোট-নিরপেক্ষতা'র নীতিতে পরিণতি পেল। বলা যেতে পারে, কোরিয় যুদ্ধপ্রসঙ্গে নেহরু-স্তালিন বার্তা বিনিময় দিয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তনের সূচনা, এবং তারপর ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বন্ধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, চৌ এন লাই-এর ভারত আগমন ও পঞ্চশীল চুক্তি, ক্রুশ্চভ-বুলগানিনের ভারত সফর, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা, 'সেন্টো-সিয়াটো'র খোঁয়াড়ে ভিড়তে অস্বীকৃতি, বান্দুং সম্মেলন, এমন কি হাঙ্গেরির প্রতি-বিপ্লবকে সমর্থন জানাতে সরাসরি অসম্মতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পররাষ্ট্র-নীতি স্পষ্ট ও অর্থবহ হয়ে উঠল। প্রাক-স্বাধীনতা পরে কংগ্রেসী বৈদেশিক নীতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তাকে বহন করে যে নতুন পররাষ্ট্র নীতি বিবর্তিত হল তার মর্মবস্তু: যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সংহতি জ্ঞাপন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সর্বতোমুখী ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই ভূমিকাই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এশিয়া-আফ্রিকা তথা বিশ্বের ইতিহাসের ধারার উপরে।

সাত

সরকারী নীতিতে প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের ধারা কিন্তু শুধু বৈদেশিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রইল না; এই ধারার সংক্রমণ ঘটল অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রেও। গোড়ার বছরগুলিতে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ছিল অত্যন্ত

ভীরু ও দুর্বল। সে সময়ে ধনিক শ্রেণীর, বিশেষত ধনিক চূড়ামণিদের বাসনাটা ছিল একদিকে নবলব্ধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস রফা করে, আর অন্যদিকে দেশের ভিতরে দাম, জোগান, বাজার, নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে গোটা অর্থনীতিটাকেই বিপর্যস্ত করে দিয়ে একেবারে লুটেপুটে খাওয়া। সরকারী নীতিটা ছিল এই বিকৃত বাসনার কার্যত সহায়ক।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি আর সাম্রাজ্যবাদী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল আভ্যন্তরীণ নীতি—এ দুয়েরই বেশিদিন ধরে একসঙ্গে চলাটা সম্ভবপর ছিল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অবশ্য উপরোক্ত দুর্বল নীতিই প্রতিফলিত হয়েছিল। বহিরঙ্গ ও ঘোষণার দিক দিয়ে অনেক প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্কীর্ণ ও পশ্চাদ্‌পদ কাঠামো থেকে বেরনোর কোনো পথের সন্ধান এ পরিকল্পনায় পাওয়া যায় নি।

কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫১ সালে গৃহীত কর্মসূচীতে অবশ্য এ পরিকল্পনাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনার অঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি ছিল উল্টো রকমের। সে-সময়কার সরকারী নীতির মৌলিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এটা সরকারী নেতাদের কৃতিত্ব যে, যুদ্ধ-অর্থনীতি ও তার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে ভারতকে গাঁটছড়ায় বেঁধে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী ফন্দীটিকে তাঁরা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। বরং চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্থান মেশিন টুল কারখানা, বড় বড় জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রাদিতে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে প্রথম দ্বিধান্বিত পদক্ষেপের মৃদু আভাস পাওয়া যায়। আর ঐ একই সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে পুরনো ধরনের জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব অবসানের জন্য আইন রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পদক্ষেপ দ্রুত ও দৃঢ় হয়ে উঠতে শুরু করল প্রথম যোজনার শেষ দিক থেকে। ঔপনিবেশিক দায়ভাগের সঙ্গে দেশগঠনের জন্য জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলগত বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিদেশী ধনিকতন্ত্রের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশাভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতা, সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থী মনোভাব ও গণ-আন্দোলনের দ্রুত প্রসার—এই সবের ধাক্কাতেই অর্থনৈতিক নীতিতে প্রগতি অভিমুখী পরিবর্তন এল।

১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্য ঘোষিত হল। এই একই সময়ে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও কোলার স্বর্ণ খনির জাতীয়করণ, দেশী-বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানিগুলিকে সরকারি সম্পত্তিতে রূপান্তর, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নতুন কোম্পানি আইন, এই সব রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মালিক বা প্রাক্তন জমিদার, জায়গীরদারদের পক্ষ থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ হাঁরের বিরুদ্ধে আদালতের দারস্থ হওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনাদি এই প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের সাক্ষ্য। আর এ সব ব্যবস্থা শুধু বিদেশী ধনকুবেরদের মনে নয়, এদেশের ধনিক শিরোমণিদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই পরিচয় বিড়লার ইস্টার্ণ ইকনমিস্ট পত্রিকার মন্তব্য: "Events in last three months have left one in little doubt as to the determination of the Government of India to proceed on a reckless course."

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটি, অসন্তোষ ও এমন কি সরাসরি বিরোধিতা ও হস্তক্ষেপ (বিশ্ব ব্যাঙ্কের তদানীন্তন সভাপতি ইউজিন ব্ল্যাকের ভারতীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে লিখিত উদ্ধৃত চিঠিটি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য) এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বৃহৎ পুঁজিপতিদের ওজর-আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত রইল। দ্রুত শিল্পায়ন, ভারী ও বুনিয়াদি শিল্পের বিকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার, কৃষিতে সমস্ত রকম মধ্যস্বত্বের অবসান, জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা দান, সমবায়মূলক তৎপরতার প্রসারাদির কর্মসূচী সম্বলিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত ও চালু হল। স্থিতস্বার্থের চাপে কিছুটা দক্ষিণপন্থী সংশোধন সত্ত্বেও স্বাধীনতার অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত ও প্রসারিত করার এই কর্মসূচীটি তৃতীয় পরিকল্পনারও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বাম ও প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের এই যে স্রোত তার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি একপক্ষে ১৯৫৯-এ কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, কৃষি-সংস্কারের ধরন, প্রকৃত চাষীর মালিকানা ও সমবায়মূলক সহযোগিতানির্ভর গ্রামীণ সমাজ গঠন এবং খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য প্রবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ, আর অন্যপক্ষে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাব ও বিশেষত দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের

পর কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা। কোনো অতিরঞ্জন না করেই বলা যায়, এই শেষোক্ত বিকাশ শুধু কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের নয়, আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনেরই স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো ছিল—কিন্তু এই সর্বপ্রথম কোনো সরকার প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হল।

কিন্তু আন্তর্রাষ্ট্রীয় ও আভ্যন্তরীণ—এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল গতিধারা এদেশের একচেটিয়া ধনকুবের ও অন্যান্য সমস্ত স্থিতস্বার্থকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং বামপন্থীর অগ্রগতি জাতীয় বুর্জোয়াকেও অতিরিক্ত রকমের দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলল। কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারের অ-গণতান্ত্রিক উচ্ছেদ এর একটি প্রকাশ। আর জওহরলালের নেতৃত্বে ভারত সরকারের কার্যাবলীতে দেশী-বিদেশী স্থিতস্বার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সংগঠিত অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র পার্টির গঠন। এরপর থেকেই কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষ থেকে একটানা চেষ্টা চলল স্বাধীনতা-উত্তর কালের অগ্রগতির চাকাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। আর এই প্রতি-বিপ্লবী প্রয়াসেরই উৎকট প্রকাশ দেখা গেছে চীনের ভারত-আক্রমণ পরবর্তী কয়েক মাসে রাজাজী-কৃপালনী-বাজপেয়ী-কারিয়াপ্পা-পাতিল-মোরারজীর অশুভ মিতালী ও কার্যকলাপে।

আট

উপরের আলোচনা থেকে অবশ্য গত পনেরো-ষোল বছরে ভারতের অগ্রগতিকে ধনতান্ত্রিক ভিন্ন অন্য কিছু মনে করলে গুরুতর ভুল হবে। তথাপি বর্তমান আলোচনায় যেটা তাৎপর্যের সেটা হল যে, অনেক অ-সমাধিত জটিল সমস্যা সত্ত্বেও জাতীয় সংহতি, সামাজিক প্রগতিমুলক ব্যবস্থা, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান, জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কিংবা স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ—এ সবই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপাদান এবং এই হিসেবেই এ সবের অন্যতম মূল্য।

স্বাধীন ভারতে সামাজিক-রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রকৃতি বিচারে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল্যায়ন নিয়ে বিভ্রান্তি যেহেতু প্রচুর এবং সমাজ-বিকাশের শেষ পর্যন্ত নিয়ামক যেহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক সে কারণেই এই

বিশেষ বিষয়ে একটু বিস্তারিত চর্চা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে, পূর্বে উল্লিখিত বিরোধ কটির বিস্তৃত পরিসরে এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র-এর (state capitalism) বিকাশ মূলত একটি প্রগতিশীল ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই প্রগতিশীলতার পরিচয়, প্রথমত, শিল্পোন্নয়নের মূল কার্যক্রম অর্থাৎ ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পবিকাশের মধ্যে নিহিত। এই ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক বিকাশের বনিয়াদ নির্মাণ।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও এমন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার ঘটছে যেটির অন্তর্বস্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। কারণ [ক] রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মসূচীর মূল বিষয়বস্তু ইস্পাত, পেট্রোলিয়ম বা ভারী রাসায়নিক জাতীয় শিল্পের বিকাশ, এবং [খ] এই বিকাশ প্রধানত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একচেটিয়া প্রবণতা, বিশেষত ভারতীয় ধনিককুল-চূড়ামণিদের যথেচ্ছ কার্যকলাপ ও মুনাফাবাজির কেলেঙ্কারিকে পুরোপুরি না হলেও অন্তত অংশত সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার হাতিয়ার। আবাদী-কংগ্রেস প্রস্তাবিত সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ বা নেহরু-ঘোষিত সমাজতন্ত্রের প্রধান তাৎপর্যও এখানে। এই সব ঘোষণা যে বৈজ্ঞানিক অর্থে বা মার্কসীয় অর্থে সমাজতন্ত্র গঠনের কার্যক্রম নয় তা সুস্পষ্ট। কিন্তু ছোট-মাঝারি সমেত সমগ্র জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মবিকাশের প্রবল তাগিদ, সমগ্র শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্বাবধান, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের সুসম বিকাশের আগ্রহ এবং উন্নয়নের ফলসমূহকে শাসক শ্রেণীর উপরতলার সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীটি কর্তৃক আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিস্তার, পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ গঠনের ঘোষণার মধ্যে প্রতিফলিত।

চতুর্থত, নানা ফাঁক, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আপোষমুখিনতা সত্ত্বেও দেশীয় রাজ্যের সামন্ত-অধিপতি ও জমিদার, জায়গীরদার, তালুকদারদের রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক আধিপত্যের অবসান, কৃষি-সংস্কারের কর্মসূচীর মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উৎকট রূপের সঙ্কোচন ও খর্বতা সাধন এবং কাশ্মীরের মত কোনো কোনো অঞ্চলে অত্যন্ত ব্যাপক ভূমি-সংস্কার উপরোক্ত প্রগতিশীল ধারার প্রকাশ।

স্পষ্টতই ভারতের এই ধনতান্ত্রিক বিকাশ বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র জাপান, জার্মানি বা প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়া কিংবা আজকের ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের প্রকৃতির থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। এই সব কয়টি ক্ষেত্রেই শুধু নিজ দেশের জনগণের উপর শোষণ ও অত্যাচারের নয়, অন্য দেশের জনসাধারণকেও লুণ্ঠনের, পররাজ্য গ্রাসের এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে একচেটিয়াতন্ত্রের স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল বিকাশের হিসেবে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের আবির্ভাব। আর ভারতে ব্যাপারটা মূলগত অর্থেই বিপরীত—এখানে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ঘটছে অর্থনীতির জাতীয় পুনর্গঠন, ঔপনিবেশিকতার চক্রব্যূহের বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণী ও সমগ্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বনিয়াদ সম্প্রসারণের হাতিয়ার হিসেবে।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে একথা কিন্তু অবশ্য স্মর্তব্য, বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও এটা শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক বিকাশ। মার্কসবাদ আজ অচল, এটা বর্তমানে অনেকেরই চালু বুলি। কিন্তু, টাকার আবির্ভাব গালে রক্তের ছাপ নিয়ে, আর পুঁজির আবির্ভাব পা থেকে মাথা অবধি রক্ত ও ক্লেদ মেখে, মার্কসের এই উক্তির সত্যতা শুধু আঠারো-উনিশ শতকী ইউরোপ-আমেরিকায় নয়, বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে এই 'সনাতন' ভারতেও বহাল রয়েছে। খাদ্যের জন্য মানুষে আর কুকুরে কাড়াকাড়ি, হাজার হাজার চাষীর জমি থেকে উচ্ছেদ, দু-মুঠো অন্নের দাবির জবাবে আশিটি তাজা মানুষকে খুন, অশ্রুতপূর্ব মুনাফার পাহাড়, সম্পদ উৎপাদকদের নরকতুল্য বস্তিতে বাস, স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণের নামে স্বর্ণশিল্পীমেধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি কিংবা পড়ার খরচ চালানোর জন্য ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত বিক্রির প্রতিযোগিতা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর নির্বিচার দমননীতি, শ্রেণী স্বার্থে সংবিধান লঙ্ঘন—এ সবই ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এ সবই ধনতান্ত্রিক সমাজের পরতে পরতে জমে ওঠা অমানুষিকতার পরিচয়।

এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, এই ধারা যদি চলতে থাকে, অর্থ ও

পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও একত্রীকরণ যদি অব্যাহত থাকে, ধনিকচূড়ামণিদের বর্তমান ক্ষমতা যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তবে অচিরেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্র হয়ে উঠবে এদেশে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের ভিত্তি। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র হয়ে উঠবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও একচেটিয়া ধনিককুলের সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষণের হাতিয়ার। আর একচেটিয়া ধনিকদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী মহাধনিকদের ঘনিষ্ঠ যোগসাজসের দরুন শুধু যে ভারতের স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় স্বাধীনতা বানচাল হয়ে যাবে তা নয়, আসলে নয়া-উপনিবেশবাদ বা ঔপনিবেশিক ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটবে তার সমস্ত বর্বরতা ও স্বৈরাচার নিয়ে। আর গত কিছু দিনে এই বিপদটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

নয়

প্রতিক্রিয়া ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিপদটি যে সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে মার্কস-লেনিন-কথিত দ্বিতীয় পন্থায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের শক্তিশালী ঝোঁক। ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের বিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস ক্যাপিটাল-এর তৃতীয় ভল্যুমে সিদ্ধান্ত করেছিলেন : 'The transition from the feudal mode of production is two-fold. The producer becomes merchant and capitalist....This is the really revolutionary way. Or else, the merchant establishes direct sway over production....This system presents everywhere an obstacle to the real capitalist mode of production....Without revolutionizing the mode of production, it only worsens the condition of the direct producers, turns them into the wage-workers and proletarians under conditions worse than those under the immediate control of capital, and appropriates their surplus-labour on the basis of the old mode of production." প্রথম পথের, নীচের থেকে উৎপাদক-মালিকদের উদ্যোগে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও একচেটিয়া বণিকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একেবারে গোড়া ঘেঁষে বুর্জোয়া বিপ্লবের দৃষ্টান্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক বিকাশ। আর দ্বিতীয় পথ হল প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে অংশত বজায় রেখে, তার সঙ্গে

আপোস করে উপর থেকে একচেটিয়া বণিকদেরই উদ্যোগে শিল্পের বিস্তার ও সামন্ত জমিদারদের ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তর। প্রথম পথের তুলনায় অনেক বেশি মন্থর, স্বৈরাচারী ও যন্ত্রণাদায়ক এই দ্বিতীয় পথে ধনতন্ত্র বিকাশের নমুনা মেইজি-বিপ্লব-পরবর্তী জাপান, বিসমার্কের জার্মানি কিংবা স্টলিপিনের রাশিয়া।

আজ ভারতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার মধ্যে আসলে প্রকাশ পাচ্ছে ঐ দ্বিতীয় পন্থার চাপ। আর এই চাপের শিকড় রয়েছে ভারতীয় ধনিকদের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এদেশে ধনিকতন্ত্রের প্রথম বিকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায়, দেশীয় মুৎসুদ্দি কারবারীদের উদ্যোগে। তাই ঠিকুজি-কোষ্ঠীর হদিশ নিলে দেখা যায়, আজকের ভারতের পাঁচটি বৃহত্তম ধনিক পরিবার—টাটা, বিড়লা, ওয়ালচাঁদ, মাহিন্দ্র ও মফতলালদের প্রত্যেকটিই দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিল শুধুমাত্র বাণিজ্য ও তেজারতির কারবারে। আর তাই ভারী শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পর এখনও টাটাদের অন্যতম প্রধান আগ্রহ আমদানি-রপ্তানি থেকে শুরু করে নানা রকমের ব্যবসায়ে।

ঔপনিবেশিক শাসনের নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে এই ধনিকশ্রেণী জন্মক্ষণের বেদনা ও বাল্যের অভাববোধ পেয়েছে—কিন্তু যৌবনের শ্রী, স্ফূর্তি কিংবা সবলতা পায় নি, তার আগেই জরা ও অবসাদ এদের গ্রাস করেছে। এই অবস্থায় এই ধনিকগোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য—শিল্পবিস্তার হোক চাই না হোক, কৃষির উন্নতি ঘটুক কি না ঘটুক—যে কোনও উপায়ে, সহজে, তাড়াতাড়ি, বেশি বেশি মুনাফা অর্জন।

অবশ্য এদেশে চীনের মতো শুধু কম্প্র্যাডোর বা মুৎসুদ্দিফড়িয়া বুর্জোয়ার উদ্ভব হয় নি। এখানে বুর্জোয়াদের সর্বোচ্চ অংশের মধ্যেও তেজারতি-বণিকী বৃত্তি আর শিল্পবিস্তারে আগ্রহ ও সামর্থ্য—এই দুয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। আর ভারতীয় বুর্জোয়ার উপরোক্ত জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও দ্বৈত চরিত্রের প্রকাশ আমাদের দেশে ধনতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে দুই বিপরীত পথের কার্যক্রম ও সংঘর্ষের মধ্যে।

স্বাধীনতার আগে করাচী কংগ্রেসের 'মৌলিক অধিকার' বিষয়ক প্রসিদ্ধ প্রস্তাব ("The state shall own or control heavy industries and services, mineral resources, railways, waterways, shipping and other means of public transport"), ১৯৩৬-এর জানুয়ারিতে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে

জওহরলালের সভাপতির ভাষণ, ঐ বছরেই ডিসেম্বরে ফৈজপুর কংগ্রেসে গৃহীত নির্বাচনী ইস্তাহার ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক কর্মসূচী (এই কর্মসূচীর মধ্যে ছিল "...removal of British Imperialistic exploitation and a radical change in the antiquated and repressive land tenure and revenue systems"). ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কার্যকলাপ কিংবা স্বাধীনতার পর ১৯৪৭-এর নভেম্বরে এ. আই. সি. সি.র দিল্লী অধিবেশনের প্রস্তাব, কংগ্রেস কৃষি সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্তাবলী, অধ্যাপক মহলানবীশের 'পরিকল্পনা-কাঠামো', ঐ বিষয়েই পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের সুপারিশ (ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানির উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ, খনি শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তনাদি এই সুপারিশগুলির অন্যতম), ভূমি-সংস্কার প্যানেলের সুপারিশ বা নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবাদিতে এই প্রথম পন্থায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী রচনা করা হয়েছে।

কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বয়বাদী ভূমিকা, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ উপরতলার সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষণের দরুন দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ঝোঁক এদেশে অত্যন্ত প্রবল। বাস্তবিকপক্ষে কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে প্রথম পথের প্রতি বিরোধিতা গোড়ার থেকেই। এ কারণেই করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব, স্বতন্ত্র রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা কে. এম. মুন্সীর ভাষায়, "ধনিক শ্রেণীকে স্তম্ভিত করেছিল।" এ কারণেই কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জওহরলাল ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে ১৯৩৬-এর জুনে 'মৌলিক প্রকৃতি'র মতপার্থক্য জ্ঞাপন করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে একসঙ্গে পদত্যাগ করেছিলেন প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী প্রমুখ। এ কারণেই, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি প্রসঙ্গে জওহরলাল লিখেছেন, "Important elements in the Congress...rather looked upon it as an unwanted child... and rather suspicious of its future activities. Big Business was definitely apprehensive and critical...."

দশ

স্বাধীনতা পাওয়ার পরে এই দুই পথের সংঘাত আরও বেশি তীব্র হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরে অতীতে প্যাটেলের সঙ্গে নেহরু-আজাদদের মতপার্থক্য বা

কংগ্রেস সভাপতিরূপে ট্যাণ্ডনের নির্বাচনকে উপলক্ষ করে সংঘাত ও পরে নেহরুর উদ্যোগে কংগ্রেস নেতৃত্বের পুনর্গঠন কিংবা সম্প্রতি জওহরলাল, কৃষ্ণ মেনন, কেশবদেব মালব্য, গুলজারিলাল নন্দ প্রমুখর সঙ্গে পাতিল-মোরারজি-অতুল্য ঘোষদের সুস্পষ্ট বিরোধ, আর নেহরুর নীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘ-সোশ্যালিস্ট-আকালি-ডি. এম. কে. পার্টিদের জগাখিচুড়ি মিলন ও বিষাক্ত আক্রমণ এই সংঘাতেরই অভিব্যক্তি।

আমাদের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জাতীয় বিপ্লবাত্মক সাধনার যা কিছু অভীষ্ট এবং বর্তমানেও জাতীয় জীবনে ও সরকারী নীতিতে যা কিছু সুস্থ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সে সবেরই বিরুদ্ধে এদের দেশদ্রোহাত্মক চক্রান্ত উদ্যত। আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, কৃষির ব্যাপক প্রসার, সমবায়মূলক তৎপরতা—এ সবই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, তাদের আশীর্বাদ-ও-প্রসাদপুষ্ট দেশীয় কায়েমী স্বার্থ এবং তাদের উপরোক্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য ও চোরাগোপ্তা আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। বৈদেশিক ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতার নীতি, সামরিক জোটের আশ্রয় অবলম্বনে অস্বীকৃতি, দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সৌভ্রাত্র্য জ্ঞাপন, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ঘোষণা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির বিরুদ্ধে এরা খড়্গহস্ত। বিদেশী মহা-ধনিকদের সঙ্গে মিতালি করে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প-বিস্তার, বড় জোতের মালিক ও প্রাক্তন জমিদারদের উপর নির্ভর করে বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক খামার গঠন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন এবং সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পোষকতা, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র সম্পর্কে জনমানসে সংশয় ও অবিশ্বাস সৃষ্টি এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ সন্ত্রাস—এই হল দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রতি-বিপ্লবী কর্মসূচী।

এই দ্বিতীয় পথের প্রবল চাপের সামনে জওহরলাল ও তাঁর সমর্থকদের দ্বিধা ও স্ব-বিরোধিতা এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য বামপন্থীদের বিভ্রম ও দুর্বলতা আর উপযুক্ত জাতীয় সমাবেশের অভাব ইত্যাদি মিলিয়ে, প্রথম পথ পিছু হঠেছে অনেক ক্ষেত্রেই এবং অনুসৃত হয়েছে মধ্য-পন্থা। মধ্য পথ অনুসরণে নেহরু ও তাঁর অনুগামীদের আশা থেকেছে যে, এইভাবেই দ্বিতীয়

পথের ধ্বজাধারীদের অপকৌশলকে পরাস্ত করা যাবে। কিন্তু, কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে অংশত বজায় রেখে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোস করে কৃষির বিকাশের প্রয়াস সংকট ও অসঙ্গতি নিরসনের পরিবর্তে সেগুলিকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। এই দুর্বল প্রয়াসই গ্রামাঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বড় জোতের মালিক, বড় বড় কারবারী ও মহাজনের আধিপত্যকে সর্বময় করে তুলেছে। সরকারী আমলাদের সঙ্গে যোগসাজস এবং শহরাঞ্চলের একচেটিয়া কারবারী ও ফাটকাবাজদের সঙ্গে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ ঐ তিন দুষ্টগ্রহই গ্রামাঞ্চলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার প্রধানতম ভিত্তি। আর ভারতের মতো দেশে, যে দেশে কৃষি সমস্যাই অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা, কৃষি সংকট সমাধানে অক্ষমতা ও পরিবর্তে উপরোক্তরূপ বিকাশের পশ্চাৎপটে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাকে বহাল রেখে, একচেটিয়া পুঁজিকে নানাবিধ কনসেশন দিয়ে, আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করে শিল্প-বিস্তারের প্রয়াস একদিকে জনসাধারণের উপর বর্বর শোষণের বোঝা চাপিয়েছে, আর অন্যদিকে শিল্প-অর্থ-বাণিজ্য, মায় সংবাদপত্র জগতে এক কি দেড় ডজন পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার সুযোগ করে দিয়েছে।

কিন্তু এ পথে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন তথা ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থে সুস্থ, সবল জাতীয় অগ্রগতি দুরাশামাত্র। উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ার পরিণামে বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরতলায় যে একচেটিয়া ধনিক চক্রটি গেড়ে বসেছে, মার্কসের ভাষায়, সেটি "...in its mode of acquisition as well as in its pleasures, is nothing but the *rebirth of the lumpenproletariat on the height of bourgeois society*" (বাঁকা হরফ মূলের)। এই প্রক্রিয়ারই অপার মহিমায় সামাজিক ও নৈতিক জীবন অধঃপতিত, সাহিত্যসৃষ্টি নগদমূল্যের বিনিময়ে দেশী-বিদেশী কুবেরদের সেবায় পর্যবসিত, নারীহরণ থেকে শুরু করে ক্রিশ্চিন কীলার পর্যন্ত যাবতীয় কিস্‌সা কাহিনী 'স্বাধীন' সাংবাদিকতার প্রধান উপজীব্য, আর রাজনৈতিক জীবন নীতি ও আদর্শভ্রষ্টতায় পঙ্কিল। এখানে ফ্রী এণ্টারপ্রাইজের অর্থ সীমাহীন মুনাফার লালসা। আর এই লালসাকে তৃপ্ত করার জন্য টাকা ছুটেছে ইস্পাত, মেশিন নির্মাণ, ভারী রাসায়নিক শিল্পের থেকে চিনি, কাপড় বা রেয়ন কলের দিকে, আবার সেখান থেকে ব্যবসা ও ফাটকাবাজির দিকে, আর সেখানেও

সন্তুষ্ট না হয়ে কালোবাজারের দিকে। এই মহাধনিকচক্রের জীবনযাত্রায় ম্যাক্সওয়েবার কথিত capitalistic spirit ও তার অভিব্যক্তি সংযত, ভোগবিলাসকুণ্ঠ আচরণ, নিরন্তর উদ্ভাবনী প্রয়াস ও সক্রিয় শিল্পোদ্যোগ অনুপস্থিত; পরিবর্তে অনুৎপাদক ব্যয়ের উদ্দামতা ও জাঁকালো সম্ভোগের বেলেল্লাপনাটাই বৈশিষ্ট্য।

এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে দুই ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করছে। একদিকে, সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যে, বিশেষত দ্বিতীয় পন্থায় বিকাশের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বর্বরতা ও অমানুষিকতা রয়েছে তা জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই তীব্র নৈরাশ্য ও প্রচণ্ড ক্রোধ সঞ্চারিত করছে, এবং তা এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন এক সঙ্কীর্ণ ও অতি-বামপন্থী রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিচ্ছে যা পরিণামে বন্ধ্যা, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আত্মঘাতী। অন্যপক্ষে, উপরোক্ত ধরনের ধনতান্ত্রিক বিকাশই কিন্তু বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াকে পুষ্টি ও সাহস জোগাচ্ছে। আর রাজনৈতিক জীবনে এই ধারা দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিপরীত হলেও কার্যত অবশ্য নেহরুর মধ্য-পন্থাকেও বিপন্ন করছে।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে বিশদ করলে বলা যায়, ইতিপূর্বে ১৯৪৭-৫০-এর পর্বে যে সাম্রাজ্যবাদী, প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্র সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করে মুখ লুকিয়েছিল, কৃষি অর্থনীতি থেকে শুরু করে উপরে বর্ণিত পুরো জটটিকে অবলম্বন করে, সম্প্রতিকালে সেই প্রতি-বিপ্লব আবার তার বিষাক্ত নখ-দন্ত বিস্তার করছে। আর মহা-ধনিক চক্রটি এই প্রতিক্রিয়ার মেরুদণ্ড। যে মীরজাফরী কর্মসূচীটির কথা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেটির বাস্তব রূপায়নের কলা-কৌশল হিসেবে, প্রথমত, সরকারী নীতির জন-বিরোধী দিক ও নিজেদের মুনাফালোভী কার্যকলাপের ফলস্বরূপ জনসাধারণের দুর্দশা, গভীর নৈরাশ্য ও ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষকে এবং নিজেদেরই তৈরি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অরাজকতাকে এরা কাজে লাগাচ্ছে। নিজেদের নোংরা মতলব হাঁসিলের ব্যাপারে এদের দ্বিতীয় অপকৌশল হল কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে সুপরিকল্পিত যোগসাজস। কংগ্রেসের বাইরে থেকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় কায়েমীস্বার্থ ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি—স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, প্রজা

সোস্থালিস্ট, আকালি পার্টিরা হল্লা জুড়ে দেয়, আর সেই সুযোগে কংগ্রেস ও সরকারের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শক্তভাবে গেড়ে বসা দক্ষিণপন্থীরা সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য জোগায় এবং প্রগতিশীল নীতি ও শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আঘাত হানে। আর এই পরিস্থিতি ও শক্তিবিন্যাসই অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী নীতিতে দক্ষিণগামী পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এগারো

এই বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াটিই অভূতপূর্ব শক্তি লাভ করেছে চীন সরকারের হঠকারী আচরণজনিত পরিস্থিতির থেকে। কৃষ্ণ মেননের অপসারণ দিয়ে এদের সাফল্যের শুরু; তারপর ঘটেছে সরকারের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতিতে ধাপে ধাপে দক্ষিণপন্থার দিকে সর্বনাশা পরিবর্তন, মালব্যর অপসারণ, লোহিয়া-মাসানী-কৃপালনীদের উপনির্বাচনে জয়। এই সব পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির মধ্যে তীব্র সংঘাতের আবহাওয়ায়। কলম্বো প্রস্তাব, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ, চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ আলোচনার নীতি, সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে সৈন্য আমদানি, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির মতো বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই এই শ্রেণী-সংগ্রাম আবর্তিত হয়েছে। কলম্বো প্রস্তাব তথা শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসা, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ইত্যাদি যা কিছু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করার পক্ষে সহায়ক তারই তীব্র বিরোধিতা করেছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশের ভিতরে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি। এরাই ঘোষণা করেছে যে, জোট-নিরপেক্ষতার নীতি মৃত; এবারে শুধু স্থির করা প্রয়োজন সমাধি-ফলকে কী লেখা হবে। দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতার এই ধ্বজাধারীরাই পাকিস্তানের হাতে কাশ্মীর তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে; এরাই 'বিমান-ছত্র', ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে আকাশ-বাণীর চুক্তি ফেরি করেছে।

এই জটিল, গুরুতর পরিস্থিতিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়েছে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা। কিন্তু এ ভূমিকা, বিশেষত সরকারী নীতির দক্ষিণ-অভিমুখী পরিবর্তনের প্রবণতা সত্ত্বেও এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রখর শ্রেণী ও নীতিগত সংগ্রামের পর

দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করা গেছে এবং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির মৌলিক, প্রগতিশীল উপাদানগুলিকে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ, অর্থনৈতিক বিকাশের মূল দিকগুলির অনুসরণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ইত্যাদিই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল, জাতীয় শক্তিগুলির শক্তি ও সামর্থ্যের নিদর্শন। আর এজন্য জওহরলাল ও তাঁর সহযোদ্ধাদের কৃতিত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের আশা অবশ্য অনেক। সরকারী নীতির অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য ও কংগ্রেসী নেতৃত্বের আপোসমুখী মনোভাবের পটভূমিতে একবার রক্তের কিছু স্বাদ পেয়েই এরা আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এরা দাবি করতে শুরু করে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির আরও দক্ষিণমুখী পরিবর্তন, সরকারের দক্ষিণপন্থী পুনর্গঠন এবং এমন কি নেহরুরও অপসারণ। আর এই অভিসন্ধি পূরণের উদ্দেশ্যেই দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ থেকে জোটবদ্ধভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের উত্থাপন। আশাটা ছিল এর মধ্যে দিয়েই এরা দেশের সামনে নিজেদেরকে বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

কিন্তু এ-সাধ ছিল সাধ্যের অনেক বেশি। অনাস্থা প্রস্তাব হেরে তো গেলই, উপরন্তু তাদের সহ্য করতে হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আঘাত। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্ক হয়ে যাওয়ার পর সকলের নজর ছিল কামরাজ পরিকল্পনা ও তার রূপায়নের দিকে। দেখা গেল, এ পরিকল্পনার ধাক্কায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ভিতরে দক্ষিণপন্থার প্রধানতম দুই স্তম্ভ মোরারজি দেশাই ও সদাশিবরাও পাতিলকে সরে পড়তে হল এবং সেই সঙ্গেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর আপৎকালে অবলম্বিত অর্থনৈতিক নীতির জঘন্যতম দুটি ব্যবস্থা—বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্প ও স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। এখনও অবশ্য সব কিছুই প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে কামরাজ পরিকল্পনা, দেশের ভিতরে ফ্যাসিস্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে নেহরুর সতর্কবাণী, 'গদির আগে পার্টি'—এই নীতির ঘোষণা ও এ-ঘোষণার বাস্তব রূপায়নের মধ্যে জওহরলাল ও তাঁর সমর্থকদের অর্থাৎ কংগ্রেসের ভিতরকার প্রগতিশীল শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম পাল্টা আক্রমণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অবশ্য দ্বিধা এখনও রয়েছে। দক্ষিণপন্থীরাও যথেষ্ট শক্তিশালী—ফলে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো সহজ বা সরল নয়। কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, সারা দেশেই শুরু হয়েছে প্রগতিশীল আন্দোলনের নতুন পালা। তারই পরিচয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে মহা-আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ ও ১৩ই সেপ্টেম্বরের অবিস্মরণীয় দিল্লী অভিযান। দলগত সংস্কারের সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধির প্রাচীরকে অতিক্রম করে, প্রায় সমস্ত শ্রেণী ও অংশ—শিল্প-শ্রমিক, কৃষি-শ্রমিক, ছোট-বড় মালিক চাষী, শহুরে মধ্যবিত্ত, ধনিক শ্রেণীরও অংশবিশেষ, বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদিকে ব্যাপ্ত করে, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিগত বিষয়ে এমন সংগঠিত, সম্মিলিত আলোড়ন-অভিযান স্বাধীনতা পাওয়ার পরবর্তী ষোল বছরে আর কখনও হয় নি। এই অভিযানের ব্যাপ্তি ও জাতীয় প্রকৃতি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের জাতীয় আন্দোলনের গৌরবময় দিনগুলির কথাই মনে করিয়ে দেয়। বাস্তবিকপক্ষে গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরের অভিযান আর স্বাধীনতা পাওয়ার আগেকার আন্দোলনগুলির মধ্যে একটা নিবিড়, গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান। এই শেষোক্ত আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, আর সর্বশেষ জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ ও প্রসারসাধন অর্থাৎ ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক বিপ্লবের সংহতিসাধন। সেই হিসেবে এই অভিযানটি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যেরই অনুবৃত্তি—কিন্তু নতুন পটভূমিতে, নতুন স্তরে অনুবৃত্তি। আর কামরাজ পরিকল্পনায় দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রত্যাক্রমণের সূচনা তাকেই আরও একধাপ এগিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অভিযানে। নিঃসন্দেহেই এই ঐতিহাসিক অভিযানের মধ্যে রূপ পেয়েছে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা, স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি সংগঠিত সমর্থন, এবং এই সঙ্গেই আবার সরকারের জন-বিরোধী নীতি ও সর্বোপরি, দক্ষিণ-পন্থীদের প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ রচনার প্রয়াস।

এই প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে পরাস্ত করাটাই জাতীয় অগ্রগতি তথা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশও সাধারণভাবে

স্ববিরোধিতাপূর্ণ, এবং আমাদের দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে গোড়ার থেকেই উৎকট রকমের জন-বিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানকে জন্ম দিতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে প্রথম পথের বিকাশটিকে একমাত্র জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলেই সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনকে নিশ্চিত করা যায়, জাতীয় অগ্রগতিকে নির্বিঘ্ন করা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির বাম-অভিমুখী পরিবর্তন অর্জন, এবং, সবথেকে বড় কথা হল, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করাটাই বর্তমান মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা বেশি জরুরী কর্তব্য।

এই কর্তব্যের সমাধান অবশ্য মোটেই সহজ নয়। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রথম আক্রমণের আঘাত সামলে নিয়ে জোট বাঁধছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তির সংগ্রাম আরও তীব্র হচ্ছে। জওহরলাল ও তাঁর অনুগামীদের নীতি ও প্রয়াসও এখনও দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধিতা থেকে মুক্ত নয়। এ কারণেই সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির আশু কাজ হল সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের নতুন ধারাটিকে অব্যাহত রাখা, প্রসারিত করা ও আরও শক্তিশালী করা। গণ-সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন উত্তরোত্তর বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরোধী সমস্ত শক্তিকে ব্যাপ্ত করে গণ-সংগ্রামে নতুন ব্যাপকতা ও গভীরতা আনয়ন অভিপ্রেত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এই জাতীয়, গণতান্ত্রিক সম্মিলনের বিশেষ অর্থ ও অন্তর্বস্তু হল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকসাধারণের নতুন ধরনের মৈত্রীবন্ধন। এ-কাজ সম্পাদনে ব্যর্থতাই গত পনেরো-ষোলো বছরে ভারতের বামপন্থী ও প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতার প্রধানতম ও মূলগত দুর্বলতা।

সম্প্রতিকালে প্রগতিশীল শক্তিগুলির মধ্যে নতুন ধরনের বিপ্লবী ঐক্য রচনা এবং রাজনৈতিক তৎপরতাকে গুণগত অর্থেই নতুন স্তরে উন্নীত করার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে কংগ্রেসের ভিতরকার গণতান্ত্রিক শক্তি এবং কমিউনিস্ট পার্টির। কংগ্রেসের রয়েছে সেই ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে জাতীয় চেতনা ও আন্দোলনের দীর্ঘদিনের গৌরবময় ঐতিহ্য, আর কমিউনিস্ট

পার্টি আগামী দিনের মহত্তম ভবিষ্যতের প্রতীক। স্বভাবতই আজকের যুগসন্ধিক্ষণে জরুরী প্রয়োজন এই দুটি প্রগতিশীল ধারার ঐক্য এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জাতীয়, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন। আর এই জাতীয়, গণতান্ত্রিক সম্মিলনকে নিজেদের পতাকায় লিখে নিতে হবে সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণপন্থীদের প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে এদেশের বুক থেকে চিরতরে নির্মূল করার বিপ্লবী আহ্বান। এই আহ্বানকে জয়যুক্ত করে তোলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজকে সমাধা করে অর্থাৎ আজকের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে জাতীয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির সম্ভাবনা।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

গৃহশিল্পের কথা

সেজ জেঠামশায়কে আমি দীর্ঘদিন দেখেছি। মানুষ হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝবারও অবসর পেয়েছি বেশি—স্নেহ ভালোবাসাও পেয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর। অতি গম্ভীর প্রবল কণ্ঠ আর কারও দেখি নি—তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রভীনচন্দ্র হালদার কতকটা তা পেয়েছেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণু, কর্মঠ লোক, দেহে সুপটু, প্রকৃতিতে বেশ সাবধান। বাড়ির পুজোর বা ক্রিয়াকর্মের যত কষ্টকর কাজের ভার তিনি বহন করতেন। তাঁর বন্ধুরা বলতেন, প্রমদা ক্রিকেট খেলত ভালো। ব্যাট ধরলে সারা দিনে তাকে আউট করা যেত না। কিন্তু রান হয়তো হত ৭ বা ৮। প্রমদা জোরে মারবে না—সাবধান, কেবল ঠেকাবে। আসলে সাবধানতা ছিল তাঁর প্রথম নীতি। তাঁর সঙ্গে পুজোয় দু-একবার বাড়ি গিয়েছি। যেতে লাগত বিকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত। তিনি কলা ছাড়া পথে কিছুই খেতে দেবেন না—খেলেই কলেরা হবে। বলতেন, "এক রাত্রি না খেয়ে কেউ মরে নি, কিন্তু খেয়ে মরেছে অনেক।" আমাদের খাদ্যমন্ত্রীরাও তো এ কথাই বলেন—না খেয়ে কেউ মরে না, মরে বরং খেয়েই। কারও কোথাও গতায়াতেই জেঠামশায়ের আপত্তি—কেন একটা বিপদ ডেকে আনা। দাদা যাঁর লেখাপড়া ফেলে নেপাল চলে গিয়েছিল এমন লোকের ভাই তিনি। কেউ যাবে শুনলেই নিষেধাজ্ঞা ধ্বনিত হত প্রবল কণ্ঠে "যেয়ো না, যেয়ো না বলছি।" তারপর, হতাশ কণ্ঠে "যাও আমার কথা না শুনে। টাকা-পয়সা খরচ করে যেতে পার, ফিরে আসবে এক পয়সায়" —তখনো পোস্টকার্ড এক পয়সা, আর 'ফিরে আসবে' অর্থাৎ এক পয়সার পোস্টকার্ডে আসবে মৃত্যুসংবাদ। এ রকম অদ্ভুত উদ্ভটের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিতে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিবাদ-প্রবণতা, দৃঢ় সংকল্প। সেখানে তাঁর

প্রবল কণ্ঠ গর্জে উঠত দুর্বার বিক্রমে আর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়। চমকে উঠতে হত সকলের। অথচ তিনি কলহপরায়ণ ছিলেন না। যে কাজ তিনি করতেন, সরকারী কানুনগোর কাজ, তাতে বিনা চেষ্টাতেও যথেষ্ট অর্থাগম হতে পারত—যদি অর্থলাভের প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু সে পথ তাঁর পক্ষে ছিল অগ্রাহ্য, বেতনের অতিরিক্ত 'উপরি' তাঁর কাছে ঘৃণার্হ। অথচ ধর্ম ভক্তি প্রভৃতি নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা বেশি ছিল না। আমার জেঠাইমা দীক্ষা নিয়েছিলেন ভোলানন্দ গিরি মহারাজের থেকে—তিনি স্বচ্ছন্দে তাতে সম্মতি দিলেন না। নিজে মন্ত্র নেবেন না—"একজন দুই প্রভুকে সেবা করতে পারে না। আমি সরকারী চাকরো।" আত্মীয়-কুটুম্বদের চিঠিপত্র এলে তা আর পড়ার অবসর হত না—মুখে শুনে নিতেন। তারা অনুযোগ দিলে বলতেন "রেখে দাও এখন। পেনসেন নিয়ে উত্তর দোব।" পেনসেন নিয়েও তাঁর চিঠি লেখার অবসর হয় নি, দীক্ষা নেবারও না। মৃত্যু যখন অদূরে, ডাক্তারদের কথামতো বউদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, কী খেতে চান?" দু-একবার জিজ্ঞাসা করাতে মৃদু হেসে বললেন, "পোলাউ-মাংসই করো তা হলে।" পরিবারটা একটু মাংসাশী— এবং ভোজনপ্রিয়। তিনি তদুপরি ছিলেন খুঁতখুঁতে। অন্তত জ্যেঠাইমার রন্ধনে খুঁত ধরতে না পারলে খাওয়ার পরে বলতেন, "ছাখো এখন হজম করতে পার কিনা।"—যেন তাও রান্নার দোষ। অথচ সেজ জেঠাইমা ছিলেন রন্ধনে সুপটু।

বাড়ির কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—তাই এঁদের সকলের স্নেহ আমি জন্মাবধি লাভ করেছি। সে সব মানুষেরা এখন আর কেউ বড় নেই। অকৃতজ্ঞ হলেও তাঁদের ভোলা অসম্ভব। আমার স্মৃতি থেকেও অবশ্য কাল তাঁদের অনেক রেখা মুছে ফেলছে।

একটা মজার কথা প্রথম বলি। স্কুলে যখন প্রথম পড়তে যাই—বাড়ির সঙ্গেই ছিল সেই ইস্কুল—'বঙ্গবিদ্যালয়'—আমাকে শিক্ষকেরা একজন গল্পছলে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে, তোকে বাড়িতে সব থেকে বেশি ভালোবাসে কে?" বিশেষ চিন্তা করতে হল না। দ্বিতীয় বার "বল না" শুনতেই বললাম "ঠাকুর-মা।"

তিনি হাসলেন। বললেন, "কেন? মা নয়?"

আমি দ্বিধা না করে বললাম, "না।"

শিক্ষক মহাশয় ক্লাশ-সুদ্ধ সকলকে কথাটা শোনালেন। তাঁর সহযোগীদেরও দু-একজনকে আনালেন। বললেন, "শুনেছেন, ওকে নাকি ওর মা ভালোবাসেন না।"

তাঁরা যে কী আমোদ পেলেন জানি না, হাসতে লাগলেন। আমি কিন্তু ভাবছিলাম "সত্যই তো, মা কি আর ঠাকুরমার মতো ভালোবাসেন —কিছুতেই না।"

কথাটা বাড়িতেও পৌঁছল, সবাই হাসলেন আবার—মাও পর্যন্ত স্মিত মুখে।

ঠাকুর-মা যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রায় ততদিন এ কথাও সত্য ছিল। কেবল শেষ বছরটা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারিয়ে সেই সত্তর-পেরুনো বৃদ্ধা শয্যাশায়িনী হয়েছিলেন।—বৎসর না ঘুরতেই অবশ্য তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন—সেই এক বৎসর তিনি আমারও খোঁজ নেন নি। না হলে আমি তো জানতাম—সব থেকে বেশি তিনি ভালোবাসেন আমাকে। অনেক দিন দুপুরে তাঁর কাছে ঘুমোতাম—না হলে মায়ের বিশ্রাম আমার দৌরাত্ম্যে অসম্ভব হত। ফলে অবশ্য অসম্ভব হত ঠাকুরমায়ের বিশ্রাম। কিন্তু তিনি বলতেন—"চল 'প্রস্তাব' বলব।" পূর্ব বাঙলায় রূপকথা-উপকথায় নাম 'প্রস্তাব'। ঠাকুরমায়ের সেই ঝুলিটা তত রসসমৃদ্ধও ছিল না, বিশালও না। ছাপা বই দেখে এখন তা বুঝি। তখনো আপত্তি করতাম—"এটা জানি, আরেকটা বলুন।" পরিমিত ছিল জোগান, কিন্তু অমৃত অমৃতই। ঠাকুরমাই যে সব থেকে বেশি ভালোবাসেন, এ বোধহয় পৃথিবীর সকল শিশুর অভিজ্ঞতা। কিন্তু মনে হয় আমাদের বাড়িতে অন্যদের অপেক্ষা এ কথাটা জোর করে বলতে পারতাম আমরা দু-জন—তাঁর নাতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'সুদর্শন', আর তার বছর নয় পরেকার এই কনিষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ তনয়। ছোট্ট মানুষটি ঠাকুরমা, এককালে ছিলেন গৌরবর্ণা,—তা এখন বুঝি, তখন বিশেষ লক্ষ্যও করি নি। নাক-মুখ-চোখ সুন্দর, তাও তখন দেখি নি। মানুষটিকেই দেখেছি—যাঁর কাছে ঠাঁই নিতে পারলে আর আমার দুষ্টোমির জন্য কারও শাসন সইতে হবে না। রাত্রি ভোর না হতে উঠে তিনি বাড়ির চারদিকে গোবর-জল ছিটিয়ে যান—সব শুদ্ধ হল। পূজার ফুল-পাতা সংগ্রহ করেন, ঘরদোর পরিষ্কার করেন। স্নান করে, নামাবলী গায়ে পূজোয় বসতেন। পাশে বসে তাঁর শিবপূজা দেখতাম, তাঁর কাছে ঘেঁষা তখন নিষেধ—আমি অস্নাত। একটি-একটি করে বেলপাতা বেছে নেন—পোকা-কাটা পাতা সরিয়ে

রাখেন। পূজার শেষে তাঁর স্বহস্তে নিরামিষ রান্না—বাঙাল বাড়ির সে 'মরিছ ঝোল' আশ্চর্য বস্তু! পাথরের থালা-বাসন থেকে এক-আধটুকু প্রসাদ না পেলে আমাদের চলত না। যতদূর জানি বৃদ্ধা জীবনে দুঃখই পেয়েছেন বেশি। অল্প বয়সেই স্বামী হারান তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা নিয়ে। একান্নবর্তী পরিবারে আশ্রয়ের অভাব হয় নি, ব্যক্তিত্বের তবু ছাঁটকাট হয়। এর পরে একমাত্র কন্যা (আমার পিসিমা) মাত্র একটি শিশুকন্যা কোলে নিয়ে বিধবা হলেন। অবশ্য ছেলেরা বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে ঠাকুরমায়ের অনেক দুঃখ মিটে গিয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ বৎসরটি আবার পুত্রশোকে তা চূর্ণ হয়ে যায়। শিবপূজার কালে ঠাকুরমাকে দেখতাম—মাঝে-মাঝে কী অস্পষ্ট কথা বলে ক্রন্দনে ভেঙে পড়তেন। বুঝতাম না—কী বলেন, কেন তাঁর দুঃখ। পরে শুনেছি—বহু পূর্বে কে নাকি গণনা করে বলেছিলেন তাঁর ভাগ্যে পুত্রশোকের সম্ভাবনা। গণনা জিনিসটা তাঁদের দিনে বেশ ফলত, আমাদের দিনে দেখছি তার না-ফলাই বেশি। তবে এক-আধটা ব্যতিক্রমও দেখেছি—দাদা (রঙীন হালদার) সেবার ম্যাট্রিক দিচ্ছেন, তখন তাঁর কোষ্ঠী একজন ভদ্রলোককে দেখানো হয়। তিনি কিন্তু গণৎকার নন, ব্যাবসায়ে মোক্তার, কোষ্ঠীবিচার তাঁর বিনি-পয়সার খেলা—যাক, তিনি বলেছিলেন "শিক্ষা বিজ্ঞান এর কর্ম।" বাড়ির সকলের ইচ্ছা ছিল—পাশ যদি করে তবে এ ছেলে ওকালতিই করবে, হবে কাকার সহকর্মী। তাঁরা বললেন, "শিক্ষা!—মাস্টারি?" আর একটু পরীক্ষা করে ভদ্রলোক জানালেন, "না, আরও উচ্চতর শিক্ষা মনে হয়।" এবার সকলের উচ্চহাস্য। কারণ, আর যাই হোক, রঙীন হালদার মহাশয় স্কুল জীবনে (পরে কলেজ জীবনেও) পাঠ্য বইএর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন সামান্য—ভালো পাশ করা অপেক্ষা একেবারে পাশ না করাও তাঁর পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি—আমাদের অভিভাবকরা আমাদের দিয়েছিলেন চরম স্বাধীনতা—পড়ো না-পড়ো যায় আসে না। কারণ, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন—আমাদের কিছু হবে না। প্রতিবেশীদের ছেলেরা যে প্রত্যেকে 'ভালো ছেলে', তা তাদের পিতারা যেমন সজোরে বলতেন, আমাদের বাড়ির কর্তারাও ধ্রুব বলে তা জানাতেন। তেমনি তাচ্ছিল্যভরেই কর্তারা স্থির করে রেখেছিলেন; "আমাদের এগুলোর কিছু হবে না।" আমার কাল পর্যন্তও এর ব্যতিক্রম হয় নি। আমরাও জানতাম—আমাদের কিছু হবে না। অথচ পরে দেখলাম,

আমার ব্যাপারে তাঁদের ধারণা—শুনেছি পরবর্তীকালে রচিত কর-কোষ্ঠীর গণনাও—মিথ্যা হয় নি, কিন্তু বাড়ির সকলের সম্বন্ধে তাই বলে তা সত্যও হয় নি—ম্যাট্রিক কেন, বি-এর দেউড়িও তো সকলেই পেরিয়ে গিয়েছি।—তারপরে কেউ কেউ আর জায়গা পাই নি জীবিকার রাজসভায়। আমি তো রোলিং স্টোন্। যাক্ সে কথা, কিন্তু আসল কথাটা এই, ভাগ্যগণনা জেনেই বা সেই বৃদ্ধা জননীর কী লাভ হল? দেবতার কাছে নিবেদন-ক্রন্দনও তো সফল হয় নি—পুত্রশোক তো পেলেনই। আর-একটি কথা বলে এখানেই ঠাকুরমায়ের কথা শেষ করি—তাঁর সেদিনের লক্ষ্মীর ঝুলি, হরীতকি কর্পূর প্রভৃতির কৌটো—রহস্যময় বস্তু থাক। আমার বিদ্যারম্ভের কালে প্রথম শিক্ষা হয়েছিল যেমন জেঠামশায়ের কাছে উঠোনে লেখা লিখে, আমার বাংলা-ইংরেজি হস্তলিপির দাগা-বুলোনোর কাজ হয়েছিল তেমনি ঠাকুরমায়ের সামনে—তিনি তা বসে বসে দেখতেন। মনে পড়ে ইংরেজি হস্তলিপি লিখছি—'পি', 'ও', 'এফ' প্রভৃতি অক্ষরগুলো যে মাত্রাচ্যুত তা ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা লক্ষ্য করে ফেললেন—"এ কি, মাত্রা ছেড়ে গিয়েছে যে।" সগর্বে জানালাম "এ ইংরেজি লেখা,—বাঙলা নয় যে, তুমি বুঝবে।" আজ জানি, ইংরেজ জাতটা মাত্রাজ্ঞানে বলিষ্ঠ, কিন্তু সেদিন ঠাকুরমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ওদের লেখা মাত্রা মানে না। হয়তো তাঁর বিবেচনায় তা সত্যই মনে হয়েছিল—এদেশে ইংরেজই রাজা তাদের মাত্রা মানতে হবে কেন? ঠাকুরমা ইংরেজি জানতেন না, নিঃসন্দেহ। বাঙলাই কি জানতেন? অনুমান করছি—উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষে তাঁর জন্ম (১৮৪০ ইং একটু আগে বা পরে)। বিক্রমপুরে, ব্রাহ্মণগৃহের শিক্ষা তাঁদের যা হয়েছে—হয়েছে মুখে মুখে—হাতে-কলমে—কালি-কলমে নয়। তবে আমার হস্তলিপিতে দাগ-বুলানোর বেলা তিনিই ছিলেন আমার 'গাইড'—এটুকু বুদ্ধি ও শিক্ষা তাঁর ছিল।

মা ও জেঠাইমাদের কালে (জন্ম যাদের ১৮৭০-৮৫ ইং'র মধ্যে) বাঙলা লেখাপড়া-জানা নিয়ম হয়ে পড়েছিল। তাঁরা সবাই তা জানতেন। সম্ভবত পরিবারের গুণে ও শহরে বসবাসের ফলে বেশ তাঁরা পড়তেন—লিখতেনও। সেদিকে আমার সেজ জেঠাইমা বেশি উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশ সুন্দরী ছিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন বললেও হয় না। বিদ্যা যেটুকু বাল্যে লাভ

করে থাকুন তার চেয়ে বেশি ছিল তার বিদ্যানুরাগ ও রসবোধ, গ্রহণশক্তি। সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা—তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববতী। ছেলেমেয়েরা কেউ-কেউ তা কিছুটা লাভ করেছেন (যেমন, রঙীন হালদার, প্রফুল্ল হালদার, বোনদের মধ্যে দু-জনা—একজনা স্বর্গীয়া ডাঃ লক্ষ্মী হালদার)। সবাই নয়, সবটাও কেউ নয়। বাড়ির ব্যবস্থা আয়োজন তিনিই প্রায় সকলকিছু করতেন—করতে জানতেন, ও করতে পারতেন। ব্রত-পূজায় ব্রতকথা যা তিনি বলতেন তা অপরেরা শুনত—তাঁর ঘরেই প্রতিবেশিনীদের হত সমাগম—দুপুরে, আত্মীয় কুটুম্বদেরও তিনিই জানাতেন সমাদর, আপ্যায়ন গৃহকর্ত্রীরূপে। ও পাড়ার মহিলাদের মধ্যে ভাগ্যবতী অনেকে ছিলেন, বুদ্ধিমতী, গর্বিতাও। কিন্তু সেজ জেঠাইমার মতো সামাজিকতার সঙ্গে আত্ম-সচেতনতা আর কারও ছিল না। কথায় ছিল সহজ স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু প্রয়োজনমতো খোঁচা তিনি দিতে জানতেন, প্রখর হতে পারতেন, কঠিন হতেও না পারতেন তা নয়। বাইরের পুরুষেরাও তাকে এজন্য ভয় করত, সম্মান করত, কারণ, তিনি অপ্রতিহতপ্রভাবা। এক কথায়, এ ব্যক্তিত্ব রাজ্যশাসন করতে পারত, এবং রাজ্যপালনও করতে পারত। যে ক্ষেত্রে তিনি পড়েছিলেন সেখানেও স্বাভাবিকভাবেই তিনি পরিবারের ছেলে-মেয়ে ও মহিলাদের শাসন করেছেন, এবং প্রাণপণে ছেলে-মেয়েদের পালনও করেছেন। শিক্ষাই কি কম দিয়েছেন আমাদেরকে ? সেদিনের বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের পরে বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মা জেঠাইমারা পড়েছিলেন ; মাইকেলকে নিয়ে অসুবিধায় পড়তেন। কিন্তু সে সবের রসগ্রহণ সেজ জেঠাইমা যে পুরোপুরি করেছিলেন আজও তাঁর কথার টুকরো থেকে তা বুঝতে পারি। ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ করে অমিয়নিমাইচরিত শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মতো বই আমাদের বাড়িতে সুলভ ছিল। জেঠাইমা তা পড়ে যে-আলোচনা মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে করতেন, তাতে আজও বুঝি তাঁর বোধশক্তি ছিল গভীর। আরেকটা কথাও বলতে হবে—এদেশের মানুষও যে আমাদের দর্শনের মূলতত্ত্ব সহজেই অনুধাবন করে ফেলেন—অদ্বৈতবাদ কী, আর দ্বৈতবাদই বা কী, গীতার নিষ্কাম কর্ম, বিশ্বরূপী দর্শন যে কী সত্য—এসব তাঁদের উপলব্ধি করতে কিছুই কষ্ট হয় না—সেজ জেঠাইমায়ের টুকরা-টুকরা কথা স্মরণ করলে আজও তা বুঝতে পারি। হয়তো চিরদিন পুরাণ ইতিহাস শুনতে-শুনতে এসব আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির

কতখানি গভীরতায় ও প্রসারতায় তা সম্ভব হয়। এই সেজ জেঠাইমা আমার কাছে এ সব নানা কারণে মায়ের থেকেও বেশি আপনার ছিলেন। হয়তো কথাটা বাড়াবাড়ি শোনাল। কিন্তু, না। আমি তাঁর কাছে এমনি আপনার ছিলাম। আজ বুঝি, প্রবল ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে দৌর্বল্য থাকা অনেক সময়েই সম্ভব, তা তাঁরও মধ্যে ছিল—কেউ-কেউ সে সুযোগও নিয়েছে, আবার কেউ-কেউ তাঁর কাছে বাধাও পেয়েছে। কিন্তু যারা আপনার হতে পেরেছে তারা পেয়েছে কী স্নেহ, কী সবল সহায়তা, বিপুল দাক্ষিণ্য, বুদ্ধি-মার্জিত শিক্ষা, বিদ্যানুরাগের স্বাভাবিক প্রেরণা—আমি তার একজন—পুত্রকন্যাদের সঙ্গে আমাকে তিনি বাল্য থেকে এক করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই আমি পরেও অনেক সময় কাটিয়েছি। অনেকেই তাই জানেন—রঙীন হালদার, প্রফুল্ল হালদার ও লক্ষ্মীর আমি সহোদর। আমরাও তাতে আপত্তি দেখি না। ওরা তিন সহোদর চার সহোদরা, আমরাও তাই—আরও তিন জেঠতুত বোনও আমাদের আছে; আগেই বলেছি, জন্মগত গণনায় এরূপই হয়। না হলে আর সকল দিকেই আমরা সহোদর।

বাং ১৩৩৯-এর বৈশাখী পূর্ণিমায় জেঠাইমা কলকাতায় নিউমোনিয়ায় মারা যান। তখন আমি আলিপুরে প্রেসিডেন্সি জেলে—জানতেও পারি নি। মাত্র দিন পনের পূর্বে তাঁকে শেষ দেখেছি—পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে তাদের গাড়িতে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। তিনি খবর পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে এসেছেন আমাকে দেখতে। তিনি ফুটপাতে, আমি গাড়িতে, কথা হয় নি, দেখা হয় চোখের।

ঠিক ত্রিশ বৎসর পরে গত বৎসর ১৩৬৯-এর বৈশাখী পূর্ণিমায় আমার মাও আমাদের ত্যাগ করে যান। বৈশাখী পূর্ণিমার থেকে পুণ্যদিন আমার মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই—বুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাভিনিষ্ক্রমণের দিন বৈশাখী পূর্ণিমা।] জেঠাইমার তুলনায় মা নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্বে সামান্য। আসলে মা কোনোদিকে অসামান্যা ছিলেন না। রূপে না, বিদ্যায় না, বুদ্ধিতে না, কর্মনৈপুণ্যেও না। তিনিও পড়তেন, লিখতেন, কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্য তেমন ছিল না, ব্যক্তিত্ব ছিল না প্রবল, কথা সতেজ। সাধারণ দশজন বাঙালী মায়ের মতোই তিনি দেখতে শুনতে। তবু তাঁকে অসামান্য মনে হত কেন? মা বলে? এ কথাটাও ঠিক। ফেণী কলেজের

আমার অধ্যাপক-বন্ধুরা একবার বিশেষ একটু নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন—মা তখন কদিনের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন; বন্ধুরা বললেন, মা-রূপে তাঁকে দেখে তাঁরা বিশেষ ইম্প্রেশড হয়েছেন। প্রতিবেশিনীদের একাধিকের কাছে তিনি সুবাদে মা; অনুগতদের মধ্যে পুত্রসংখ্যাও কিছু ছিল। অর্থাৎ, মায়ের মা-ছাড়া আর কোনো অসাধারণ পরিচয় ছিল না। এরূপ প্রকাশের আরও একটা কারণ ছিল। তখনো মায়ের জীবনে দুঃখ-ক্লেশের ছায়া ঘনিয়ে আসে নি। তিনি জন্মেছিলেন সুসম্পন্ন সংসারে। তাঁর পিতা সেদিনের আবগারী দারোগা—আমি তাঁকে দেখেছি বৃদ্ধ অচল। কিন্তু কর্মজীবনে তিনি দারোগার মতো ধনার্জন করেছিলেন, অথচ তা সঞ্চয় করেছিলেন হিসাবী মানুষের মতো। কার্পণ্যে কিন্তু মোটা হিসাবে তাঁর মারাত্মক ভুলও হয়। তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বোঝা গিয়েছিল। প্রথমত তিনি বড় কন্যাকে বড় কুলীনে পাত্রস্থ করে ঘরজামাই আনলেন এক কুলীন পুত্রকে। এ ভুলই যথেষ্ট হত। তারও পরে একমাত্র পুত্রের আকস্মিক বিয়োগে তিনি শোকার্তা স্ত্রীর সান্ত্বনার জন্য গ্রহণ করলেন দত্তক। তৃতীয় ভুলটা আরও করুণ। স্বল্প পরেই প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগে তিনি লুকিয়ে গঙ্গাপার থেকে বিয়ে করে আনেন সুরূপা, পশ্চিমবঙ্গীয়া দ্বিতীয়া স্ত্রী। পাত্রীটিও নিতান্ত বালিকা ছিলেন না। গ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিষয়ী লোককে অপদস্থ করবার জন্য বললেন—তিনি বিধবা। একঘরেও তাঁদের করলেন। কিন্তু তাতে ঠেকানো গেল না। একটি পুত্রও সেই নতুন পত্নীর গর্ভে তাঁর লাভ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছ-সাত বৎসর বয়সে সে পুত্রও মারা যায়। আর, তখন এই পাণ্ডববর্জিত রাজ্যের স্বজনহীন পুরী ছেড়ে সেই স্ত্রী যতটা সম্ভব অলঙ্কার ও পয়সাকড়ি সংগ্রহ করে পিত্রালয়ে চলে যান—আর এদিকে তিনি আসেন নি। কাজেই, শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্তী যখন মারা গেলেন (সে বোধহয় ১৯১৩-১৪ ইং সাল), তখন তাঁর সম্পত্তি নষ্ট করবার মতো লোকের অভাব হল না। অনতিবিলম্বেই তা সমাধা হল। অবশ্য এসব অনেক পরের কথা। আমার মা জন্মেন ও পালিত হন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। ঘরে তখন সবে বিমাতা এসেছেন, কিন্তু ধনজন, বিষয়-সম্পত্তি, দোতলা বাড়ি—কিছুরই তাঁদের অভাব ছিল না। সে তুলনায় তাঁর পতিকুল ছিল সৌভাগ্যে খর্বিত। সেখানে ছোট বউ হিসাবে শাশুড়ির নিকট মা বরাবর স্নেহ ও আদর পেয়েছেন, কিন্তু বাড়িতে

ছোট বউদের প্রতিষ্ঠা পাবার কথা নয়। তিনিও পান নি। অথচ আত্মমর্যাদাবোধ তখন সকল দিকে দেখা দিয়েছে। গ্রামের বাড়িতে তার প্রকাশের অবকাশ না থাক, শহরের জীবনে কিন্তু সে অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে। তবু নিজের জোরে তাতে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো প্রকাশ্য চেষ্টা দেখা দেয় নি। আর মায়ের সেই জোরও ছিল না—তিনি অসামান্যা নন। বাড়ির ছোট বউ হিসাবে তাঁকে চলতে হয়েছে মুখ বুজে, কাজ করতে হয়েছে মাথা গুঁজে, কথা বলতে হয়েছে ভয়ে দ্বিধায়। আমার তো শৈশবের প্রথম স্মৃতি এই—মা আমাকে ফেলে রেখে রান্নাঘরে রাঁধতে গিয়েছেন। কেঁদে আপত্তি করে কোনো ফল পাচ্ছি না—বরং অসাবধানতায় তক্তপোশ থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেলাম। তাতেই মা রান্না ছেড়ে ছুটে এসে কোলে নিলেন। এবং বোধহয় আমাকে ঘুম পাড়িয়ে আবার গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে। "মা রাঁধে, গোপাল কাঁদে"—এইটাই আমার কানে কোন্ গৃহচ্ছবির ছন্দোবদ্ধ প্রথম রচনা। তার মধ্য দিয়ে ছন্দের ইন্দ্রজাল অনুভব করি নি, দেখেছি ক্ষোভ, আপত্তি, বেদনায় ব্যাহত শিশুহৃদয়ের স্নেহাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। একটার পর একটা পর্ব পেরিয়ে কিন্তু মাও শেষ পর্যন্ত প্রকাশের অবকাশ পেলেন। তখন বাবা প্রতিষ্ঠাবান, মা প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন, আমরাও বড় হয়েছি—পরিবেশই যেন তাঁকে অভিষিক্ত করলে মর্যাদায়। দশজনকে খাওয়াতে পরাতে তখন তাঁর আনন্দ, সকলের প্রতি তিনি দাক্ষিণ্যময়ী। মাত্র দশ-বারো বৎসর তিনি এই মায়ের সৌভাগ্য উপভোগ করেছেন। তারপরে প্রথম বাবা মারা গেলেন। তারপর আমি তাঁদের সকল আশা চূর্ণ করে জেলে চলে গেলাম। অন্য দু-ছেলেকে মা যতই এ দুর্দিনে স্নেহের আঁচলে ঘিরে মানুষ করতে গেলেন ততই তারা দায়িত্ব গ্রহণ না করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আর আমি যখন ফিরে এলাম তখন আমিই কি দায়িত্ব স্বীকার করলাম? দেশোদ্ধারে আমার তখন নেশা লেগেছে। মা অর্থহীন, বিষয়হীন, অনেকাংশে অসহায়। এই পরিবেশেই মা দিনদিন ক্ষয় হয়ে গেলেন। খুইয়ে ফেললেন সেই প্রসন্ন মাতৃরূপ। রোগে, পীড়ায়, শোকে-তাপে একটু-একটু করে তিনি—বিশেষ করে আমাদের—পুত্রদেরই সৃষ্ট নানা ঝঞ্ঝাটে ক্রমশ হয়ে গেলেন বিষণ্ণ, সদা-ব্যাহত এক অসহায় বৃদ্ধা—নিজেকেও পীড়া দিচ্ছেন, পরকেও পীড়াদান করছেন। শান্তি পেলেন যখন চরম শান্তি পাবার কথা তখন। ধরা পড়ল, তিনি ক্যানসার

রোগাক্রান্ত। সে অসহনীয় যাতনার চিন্তাতে যখন আমি বিচলিত ও বিমূঢ়, ভাগ্যবশে সে রোগ ও তার যন্ত্রণা আরোগ্যের পূর্বেই মা হাসপাতালে চেতনা হারালেন। তারপর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেলেন—সম্ভবত রক্তের চাপে ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতায়। মা বাঁচলেন, আমরাও।

সরল, সাধারণ বাঙালী মায়ের মধ্যেও যে অসামান্য সত্তা বিকশিত হয়েছিল, ভাগ্যের চক্রান্তে তা নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে দেখলাম—কিন্তু তাই বলে কি তা মিথ্যা? যা বুঝেছি, ওঁদের কালটা সংসারের কাছে মেয়েদের নিঃশেষে দেবার কাল—পাবার কাল নয়। কিন্তু পাবার দাবিটাও সমাজের মধ্যে দেখা দিচ্ছে—'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা'—এ নিয়মটাকে বিধিলিপি বলে অকুণ্ঠিতে মেনে নিতে পারছেন না। তবু রাঁধা-বাড়াই তাদের অভ্যাসগত থেকে স্বভাবগত। সৌভাগ্যের দিনে বামুন-চাকর থাকলেও ওঁরা অন্তত একবেলা রাঁধবেন। গৃহকর্ম খুঁজে বার করবেন। কিছু না থাকলে বড়ি দেবেন, আচার তৈরি করবেন, উপকরণ জোগাড় করে করবেন পিঠে-পায়েস, নারকেলের নাড়ু; পুডিং পর্যন্তও মায়ের হাতে উতরেছিল। মেজ জেঠাইমার মতো পায়েস কিন্তু কেউ রাঁধতে জানতেন না—মাংসেও তাঁর হাত ছিল। মাও মাছ-মাংস, বিশেষ করে মাছের কালিয়া, ভালো রাঁধতেন। তাঁর বিশেষত্ব ছিল শুকতো, তিতার ডাল, লাউ বা পেঁপের তিতার ঝোলে। আঃ, সেই হারানো রন্ধন-কলা—দি লস্ট আর্টস অব বেঙ্গল। মাঘমণ্ডল, তারাব্রত, পুণ্যিপুকুরের মতো, গোবর-নিকানো মাটির ঘরে ভক্তিতে আঁকা আলপনার মতো, সেই শুকতো, সেই তিতার ঝোল আজ বাঙাল বাড়িতেও 'লুপ্তশিল্পকলা।'

তাস খেলা পূর্ববাঙ্‌লার অন্তঃপুরে তখনো ঢোকে নি, কড়ি, দশ-পঁচিশ, বাঘবন্দীই ছিল তাঁদের খেলা। বরং রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে ঢুকেছিল বঙ্কিমসাহিত্য। অবশ্য দেখতে-দেখতে এসে গিয়েছিল রবীন্দ্রযুগ—বাবার সময়ে 'প্রবাসী'ই ছিল আমাদের বাড়িতে তার প্রধান বাহন। প্রথম মহাযুদ্ধেই বাঙলা সাপ্তাহিক অচল হয়ে পড়ে, এল বাঙলা দৈনিক। ছেলেরা যখন রাজনীতিতে 'পাগলামো' করছে, মায়েদের পক্ষে তার হেরফের না বুঝলেও তার ঠিকানা খোঁজা প্রায় দুর্বার হয়ে পড়ল। কোথায় কী অঘটন ঘটল, তা পড়ে মায়ের ভয়, বাবারও—বুঝি আমি তাতে জড়িয়ে পড়ছি। খবরের কাগজ না পড়লেও নয়, পড়লেই দুশ্চিন্তা। পুলিশ বাড়ির কাছ

দিয়ে গেলে তাঁর আশঙ্কা। পুলিশের কালো গাড়িগুলো বাড়ির সামনেকার বড় সড়ক দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন তাঁর বুক কাঁপছে। বলতেন, "আমার যেন চোরের মায়ের অবস্থা। কাঁদতেও পারি না—সইতেও পারি না।" আমার সহকর্মীরা প্রত্যেকে তাঁর সন্দেহভাজন—অথচ স্নেহভাজনও। আমাকে তারাই বিপদে জড়াচ্ছে; কিন্তু বিপদে যে তারাও জড়িত, তাও বুঝতেন। জেলে যখন ছিলাম অনুমতি পেলে যে করে হোক মা জেলে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, সকাল থেকে সে আয়োজন—আর ফিরে গিয়ে রাতভর সেই স্মৃতিমন্থন। তবু দেখতে-দেখতে পড়তে-পড়তে কেমন সবই আবার সওয়া হয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা এল, নতুন কী নিয়ে এল? খুঁজে পান না। সত্তর পেরিয়েও ভাঙা চশমা সুতোয় বেঁধে যেমন করে হোক দুপুর-ব্যাপী পড়বেন 'স্বাধীনতা'—আর পড়ে বলবেন, "ধর্মঘট, ধর্মঘট, ধর্মঘটের কাগজ।" আশী বৎসরে হাসপাতালে শেষ শয্যায় তাঁর প্রধান অভিযোগ—খবরের কাগজও পড়তে পাচ্ছি না। যখন দেখি কোন্‌খান থেকে ওঁরা জীবন আরম্ভ করে কোন্‌খানে এসে তা শেষ করলেন, তখন বুঝি দেশের ইতিহাস ওদেরও ছেঁকে, নিংড়ে নিঃশেষ করে দিতে ছাড়ে নি—কিন্তু সে সত্য চোখে পড়ে কার? আমাদের ছেলেদের অন্তত নয়—কারণ, আমাদের ভাবনা—আমার জীবন। মায়ের সম্বন্ধে আমার প্রথম স্মৃতি: "মা রাঁধে। গোপাল কাঁদে" আর শেষ উপলব্ধি: "গোপাল কাঁদে। মা কাঁদে"। জীবনের ফাঁদে ছেলেরা পা দেবেই আর মায়েরা কাঁদবে।

(ক্রমশ)

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান

বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) নাম স্মরণীয়। শুধু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে নয়, সমসাময়িক কালের বাংলা দেশে তাঁর মতো বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিল সুদুর্লভ। উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও রাজা রামমোহনের (১৭৭২-১৮৩৩) যুগে জন্মগ্রহণ করায় উত্তরকালে মৃত্যুঞ্জয়ের যশ ও খ্যাতি অবশ্যই অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সমকালীন ব্যক্তিরা তাঁকে কতটা সম্মান করতেন তা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের প্রশস্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। মার্শম্যান তাঁর বিখ্যাত বই *The Life And Times of Carey, Marshman and Ward*-এর প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৮০) মৃত্যুঞ্জয়কে "The Boethius of the country", "a colossus in literature" ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করে লিখছেন, "He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson] not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanskrit classics was unrivalled and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour."

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভূমিকাতেও মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে "one of the most profound scholars of the age" বলে বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি যে সে-যুগে বহুবিস্তৃত ছিল তা তাঁর প্রতিপক্ষীয় রামমোহনের উক্তি থেকেও জানা যায়। নব্য ন্যায় ও স্মৃতির প্রভাবে বাংলা দেশে যখন উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের চর্চা লুপ্তপ্রায় তখন যে কয়জন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ঐ দুই শাস্ত্রের অনুশীলনের

ধারা বজায় রেখেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় তাঁদের অন্যতম (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭)।

হিন্দু শাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের এই গভীর জ্ঞানের জন্যই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হিন্দু বিধবাদের সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিন্দু বিধবাদের স্বামীর সহিত সহমরণ অপরিহার্য নয়, ঐচ্ছিক মাত্র, এবং বেদান্তের দৃষ্টিতে সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্য পালনই তাঁদের পক্ষে শ্রেয়স্কর—বহু শাস্ত্র মন্থন করে মৃত্যুঞ্জয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন (*Parliamentary Papers : Commons : 1821, Vol. XVIII, pp. 119-125*)। লক্ষ্যণীয় এই যে রামমোহনের সহমরণ বিষয়ে প্রথম পুস্তিকা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) তখনো আত্মপ্রকাশ করে নি। অবশ্য হিন্দু সমাজে সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করে রামমোহন সে যুগে যে অসাধারণ মনোবল দেখিয়েছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে সে-মনোবলের পরিচয় কোনোদিনই মেলে না। সে যুগের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, যথা হিন্দু-কলেজ, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গেও মৃত্যুঞ্জয়ের অল্পবিস্তর যোগাযোগ ছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৷৵০)। বিস্ময়কর প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের অবদান কতটা মূল্যবান সে বিষয়ে কিন্তু এখনো যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

দুই

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কেরীর কলেজের অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ বিভাগের প্রধান পণ্ডিত রূপে নিযুক্ত হন। ১৮০২ থেকে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত হয়—'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) ও 'রাজাবলি' (১৮০৮)। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ধর্মমত খণ্ডন করার জন্য তিনি 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' বা *An Apology For the Present System of Hindoo Worship* রচনা করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ তত দিনে ছিন্ন হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় তখন কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত। খুব সম্ভব ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই (ঐ বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন হয়) ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের ছাত্রদের জন্য 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামে আরো একখানি বই তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু সে-বই প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে। এই পাঁচটি বইএর মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের স্বনামে প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের তালিকা সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্যভাষা সংগ্রহ' (১৮১৮) নামে একটি অনুবাদ রচনার কাজে ও উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১) পুস্তিকা সঙ্কলনের ব্যাপারেও বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয় কিছুটা সাহায্য করেছিলেন ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ।।৶০-৸০, ও সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', পৃঃ ১০৯)। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিচারে শেষোক্ত দুটি পুস্তিকাকে অবশ্যই গণ্য করা চলে না। স্বনামে প্রকাশিত পাঁচটি বইএর মধ্যে 'রাজাবলি', 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' এই তিনটিই মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা। বাকি দুটি, অর্থাৎ 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত বইএর অনুবাদ মাত্র।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদি যুগের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় যে বিশেষ স্মরণীয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা হরফে ছাপা, বাঙালীর লেখা প্রথম গদ্যপুস্তক, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনা 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর মাত্র এক বৎসর আগে প্রকাশিত হয়। রামমোহনের আগে বাংলা গদ্যসাহিত্যের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বই লেখেন। তাঁর লেখা 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক (কলিযুগের সূচনা থেকে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন পর্যন্ত) ইতিহাস, যদিও আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে একে ইতিহাস বলা চলে কিনা সন্দেহ। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) এবং বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি স্থানীয় রাজারাও এই 'ইতিহাস'-এর কল্যাণে 'দিল্লীশ্বর'-এর মর্যাদা লাভ করেছেন ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ১২৩, ১৩৭-৩৮)। একমাত্র 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বাদ দিলে মৃত্যুঞ্জয়ের অধিকাংশ রচনাই কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের পর্যায়ভুক্ত। 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করে লেখক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দুশো টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করেও তিনি যে অনুরূপ পারিশ্রমিক আশা করেছিলেন তা উইলিয়ম কেরীর লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ।৶০, ৸০-৸৶০)। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বেদান্ত দর্শনে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক হলেও

তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার নিদর্শন বহন করে না। পথিকৃৎ-এর প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার পর সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের স্থান তাহলে কোথায়?

তিন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের কাছে উপহাসের বস্তু বলেই বিবেচিত হত। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বইএ লেখেন, মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষা "সংস্কৃতাশ্রয়ী, কিন্তু নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও নীরস। কোন কোন স্থান দীর্ঘ সমাস সমন্বিত এবং নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দ দ্বারা গ্রথিত, আবার কোনো কোনো স্থান একান্ত অপভ্রংশ পদ দ্বারা বিরচিত। কোন কোন স্থলে বাক্যের দীর্ঘতা ও বিশৃঙ্খলতার জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠে না।" অবশ্য লেখকের মতে মৃত্যুঞ্জয়ের যুগে এই রকম ভাষা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২০৬-২০৭)। সে যুগের অপর একজন সাহিত্য-সমালোচক, রাজনারায়ণ বসু তাঁর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় (১৮৭৮) 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' ইত্যাদি প্রাক্-রামমোহন যুগের বাংলা গদ্যরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন (পৃঃ ২২): "উল্লিখিত গ্রন্থসকল এমন অপকৃষ্ট বাংলা ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা বলিলে অন্যায় হয় না।" দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' রামরাম বসুকে সাহিত্যশিল্পী হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর মধ্যে রাম বসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করেছেন সত্য কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ পণ্ডিতের রচনায় সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের যে বিকট সমন্বয় দেখা যায় তার তুলনায় রাম বসুর মুসলমানী শব্দের ঘটা অতি অল্প। "সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মত তিনি [রামরাম বসু] তাঁহার উপহাসাস্পদ পাণ্ডিত্যের ভুঁড়ি বাহির করিয়া সাহিত্যের আসরে আসেন নাই।" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নবম সংস্করণ, সন ১৩৫৬, পৃঃ ৩৭৬) ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* (Calcutta, 1919) বইটিতে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সম্বন্ধে এই ধারণাকেই আরো দৃঢ় করেছেন। তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'ও "wholly devoid of all

artistic instincts of proportion or arrangement." (p. 219)। এর মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষারীতি স্থান পেয়েছে ডক্টর দের মতে সেগুলি বইটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে নি ("sudden and ludicrous descent from the most pedantic and laboured language to the extreme vulgarity of the popular dialect.")।

আধুনিক কালে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতবাদ কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচকের লেখনীমুখে দেখা দিয়েছে। খুব সম্ভব বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল'-ই প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন ১৩২১ সালে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র গদ্য প্রমথ চৌধুরীর মতে মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব রচনা নয়। "'দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।...নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা, তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষার আদি-লেখক—অপর দিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক।" মৃত্যুঞ্জয়ের চলিত ভাষা, প্রমথ চৌধুরীর মতে, "সজীব, সতেজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত ;—ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই" ('সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২১, পৃঃ ৭৮০-৭৮২)। প্রমথ চৌধুরীর এই মতবাদ পরবর্তী যুগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ "সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-এর জীবনীতে (কলিকাতা, ১৩৫২ সন) ও তাঁর সম্পাদিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র (কলিকাতা, ১৩৪৬ সন) ভূমিকায় খুব স্পষ্ট ভাষায় এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে বাংলা গদ্যের নিতান্ত শৈশবকালেই মৃত্যুঞ্জয় বিভিন্ন গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বই বিভিন্ন রীতিতে রচনা করে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় স্বভাবতই যতদূর সম্ভব সংস্কৃত রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। সাধু ও চলিত এই দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য বাংলা দেশে সর্বপ্রথম তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন, "তিনিই বাংলা গদ্যের সর্বপ্রথম

কন্‌শাস আর্টিস্ট" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা : 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৮, ৩৬)। 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন যে সাহিত্যিক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতিলোপের প্রধান কারণ তাঁর ধর্মমত এবং পরবর্তী যুগে "প্রগতিপন্থী সমাজের সক্ষম প্রচার।" (পৃঃ ।/০, ১/০)। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রামমোহনই যে লেখকের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর রামমোহন-জীবনীতেও (সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১৬: 'রামমোহন রায়', পৃঃ ৭১) "বাংলা গদ্য সম্পর্কে রামমোহনের কীর্তি সামান্য নয়" এ-কথাটুকু স্বীকার করার আগেই ঘোষণা করেছেন, বাংলা গদ্যের "স্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তাঁহার [মৃত্যুঞ্জয়ের] দাবী সর্বাগ্রে।" সজনীকান্তের মতে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষাতে মৌখিক রীতি, সাধু বা সাহিত্যিক রীতি এবং সংস্কৃত রীতি, এই তিন রীতির নিদর্শন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৌখিক রীতির প্রতিই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবণতা ছিল। "বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পিরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা নিবেদন করিতেই হইবে।" মৃত্যুঞ্জয়ের সাধু ভাষাই পরে উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করে শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতিতে স্থায়ী হয় (সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'— প্রথম খণ্ড; কলিকাতা, ১৩৫৩ সন; পৃঃ ১৫৭-১৬৫)। ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত-এর পরবর্তী সাহিত্যসমালোচকদের অধিকাংশই এই দুই গবেষকের রায়কে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যে" (কলিকাতা, ১৩৬৩ সন) বলছেন, "মৃত্যুঞ্জয় বাস্তবিক নিপুণ ভাষাশিল্পী ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতান্বিত বাংলা গদ্য সমাস-সন্ধি-জড়িত ও দীর্ঘ-পদবিন্যাসবহুল হইলেও তাহার অন্বয় ও অর্থবোধ আদৌ দুর্বোধ্য নহে।" তারপর সজনীকান্তের প্রতিধ্বনি করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের ভাবী সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল এ কথা অবশ্য স্বীকার্য" (পৃঃ ১০৯-১১০)। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন বা মৌখিক রীতির প্রতিই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এ কথা অসিতকুমার কোথাও স্পষ্টভাবে বলেন নি, কিন্তু কেরী সাহেবের 'কথোপকথনে' (১৮০১) "চলিত ভাষার যে বলিষ্ঠ ও অমার্জিত রূপ দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে শিল্পীচেতনার সাহায্যে আস্বাদ্যমান অনুভূতিতে পরিণত করেন" [পৃঃ ১১২), এ-কথা তিনি অসঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন।

চার

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরচনা সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকদের মতবাদ প্রধানত তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'কে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হলেও এর মধ্যে কোথাও মৌখিক ভাষার প্রতি লেখকের প্রবণতা দেখা যায় না। সে যুগের কথকতার ভঙ্গীতে বইটি লেখা হয়েছে।... "শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়।...রাজসভাতে প্রত্যহ শত ২ বেদজ্ঞ বেদান্তী, মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির ধনন্তরি প্রভৃতি বসেন" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৭)।

'হিতোপদেশে'র ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী, কোথাও কোথাও সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ; আধুনিক বাংলা গদ্যের সঙ্গে এর যোগসূত্র অতি ক্ষীণ।... "আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধলোকের বাক্য গ্রাহ্য হয় আর অন্যত্রও বিচারক্রমে গ্রাহ্য হয় কিন্তু ভোজন বিষয়ে গ্রাহ্য নয়, যেহেতুক পৃথিবীমণ্ডলে সকল অন্ন ও জলাদি আশঙ্কা কর্তৃক ব্যাপ্ত তাহাতে কোথা প্রবৃত্তি কর্তব্যা কি প্রকারে বা জীবন ধারণ কর্তব্য। সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের কর্তৃক কথিত হইয়াছে ঈর্ষাবিশিষ্ট ও ঘৃণাযুক্ত ও অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ও সর্বদা সশঙ্ক আর পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় জন দুঃখভাগী হয়" (ঐ, পৃঃ ৫৫)। অথবা—"দমনক বলিতেছে 'তথাপি স্বামীর চেষ্টানিরূপণ সেবকের অবশ্য কর্তব্য করটক বলিতেছে সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত যে প্রধান মন্ত্রী সেই করুক যেহেতু ভৃত্যদের পরাধিকার চর্চা কোন প্রকারে কর্তব্য নহে দেখ যে জন প্রভু হিতেচ্ছাতে পরাধিকার চর্চা করে সে বিষণ্ণ হয় যেমন চীৎকারেতে গর্দভ তাড়িত হইয়াছিল। দমনক প্রশ্ন করিতেছে ইহা কি প্রকার করটক কহিতেছে" (ঐ, পৃঃ ৭২)। অথচ 'হিতোপদেশ' 'বত্রিশ সিংহাসনে'র প্রায় ছয় বৎসর পরে লেখা। অন্তত এই ছয় বৎসরের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় যে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছু করেন নি সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সজনীকান্তের মতে সমসাময়িক লেখক গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ'-ও

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার তুলনায় অনেক সুখপাঠ্য ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)।

'রাজাবলি'র সর্বত্র এক ভাষারীতি অনুসরণ করা হয় নি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় লেখা, কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করতে বসে লেখককে বহু মুসলমানী শব্দের সাহায্য নিতে হয়েছে।··· "তদনন্তর নবাব জাফরালী খাঁ নন্দকুমারকে রাজগী খেতাব দিয়া রাজা কুঞ্জবিহারিকে তগীর করিয়া তাঁহাকে রায় রাযাঁ কার্য্যে মোকরর করিলেন কিন্তু মহারাজা দুর্লভরামের অনুরোধে সাহেব লোকেরদের ইচ্ছামতে কুল্লের নাএব সুবেদারী কার্য্যে কেহ মোকরর হইল না।" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ১৮৮)। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সঙ্গে এর তুলনা চলে। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসের সর্বত্রও আবার এ ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। আকবরের সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় লিখেছেন, "আর ইঁহার শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য গুণজ্ঞতা গুণগ্রাহকতা দোষত্যাগিতা শিষ্টসমাদরকারিতা দুষ্টবিনাশকারিতা বিদ্যামোদিতা দীনদয়ালুতা দুঃখিজনবন্ধুতা ধনিজনরক্ষকতা বক্তৃতা রসিকতা দাতৃতা ধার্মিকতা প্রজামনোরঞ্জকতা সাহসিকতা সদোৎসাহিতা নিত্যোদম-কারিতা মাতাপিতৃভক্তা পরমেশ্বরানুরাগিতা প্রভৃতি উত্তম গুণের কথা আমি কত লিখিব···শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে আকবর শাহের সম সম্রাট আর কেহ হয় নাহি" (ঐ, পৃঃ ১৬৪)। কোথাও আবার একই বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়।—"সুলতান জলালুদ্দীন মহম্মদ আকবর বাদশাহ হইলে বয়রম খাঁ খানখানার পরামর্শে লাহোরের নিকট কলানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ নয় শত তেষট্টি হিজরি সনে জলুস করিলেন ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারি করিলেন হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাত প্রভৃতি অনেক দেশ অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন ও অনেক প্রধান লোক স্বত ইঁহার অনুগত হইল। আর আকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহার নামেতেই জয় হইতে লাগিল···" (ঐ, পৃঃ ১৬৩)। ভাষার ক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ নৈরাজ্য কি মৃত্যুঞ্জয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল? সাহিত্যিক উৎকর্ষ বইটির প্রায় কিছুই নেই বলা চলে। ইতিহাস-গোত্রীয় রচনা হলেও এর মধ্যে বহু কাহিনী বা জনশ্রুতি স্থান পেয়েছে—বিশেষত প্রাচীন যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে।

'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষা এতই উৎকট সংস্কৃতাশ্রয়ী যে, যে-রামমোহনের

রচনা আধুনিক কালের বাংলা পাঠকদের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য, তিনিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন নি ('রামমোহন গ্রন্থাবলী', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫)—"অতএব বেদান্ত পরম প্রতিপাদ্য যে ত্রিগুণাতীত তুরীয় জীবব্রহ্মৈক্য শুদ্ধচৈতন্য তিনি স্বরূপতঃ জ্ঞেয়মাত্র স্বশক্তিকৃত ঔপাধিক জগৎকারণাদি স্তম্বপর্যন্ত রূপোপাসনাতে পরম্পরাতেই উপাসিত হন সাক্ষাৎ উপাসিত হন না…"('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২০৬)। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বইটি এই ভাষাতেই লেখা। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'ই মৃত্যুঞ্জয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

লেখকের শেষ প্রকাশিত বই 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'-ও মূলত সাধুভাষা বা সংস্কৃতানুগ ভাষায় লেখা, যদিও এর কোনো কোনো অংশে মৌখিক রীতির প্রয়োগ দেখা যায় (বিশেষত তৃতীয় 'স্তবকে')। বাংলা গদ্য রচনা সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের আদর্শ কি ছিল আমরা সেটা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারি। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, "এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা…। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা সর্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্যহেতুক" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী' পৃঃ ২২৩)। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের রচনাশৈলী যে প্রায় সর্বত্র সংস্কৃতানুগ হয়েছে তাতে সুতরাং বিস্ময়ের কিছুই নেই। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সমাপ্তিতে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনকে লৌকিক ভাষায় বেদান্ত ব্যাখ্যা করার জন্য তীব্র আক্রমণ করেছেন।…"আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে।" তারপর অশ্লীল উপমা প্রয়োগ করে তিনি নিজের বক্তব্য আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,—"আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর-পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন" (ঐ, পৃঃ ২১৩)। তাঁর নিজের রচনাশৈলী সম্বন্ধে আধুনিক সাহিত্য সমালোচকদের রায় শুনলে সংস্কৃতাভিমানী মৃত্যুঞ্জয় খুব খুশি হতেন কি না সন্দেহ! 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় 'স্তবক', প্রথম 'কুসুমে' (ঐ, পৃঃ ২৪৩-২৪৬) মৃত্যুঞ্জয় বাংলা বাক্য রচনার নানা রীতি ও তাদের দোষগুণ নিয়ে বিশদ

আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও চলিত বা মৌখিক ভাষায় বাক্য রচনার রীতি শিক্ষা দেন নি। তার কারণ, তাঁর যুগে সেটা সত্যই অভাবনীয় ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, "কোকিলকুল-কলালাপবাচাল্ যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে", এই বাক্যটি মৃত্যুঞ্জয় "মধ্যমপ্রাণাক্ষরবহুলা বাণী"র উদাহরণ স্বরূপই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে-মৃত্যুঞ্জয় নিজে এই ধরনের বাক্য রচনার নিন্দা করেন নি, বরং তিনি বলেছেন, "এতদ্রূপ বৈষম্য দোষরহিত যে বাক্য সে সাম্যগুণবৎ বাক্য হয়" (ঐ, পৃঃ ২৪৪)। ব্রজেন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের এই মন্তব্যটুকু আর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নি (ঐ, ভূমিকা, পৃঃ ১/০)।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র কোনো কোনো অংশে অবশ্যই মৃত্যুঞ্জয় মৌখিক বা চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচনার উদ্দেশ্য জানতে হয়। বইটির মুখবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় নিজেই জানিয়েছেন যে "সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ রচিতেছেন" (ঐ, পৃঃ ২২৩)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই বইটি লেখা হয়েছিল, যদিও দুঃখের বিষয় মৃত্যুঞ্জয় তাঁর জীবদ্দশায় এটি প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত ছিল, এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে যুগে বইটির বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে বাংলা গদ্যের আদি যুগের লেখককে সম্মানিত করেছিলেন (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৭)। এই ছাত্রপাঠ্য বইটি লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লিখিত ও কথ্য বাংলার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নবাগত বিদেশী ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মার্শ্‌ম্যান সাহেব বইটির ভূমিকায় লিখেছেন :

"The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour."
('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২১৭)। ভাষাশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় নিজেই বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করতে বসেছিলেন এ কথা মার্শ্‌ম্যান

বলেন নি। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় চলিত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে,—স্ত্রীলোক, নিম্ন শ্রেণীর লোক ও মনুষ্যেতর প্রাণীর কথোপকথনে,—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ভাষা গ্রাম্যতা অথবা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২৫৯-২৬৩, ২৮৯-৯০ ইত্যাদি)। অন্যত্র মৃত্যুঞ্জয় শুধু সংস্কৃতানুগ সাধুভাষারই প্রয়োগ করেছেন, যদিও সে ভাষা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষার মতো দুর্বোধ্য নয়।

উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন'-ও (১৮০১) ঠিক ঐ আদর্শে লেখা হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে বাংলা সাহিত্যের "প্রথম কন্‌শাস আর্টিস্ট" বললে কেরীকে ঐ সম্মান তাঁর আগেই দিতে হয়। অবশ্য 'কথোপকথনে'র তুলনায় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি জড়তামুক্ত। আসলে কেরী এবং মৃত্যুঞ্জয় উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তাঁদের পাঠকবর্গের (মুখ্যতঃ, বিদেশী ছাত্রদের) পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাঁরা নিজেরা ঐ সব বিভিন্ন ভাষারীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এ কথা মনে করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

মৃত্যুঞ্জয় যদি সত্যই সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করতে আগ্রহী হতেন তাহলে তাঁর লেখনী থেকে আদ্যোপান্ত মৌখিক ভাষায় লেখা অন্তত একটি পুস্তিকাও আমরা পেতাম। তার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি একই বই-এর, এবং কোথাও কোথাও একই অনুচ্ছেদের, ভিতর সাধু ও চলিত ভাষার এক বিচিত্র বিসদৃশ সংমিশ্রণ, যাকে মৃত্যুঞ্জয়ের শিল্পী প্রতিভার পরিচয় বলে মনে করা সত্যই কঠিন। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সর্বত্রই দুর্বোধ্য বা অপাঠ্য এ অভিযোগ নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র কোনো কোনো অংশে সাহিত্যের আস্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, অথবা মৌখিক ভাষার প্রতিই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, এ কথা ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের রায় সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের যুগেও সাধারণ লোকের চিঠিপত্রাদি অবশ্যই মৌখিক বা চলিত ভাষায় লেখা হত কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মতো শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সেই ভাষাকে বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবেন, এটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। নিছক সন-তারিখের বিচারে মৃত্যুঞ্জয় অবশ্যই রামমোহনের পূর্বসূরী, কিন্তু রামমোহনের রচনায় প্রকাশভঙ্গীর যে-দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার কোথাও তা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া রামমোহনের সাহিত্যকীর্তি মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় অনেক বিরাট ও অনেক গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। "বাংলা গদ্যের প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী লেখক" যে রামমোহন রায় (সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' পৃঃ ৯৯৭) সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম, যদিও আধুনিক বাংলা গদ্য থেকে রামমোহনের গদ্যের ব্যবধান দুস্তর।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরের দিন দুপুর। একটা স্কুল বাড়ির সামনে মানবদের অস্থায়ী রিলিফ অফিস বসেছে।

রোদ উঠেছে। মেঘ কেটে গেছে। শরৎ-নীল আকাশ। শহিদপুর কলোনিতে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ধার কাজ চলছে। সুখদেও কলার ভেলা বানিয়েছে। ডিঙ্গি যোগাড় হয়েছে দুটো। স্কুলবাড়িটা খোলানো হয়েছে। বিকেল নাগাদ আরো ভলান্টিয়ার এসে পড়বে। দুটো বাঁশের খুঁটিতে সালুর ফেস্টুন! পিপলস্ রিলিফ কমিটি। ফকিরচাঁদ সাধু এ অঞ্চলের পি. আর. সি.র ডাক্তার। কথাবার্তা একটু ব্যাঙ্গাত্মক। মোটা। বেঁটে। কালো। মাথায় অপ্রতিহত টাক। গলায় লাল টকটকে টাই। মানব পরম তৃপ্তিতে পানের পিচ ফেলে, পানের বোঁটা থেকে চুণ চেটে নিতে নিতে ফকিরচাঁদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল। সুব্রত কতকগুলো নাম নিয়ে তালিকা তৈরী করছিল। সাহায্য প্রার্থীদের নামের তালিকা।

—আর সব শকুনী গৃধিনীরা কোথায় হে, কংগ্রেস হিন্দুসভা, সোসালিস্ট— ভাগাড়ে মড়া পড়েছে তোমরা একাই খাচ্ছ। ফকিরচাঁদবাবু সিগারেটটা ধরিয়ে কাঠিটা নিবোলেন।

—কংগ্রেসের তাহের সাহেব অফিস খুলেছে, তবে পাত্তা করতে পারবে না। প্রথমত মুসলমান, আর এটা রিফ্যুজি কলোনি। দ্বিতীয়ত—মানব থেমে গেল।

—দ্বিতীয়তটা পরে শুনবো, তুমি প্রথমটার সুবিধে নিয়েছ কিনা বলো।

—আমার সুবিধা নেবার কিছু নেই, ওটা আপ্‌সেই যা হবার হয়ে গেছে।

— তুমি তার ফল ভোগ করছ, না করছ না? মৃদু মৃদু হাসছেন ফকিরচাঁদ বাবু।

—এই ফকিরদা চুপ করুন। সুব্রত থামিয়ে দিল—নানা রকম লোক যাতায়াত করছে।

ফকিরচাঁদবাবু একটা সিগারেট ধরালেন—ব্রজদুলালরা আসেনি ?

মানব বলল—ঐ তো অশথ গাছ তলায়। অফিস খুলেছে।

—ওরা এখন কাদের সঙ্গে, জয়প্রকাশ নারায়ণ না শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে ?

—দুইই এক নিঃশ্বাসে চলে ওদের।

—বিচিত্র জিনিস এই ব্রজদুলালেরা, কখনো প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ, কখনো জয়প্রকাশ লোহিয়া, কখনো শ্যামাপ্রসাদ, সাবাড় কর—

—কিন্তু ভুলেও নেহরু নয়। সুব্রত ধরিয়ে দিল।

—খানিক আগে তাহেরের সঙ্গে ব্রজদুলালের তো একহাত হয়ে গেল। এ কথা বলে মানব হাসল।

সাদা এবং কড়া ইস্তিরি করা ট্রাউজারের ধার ঠিক করে গুটিয়ে ফকিরচাঁদ বাবু চেয়ারে বেশ আয়েস করে বসে বললেন—সুব্রত, বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে মানবের হাসিটা দেখ। সুব্রত চুপ করে রইল। স্কুলবাড়িতে যাদের তোলা হয়েছে তাদের অনেকেরই হাঁড়ি চড়েনি আজ। রিলিফ দরকার। চাল, ডাল, কাপড়, রোগে পড়ে আছে জনা কতক, পথ্য, টাকা দরকার। মানবও ভাবিত। ফকিরচাঁদবাবু বললেন—লাগিয়ে দাও তোমাদের দলবল। সুব্রত বলল—ছেলে মেয়েগুলোকে খবর দাও মানবু। ফকিরচাঁদবাবু বললেন—হ্যাঁ সেজেগুজে নেমে পড়ুক সব, লোকাল আই. পি. টি. এ.-কে খবর দাও, ঘুঁষি উঁচিয়ে গান হবে না ?···হন্তদন্ত হয়ে একজন ভলান্টিয়ার এগিয়ে এল—একটা মেয়ে হঠাৎ বমি করছে। সুব্রত ফকিরচাঁদ বাবুকে বলল—নিন্ এবার ফোড়ন থামিয়ে যা কাজ তাই করুন। কলেরা লাগবে নাকি ?

নিরাসক্ত চিত্তে, বিন্দুমাত্র ব্যতিব্যস্ত না হয়ে ফকিরবাবু সিগারেটে শেষটান দিয়ে বললেন—লাগুক, লাগুক, কলেরা ভূমিকম্প, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, আমি তো আফশোষ করি সুব্রত আগ্নেয়গিরি নেই কেন একটা ইণ্ডিয়ায়, বাড়তি জনসংখ্যাটা তাহলে আর মাথা ব্যথার ব্যাপার হত না।

মোটা শরীরটা নিয়ে অতিকষ্টে উঠলেন ফকিরবাবু।—চল হে, দেখা যাক কেমন বমি। একটা হলঘরের কোণে কাঁথায় শুয়ে রয়েছে একটা বছর পনেরো-ষোলোর মেয়ে। রোগা টিং টিং করছে। চুলে জট। হাতে একজিমা। ফ্রকপরা মেয়েটার বুকের পাঁজরাগুলো হাপরের মতো উঠছে নামছে। মুখটা

লাল। নাকের দুই পাশ ফুলছে। হলঘরে জল, কাদা, ভাঙা সরা বা মালসার টুকরো, বিড়ি আর পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি। হাঁড়ি কলসি মাদুর কাঁথা লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। কচি ছেলের কান্না। অসুস্থ মেয়েটির কাছে কেউ নেই। বমির ওপর মাছি ভন ভন করছে।

এর বাবা কোথায়? ফকিরবাবুর গলার আওয়াজ চড়ালেন। মেয়েটির কপালে হাত দিতে মেয়েটি আঃ বলে চোখ খুলল। বড় বড় চোখ একটু লালচে। ফকিরবাবু বললেন—কলেরা নয়।

—খুকী তোমার নাম কী?

—মমতা।

—বাবা কোথায়?

—বাবা বাড়ি ফেরেনি কাল।

—মা?

—মা নেই।

ততক্ষণে দু-চারজন এসে দাঁড়িয়েছে। ফকিরবাবু বললেন—এর বাবাটা তো আচ্ছা উজবুক। মা-মরা মেয়েটাকে ফেলে কোথায় গেছে।

—মা ওর মরেনি আজ্ঞে। একজন বলল।

—তিনি আবার কোন চুলোয়।

—চুলোই বটে, ওর—

মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। আবার বমি করল।

—কাল কী খেয়েছ খুকি?

—কিস্যু না।

—কাল সারাদিন কিছু খাওনি? ফকিরচাঁদ ডাক্তার চোখ কপালে তুললেন! একটা ইনজেকশন দিলেন। একটা প্রেসক্রপসন লিখে দিলেন। সুব্রত প্রেসক্রপসন পড়ে হেসে ফেলল। এসব কী লিখেছেন—দুধ, ডিম, হর্লিক্স্, ফলের রস—

—কী লিখব, শুক্নো মিয়্নো মুড়ি, বাসিভাত? লঙ্কার ঝাল? ম্যাল-নিউট্রিশন—না খেয়ে খেয়ে মরতে বসেছে, বুঝলে?

—ফাণ্ড্ কোথায়?

—কমিউনিস্ট পার্টির ফাণ্ড দেখে আমি প্রেসক্রপশন লিখব না কি হে?

মেয়েটি বিরক্ত মুখে এদের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যেরা চুপ করে

দাঁড়িয়ে। 'আপাততঃ মেয়েটিকে একটু ফলের রস খাওয়ানো দরকার'। ঘোষণা করলেন ফকিরচাঁদ বাবু।

—কোথায় পাবো, বিকেলের আগে ফাও কোথায় ?

—তাহলে বিকেল অবধি ও যুঝুক। তোমাদের একটা ছেলেকে ডাকো দেখি। সুব্রত একটি ভলান্টিয়ারকে ডেকে দিল। খস্‌খস্‌ করে একটা চিরকুট লিখলেন ফকিরবাবু।—আমার বাড়ি গিয়ে, আমার স্ত্রীকে দেবে। বলবে যদি তার দিবা নিদ্রা শেষ হয়ে থাকে একবার যেন আসেন এদিকে, দেশের কাজ করতে হবে। মৃদুস্বরে বললেন—আর ফ্যাটও কমবে।

মেয়েটিকে ততক্ষণে ঐভাবে থাকতে দিয়ে ওরা বেরিয়ে আসছিল। মেয়েটি বলল—শুনুন। ফকিরবাবু ফিরে দাঁড়ালেন। কী বিবর্ণ ক্লান্তি মেয়েটার ফর্সা সাদা মুখখানায়। কুণ্ঠিত ভাবে বলল—

—আমার বাবা টের পাবেন কী করে যে আমি এখানে।

—আমি টের পাইয়ে ছাড়বো এখন, ভেবো না।

বাইরে মানব খবর পেয়েছে বিকেলে ভবেশবাবু আসবেন। সার্কল অফিসারও আসবেন রিলিফের জন্যে। মানব এসব ব্যাপারে সুব্রতর পরামর্শ নিল না। তবে সুব্রতও এটা বুঝল যে মানব তার আগেই রিলিফের সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে ফেলতে চায়। সে ছুটো ক্লাবে খবর দিল। একটা সংস্কৃতি-সঙ্ঘ, একটা ব্যায়াম সমিতি—যত বেশি সম্ভব ভলান্টিয়ার চাই।

ওদিকে এদের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে ব্রজদুলালদের ভলান্টিয়ারদের একটা ছোটখাট ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল। কে বুঝি কাকে রাশিয়ার দালাল বলেছে। মানব এগিয়ে গেল। ব্রজদুলাল একটা মাইক্রোফোন এনেছে। বক্তৃতা শুরু করল। চীন রাশিয়ায় যাদের টিকি বাঁধা তাদের সম্বন্ধে জনতাকে হুঁশিয়ার করতে লাগল। চারটে টিনের চোঙা বের করে মানবেরা তার চতুর্মুখ জবাব দিতে লাগল।—ওরা বলল সুভাষ বোসকে দালাল বলেছে কারা। ওরা বলল—'কারা সুভাষ বোসের লেফট কনসোলিডেশন সম্ভব হতে দেয়নি'। সুব্রতর মনে হল আসলে এটা একটা নির্বাচনী সভা। স্লোগান, পাল্টা স্লোগান। গালাগাল। এবং এ ব্যাপারে খানিকক্ষণের মধ্যেই দারোগা পুলিশ পৌঁছে গেল।

সবাইয়ের গলা ছাপিয়ে ফকিরবাবুর গলা শোনা গেল—লুক হিয়ার দারোগাসায়েব, এখানে, এ্যাট লিস্ট্‌ গোটা তিনেক পেশেন্ট আছে যাদের নার্ভ

প্রায় স্ট্যাটার্ড। ইউ মাস্ট স্টপ দিস মাইক্রোফোন-সাউটিং। দারোগাবাবু একটি কনস্টেবলকে থানায় পাঠালেন। এস. ডি. পি.-ওর সঙ্গে কথা না বলে তিনি কিছু করতে পারবেন না। ব্রজদুলাল উত্তেজনায় হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফকিরবাবুকে উদ্দেশ করে বলল—আপনি তো ওদের ডাক্তার, ওদের কথাই বলছেন। সবাইকে থামান।

টাক টকটকে বেগুনি হয়ে উঠল ফকিরচাঁদবাবুর—ওদের ডাক্তার মানে, রাশিয়ার দালালদের ডাক্তার, ইয়েস তাই, তোমাদের ডাক্তার থাকে ডাকো, দেখি রাশিয়ার দালালদের ডাক্তারদের প্যাথোলজি আর আমেরিকার দালালদের ডাক্তারের প্যাথোলজি—বিপন্ন দারোগাবাবু হাত তুলে থামতে মিনতি করলেন। ওদিকে হৈ হৈ করে উঠল ব্রজদুলালেরা, আমাদের আমেরিকার দালাল বলেছে। একটা মারামারির পূর্বাবস্থা। টেনসন চরমে। অগ্রণী ব্যায়াম সমিতি আসতে পারেনি। তার বদলে কোঁচা দুলিয়ে এসে হাজির রবীন্দ্র-সংস্কৃতি বিভাগের ললিতমাধব। মানবের পিত্তি জ্বলে গেছে দেখে।

ঠিক এই সময়ে একটা জিপ সর্বাঙ্গে কাদা মেখে এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামলেন ভবেশবাবু, লোকাল কংগ্রেসী এম. এল. এ. সার্কেল অফিসার; আর, সুব্রত অবাক হয়ে গেল দেখে—দেবু মুস্তাফি। জিপেই বসে থাকল সে প্রথমটা। দারোগাবাবু ওকে কী রিপোর্ট করতে লাগলেন।

ততক্ষণে এদিকে একটা টানা-হেঁচড়া চলছে। একটি আশ্রয়প্রার্থী পরিবারকে নিয়ে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকদের বচসা শুরু হয়েছে। এরা বলছে আমাদের ক্যাম্পে চলুন, ওরা বলছে, আমাদের ক্যাম্পে। বিবাদ মীমাংসা করাও মুশ্‌কিল, কেননা একটা ডিঙ্গি খালি পড়েছিল, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা সেটা কমিউনিস্টদের ডিঙ্গি হওয়া সত্ত্বেও তাতে করে একটি পরিবার সরিয়ে এনেছে। বন্দেমাতরম, লালঝাণ্ডা কি জয়। দেবু জিপ থেকে স্মার্ট ভঙ্গিতে ল্যাফিয়ে নামল, তারপর গট গট করে একটা সরলরেখা ধরে, কোনো দিকে না তাকিয়ে মানবের দিকে সটান এগিয়ে এল—স্টপ ইট, হোয়াই ডু ইউ সাউট ইন দি ওপেন রোড লাল ঝাণ্ডা কি জয়?

ভবেশবাবুকে সামনে নিয়ে তাহের বক্তৃতা করছে। ইনি ত্যাগব্রতী দেশকর্মী। আইনসভার প্রতিনিধি, ইনি···মানবদের ভল্যান্টিয়াররা প্রশ্নবান

শুরু করল—ছিলেন কোথায় এতক্ষণ ? কাল রাত্তির থেকে আজ বেলা চারটে পর্যন্ত লোকগুলোর যে পেটে একটা দানা নেই ? দেশের জন্য মলমূত্র ছাড়া কী ত্যাগটা করেছেন ?

ফকিরবাবুর টাকে বিকেলের আলো চক চক করছে। তিনি দেবুকে কী বোঝাচ্ছেন। সুব্রত সার্কেল অফিসারকে অবিলম্বে কী রিলিফ দরকার তার তালিকা শোনাতে লাগল। ইতিমধ্যে দেবু সুব্রতকে দেখল। এগিয়ে এল—হাউ ডু ইউ ডু ওলড বয় ? কবে ছাড়ল তোমাকে ? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—তুমি এখানে নাকি এখন ?

—ইয়েস। মাসখানেক হল এসেছি, এমন গোলমেলে ঝঞ্চেটে জায়গা সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই। যত স্মাগলার, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। রেপ মার্ডার এভরিডে রুটিন।

—এদিকে এসেছিলে কোথায় ?

—ম্যাকরয়েডে লেবার ট্রাবল। লেবার-অফিসারের গায়ে আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। ম্যাকরয়েড লক আউটের দিকে ঝুঁকছে। নাউ ইউ সি গভমেণ্ট ডাজ নট এনকারেজ লক আউট। কিন্তু ব্রিটিশ কনসার্ন, শুনতে চায় না। এসেছিলাম। আমারি গাড়ি। সার্কেল অফিসারকে তুলে নিলাম। ওঁর সঙ্গে ভবেশবাবু ছিলেন। একের নম্বর বুদ্ধু হে লোকটা। মানব বলে তোমাদের কে আছে এখানে, ভয়ানক রাগ তার ওপর।

ফকিরবাবু গুঁড়ো দুধের প্যাকেটগুলো গুণে নিচ্ছেন। ভবেশবাবু তাহের এবং তার দলবলকে কোথা থেকে চাল আনতে হবে তার নির্দেশ দিচ্ছেন। সার্কেল অফিসার বললেন—রিলিফে দলাদলি করবেন না। ইন ছাট কেস আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করব। আর, দেবুকে ডেকে আলাদা করে কী একটা বললেন।

দেবু, ব্রজদুলাল, তাহের আর মানবকে ডেকে বলল—আই ফাইণ্ড হিয়ার মাচ টেনসন। সাউটিং বন্ধ করতে হবে। চোঙা, মাইক্রোফোন চলবে না। ডোণ্ট কমপেল মি টু টেক লিগ্যাল স্টেপ। হান্‌ড্রেড ফরটি ফোর প্রমালগেট করতে বেশি দেরি লাগে না। বলেই সে আবার এগিয়ে গেল সার্কেল অফিসারের দিকে। তাঁর সঙ্গে নিচু স্বরে কিছুক্ষণ কথা বলে চেঁচিয়ে ডাকল—বড়বাবো, দুটো সিপয় এখানে পোস্ট করে দিন। বশম্বদের মতো বড়বাবু বললেন, ইয়েস স্যার। জিপ হঠাৎ গর্জন করে উঠল। হর্ন কর্কশ ধমক

দিল যেন। সামনের জামরুল গাছে একটা নাম জানা নেই পাখি অনেকক্ষণ ডাকছিল। থেমে গেল। বিকেল ধূসর হতে চলেছে। অনেক পরিশ্রম শেষ করে দেবু মুস্তাফি সার্কেল অফিসার চলে গেলেন। দেবু যাবার সময় সুব্রতকে বলে গেল—যাবে একদিন, অনেকদিন আগেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল, ওভার ডিউ হয়ে গেল। সুব্রত বলল—যাবো। কাদা ছিটিয়ে জিপ চলে গেল খৈনি টিপতে লাগল সিপাই দুটো।

ফকিরচাঁদ বাবু ব্যাগ ইঞ্জেকসনের সিরিঞ্জ গুছিয়ে নিলেন। ডিসপেনসারি খুলতে হবে তাঁকে। যাবার আগে সুব্রতকে বললেন—আমার গিন্নি যদি আসেন, যদি নয়, আসবেনই, ঐ মেয়েটির কাছে নিয়ে যেও। সুব্রত বলল—চেনে তো সবাই বৌদিকে? আমি তো দেখি নি কখনো।

—চেনে। আর না চিনলেও দেখলেই চিনতে পারবে। ফিজিক্যালি, এবং স্পিরিচুয়ালি কাউকে যদি দেখ আমার চেয়ে ইনফিরিয়র, অথচ মনে হয় সুপিরিয়র বুঝবে সে হল মিসেস সাধু। বিশাল দেহ নিয়ে ফকিরচাঁদ বাবু আড়মোড়া ভাঙলেন।

সুব্রত হাসল। ফকিরচাঁদবাবুও তখনকার মতো বিদায় নিলেন। কলেজের ছেলেমেয়েরা এসেছে। মানব তাদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। সুব্রত উৎসুক চোখে কাকে যেন খুঁজল, পেল না।

ভ্যাপসা গরম। ঘাম হচ্ছে অনর্গল। কোথা থেকে পচা গোবরের গন্ধ আসছে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে—দারুণ মশা। স্কুল বাড়িটায় সামান্য কয়েকটি লণ্ঠন জ্বলছে। চব্বিশ ঘণ্টার ওপর সুব্রত বাড়ি যায় নি। এখন এদিকে আলাদা করে বিশেষ কাজ নেই। স্বেচ্ছাসেবকদের উত্তেজনা কমে এসেছে। যারা পাত্তা পায়নি তারা বাড়ি গেছে। জল এখনো কমে যাবার কোনো লক্ষণ নেই। অনেকে লণ্ঠন জ্বেলে মাছ ধরছে। তার কলরব শোনা যাচ্ছে। বিল ভেসে যাওয়ায় মাছও ভেসে এসেছে। এবং বাজারে মাছের দর হঠাৎ খুব পড়ে গেছে। মশা তাড়াতে তাড়াতে সুব্রত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মানব পার্টি সদস্যদের নিয়ে একটা গ্রুপ মিটিং করে এল। সুব্রতকে স্বভাবতই ডাকা হয় নি। একটা রিলিফ-কমিটি তৈরি করেছে মানব। ফকিরচাঁদবাবু সভাপতি এবং সে নিজে সম্পাদক। সুব্রতর নাম সে কমিটিতে নেই। মানব বুদ্ধি করে কমিটির নামগুলো একবার সুব্রতকে শুনিয়ে গেল। যেন ওকে দিয়েই অনুমোদন করিয়ে নিল। কাঠের ধোঁয়ায় সুব্রতর চোখ জ্বালা

করছিল। আশ্রয়প্রার্থীরা কেউ কেউ রান্না চড়িয়েছে। মমতা বলে সেই মেয়েটিকে একটি আলাদা ছোটঘরে রাখা হয়েছে। ফকিরবাবুর স্ত্রী মীনাক্ষী দেবী এসেছিলেন। সুব্রত অবাক হয়ে গেছে ভদ্রমহিলার রূপ দেখে। ভাবল, ফকিরবাবুকে এ নিয়ে পরে ঠাট্টা করবে এখন। মমতাকে ফলের রস খাওয়ানো হয়েছে। মেয়েটা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। গুঁড়ো দুধের রিলিফ বিলি করা হয়েছে একবার।

অন্ধকারে সব মিশে গেছে যেন। দূরে গুণ গুণ কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে। বিড়ি ধরানোর দেশলাইয়ের আগুন দেখা যাচ্ছে। কাল থেকে আজ পর্যন্ত রুচিকে মিলিয়ে সে যেন একটা অভিভূত অবস্থার মধ্যে ছিল। বন্যার জল, সারারাতের ক্লান্তি, সারাদিনের উত্তেজনা সব কিছুতেই সে সহজে ডুব দিতে পেরেছে। এতক্ষণে সেই পুরনো ক্লান্তিটা কি আবার ফিরে এল—সব যেন ছোট, সব যেন মুখোস, ঠিক এই সময়টাতেই তার বারে বারে মনে হয়—তার কোথাও যাবার নেই। কেন মানব এমন করে—রিলিফ কমিটির সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী হলে কার ক্ষতি হত? কেন অবিশ্বাস! ক্লান্ত—যেন এখানেই ঘুমিয়ে পড়বে সে। কলেজের ছেলেমেয়েরা ভলান্টিয়ার হয়ে এসেছে—কই রুচি তুমি তো এলে না। মানবকে কে যেন বলেছে রুচির বাবা আসতে দেন নি। ঘুম-ঘুম আসছে। হাই উঠল। অনিবার্য হাই। কী বলেছে মানব মিটিঙে-সমস্ত ব্যাপারটা পার্টি ইনিসিয়েটিবে থাকা চাই। এবং কমরেডগণ পার্টির ইনিসিয়েটিব তাদেরই হাতে থাকবে এ্যাকশনের মাঠে যারা যাচাই হয়েছে। কমরেডগণ ভ্যাসিলেটিং এলিমেণ্টস দিয়ে কিছু হয় না। —'মানবদা, শুনছেন স্কুল বাড়ির ওপরের ঘরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে'। 'ওটা কোন ঘর?' 'মমতার ঘর'? ওকে তো ওখানেই রাখা হয়েছে। হঠাৎ একটা কলরব উঠল। সুব্রত চকিতে উঠে দাঁড়াল। কে যেন কাকে মেরেছে—তাকে সকলে আক্রমণ করতে চাইছে। বন্ধ দরজায় কারা ধাক্কা দিচ্ছে। সুব্রত উঠে গেল ওপরে। মমতারই ঘর। ভেতর থেকে মমতার কান্না ভেসে আসছে।—কী ব্যাপার? অনেক লোক দরজার কাছে, জানলায় বারান্দায়। 'মেরেই ফেলব শালাকে আজ'। ম্লান লণ্ঠনের আলোয় সকলের মুখ ক্রোধে বীভৎস। মানবেরা হুইসিল বাজালো। ভল্যান্টিয়ারেরা ছুটে এল। সুব্রতও দরজার কাছে এগিয়ে গেল—কঠিন হাতে দরজায় আঘাত করল। হঠাৎ দুম করে দরজাটা খুলে গেল। দরজা আগলে দুদিকের

চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল মমতা।—কী চান? স্বব্রত যেন হতভম্ব হয়ে গেল। ময়লা ফ্রকপরা, এলোমেলো চুল, লাল চোখ, গালে চোখের জলের দাগ। মেয়েটা যেন সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। স্বব্রত জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে তোমার? ঘরে কে?—আমার বাবা। বাবা এখন ঘুমোবে আপনারা যান। দুর্বল মেয়েটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। যেন পড়ে যাবে। কে একজন গর্জন করে উঠল—এই মেয়েটাই ওর বাবাটাকে শায়েস্তা করতে দেয় না। মশাই রে, ফি রোজ মদ খেয়ে এসে মেয়েটাকে চোরের মার মারে। আর মেয়েটা সেই মার গরুর মতোন সহ্য করে। আমরা কতবার বলেছি এর একটা বিহিত করা দরকার—ছুঁড়িটা মশাই বাগড়া দেয়। মেয়েটা কোনোদিন খায় কোনোদিন খায় না। হারামজাদা বাবা নেশা করে ঘুরে বেড়ায়, খোঁজও রাখে না। বাড়ি ফিরে একবার তালাসও করে না, হ্যাঁরে কী খেলি—আর সেই বাবার জন্যে—

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে মমতা ঘরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সেই লোকটিই বলল, দেখুন গিয়ে বাবার মাথা কোলে করে মাথায় হাত বুলিয়ে বাবাকে ঘুম পাড়াচ্ছে এখন—

আর একজন বলল, আদিখ্যেতা। আর একজন সন্দেহ করল—বাবাটা মানুষ না জানোয়ার। অন্য একজন বলল—মেয়েটাই বা কী মানুষ না ভেড়া?

অন্ধকার কাঁচা রাস্তা ধরে স্বব্রত বাড়ি ফিরল। মানব ও ফিরছে। ওখানে রাত্রের কাজ বেশি নেই। মানব তার স্বভাব মতো নানা কথা বলছিল। ঘুরে ফিরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার আলোচনা শেষ করে মানব ভারতবর্ষের কথায় এল। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসির মধ্যে ডুব দিলে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র কতটা থাকবে বলে স্বব্রত মনে করে—সে কথা মানব জিজ্ঞাসা করল। ক্লাস স্ট্রাগল আর পার্লামেণ্টারি রাজনীতি তেঁতুলের আমসত্ত্ব হয়ে যাবে না?

স্বব্রত বলল—ভাবছি।

মানব বলল—আপনি মেম্বারশিপ রেসটোর করবেন?

—ঠিক করিনি এখনো।

—একটা কথা বলবো, একটু ডেলিকেট—

—নিঃসঙ্কোচে বলো।

—রুচি, আই মিন প্রকাশবাবুদের বাড়ি বেশি যাবেন না।

—পার্টির কি কোনো নির্দেশ আছে ?

—ঠিক তা নয়, তবে, উনি অন্য শিবিরের লোক হয়ে গেছেন।

—প্রকাশবাবুর কোনো শিবিরের যোগ্যতা আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এইসব শিবির, ফ্রন্ট, এ জাতীয় কথাগুলো কি এই বার বাদ দেবার সময় আসেনি ?

—আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না।

—আমরা কেউ কাউকে ঠিক বোঝাতে পারি নি, কেননা নিজেরা কেউ বুঝি নি।

—যাই হোক আপনাকে যা বললাম, আপনি বিবেচনা করবেন, তবে আপনি বোধ হয় জানেন না যে ওঁরা আমাদের সম্পর্ক আর বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। অবশ্য তার কারণও যে নেই তা নয়, প্রকাশবাবুর স্কুল আপগ্রেডেড হওয়া চাই, রুচির বিয়ের কথা হচ্ছে,—

—কার ?

—রুচির, কাজল সান্যাল বলে একটি ছেলে, যেমন হয় কেরিয়ারিস্ট টাইপ, এম. এ. পাশ করে বুঝি এখন কোনো কলেজে পড়ায়, আই. এ. এসের জন্য খাটছে খুব, ছেলেটি ওদের বাসায় যাওয়া আসা করে।

মানব তারপর আবার নানা কথায় ঘুরে গেল। আসন্ন পার্টি সম্মেলন। জোশী রিভিশনিস্ট কিনা, কতখানি রণদিভের নীতি ব্যর্থ হয়েছে সে সব বিষয়ে মানব তার মতামত জানাতে লাগল। সুব্রতর মনে আছে কলকাতা পার্টি কংগ্রেসে পার্টির নেতাদের রণদিভে-নীতির সম্মুখে বিচলিত অবস্থাটা মানব এবং তাদের বন্ধুরা রীতিমত উৎসাহিত উল্লাসের সঙ্গে মুখে মুখে বিলি করেছে। জোশী নাকি স্বীকার করেছেন, বিচলিত ভগ্নকণ্ঠে, যে পার্টিকে তিনি ভুলপথে পরিচালিত করেছেন। প্রায় যেন মস্কো ট্রায়াল—বুখারিনের স্বীকারোক্তি—মন্‌স্ট্রাসিটি অফ মাই ক্রাইম্ ইন্ ইম্‌মেজারেব্‌ল। কে জানে এই রাতারাতি স্বীকারোক্তির তাৎপর্য কী—

মানব বলেই চলেছে—শ্যামলদাকে মনে আছে ? আজকের—'বাজারে' শ্যামলদার একটা ফিচার বেরিয়েছে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভেতরের অনেক কথা ফাঁস করেছে শ্যামলদা।

—শ্যামলদা কোথায় এখন ?

—সি. পি.তে মাস্টারি নিয়ে চলে গেছে, রটিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে

থাকলে কমিউনিস্টরা এ্যাসেন্ট করবে ওকে। সেখান থেকে ওর স্মৃতিকথা লিখবে। আই. বি. ডিপার্টমেন্টের মতো পুঁজিবাদী কাগজগুলোতেও এখন একটা করে সি. পি. আই. একসপার্ট থাকবে। এই আর এক জঞ্জাল; দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কলকাতা কংগ্রেসের পর বাজারে আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে কত চট করে। যে মিটিং প্রাদেশিক কমিটির কয়েকজন সদস্যের মধ্যের ব্যাপার তাও খবরের কাগজে চলে যায়।

—শ্যামলদা আসলে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের লোকই ছিল। মানব বলল।

এখন তাই ভাবছে বুঝি, সবাই ?—সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

একটু উত্তেজিত গলায় মানব বলল—আপনি তা ভাবছেন না ?

সুব্রত বলল—দায়িত্ব সমান সমান বলে মনে হয় না তোমার ? আমি তো তাই ভাবি।

মানব চুপ করে গেল। সুব্রত বুঝতে পারছে যদি সে এখনও পার্টি সদস্য হত তা হলে মানব একটা উত্তর দিত—পার্টির সমষ্টিবোধের কাছে আপনার 'আমি'টার দাম কী ?

স্টেশন ব্রিজের কাছে এসে মানব বলল—প্রকাশবাবুদের সম্বন্ধে আপনার কী মনে হল ?

—কিছুই মনে হল না। নিরাপত্তালোভী মধ্যবিত্ত এই কথাটুকুতে যতটুকু বোঝায় তার বেশি কিছু নয়। সে তো তুমিও আমিও— কে নয় ? বিশুদা, বল কাকে বাদ দোব ?

—আর রুচি ?

—রুচি ? রুচির কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন জানি না, তবে আমি খুব ভাল করে জানি তুমি রুচিকে যা ভাবছ সে তা নয়। কিছুতেই নয়।

—আপনিও দেখুন, আমরাও দেখি। কাল আসছেন ?

—হ্যাঁ দুপুরের দিকে আসব।

মানব চলে গেল। সুব্রত বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। রুচির কথায় এত জোর দেওয়া হয়তো উচিৎ হল না।

বাড়ি ফিরে সুব্রত দেখল, রুচির একটা চিরকুট অপেক্ষা করছে—একবার আসবেন, বিশেষ দরকার।

আর নন্দিনী বসে আছে—আমার অনেক কথা আছে, আজ আমি বলব। সুব্রত বলল—আগে খেতে দাও। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রিয়ব্রত বাড়ি আসে নি এখনো।

চতুর্থ অধ্যায়

নন্দিনী ভাত বাড়তে বসল। সুব্রত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মা বলল—তোর আক্কেল বিবেচনা কোনোদিন হবে না। একটা খবর তো পৌঁছে দিবি কাউকে দিয়ে। তুই আমার জন্য ভাববি সে আশা আমি করি নে, কিন্তু আমি যে তোর জন্য ভাববো সেটা তো ভাববি একবার। সুব্রত সেই ছোট বেলায় যা বোঝাতো মা-কে এখনো তাই বোঝালো। 'আমার কিছু হলেই তুমি ঠিক খবর পাবে, খবর না পেলেই বুঝবে ঠিক আছি'। উঁচু টুলটার ওপরে পেতলের পিকদানিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সুব্রতর মনে হল কারো কথা শোনার দরকার নেই—কোথাও কারো কাছে যাবারও দরকার নেই—এই ঘরখানায় মায়ের ময়লা বিছানায় পায়ের দিকে কুঁচকে কুঁকড়ে শুয়ে পড়াই ভালো। ভালো—শুয়ে শুয়ে দু-চোখে ঘুম আনতে আনতে মায়ের বিড় বিড় বকুনি শোনা। কী বলছিল মানব ও-সব। কী হবে জেনে কাকে বলে পেটি বুর্জোয়া ডিভিয়েশন—কমরেড ডিভিয়েশন। কতবার এই কথাটা মুখে মুখে এঁটো হয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে হয়েছে। এখনো যেন স্বাদ যায় নি। ডিভিয়েশন কথাটা যেন ঐ পিকদানির মতো—প্রচণ্ড বুকচাপা কাশ-কষ্টের পরের মুক্তি ওখানে। মা বিড় বিড় করছে, করুক। জীবনের হিসেবে পিকদানির সঙ্গে ফুলদানির তফাৎ কতদিনের—মনে হয় ফুলদানিটাই যেন চলতে চলতে দুমড়ে গিয়ে পিকদানি হয়ে যায়। এই মাকেই তো সে দেখেছে বাবার বৈঠকখানায় গানের জলসার আগে মেয়েলি নরম হাতে ফুলদানি সাজাতে। আজ স্থূল কাঁপা-কাঁপা হাতে পিকদানি তুলছে মুখের কাছে। কয়েক বছরের তফাৎ মাত্র—একই জীবন অথচ। পিকদানিকে যে আকারই দেওয়া যাক—তাকে দেখে এ কথা কখনোই মনে হয় না, যে, ফুলদানির আর পিকদানির মূল উপাদান একই ধাতু। এমনি করে তারো কি সব পিকদানিই হয়ে যাবে?—সেই একই ধাতু, একই কারিগর, একই অধ্যবসায়, একই শ্রম,—

শুধু ব্যর্থতার হেরফেরে, যা ছিল একদিন প্রেরণা, আজ শুধু তা ক্লেদ মুক্তির পাত্র! অবদ্ধ জলার মতো বিড় বিড় করছে যত ব্যর্থতার বকুনি। কোথা থেকে যে আসে এসব কথারা—

—কী তোমাদের সংসার। নন্দিনী কেন সন্ধ্যে বেলায় শাঁখ বাজাতে ভুলে যায় রোজ। দোরে, চৌকাঠে গঙ্গাজল পড়ে না। তুলসী গাছে বোশেখ মাসে ঝারা বাঁধা হয় না। কেন ছোট বৌমা অফিসের ঢঙে কুঁচিয়ে শাড়ি পরে সংসার করে—যেন সব সময়ই ট্রেন ধরছে। এমন করলে লক্ষ্মী থাকে!

কম বাতির আলোটা ঘরখানাকে যত নিথর করে রাখতে চাইছে ততই যেন কোথা থেকে আসছে সেপ্টেম্বরের কঠিন গুমোটের ছটফটানি! সুব্রত তবু যেন এখানেই আত্মসমর্পণ করতে চায়—দুঃখ অনেক ছোট এখানে। ছোট বলেই তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়। আর যাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় তাকেই হাত বুলোনো চলে। মা থেমে থেমে বলেই চলেছে—বেশ তো যা খুশি করোগে তোমরা। কিন্তু অন্তত নিজেরা সুখে থাকো। তা নয়, তোমাদেরও তো দেখি অশান্তির শেষ নেই। ছোট বৌমা কাঁদে কেন? প্রিয়ব্রত কী বলে ওকে?

স্থূল শরীর নিয়ে মা হাঁফাতে লাগল। বসে বসে বুকে বালিশ দিয়ে সারা রাত এই বুড়ি জেগে থাকবে। আর ভাববে এই সব। কপালে ঘাম জমছে। নাকের দুই প্রান্ত ফুলে ফুলে উঠছে। বাবার ছবিটা শুধু ছবি বলেই শান্ত হয়ে রয়েছে।

নন্দিনী ডাকল, খেতে আসুন।

খেতে বসে সুব্রত দেখল নন্দিনী অসামান্য গম্ভীর। চোখের কোল দুটো যেন ফুলেছে। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—মা কিছু বলেছে?

—না, মায়ের বলায় কী হয়। মা সেভাবে কিছু বলেনও না।

—তবে?

—ও ভয়ানক অবুঝ। ঘাড় ফিরিয়ে নিল নন্দিনী। তারপর বলল, খেয়ে নিন বলছি।

(ক্রমশ)

জর্জ সেফেরিস্

নাবিক

অপরিচিত, আর শত্রুর নির্লজ্জ প্রলোভন
আমরা দেখেছি তাকে জলের নগ্ন দর্পণে।

কিন্তু ওরা যে বন্ধু, মিতাচারী নম্র বালক
কোনদিনই করেনি অভিযোগ, কেননা
ওরা যে ক্লান্ত, তৃষিত, হিমেল।
বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর সূর্যে
ওদের স্বভাব অরণ্য আর ঢেউয়ের,
তাছাড়া পরিবর্তনের চরম মুহূর্তেও
ওরা অপরিবর্তিত, তীক্ষ্ণ ঋজু।
নম্র নতচোখে মসৃণ দাঁড়ের ওপরে ওরা ঘাম ফ্যালে,
দাঁড়ের নানান ছন্দে একসাথে শ্বাস নেয়
দাসত্বের কড়া চামড়ায় ফুটে ওঠে রক্তরেখা।
নম্র নতচোখে ওরা আবার গান গায় :
আমরা যখন আরেবিয়ান পণ্য নিয়ে পাড়ি দিই
নির্জন সমুদ্রদ্বীপ
অন্তরীপ থেকে অন্তরীপের অতলান্তে,
বেলাশেষের সূর্য যখন ঢলে পড়ে
প্রতিধ্বনিত হয় ওদের দাঁড়ের শব্দ
সূর্যের গভীরে, সমুদ্রের স্বর্ণিল পথে।

কত দ্বীপ কত অন্তরীপ পেরিয়ে এলাম
কত সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে, আহা, কত না সমুদ্রপাখি
সামুদ্রিক মাছের নানান বাহার।
হতভাগ্য কত নারী বিলাপের অশ্রু ঝরালো তাদের

হারানো শিশুর স্মৃতিতর্পণে,
অন্য পুরুষেরা বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে চেয়ে ছাখে
আলেকজাণ্ডার কিংবা ধ্বংসোন্মুখ এশিয়ার লুপ্ত গৌরব।
তারপর উপলে, সমুদ্রসৈকতে আমরা নোঙর ফেলি
রাত্রির স্নিগ্ধ গন্ধে, কাকলিমুখর পাখির মিষ্টি গানে,
বিশাল পবিত্র একটি নিয়তির সঞ্চয় করপুটের স্খলিত জলে।

তবু বিশ্রাম ছিল না অন্তহীন দীর্ঘ পরিক্রমার :
কেননা ওদের সবকটি হৃদয় একসাথে গাঁথা
কয়েকটি দাঁড় আর মাস্তলের লৌহশৃঙ্খলে,
চিত্রিত পোতাগ্রের তীক্ষ্ণ কঠোরতায়
হালের বুকফাটা কান্নার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে
প্রতিফলিত ওদের মুখ জলের নগ্ন দর্পণে।
তারপর নম্র নতচোখে সাথীরা একদিন মারা গেল :
তাদের সে দাঁড় এখনো চিহ্নিত করে
নীল নির্জন সমুদ্র সৈকত
যেখানে ওরা চিরদিনই নিদ্রালস, নিস্তব্ধ নিথর।

আজ আর কোনো স্মৃতি নেই
কেউ আর স্মরণ করবে না তাদের যে পবিত্র স্মৃতিমুখ,
কয়েকটি শব্দ এখন শুধু নিস্তব্ধতায় অমিত সম্রাট।

অনুবাদ : অসিত সরকার

জর্জ সেফেরিস্

আনন্দের পালা

সেদিন সারাটা সকাল আমরা খুশিতে ছিলুম
আ, কতখানি যে খুশি ছিলুম !
প্রথমে নুড়িগুলি, তারপর পাতাগুলি, ফুলগুলি
আর তারও পরে সূর্য ঝকঝক করে উঠল ;
একটা বিরাট সূর্য কাঁটায় আকীর্ণ, কিন্তু নীলিমায় কত উঁচুতে।
একটি পরী আমাদের দুঃখগুলি কুড়িয়ে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিল

জুডাস গাছের অরণ্যে।
কন্দর্পদেব অরণ্যদেব সকলেই খেলছেন, গান গাইছেন ;
আর দেখতে পেতে
কালো লরেল গাছের গোলাপী ডালগুলি
কচি ছেলেদের গায়ের মতো।
সারা সকাল আমরা খুশিতে ছিলুম।
অতল গহ্বর আবৃত কুয়োর মতো
মাথার ওপরে শিশু অরণ্যদেবের কোমল পদাঘাত।
তার হাসি মনে করতে পার ? আ, কতখানি খুশি যে ছিলুম !
তারপরই মেঘ, বৃষ্টি আর ভিজে পৃথিবী।
যখন তুমি কুটিরের মধ্যে শুয়েছিলে,
চেয়ে দেখলে একটা জ্বলন্ত তরবারি নিয়ে খেলা করছেন
পরমতম দেবদূত।
তা দেখেই হাসি তোমার উবে গেল।
"বিশ্রী", তুমি বললে, "এটা একটা বিশ্রী ব্যাপার।
মানুষদের আমি বুঝতে পারি না :
যতই রং নিয়ে মাতামাতি করুক না কেন
তারা সকলেই কালো।"

অনুবাদ : শিবশম্ভু পাল

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সিঁড়ি

সিঁড়ি শেষ হলে ফের বাঁক নিয়ে সিঁড়ি শুরু হয়,
কোথাও প্রবেশ নেই। ভেসে আসে উৎসবের গান।
সময়ের হাতে আঁকা দেয়ালে দেয়ালে অবক্ষয়;
পেছনের ধাপগুলো নিষ্ফল তিমিরে মজ্জমান।

কাদের অস্ফুট স্বরে, ইতস্তত আলোর সংকেতে
সন্তপ্ত চরণে শুধু অন্তহীন সিঁড়ি ভেঙে চলি;
কেউ পথ দেখাবে না, নিরুপায় দুই হাত পেতে
বিনাপ্রতিশ্রুতি নেব আতঙ্কিত জন্মের অঞ্জলি।

দেখা নেই যে আমায় এ বাড়িতে এনেছিল ডেকে;
তার নাম, তার মুখ মনে নেই। ব্যর্থ প্রতারিত—
রক্তের গোলাপ হতে শতাব্দীর শাপে একে-একে
দলগুলি ঝরে যাবে, স্মৃতি হবে কীটদষ্ট ঃ মৃত।

এবাড়ির কোনোখানে সারারাত চলেছে উৎসব;
সিঁড়ি ভেঙে যাই একা কাঁধে নিয়ে প্রাক্তনের শব॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

শিল্পী

আমারই রচিত দুর্গ চূর্ণ করে তীব্র পদাঘাতে
চলে যেতে চাই দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে বারংবার।
শিল্পের অমল আত্মা কে পারে স্পর্শিতে যার হাতে
নেই সেই মায়াদণ্ড, যার বলে জলধি অপার
ছেড়ে দেয় পথ, প্রতিবন্ধকেরা গর্জায় নিষ্ফল।
এবং অমরতার সুকঠিন দরজা যায় খুলে,
যার হাতে মায়াদণ্ড পরিতৃপ্ত সে পানে গরল,
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ভবিতব্য সে গাঁথে ত্রিশূলে।
নিজেরই রচিত সীমা এক হাতে ভাঙি, অন্যহাতে
আমার সর্বস্ব দিয়ে গড়ে তুলি আত্মার প্রতিমা।
মরণ ঘনায় দেহে, ঝুলে পড়ে কালের আঘাতে
চোয়াল নাসিকা জিহ্বা, হাড়-মজ্জা, পরমায়ু-সীমা
যা দেখে স্তম্ভিত মৃত্যু সে নহে চরম সর্বনাশ
শিল্পের শাশ্বত লোকে প্রতিষ্ঠিত আমার বিশ্বাস।

রণজিৎ সিংহ

চিহ্ন

১. প্রথম আলাপ

গ্রে স্ট্রীট পার হয়ে
আমরা খালের দিকে পা বাড়ালাম
আকাশ ডানা মেলল
ঝলকে উঠল ঠাণ্ডা ধারালো মস্ত চাঁদ
মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ!

কথায় জোয়ার লাগল,
অথই কথায় আমরা পাড়ি দিলাম ;
বেলগাছিয়ার ব্রিজে খেলছে কলকাতা
কলকাতা নাচুক।
আমরা পৌঁছলাম সারি দেওয়া গাছের গম্ভীর নীরবতায়

আলো ছায়ার জাফরি
রোমকূপে ধ্বংসনগরীর মায়া
শূন্যে টলমল জ্যোৎস্না।
আমাদের বাঁধভাঙা মাতাল তাজা হৃদয়ে হৃদয়ে
উচ্চারিত হল সন্ধি।

২. ফুলের বাগান

ওই তো ফুটেছে লাখে লাখে
হাওয়ায় দুলছে রোদে জ্বলছে
এধারে ওধারে হাসছে
মরশুমী ফুল।

কিন্তু কথা মানো যাব না ফুলের মেলায়
কথা মানো চলো ওই ঘাসের রিক্ততায়
দিগন্তকে আড়াল করো
আকাশকে আড়াল করো
আমার দৃষ্টি তোমাকেই বিঁধুক তোমাতেই উড়ুক

বসন্তের তাবৎ চক্রান্ত ফেঁসে যায়
এই তো পেয়েছি রক্তমাংসের ফুল।

৩. মেঠো রাস্তা

আকাশকে বুকে টানি
শরীরে ভাঙি ঝোড়ো হাওয়া

উত্তাল কবিতায় ভ'রে তুলি মাঠ।
ফিরছি লোকালয়ে,

আমাদের সন্ধিতে এ জয়যাত্রা।

জয়যাত্রার নিশান ওড়ে লাল আকাশে
খবর ছড়ায় পাখিদের চিৎকারে।

৪. ঘর

তোমরাও এস—
এস চৈত্রদিন
এস ফুলের শোভা
এস উঠোনের চড়াই
তুমিও এস আমার মা মনি;
হও খুশির ঝরনা;
দেখ দেখ
আমার ঘরে এল
আনন্দিত দিন
আমার ভালোবাসা।

সমরেশ রায়

ফেউ

দেবব্রত নামে তেইশ বছরের সেই যুবকের যক্ষ্মা হয়েছিল। যৌবনে প্রবেশের মুখে তার গলা দিয়ে রক্ত পড়েছিল। সাদা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে, লাল রঙের নিজের শিরা ধমনীতে প্রবাহিত, হৃদপিণ্ড নামক একটি শারীরিক যন্ত্রের অলিন্দ ও নিলয় নামক দুইটি কক্ষ ধুয়ে আসা—এবং হৃদয়—সেই রক্তিম তরল পদার্থ মুহূর্তের মধ্যে দেবব্রত নামক যুবকের ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। দেবব্রত নিজেকে এই আকস্মিকতার আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

দেবব্রতর কেন যক্ষ্মা হল এই আলোচনায় সে নিজের মতামত ব্যক্ত করে নি; স্বাভাবিকভাবেই যে কারণগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত কারণগুলির মধ্যে দেবব্রতর অনিয়ম অত্যাচার ইত্যাদি-ই প্রাধান্য পেয়েছিল। দেবব্রত এই কারণগুলিকে অস্বীকার করে নি। কিন্তু সে নিজের মনের কাছে অসুখের মূল কারণ নির্দেশে কোনো ফাঁকি রাখে নি।

যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার অনেকদিন পরে দেবব্রত নিজেকে পরিবারের মধ্যে সমস্যা হিসেবে আবিষ্কার করে লজ্জিত ও মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। দেবব্রতর বাড়িতে মাত্র দুটো ঘর। তার অসুখের আগে এই দুটো ঘর কখন ছ-জন কখন আট-দশজন মানুষকে মোটামুটিভাবে ধরে যেত; কিন্তু হাঁসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে, একটি ঘর শুধুমাত্র দেবব্রতর জন্য ছেড়ে, বাকী একটি মাত্র ঘরকে তার দুই বোন একটি ভাই বাবা-মা সহ—পরিবারের অন্যান্য সবাই আশ্রয় করলেন। অথচ দেবব্রতর ঘরে আরো দু-তিনজন মানুষের জায়গা হতে পারে। কিন্তু সদ্য হাঁসপাতাল ফেরৎ দেবব্রতর তখন অন্য কারো সঙ্গে একই ঘরে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ এতে তার নিজের শারীরিক ক্ষতি হবার অকারণ ভীতি ছিল (স্যানোটোরিয়াম প্রত্যাগত সবাই নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশ্চর্য সচেতন; ও স্বার্থপর) তেমনি তার

সঙ্গে একই ঘরে স্ব ইচ্ছায় থাকবার মতো কাউকে পাওয়াও কষ্টকর ছিল। কারণ সদ্য হাসপাতাল ফেরৎ দেবব্রতর যক্ষ্মা নামক অসুখটি সম্পর্কে অন্য সবার ভীতি থাকাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। যদিও তার কাছে হাঁসপাতাল থেকে দেওয়া দুটো লাংস-এর ছবিগুলা এবং তাতে তার অসুখের প্রথম অবস্থা ও সেরে যাবার পরের অবস্থা পেন্সিল দিয়ে আঁকা আছে এবং সেখানে ছাপার অক্ষরে এ কথাও লেখা আছে যে সে নির্ভয়ে সবার সঙ্গে মিশতে পারে এবং তার থেকে কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, তবুও দেবব্রতকে সামাজিক পরিবেশে মেশবার মতো মানসিক প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা করতে হয়েছে, ফলত তার মধ্যে কতগুলো বিচিত্র ধারণা দানা বেঁধে উঠেছে। অথচ এই বিচিত্র ভাবনাগুলো দেবব্রতর মধ্যে হাঁসপাতাল থেকে ফিরে আসবার পর প্রথম বেশ কিছুদিন ছিল না। এই ধারণাগুলোর সঙ্গে—আমি সবার করুণার পাত্র কারণ আমার যক্ষ্মা হয়েছিল—এই বিশ্বাস মিশ্রিত হয়ে দেবব্রতর মানসিকতায় এমন এক আলোড়ন আনল যে দেবব্রতর চোখে সব ঘটনার রঙই পাল্টে গেল। এর পাশাপাশি এবং প্রায় পরপর ঘটে যাওয়া কতগুলো ঘটনা দেবব্রতকে এই বিচিত্র ধারণার ঘূর্ণিতে ঠেলে দিল। ফলে দেবব্রত একটি বুদ্ধিমান যুবক হওয়া সত্ত্বেও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে আনতে চাইল। যা তার স্বভাব বহির্ভূত। এই গুটিয়ে আনার প্রবণতা সব সময় সার্থক হয় নি। সে তার মনের তাড়নায় স্বনির্মিত জালের আবরণকে বারবার ভেঙেছে এবং কোনো ঘটনাকে ভুল অর্থে নিয়ে আবার সেই আবরণ তৈরি করতে চেয়েছে। স্যানোটোরিয়াম থেকে ফিরে দেবব্রত প্রাণপণে নিজের প্রায় এক বছরের স্যানোটোরিয়াম-জীবনকে—যেখানে মুহূর্ত বছরের মতো এবং প্রতিটি দিন জীবনের মতো দীর্ঘ—ভুলতে চেয়েছিল—এবং অসুখটাকেও। এবং সে তার পরিবার ও বন্ধু বান্ধবীদের সহায়তায় নিজেকে প্রায় বুঝিয়ে এনেছিল যে যক্ষ্মা হওয়া তার কোনো অপরাধ নয়, এবং এই অপরাধের ফল তাকে সারা জীবন ধরে ভোগ করতে হবে না। কিন্তু দেবব্রতর মনে এই অসুখের ফলে যে তীক্ষ্ণ অনুভূতির জন্ম হয়েছিল সেই অনুভূতিই তাকে এই স্বাভাবিকতার দিকে যেতে দিল না। ফলে যে দেবব্রত কোনো মতেই পরিবেশ নামক অদৃশ্য শক্তির শীকার হতে চাইছিল না—যা প্রায় প্রতিটি যক্ষ্মা রোগীই হয়ে থাকে—সেই দেবব্রতই নিজের অজান্তেই মনের বিশেষ ধারণার চাপে নিজেকে পরিবেশের জালে বন্দী করেছিল। ফলে তার

অন্য এক পথে, নিয়ে যেতে বাধ্য হল। অথবা তার অসুখই তাকে এই নতুন পথে নিয়ে এল। যে দেবব্রত পরিবারের ভরসা ছিল সেই দেবব্রত এই অসুখের ফলে পরিবারের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নিজের অজান্তেই তার মনে এই সমস্যা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে ধীরে ধীরে নিজের সম্পর্কে এবং পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে অসন্তোষ জমা হল। অথচ দেবব্রত প্রাণপণে নিজেকে আগের দেবব্রত করতে চাইত; কিন্তু এ দেবব্রত অত্যন্ত অসহিষ্ণু, এবং তার নিজের সামান্যতম অসুবিধাকে কেন্দ্র করে পরম স্বার্থপরের মতো পরিবারের মধ্যে অশান্তির ঝড় বইয়ে দেয়। ফলে দেবব্রতর মা-বাবা ভাই-বোনেরা সব সময় যেন তার কাছে অপরাধী হয়ে থাকেন। মাসের শেষে টাকার অভাবে ডিম ইত্যাদি কিনতে না পারায় তার বাবা দেবব্রতকে এড়িয়ে যান; দেবব্রতর মা এসব সময় নিজের হাতে তাকে খাবার দিতে আসেন না। ফলে দেবব্রতর ভাইবোনেরা নিজেদের প্রয়োজন কমিয়ে কমিয়ে নিজেদের প্রায় অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

এই দেবব্রত নামক যুবকটি, যার মনে পরিবেশকে অস্বীকার করবার মতো চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, যে প্রায় পরাজিত, অথচ যার মধ্যে একটি যুক্তিনিষ্ঠ মনের কিয়দংশ এখন বর্তমান, যতই তার পরিবারের কথা চিন্তা করে ততই নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। তার বাবা যে আয় করেন তাতে স্বাভাবিক অবস্থাতেই মাসের পঁচিশ তারিখে ধার করতে হত তার ওপরে এখন তার মতো শ্বেত হস্তীকে পুষতে হচ্ছে—শ্বেত হস্তী কথাটা দেবব্রতর মা তাকে আদর করে গালাগাল দেবার সময় ব্যবহার করেন, দেবব্রত মাঝে মাঝে নিজের সম্পর্কেও এ কথা ব্যবহার করে হাসে—কাজেই এখন মাসের পনেরো তারিখেই ধার করতে হয়। এবং সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পরিবারকে এবং ছোট ভাইবোনদের বঞ্চিত করছে এ ধারণা এখন তার মনে দানা বেঁধেছে।

এ কথাগুলো চিন্তা করলে দেবব্রত নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দেখে; অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার ফলে দেবব্রতর মনে দুঃখজনক ভাবে কিছু ক্ষুদ্রতা দেখা দিয়েছে। অথচ দেবব্রত এমন একটি যুবক, যার কাছে যুক্তি অনেক বড় হয়ে দেখা দেওয়া উচিত; কারণ দেবব্রত যে আজকের জন্য নিজেকে উৎসর্গীত মনে করে সেই আজকের মধ্যে নিজেকে এবং অপরকেও ভুল বুঝবার সুযোগ নেই। অথচ পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পনের ফলে দেবব্রত অসহায় হয়ে পড়েছে; যে দেবব্রত এককালের কর্মী সে এখন নিজের

মধ্যে কর্মী মনের সম্পূর্ণ উপস্থিতি সত্ত্বেও কাজ করতে পারে না। যে কোনো কাজেই হাত দিতে যাক না কেন "তুই আবার কেন" বলে যে কেউ তার কাছ থেকে কাজটি নিয়ে নেয়। এরা প্রত্যেকেই দেবব্রতর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দেবব্রতর যক্ষ্মা হবার ফলে এরা প্রত্যেকেই আন্তরিক দুঃখিত। এরা প্রত্যেকে নিজেকে দেবব্রতর জায়গায় বসিয়ে নিয়েছে। আমি যদি দেবব্রত হতাম তাহলে ইত্যাদি, ইত্যাদি, চিন্তা করেই চারিদিকের দেওয়ালের ক্ষয় দেখে আতঙ্কিত হয়েছে এবং এই ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে দেবব্রতকে রক্ষা করতে না পেরে যেন নিজেরাই অপরাধী হয়ে পড়েছে। তাই দেবব্রতকে তারা সবরকম সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চায়।

অথচ দেবব্রত ইদানীং এদের এই বন্ধুত্বের সততাকে নিজের মনের স্বাভাবিক উদারতা দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে এই সমস্ত রকম পরিশ্রম বা সামান্যতম কাজ থেকেও দেবব্রতকে এড়িয়ে দেওয়াকে দেবব্রত করুণা বা বন্ধুদের যক্ষ্মা-ভীতি হিসেবে ধরেছে। এই সময় এক বিরাট উৎসব হয়েছিল। দেবব্রত সুস্থ থাকলে সে তার দিন রাত্রের প্রতিটি মুহূর্তকে এই উৎসবের কাজে নিয়োজিত করত। কিন্তু বর্তমানে এই উৎসবে যেখানে প্রতি মুহূর্তে আরো কর্মী দরকার, সেখানে একটি সর্বক্ষণের কর্মী মনের উপস্থিতি সত্ত্বেও দেবব্রত কাজে নামতে পারছিল না। প্রতি মুহূর্তে সে নিজের মনে কাজে নামবার তাগিদ পাচ্ছিল। কিন্তু দেবব্রতর এই কাজে নামবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং কাজে নামতে না পারার ফলে প্রতি মুহূর্তেই তার মধ্যে একটি অসহায়তার যন্ত্রণা জন্ম নিচ্ছিল। এবং পারিপার্শ্বিক কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে মেশাতে না পেরে সে নিজের প্রতি বিরক্ত হচ্ছিল। এর মূল কারণ হিসেবে তার অসুখকে আবিষ্কার করে দেবব্রত সেই অদৃশ্য শক্তির প্রতি প্রায় উন্মত্ত হচ্ছিল। অথচ প্রত্যেকেই নিজেদের সঙ্গী হিসেবে দেবব্রতকে রাখতে উদগ্রীব। কিন্তু কোনো কাজ না করে শুধু সঙ্গী হিসেবে থাকতে দেবব্রতর প্রচণ্ড অনিচ্ছা। এমন মানসিক অবস্থায় উৎসব আরম্ভ হবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যখন একটি তোরণ নির্মাণের কাজ চলছিল তখন দেবব্রত সেখানে উপস্থিত ছিল। কোনো এক সময় তোরণটি এমন এক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়াল, যখন সেই তোরণটির একটি বিশেষ দুর্বল স্থানে সেই মুহূর্তে যদি কেউ হাত না লাগায় তাহলে পতনোন্মুখ তোরণটিকে রক্ষা করা যাবে না। সম্মিলিত 'গেল' 'গেল' চীৎকারের মধ্যে দেবব্রত মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাধা

নিষেধ ভুলে গেল এবং তার কর্মী মন তাকে সেই দুর্বলতম স্থানে হাত লাগাতে বাধ্য করল। এই দুর্বলতম স্থানে হাত লাগিয়েই দেবব্রত হঠাৎ উত্তেজিত হল। কিন্তু দেবব্রতর হাত লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই "তুমি সরে যাও আমি ধরছি" বলে যে-ভদ্রলোক সেখানে হাত দিলেন তিনি দেবব্রত যদি তোরণে হাত না লাগাত তাহলে কোনো অবস্থাতেই এমনকি তোরণটি ভেঙে পড়লেও সেখানে হাত লাগাতেন না।

দেবব্রত সেই মুহূর্তে সেখান থেকে সরে আসল। এবং যে মন থেকে ভদ্রলোক দেবব্রতকে সরিয়ে নিজে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই শুভ ইচ্ছাকে দেবব্রত অন্যভাবে ব্যাখ্যা করল। এবং এই ভদ্রলোক আমাকে করুণা করলেন, সবাই আমাকে করুণা করছে, করে, কারণ আমার যক্ষ্মা হয়েছিল, এমনতর একটা ধারণা মনে নিয়ে দেবব্রত উৎসবক্ষেত্র থেকে বাসায় ফিরল।

উৎসবের এই ঘটনার সঙ্গেই পরিবারে নিজেকে জোর করে সমস্যা তৈরি করে, ভাইবোনদের বঞ্চিত করছি, এই ধারণা মনে নিয়ে যখন দেবব্রতর অস্থিরতম সময়, মানসিক স্থৈর্য যখন ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে, তখনও দেবব্রত নিজেকে নিয়ে রসিকতায় হেসেছে। বন্ধুবান্ধবদের তাকে ভয় পাবার কৃত্রিম অভিনয়ে বাসায় তার থালা বাটির স্পর্শ বাঁচানোর অভিনয়ে দেবব্রত প্রাণ খুলে হেসেছে; এবং এই দুই ভিন্নমুখী মানসিক সংঘাতের ফলে অস্থিরতম সময়ে দেবব্রতর সাথে সীমার দেখা হয়েছিল। দেবব্রত সুস্থ হয়ে ফিরে আসবার মাসখানেক বা মাস দুয়েকের মধ্যে সীমার—যে যুবতীকে দেবব্রত স্যানোটোরিয়াম যাবার আগে এবং সেখান থেকে ফেরার পরেও ভালোবাসত—বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সীমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে ভালোবাসার ক্ষেত্রে দেবব্রত আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। সীমা—যে একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সাত অথবা আট অথবা ছয় ভাই-এর একমাত্র বোন, এবং যার বাবা যে কোনো মুহূর্তেই মেয়েকে পাত্রস্থ করবার পক্ষপাতী—বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরে এক সন্ধ্যাতে দেবব্রতকে নিজের বিয়ের সংবাদটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত-ভাবে দিতে চেয়েছিল; যেন দুপুরে ভাত খেতে খেতে তার গলায় একটা মাছের কাঁটা বে-কায়দায় বিঁধে গিয়েছে এবং প্রতিটি ঢোক গেলার সঙ্গে সঙ্গে গলায় খোঁচা দিচ্ছে; দেবব্রত সংবাদটি এমনভাবে গ্রহণ করল যেন সে প্রতি মুহূর্তে সীমার গলায় বিঁধে থাকা কাঁটাটির খোঁচা নিজের গলায় অনুভব করছে। সীমা দেবব্রতকে—যাকে সে এবং যে তাকে ভালোবেসেছে—তার বিবাহের

সংবাদ এমন নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করতে দেখে, আমার গলায় বিঁধে-থাকা এই মাছের কাঁটা নানাভাবে আমার মৃত্যুর কারণ হতে পারে একথা চিন্তা করেই যেন কেঁদে ফেলল এবং দেবব্রত 'ছিঃ ছিঃ মাছের কাঁটা গলায় বিঁধলে কেউ মারা যায় নাকি', গোছের সান্ত্বনা দিল। ফলে সীমা আরও কাঁদল। এবং একদিন সীমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর এই প্রথম সীমার সাথে তার দেখা হল। এই দেখা-হওয়া তার মনে আর এক নতুন বিষাদের জন্ম দিল। সীমার সমস্ত গা ভরে কেমন এক নতুন-বৌ সুলভ গন্ধ জড়ানো। প্রায় আগের দিনের মতোই সীমার সঙ্গে দেবব্রত গল্প করল; এবং বিবাহের পর সীমাকে দেখে ভাবল এই সীমা আমার স্ত্রী হতে পারত এবং তাহলে তার এই নতুন-বৌ সুলভ লোভনীয় ভাবের আমিই অধিকারী হতে পারতাম। এবং ইত্যাদি। অনেকক্ষণ গল্পের শেষে সীমা যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল এবং যাবার আগে দেবব্রতর খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল "আমার বিয়েকে কিন্তু তুমি অন্যভাবে নিও না। ভেবো না তোমার অসুখই আমার বিয়ের কারণ," এই কথাগুলো শুনে প্রথমে দেবব্রত পূর্ব জীবনের মতো হেসেছিল। মনে মনে বলেছিল সীমাটা একটা পাগল। মুহূর্তের মধ্যে তার মনে হল আমার অসুখটা তাহলে সীমার—অন্যখানে বিয়ে হয়ে যাবার পক্ষে একটা কারণ হতে পারত এবং আমি পাছে এ কথা মনে করি তাই সীমা আমার কাছে নিজের ভালোবাসার সততা প্রমাণ করে গেল। দেবব্রত মনে মনে হেসেছিল। সীমা এখন নতুন-বৌ-এর সুখমায়ায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখে আমাকে—যে আমি সীমাকে ভালোবাসতাম—তার সততার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল। কেন গেল? আমি তো সীমাকে অবিশ্বাস করি নি। আমার মধ্যে তো এ প্রশ্ন এর আগে জাগে নি। উৎসবের যে ঘটনা দেবব্রতর অসহায়তা বাড়িয়ে তুলেছিল, সেই ঘটনাই যেন দ্বিগুণ হয়ে সীমার একটিমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে ফিরে এল।

অর্থাৎ দেবব্রতর মনে অসুখের ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে যে বিষাদের জন্ম হচ্ছিল, সেই বিষাদ সীমার এই কথাগুলোর ফলে আরো বৃদ্ধি পেল। এবং অনেকগুলি ঘটনা মিশে ক্ষেত্রটিকে আরো পিচ্ছিল করে তুলল। ফলে দেবব্রত নামে যে যুবক তার পূর্ববর্তী জীবনে এই সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি বীতস্পৃহতার ফলে নতুন আর এক আদর্শের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল, যে যক্ষ্মা হবার পরবর্তী জীবনে নিজেকে পূর্বতন পরিবেশে

একাকী দেখে অসহায় হয়ে পড়ল ; এবং প্রতি মুহূর্তে তার এই অসহায়তা বৃদ্ধি পেল।

দেবব্রত এখন নিজের অজান্তেই নিজেকে পরাজিত নায়ক ভাবে। ফলে এখন সে প্রায়শই যে কোনো আলোচনায় যে কোনো সূত্র ধরে তার স্যানোটোরিয়াম জীবনের কথা আনে। এবং যেহেতু এ বিষয়ে সবারই উৎসাহ আছে এবং যেহেতু দেবব্রতর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, অতএব অনেকেই নানা রকম প্রশ্ন করে। ফলে যে কোনো আলোচনায় দেবব্রত মুখ্য বক্তা হয়ে ওঠে। তার মূলধন স্যানোটোরিয়ামের একটি বছর—যেখানে কম-বেশি কোনো সময়েরই মূল্য নেই। দেবব্রতর নিকট বন্ধুদের অনেকেই তার এই অসুখের ফলে ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এবং দেবব্রতকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ভেবে নিয়ে তার কাছেই কথা জিজ্ঞেস করতে আসে। কারো ওজন কমেছে, কারও বুকে পিঠে ব্যথা, কারো সর্দি ইত্যাদি। এর ফলে দেবব্রত নিজেকে যক্ষ্মা নামক রোগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখতে পেল। এবং বন্ধুবান্ধবদের এই ভীতির জন্য সে মূলত নিজেকে দায়ী করল। ফলে অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে অসুখ হওয়া ও সেরে যাবার অনেক পরে যক্ষ্মাই তার নিয়ন্ত্রণকর্তা হয়ে দাঁড়াল।

সীমার বিয়ে হয়ে যাবার পর সে মনের ওপর জোর করে একটা পর্দা টেনে নেবার চেষ্টা করল। এবং প্রায় সার্থক হল। কিন্তু তার মনে ভালোবাসার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। যক্ষ্মা হবার ফলে তার অনুভূতিগুলো তীরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়েছিল। সীমার বিয়ে হয়ে যাবার পর বাইরের নানান ঘটনার আঘাতে ও মানসিক অসহায়তা দেবব্রতকে আরো ব্যাকুল করে তুলল। এবং আমি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সৎ থাকব এই প্রতিজ্ঞা করে সে স্যানোটোরিয়ামে যে শান্তা নাম্নী রোগিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তাকে ভালোবাসার স্বীকৃতি দিল না। শান্তা স্যানোটোরিয়ামের পরিবেশের একাকীত্বের এবং অসহায়তার পশ্চাৎপটে আমাকে দৈহিক আকর্ষণ করেছিল। দেবব্রত শান্তার দেহকে উপভোগ করেছিল কিন্তু তবুও সে তাকে ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে রাজী হল না। এবং স্যানোটোরিয়াম থেকে ফিরে আসবার পর ঘটনা পরম্পরায় ভিন্নার্থ তাকে জীবনের ক্ষেত্রে অসহায় করল। এক নিজের মানসিক অস্থিরতাকে ও ক্ষুদ্রতাকে কোনো এক আশ্রয়ে নিয়ে যাবার জন্যই দেবব্রত ভালোবাসার যন্ত্রণার শরে আহত হল।

অথচ পরিবারে নিজেকে সমস্যা হিসেবে ভেবে নেওয়া, নিজের অর্থনৈতিক পরাধীনতাকে কড়া রঙে চিত্রিত করা; মানসিক উদারতা হারিয়ে নিজেকে প্রত্যেক স্থলে ছোটো করে দেখা ইত্যাদির ফলে সে কেমন যেন ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। দেবব্রত নামে যে যুবক পূর্ববর্তী জীবনে প্রায় দুঃসাহসী ছিল তার এই পরবর্তী জীবনের ভীতি দেখে সে অবাক হল। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষ্য করল যে তার চারিদিকে কতগুলি বলয় রচিত হয়েছে, এবং প্রতিটি দ্বিতীয় বলয় প্রথম বলয় থেকে বৃহৎ ব্যাসযুক্ত। প্রতিটি ব্যাসের মধ্যে আছে তার মানসিক যন্ত্রণার ফলে জাত বিষাদ। এবং এই বলয় বিষাদ ও অসহায়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দেবব্রত হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল—তাকে ঘিরে তার বন্ধুদের একটা ভিড়। সবাই দেবব্রতর অজ্ঞাত কোনো কারণে উত্তেজিত ও উজ্জ্বল।

: দেবু খবর শুনেছিস ?

: না কি খবর ?

: রাশিয়া আকাশে মানুষ পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছে। কি যেন নাম রে ?

: গাগারিন।

: সে কি রে ? দেবব্রতর গলায় বিস্ময় আটকে গেল। চীৎকার করে এই বিরাট সাফল্যকে সম্বর্ধনা জানাতে চাইল। কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। দেবব্রত হঠাৎ অবাক হল। এই পৃথিবীর প্রচণ্ড আকর্ষণকে ছাড়িয়ে কী করে একটা মানুষ এই পৃথিবীরই আকাশ থেকে এই তারার মতো পৃথিবীকে দেখছে। দেবব্রত ভাবতে চেষ্টা করল কোন প্রচণ্ড গতি এই মানুষটিকে যার নাম গাগারিন, আকাশের নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে ভেসে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে। এই পৃথিবীর চারিদিকের আকর্ষণের বলয়গুলোকে কী করে সে ছিঁড়ল। দেবব্রত এগিয়ে এলো সবার সঙ্গে মিশে, বন্ধুদের নানা কথা এলোমেলোভাবে কানে আসছে।

দেবব্রত নিজেকে সেই শূন্যে ঘূর্ণায়মান মানুষের সঙ্গে বিরাট শূন্যতার মধ্যে দেখতে চাইল। এই পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট তারা। একে ঘিরে নানা বর্ণের মেঘের মালা। এর একদিকে রাত্রি আর একদিকে দিন। কি আশ্চর্য ! আমাদের সবার মাঝখানে কালো সুতোর মতো দিনরাত্রির মিলন। এই পৃথিবীর আশ্রয়ে থেকেও, এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অন্য আর এক আকর্ষণে

চলে যাওয়া, এবং ফিরে আসা; দেবব্রত আকাশে তাকাল। তারা অসংখ্য তারা। যেন একটা বিরাট মালা। অথবা একটি ডালাতে এলোমেলো অনেক ফুল। আর এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা অথচ কোন এক অদৃশ্য বিচিত্র আকর্ষণের দ্বারা একে অন্যের সাথে অন্বিত। আমরাও। আমরাও।

দেবব্রত এই উত্তেজনাকে মনে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে মিশে এগোতে লাগল। দেবব্রত আকাশে তাকাল, তারা দেখল, আকাশ—নিজেকে এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকর্ষিত দেখতে পেল; এবং জীবনের। জীবনের আকর্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেবব্রত তার তেইশ বছরের জীবনকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে জাত বিষাদের মধ্যে বন্দী দেখে চিন্তিত হল। এবং এই অসহায়তার বন্ধন ছিন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। দেবব্রত সেই গতিকে, যে গতি একটি মানুষকে মহাশূন্যের মধ্যে স্থাপিত করেছে, কল্পনা করতে চাইল এবং নিজের মধ্যে সেই গতির সন্ধানে আকুল হল। দেবব্রতর মনে হল যে ইচ্ছে করলে এই গতির দ্বারা তার চার পাশের বিষাদের বলয় থেকে এবং স্বনির্মিত যন্ত্রণার থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এই গতির সন্ধানে সে আকুল হল।

বন্ধুদের সাথে যেতে যেতে দেবব্রত অর্ধেক মন নিয়ে, তার আর অর্ধেক মন তখন আকাশে ঘূর্ণায়মান একটি মানুষের সঙ্গে সে প্রবহমান মানুষের স্রোতকে লক্ষ্য করছিল, এবং এই কয়েক মুহূর্ত ধরে তার অসুখ, অর্থনৈতিক পরাধীনতা, এবং মানসিক অসহায়তাকে ভুলে থাকতে পেরেছিল। প্রবহমান মানুষের স্রোত দেখতে দেখতে দেবব্রত নিজেকে এই গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে দেখে অস্বস্তি বোধ করল। আমি সকালে উঠে চা খাই, পড়তে বসি, দাড়ি কামাই, স্নান খাওয়া সেরে কলেজ যাই একই কথার চর্বণ করি। বাসায় ফিরি, খাই বিশ্রাম করি, পড়তে বসি, খাই এবং এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি, এবং স্মৃতির রোমন্থন করি। এবং আমার সকালে ঘুম থেকে ওঠা ও রাতে শুতে যাবার মধ্যবর্তী মুহূর্তগুলিকে অসহায়তার রঙে চিত্রিত করে দিই। দেবব্রত চোখের সামনে অসহায়তার রঙে চিত্রিত মুহূর্তগুলিকে মিলিয়ে যেতে দেখল। এবং হঠাৎ মনে পড়ল স্যানাটোরিয়ামে এক সকালে নিজের ঘর থেকে আকাশে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন অনেকটা প্রায় মিলিয়ে থাকা বুদ্‌বুদ্ দেখতে পেয়েছিল, এবং সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলেই বুদ্‌বুদ্‌গুলো মিলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দৃষ্টিকে একেবারে ঢিলে করে দিলেই আবার বুদ্‌বুদ্‌গুলোকে ওপর থেকে নীচে পড়তে দেখছিল, আকাশের গা বেয়ে।

আমার অসহায়তার রঙে চিত্রিত মুহূর্তগুলো আমাকে প্রতি মুহূর্তে একটা বেড়াজালের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেবব্রত মনে মনে স্বীকার করল তার এই বেড়ার দিকে এগিয়ে না যাবার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ছে। ফলে তার চারিদিকে বিষাদভর্তি বলয়গুলো আরও শক্ত হচ্ছে, এবং দেবব্রত নিজের মধ্যে সেই গতির উপস্থিতি দেখতে চাইছে, যে গতি তাকে বলয়গুলো ছিঁড়ে বের করে আনবে। এই গতির কথা মনে আসতে দেবব্রতর এই অর্ধেক মন মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান তার আর অর্ধেক সত্তার সঙ্গে মিলিত হল এবং তার চোখের সামনে আশ্চর্য কমলা রঙের আস্তরণে ঢাকা পৃথিবীটা স্বপ্ন হয়ে উঠল। মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান দেবব্রত অনেক নীচে আকাশে উজ্জ্বলতম তারা, এই পৃথিবীর আঘ্রাণ গ্রহণ করল এবং এই আঘ্রাণই তাকে মাটির আকর্ষণে নিয়ে এল; এই মাটির আকর্ষণ হঠাৎ তার বিষাদ অসহায়তার সঙ্গে মিশে তাকে আবার পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনল। দেবব্রত চারিদিকের মানুষগুলোর গায়ে সেই মাটির গন্ধ এবং আকর্ষণের গন্ধ পেয়ে অস্থির হল। এবং একটি প্রচণ্ড গতির দ্বারা তাড়িত হতে চাইল। দেবব্রতর মনে হল—সে যদি অত্যন্ত জোরে একটা দৌড় লাগাতে পারত, এত জোরে যে এই গন্ধগুলি তাকে পশ্চাৎধাবন করতে পারবে না, তাহলে হয়তো সে এই আকর্ষণের বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ দেবব্রতর মনে হল যে যক্ষ্মা নামক একটি অসুখ দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, এবং সে প্রতি সন্ধ্যায় ডিম, দুধ খাবার জন্য বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে একা একা প্রায় পরাজিত মধ্যযুগীয় বীরের মতো রাস্তার আলোয় নিজের দীর্ঘ ছায়া দেখতে দেখতে বাড়ি ফেরে; এবং তার এই যক্ষ্মা হবার ফলে তাকে কেন্দ্র করে সংসারের মধ্যে সেই কালপেঁচা প্রবেশ করতে চাইছে—যার আগমনে লক্ষ্মীদেবী ফুটপাথে আকাশে পা তুলে চিৎপটাং হয়ে থাকেন।

দেবব্রত চোখের সামনে রাস্তায় লক্ষ্মী ঠাকরুণকে দেখতে পেল। চিত হয়ে পড়ে আছেন। প্রায় নগ্ন দৈবিক মহিমা। শীর্ণ স্তন দুটো ডাইনি বুড়ির মাথার চুলের মতো। পাঁজরের খাঁচার উপর পেঁচাটা একটা শীর্ণ শিশুর রূপ ধরে বসে আছে। দড়ির মতো উরু। দেবব্রত এই লক্ষ্মী ঠাকরুণের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজেকে নাকে রুমাল দিতে দেখল। দেবব্রত ভাবল আমি যদি লক্ষ্মী হতাম তাহলে···

: দেবু তুই চুপ করে কেন রে ?

: না—কৈ ?

দেবব্রত দেখল সে একটি পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুরা একে অন্যের সিগারেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে। দেবব্রতর ঠোঁট শির শির করে উঠল, আমি এককালে প্যাকেট প্যাকেট 'চারমিনার' খেতাম। দেবব্রত অতীতের সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকটিকে করুণা করতে চাইল। এবং বুকজোড়া এক আশ্চর্য ব্যথা অনুভব করল, যার অনুভব মাত্র করা যায়, কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না। দেবব্রত এই ব্যথার তাড়নায় অস্থির হল। পানের দোকানের আয়নায় দেবব্রত নিজের প্রায় রক্তাভ মুখ দেখলো।

: আমি যাই, দেবব্রত হঠাৎ পেছন ফিরল।

: এখনি ? আটটাতো বাজে নি ?

: না ভালো লাগছে না। দেবব্রত এগিয়ে গেল। একদমে অনেকখানি হেঁটে ভাবলে; এখন কোথায় যাবে, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বাড়ি মানেই সেই ঘর। একটি বিছানা, টেবিলে অসংখ্য বই, তাকে পুরনো কাগজের স্তূপ, কেমন পুরনো গন্ধ। দেবব্রত সমস্ত বুক জুড়ে সেই ব্যথাটা অনুভব করল। কিন্তু ব্যথাটা বুকে নয় তা সে জানে। ব্যথাটা ঠিক ব্যথা নয়। কি যেন কেমন যেন।

দেবব্রত একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। সামনের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে দোকানদারের হাতে পয়সা তুলে দিল।

: পানে কি দেবো ?

: ভাজা মসল্লা, এলাচ, বাবা জরদা।

পান মুখে দিয়ে চুনের বোঁটা হাতে রাস্তায় পা দিতেই দেবব্রতর বুকের সেই ব্যথাটা ছট্‌ফট্ করে উঠল। যেন বুকের খাঁচার মধ্যে বন্দী একটা পাখি উড়তে চাইছে। ব্যথাটা পাখি হয়ে পাঁজরের হাড়ের কাঠিতে ঠোকরাচ্ছে। দেবব্রতর গলার কাছে সমস্ত যন্ত্রণা যেন দলা পাকিয়ে গেল।

দেবব্রত আকাশের কথা ভাবল, একটা মানুষ—গাগারিন—আকাশে ঘুরছে, মাটির গন্ধ, আমি আকাশে গিয়েছিলাম, মাটির গন্ধ, জীবনের আকর্ষণ, আমি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলাম, গড্ডালিকাপ্রবাহ, আমি, আমার অসহায়তার রঙে চিত্রিত মুহূর্তগুলো, চারিদিকের বিষাদভর্তি বলয়গুলো চেপে আসছে, আমাকে চারিদিক থেকে এক অসহায়তা ঘিরে ধরছে, আমাকে এই বিষাদের আকর্ষণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এবং দেবব্রতর বুকজোড়া সেই ব্যথা—যা ঠিক ব্যথা নয় কিন্তু কি দেবব্রত ঠিক জানে না—ছটফট করে উঠল। দেবব্রত বুকে হাত দিল এবং হাত দেওয়া মাত্র অনুভব করল বুকের মধ্যে বন্দী এই যন্ত্রণাই গতি হয়ে যাচ্ছে। দেবব্রতর সমস্ত বুক জুড়ে সেই আশ্চর্য গতির তাড়না।

[বিজন চৌধুরী

মিছিলের শহর

আর এক মিছিল

কাক ডাকার শব্দ শুনে উঠে পড়তে হয়। ঘরের মধ্যে তখনো আবছা অন্ধকার। মনে হয় আর একটু গড়িয়ে নিতে পারলে বেশ হত। কিন্তু পারা যায় না। ওদিকে আবার 'লেট' হয়ে যাবে।

অফিস কাছারি নয়, তবু 'লেট' হবার ভয় থাকেই। দেরী হয়ে গেলে মুশকিল, আর কেউ এসে নিয়ে যাবে। কিংবা হয়তো নষ্টই হয়ে যাবে।

হাতে ঝুড়ি নিয়ে প্রায় ছুটতে থাকে নসীর মা। তারপর ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মতো সে হাঁটে।

সামনে এক পাল গোরু কিংবা মোষ। তাদের মাঠে চরতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পেছনে নসীর মা। এই রকম রোজ। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন।

গ্রীষ্ম বর্ষা শীত—কোনো বাছ বিচার নেই। সকাল বেলা, চারণে যাবার সময়। আবার গোধূলিতে, যখন ওরা ফিরে আসে। সব সময় নসীর মা থাকে পেছনে।

আকাশ তার চোখে পড়ে না। না কচি তাজা সকাল বেলায়। না গোধূলির স্বর্ণ বর্ণ রঞ্জিত ক্লান্ত সন্ধ্যায়। সময় থাকে না। নসীর মাকে চলতে হয় মাটির দিকে তাকিয়ে। আকাশের দিকে তাকাতে হয় কখনো কখনো—বৃষ্টি এল কি না দেখবার জন্য। অথবা যখন প্রখর রৌদ্রতাপে করুণার লেশমাত্র থাকে না। আর নয়তো একটি দীর্ঘশ্বাস ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। নসীর মার অগাধ বিশ্বাস, ঐ আকাশ ভগবানের বাসস্থান।

তার নিজের বাসস্থান বলতে একটি মাটির ঘর। দেখতে মনে হয়, কোনো কিছুর ভারে নুয়ে পড়েছে। যেমন নসীর মা নিজে। সে কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত কিনা সে কথা কারও মনে নেই। না তার নিজের, না অন্য কারও। ঘরে তৈজসপত্র কিছু নেই প্রায়। মেঝে থেকে চালা পর্যন্ত স্তূপীকৃত ঘুঁটে। রাশি রাশি। অগুন্তি। তারই মাঝখানে ফুট চারেক জায়গা নিয়ে শুয়ে ঘুমোয় নসীর মা।

নসীর মা ঘুঁটেওয়ালি। মজা এই, যে লোক ঘুঁটে বানায় আর তা বিক্রী করে দিন চালায়, তাদের কোনো নাম থাকে না। পেশাটা প্রায় মেয়েদের একচেটিয়া। ওদের পরিচয় পেতে এবং দিতে হয় কারও মা, কিংবা দিদি অথবা বৌ বলে। নসীর মার জীবনে নসী বলে কেউ কখনো এসেছিল কিনা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তবু তার নাম নসীর মা।

সাল তারিখ এসব তার মনে থাকে না। এইটে শুধু তার মনে আছে, একবার সারা দেশ জুড়ে আকাল এসেছিল। মরণের একটা যেন মিছিল লেগেছিল রাজ্য জুড়ে। রাজার কাছে দুঃখু জানাতে অনেকের সঙ্গে সে-ও এল গ্রাম থেকে এই শহর কলকাতায়। সেখানে কত পাক, কত ঘূর্ণী। কত শত তলিয়ে গেল। নসীর মা পাক খেয়েছিল বটে, ডোবে নি। তারপর সে ঘুঁটেওয়ালি।

সকালে বিকেলে গোবর কুড়িয়ে আনতে হয়। তাতে পাঁক মেশাতে হয়। করাত কল থেকে নিয়ে আসতে হয় কাঠের গুঁড়ো। ওসব মিশিয়ে ঘুঁটের পরিমাণ যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে ঘুঁটের দাহন শক্তি। অনেক ঘুঁটেওয়ালি আছে যাদের সঙ্গে খাটাল মালিকদের বন্দোবস্ত থাকে। খাটাল থেকে গোবর নিতে হয় পয়সা দিয়ে। নসীর মার ওরকম কোনো ব্যবস্থা নেই।

ঘুঁটেওয়ালিদের একটা মস্ত সমস্যা হল ঘুঁটে শুকোনো। সব জায়গায় সেটা সম্ভব হয় না। ওর জন্য দরকার হয় পোড়ো বাড়ি, কিংবা ভূতুড়ে বাড়ির দেয়াল। আর নয়তো রেল লাইনের ধারে চওড়া জায়গা। এমনি ধারা হাঙ্গাম হুজ্জুত করে তবে তৈরি হয় ঘুঁটে—শহর কলকাতার হাজার হাজার সংসারের একটি মূল্যবান জ্বালানি।

নসীর মায়েরা এই শহরে আছে কয়েক শত। তারা কারও কাছে হাত পাতে না। আপন পেশা অনুসরণ করে তারা স্বাবলম্বী। মেহনতের মূল্যে তারা মূল্যবান।

মধ্য কলকাতার একটি বই-এর দোকানের পাশে একখানা ক্ষুদ্র ঘরে একদিন সহসা দেখতে পেলাম, একটি বিধবা মেয়ে সদ্য-ছাপা কাগজ ভাঁজ করছে বসে বসে। ওটি এক পাবলিশারের দোকান। নানা ইস্কুল আর কলেজের বই ওখান থেকে প্রকাশ হয়।

বই প্রকাশের নানা ব্যাপার। লেখক তা লেখেন। ছাপাখানায় সেই লেখা ছাপা হয়। তারপর তার সেলাই বাঁধাই। সবশেষে পুরো বইখানা তৈরি হয়ে আসে দোকানে।

বই বাঁধাই-এর কাজটা মুখ্যত পুরুষের কাজ। আগে তো জানাই ছিল না, এ কাজে মেয়েরাও হাত লাগিয়ে থাকেন। এখন শোনা গেল, শুধু হাত লাগানো নয়, এ কাজে মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর। আর তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মেয়েরা এ কাজে বেশ নিপুণ। তাছাড়া, সব থেকে বড় কারণ হল মেয়েদের দিয়ে কাজ করালে মালিকদের পয়সা খরচ অনেক কম।

বই বাঁধাই-এর কাজ করে থাকেন এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, তাঁর নাম পারুল। তথাকথিত ছোট জাতের মেয়ে নন, পদবিতে মিত্র।

সংসারে আর কে আছে?

—একটি সন্তান।

স্বামী তার নিরুদ্দেশ। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে কিন্তু রিফিউজি সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। বাবা-মা বহু পূর্বেই গত হয়েছেন। দুই ভাই ছিল। কোথায় ছিটকে পড়েছে পারুল মিত্রের তা জানা নেই।

এই কাজে কত বেতন পান ?

—বেতন বলে কিছু তো নেই। কনটাক্ট (কনট্রাক্ট) কাজ।

—মাসে কত হয় ?

—৩৫ টাকা, বড় জোর চল্লিশ টাকা।

তুজনের তাতে চলে ?

হাসি দেখা দেয় পারুল মিত্রের মুখে।

চলে ?

—না চলে না—একজনদের বাড়িতে মায়ে ঝিয়ে কাজ করে দিয়ে কিছু পাই। কখনো টাকা, কখনো খাবার।

বাকীটা ? চালের দামই তো চল্লিশ টাকার বেশি।

—ওটা আমাদের কোনো সমস্যাই নয়। ভাতই খেতে হবে এমন বিলাসিতা আমরা অনেক কাল বর্জন করেছি।

—কী খেয়ে থাকেন তাহলে ?

প্রথমে একটু সংকোচ ছিল। তারপরে শুনলাম—ডাল আর সব্জি সেদ্ধ করে খাই। রুটি খাই। ছাতুও খাই।

ঘুরিয়ে অন্য প্রশ্নে যেতে হয়। এইরকম কাজে এলেন কেন ?

—কী করব! লেখাপড়া তো শিখিনি। দোরে দোরে ভিক্ষে করব নাকি ? আর এই শহরে মান ইজ্জৎ নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী কঠিন তা আপনারা বুঝতেও পারবেন না।

স্বামীকে ফিরে পাবার আশা পারুল মিত্রের নেই। এখন একমাত্র সাধ মেয়েটাকে মানুষ করা। একটু লেখাপড়া শেখানো। ওর জীবনটাও যেন পারুল মিত্রের মতো না হয়।

না কারও সাহায্য তিনি চান না। সাহায্য নেবার দায় অনেক। তাতে সম্ভ্রম বজায় থাকে না। এ তাঁর এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

এমনি পারুল মিত্ররাও শহর কলকাতায় ভিড় করে আছে। তারা থাকে লোকচক্ষুর অগোচরে। ক্বচিৎ কদাচিত যখন তারা চোখে পড়ে তখন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এমনি আর এক রকমের মেহনতী মেয়ে আছে। তাদের কথাও লোকে

খুব বেশি জানে না। এদের দেখতে পাওয়া যাবে কলকাতার কিছু কিছু ছাপাখানায়।

মেয়ে কম্পোজিটার দিয়ে কাজ করালে প্রেস মালিকের অনেক সুবিধা। এরা মাস মাইনেতে কাজ করে না। কাজ করে কনট্রাক্ট-মাফিক। লেখার কপি ভালো থাকলে এদের কাজ হয় নিখুঁত। আর পুরুষ কম্পোজিটার নিতে গেলে সারা দিন ভর কাজের কনট্রাক্ট করে নিতে হয়। তাতে আড়াই টাকা তিন টাকা খরচ। মেয়েদের বেলা সে অসুবিধে নেই। তারা অনেক কম পয়সায় নির্দিষ্ট সময়ের কনট্রাক্ট নিয়ে কাজ করে।

প্রেসের মালিক হয়তো দেখলেন, একখানা বই-এর তিনটি পৃষ্ঠা কম্পোজ হতে বাকী আছে। পুরুষ কম্পোজিটার নিলে সারা দিনের খরচ দিতে হবে, অথচ কাজটা সারা দিনের নয়। এই অবস্থায় মেয়েদের ডাক পড়ে।

আর তাদের কাজের ধারাটাও অদ্ভুত। মানিকতলার এক বস্তিতে মাসে চার টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে বাস করেন মঙ্গলা। প্রৌঢ়া। নিজের কথা নিজে কেউ বলে না। তবু লোক-পরম্পরায় জানা যায়, যৌবনকালে মঙ্গলা একটু প্রজাপতি-স্বভাবা ছিলেন। তার জন্য তাঁকে কম ঠকতে হয় নি। তাই তাঁর জীবনের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা গভীর।

মঙ্গলার একটি দল আছে। মেয়ে কম্পোজিটারের দল। কাজের খবর তাঁর কাছেই আসে। কিন্তু মঙ্গলা কখনো একলা কাজে যান না। তিন পৃষ্ঠা কাজের খোঁজ পেয়ে তিনি দলের দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান। তারপর তিনজনে কাজ করে আসবার সময় তিন ছয় আঠারো আনা নিয়ে চলে আসে।

মঙ্গলার আর একটা কাজ আছে। নিজে জীবনে অনেক দেখে এবং ঠেকে শিখেছেন। তাঁর জানা আছে, এই মস্ত শহরটায় নারী-মাংস-লোলুপ শিকারীর অভাব নেই। সেই সব বিপদ থেকে কচি কাঁচা নরম-সরম গরীব মেয়েগুলিকে রক্ষা করা তাঁর একটা মস্ত বড় কাজ।

অহঙ্কারের অভ্রংলিহ অট্টালিকায় ঘেরা এই শহর কলকাতার কতজন লোক এদের খবর রাখে!

আরো একটি আশ্চর্য মেয়েকে দেখেছি রাজাবাজারের বস্তিতে। তারও কোনো নাম নেই। পরিচয়: রহিম শেখের বউ।

রহিম শেখ কাচ কলে কাজ করত। লম্বা নলের মধ্যে আপ্রাণ শক্তিতে ফুঁ লাগিয়ে বড় বড় কাচের পাত্র তৈরি করা ছিল তার কাজ। ইংরেজীতে বলে গ্লাস ব্লোইং। এ কাজে ভয়ানক পরিশ্রম। বুক একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। এই কাজ করতে হলে শ্রমিকদের দুধ, ফল এবং নানা পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয়। রহিমের মালিক রহিমকে তা দেয় নি। আর তাই সে যক্ষ্মায় মরমর। একটা রিলিফ প্রতিষ্ঠান থেকে ঔষধ পাওয়া যায়। কিন্তু পথ্য কোথায় পাওয়া যাবে! খেটে পয়সা রোজগার করার ক্ষমতা আর রহিম শেখের নেই।

রোজগারের ভার এখন তাই বউ-এর ওপর। অবলম্বনটা অভিনব। বিড়ি বানানো। প্রথম প্রথম অসুবিধে হত। এখন রপ্ত হয়ে গেছে। এক হাজার বিড়ি বানাতে পারলে তিন টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু সারাদিনে রহিম শেখের বউ তা পারে না। পাঁচ শ'র বেশি তার হয় না। সেই মজুরীর ওপর দুটো লোকের খাওয়া-পরা। রোগীর চিকিৎসা। হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই রহিমের বউ মাথা খারাপ করে নি।

রহিমের বউ রহিমকে শেখাচ্ছে। বিড়ি বানাতে আর ঠোঙা তৈরি করতে। এতে তার নিজের বানানো বিড়ির পরিমাণ কম হচ্ছে। কিন্তু রহিম শিখে নিতে পারলে সংসারের আয় অনেক বেড়ে যাবে। এই রহিম শেখের বউ-এর ভরসা।

মুখে তার হাসি আছে। মনে ইজ্জৎবোধ। বুকে সাহস।

এমন মেয়েও আছে এই কলকাতায়। ইট কাঠের স্তূপের আড়ালে। ধন ঐশ্বর্য যেখানে পুঞ্জীভূত নয়, সেইখানে।

মিছিলের শহর কলকাতায় এ এক আশ্চর্য মিছিল। মেহনতের, মর্যাদার, জীবনের। হয়তো এরা কোনোদিন নিশান নিয়ে ইনকিলাব বলে রাজপথে এসে সারি বাঁধে নি। কিন্তু মানুষের জীবনের অখণ্ড মিছিলে এরা শরিক। যে মিছিল চলেছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে আত্মবিক্রয়ের প্রতিরোধে। চলেছে জীবনবোধের প্রেরণায়।

রাজপথের মিছিল কি আপন সারিতে এদের ঠাঁই দেবে না? কবে দেবে?

প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের অবদান

মহাকাশচারী গাগারিন, তিতোফ, নিকলায়েভ, পপোভিচ, বিকোভস্কি, ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা, শেফার্ড, গ্লেন, কার্পেণ্টার ও গর্ডন কুপার,—এঁদের কৃতিত্বে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজনা সম্ভব হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা এই বৈপ্লবিক সংযোজনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যেও মহাকাশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানবার অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছে। এই মহাকাশ বিজ্ঞানেই 'আয়নোস্ফিয়ার' (Donophere)-এর গবেষণা একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই—'আয়নোস্ফিয়ার' সম্বন্ধেও মানুষের কৌতুহল থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'আয়নোস্ফিয়ার'-এর প্রকৃতি কি, তার বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে কোনটা কত উঁচুতে, ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্তরগুলির উচ্চতার কি রকম হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, স্তরের উৎপত্তির কারণ কি—এ সম্বন্ধে বিশেষ করে বিলাতের রয়েল সোসাইটির ফেলো ও সম্প্রতি লোকান্তরিত জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানী ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা 'আয়নোস্ফিয়ার' সম্পর্কিত গবেষণার নতুন একটা দিকে পথ নির্দেশ করেছে।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্যন্ত উচ্চতা বাদ দিয়ে তার ঊর্ধ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কয়েকশত মাইলব্যাপী আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল (আয়নায়িত বায়বীয় স্তর) পরিব্যাপ্ত। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রভা, চুম্বক-ঝটিকা, বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলন প্রভৃতি ঘটনাবলীর উদ্ভবও এই আয়নমণ্ডলে।

আয়নমণ্ডল চারটি বায়বীয় স্তরে স্তরীভূত। বিজ্ঞানীরা চারটি স্তরের-ই সন্ধান পেয়েছেন। D, E, F_1 ও F_2 নামে এই স্তরগুলি বিজ্ঞানে পরিচিতি লাভ করেছে।

আয়নমণ্ডলের বাতাস বিদ্যুৎপরিবাহী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই অঞ্চলের বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী কেন?

উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলিতে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা 'ইলেক্‌ট্রন' এবং একই সঙ্গে ধন-তড়িৎ আর ঋন-তড়িৎ বিশিষ্ট 'আয়ন' (তড়িতাবিষ্ট অনু বা পরমাণু-কে বলা হয় 'আয়ন') রয়েছে বলেই আয়নমণ্ডলের বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী, তাই, স্তরগুলি বিদ্যুৎ-পরিবাহকরূপে কাজ করে। তড়িৎ-নিরপেক্ষ অনু বা পরমাণু থেকে 'ইলেক্‌ট্রন' বেরিয়ে আসার পদ্ধতিকে বিজ্ঞানে 'আয়নক্রিয়া' (Ionisation) বলা হয়। সূর্যের বিকিরণক্রিয়ার (Radiation) ফলেই 'ইলেক্‌ট্রন' অনু বা পরমাণুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে। আয়নমণ্ডলের স্তরগুলির উপর যখনই সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি (Ultra-violet ray) পড়ে, তখনই 'রেডিয়েশন' সম্ভব হয়।

আয়নমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহক স্তরগুলি কি ধরনের কাজ করে ?

এই স্তরগুলি বেতার-তরঙ্গগুচ্ছকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বেতার তরঙ্গগুলিই দেশ-বিদেশের বার্তা রেডিও সেটের মাধ্যমে আমাদের কাছে বহন করে নিয়ে আসে। তাহলে বেতার-তরঙ্গগুলি এক জায়গা থেকে দূর-দূরান্তে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে ?

বেতারের মূল তথ্যের আবিষ্কারক মহাবিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বক বল-ক্ষেত্রের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা করতে গিয়ে 'তড়িৎ-চুম্বকীয় ঢেউ' (Electro-magnetic wave) আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, এই গতিবেগ, আলো ও তাপ-বিকিরণের গতিবেগের সমান—প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ১৮৮৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হের্ৎজ (Hertz) এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে 'ম্যাক্সওয়েলের ঢেউ'—যা এখন বেতার-তরঙ্গ নামে সুপরিচিত, ল্যাবরেটরিতে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। হের্ৎজের (Hertz) তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (wave length) ছিল কয়েক গজ কিন্তু কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর তৈরি যন্ত্র থেকে যে বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল খুব-ই ছোট, এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। আচার্য বসুই বিজ্ঞানী হের্ৎজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন।

হের্ৎজের বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর কুব্জ-পৃষ্ঠ অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশে পৌঁছতে পারে কিনা, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংশয় দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তার সমাধান পেয়েছেন।

১৯০২ সালে বিজ্ঞানী কেনেলি ও হেভিসাইড যে তথ্য পরিবেশন করেন, তা থেকেই প্রথম জানা গেল, আয়ন মণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহক স্তরগুলিই বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ১৯২৪ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী অ্যাপলটন্‌ও ক্ষণস্থায়ী একগুচ্ছ তরঙ্গ পাঠিয়ে দেখলেন 'হেভিসাইড-স্তর'-এ (বিজ্ঞানী হেভিসাইডের নামানুসারে) তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো। এজন্য স্তরগুলিকে প্রতিফলক স্তর নামেও অভিহিত করা হয়।

প্রতি সেকেণ্ডে বেতার-তরঙ্গমালা ১,৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ ৩,০০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে ছড়িয়ে পড়ে। মহাবিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের হিসাব অনুযায়ীই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে। ৩,০০,০০০ কিলোমিটারকে তরঙ্গ সংখ্যা (Frequency) দিয়ে ভাগ করলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের (wave-length) মাপটা পাওয়া যায়। কিন্তু সবকয়টি বেতার-তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের হয় না, যেমন—জার্মান বিজ্ঞানী হের্ৎজ কর্তৃক সৃষ্টি বেতার-তরঙ্গ ও ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের নয়। দূরপাল্লার যোগাযোগে হ্রস্ব-তরঙ্গের কার্যকারিতা অনেক বেশী।

আয়নমণ্ডলের স্তরে যখন বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো, তখন প্রশ্ন উঠল, এই 'হেভিসাইড-স্তর' ভূ-পৃষ্ঠের কত উঁচুতে? অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিজ্ঞানীরা অবশেষে দুটো স্তরের সন্ধান পেলেন। একটি প্রায় নব্বই কিলোমিটার, আর একটি প্রায় দুশো কিলোমিটার উঁচুতে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই স্তর দুটোকে E ও F_1 নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

"এই দুটো স্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বিজ্ঞানী অ্যাপলটন আরও গবেষণা চালিয়ে গেলেন। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁর সন্দেহ হল E স্তরের নীচে (ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ষাট কিলোমিটার উঁচুতে) হয়তো আর একটি স্তর আছে। কিন্তু অ্যাপলটন এই স্তরের অস্তিত্বের কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ দিতে পারলেন না। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও এই স্তরের কোনো প্রমাণ পেলেন না।

১৯৩৫ সালে অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁর সহকর্মীরা ভূ-পৃষ্ঠের পঞ্চান্ন কিলোমিটার উর্ধ্বে আয়নমণ্ডলের একটি স্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে যান (অ্যাপলটন এই স্তরেরই অস্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ করেছিলেন) ও সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করেন। অ্যাপলটন

D-স্তর নামে এর নামাকরণ করেছেন। ডঃ মিত্রের সহকারী ডঃ হৃষীকেশ রক্ষিতও প্রতিফলক স্তর নিয়ে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। D-স্তরটির অস্তিত্ব শুধু দিনের বেলাতেই থাকে।

অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর ছাত্র ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড় (বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্সের প্রধান অধ্যাপক) ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর চল্লিশ কিলোমিটার উঁচুতে আরও একটি বিদ্যুত-প্রতিফলক স্তর আবিষ্কার করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলওয়েলও এই স্তরের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেন ও বিলাতের বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল 'নেচার'-এ এ-সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। অধ্যাপক কলওয়েল তখন জানতেন না,—অধ্যাপক মিত্র ও অধ্যাপক ভড় অনেকদিন আগেই এই স্তরটিও আবিষ্কার করে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন।

এই আবিষ্কারের পর প্রায় পঁচিশ বছর চলে গেছে। আজও এই নতুন প্রতিফলক-স্তর সম্পর্কে আর কোনো তথ্য হাজির হয়নি। ডঃ মিত্রের ধারণা ছিল, যে-বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন পাওয়া গিয়েছিল, তা সম্ভবত কোনও চলমান এরোপ্লেন থেকে, রেডার প্রতিফলন জাতীয়। অবশ্য তখনও রেডার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। অধ্যাপক মিত্র ও অধ্যাপক ভড় যে প্রতিফলন-সূত্রে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন, একই প্রতিফলন-সূত্র অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালিয়ে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব-মুহূর্তে রেডার যন্ত্র তৈরি করা হয়।

অধ্যাপক মিত্রের বিখ্যাত বই 'দি আপার অ্যাটমস্‌ফিয়ার' বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণায় আর একটি বিরাট অবদান। এই বইয়ে উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের যে সব তথ্য আলোচিত হয়েছে, সবই কৃত্রিম উপগ্রহ ডিজাইনের সময় অনেক কাজে লেগেছে। এজন্যই সোভিয়েত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বইটির এত চাহিদা। বইটি ১৯৪৭ সালে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন মুল্লুকে হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়ে যায়। ১৯৫২ সালে এটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুবাদ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।" (লেখকের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রেডিও-টেলিফোনির আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। রেডিও-

টেলিফোনির আবিষ্কারের মূলে ছিল এক বিশেষ ধরনের ভাল্‌ভ্ (valve); আজকাল রেডিও সেটে এই ভাল্‌ভ্‌-কে কাজে লাগানো হয়েছে। এই ভাল্‌ভের জন্যই আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। যে বেতার-তরঙ্গ ছিল অত্যন্ত মৃদু, ধরা যেত না, ভাল্‌ভ তাকে অবশেষে শ্রুতিগোচর করিয়েছিল। অধ্যাপক মিত্রও এই ভাল্‌ভের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বেতার-বিষয়ে তৎকালীন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গ্যিতঁর-এর ল্যাবরেটরিতে ভাল্‌ভ সম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এখানেই তাঁর বেতার-গবেষণার প্রথম হাতে খড়ি হয়।

আয়নমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহী স্তরগুলিকে অতিক্রম করেই আজ মহাকাশচারীদের মহাকাশে যেতে হচ্ছে। তাই—কোন্ স্তরের কি প্রকৃতি, এ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ডঃ মিত্রের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য নিতে হচ্ছে।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

People and Politics in Early Medieval India. (1206—1394 A. D.) Asit Kumar Sen. Indian Book Distributing Company. Cal.-9.

ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে একটি পুরাতন ধারণা এখনও আমাদের ইতিহাস চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধারণাটি হল এই যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক ঘটনাগুলিতে, কিম্বা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে—দেশের জনসাধারণের কোনো ভূমিকাই ছিল না। আধুনিক ইতিহাসের সূচনা পর্যন্ত ভারতের সাধারণ মানুষ—নিরীহ মূক পুতুলের মতো রাজার অনুজ্ঞা আর স্বেচ্ছাচারী শাসনের মুখাপেক্ষী ছিল। ভারতে মধ্যযুগীয় মুসলমানী শাসন সম্পর্কে এই ধারণা যে বার বার প্রযোজ্য হয়েছে তাই নয়, অনেক বেদনাদায়ক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেরও সৃষ্টি করেছে। স্যার এচ. এম. ইলিয়ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের (Biographical Index to the Historians of Muhammadan India) ভূমিকায় উপরোক্ত মতের অনুসরণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন: "For history will show them (Indians) that certain peculiarities of physical or moral organisation···have hitherto prevented their even attempting national independance —which will continue to exist to them but as a name." ইলিয়ট সাহেবের সিদ্ধান্ত আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তের যুক্তি ও বিশ্লেষণ আজও আমাদের দেশের ঐতিহাসিকের পেছনে ছায়ার মতো চলেছে। প্রখ্যাত পণ্ডিত জি. এইচ. স্যাবাইন কিছুদিন আগেও এমন মন্তব্য করেছেন যা আমাদের প্রচলিত ইতিহাসের যুক্তি ও তথ্য দ্বারা অস্বীকৃত হয় নি। "The oriental monarchy is more truely a form of tyranny, though it is lawful after a barbarian fashion, since Asiatics are slaves by nature and do not object to despotic government." (A History of Political Theory, G. H. Sabine.) আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা সব সময়েই এই ধরনের মতামতের বিরোধিতা করতে চেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বহুল প্রচলিত এই ধারণার মূলে, ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

নিয়ে কখনও কুঠারাঘাত করা হয় নি। প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্দের মধ্যেও এ ব্যাপারে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর উৎসাহ দেখা গেছে।

তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকেরা অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থলতানি আমলের জনসাধারণের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। যে যুগে রাজসভার বিবরণী রচয়িতারা কূটনৈতিক "উচ্চস্তরের" রাজনীতির কথায় ব্যস্ত ছিলেন, সে যুগেও আমীর খসরু বলেছেন যে "রাজার গলার রত্নমালার প্রতিটি রত্নই হল দরিদ্রের বেদনাশ্রু।" আমাদের দেশে মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনার রীতিই হল, তৎকালীন জনসমষ্টিকে কেবল হিন্দু আর মুসলমান এই ভাগে ভাগ করে দেখার চেষ্টা। ইংরাজ ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড এই চেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন জিয়াউদ্দিন বারণীর বিবরণের নজীর তুলে। "Taking his book as a whole, I would imfer that he thought of the kingdom consisting not of two elements but of three—Moselems, Hindus and 'herd's or peasants." (The Agrarian System of Moselem India. Moreland. Page. 32. F.. N.) কিন্তু ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রকাশিত 'The Delhi Sultanate' গ্রন্থের রচয়িতারা মোরল্যাণ্ডের এই সাধারণ বক্তব্যটিকেও সহ্য করতে না পেরে বাতিল করে দিয়েছেন। "Moreland adds…but this interpretation is atleast doubtful." (The Delhi Sultanate, Page 24. Bharatiya Vidya Vaban.) ঐতিহাসিক কে. এম. আশরফ স্থলতানি আমলে কৃষক ও নগরাঞ্চলের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন (Life and conditions of the People of Hindustan. K. M. Ashraf. Jiwan Prakasan)। জাঠ ও সতনামী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ডব্লু. সি. স্মিথ মুসলমানি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে উপজাতি বিক্ষোভের প্রচুর তথ্য জানতে পেরেছিলেন। এত প্রচুর তথ্য থাকা সত্ত্বেও, ভারতের ইতিহাসে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয় নি দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। (Lower Class Uprisings in the Moghul Period." W. C. Smith. Islamic culture. Vol. xx. 1946.)

মধ্যযুগের ভারত যে স্থলতানি একনায়কত্বের অধীন ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তৎকালীন ঐতিহাসিক বিবরণীর রচয়িতারা প্রায় সকলেই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন

এবং কেবল রাজসভা সংক্রান্ত কূটনীতি ও রাজকীয় ঘটনাবলীতেই উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তবু এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়—যার ভিত্তিতে প্রমাণ করা সম্ভব যে সুলতানি আমলে সাধারণ মানুষ কোনক্রমেই দেশের শাসননীতি, শাসনপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্পর্কে নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় ছিল না। বলাই বাহুল্য যে প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই মতটি বিশ্বাস করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ যাবৎ তথ্যাদির অভাবের জন্য সেই মত প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। অসিতকুমার সেন এই দুরূহ কাজটি তাঁর গ্রন্থে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন।

সুলতানি একনায়কত্বের যুগে, মাত্রাতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতা সীমাবদ্ধ করার জন্য মূলত তিনটি বিরোধী শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম বিরোধী শক্তি ছিল একটি আইনগত ঘটনা। হিন্দুস্থানের সুলতান ইসলামজগৎ-প্রধান খলিফার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতেন। কিন্তু এই লৌকিক সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি অধিকাংশ সময়ে হিন্দুস্থানের সুলতানের ক্ষমতা বা যথেচ্ছাচারিত খর্ব করতে পারে নি। স্বেচ্ছাচারিতার দ্বিতীয় বাধা ছিল ইসলামি আইনের বিধিনিষেধ। কিন্তু সুলতানি আমলের ভারতে এই সব বিধিনিষেধ প্রায়শই অমান্য করা হয়েছে এমন তথ্য বিরল নয়। তৃতীয় বাধা ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বৃহত্তম শক্তি—অভিজাত সম্প্রদায়। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসে বারম্বার দেখা গেছে যে শক্তিশালী সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করে অভিজাতরা হয় যথেচ্ছাচারিতার পথ সহজ করেছেন, অথবা দুর্বল সুলতানের শক্তিহীনতার সুযোগে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন। প্রসঙ্গত অভিজাতদের মধ্যে ভারতীয় ও তুরস্কদেশীয় দলাদলি, জাতিবৈষম্য ও সংঘর্ষের কথা উল্লেখযোগ্য।

অসিতকুমার সেন তাঁর গ্রন্থে উপরোক্ত বাধাগুলির বিফলতা আলোচনা করে এক স্বতন্ত্র বিষয়ে এসে পড়েছেন। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের চেতনা নিঃসন্দেহে নিম্নস্তরের ছিল। কিন্তু তবু জনগণের বাধাদান ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির ফলে সুলতানের যথেচ্ছাচারিতা ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, দেশের জনসাধারণ কোনো কোনো সময়ে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সুলতানী যথেচ্ছাচারিতাকে সংযত করেছিল। অন্য দিকে আবার মধ্যযুগের অনেক সুলতানই তাঁদের শাসন অব্যাহত রাখার জন্য

সাধারণ মানুষের বিশ্বস্ত সমর্থনের কথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সমর্থন অর্জনের ক্ষেত্রে শাসননীতির কিছু কিছু রদবদলও সম্ভবত ঘটেছিল। অসিতকুমার সেন ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে এই ঘটনাগুলি কি ভাবে সংঘটিত হয়েছিল—তা দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি ও তথ্যাবলী কয়েকটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে। যেমন আলোচিত হয়েছে স্থলতানি আমলে নগরাঞ্চলের জনগণের কার্যকলাপ, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক প্রভাব, উপজাতিগুলির বিরুদ্ধতা ইত্যাদি। নগরাঞ্চলের জনগণের বিবরণে দিল্লী নগরী তার অবস্থিতি ও ঐতিহ্যের জন্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। নগরীর শোষিত জনসাধারণ ও অভিজাতকুলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের তথ্যবহুল বর্ণনা খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। এই শোষিত জনসাধারণ অবশ্যই যে দুর্বল জড়ত্বের ভূমিকা পালন করে নি তার প্রমাণ আছে। ইলবারী বংশ থেকে তমলুক বংশের রাজত্বকালের মধ্যে, অসংখ্যবার দিল্লী নগরীর এক সক্রিয় মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলতানা রিজিয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্তি ও রাজ্য পরিচালনায় দিল্লীবাসীর সহায়তা, বলবনের শাসনরীতির পরিবর্তনে দিল্লীবাসীর অসন্তোষের প্রভাব, স্থলতান হওয়ার পরও জালালুদ্দিনের দিল্লী প্রবেশে অসামর্থ্য, —দিল্লীর জনগণের সংগ্রামের সাক্ষ্যই বহন করে। কোতোয়ালি অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাজী মৌলার বিদ্রোহ যে আলাউদ্দিনের শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারকার্যকে প্রভাবিত করেছিল—একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তনকালে, শাসনতান্ত্রিক স্থবিধা অপেক্ষা দিল্লীবাসীর অসন্তোষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন, এমন মনে করারও যথেষ্ট যুক্তি আছে। জনমতের চাপে ফিরোজ তুঘলককেও একাধিকবার শাসননীতির পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর হ্রাস না করে উপায় ছিল না। ফিরোজশাহী দাসেদের নেতৃত্বে সংগঠিত জনতার বিক্ষোভ রাজকুমার মহম্মদ খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।

স্থলতানি শাসনকালে দিল্লীর মতো আরও অনেক নগরীর কাহিনীতেই সক্রিয় জনমতের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় লাহোর ও মুলতানের ঘটনাবলী, দক্ষিণের কাম্পিলি ও পূর্বাঞ্চলের "বিদ্রোহের নগরী" লক্ষণাবতীর ইতিহাস।

শহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসের পাশাপাশি, সুলতানী আমলে গ্রামাঞ্চলের জনগণের সক্রিয়তাও লক্ষণীয়। শহরের শোষিত জনসাধারণ (urban poor বা city-plebians) ও গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণী (প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী) সুলতানি রাজনীতিতে প্রায় একই ভূমিকা পালন করেছে। সুলতানি আমলে ভারতের পুরাতন গ্রাম্য গোষ্ঠী ও গ্রামীন গণতন্ত্র শুধু যে অবিকৃত ছিল তাই নয়, সেগুলি মুসলমান ক্ষমতাকেও অনেক পরিমাণে সংযত রেখেছিল। জনসংখ্যার চেয়ে ভূমি বেশি থাকার ফলে, সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অতিরিক্ত কর বসানোর বিশেষ সুবিধা ছিল না। এ ছাড়া তৎকালীন কৃষক বিদ্রোহ ও আর গণভাবনা, সুলতানি করনীতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভূমির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বলবন যে "মধ্যপন্থার" কথা ঘোষণা করতেন, তা সম্ভবত তাঁর মানসিক ঔদার্যেরই লক্ষণমাত্র নয়। দোয়াব অঞ্চলে, মহম্মদ বিন তুঘলকের করবৃদ্ধির ফলে কৃষকবিদ্রোহ ক্রমশ এক প্রবল গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল।

সুলতানি আমলে দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলির উল্লেখ না করলে, সাধারণ মানুষ ও তৎকালীন রাজনীতির কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এসম্পর্কে, বিশেষ করে খোখর, গাকৃথর, জাঠ, গুজ্জার, মেওয়াটি, ভীল ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেদের বিক্ষোভ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে—তথ্যের প্রাচুর্য আছে। সুতরাং সমস্ত দেশ জুড়ে সুলতানি স্বেচ্ছাচারী শাসন যে নিষ্কণ্টক ও অব্যাহত ছিল—একথা আদৌ সত্য নয়।

অসিতকুমার সেনের গ্রন্থে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, (১) গ্রন্থকার মনে করেন যে সুলতানি শাসকের হিন্দুবিরোধী নীতি প্রধানত ধনী ও শক্তিশালী হিন্দুদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়েছিল, সাধারণ হিন্দু বা হিন্দু কৃষকের বিরুদ্ধে নয়। শাসকগোষ্ঠীর কাছে শাসিত শ্রেণীর ধর্মের বাছবিচার না থাকাই সম্ভব, যদিও সুলতানি আমলে ধর্ম রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদাই এক অমোঘ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থকারের বক্তব্যের গুরুত্ব হল এই যে সুলতানি আমলে মধ্যযুগীয় ধর্মবিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও, সম্ভবত কোনো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা বিরোধে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে নি। (২) দিল্লী শহরের বিবরণ ও জীবনযাত্রার কথা গ্রন্থের আর এক আকর্ষণীয় বিষয়। দিল্লীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে, এই গ্রন্থে অনেক তথ্যের সমাবেশ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

তথ্য হল-সাধারণ মানুষের আয়ের হিসাব ও তার বিশ্লেষণ। (২৩ পৃঃ) (৩) সুলতানি আমলে, ভারতবর্ষীয় অভিজাত ও তুর্কী অভিজাতদের বিরোধের একটি নিখুঁত ধারাবাহিক বিবরণ এই গ্রন্থে রয়েছে। ঘটনাটি মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠকের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়। তবু ইতিপূর্বে এই বিরোধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, অধ্যাপক নরন, কে. এম. আশরফ ও অন্যান্য কয়েকজনের কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা ছাড়া বিশেষ চোখে পড়ে নি। গ্রন্থকার অবশ্য তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলমান ও তুর্কী মুসলমান—এই দুই অভিজাত সম্প্রদায়ের জাতিগত সংঘর্ষে, একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণ কি?

সুলতানি আমলের ব্যবসায়ী শ্রেণী সম্পর্কেও পাঠকের কৌতূহল সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয় না। গ্রন্থকার ব্যবসায়ী শ্রেণীকে নাগরিক দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কারণ অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো ব্যবসায়ীরাও সুলতানি শাসনে শোষিত হয়েছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই কি ব্যবসায়ীদের মনোভাব ও স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে শক্তিশালী করেছিল? আলোচ্য বইটিরই দুটি স্থানে গ্রন্থকার স্বতন্ত্র কথার আভাস দিয়েছেন। বই-এর ৩০ পৃষ্ঠায় ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু জনবিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করে লাভবান হওয়া, বেশি দাম নেওয়া, ক্রেতাকে প্রতারিত করা ইত্যাদি ব্যবসায়ী অসৎ অভ্যাস অতি সুপরিচিত। বই-এর ৯১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সুলতান মুইজুদ্দিন বহরাম শার শাসনকালে, লাহোর মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, সেখানকার ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় কোনো উৎসাহ দেখায় নি। এ দুটি ঘটনা ছাড়াও সাধারণভাবে জানা যায় যে আলাউদ্দিনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগ্রহণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে সাধারণ মানুষের প্রভূত সুবিধা হলেও, ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছিল। গ্রন্থে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা থাকলে, বোধহয় সাধারণ পাঠক সন্তুষ্ট হতে পারতেন।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে অসিতকুমার সেন ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে মৌলিক গবেষণা করেছেন। এই কাজের জন্য তিনি নিশ্চয়ই সকলের ধন্যবাদের পাত্র। আশা করা যায় যে অদূরে ভবিষ্যতে, মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মোগল শাসন সম্বন্ধেও এই জাতীয় আলোচনায় কেউ কেউ অগ্রণী হবেন।

অমিত গুপ্ত

Geography of Hunger : by Josue de Castro, Victor Gollancz, London.

বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের ছাতি আর কব্জি সরু সরুই হয়ে থাকে ; কিছুকাল ধরে ওজনও কমছে ; ওটা জল-হাওয়ার জন্যে। বাঙ্গালী মেয়েদের রক্তে হিমোগ্লোবিন কমই হয়, এবং কুড়িতেই হয় বুড়ি ; সে ওরা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে না, আর বছর বছর আঁতুড়ে যায় বলে। বাংলার কচি-কাচারা বরাত জোরে সে-আঁতুড়-ঘর যদি পেরোতে পারে, তাহলে হাড়-জিরজিরে লিক্‌লিকে ধরনের হবেই। আবহমানকাল ধরে এই তো দেখে আসছি ! আর বাঙ্গালী চাষী ? যেমন চিররুগ্ন তেমনি কুসংস্কারান্ধ ; ম্যালেরিয়া গেল তো যক্ষ্মায় ধরল ; ফসল ফলাবার মুরোদ নেই, বংশবৃদ্ধিতে ওস্তাদ।

বেশ কয়েক যুগ ধরে বাঙ্গালীর শারীরিক কাঠামোর এ-হেন ছবিখানি দেখে শুনে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমরা যে লাঠিয়াল বাঙ্গালী, কুস্তিগীর বাঙ্গালী বা ঘোড়সোয়ার বাঙ্গালীর মূর্তি মন থেকে তো বটেই, এমন কি ইতিহাসের পাতা থেকেও প্রায় মুছে যেতে বসেছে। স্বভাবতই লম্বা-চওড়া গাঁট্টা-গোট্টা মানুষ দেখলে চোখ আপনিই নত হয়ে আসে। রংটা কটা হলে তো কথাই নেই। তা ছাড়া ভবিতব্যে চিরকালই অগাধ বিশ্বাস আমাদের ; তাতে চিড় খাওয়ানো কঠিন বইকি।

সুতরাং ব্রেজিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ জে. ডি. কাস্ত্রো তাঁর 'জিয়োগ্রাফি অফ্‌ হাঙ্গার'-এ যখন ঘোষণা করলেন যে "যে-সব দৈহিক বিশেষত্বকে 'উত্তম' কিংবা 'অধম' জাতির লক্ষণ হিসাবে ব্যক্ত করা হয় আসলে সেগুলি হল খাদ্যের প্রভাব"—থমকে গেলাম। চমক লাগল আরো যখন দেশ বিদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে উনি দেখালেন এবং দাবি করলেন যে "এইসব বিশেষত্ব বংশগতির থেকেও ঢের বেশি নির্ভর করে স্থানীয় অধিবাসীরা কি ধরনের খাদ্য খেতে পায় এবং কি রকম তাদের খাদ্যাভ্যাস, তার উপর।" বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাটল যখন দেখা গেল বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংসদ থেকে শুরু করে ভারত সরকারের মুদালিয়র কমিশন পর্যন্ত খাস বনেদী সংস্থাগুলিও পুষ্টি-সংক্রান্ত আধুনিক তত্ত্বের সন্ধানে শরণাপন্ন হয়েছেন দ্য কাস্ত্রোর এই 'জিওগ্রাফি অফ্‌ হাঙ্গারের'।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর প্রান্তে শেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ। সেখানে পাওয়া যায়

দুনিয়ার সব থেকে ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া। ঠিক যেন বাচ্চাদের খেলনা। সবাই জানত, শেট্‌ল্যাণ্ডের টাট্টু একটা বিশিষ্ট জাত। একবার হল কি, একদল ব্যবসায়ী ঠিক করল, এই মজাদার টাট্টু আমেরিকায় চালান দিয়ে সেখানেই বংশবৃদ্ধি করাবে। তাতে খরচ কম পড়বে, মুনাফা হবে বেশি। করলও তাই। কিন্তু অবাক কাণ্ড, আমেরিকায় গিয়ে শেট্‌ল্যাণ্ডের টাট্টু এক এক পুরুষ পরে পরে আকারে ক্রমশ বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল অন্য সব ঘোড়ার মতো! আশ্চর্য ব্যাপার! ঘটনাটা কি! অনেক অনুসন্ধান, অনেক গবেষণার পর জানা গেল, আসলে ঐ টাট্টুগুলির পূর্বপুরুষরা শেট্‌ল্যাণ্ডে এসেছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেরই অন্যান্য জায়গা থেকে। শেট্‌ল্যাণ্ডের মাটিতে তথা ঘাসে কোনো কোনো খনিজ পদার্থের একান্ত অভাব থেকেই সাধারণ আকারের ঘোড়াগুলি কালক্রমে টাট্টুতে পরিণত হয়েছিল। আমেরিকায় গিয়ে স্বাভাবিক খাদ্য পেয়ে তাদের পুনর্জন্ম হল।

ঘোড়া কেন, মানুষের ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম কিসে? বিষবরেখার কাছ বরাবর বাস করে আফ্রিকার খুদে মানুষেরা। তাদের প্রধান খাদ্য আরণ্যক ফলমূল। এতদিন ধারণা ছিল, ওরা বুঝি চিরকালই ঐ-রকম— বামন; বিশেষ এক প্রজাতির মানুষ। কিন্তু দেখা গেল, ওদেরই একটি অংশ সমতল ভূমিতে গিয়ে চাষ-আবাদ, পশুপালন শিখে কালক্রমে সাধারণ মানুষের চেহারা পেয়েছে।

গল্প নয়, বিজ্ঞানের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করা এই সব সত্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেল 'জিয়োগ্রাফি অফ্ হাঙ্গার' থেকে। এবং এ থেকে কাস্ত্রো এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তথাকথিত "অধম" জাতিগুলি আসলে "বুভুক্ষু" জাতি। সে বুভুক্ষা নিছক দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি নয়; কোথাও ক্যালরির, কোথাও প্রোটিনের, কোথাও ভিটামিন কিংবা খনিজ লবণের অভাব-জনিত ক্ষুধা। সে-ক্ষুধা কখন প্রকট, কভু প্রচ্ছন্ন। পুরুষানুক্রমে দেহগঠনের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়ার ফলেই তারা হয়েছে শীর্ণ, হ্রস্ব, রুগ্ন, অকালমৃত্যুর সহজ শিকার। এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, খাদ্যাভাবের ও অপুষ্টির সঙ্গে অধোগত দৈহিক কাঠামোর নিবিড় সম্পর্কের এই লক্ষণগুলি সব থেকে প্রকট এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায়। একটার পর একটা দেশ ধরে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবচ্ছেদ মারফৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের চির-বুভুক্ষার নিদান বিশ্লেষণ করেছেন কাস্ত্রো অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে।

বুভুক্ষা বহুরূপী। অনাহার ও অর্ধাহারের প্রেতরূপ এই বাংলা দেশেই আমরা দেখেছি পঞ্চাশের মন্বন্তরে। এর আর এক রূপ দেখছি চোখের উপর—অহরহ—স্কুল-কলেজে, গৃহস্থের অন্দরমহলে, ক্ষেতে-খামারে, কারখানায়, বস্তিতে। প্রতিদিনের খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানের একান্ত অভাবে একটা সমগ্র জাতির ক্ষয়িষ্ণু রূপ কিছুটা প্রচ্ছন্ন বলেই সে-রূপ আরো মারাত্মক।

সারা দুনিয়ার তাবৎ বিজ্ঞানী মহলের মতে এশিয়া ও আফ্রিকায় অপুষ্টির প্রধান কারণ খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালরির অভাব। কাস্ত্রো বলেছেন, "ভারতীয়দের জৈব-গঠনের গুরুতর ক্ষয় হয়েছে খাদ্যে উচ্চ মানের প্রোটিনের একান্ত অভাব থেকে। এই অভাব এমন পাপচক্রের জন্ম দেয় যার ফলে এসেছে জাতিগত অবনতি ও অবক্ষয়।" শুধু তত্ত্ব নয়, তথ্যগত বিচারেও এই উক্তিটি স্বতঃসিদ্ধ। একজন মেহনতি মানুষের দৈনিক খাদ্যে ক্যালরি প্রয়োজন ৩০০০-৩৩০০; প্রোটিন চাই ৮০-১০০ গ্রাম, এবং তার মধ্যে অর্ধেক হওয়া উচিত আমিষ জাতীয় "সম্পূর্ণ" প্রোটিন। অথচ জাতিসংঘের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে ভারতবাসীর দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২০৮০ (F. A. O. Production Year Book, 1960); আর প্রোটিন পাই আমরা গড়ে দৈনিক ৫২ গ্রাম এবং "সম্পূর্ণ" প্রোটিন (মাছ মাংস ডিম দুধ) মাত্র ৬ গ্রাম। তাও গড়ে—অর্থাৎ বড়লোক গরীবলোক মিলিয়ে। সবথেকে ভয়ের কথা হল এই যে ১৯৩৫-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৯ সালে "সম্পূর্ণ" প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ এতটুকুও বাড়েনি, বরং কমেছে (Eastern Economist, Annual Number, 1961)।

তার ফলটা কি ? ফল—ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতা, ক্রমবর্ধমান রোগ প্রবণতা, দুরন্ত শিশু-মৃত্যু, নিরবচ্ছিন্ন মহামারী, ক্ষয়ের প্রসার, কর্ম ও মনন শক্তি হ্রাস। এক কথায়, মানুষ হিসাবে একটা 'অধম' জাতির যা কিছু লক্ষণ, সব। কয়েক শতাব্দী পরে বাঙ্গালী জাতটা শেটল্যাণ্ডের টাট্টু, বা আফ্রিকার বামনদের পর্যায়ে পৌছবে কিনা কে জানে! তফাৎ যদি কিছু ঘটে তা শুধু এই যে, ওদের দৈহিক অবনতি ঘটেছিল না-জেনে, না-বুঝে; আর আমরা ক্ষয়ের সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে চলেছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিশ্ব-বিপ্লবের যুগে।

"বুভুক্ষা শুধু দেহটাকে তছনছ করে না, আত্মাকে হেয় করে।…ক্ষুধার তাড়না সামাজিক আচার ব্যবহারে পরিবর্তন আনে, মানসিক কাঠামোকে

প্রভাবান্বিত করে।···ক্ষুৎপীড়িত মানুষকে নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যবহার করতেও দেখা গিয়েছে···ক্ষুধিত পশুর মতোই তখন তার আচরণ।···ডাকাতি, রাহাজানি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপের পিছনে কাজ করে তীব্র অথবা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধার তাড়না।"

"···ক্ষুধা ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে···আত্ম সংযম ও মানসিক স্থৈর্য ক্রমশ কমে আসে, এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত নীতিবোধ ও সংযম যায় হারিয়ে।" এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় যে "হতাশা, উদ্দমহীনতা, ভবিতব্যে বা ঐশী শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস, তার উৎপত্তি খাদ্যাভাব থেকে।"

বুভুক্ষার কায়িক ও আত্মিক পরিণতি সম্পর্কে কাস্ত্রোর এই শাণিত বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়।

'জিয়োগ্রাফি অফ হাঙ্গার' পড়ে পাঠক জানতে পারবেন যে বেশ কিছুকাল আগে ম্যাকে (McCay) এবং ম্যাক্‌ক্যারিসন (McCarrison) নামে দু-জন বিজ্ঞানী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা বিশ্লেষণ করে এই এই সিদ্ধান্তে পৌছন যে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজীদের তুলনায় উত্তর পাঞ্জাবের শিখদের স্বাস্থ্য উন্নততর হওয়ার প্রধান কারণ শিখরা প্রোটিন খায় বেশি। ইঁদুরের উপর শিখ ও মাদ্রাজী খাদ্য পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়েছে। ব্রেজিলে কাস্ত্রোর নিজস্ব সমীক্ষা এবং কেনিয়ায় বয়েড ওর ও গিল্কস-এর গবেষণা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে জনসংখ্যার যে অংশের খাদ্যে প্রোটিনের নিরবছিন্ন অভাব, তাদের ওজন এবং দৈর্ঘ্য তুলনায় কম।

শুধু এই নয়, প্রোটিনের প্রভাব আরো সুদূরপ্রসারী। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপকতা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে উদ্বেগের অন্ত নেই। নিদান ও নিরসনের পথ নিয়ে গবেষণা চলছে অনেক কাল। কাস্ত্রোর মতে এই সংক্রমণ-প্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্যে মাছ মাংস ডিম দুধ প্রভৃতি দেহ সংরক্ষণকারী উপাদানের অস্বাভাবিক অপ্রতুলতা এবং ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস। এই অভিমত অবশ্য আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে খাদ্যে প্রোটিনের স্থায়ী অভাব ঘটলে রোগ প্রতিরোধ শক্তি অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়, জীববিজ্ঞানে এই সত্যটি বহু পূর্বেই পরীক্ষিত। অধুনা বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংসদের পক্ষ থেকেও ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি

দেশে শিশুমৃত্যুর অস্বাভাবিক উচ্চহারের প্রধান কারণ হিসেবে এই তত্ত্বটির উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রোটিন-ক্ষুধা সম্পর্কে তৃতীয় যে সম্পাদ্যটি কাস্ত্রো উপস্থিত করেছেন তা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। স্লোনেকার-এর তত্ত্বকে সমর্থন করে উনিও দাবি করেছেন যে খাদ্যে প্রোটিনের নিরবচ্ছিন্ন অভাব জীবের প্রজনন ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে। স্লোনেকার ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। কাস্ত্রো হাজির করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রতি প্রোটিন গ্রহণের এবং জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ। দেখা গিয়েছে, যে-সব দেশে জন্মহার বেশি, সেখানকার মানুষ প্রোটিন খেতে পায় কম। খুবই কম। এবং এক্ষেত্রেও পোড়া কপাল এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার। কাস্ত্রো বলেছেন, "স্বাভাবিক অবস্থায় পুষ্টি ও প্রজননের সহজাত প্রবৃত্তি দুটি পরস্পরের প্রতিযোগিতা করে চলে। একটি পিছিয়ে পড়লে আরেকটি চলে এগিয়ে এগিয়ে। দীর্ঘস্থায়ী বুভুক্ষা—বিশেষ করে প্রোটিন ও কিছু কিছু ভিটামিনের ক্ষুধা খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দেয়, যৌন-ক্ষুধাকে তীক্ষ্ণ করে তোলে।" বিতর্কটি নিছক মনস্তাত্ত্বিক নয়; বিজ্ঞানী কাস্ত্রো তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে খাদ্যে প্রোটিনের অভাব উচ্চ জন্মহারের একমাত্র কারণ নাও হতে পারে। ১৯৬০ সালের F. A. O. Production Year Book-এ দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি মোট প্রোটিন ও আমিষ জাতীয় প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ ছিল যখন ৯৩ ও ৬৬ গ্রাম, একই সময়ে ভারতবাসী খেয়েছে ৫২ গ্রাম ও ৬ গ্রাম। অথচ ১৯৬০ সালের U. N. O. Statistical Year Book-এ প্রকাশ, ১৯৫৩-৫৯ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল শতকরা ১·৭, এবং ভারতে ছিল ১·৩। অর্থাৎ ১১ গুণ বেশি আমিষ প্রোটিন খেয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয়েছে ভারতের থেকে শতকরা ০·৪ ভাগ বেশি। মনে হয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা এবং খাদ্যে প্রোটিনের অভাব—মূলত এই তিনটি কারণ মিলিতভাবেই জন্মহার বৃদ্ধির অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

তা সত্ত্বেও কাস্ত্রোর এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই কারণে যে ইতিহাসের বিচারে পরাভূত ম্যালথাসবাদ আজ আবার নবরূপে প্রেতলীলার

নতুন ক্ষেত্র খুঁজে ফিরছে এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো সন্থ স্বাধীন দেশে। "কোটি কোটি মানুষের ব্যাধি বুভুক্ষা"—"ক্ষুধা থেকে মুক্তি চাই"—জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি ও আহ্বান দেশে দেশে শোষক গোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। চলেছে আদর্শক্ষেত্রে সূক্ষ্ম এবং সুকৌশলী পাল্টা আক্রমণ। বুভুক্ষার প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি—জনসংখ্যা যদি বেড়েই চলে, তাহলে খাদ্যাভাবও চলবে, এবং তা মেনে নিতেই হবে—এই হল নয়া-ম্যালথাসবাদীদের যত কিছু তত্ত্বকথার নিগূঢ়ার্থ। অথচ, বুভুক্ষা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া; শ্রেণী বৈষম্য ও শোষণ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার চরম অসঙ্গতিই যে বুভুক্ষার মূল কারণ, এই রূঢ় সত্যটিকে জনমানস থেকে লুকিয়ে রাখার জন্যই দেখানো হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জুজু। কাস্ত্রো বলেছেন, "জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক সূত্রানুসারে, আর খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি হয় গাণিতিক নিয়মে···সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্যোৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে—ম্যালথাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ইতিহাস ইওরোপের পটভূমিকায় প্রত্যাখ্যান করেছে। বিগত শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বহু দেশেই জন্মহার স্তিমিত হয়ে গিয়েছে।" অর্থাৎ কাস্ত্রোর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকাতেও সেই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটা অসম্ভব নয়—যদি বুভুক্ষাকে পরাস্ত করা যায়। এবং তা সম্ভব, কারণ, "যুদ্ধ ও বুভুক্ষা মানুষেরই সৃষ্টি।"

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়—যে সব প্রশ্ন অহরহ সুপরিকল্পিতভাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ক্ষুধিত হওয়ার অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য। জনসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে একদিন না একদিন বসুধা কি খাদ্য সরবরাহের শেষ সীমায় পৌঁছবে না? সে দিন কি আসন্ন নয়? একটানা দীর্ঘ ব্যবহারে ভূমির উর্বরতা ক্ষয় এবং উৎপাদন হ্রাস নিয়তির মতো অবশ্যম্ভাবী নয়? বুভুক্ষু এলাকাগুলির ক্ষুধামুক্তি কি কোনোদিনও সম্ভব? ক্ষুধার ভৌগলিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে এমনি ধারা আরো অনেক বাস্তব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কাস্ত্রো ভূরি ভূরি অবিসংবাদী তথ্য ও যুক্তি দিয়ে।

"ভূমণ্ডলের চাষ-যোগ্য জমি হল ১৬ বিলিয়ন একর, অর্থাৎ পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার প্রতিটি লোক পিছু ৮ একর হিসাবে।···বিশেষজ্ঞদের মতে জনপিছু ২ একর জমি থেকেই সুষম খাদ্য ও পুষ্টি পাওয়া সম্ভব।···অথচ এযাবৎ ২ বিলিয়ন একরও চাষ করা হয় নি।···১৬ বিলিয়ন একর চাষ করতে পারলে বর্তমান জনসংখ্যার চতুর্গুণকে খাওয়ানো যাবে।···"

"বুভুক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম বিজয় হবে সারা পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে। প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। বিশাল বিশাল অব্যবহৃত ভূমিখণ্ড পড়ে আছে কর্ষণের অপেক্ষায়; কৃষির প্রযুক্তি-বিদ্যা দেখাতে পারে কিভাবে তার সদ্ব্যবহার করা যায়, কেমন করে বর্তমানের আবাদী জমিতে আরো বেশি ফসল ফলানো যায়, কিভাবে খাদ্য পাওয়া যায় সমুদ্র থেকে, এমন কি অজৈব পদার্থ থেকে।"

"জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটি সমীক্ষা করে বলেছেন, ভারতবর্ষে গমের ফলন দশ বছরে শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো যায়। ২০ ভাগ বাড়ান যায় সার দিয়ে, ৫ ভাগ নতুন ধরনের বীজ ব্যবহার করে এবং ৫ ভাগ পোকা-মাকড় ও ব্যাধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরপর অন্যান্য ব্যবস্থা মারফৎ এই বৃদ্ধির হার তোলা যায় শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত।...এযাবৎ ভারতে চাষ করা হয়েছে শুধু অপেক্ষাকৃত উর্বর এবং সহজে সেচযোগ্য জমিটুকু। অনুমিত প্রায় ১৫০ মিলিয়ন একর আবাদী জমি আজো চাষ করার অপেক্ষায় পড়ে আছে।...সমগ্র চাষযোগ্য জমির প্রায় একতৃতীয়াংশ সেটা।"

সুতরাং "ক্ষুধামুক্তি কোনো স্বপ্নাশ্রয়ী প্রকল্প নয়, সম্পূর্ণ সাধনযোগ্য লক্ষ্য। প্রয়োজন যা, তা হল জমিতে যারা আছে, তাদেরকে আরো ভালোভাবে পুনর্বাসন করা, এবং জমির দানকে আরো সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা।"

সমর রায়চৌধুরী

মাতৃমন্ত্র। শ্রীকালীচরণ ঘোষ। প্রইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা। একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'মাতৃমন্ত্র' দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা সংগ্রহ। এই সংগ্রহে লেখক 'অতি উচ্চস্তরের সাহিত্যে'র সঙ্গে নিতান্ত সাময়িক অনুভবের প্রয়োজনে লিখিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতাকে একযোগে স্থান দিয়েছেন। গ্রন্থটি মূলত "বঙ্গভঙ্গ এবং তাহার পূর্ব হইতে দেশপ্রেম" কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

বাংলা কবিতার দেশাত্মবোধক বৈশিষ্ট্য প্রথম উদঘাটিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে। অবশ্য এর আগেই, সংকীর্ণ হলেও, ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম স্বদেশপ্রেমের কথা উচ্চারণ করেছিলেন—

স্বদেশের প্রেম যত সেই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার
ভাবতুলি ধ্যান করে চিত্রপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার।

কবিতায় দেশপ্রেমের এই ধারা রঙ্গলাল-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সার্থকভাবে প্রবাহিত হয়ে এসে ব্যাপ্তির সার্থকতায় পরিণতি লাভ করেছে হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭)। তারপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই দেশপ্রেমের গান ও কবিতা হৃদয়ের উন্মাদনাময় আন্তরিক আবেগে স্বতন্ত্র মর্যাদায় স্বতোচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে। এই দেশপ্রেমের কবিতা ও গানের মধ্যেই তাই জাতীয় আবেগের পরিচয় আত্মগোপন করে রয়েছে।

সংকলনের দিক দিয়ে বহু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। বহু বিখ্যাত কবিতা বা গান, যেগুলো সাহিত্য হিসাবেই শুধু বিখ্যাত নয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গেও যেগুলো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এই সংগ্রহে স্থান পায় নি। হিন্দুমেলার (১৮৬৮) দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্‌বোধিনী সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' শীর্ষক গানটি (মিলে সব ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ—গাও ভারতের যশোগান ইত্যাদি) এবং কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯১১) গাওয়া সরলা দেবীর—'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী—গাও আজি হিন্দুস্থান'—শীর্ষক গানটি সংকলনে স্থান না দেওয়া আমার কাছে গুরুতর ত্রুটি বলে মনে হয়েছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিও সংকলনে স্থান পায়নি)

তবু এই সব অপূর্ণতা সত্ত্বেও গ্রন্থ-সংকলকের উদ্দেশ্য অভিনন্দনযোগ্য। এবং তাঁর উদ্দেশ্য অংশত হলেও সফল হয়েছে।

দেবব্রত বিশ্বাস

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

"পরিচয়"-প্রসঙ্গে

'পরিচয়' আমার সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা। আজ থেকে নয় অনেকদিন থেকেই। তবুও বলতে দ্বিধা নেই মাঝে-মধ্যে কখনো-সখনো 'পরিচয়' আমাকে নিরাশ করেছে। তবু ধীরে ধীরে আবার সেই অতীতের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে দেখে আরো ভালো লাগছে। পরিচয় মূলত সাহিত্য পত্রিকা হলেও একটা সুস্থ জীবনবোধ-এর সঙ্গে জড়িত। আমার বক্তব্য, সে বোধকে রাজনৈতিক সংস্কারের গোঁড়ামির পর্দা দিয়ে যেন ঢেকে রাখা না হয়। আর সবচেয়ে বড় দাবি, যাই করুন সাহিত্যের জন্য করুন। সাহিত্যের জন্য রাজনীতিতে আপত্তি নেই, কিন্তু রাজনীতির জন্য সাহিত্য আপত্তির বৈকি। আমার মনে হয় অন্যান্য পত্রিকার মত পরিচয় শুধু পাঠকের সময় কাটানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেন তাঁদের 'গাইড' করতে সাহায্য করে। সম্প্রতি বাঙলা সাহিত্যে একটা দুর্লক্ষণ দেখছি যে, ভাষা এবং আঙ্গিক নিয়ে—অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়েছে। বিষয়বস্তু দুর্বল বলেই কি বহিরঙ্গের চটক বেশি? আর ভাষা নিয়ে যা আরম্ভ হয়েছে মনে হয় যেন, যে কবি কবিতা কিংবা গল্পকার ছোট গল্প লেখেন, সে-ই ভাষা নিয়ে শব্দ নিয়ে যেন গবেষণা করছেন। নতুন শব্দ, নতুন ভাষা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রচলিত ভাষা কিংবা শব্দ কিছুতেই ব্যবহার "করব না" এমন পণ করে যত পার বিদেশী এবং মৌলিক (লেখকের নিজস্ব এবং লেখক নিজেই শুধু তার অর্থ বোঝেন) শব্দ প্রয়োগ করে পাঠকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করলে কিছুদিনের মধ্যেই লেখকদেরই পাঠকের ভূমিকা নিতে হবে। পাঠক বলে আলাদা জাত আর থাকবে না। আমার মনে হয় লেখকদের বক্তব্য কিছু থাকলে সহজ ভাবে বলার সাহস করা উচিত। বক্তব্য অস্পষ্ট বলেই কি ভাষার হেয়ালী এবং ধাঁধাঁর সৃষ্টি করবেন? তার ফলে নানান পাঠক তার নানান অর্থ ধরে নেবেন এবং লেখক নিজেই অবাক হবেন, "আশ্চর্য তো, এত অর্থ লুকিয়ে ছিলো!" "পরিচয়ের" লেখকদের এ বিষয়ে ভেবে দেখতে সবিনয়ে অনুরোধ

করছি। জানি যে রবীন্দ্র যুগ এটা নয় বরং এটাকে "রকেট যুগ" অথবা "আণবিক যুগ" বলাই সঙ্গত তবুও না বলে পারছি না যে, সেই রবীন্দ্রনাথও তো গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ কম লেখেন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে ভাষাটা এতই স্বচ্ছন্দচারী যে আধুনিক লেখক বুঝি ওই ভাষায় লিখতে লজ্জা পাবেন! আধুনিক পাঠক কিন্তু এখনো ওই "পুরোনো" স্টাইলেই বুঝি বেশি রস আহরণ করেন। এখনো কিছু শ্রদ্ধেয় লেখক সহজ ভাবে স্পষ্ট কথা লিখতে সাহসী হন। যেমন, শ্রীঅন্নদাশংকর রায় এবং আরও কেউ কেউ। তাঁরা কেউ অশিক্ষিত নন। এককালে ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরিচয়ের মাধ্যমে যে তর্ক-বিতর্ক চলতো, তাতে অংশ গ্রহণ করতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, হিরণকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে প্রমুখ দিকপাল কবি-সাহিত্যিকরা। আবার তেমনি সাহিত্যিক বিতর্কের সূত্রপাত করা কি সত্যিই অসম্ভব ?

মিহির হাজরা

নব কলেবর 'পরিচয়' সম্পর্কে আপনারা পাঠকের স্বাধীন মতামত আহ্বান করেছেন। প্রচুর ভরসা পেলাম।

প্রধানত দুটো কারণে পরিচয়কে ভালবাসি এবং পরিচয়ের নিয়মিত পাঠক। (১) এটি একটি প্রগতিবাদী (মার্কসীয়) দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী (২) পরিচয়ে dogma অপেক্ষা যা পেয়েছি তা হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বলিষ্ঠ মনোভাব। নিঃসংশয়ে তাই পরিচয়ের কাছে প্রত্যাশা আমার এবং আমার মতই অনেকের, অনেক।

অধিক বাক্‌বিস্তারে না গিয়ে সংক্ষেপে আমার কয়েকটি প্রস্তাব নিবেদন করি। আশা করা যায় তার মধ্যেই পরিচয়ের কিছু অভাব এবং সেই সম্পর্কে একজন পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা প্রতিফলন থাকবে।

(১) বাঙলার অনুবাদ সাহিত্য লজ্জাজনক রকমের দরিদ্র। পরিচয়ের পাতায় নিয়মিত গুরুত্বের সঙ্গে সুন্দর ও সার্থক না হোক অন্তত অনুগত (faithful) অনুবাদের প্রকাশ হোক। কোন সারানুবাদ নয়। (তার কারণ—এগুলি অসমর্থনীয়। তথাকথিত সারানুবাদগুলিতে যে ধরনের ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, কোন যুক্তিতেই তাকে সমর্থন করা চলে না।) অনুবাদগুলি পরিকল্পিত ভাবে প্রকাশিত হোক। সম্ভবত এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে

কিছু বলাই বাহুল্য হবে। বাঙলা ভাষাতেই আমরা রঁলা, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, টমাস মান, জয়েস, প্রুস্ত, আনাতোল ফ্রাঁস, কাফ্কা, মলিয়ের, ইবসেন, চেকভ, পড়তে চাই! বাঙালী বলেই অর্থাৎ ইংরেজী জানি না এই অপরাধেই কি বিশ্বসাহিত্যের শিল্পকীর্তিগুলির সম্ভোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত থাকতে হবে? এবং যথারীতি একটি "মধ্যবিত্ত" সাহিত্যরুচি নিয়েই আমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে? এসম্পর্কে "পরিচয়ের" কি কোন দায়িত্ব নেই? ইতিহাস বিচারে নয়, শুধু মধুসূদন থেকে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বয়স যদি এক শ বছর ধরে নেই তবে এই সময়ে মৌলিক সৃষ্টি প্রয়াসের তুলনায় সদ্ অনুবাদ সাহিত্যের লজ্জাজনক অপ্রতুলতা আমাদের সামগ্রিক দায়িত্ববোধের অভাব-ই কী সূচিত করে না? অথচ অনুবাদ ছাড়া পাঠক সমাজের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্যরুচির মানোন্নয়ন ঘটে না একথা কম বেশি আমরা তো সংলেই বুঝি।

(২) পরিচয়ে নিয়মিতভাবে (ন-মাসে ছ-মাসে একবার নয়) নাটক প্রকাশিত হওয়াও একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেন?—বলাই বাহুল্য মনে করি।

(৩) 'সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা' জাতীয় বিতর্কের যখন সূত্রপাত হয় তখন বিশেষ বিভাগের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী কর্মীদের আলোচনায় আমন্ত্রণ করাই যুক্তিসঙ্গত। নির্দ্বিধায় বলছি, শঙ্কর আচার্য বা সতীন্দ্র চক্রবর্তীতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পীদের মতামতও জানার ব্যবস্থা ছিল একান্তই বাঞ্ছনীয়। তাতে নিঃসন্দেহে আমাদের উপকারও দর্শাত বেশি।

(৪) "পরিচয়"-এর ঐতিহ্যময় পুস্তক-পরিচয় বিভাগটি অধিকতর পরিকল্পনা, সতর্কতা ও গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হোক। এ কথা আমাদের সর্বদাই মনে না থেকে পারে না যে "দেশ" ও "পরিচয়" একজাতীয় পত্রিকা নয়।

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি-সংবাদ

পরিচয়-এর পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাই।

এত একমাসে সংস্কৃতি-জগতে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে—তার সবগুলির সম্যক আলোচনা এবারের জন্য মুলতবী রাখতে হল। প্রকাশনা দ্রুত করার জন্যই এ-সিদ্ধান্ত। শারদ-উৎসব উপলক্ষে ছাপাখানা বন্ধ ছিল, খোলবার পর থেকে উর্ধ্বশ্বাসে কাজ করেও সময়মত কাগজ বের করা সম্ভব হল না, অনেক বিভাগই নমঃ নমঃ করে সারতে হল।

তবু দু-একটি ঘটনার অন্তত উল্লেখ না করলে নিজেদের কাছেই আমরা অপরাধী হব। এই রকম উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি হল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় নোবেল পুরস্কার ঘোষণা। বিজ্ঞান বিষয়ক নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে আগামী বারে বিস্তারিত আলোচনা পত্রস্থ করা যাবে, আশা করি। সাহিত্য বিষয়ে সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া অবশ্য কঠিন। কেননা সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার যিনি পেয়েছেন সেই কবি জর্জ সেফেরিস্ একাধিক অর্থে গ্রীক, আমাদের কাছে। নোবেল কমিটি এদিক থেকে তাঁদের পুরনো ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করলেন—ঝোলা থেকে বৎসরান্তিক বিস্ময় বের করে। বিস্ময়ই বলব, কেননা বাজারে গুজব ছিল জঁা-পল সার্ত্রে পাবলো নেরুদা এবারে নোবেল পুরস্কার পাবেন। নেরুদা লাল এবং সার্ত্রে ফিঁকে লাল বলে বিদিত। তবু মানুষ গুজবে কান দিয়েছিল এই কারণে যে তারা ভেবেছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বরফ-গলা শুরু হয়েছে সুইডিশ আকাদেমির টিনের দেবতাদের তা স্পর্শ করবে। ধন্য আশা কুহকিনী!

পুরস্কার প্রসঙ্গে মনে পড়ল, 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের জন্য এবারে আকাদামি পুরস্কার পেয়েছেন নট ও নাট্যকার শ্রীউৎপল দত্ত, আর নাট্যপ্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছেন নট শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। সাহিত্য আকাদামির এই সিদ্ধান্তে বাংলার নাট্যামোদী সমাজ খুশি হবেন, পরিচয়-এর আমরা তো বটেই। দুই দত্তই—উৎপল এবং সবিতাব্রত—পরিচয়-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের সম্মানে আমরা নিজেদের সম্মানিত মনে করছি।

এই ক-মাসের একটি দুঃখজনক ঘটনা শ্রীশুভময় ঘোষের অকালমৃত্যু। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি মস্কো থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পরিচয়ে

আমরা তাঁর দুটি লেখা—একটি রুশ কবিতা এবং একটি প্রবন্ধের (উলানোভার) তরজমা প্রকাশ করেছিলাম। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরও লেখা পাব আশা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর শীতল হাত তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিল। শুভময় পরিচয়-এর শুধু লেখক ছিলেন না, অনেকের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।

আজ থেকে অর্ধশতক আগে ১৯১৩-এর ১৩ই নভেম্বরের অবিস্মরণীয় সেই দিনটি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবির আসনটিতে অভিষিক্ত হলেন। কবির ইংরাজীতে অনূদিত "গীতাঞ্জলি" সে বৎসর সুইডিশ একাডেমির নোবেল পুরস্কার লাভ করল। সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডের মধ্যে সেই সর্বপ্রথম কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে জগৎজোড়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের বৈজয়ন্তী এইখানেই—ইউরোপের চোখ ঝলসাবার জন্য নয়, উদ্বেগ, সংশয় ও দ্বিধাদীর্ণ পৃথিবীতে শান্তির ও মৈত্রীর সঞ্জীবনীর অমৃত এই ভারতীয় মহাকবির হাত থেকে বিশ্ব উপহার লাভে ধন্য হল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সেই পঞ্চাশত্তম বার্ষিকীর দিনটিকে আমরা তাই স্মরণ করি। এ আমাদের গর্ব ও আত্মোপলব্ধির দিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধনা কি আমরা বহন করে চলতে পেরেছি?

সম্প্রতি মস্কোয় যে আংশিক পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আমরা তাকে স্বাগত করি। আমরা মনে করি পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই চুক্তি একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। আমরা আশা করি এই শুভ উদ্যোগের বিকাশ হবে, পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হবে, পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করা হবে, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং আমাদের জীবদ্দশাতেই অস্ত্রবর্জিত পৃথিবীর স্বপ্ন সফল হবে। আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে পারব—পারমাণবিক ধূমে বিষাক্ত পৃথিবী নয়, সুখ-শান্তির এক ঝলমলে পৃথিবী।

এই সংখ্যার ছাপার কাজ যখন সমাপ্তির মুখে তখন কলকাতা সফরে এসেছিলেন সোভিয়েত মহাকাশচারী ত্রয়ী—ভালেন্তিনা তেরেশকোভা, আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ ও ভালেরি বিকোভস্কি। মহানগরে পা দিয়েই কলকাতাবাসীর চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন এই মহাকাশ-বিজয়ী বীরেরা। বিশেষ করে কলকাতাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী তেরেশকোভা। এ-কাহিনীও আগামী সংখ্যা পর্যন্ত মুলতবী রাখতে হল। তাঁদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে পত্রান্তরে প্রকাশিত শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোট কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

মহাশূন্য মনোলোভা
ভালেন্তিনা তেরেস্‌কোভা।
তোমার তরে, ভালিয়া,
পাঠাই আমার ডালিয়া।
সামান্য এই ক'টি লাইন
আমার প্রীতির ভ্যালেন্টাইন।

শচীন বসু

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৫-
অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

সূচীপত্র

ছবি ও স্কেচ—জর্জ ব্রাক, নিখিলেশ দাস

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

[জর্জ ব্রাক

পরিচয়
বর্ষ ৩৩ ॥ সংখ্যা ৫

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

ভারতের আবদ্ধ আর্থনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে

ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে সম্প্রতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে। দেশের উন্নত শহর-নগর এলাকার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আজও অনুন্নতির শেষ ধাপে থেকে গেছে, অর্থাৎ এসব অঞ্চলের উন্নয়নের প্রভাব পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পড়েনি। তাই দেখা যাচ্ছে খুব উন্নত শহরের পাশেই অনুন্নত জীবনযাত্রাসম্পন্ন গ্রাম। এবং এই গ্রামগুলির আর্থনীতিক জীবনে ক্রমাবনতিই ঘটছে, অর্থাৎ শহর নগরের শিল্পায়ন ও আর্থিক উন্নতি গ্রাম এলাকায় কোনো demonstration effect বা প্রদর্শনী-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। বরং অন্যভাবে বলি, demonstration effect এইসব গ্রামাঞ্চলে আর্থনীতিক কোনো উদ্যম সৃষ্টি করতে পারেনি যার ফলে সঞ্চয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটে উৎপাদন বাড়বে। demonstration effect-এর এই সুফলটা ফলে নি। আবার অনেকে বলছেন, এই demonstration effect-কে আত্মস্থ করে নেবার মতো ক্ষমতা গ্রামীন্ অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়নি।

ভারতে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে আধুনিক শিল্পের পত্তন ঘটেছে এবং দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ পাট এবং কার্পাস ও কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানী করে আসছে। রেলপথ যোগাযোগও প্রায় ১০০ বছর হল ঘটেছে। এবং ৫০ বছরের উপর হয়ে গেল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পত্তন হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, শিল্পায়নের অগ্রগতির হিসাবে ১৯৫১ সালে ভারত এবং এই শতকের প্রথম দশকের ভারতের মধ্যে তেমন কোনো তারতম্য চোখে পরে না। উইলফ্রেড ম্যালেনবমের উক্তি এ সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি

লিখেছেন : "India was not an appreciably more industrialised nation in 1951 than in the first decade of the century, at least in terms of the relative importance of modern industrial output and employment." (Prospects for Indian Development p. 31)

এর পেছনে দুটি কারণ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমটি বিদেশী স্বার্থে যে শিল্পায়ন কর্ম শুরু হয়েছিল মূলতই তা export oriented অর্থাৎ রপ্তানী বাণিজ্যমুখী এবং দ্বিতীয়টি হল, আমাদের দেশে শিল্পায়নে প্রথম পর্ব থেকে এমন কি পরিকল্পনাকালেও শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন ও সংগঠন পদ্ধতিগত মৌলিক কোনো উন্নয়নমূলক পরিবর্তন ঘটেনি। আর এর ফলে, ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে। অর্থাৎ নগরীকরণ বা urbanisation যেটুকু ঘটেছে তা সীমাবদ্ধ। এই ধরনের enclave development* কখনই কৃষিগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করে না বা দুর্বল কৃষি আর্থনীতির পক্ষে এই ধরনের উৎসাহে সাড়া দেওয়াও সম্ভব হয় না। এই ধরনের কর্মপদ্ধতির ফলে দেখি একদিকে খুব উন্নত যদিও সীমিত নগরীকৃত এলাকা অপরদিকে অনুন্নত কৃষি অর্থনীতি।

আমরা যদি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মাথাপিছু কর্ষিত জমি ও মাথাপিছু উৎপাদনের হিসেব নিই তাহলে খুব ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠবে। এই হিসেব অনুযায়ী দেখি ১৮৯১ সালে মাথাপিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ যেখানে ছিল ১·০৯ একর ১৯৫১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০·৮৪ একর (Census 1951, Vol-part I A ; p. 141) এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাসের হারও লক্ষণীয় :

১৮৯৩-৯৬—১০০ ; ১৯১৬-২৬=৯৮ ; ১৯৩৬-৪৬=৮০ ;

(G. Blyn—The Agricultural Crops of India. 1893-96)

আবার ১৯৩৪-৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬-৫১ সালে মোট কৃষি উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতিতে কৌশলগত বা সংগঠনগত উন্নয়নমূলক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

কৃষি অর্থনীতির বিশেষক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি উৎপাদনও লক্ষণীয় হারেই বেড়েছে। তামাকপাতা, চা, কফি; রবার, পাট ও তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন ১৮৯০ থেকে

* আবদ্ধ অর্থনীতিক উন্নয়ন—Enclave Development.

১৯৪০-৪৬ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ফসলের জন্য জমির ব্যবহারের পরিমাণের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি অর্থাৎ জমির সযত্ন ব্যবহার, উন্নত যন্ত্রপাতি ও কৌশলের নিয়োগ এবং উন্নত ধরনের সার ও বীজ ব্যবহারের ফলে এমন ঘটেছে। অর্থাৎ কৃষি অর্থনীতিতে পদ্ধতিগত যে উন্নয়ন ঘটেছে তাও বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকেছে—তার প্রভাব কৃষির বৃহত্তর ক্ষেত্রে পড়েনি বা সেই প্রভাব আত্মস্থ করবার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। অধ্যাপক ম্যালেনবমের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "Improvements in one are tending to spread slowly, if at all—response sequences are limited in the area as well as in the nation—more broadly rather gains here are offset by declines elsewhere." (Prospects for Indian Development) ডঃ এস. আর সেন একটা মূল্যবান দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আসামে দেখা যাচ্ছে চতুর্দিকে চাষী খামার (peasant-farming) বেষ্টিত অঞ্চলে বাগিচা চাষ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক কৌশলে পরিচালিত এই বাগিচা চাষ-পদ্ধতি নিকটবর্তী চাষী খামারের পদ্ধতিকে কোনো প্রকারে প্রভাবিত করতে পারেনি অর্থাৎ চাষী খামারগুলির উপর বাগিচা চাষ-পদ্ধতির কোনো demonstration effect হয়নি। বা ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে পরিচালিত প্রাচীন-পদ্ধতি অনুসৃত দুর্বল চাষী খামারের পক্ষে ঐ প্রদর্শনী প্রতিক্রিয়া দ্বারা উজ্জীবিত হবার প্রাণশক্তি ছিল না বলাটাই ভালো। ডঃ এস. আর সেন মহাশয় লিখেছেন: "There seems to be a chasm between the planters and their neighbouring farmers in Assam which has not yet been bridged.* এ উক্তি ভারতের কৃষি এলাকার এই ধরনের পরিস্থিতির সর্বত্রই প্রযোজ্য।

আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের প্রাথমিক যুগের মতো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথাপিছু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো লক্ষণই দেখা দিল না। শুধু তাই নয়, গ্রাম এলাকায় শুধু কৃষিরই অবনতি ঘটেনি কৃষি-ভিন্ন অন্যান্য জীবিকারও শোচনীয়

* The Strategy of Agricultural Development—সর্বভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

অবস্থা ঘটেছে। মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস যেমন একদিকে শ্রমের সময় বৃদ্ধি ঘটিয়েছে অপরদিকে কৃষকের সংখ্যাও বাড়িয়েছে। কৃষকেরা চাষবাসের জন্য যে সামান্য যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করে তা তারা গ্রামের বাইরে থেকেই কিনত। অবশ্য ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে জনবহুল চাষ ব্যবস্থায় এই সামান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার তেমন সুফলপ্রসূ হয়নি আর তা হয়ও না। ফলে, গ্রামের কারিগরদের কোনো রকমে বেঁচে থাকবার মতো জীবিকাও বিশেষভাবে ব্যাহত হতে থাকে। তা ছাড়া, কৃষকদের দুরবস্থার দরুণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় এদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। এদের পণ্য গ্রামের বাইরে আমদানী করা বা উন্নত যন্ত্রপাতি তৈরী পণ্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখে বিক্রীর কথাই ওঠে না। তাই এমন করেই গ্রামীন অর্থনীতিতে অচল অবস্থা স্থায়ী হয়ে উঠতে থাকে। কুমোর, কামার, তাঁতী, জোলা হস্তশিল্পীরা বৃহত্তর শহরাভিমুখী হয় অথবা অদক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে থাকে। অকৃষিগত গ্রামীন অন্যান্য উৎপাদনে মাথাপিছু হার দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। সেদিন কৃষি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সুযোগ যে কত সীমিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্রমবর্ধমান কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যার হিসেব থেকে। হিসেবটি নিম্নরূপ :

কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যার অনুপাত :

১৮৮১—৬১% ; ১৯১১—৭১% ; ১৯৫১—৭০%

[এর সঙ্গে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশ অর্থাৎ আমেরিকার অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে—১৮৫০ সনে আমেরিকার কৃষি-নির্ভর মানুষের অনুপাত ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ এবং ১৯৫০ সালে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ। আবার ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে আমেরিকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ এবং কৃষি-নির্ভর জনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৫০ ভাগ।]

এ থেকে আমাদের কৃষি অর্থনীতির অচলাবস্থার পরিচয় পাই—অবশ্য অচলাবস্থা না ক্রমাবনতির অবস্থাই বলা চলে।

দেখা গেল ইংরেজ শাসনকালে অনুসৃত আর্থনীতিক কার্যক্রম সে সব দেশের আর্থনীতিক জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারেনি বরং স্বাভাবিক আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রতিবন্ধকগুলিকেই শক্তিশালী করেছে। বিদেশী শাসকদের কার্যক্রম ও বিধিব্যবস্থা ছাড়াও দেশীয় উদ্যোক্তা ও ফিনান্সিয়ারদের মনোভাবের মধ্যে দিয়েও এই প্রতিবন্ধকগুলি প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশী ও

দেশী কারখানাজাত পণ্যের প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত কারিগর ও কৃষকদের মধ্যেও প্রাথমিক ভাবে এই প্রতিবন্ধকের প্রতিক্রিয়াগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সীমিত কর্মসংস্থান সুযোগ শ্রমনিবিড়-অর্ধবেকার ভিত্তিক উৎপাদন (built in underemployment) কৌশলকেই উৎসাহিত ও স্থায়ী করেছে। যে ধরনের সীমিত শিল্পায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে আবদ্ধ উন্নয়নই ঘটেছে এবং ফলে কোনো উন্নয়ন-প্রবাহের (growth process) উদ্ভব হয়নি। তাই ক্রমাগতই নগর শহর শিল্প এলাকার শ্লথ গতি উন্নয়ন এবং প্রধানতই অচলাবস্থামূলক কৃষি অর্থনীতির পার্থক্য দুস্তর হয়ে চলেছে। আজও সেই ধারা অব্যাহত। একটা কথা; শহর নগর এলাকা যত গতিশীলই হোক না কেন তার প্রসারসীমা কৃষি অর্থনীতির অচলতা দিয়ে যেমন আবদ্ধ তেমনি ভোগ্য পণ্য শিল্প ও ব্যবসায়ভিত্তিক শহর-নগর অর্থনীতির প্রকৃতিগত বাধা ও কৃষি অর্থনীতির জীবনে প্রাণসঞ্চার করতে অক্ষম।

এই অবস্থায় পল্লী ও নগরের মধ্যে পণ্য, শ্রম, ও ধারণাগত আদান প্রদানে প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধিই পায়—হ্রাস পায় না। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের উৎপাদন ও সুবিধাগুলি দ্রুততালে গোটা অর্থনীতিতে পরিব্যাপ্ত করা যায় না। আবার ভোগ কাঠামো, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, শ্রমিকের দক্ষতা ও ধারণা, মূল্য-যোগান সম্পর্ক প্রভৃতি সব কিছুতেই এই আবদ্ধ উন্নয়নের ছাপ থেকে গিয়েছে।

ইংরেজ আমলে বাগিচা, খনি, তৈল প্রভৃতি শিল্পে যে ধরনের অর্থ লগ্নী ভারতে ঘটেছে তার প্রতিক্রিয়া ইওরোপের প্রথমাবস্থায় মূলধন লগ্নীর প্রতিক্রিয়ার মতো অনুকূল হয়ে ওঠেনি। কেননা, ঐ ধরনের মূলধন লগ্নীর শুভফল যেটুকুও ঘটেছিল তা দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতির দিক দিয়ে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ যে আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত ঘটল তা জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাড়তি ভোগে ব্যয় হয়ে গেল মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে শিল্পায়নে পুর্নবিনিয়োগ হল না। পশ্চিমের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে শিল্পায়নের প্রারম্ভে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির অবস্থা দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হয়েছিল যার ফলে জন্মহার হ্রাস পায় এবং তাতে আর্থনীতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ এই ধরণের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে জনতত্ত্বগত (demographic reaction) যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—যা ইওরোপে ঘটেছিল, তা এখানে ঘটল না। আজ পর্যন্ত শিল্পায়নের কার্যক্রম সেদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন কেন ব্যর্থ হয়েছিল আর আজও কেন হচ্ছে তার কারণ নিহিত রয়েছে

শিল্পায়ন পদ্ধতির প্রকৃতি এবং কৃষি অর্থনীতির প্রকৃত সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রমের অনুপস্থিতির মধ্যে।

ইংরেজ আগমনের প্রাক্‌কালে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থাতেও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা বিপুল ছিল না এবং সেই দিক থেকে যন্ত্রশিল্প প্রসারের মাধ্যমে আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে এসব দেশের অবস্থা অনুকূলই ছিল বলা চলে। এবং যন্ত্রশিল্প প্রসারের ফলে কৃষি অর্থনীতির সংগঠন ও পদ্ধতিগত যে উন্নয়ন ঘটত তাতে আর্থনীতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে জনতত্ত্বগত প্রতিক্রিয়া ইওরোপের মতই অনুকূল হয়ে উঠত।

কিন্তু ইংরেজ-অনুসৃত রপ্তানী-বাণিজ্যমুখী শিল্পায়ন-কার্যক্রম এবং তাদের প্রবর্তিত নতুন ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সম্পর্কের ফলে দেখা গেল ১৯ শতকের শেষ ভাগে ভারতবর্ষে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এত দ্রুত হারে ঘটল যে শিল্পায়ন কর্মপদ্ধতি ও ভূমি-নীতি না বদলিয়ে অর্থাৎ—বৃহদায়তন কৃষি অর্থনীতি ও মূল ও ভারী শিল্প পত্তনের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি না ঘটিয়ে শুধুমাত্র বাগিচা, খনি ও রপ্তানী শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব না। শুধু তাই না, এই সব শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শিল্প-কারখানা ভারতে গড়ে ওঠেনি বা গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। ইংলণ্ড থেকে এসব যন্ত্রপাতি আমদানী করে বাগিচা, পাট, বস্ত্র শিল্পে যোগান দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই ধরনের শিল্পায়ন কার্যক্রমের ফলে এবং ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতির দরুণ যথার্থ নগরীকরণ (urbanisation) ঘটেনি। ইংলণ্ড, আমেরিকায় শিল্পায়নের প্রথম পর্বের শিল্পকরণ কর্মপদ্ধতির প্রকৃতির দরুণ নগরীকরণ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে—তাই নগরীকরণের জনতত্ত্বগত প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে, যা ভারতবর্ষে ঘটল না। ইওরোপ-ইংলণ্ড-আমেরিকায় প্রাথমিক বিনিয়োগ, খনি, তৈল, ও রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঘটেছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বৃহদায়তন কৃষি অর্থনীতির পত্তন এবং সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারি শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা ভারতে এই দুই ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারি শিল্পের বিকাশে উৎসাহ তো দেয়ই নি বরং বাধা সৃষ্টিই করেছে। কাজেই ভারতে শিল্পে-বিনিয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারি শিল্পের বিকাশ ঐ সব দেশে না ঘটে উপনিবেশিক শক্তি, ইংলণ্ডেই ঘটেছিল। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থলগ্নীর কারবার (financing), যানবাহন সংগঠন ব্যবসা

(transporting) মজুত কারবার (storing) বীমা, শিল্পগত কাঁচামালের প্রসেসিং (processing industry) প্রভৃতি শিল্প ভারতের বাইরেই মূলত সংগঠিত হয়েছিল। যে শিল্পায়ন শুধু কাঁচামাল ও রপ্তানী বাণিজ্য পণ্য তৈরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাতে নগরীকরণ ঘটে না এবং এই ধরনের শিল্পকর্ম ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের একমাত্র জীবিকা কৃষি অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রগত (capitalising) বা অন্য কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক পরিবর্তন না ঘটিয়েই অনেকদূর অগ্রসর হতে পারে। এ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি তা হল এ সব দেশে মৃত্যুর হার হ্রাসের শুরু থেকে জন্ম হার হ্রাস শুরু হওয়ার মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকে তা ভারতের বিশেষ ধরনের নগরীকরণ পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন শিল্পায়ন কর্মধারা প্রভাবিত।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা চলে। অর্থাৎ যে সব দেশে যে সময় থেকে যন্ত্রশিল্পগত অগ্রগতি সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবন কাঠামোয় ব্যাপক ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব দেশে সেই মুহূর্ত থেকে শুধুমাত্র যে উৎপাদন ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায় তা নয়, কিছুদিনের মধ্যেই সে সব সমাজে হ্রাসমান প্রজনতাও দেখা দেয়। ইংলণ্ড-ইওরোপের ইতিহাস তাই বলে। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রমুখ দেশে অনুসৃত শিল্পায়ন পদ্ধতিতে built-in technological progress রূপায়িত হয়ে ওঠেনি। এসব দেশে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি দেশী সমাজ-প্রয়োজন উদ্ভূত নয়; তাই এই সব সমাজে এই ধরনের শিল্পায়নের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। এ সব দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই আধুনিক যন্ত্রগত উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং সাধারণ মানুষের অনুসৃত উৎপাদন পদ্ধতি এতে একটুও পরিবর্তিত হয়নি। কেন তা হল না? ভারতে যে ধরনের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে যে পদ্ধতিতে শিল্পায়ন ঘটেছে তাতে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান-সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি। সেদিক থেকে ভারতের মতো উপনিবেশিক দেশগুলির আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মকে শিল্পক্ষেত্র (industrial sector) ও কৃষি ক্ষেত্র (rural sector) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শিল্প ক্ষেত্র বলতে রপ্তানীমুখী শিল্প, বাগিচা শিল্প, খনি, কিছু পার্ট ও বস্ত্রশিল্পকে বোঝায়; আর কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য উৎপাদন, হস্ত শিল্প ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে ধরা চলে। শিল্প ক্ষেত্র মূলধন-নিবিড় পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং এ সব শিল্পের উৎপাদন-উপাদান-সম্মিলন ঘটে অপরিবর্তনীয় অনুপাতে (fixed technical co-efficient) তা ছাড়া,

মূলধন-নিবিড়মূলক পদ্ধতিতে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত—দেশের মাটিতে দেশের শ্রম ও অন্যান্য উৎপাদনে তৈরী নয়। কাজেই সব মিলিয়ে এই সব উৎপাদন সংগঠনে বিনিয়োগের কর্ম-সংস্থানগত সুফল সামান্যই ঘটে। অবশ্য পল্লী অঞ্চলে উৎপাদনের উপাদান-সম্মিলন পরিবর্তনীয় অনুপাতে ঘটে (variable technical co-efficient) অর্থাৎ উপাদান-সম্মিলনের অনুপাতের ব্যাপক বিভিন্নতার সাহায্যে উৎপাদন এ সব ক্ষেত্রে সম্ভব।

এই অবস্থায় আর্থনীতিক বিকাশধারা প্রথম পর্যায়ে উৎপাদনের কোনো উপাদানের যোগানই তুলনায় প্রচুর বা স্বল্প কোনটাই হয় না। তাই উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে শিল্প পত্তনের ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দরুণ প্রজনন বিস্ফোরণ ঘটে। ক্রমশ শিল্প ক্ষেত্রে যে হারে মূলধন সংগঠিত হয় সে হারকে অতিক্রম করে যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। কারণ, এইসব শিল্পের যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত এবং কেবলমাত্র কাঁচামাল আসে দেশের পল্লী অর্থনীতি থেকে; আর তাছাড়া, কৃষি অর্থনীতিতে পুরাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতেই উৎপাদন চলে; ফলে মাথাপিছু আয় স্বল্পই থাকে— মোট আয় বাড়াবার তাগিদে পরিবারের আকার বৃদ্ধির প্রবণতা তাই থেকে যায়। অপরদিকে এই সব দেশের শিল্পক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় উৎপাদনের সম্মিলনের ফলে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় তাতে এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। শিল্পায়নের প্রথম প্রতিক্রিয়ার পর কর্মসংস্থান-সুযোগ কৃষি ক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরিত তো হয়ই না বরং তুলনায় মোট কর্মসংস্থান হ্রাসের সম্ভাবনাই ঘটে। সেদিনের বিশেষ ধরনের শিল্প লগ্নীই এর জন্য দায়ী।

স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে অপর ক্ষেত্রে পল্লী আর্থনীতিক কাঠামোতে অর্থাৎ উপাদানের পরিবর্তনীয় সম্মিলনমূলক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবিকার অন্বেষণ করতে হয় এবং যত দীনই হোক জমির আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম বটে। কৃষিতে মূলধনের যে পরিমাণ যোগান ঘটে থাকে তার অনুপাতে শ্রম উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যেহেতু পল্লী অর্থনীতিতে উৎপাদন-উপাদান-সম্মিলন পরিবর্তনীয় সেই হেতু উৎপাদন পদ্ধতি ক্রমশ শ্রম-নিবিড় হয়ে ওঠে আমাদের দেশে। প্রথমাবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে ভূমি ও শ্রমের অনুপাত স্থির রাখতে গিয়ে নতুন জমি

কর্ষণভুক্ত করা হয়। কিন্তু যেহেতু পাশাপাশি অনুষ্ঠিত শিল্পায়ন সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক নয় ও কৃষিকে উন্নত ধরনের মূলধন যোগানে অক্ষম এবং ভূমি রাজস্ব প্রথার দরুণ ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে পরিচালিত পঙ্গু কৃষি অর্থনীতি সেই হেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিবার কর্তৃক ফলপ্রসূ কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তখন সেখানে যতদূর সম্ভব শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে। এমন করে অত্যধিক শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কোনোরকমে জীবনধারণ মানেরও নীচে নেমে যায়, এমন কি শূন্যেও পৌছয়। এই অবস্থায় প্রচ্ছন্ন বেকারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

গত একশ বছর ধরে ভারতের মতো দেশগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে এবং কুটির ও হস্তচালিত শিল্পে উৎপাদনপদ্ধতি ও সংগঠন-গত কোনো উন্নয়ন ঘটেনি, বা সে চেষ্টাও হয় নি (কেন হয়নি পরে আলোচ্য) ; অথচ রপ্তানীমূলক শিল্পে বাগিচা ও খনি প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক মজুরীতে সুদক্ষ শ্রম নিয়োগ ঘটেছে। ফলে দেখা গেছে, শিল্প-অঞ্চলের সন্নিহিত কৃষি এলাকার বাড়তি জন কোনো সুযোগ পেল না—দেশের ভিন্ন অঞ্চলের নগর শহর এলাকার শিক্ষিত সুদক্ষ জন সে ক্ষেত্রে নিযুক্ত হল। কাজেই গ্রাম ও শহর-নগর এলাকাগুলির ব্যবধান ক্রমাগত দুস্তর হয়ে উঠল। আজও সে ধারা অনেকটা অব্যাহত। দুর্বল, দরিদ্র, কৃষি অর্থনীতি অধ্যুষিত আর্থনীতিক কাঠামোতে শিল্পায়ন সীমিতই থেকে যায়। উন্নত ভোগ্যপন্য শিল্পে প্রধান শিল্পায়ণই তাই আমাদের অর্থনীতিতে ঘটেছে—সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নপোযোগী ভারী ও মূল শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নি।

এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথাও উল্লেখযোগ্য—কেননা বৈদেশিক বাণিজ্য ইংরেজ আমলে ও আজও আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। তবে এ কথা সত্য বর্হিবাণিজ্য সেদিন আমাদের আর্থনীতিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকরই হয়েছিল। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে আমাদের দেশে রপ্তানী বাণিজ্যের বেশ দ্রুততালে উন্নতি ঘটেছে। সেদিন রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রের মূলধন দুষ্প্রাপ্য ছিল না—রপ্তানী বাণিজ্যে নিয়োজিত বিদেশী ফার্মগুলি বিদেশ থেকে সহজেই সমান শর্তেই মূলধন -ঋণ সংগ্রহ করতে পারত। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, রপ্তানী বাণিজ্যের অগ্রগতি

অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে গুণিতক প্রতিক্রিয়া (multiplier effects) সৃষ্টি করল না কেন? অর্থাৎ রপ্তানী বাণিজ্যের spread effects বা ব্যাপক প্রসারে সুফল ঘটল না কেন?

এর জন্য দায়ী, সীমিত শিল্পায়নপ্রসূত শ্রম যোগানের কয়েকটি অবস্থা। প্রথমত স্বল্প মজুরীতে বিপুল শ্রমের যোগান এবং দ্বিতীয়ত সাধারণত দক্ষ শ্রমিকের অভাবের দরুণ সংগঠকেরা উপযুক্ত পরিমাণে শ্রম সংগ্রহের বিষয়টিকে দুরূহ কাজ বলে মনে করতেন। শ্রমের মজুরী জীবনমানের দিক থেকে অল্প হলেও তাদের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় তা অল্প ছিল না।

অবশ্য শস্তা শ্রম-নিয়োগ নীতির পরিবর্তে অধিক মজুরীতে সুদক্ষ শ্রম-নিয়োগ নীতি এবং শ্রমের পরিপূর্ণ ও যথার্থ ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে হলে বড় যন্ত্রপাতির আকারে বিপুল একত্র নিয়োগ এবং অপর দিকে স্থায়ী শ্রমের উপযোগী কৃষি সংগঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল। যা সেদিন নেওয়া হয় নি।

ভারতে সেদিন বিদেশী ব্যবসায়ীরা, বাগিচা, রপ্তানী প্রভৃতি কৃষির ক্ষেত্রে শস্তায় শ্রম-নিবিড় পদ্ধতির অনুসরণের পক্ষপাতীই ছিল—এতে সহজলভ্য শ্রমের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় সংক্ষেপ ঘটত—তা ছাড়া, এই ক্ষেত্রেও নিপুণ দক্ষ শ্রমিকের নিয়োগ ঘটাতে গেলে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হত—যা তাদের স্বার্থবিরোধী ছিল। কাজেই তারা সে পথে যায় নি। এ সব উৎপাদনের অপরদিকে অর্থাৎ যেখানে সুদক্ষ শ্রম ও উন্নত মূলধন অপরিহার্য সেখানে তার বিনিয়োগে এরা পেছপা হয় নি। অবশ্য এই মূলধন আমদানীকৃত ছিল এবং শ্রমেরও একটা অংশ তাদের স্বদেশাগত ছিল। তাই একই বাগিচা শিল্পের ব্যাপারে আমরা দেখি খুব সামান্যই সাধারণ ট্রেনিং প্রয়োজন এমন শ্রম-ও-ভূমি-নিবিড় পদ্ধতি সম্বলিত কৃষি অংশের সঙ্গে সুদক্ষ শ্রমসহ মূলধন নিবিড় পদ্ধতি অনুসৃত উৎপাদনের প্রসেসিং অংশ সংযুক্ত। ডঃ মিণ্ট লিখেছিলেন—It is the intermediate kind of technique requiring fairly large number of workers in skilled occcupation which were shunned by entreprenneurs in under-developed countries.

এ কথা স্বীকার করতেই হবে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলি অনুসৃত

শিল্পায়ন পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতির পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্যম সৃষ্টি হয় অথচ ভারতের মতো অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে বিশেষ ধরনের সীমিত শিল্পায়ন কর্মধারা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নতুন অভাব সৃষ্টি করা ছাড়া শিক্ষাগত ও উন্নয়নমূলক কোনো প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারে নি। বিদেশী শাসকের স্বার্থে আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার পত্তন ছাড়া কিবা কৃষি কিবা অকৃষি কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন ও দক্ষতার দিক থেকে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষায়ণ ঘটে প্রাচীন পদ্ধতিতে পুরনো অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন ফসল উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে।

পূর্বে বলেছি, সেদিন আমাদের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্ম প্রধানত রপ্তানী বাণিজ্যমূলক শিল্পে বাগিচা, খনি প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্যও সৃষ্টি হয়েছে। অগ্রসরমান অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীভূত আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করে এবং তাতে অনগ্রসর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অচলাবস্থা অথবা অবনতির সৃষ্টি করে। ক্ষীণ ব্যাপকপ্রসারী সুফল (weak spread-effects) সম্বলিত নিম্নমান আর্থনীতিক অগ্রগতিতে বাজারের প্রতিযোগী শক্তিগুলির চক্রাকার প্রতিক্রিয়ার ফলে সব সময়ের জন্য অঞ্চলগত অসাম্য সৃষ্টির (regional disparitis) দিকে একটা প্রবণতা থাকে এবং এই প্রবণতা আপনা থেকেই আর্থনীতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। উন্নত দেশের অর্থনীতির উচ্চমান অগ্রগতি ব্যাপক-প্রসারী সুফলকে অবশ্যই শক্তিশালী করে এবং অঞ্চলগত বৈষম্য সৃষ্টির প্রবণতাকে ব্যাহত করে। এর ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতি সংরক্ষিত হয়।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট কতকগুলি মূলধন নিবিড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমদানী করা মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আজকের এই অচল অবস্থা এবং এর ফলে সীমিত নগরীকরণ প্রভাব সৃষ্টি হয়ে নগর ও গ্রামের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য গড়ে উঠেছে। এবং তা আজকে ভারতে সত্যিকারের উন্নয়নমূলক শিল্পায়ণের পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতার উত্তরকালে অবশ্য আমরা পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপকপ্রসারী শিল্পায়নের চেষ্টা নিয়েছি। কিন্তু পরিকল্পনার গত ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে

দেখা যাচ্ছে ; গ্রাম-নগরের পার্থক্য সমান দুস্তরই থেকে গেছে কিবা উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে কিবা ভোগ সঞ্চয় কাঠামোর দিক থেকে। বলাবাহুল্য এই কারণে আর্থনীতিক উন্নয়ন-শক্তি যেটুকু সৃষ্টি হচ্ছে, তা সর্বব্যাপী না হয়ে বড় বড় শহর-নগর এলাকার বিশেষ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে। আজও দেখা যাচ্ছে, শিল্পায়নের উন্নয়নমূলক প্রতিক্রিয়া গ্রাম এলাকায় অতি সামান্যই ঘটছে। আজও তাই শিল্পোন্নত বড় বড় শহরের পাশেই অনুন্নত গ্রাম এবং আজও এই গ্রামে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবিকার সূত্র। অথচ যেখানে বড় বড় শহরের বিশেষ অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান প্রায় মার্কিন জীবনযাত্রার সমতুল্য সেক্ষেত্রে গ্রামের লোকের মাথাপিছু আয় কোনোরকমে বেঁচে থাকার পর্যায়ভুক্ত যাদের মাসের মধ্যে প্রায় ১০ দিন অর্ধভুক্ত থাকতে হয় (সম্প্রতি The Statesman কাগজে প্রকাশিত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। উৎপাদন কাঠামো বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, উন্নতমান ভোগ্য পণ্যের শিল্পে বিপুল মূলধন বিনিয়োগ ঘটছে অথচ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির শিল্প ভারী ও মূল শিল্পে সেই পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটছে না। সেই একই ধারা অর্থাৎ একদিকে মুষ্টিমেয় শহর-নগর এলাকায় মূলধন নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদন চলছে এবং অর্থনীতির অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে শ্রমনিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদনের কাজ চলছে। অর্থাৎ দ্বৈত অর্থনীতি অনুসৃত হচ্ছে—তাই সত্যিকারের আর্থনীতিক অগ্রগতির কাজ ব্যহত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে কৃষি অর্থনীতির সংগঠন ও উৎপাদন পদ্ধতির আলোচনা করাটা বিধেয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, ইংরেজ আমল থেকে পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত কৃষি অর্থনীতি অনুসৃত নীতির তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ল না। সম্প্রতি ভূমিসংস্কার নীতির আশ্রয় আমরা নিয়েছি সত্য কিন্তু তাতে জমিতে কৃষকদের মালিকানা স্বীকৃত হলেও উৎপাদন ব্যবস্থা ও সংগঠন-মূলক এবং উৎপাদন সম্পর্কগত কোনো ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তার ফলে কৃষি অর্থনীতির অনুন্নত অবস্থা প্রায় স্থায়ী হয়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলে অনুসৃত নীতির প্রতিক্রিয়া আজও ব্যাপকভাবে আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে উপস্থিত।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত ভূমি-প্রথার বিবর্তনের মাধ্যমে ইংরেজ আমলে মধ্যবর্তী সত্তা জমিদার শ্রেণীর এবং জমিতে অচাষী শ্রেণীর মালিকানার প্রবর্তন। এর ফলে, চাষীকে জমির সঙ্গে বেঁধে ফেলা

হল। কেননা তার পক্ষে অন্য কোনো বৃত্তির অভাবে চাষ, তা যত অলাভ-জনক শর্তেই হোক, ছেড়ে যাওয়ার উপায় রইল না—ফলে ভূস্বামী জমিদার শ্রেণীদের শোষণের সুযোগ ব্যাপক হয়েছিল। চাষীর ভূমিহীনতা আর্থনীতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করল। জমি থেকে চাষীর বিতাড়িত হবার শঙ্কা থাকায় চাষীর পক্ষে জমির মালিকের সঙ্গে ফসলের ভাগাভাগি নিয়ে সুবিধেমতো দরকষাকষির ক্ষমতা সীমিত হয়ে গেল এবং এই অবস্থায় জমিতে দীর্ঘকালীন মূলধন লগ্নীর মাধ্যমে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি কোনো ঝোঁকও চাষীর থাকবার কথা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষি থেকে অন্য বৃত্তিতে যাওয়ার সুযোগের অভাব বা বাধা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবতই নতুন ভূমি-ব্যবস্থাতে উৎপাদনের দিক দিয়ে অসুবিধা-জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে অকেজো পদ্ধতিতে (inefficient methods) চাষবাসের প্রবণতা বৃদ্ধিই পাবে। আজও ভূমিসংস্কারের পরও ভূমি সংগঠনের অভাবে এবং ব্যাপক শিল্পায়নের অভাবে এই প্রবণতা শক্ত হয়েই থেকে গিয়েছে। কৃষির capitalisation-এর অভাবও এর একটি কারণ।

সেদিন দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছিল কৃষিপণ্য—বিশেষ করে রপ্তানী পণ্য ও বাণিজ্যিক পণ্যের বিক্রির ব্যাপারে মধ্যবর্তী স্বত্বের (intermediaries) আবির্ভাব সত্যিকারের চাষীকে ন্যায্য উপার্জন থেকে বঞ্চিত করেছে। কৃষকের সঙ্গে এই মধ্যবর্তী স্বত্বের আগাম চুক্তির ফলে বাজারে মূল্য স্থির হবার সময় যে সুবিধে ঘটে তা থেকে কৃষক বঞ্চিত হয়। অসংগঠিত কৃষি অর্থনীতিতে এই মধ্যস্বত্বশ্রেণী কৃষকদের উৎপাদনকালে জীবিকা নির্বাহের জন্য খাদ্যবস্তু বা বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং তার ফলে পণ্য বিক্রয়ের আয় থেকে সর্বাধিক সুবিধে ভোগ করে এবং এইভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এমনকি বাণিজ্য ফসলের উৎপাদন ও অমুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক থেকে গিয়েছে। আর এই কারণে কৃষি অর্থনীতি ক্রমাগত শহর-নগর এলাকার মুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজও একথা সত্য।

এ-সব দেশের সওদাগর-ব্যবসায়ীদের কাজকর্ম মহাজনদের কাজকর্মের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। "The narrow money margins which characterised the endevours of, most peasants meant

frequent borrowing repayment constituing a long-term burden which in itself deferred investment by many of the cultivators." (Malenbaum) তৃতীয়ত গ্রাম এলাকায় দুস্তর আর্থনীতিক বৈষম্য ও ভূমিগত সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রতিক্রিয়াও কৃষি অর্থনীতির অচলতার জন্য অনেকখানি দায়ী। যেখানে পল্লীগত অর্থনীতির মাথাপিছু উৎপাদন হার নিম্নমুখী সেক্ষেত্রে পল্লী মানুষের আর্থনীতিক কল্যাণ নির্ভর করে বহির্জগতের সঙ্গে তার লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্যের শর্তের উপর। আর একথাও আমরা জানি যে অর্থনীতির বৃহত্তম অংশ অমুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক (১৫% মাত্র মুদ্রাগত বিনিময়-ভিত্তিক—সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী) ফলে উৎপাদক তার পণ্যের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে দিনের পর দিন দারিদ্র্যের মধ্যেই দিন যাপন করে চলেছে। আর এই মুষ্টিমেয় ব্যবসায়শ্রেণী যারা লেনদেনের শর্তে লাভবান, হল তাদের জমিতে লগ্নীর ব্যাপারে কোনো উৎসাহই থাকতে পারে না—আর জমিদার মহাজন শ্রেণী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীরা এই প্রকারে যে বিপুল পরিমাণ বিত্তলাভ করেছে তা তারা শহর-নগর এলাকায় বিনিয়োগ করেছে। ফলে গ্রামের আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত কৃষি উন্নয়নের জন্য লগ্নী না হয়ে ক্রমাগত শহর-নগর এলাকায় ফাটকা, গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে। এর ফলে পরিবর্তনশীল শহর-নগর এলাকা থেকে ক্রমশই বৃহত্তর পল্লীসমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে। দেখা গিয়েছে যোগাযোগ ও যানবাহনের উন্নতির ফলে শহর-নগর এলাকার ভোগকাঠামো হয়তো এদের ভোগকাঠামোকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করেছে কিন্তু তাতে অন্যান্য উন্নত দেশের এই demonstration effect যেভাবে capital formation ও শিল্পায়নকে প্রভাবিত করেছে, ভারতে তা করেনি বরং সেদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্তই করেছে। কেননা পল্লী অঞ্চলে দুর্বল কৃষি-অর্থনীতি-আশ্রয়ী কোনো রকমে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে কৃষি-আর্থনীতিক সংগঠনের কোনোরূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে এই অবস্থার সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। অর্থাৎ শহর-নগর এলাকার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়ানো যায় তাহলে উভয়ক্ষেত্রের পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে সমতালে আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটবে না—দুর্বল পল্লী অর্থনীতি সর্বদাই পেছিয়ে থাকবে। ফলে শিল্পের উৎপাদন কাঠামোও শুধুমাত্র শহর-নগর এলাকার উচ্চবিত্ত মানুষের

উন্নতমান ভোগপণ্যের চাহিদা মেটাবার দিক থেকে তৈরি হতে থাকে। এতে একদিকে ভারী মূলশিল্প পত্তনের তাগিদ হ্রাস পেয়ে যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর ক্রমশ নির্ভরশীলতা বাড়বে এবং শহর-নগর অর্থনীতির ও গ্রামীন অর্থনীতির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই দুস্তর হতে থাকবে। আমাদের গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতাও এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ দুটি পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হবার পরও দেখা যাচ্ছে কৃষি-আশ্রিত মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এবং এই কৃষি হল ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত স্বল্প মাথাপিছু উৎপাদনশীল কৃষি। একটা লক্ষ্য করবার বিষয়, আমাদের পল্লী অঞ্চলে কমিউনিটি উন্নয়ন-পরিকল্পনা কোনো উদ্যম ও উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারে নি—কিছু অঞ্চলে মুদ্রাগত বিনিময় ব্যবস্থা হয়তো এতে প্রসার লাভ করেছে কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নি—কেননা তাতে অতি সামান্য হলেও কিছু আধুনিক ভোগপণ্যের বাজার প্রসার ঘটলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নি। এতে কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার দোষ নেই—দোষ মূলে অর্থাৎ, কৃষি-অর্থনীতির সংগঠনগত ও উৎপাদনপদ্ধতিগত কোনো উন্নয়ন না ঘটলে কমিউনিটি প্রজেক্টের কোনো আবেদনই পল্লী মানুষের কাছে থাকতে পারে না। সম্প্রতি The Statesman-এ প্রকাশিত Visva-Bharati Agro-Economic Research Centre-এর এক বিবরণী থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করতে হলে এবং শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটাতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন কৃষি-আশ্রিত মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার ফলে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা। অন্যান্য দেশে দেখা গিয়েছে শিল্পায়ন অগ্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত কৃষি অর্থনীতি থেকেই এসেছে এবং কৃষি-অর্থনীতির এই সার্থকতা আবার শিল্পায়ন অগ্রগতির ফলেই ঘটেছে কৃষি-অর্থনীতির উৎপাদন-পদ্ধতি ও সংগঠনের উৎপাদনের মাধ্যমে। আমাদের দেশে এমনটা ঘটল না। একটা কারণ শিল্পায়ন পদ্ধতির ত্রুটি যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং অপরটি হল ভূমিসংস্কার নীতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনগত আমূল পরিবর্তনের কোনো চেষ্টার অভাব। ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষকের হাতে জমি এসেছে কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ জমির মালিকানার সর্বোচ্চমান ব্যবস্থার ফলে জমির বড় অংশই পূর্বের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে থেকে

গেল।* কৃষি জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের হাতে খুব সামান্য জমিই রইল। ফলে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে প্রাচীন পদ্ধতিতেই চাষবাস চলছে; আর তাই প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যাও থেকে গেল আবার উৎপাদন হারও কমল বই বাড়ল না। এরপর যে জমি রইল তা পাওয়ার কথা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের—কিন্তু দেখা গেল তাদের কপালে এতই সামান্য জমি এসে দাঁড়াল যা একত্রিত করে সমবায় প্রথা অনুসরণের পক্ষে খুব লাভজনক মনে হল না। তাছাড়া পূর্বে বর্ণিত মহাজন মধ্যবর্তী শ্রেণী ব্যবসায়ীচক্র থেকেই গেল—ফলে অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং-ই থেকে গেল। কাজেই দেখা যাচ্ছে একদিকে শিল্পায়নের গতি উচ্চমান ভোগ্যপণ্য উৎপাদনমুখী এবং অপরদিকে কৃষি-অর্থনীতির আশ্রিত মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা। ফলে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র আজও স্থাপিত হল না।

---

* এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য:

(ক) Daniel Thorner—Agrarian Prospects in India

(খ) Agro-Economic Research Centre, Delhi-এর রিপোর্ট ও National Sample Survey Report দ্রষ্টব্য

(গ) প্রিয়তোষ মৈত্রেয়—Economics of Land Reforms in India—বিশ্বভারতী Agro-Economic Research Centre-এর Seminar পঠিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রবাসীর ভদ্রাসন

ফেনী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাস চলেছে। পড়াতে পড়াতে চোখে পড়ল ক্লাশের এক কোনে গুটি দু তিন ছেলে গল্প করছে। দেখে চিত্ত সরস হবার কথা নয়। ক্লাসের পড়া থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কী কথা হচ্ছে। ধরা পড়ে ছাত্র কয়টি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে! শেষ পর্যন্ত সলজ্জ ভাবে জানাল, "কথা হচ্ছিল, আপনার বাড়ি কোথায় ?"

এবার কৌতুক বোধ করলাম। বললাম, "তোমরাই বলো না কোথায় ?" সঙ্কোচ আরো একটু কাটলে একজন বললে, "আমি বলছিলাম বিক্রমপুর, ঢাকা।' আমার বন্ধু বলছিলেন "নোয়াখালি। তর্ক হচ্ছিল—কার কথা সত্যি।" দুজনারই কথা—আমি তাদের 'গাঁওকী ভেইয়া'। বললাম "দুই-ই সত্য, দুই-ই মিথ্যা। ছাখো আমি জন্মেছি বিক্রমপুরে। আবাল্য কাটিয়েছি নোয়াখালি শহরে। তা জন্মক্ষেত্র নয়; কিন্তু নিশ্চয়ই সেই বাসাবাড়িও বাড়ি। তাই দুটি কথাই সত্য। তবে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো তা হলে বলব আমার বাড়ি অন্যত্র।" ওদের কৌতুহলটা আরও একটু বেড়ে গেল। বললাম, "জানো ইউরোপে একটি কথা আছে, 'প্রত্যেক ইউরোপীয়ের দুটি আছে বাড়ি—একটি তার জন্মভূমি, আরেকটি প্যারিস।' আমার মতে আমাদের বাঙালীদেরও দুটি করে আছে বাড়ি। একটি নিজ বাড়ি, আরেকটি কলকাতা। আমি কলকাতার মানুষ।"

তখনো বয়স ছিল ত্রিশের নিচে। তা পেরিয়ে গিয়ে বক্সা বন্দিশালায় বাস করছি। তখন সেখানকার মধ্যবিত্ত কমিউনিস্টদের 'ভদ্রলোক'-বিরোধিতাকে নিরস্ত করবার মতো আমারও একটা উত্তর ছিল; "আমি কমিউনিস্ট হব আবার কী ? আমি পুরুষানুক্রমে প্রোলেটেরিয়ান্—আপনারা

কেউ যা নন। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাই। জমিজমা দূরে থাক বাড়িঘরও আমাদের নেই। বিক্রমপুরের বাড়ি পদ্মা গর্ভে; নোয়াখালির বাসাবাড়ি—মেঘনার উদরে। থাকি কলকাতায়—ফ্লাটের ভাড়াটে। সম্বল শুধু দেহ আর মাথা। বাঙালী ভদ্রলোকরা তো have nothing to lose but their body and brains."

গ্রামের সেই বাড়ির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটত স্বল্পকালীন। সাধারণত পূজায় প্রবাসীরা বাড়ি যায়। প্রতি বৎসর সমস্ত পরিবারের বাড়ি যাওয়া আমাদের দিনে সম্ভব হত না, দু বৎসরে যেতাম একবার করে। তা হলেও, সেই বিক্রমপুর সমাজই ছিল সমাজ, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম হয় সে সমাজেই। সেখানকার আচার-বিচারই বরাবর পরিবারের আচার-বিচার, তার ভাষা বাড়ির সকলের ভাষা, তার রন্ধন-রীতিও আমাদের স্বাভাবিক রন্ধন-রীতি। নিশ্চয়ই শিক্ষা-দীক্ষা ও বাইরের মেলামেশায়ও কিছুটা পলি পড়েছে সেই প্রবাসের মনে। গ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্বল্পকালের বলেই স্মৃতিতেও সুমধুর হবার পক্ষে তার বাধা ঘটে নি।

পূজার বাড়ি সহজ ভাবেই উৎসব-মুখর, আত্মীয় কুটুম্ব মিলনোচ্ছল, সমাদরে সম্ভাষণে মানুষের মুখ উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত। নৌকার পর নৌকা তখন বাড়ির ঘাটে লাগছে। এলেন বুঝি পিসিমা তার কন্যা ও দৌহিত্রদের নিয়ে। অন্য গ্রাম থেকে এলেন এক ভাগ্নী বালবিধবা—মামাদের বাড়িই তো তার নিজ বাড়িই। বৃদ্ধা গৃহিণীর ভাই-ঝি এলেন কেউ ছোট পুত্রবধুকে নিয়ে—এই দাদাশ্বশুরদের বাড়ি দেখে যাক নতুন বউ। পিসতুত ভাইরা এল কেউ—মা না থাকুন এটা তাঁদের মামার বাড়ি। আর বাড়ির কন্যারাও এল—যাদের বাড়ি পূজা নেই—পিত্রালয়ে, দু-একটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে—গৌরী যখন আসছে মায়ের কাছে। এদিকে পূজা মণ্ডপে প্রতিমা কাদামাটি থেকে দেখতে দেখতে অপূর্ব শ্রীতে প্রকাশিত হয়ে ওঠে বাতে-বাঁকা নসী কুমোরের সেই যাদুকর্ম দেখতে দেখতে আহার-নিদ্রা ভুলে যেতে হত। অধিবাসের আগেই খালের দিকে হঠাৎ ঢাক বেজে উঠল—রসিক 'ঋষি' জানিয়ে দিত সে এসে গিয়েছে। ঢোল কাঁসি-ঢাকে এক দফা আগমনী ঘোষণা তখনি হল। অমনি মনে হল—পূজো বাড়ি। বাইরের প্রাঙ্গন লোকজনে জমাট। সন্ধ্যায় এসিটেলিন গ্যাসের আলোকে খাল পাড় পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে। ভেতরে মেয়েদের কাজের অন্ত নেই—

কথারই কি শেষ আছে? বৎসরের জমানো কথা উছলে পড়ছে। কিন্তু পূজার কাজও তো কম নয়। আয়োজনও সম্বৎসর ধরে করতে হয় কত শুদ্ধ ভাবে। প্রসাদ বণ্টনের ও নিমন্ত্রণ রন্ধনের পর্ব। রাত জেগে বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা থেকে ঝাড়াই-বাছাই কত কিছু। এ-পাড়ার ও-পাড়ার লোকজন প্রতিমা দেখতে আসে, প্রসাদ নিয়ে যায়। মুসলমান গ্রামবাসীরাও আসেন 'ঠারান' দেখতে সকলেরই আগ্রহ। নানা বাড়ির প্রতিমার তুলনাও শুনি তাদের মুখে—কোন বাড়ির প্রতিমা বড়ো। অসুরের রূপ কিরূপ। আমাদের বাড়ির প্রতিমা মাঝারি গোছের। মুখশ্রী ছিল লাবণ্যময়—নসী কুমোরের কৃতিত্ব অতুলনীয়। মুখশ্রীতে যে লাবণ্য তার তুলনা নেই। আবার প্রতিমা সত্যিই মাতৃ-মহিমায় প্রসন্নোজ্জ্বল দেখাতেন। বিজয়ার দিনে শেষ প্রহরে যখন নিঃসন্তানা 'বড়ো মা' দেবীর মুখ আঁচলে মুছিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতেন, 'মা, আবার এসো, তখন সেই গৃহকর্ত্রীর চোখের জলে ও রুদ্ধ কণ্ঠের স্পর্শে ওই দেবী প্রতিমার মুখে আবার ফুটে উঠত বাড়ির মেয়ের মুখের মতোই মমতা-ভরা ব্যথা। আমরা ছোটরা বলতাম—দেবী পিত্রালয় ছাড়তে কাঁদছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম পাড়া প্রতিবেশীরা এসে গিয়েছে। মেজ জ্যাঠামহাশয় ও বাড়ির লোকজন সকল মিলে প্রতিমা খালের ঘাটে নামিয়ে দিলেন। খুব সাবধান—অঘটন না ঘটে। বিসর্জন হল। চললেন সকলে প্রতিবেশী সুবাহিত বাড়িতে—তাঁদেরও প্রতিমা বিসর্জনে সহায়তা করতে হবে। আমরা ছোটরাও পিছনে পিছনে ছুটে যাই। প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। চললেন পাশের পাড়ার কামার বাড়ি—তাঁদের প্রতিমা বিসর্জনের পালা এবার। একে একে সকল বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন হল। সকলেই সকলের সহকারী। সব শেষে বাড়ি ফিরে দেখতাম—বাড়ি শান্ত, সব যেন নীরব; শূন্য মণ্ডপ বিষাদমগ্ন। সেখানে একটি মাত্র দীপশিখা জ্বলছে। অবশ্য বিজয়ার আলিঙ্গন-প্রণাম-আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে আর এক পর্ব উৎসব! বাঙালীর বিজয়ার তুলনা নেই—পর্ব উৎসবের তা পরম পরিণতি। দুর্গোৎসব ছাড়া বাঙালী জীবন রিক্ত হয়ে পড়বে কিনা জানি না। পূজো ছাড়াও বিজয়া শ্রীহীন হবে না। কিন্তু বিজয়া ছাড়া পূজো শ্রীহীন কেন, প্রাণহীন হয়ে যাবে। বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে বিজয়ার প্রীতি-বিনিময় করতে করতে কেমন করে অনুভব করি—আমরা শুধু একার নই, কত লোকের সঙ্গেই না আমাদের আত্মীয়তা। সন্ধ্যায় পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় শান্তিজল নিতে ডাকেন। সার বেঁধে সবাই বসি—বড়র পরে

ছোট একে একে। জল ছিটিয়ে দিতে দিতে তিনি মন্ত্র পড়েন—'সম্বৎসরান্তে পুনরাগমনায় চ'। নিজেদের কথা ভেবে আমরা বলি 'দ্বিবৎসরান্তে—'।

গ্রামের বাড়ির সব থেকে বড় আকর্ষণ 'নৌকাখণ্ড' বর্ষান্তে জলে জলময় বিক্রমপুর। এবাড়ি-ওবাড়ি যাতায়াত নৌকায়। হাট-বাজার দেখা-সাক্ষাৎ নৌকা ছাড়া গতি নেই। প্রত্যেকের ঘাটে থাকে নিজেদের ডিঙা। তা না বাইতে জানে এমন লোক নেই। আমরা প্রবাসে থাকি, তা শিখি নি। প্রচণ্ড লোভ তাই নৌকা চালনায়। যখনি সুযোগ পাই চুরি করে ঘাটের নৌকা নিয়ে পালিয়ে যাই বাড়ির পিছনেই জলে-জলময় মাঠ। সাঁপলা, জলের দাম, নানা পাতায় তা ভরতি—দূরে দেখা যায় গ্রামের সীমানা, আর দিকে গাছে ঢাকা ভিন্ন গ্রাম। দু-তিনজনায় মিলে লগি ঠেলে, বইঠা বেয়ে সে দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার কেমন ভয়-ভয়ও করে—ফিরে আসতে পারব তো ঠিক মতো ? কখনো উল্টোদিকে খাল বেয়ে গিয়ে পড়ি পদ্মায়। চরের আর পাড়ের মধ্যে পদ্মা সেখানে ঝিমন্ত—তবু সে পদ্মা। স্রোত তার বয়ে চলেছে, ক্ষিপ্র না হলেও গতি আছে স্রোতে। তাতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে বাজারের খাল দিয়ে আবার গ্রামে ঢুকব। কুমোর বাড়ির চালা ঘর পিছনে পড়ে থাকে, শীলেদের বাড়ির টিনের চালা দেখা যায় না। পালেদের বড় বড় ঘরওয়ালা বাড়ি এসে গেল—বড় বড় নৌকা বাঁধা ঘাটে। এ তো বাজার। এসে গিয়েছে কিন্তু নৌকাকে খালমুখো করতে পারি না। স্রোতের টানে তা বয়ে যায়। কেবলই বয়ে যায়। প্রাণপণে তিনজনে বৈঠা টানি। হাল জোরে আঁকড়ে মুখ ফিরোয় মূলচরের দাদা, বৈঠা চালাও, চালাও, বুঝি সামলে উঠতে পারলাম। „ নৌকা খালে ঢুকছে। ভয় কেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাহসও বেড়ে যায়। আবার, অমন করে পদ্মায় নৌকা ভাসিয়ে হাওয়া খেতেই বা বাধা কি ?

পূজার শেষে লক্ষ্মীপূজা—কখনো যেতে হয় কোনো কুটুম্ব বাড়ি—বোন, কিম্বা পিসি বা মাসী বাড়ি। অম্বিকা মাঝিকে পেলে আর কথাই নেই। বলিষ্ঠ পুরুষ। তিন প্রহরের পথ সে এক প্রহরে-দেড় প্রহরে নিয়ে যায়। নদী ছেড়ে বহরের খাল বেয়ে চলি। কিম্বা খাল-বিল-ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে ভেতরের গ্রামে। জলে ভাসা সব—দ্বীপের মতো এক-একটা পাড়া। গুটিকয় বাড়ি। এদিকে-ওদিকে সব দিকে জল, খাল। মাঝিরা ডেকে ডেকে পথ জিজ্ঞাসা করে—"এ গাঁয়ের খাল কি এটা ?" গাঁয়ের ভেতরে

ঢুকলে কখনো সন্দেহ হয়—জল কম হবে কি ওদিকটায়? "দাড়া আছে, মাঝি?" ছোট খালে দুদিক থেকে নৌকা আসছে—দুজনাই হাঁকে—"যার যার বাঁয়ে।" 'ছাউনি'র বাইরে গলুইতে বসে থাকি। দেখে দেখে শ্রান্ত হই না। কখনো পা ডুবিয়ে দিই জলে, কখনো বা হাত। নৌকা কলকল করে জল কেটে চলেছে। হাতের বা পায়ের দাগও জলের উপর একটা রেখা টেনে একটু কলস্বর তুলে দেয়—অদ্ভুত অনুভূতি সেই জলস্পর্শে। বেতবনের, ঝোপঝাড়ের পাতা ছই-এর কাছে এসে যায়, টেনে ধরি তাই, হাত ছেড়ে চলে যায়। অম্বিকা মাঝি একবার থামে—একটা ছিলিম টেনে নেবে। রৌদ্রে শ্রান্ত হয়ে আমরাও ভেতরে শুয়ে পড়ি। জেগে উঠে দেখি দূরে সোনারং পড়ে রইল। কিম্বা আউটসাহি। কখন পিছনে ফেলে চলেছি অথবা এসে গিয়েছি শ্রীনগরের খালে। নদীর থেকে দূরে খালের দেশ, বিলের দেশ—শ্যামল গাছপালার রাজ্য।

মেয়েরা কোজাগরের নাড়ু পাকাচ্ছেন—লক্ষ্মীর পূজার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কর্তারা বৈঠকখানায় কেউ গল্প করেন, কেউ পাশা খেলেন। দাদারা কেউ যান দত্তদের বাড়িতে তাস খেলতে। শেষ দিকে যখন গিয়েছি তখন প্রথম মহাযুদ্ধের গল্পে বৈঠকখানা মুখর। একজন জার্মান লেখকের বই-এর ইংরেজি অনুবাদ বাবা তখন পড়ছিলেন—তাতে নীটশে-ট্রিটস্কে-বিসমার্ক থেকে কাইজার পর্যন্ত প্রুসীয় দর্শনের ও দিগ্বিজয়ের তত্ত্ব সগর্বে বর্ণিত। তিনি পড়ছিলেন ও মাঝে মাঝে তা বলেন। কচুরিপানা তখন নতুন এসেছে নদী থেকে খালে; তার নাম দিয়েছে সাধারণ মানুষ 'জার্মান পানা'। সাধারণ মানুষের ধারণা জার্মানরা অসাধ্য সাধন করতে পারে। ইংরেজ অপরাজেয়, এ খ্যাতি আর নেই; এ বিশ্বাসও রয়ে গিয়েছে—বলে না হোক, ছলে ও কৌশলে ইংরেজ সবাইকে হারাবে। 'স্বদেশী'র পরোক্ষ ফল নিঃসন্দেহ। শুধু এই নয়, 'এম্‌ডেন' আন্দামানের বারীন ঘোষদের মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছে, খবরটা শুনে এসেছেন নয়া বাড়ির ছোটবাবু শনিবারে লৌহজঙ্গের হাটে। জল্পনা-কল্পনা চলে তারপর। খবরটায় স্থানীয় গুরুত্বও আছে। এ গ্রামের চক্রবর্তীদের দু-ছেলে মানিকতলা বোমার মামলায় ধরা পড়ে। বছর তিন জেল খেটে তাঁরা পূর্বেই মুক্তি পেয়েছেন। তখন কলকাতায় তাঁরা দাশ সাহেবের সহায়তায় কাজে নিযুক্ত। শান্ত, সৎ যুবক। বারীন ঘোষেদের সঙ্গে এ গ্রামেরও তাই একটা সম্পর্ক গ্রামবাসীরা

অনুভব করতে পারেন। সাধারণের মনে ও সম্বন্ধে মোহের অবসান হয় নি—দশ বৎসর পরেও 'স্বদেশীর' স্বপ্নের তখনও অবলম্বন বারীন ঘোষ।

সেবারই বোধ হয় পূজায় গ্রামে ফিরে প্রবাসী যুবকেরা একটা নাটক মহড়া দিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। দশজনের সাক্ষাৎ পরিচয় আর নারী-পুরুষ সকলের আনন্দলাভের এমন অবলম্বন আর কী হতে পারে? নাটকের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন (স্বর্গীয়) হেমেন্দ্রপ্রসাদ দাশগুপ্ত। আমাদের বাড়িতেও উৎসাহী লোকের অভাব ছিল না। আমাদের পর্যায়ে আমাদের নেতা হলেন যোগেশদা। আমার অপেক্ষা বিশ বৎসরের বড়। তখন তিনি বিহার-ওড়িষ্যার সরকারী ডাক্তার। বুদ্ধিমান, কৌতুকপ্রিয়, কাজেকর্মে চৌকোস। তাঁর উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু অভিনয়ে আগ্রহ ও কুশলতা রঙীনদার অপরিমেয়। তখন তিনি সম্ভবত বি-এ পড়েন। তাঁরা মহড়ায় যান—গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' অভিনয় হবে। 'তেলীর বাগে' চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়দের পৈতৃক ভবনে তার অভিনয় হল। স্কুল বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হতে হতে রাত অনেকটা হয়ে গেল। করুণাময়ের ভূমিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদকে ও দুলালের ভূমিকায় দাদাকে কিছুক্ষণ অভিনয় করতে দেখে ও বয়সে যেভাবে রসগ্রহণ করা স্বাভাবিক তাই করলাম—অর্থাৎ আসরে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন আবার চেতনা হল তখন নৌকায় বাড়ি ফিরছি—যোগেশদা সমালোচনা করছেন, দাদা কখনো মানছেন, কখনো মানছেন না।

আসলে সেই কটা দিনে গ্রামের মধ্যে নানা দিকেই চাঞ্চল্য দেখা যেত—বিদেশ থেকে সবাই এসেছেন উৎসবের হাওয়া নিয়ে, সচ্ছলতা ও সক্রিয়তা সে হাওয়ায়। কিন্তু এটাও গ্রামের সম্পূর্ণ চিত্র নয়, বারো মাসের রূপ নয়, তাও বুঝতাম। পূজার উৎসবের আনন্দে আশে-পাশে দৈন্যের ছাপ ঢাকা পড়ে না। প্রতিবেশীদেরই কারো কারো চালা জীর্ণ, বাড়ি পড়ো পড়ো—সঙ্গতির অভাব। রোগ-শোকও পায়ে পায়ে। পাড়ারই দু-এক ঘর তো প্রায় নির্বংশ হতে চলেছে। আমাদের ডাক্তারের বাড়ি। পূজোয় যখন কর্তা বাড়ি আসেন বড়ো একটা বাক্স-ভরতি নিয়ে আসেন ঔষধপত্র—এ বাক্স বিশেষ নির্দেশে তৈরি। গ্রমের অনেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে—পূজার সময়ে সকাল থেকে তাঁরা এসে বৈঠকখানার আঙ্গিনায় দাঁড়াত। দলাদলি রেশারেশিরও শেষ হয় নি। শুনেছি—এককালে ভটচাজদের একজনা

বিয়ে করেছিলেন 'ভরার মেয়ে'। বউ-এর জাত নিয়ে কথা ওঠে, ভটচাজরা কিছুদিন একঘরে হন। আমাদের বাড়ির কর্তারাও তাঁদের পক্ষ নিয়ে লাঞ্ছিত হলেন। বাড়িতে রাত্রিতে ঢিল পড়ত; খোনা নাকে কারা ভয় দেখাত, গ্রামের একজন নাকি একটা অমঙ্গলের স্বপ্নও দেখেছিলেন। কিন্তু সে সবে ফল হয় নি। অপর দলের কর্তা মারা যেতেই সব শান্ত হয়ে গেল। আমাদের কালে দেখেছি—ধোপা-নাপিতে পরস্পরে আদান-প্রদান বন্ধ—ধোপারা নাপিতের কাপড় কাচবে না, নাপিতেরা ধোপাদের কামাবে না। এ বিরোধের জের টেনে ধোপার মুরুব্বি হলেন বৈদ্যরা—ধনে-মানে তাঁদের প্রতিপত্তি। নাপিতের মুরুব্বি হলেন ব্রাহ্মণরা। তেজটা তাঁদেরও কম নয়। ধোপারা করে না ব্রাহ্মণের কাজ, নাপিতরা বৈদ্যের! তাও শুধু নয়—বৈদ্য-ব্রাহ্মণে এদিকের গ্রামে সামাজিক নিমন্ত্রণও বন্ধ। প্রবাসে যে বৈদ্যদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রায় এক পরিবারের মতো আত্মীয়তা, ওঠা-বসা, দেয়া-নেয়া, পান-ভোজন—বাড়ি এলে নৌকা গ্রামের খালে ঢুকতেই তাঁরা বলতেন—'এবার ছাড়াছাড়ি।, ছত্রিশ জাতির গ্রাম,—তারও বেশি। মুসলমানও আছেন পদস্থ—বর্ধিষ্ণু গ্রাম। স্কুল আছে, ডাকঘর আছে, বাজার আছে, শেষ দিকে বৈদ্যদেরই একজনার দানে সুন্দর হাসপাতালও হল। আর তারপরে যখন নতুন করে ব্রতী হলেন গান্ধীজীর প্রেরণায় কংগ্রেস সেবীরা—তখন ধীরেন দাশগুপ্তের বিদ্যাশ্রম সমস্ত বাঙলা দেশেই পল্লীসংগঠনের একটি আদর্শ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল—আর ঠিক তখনি সেই তন্দ্রানিমীলিত নেত্রী পদ্মা আড় ভেঙে উঠে বসলেন—দু-তিন বৎসরের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেল বিদ্গাও-বানাড়ী-তেলিরবাগ।

তবু আমার কাছে রয়ে গিয়েছে সমস্ত স্মৃতিটাই। সেই জলে-ভরা বাড়িঘরের আর্দ্র শ্যামলতা, শরৎকালের স্থলপদ্মের রক্তিমাভা, জ্যোৎস্নায় ফুটে-ওঠা আর ভোরের আলোয় লুটিয়ে-পড়া শিউলি ফুলের শুভ্র সুবাস, দাক্ষিণ্যময়ী শরৎলক্ষ্মীর দু-হাতভরা দান আর পূজার বাড়ির মানুষের সেই স্নেহসরস মুখশ্রী। গ্রামের তা সম্পূর্ণ রূপ নয়, জানি। কিন্তু পূর্ববাঙলার ভদ্রাসনের স্বরূপ কেউ চিত্রিত করে নি। জীর্ণাসন তা হয়ে পড়ে নি। এই উত্তর-পাকিস্তানী পর্বে তা রচনা করতে হলে করতে হবে রঙে-রেখায় ও স্মৃতি থেকে সত্যকে তুলতে হবে মোহমুক্ত কল্পনায়। তাশ-পাশা খেলার সঙ্গে সঙ্গে কর্তারা পূজার নাটমন্দিরে কীর্তন-কথকতার-কবিগানের জের

টেনে ও গুরুপুরোহিতের মুখে শাস্ত্র শুনেও সম্পূর্ণ আর তৃপ্ত নন। রামায়ণ মহাভারত ছাড়া বটতলার উপন্যাসেরও আকর্ষণ তাঁদের মনে রোমাঞ্চের স্পর্শ দেয়—ছেঁড়াপাতার বঙ্কিমচন্দ্রও এসে গিয়েছেন কোনো কোনো গৃহে; ভাঙা আলমারিতে রচিত হয়েছে পাঠাগার। বৈঠকখানায়, বাজারে, ডাকঘরে, কদাচিৎ স্কুলের প্রাঙ্গনে, সপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' দশজনে মিলে পাঠ করেন, স্বদেশী হুজুগে বুঝে না-বুঝে কেমন দেশের কথা জানতে হয়। আবার, শহরে পালিত ছেলেমেয়েদের চালচলনে প্রমাদ গণেন। ঢিলেঢালা নিয়মে গ্রামের দুর্বল বেয়াদবদের সাজা দেন; প্রবল দুর্বৃত্তদের নিরুপায়ভাবে সহ্য করে যান। বিবাহ শাস্ত্রাদি উপলক্ষে দলাদলির সুযোগ ছাড়ে না, ঘোঁট পাকান, একে অন্যকে অপদস্থ করেন। আবার আপদে-বিপদে একসময়ে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ান, আমোদে-আহ্লাদে একত্র হন—কর্মহীন মানুষের তাৎপর্যহীন জীবনযাত্রা উৎসবে-ব্যসনে বয়ে চলে চিরাগত মন্থরতায়। গৃহিণীরা সংসারে রাঁধার পরে খাওয়া ও খাওয়ার পরে রাঁধার ফাঁকে ফাঁকে কড়ি খেলায়, বড়ি দেওয়ায়, মোয়া বাঁধায়, ব্রত-পূজা-পার্বনে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মেলেন; আলপনা, পিঁড়িচিত্রি, কাঁথা-সেলাই, নকসা-আঁকার সহযোগিতায় ও প্রতিযোগিতায় লাগেন। নিন্দায় কুণ্ঠা না থাকলেও গুণের আদরেও কার্পণ্য থাকে না; তারপর বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের কথা শুনতে শুনতে, মিলনে-বিরোধে, জন্ম মৃত্যু বিবাহের চক্রেবাঁধা চিরদিনের গৃহধর্ম পালন করে সংসার থেকে বিদায় নেন। নগেন্দ্রনাথের দাসদাসী বহুল জমিদার বাড়ির জীবন এ নয়—'জলসাঘরের' কৃত্রিম ছটা এখানে অজ্ঞাত ও পূর্ববাঙলার ভদ্রসমাজে ঘৃণিত। নিশ্চিন্দিপুরের সর্বজয়ার সংসারের মতো দৈন্যের হীনতাও নেই পূর্ববঙ্গের ভদ্রলোকের জীবনযাত্রায়। পূর্ববঙ্গের এ-চিত্র বাহুল্যহীন কিন্তু সবল, বৈদগ্ধ্যহীন কিন্তু মানবরসে অভিসিঞ্চিত। হয়তো শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' তার একটা আংশিক চিত্র—কিন্তু 'নিষ্কৃতি' ভদ্রাসনের 'সাগা' নয়, শহুরে পাটেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

ভদ্রলোকের সেই প্রবাসের পাটের অর্থাৎ বাসাবাড়ির সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশি। গ্রামের পাটের সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় হলেও অসম্পূর্ণ। কিশোর মনের সরসতায় তা স্নিগ্ধ, কিন্তু সুপরিচিত নয়।

(ক্রমশ)

রঞ্জন রুদ্র

জর্জ ব্রাক

একটা নীল জায়গা তার ওপর সাদা আকার—ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে এক অজানা পাখি। আরও একটা ছবি দেখলাম—আরও আরও দেখলাম—কেবলই নানান ভাবে পাখিটা এসে জুড়ে বসছে জায়গা। লোকে জিগ্যেস করল, পাখিটা কেন? ব্রাক বললেন, আসতে চাইল। আপনি কি মিষ্টিক? সে আমি জানি না, উত্তর দিলেন ব্রাক। নীল আকাশে—আকাশই তো ঐ নীল জায়গা, নয় কি? ঐ পাখি উড়ে যাচ্ছে—এক মন-জোড়ানো স্বপ্ন-জাগানো শান্তিপূর্ণ বাতাস মুখে এসে লাগল। আরাম দিল—সহজ সুন্দর ছবি। শেষ বয়েসের দিকে কতকগুলো এরকম ছবি তিনি এঁকেছিলেন, যাতে পাখি উড়ে এসে বসছিল।

ব্রাক তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরেই এই সহজ সৌন্দর্যের সাধনা করে গেলেন—এবং মানুষের জীবনকে অলঙ্কৃত করলেন। ৮১ বছর বয়সে তিনি যখন একটি ছবি অসমাপ্ত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সাধকের এ মৃত্যু কিন্তু আমাদের দুঃখ জাগায় না। তার কারণ, তিনি সারা জীবন ধরে এত দিয়েছেন যে; তাতে এ সভ্য মানবসমাজে সৃষ্টির রত্নরাজি জমাই পড়েছে, সভ্যতা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁরা চির নতুন—এঁরা ৮১ বছর বয়সেও যে ছবি

আঁকেন তাতে থাকে একটা বিশেষ করে দেখার মজা, জীবন্ত অভিজ্ঞতার ছাপ। এঁদের কোনও দিনই বার্ধক্য আসে না,—এঁরা মুহূর্তের থেকে মুহূর্তে নতুন নতুন রস আবিষ্কার করেন জীবনে—এবং সেগুলো পরিবেশন করে দেন আবার সবার মাঝে, এঁদের জীবনস্পৃহা, জীবনানন্দ, অনির্বাণ। ব্রাক, তোমাকে নমস্কার জানাই। তোমার মৃত্যুর খবরে হঠাৎ যেন সমস্ত ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল, ধরে নিয়েছিলাম যে তুমি চিরকাল থাকবে।

পশ্চিম আমাদের শিল্পজগতকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। করা উচিৎ কি নয় সেটা অন্য তর্কের প্রসঙ্গ, কিন্তু করেছে যে তা অস্বীকার করার পথ নেই। কিন্তু শোচনীয় ভাবে আমরা ঢেউকে বাদ দিয়ে ফেণা পেয়েছি, মূল রসকে বাদ দিয়ে উচ্ছ্বাস পেয়েছি ; আমরা ছবি আঁকি বিদেশী ভ্রমণকারীদের মনোরঞ্জনের জন্যে, আমরা আর্ট কলেজ ছেড়ে দেড় বছরের মধ্যে মাতিস, পিকাসো, ব্রাক সকলকে ছাড়িয়ে আধুনিকতর হয়ে যাই—চমক্ লাগিয়ে প্রসিদ্ধ হবার আকুল আবেগে।

পিকাসোকে আমরা চিনি বেশী—কিন্তু ব্রাক মোটামুটি অপরিচিত বহুলোকের কাছে। তার কারণ বোধহয় যদিও কাগজগুলোতে শিল্প-সমালোচনা হয় আজকাল কিন্তু ব্রাকের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে অতি কম। কিন্তু পশ্চিমের শিল্পধারাকে জানতে হলে ব্রাককে জানতেই হবে—কারণ ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পরূপের গোড়া পত্তনে ব্রাক একজন অন্যতম ঋত্বিক।

১৮৮২ সালে পারীর কাছে একটি ছোট শহরে ব্রাক জন্মেছিলেন এক রং-করা মিস্ত্রীর বাড়িতে। রঙের নেশা বোধহয় ব্রাকের জন্মের থেকেই রক্তের মধ্যে ছিল কেননা তাঁর ঠাকুরদাদাও ঐ একই বৃত্তির লোক ছিলেন। ব্রাকের বাবা সপ্তাহান্তে অবসর সময়ে চলে যেতেন শহর ছেড়ে দূরে ছবি আঁকতে—ব্রাকের হাতে খড়ি হল সেইখানে—বাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেতেন ছবি আঁকতে। পড়াশোনায় বিশেষ ঝোঁক না দেখানোতে বাবাও কোনো জোরাজুরি করেন নি ছেলের ওপর—সতেরো বছর যখন বয়স তখন তাঁকে তিনি আপন কাজে সহচর করে নিলেন।

কিন্তু সেই বৃত্তি ব্রাকের জীবনে শুধু অল্প কয়েকদিনেরই হল, কেননা একবছর বাদেই আমরা দেখি তিনি পারীতে চলে এসেছেন—এবং মঁমাতারে একটি ছোট্ট স্বাচ্ছন্দ্যহীন ঘর নিয়ে অজস্র ছবি আঁকছেন। সেই হল শুরু তার শিল্পজীবনের—এবং মাত্র চার বছর বাদেই আমরা দেখি তিনি প্রসিদ্ধ

ও ক্ষণস্থায়ী 'ফোভ' শিল্প-আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছেন। মঁমাতারের বহিমিয়ানদের মধ্যে তিনি অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন সুগায়ক, দক্ষ নাচিয়ে ও আকরডিয়ন বাজিয়ে হিসেবে। তার ওপর সুপটু মুষ্টিযোদ্ধাও ছিলেন তিনি। "ফোভ" আন্দোলন বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পধারার ওপর বেশ একটা ছাপ রেখে গিয়েছে—নামটির যদিও মানে 'বন্য জন্তু'। সেটা ব্রাক বা তাঁর বন্ধুদের স্বনির্বাচিত নয়—তৎকালীন এক শিল্প সমালোচকের বিদ্রূপ থেকে তৈরি। মাতিস ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর কুলগুরু। তাঁরা ছবি আঁকতেন প্রায় অমিশ্রিত রঙ দুঃসাহসের সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়ে। দশটা সেই ধরনের ছবি যদি রাখা হয় একটি ঘরে রঙের ঝড়ে ভূমিকম্প হয়ে যাবে সেখানে।

কিন্তু ব্রাক সরে পড়লেন ধীরে ধীরে এই গোষ্ঠীর থেকে—কারণ এই বিস্ফোরণধর্মিতা 'ফোভ' শিল্পীদের ছবি থেকে রেখা ও আকার প্রায় উড়িয়ে দিচ্ছিল—এবং আবেগপ্রবণতা ব্রাক চরিত্রের স্বধর্ম নয়। তাই তাঁর 'ফোভ' ছবিগুলোতেও আমরা দেখি একটা লুকোনো বাঁধন। ১৯০৮ সালে সেজানের (Cezanne) ছবি দেখে যে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন তাতে আমরা বিস্মিত হই না—কারণ সেজানের সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণমূলক ছবিগুলো ব্রাকের আপন ধীর প্রকৃতির সঙ্গে মিলল। তিনি 'ফোভ' ছেড়ে দিয়ে যে ছবিগুলো আঁকতে শুরু করলেন—সেটা হল যুগান্তরকারী—তার নামকরণ হল কিউবিজম। ঐ একই সময়ে পিকাসোও একই ভাবে চিন্তা করছিলেন—এবং এক বিচিত্র অথচ অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। ছয় বছর ধরে এই দুইজন একসঙ্গে ছবি আঁকলেন ও চিন্তা করলেন—এবং এই দুই যুবকের মিলিত চিন্তা শিল্পজগতে আনল কিউবিজম্-এর বিপ্লব। সংযত, সমুন্নত, ধীর ও বিশ্লেষণকারী ব্রাকের সঙ্গে আগ্নেয়গিরি পিকাসোর যে মিল হবে এইটাই আশ্চর্য মনে হয়।

১৯১৪ সালে ইউরোপের মহাকাশ কালো করে এল মহাযুদ্ধ। ব্রাককে যেতে হল যুদ্ধক্ষেত্রে। তিনি প্রচুর বীরত্ব ও সাহস দেখালেন, কিন্তু শেষে ১৯১৫ সালে বিষম আহত হন, বহু মাস ধরে তাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়।

যুদ্ধ শেষ হলে ব্রাক ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তিনি দেখলেন, তিনি আর পিকাসোর সঙ্গে এক পথে চলতে পারছেন না। বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হল না, কিন্তু পথ ভাগ হল। ব্রাক যাত্রা শুরু করলেন একাকী আবিষ্কারের।

কিউবিজম শক্ত শক্ত কাটা কাটা কোণা কোণা রেখা ও আকার ধীরে

ধীরে বেরিয়ে যেতে লাগল তার ক্যানভাস থেকে—তার বদলে এল নতুন ছন্দ—মৃদু—উগ্রতা নেই, তীব্রতা নেই, ধাঁধাঁ নেই—আছে কোমলতা, আছে শান্তি, আছে সমন্বয়ের সঙ্গীত, আছে সহজ সুন্দরতা। ব্রাকের ছবি কাউকে আর চেঁচিয়ে ডাকত না—একটু পাশে সরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করত। কিন্তু যদি পথিক তোমার তাড়া না থাকে, যদি আরেকবার দেখার কৌতূহল জাগ্রত হয়ে থাকে, তবে শুনতে পাবে মৃদুস্বরে কি যেন বলছে সেই ছবি—কে যেন তোমার গায়ে মুখে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল—কে যেন ডেকে নিয়ে গেল এই ব্যস্ত উগ্র চঞ্চল কোলাহলপূর্ণ জগৎ থেকে অন্য এক জগতে। হঠাৎ দেখলে একটা কালো, পিঙ্গল আর বাদামী—তিনে মিলে ধরেছে তান,—এক অপরূপ আমেজ। ছবিটা কিসের? ভালো করে দেখ, ও। দুটো মাছ! এ তো অতি সাধারণ জিনিস—পরী নয়, স্বর্গোদ্যান নয়, ফোয়ারা নয়, শুধু দুটো মাছ একটা প্লেটে একটা টেবিলের ওপর। কিন্তু এ কি জাদু? এ কি সৌন্দর্য? এ কি নবদৃষ্টি—কই, এর আগে তো মনে হয় নি দুটো মাছ একটা প্লেটে একটা টেবিলের ওপর এত সুন্দর দেখতে হয়? শুধু মাছ নয়—ফলমূল গেলাস বাটি হাতা চামচ খবরের কাগজ—এই নিয়ে ছবি এঁকে চললেন। আরও আঁকলেন—নগ্নদেহী নারী, সমুদ্রের বুকে নৌকো, মাঠ গাছপালা। এঁকেই চললেন। ৮১ বছর হয়ে গেল। আঁকতে আঁকতেই একদিন তিনি ব্রাশটি রেখে বিশ্রাম নিলেন। একটি ফোয়ারা বন্ধ হয়ে গেল। একটি বাঁশী আর বাজল না। কিন্তু মৃত্যুর আগে ব্রাক তুমি যদি ফিরে তাকিয়ে থাক, তবে এই স্বস্তি নিশ্চয়ই পেয়েছ দেখে যে তোমার ৬৩ বছরের অফুরন্ত কাজ মানুষের সৌন্দর্যবোধকে একটা উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

১৯৩০-এ পিকাসো আর মাতিসের কাছাকাছি ব্রাক আরেকবার এসেছিলেন তাঁর ছবিতে। পর পর পাঁচ বছর তিনি যে ছবি আঁকেন প্রায় সকলেরই মনে হয় যে সেগুলোই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, যেন তাঁর জমা সব অভিজ্ঞতা সব সঞ্চয় তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর এই ছবিগুলোতে—সেই পাঁচ বছরকে অনেকে বলেন ব্রাকের জীবনের 'স্বর্ণ সময়'।

পৃথিবীতে এত ভয়, এত দ্বন্দ্ব, সংবাদপত্রগুলো তো তাই নিয়েই থাকবে। ভারতবর্ষ? দারিদ্র্যের ছবি যেন হিটলারের কন্সেনট্রেশন ক্যাম্প। এত দুঃখ, এত অনটন, এত সমস্যার মাঝে থেকে কোথায় দূরদেশে কোন এক শিল্পী

ছবি এঁকে গেলেন, তারপর মরে গেলেন, সেটার খবর কি রাখবার আমাদের সময় আছে? অন্ধকার যখন সামনে ও চারিদিকে, নিরাশায় ভেঙে পড়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যখন দেখি সবকিছু সত্ত্বেও ফোয়ারার মতো, উদ্ভিদের মতো, প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বগামী তখন আশা আসে। শিল্পীর সৌন্দর্যসাধনা এই প্রাণশক্তির পরিচয় এবং ব্রাকের মতন একজন শিল্পী যে জন্মেছিলেন তাতেই আমরা জীবনের জয়ের নিশানা দেখি। যতদিন মানুষ সৃষ্টির পথিক ততদিনই তার আশা।

শুধু ছবির নানান সমস্যা নিয়েই ব্রাক সারাজীবন ব্যস্ত ছিলেন না। সামাজিক সমস্যাও তাঁর ছবিতে বর্ণিত হবার সুযোগ পায় নি। তিনি কেবল সৌন্দর্য পরিবেশন করে গিয়েছেন। মাতিস একবার বলেছিলেন: আমাকে একদলা কাদা দাও, আমি সেটা সোনা করে তোমাকে ফেরত দেব। ব্রাকও আমাদের সেই দেখালেন। দুটো মূলো, একটা ভাঙা লণ্ঠন বা একজোড়া মাছের মধ্যে যে কত আলো, ছন্দ, রূপ, কথা লুকোনো ছিল সেটা তিনি দেখালেন। মাতিস আরেকবার বলেছিলেন: আমার ছবি আরাম কেদারায় হেলিয়ে পড়ার আনন্দের মতো সুখ তোমাকে দেবে। তাই আমি চাই আর কিছু নয়। ব্রাক কথায় সেরকম কিছু বলেছেন কিনা জানি না, তবে তাঁর ছবির সঙ্গে যে নিরিবিলি ঘর করতে ইচ্ছে হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ব্রাকের দুটো উক্তি তুলে দিয়ে আমার এই আলোচনাটুকু শেষ করব। এক "A picture is an adventure each time. When I tackle the white canvas, I never know how it will come out. This is the risk you must take. I never visualize a picture in my mind before starting to paint." অন্যটি, "When a picture leaves my house, it is for always. When I see one in a collection, I sometimes even have the impression it is not by me."

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

মামার বাড়িতেই নন্দিনী মানুষ হয়েছিল। মামাদের নিজেরই ছয় মেয়ে। ছয় মেয়ে নিয়ে বিব্রত মামার সংসারে নন্দিনী কোনোদিন আলাদা অযত্ন কিছু পায় নি। সকলেই যেখানে হেলায় ঘেন্নায় অভাবে অনটনে মানুষ হয় সেখানে আর আলাদা অযত্ন করার কী আছে। তা ছাড়া মামারা ঠিক সেরকম অবিবেচক ছিলেন না। দাদামশাইয়ের শিক্ষা রক্তে কিছু ছিলই। তবে অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছিল সে রক্ত। যাই হোক আলাদা করে অযত্ন কিছু না হলেও একটা জায়গায় একটু তফাৎ হয়ে গেল। বয়সের হিসেবে নন্দিনী ছিল মামার বড় দুই মেয়ের পরেই। বড় দুজনার বিয়ে হয়ে যাবার পরে নন্দিনী দেখল মামা-মামিমা তাঁদের তৃতীয় ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চমের জন্য ভাবছেন। নন্দিনীর জন্য ভাবছেন না। নন্দিনী লেখাপড়া শিখুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক—এই পরামর্শই নন্দিনীকে সবাই দিয়েছে। মাঝে মাঝে দিদিরা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরলে নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে আদর করত—এখনো কী সুন্দর আছিস তুই। বেশ আছিস ঝাড়া হাত-পা। এই ত্যাখ না আবার হবে, কলেজে ম্যালথাস পড়ালে কী হবে, তোর জামাইবাবু—নন্দিনী শুনত, প্রথম প্রথম শিউরে উঠত, পরে সয়ে গেলে, অপমানিত হত। বি. এ. পাশ করে নন্দিনী যখন এই চাকরিটা জুটিয়ে নিল তখন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মামা-মামিমা খুশি হলেন। মামিমার পরামর্শে আন্তরিকতা ছিল। তিনি বললেন নন্দা, টাকা খরচ করে ফেলিস নে, জমাতে শেখ, টাকা জমিয়ে বিয়ে কর। মামা বললেন—কোনোদিন তো কিছু ভালোমন্দ খাওয়াতে পরাতে পারি নি মা, তুই সুখে থাক তোর টাকা নিয়ে।

নন্দিনী বলল—আমি দুই-ই করার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু একটু নিজের শখ সৌখীনতা মেটাতে লাগলাম, আর দুটো-পাঁচটা টাকাও জমিয়ে

ফেললাম। চাকুরী-জীবন, বলতে কী, আমার ভালো লাগে নি। একদিনের জন্যেও না। এমন সময়ে আমাদের অফিসে একদিন প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা হল। হঠাৎ নামটা বলেই একটু বিব্রত হল নন্দিনী। থেমে থেমে তারপর বলে চলল—ওর সঙ্গেই আমি পড়তাম। কলেজে আলাপ ছিল মাত্র। আমাদের ক্লাশের অন্য ছেলে মেয়ের তুলনায় আমরা একটু অন্য ধরনের ছিলাম। আমার সকালবেলায় মাস্টারি। ওর সকাল সন্ধ্যেয় ট্যুইশনি। দেখা হলে ত্নটো একটা কথা হত মাত্র। আর সে দেখাটাও হত প্রিন্সিপ্যালের ঘরের সামনে ফাইন মকুব করানোর পিটিশন হাতে। কখনো যে মাসের মাইনে সে মাসে দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এই অফিসে ও আসত কনট্র্যাক্ট ধরতে। ও সরকারি অফিসে কাজ জোটালেও অবসর সময়ে ছোট, মাঝারি ঠিকে ধরার চেষ্টা করত। এক আধবার দেখা হয়েছে ; হেসে বসে খানিকক্ষণ কথা হয়েছে। একদিন টিফিন আওয়ারের পরে দেখি লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খুব ক্লান্ত, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। ও কিন্তু একেবারেই সাধারণের মতো নয়। অনেকদিন দেখেছি বাজে ব্যাপারে ও কখনো আটকে থাকে না। ও সব সময় যেন দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লাশেও দেখতাম, অফিসেও দেখেছি সবাই যে ধরনের ব্যাপার নিয়ে গল্প করে বা অহঙ্কার করে ও সে সব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতো না। ওভাবে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, এগিয়ে গিয়ে যখন শুনলাম ও আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে তখন একটু অবাক হয়ে গেলাম। বলল বিকেলে দেখা করতে। আমি বললাম না কিছু। ভাবলাম এও বোধ হয় সিনেমা দেখানোর কথা বলবে, কিম্বা কোথাও খাওয়ার কথা। জানেন, আমি অনেক দেখেছি। দেখে দেখে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে সব। প্রথম দৃশ্যটা দেখেই শেষ দৃশ্যটা ভেবে নিতে পারি। তাই ও যখন এরকম দেখা করতে বলল একটু দুঃখ পেলাম। ছুটির পরে দেখা করলাম ওর সঙ্গে। শুকনো মুখে ডালহৌসির ব্যস্ত সমস্ত সবাই তখন বাড়ি ছুটছে। ভারি ভালো লাগল ও আমাকে সিনেমাতে নিয়ে যেতে চাইল না দেখে। এমন কি কিছু খাওয়াতেও চাইল না। একটা বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে ওর কথা ও আমাকে বলল। একটা টেণ্ডার দিয়েছিল ও আমাদের অফিসে। আমাদের সেকশনের মিঃ কাকারিয়া এর কর্তা। কেঁচে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা কাকারিয়া সাধারণত ন্যায় পথে চলে। বে-আইনি কাজ করার কোনো মানে না থাকলে সে করে না। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল আমি

আমার ইনফ্লুয়েন্স খানিকটা খাটাতে পারি কি না। অনেক টাকার কাজ। ও প্রায় খোসামোদ করল। বলল না হলে ডুবে যাবে ও। আমার কেমন মায়া হল। আর আবার মনে হল ও অন্যদের মতো নয়। ওকে আর কিছু বললাম না, শুধু বললাম, দেখি। নন্দিনী চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগল। বোধ হয় সে ভাবছিল বাসের পর বাস চলে যাচ্ছে। ক্ষিধেয় ঘামে, মানসিক তোলপাড়ে ক্লান্ত সেই সন্ধ্যেটার কথা।—হাঁটতে হাঁটতে থামতে থামতে কখন রাজভবনকে পাশে রেখে ওরা ময়দানের মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল। দূরে কল্লোলিত ট্র্যাফিক—চৌরঙ্গীর সান্ধ্য লোভানি। আর ময়দানের হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্ন দেখার যোগাড়।

—ওর খুব খিদে পেয়েছিল। ফুচকা খেতে খেতে ও আমাকে সব স্লুক সন্ধান বলে দিল। কাকারিয়া কোথায় থাকে, কী ভাবে তাকে ধরতে হবে। মুস্কিল হয়েছে লোকটা টাকা নেয় না। সব শুনলাম চুপ করে। সত্যি বলছি আপনাকে, ভীষণ মায়া লাগছিল। ও যে অন্যদের মতো নয়, অন্য কোনো মতলব নিয়ে আমার কাছে আসে নি এটা মনে করে খুব ভালোও লাগছিল। চেষ্টা-চরিত্র করে কাকারিয়াকে ধরলাম। সেদিন কাকারিয়া খুব ভালো ব্যবহার করল। হেসে জিজ্ঞাসা করল পার্টি তোমার কে হয়?—চুপ করে রইলাম। কাজটা করে দিল। দিয়ে বলল—মিস তুমি এটা অন্যায় সুযোগ নিলে কিন্তু। এদিকে ও খুব খুশি হল। কিন্তু আমি খুব খুশি হলাম এই দেখে যে ও আমাকে এভাবে ওভাবে সেভাবে খুশি করার চেষ্টা করল না। মাস চারেক বাদে আবার দরকার পড়ল। আবার কাকারিয়ার সঙ্গে একা দেখা করলাম। কাকারিয়া করে দিল কাজটা। হাসল, আর আবারও বলল যে তুমি ভয়ানক আনডিউ এ্যাডভ্যাণ্টেজ নাও। আমি একে কিছু বলতাম না। কেননা ও কখনো জিজ্ঞাসা করত না কাকারিয়া কী বলল, কী কথা হল, কী করে করলাম। তৃতীয়বারে—

মুখখানা শাদা হয়ে গেছে নন্দিনীর। সে বোবা পাথর হয়ে গেল যেন। সুব্রত বলল, তুমি তৃতীয়বারেও অন্তত প্রিয়ব্রতকে বললে না কেন সব?

—সেদিন বলব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সেদিনই ও আমার সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়ল। আমি ভয়ে লোভে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। সবই লুকিয়ে গেলাম, তৃতীয় বারে কাকারিয়াও যে কিছু অন্যায় সুযোগ নিয়েছে

সেকথা ভাঙলাম না। ভাবলাম বিয়ে হয়ে যাক, তখন ঠিক হয়ে যাবে সব। আমিও অন্যায় স্থযোগ নিলাম।

—বিয়ের পরে বললে না কেন ?

ঘরের আলোকে পিছন করে, মুখে একরাশ অন্ধকার মেখে নন্দিনী বলল—যতবার বলতে গেছি, কথাটা তুলতে গেছি, ও এড়িয়ে গেছে। আরো একবার যেতে হয়েছে কাকারিয়ার কাছে। আমার ভালো লাগছে না, ওকে যদি বলি, যদি বলি চাকরি ছেড়ে দেব ও মাথায় হাত দিয়ে বসে। ও কিসের পেছনে ছুটছে কে জানে! এ কারণেই আমি কলকাতায় যেতে চাচ্ছি না। ও কি জানে না কাকারিয়ার কাছে কেন আমি এত প্রশ্রয় পাই—জানে। ভালো করেই জানে। সেটাকে কখনো সে মুখোমুখি স্বীকার করবে না, এই যা। কিন্তু আমি পারছি না আর। একবার যা হয়ে গেছে সেটা পাপ বলে অনুশোচনা করতে পারি সারাজীবন। কিন্তু সেটাকে জীবনের একটা অঙ্গ করে নিতে পারি না। প্রিয়ব্রত জানে না, ও শুনতে চায় না যে আমার মা উনিশশো আটাশ সালে সারা গ্রামে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র দেখতে পায় নি, বলেছিল, ভালো ছেলেরা সব তো জেলখানায়। আমার মা আর আমি এত দূর হয়ে গেলাম কী করে। বলতে বলতে নন্দিনী আলোর দিকে মুখ ফেরাল। উত্তেজনায় লাল। চকচকে চোখ। জানেন আমার মা…কথা হারিয়ে গেল হঠাৎ যেন হতাশা নেমে এল।

স্থব্রত বলল—উনিশশো আটাশ আর উনিশশো পঞ্চাশে অনেক তফাত নন্দিনী।

—কেন জানি না সব যেন কেমন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি আমাকে কী করতে বলছ ? প্রিয়ব্রতকে কিছু বলতে বলছ কি ?

—না, না, সেটা ঠিক হবে না। আমি শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আমাকে কী করতে বলেন ?

—প্রিয়ব্রতকেই সব খুলে বল। স্থব্রত নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। কোথাও যেন কোনো সিদ্ধান্ত নেই। কেন নন্দিনী স্পষ্ট একটা কর্তব্য স্থির করতে পারে না। সিঁড়ির নিচে ওর ঘরের রোয়াকে বসে থাকল স্থব্রত। প্রিয়ব্রত বাড়ি ফিরল শেষ ট্রেনে। নিষ্ঠুরভাবে সিগারেটটাকে ঠোঁটের কোণে কামড়ে ধরে প্রিয়ব্রত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। স্থব্রতর সঙ্গে কথা বলার জন্য তার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা আছে বলে মনে হল না। সিঁড়ির মুখে

দাঁড়িয়ে ছিল নন্দিনী। চুল না-বাঁধা এলোমেলো শাড়ি পরা শিথিল নন্দিনীকে দেখে প্রিয়ব্রত থমকে গেল।

—তুমি আজ অফিসে যাও নি ?

—না।

—না মানে, তুমি তাহলে ওর সঙ্গে দেখা কর নি ?

—না।

—নন্দিন—রক্তকরবীর রাজার'মতো নন্দিনীকে আদর করে নন্দিন বলত প্রিয়ব্রত।

—তুমি পাগলামো করছ।

নন্দিনীর হাত ধরে প্রিয়ব্রত ওকে ঘরে নিয়ে গেল। খাটের একপাশে বসিয়ে দিয়ে পাখাটা পুরোদমে চালিয়ে দিল। নন্দিনী ঘাম-ভেজা মুখখানা নিচু করে বসে রইল। চিবুকের নিচেয় হাত দিয়ে ওর মুখখানাকে নিজের মুখের দিকে তুলে নিয়ে প্রিয়ব্রত বলল—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হবে না ?

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দিনী বলল—আমি চাকরি ছেড়ে দিতে চাই।

আচমকা চিবুকটা ছেড়ে দিয়ে প্রিয়বত বলল—সে হয় না। ধাক্কা দিয়ে প্রিয়ব্রতকে সরিয়ে দিয়ে নন্দিনী ঘর থেকে উঠে গেল। নন্দিনীর পিছন পিছন আঁচলটা মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত জুতো দিয়ে সেটা চেপে ধরতে পারত। কিন্তু কী ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকল। নিঃশব্দে বাতাস কেটে কেটে পাখাটা ঘুরতে লাগল। প্রিয়ব্রত সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে আবার পাখার তলাতেই এসে দাঁড়াল। কলতলা থেকে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নন্দিনী ফিরে এল ঘরে। প্রিয়ব্রত গেঞ্জি আর পাজামা পরে ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

—তুমি কলকাতা যাবে না। নন্দিনী স্থির কণ্ঠে বলল।

—বেশ না গেলাম, তার সঙ্গে কাকারিয়ার সঙ্গে কথা না বলার কী আছে।

—কলকাতা না গেলে এতেই আমাদের বেশ চলে যাবে। বেশিতে আমাদের দরকার নেই।

—আমাদের বলতে তুমি কী বলছ ?

—আমাদের সকলের কথা বলছি। আমার তোমার, দাদার, মায়ের।

—ন্যাকামি রাখ। আমি শুধু আমার কথাই ভাবছি, ভাবব। আর কিচ্ছু নয়।

—মা ?

—মা দাদার কাছে থাকবে। দাদাকে সংসারের ভার কিছু নিতে হবে না ? হি ইজ এ শার্কার। চিরদিন দেখে আসছি, শার্কার। আমি আর এসব বরদাস্ত করব না।

—যাই হোক কাকারিয়ার কাছে আমি আর যাব না।

—কী করবে সে তোমার ? খেয়ে ফেলবে ?

—কিচ্ছু যদি সে নাও করে তাহলেও না, কোনো অন্যায়ের মধ্যে আমি নেই।

—এ সমস্ত বড় বড় কথার বদভ্যাস তো তোমার ছিল না নন্দিন।

—তুমি জানো না আমার মা···

—একশো তেরো বার হল এই নিয়ে। কিন্তু ভুলে যাও কেন সেটা উনিশশো আটাশ সাল, এটা উনিশশো পঞ্চাশ। তুমি যদি জানতে কিছু, বুঝতে আটাশ সালের মডেল লোকেরা আটাশ সালেই ফেলে দিয়েছে।

বাইরে থেকে হু হু করে একরাশ হাওয়া ঢুকল ঘরে। ফ্যানের হাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে মৃদু গর্জন উঠল ঘরে। শিথিল ক্লান্ত নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বোধ হয় মায়া হল প্রিয়ব্রতর। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল ও। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে দুহাতে নন্দিনীকে তুলে বিছানায় নিয়ে গেল প্রিয়ব্রত। নন্দিনীর ইচ্ছে করছিল তুমুল বাধা দেয়। কিন্তু প্রিয়ব্রত তাকে সম্পূর্ণ শিথিল করে বিচিত্রভাবে আদর করতে লাগল। নন্দিনী বাধা দিল না। শতকরা সত্তর ভাগ আদরের সঙ্গে তিরিশ ভাগ অনুযোগ মিশিয়ে প্রিয়ব্রত নন্দিনীকে ওর নিজের কথা বোঝাতে লাগল।

সুব্রত নিজের ঘর থেকে বুঝতে পারল ওরা ঘুমুতে গেছে। উঠোনের চৌকো আলোর দাগ মুছে গেল। নন্দিনী নিজে যা করবার করুক। সুব্রত কী করে প্রিয়ব্রতকে বলবে কোনো কথা। অনেকদিন আগে সুব্রত একবার প্রিয়ব্রতকে একটা কোন্ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়েছিল। প্রিয়ব্রত শোনে নি। উল্টে সুব্রতকে বলেছিল সংসারের একটা ব্যাপারেও সুব্রতর বলার কিছু থাকা উচিত নয়। মিন্স্ অফ প্রোডাকশনটা এ সংসারের যখন আমার হাতে তখন ক্ষমতাটাও আমিই প্রয়োগ করি। এই কথা বলে পাড়ার কমলাক্ষদার উদাহরণ দিয়েছিল প্রিয়ব্রত। কমলাক্ষদা সকালে ট্যুইশনি করে। নটা-চল্লিশের গাড়ি ধরে। অফিস আওয়ারেই ফাঁকে ফাঁকে

লাইফ ইনসিওরের শীকার ধরে। বিকেলে এখানকার অর্ডার সাপ্লাইয়ের জন্য সওদা করে। রাত্রি সাড়ে নটায় যখন ফেরে দু কাঁধে ব্যাগ। হাতে বোঝা। কুলিকে সামলাতে সামলাতে সোজা হয়ে রাস্তা চলছে—তখন তাকে রিয়েলি একটা হিরো বলে মনে হয়। বোনের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ভাইপোকে মেডিকেলে পড়ায়। সমস্ত বাড়ির লোকেরা রাত সাড়ে নটায় দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছোটগুলো পর্যন্ত তাকে না দেখে ঘুমোতে যায় না। একটা পুরোদস্তুর মানুষ। দারুণ ভীড়েও শেষ শান্তিপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসবে—কোনো কমপ্লেন নেই। আর তোমরা—তোমরা শার্কার?

ল্যাস্‌কির বইখানা টেনে নিল সুব্রত। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসি। লিবারেল রাজনীতি। কোথায়? হিঁদু মুসলমান। নায়ার পারিয়া, ভুঁইহার ছত্রি—সার্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ। কী হবে রাইট্‌ টু ক্রিটিসিজম্‌-এ। রাইট টু চেঞ্জ—শাসকশ্রেণী তাহলেই কি শমন দেখবেন না। রাইট টু চেঞ্জ ছাড়া রাইট টু ক্রিটিসিজম-এর মানে কী? দেখতে দেখতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল সুব্রতর।

একা এ বাড়িতে জেগে রইলেন সুব্রতর মা। হাঁপানির টান ঘুম আসে না। মনে আসে যত পুরনো কথা। কখনো সুব্রতর কথা, কখনো প্রিয়ব্রতর কথা। কখনো ওদের বাবার কথা। যে লোকটা ভালো করে বাঁচতে জানতেন। কিন্তু হিসেব করে বাঁচতে জানতেন না। শেষ রাতে হাঁপানির টান বাড়বে। কাসির বেগ বাড়বে। তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি চেষ্টা করবেন ইষ্টনাম জপ করতে। যন্ত্রণা তাকে ভালো করে তা করতে দেবে না। কিন্তু তিনি ছাড়বেন না।

সেই গঙ্গার ঘাটের শেষ পৈঠের ওপরে রুচি বসে ছিল।

শান্তনু আর সুব্রত যখন গিয়ে পৌঁছল তখন বিকেল। জলের কাছে পা রেখে রুচি বসেছিল চুপ করে। পিঠের ওপর বিনুনীটা বেঁকে রয়েছে। ঘাড়ের উদ্ধত ভঙ্গিতে কমনীয়তা। লালে কালোয় মেশা সরু পাড়ের শাড়ির আঁচলটা সরু কোমরে জড়ানো। শেষ রোদে দু হাতের বালা দুটো চিক চিক করছে। শান্তনু চেঁচিয়ে ডাকল—রুচি। ঘাড় ফিরিয়ে রুচি হাসল। রুচি হাসতে সুব্রতরও খুব ভালো লাগল। এক সঙ্গে দু-তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ও

নেমে গেল। শান্তনু আস্তে আস্তে সবকটা সিঁড়ি পেরিয়ে নামল। রুচি শান্তনুর দিকে ভালো করে তাকিয়ে হাসিটা নিবিয়ে ফেলল—

—কী হয়েছে তোমার বলো তো। বাবা বলেন স্কুলেও না কি খুব মনমরা থাক;

—প্রেমে পড়িনি। সুতরাং দিদিমণি ভয় নেই।

—হ্যাঁ দেখো দেবদাস হয়ো না যেন।

—পার্বতী জুটলে তবে তো দেবদাস। আমরা বড় জোর হুতাশ হালদার, সিগারেট খেয়ে বুকে ব্যথা। এর বেশি কিছু হবে না। না হাসলেও কিছু হত না এমন একটু হাসল শান্তনু।

দক্ষিণে গঙ্গার বাঁক। উত্তরে জুবিলি ব্রিজ। রুচি যেন সুব্রতর সঙ্গে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। তাই দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ইতস্তত। আর সূর্য থেকে রঙ ছেঁকে নিয়ে রুচি যেন একটু অবাস্তব হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে রুচিকে ভয়ানক হৃদয়হীন বলে মনে হল সুব্রতর। ভালো করেও শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারল না কেন কী হয়েছে তোমার? নদীর জল কুল কুল করে সেদিনের মতো কথা কইছে।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—ডেকেছিলে?

সহজ হয়ে রুচি বলল—দুটো ছেলে এসেছিল।

—কী বলে তারা?

—রমেনদার শোক সভা করবে। আমাকে সভায় থাকতে বলছে, বলছে কিছু বলতে হবে।

—কারা এরা?

—কি জানি। বলছে পার্টির নেতারা আজ লাইন বদলে তাকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু লড়াকু জনতা ভুলবে না।

—ভাষা শুনে তো মনে হচ্ছে বাইরের ছেলে নয়। তারপর?

—তারপরেই মানবদার চিঠি নিয়ে একজন এল। চিঠিতে লেখা—এ জাতীয় কোনো মিটিঙে যেন যোগ না দিই।

—আচ্ছা আমি খোঁজ নিচ্ছি।

শান্তনু চুপ করে বসেছিল। অন্যমনস্ক। পশ্চিমের মেঘ যেন বিরাট বিস্ফোরণের অবশেষ। কাল রাত্রে হিরোশিমার উপরে লেখা একখানি বই পড়ছিল। মনে পড়ল। পরমাণুকে বিদীর্ণ করে মানুষ আলো জ্বালাল না—

আরো আঁধার ডেকে এনেছে। মানুষই নিয়ামক সব কিছুর। সে যদি আদি বিশ্বাস, আদিম যন্ত্রপাতি নিয়ে চলেছে তাহলেও তার বিচার হয়েছে তার অন্তরের মাপকাঠিতে। আর আধুনিকতম সভ্যতার বাণী যখন সে উচ্চারণ করে, আধুনিকতম বিজ্ঞানের জয়কীর্তির উপরে দাঁড়িয়ে তখনও তার বিচার হবে তার অন্তরেরই আলোকে। শান্তনু বলল—

—যদি কেউ রমেনের জন্য শহিদ-স্মরণ সভা করতে চায় করুক না। রমেন যে মরেছে এবং তার মরার ভেতরে যে আন্তরিকতা ছিল এ কথায় তো সন্দেহ করার কিছু নেই।

—হায় শান্তনু—একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুব্রত—অত সহজেই যদি সব কিছুর মীমাংসা হত।

—একটা এক্সটেণ্ডেড জি. বি. মিটিং ডাকছে ওরা, কথাটা জিজ্ঞাসা কোরো তো।

—যদি আমায় ডাকে, তবেই।

শান্তনু জলের দিকে তাকিয়ে বলল, কোনো বড়সড় জমায়েতে যেতে ভয় করে। কতজনকে যে দেখব না কে জানে। কতজন নেই, কতজন থেকেও আসবে না। মনীশ নাইনথ মার্চের পরের দিন সকালেই চাকরি থেকে সাসপেণ্ডেড হয়েছে। বৌ ছেলেমেয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এখন পথে বসার অবস্থা। শিবেন্দু অণ্ডাল ইয়ার্ডে গুণ্ডাদের হাতে মারাই গেল। অথচ—

—অথচ? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল। রুচি গম্ভীর হয়ে যেন তারা গুণছে।

—অথচ তুমি জিজ্ঞাসা করো নাইনথ মার্চের ডিসিশন কে নিয়েছিল, তুমি তার কোনো সদুত্তর পাবে না। যে কোনো ব্রাঞ্চ ইউনিয়নই বলবে আমরা জানিয়েছিলাম যে আমরা প্রস্তুত নই। দু-একজন বললে—ডাক এসেছে। চাকা বন্ধ। নেতৃত্ব বললে, তাই। এ. বি. রেল বি. এ. রেলের ডাকসাইটে ইউনিয়ন খান খান হয়ে গেল। আমার সবচেয়ে রাগ হয় কাদের ওপর জানো সুব্রত, যারা কথা বলে নি।

সুব্রত জানে সবই। তবু চুপ করে রইল। শান্তনু কথা বলুক। সকলকেই জুড়োতে হবে। কথা না বললে জুড়োবে কী করে শান্তনু।

শান্তনু বলে চলল—কেন কথা বলে নি তারা জানো, পাছে কম বিপ্লবী হয়ে যায় তারা, পাছে তারা অ-বিপ্লবী প্রতিপন্ন হয়ে যায়। কত সামান্যের লোভে আমরা সত্যের মুখ চাপা দিই। তত্ত্বজ্ঞানকে চাবি দিয়ে রাখি। কত

জ্ঞান, কত বোধ, কিন্তু মানুষেরই হাতে সে সবের কত বিকার। আমি বলে রাখছি শোনো—এই কদিনের মধ্যে আমরা শুনব রমেনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। জনতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল সে। ঐ মানবই বক্তৃতা করবে পার্টি সেলে।

সুব্রতর মনে পড়ল টুর্গেনিভের ভার্জিন সয়েল বইখানির কথা। টু টার্ন ওভার এ ভার্জিন সয়েল, ইট ইজ নেসেসারি টু ইউজ এ ডিপ প্লাউ গোয়িং ওয়েল ইনটু দি আর্থ, নট এ সারফেস প্লাউ গ্লাইডিং লাইটলি ওভার দি টপ। আমরা যেন বড় বেশি ফেনায় ফেনায় ঘুরে বেড়াই। এরি মধ্যে সুব্রত শুনতে পেল শান্তনু বলছে—আমি চলে যাবো এখান থেকে।

মৃদু স্বরে রুচি জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় ?

—দূরে, কোনো গ্রামে মাস্টারি নিয়ে।

—পরীক্ষা দেবে না ? সুব্রতও জিজ্ঞাসা করল।

—দিলেও সেখান থেকে দোব।

—পাগলামি করো না শান্তদা, সবাই সহ্য করছে আর তোমার…

ক্রোধে অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করল শান্তনুর। তার বদলে ও এমন ভাবে বলল—রুচি, যে, রুচি সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। শান্তনু যেন এই একটা আহ্বানে কিছু বোঝাতে চাইল। তারপরে জিজ্ঞাসা করল সে—কাজলবাবু কে রুচি ? সুব্রত চমকে গেল, হলেই বা আত্মীয়, শান্তনুর অভদ্র হবার কোনো অধিকার নেই। আর আচম্বিত আক্রমণে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায় রুচিও সেইরকম স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার পরেই সুব্রত দেখতে পেল রুচির মুখখানা নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে। বলল—কাজলবাবু অর্থনীতিতে এম. এ., ওঁর অধ্যাপনাটা সখ, বাবার কোলিয়ারি আছে। আমার মায়ের ও বাবার ওঁকে খুব ভালো লাগে। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সে। বিমূঢ়ের মতো শান্তনু বলল—আমার তাতে কী ?

—তোমার তাতে কিছু হবে কেন ? কিছু হলেও শুনছে কে ?

রুচি উঠে দাঁড়াল। নদীর দিকে পিছু ফিরে বলল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, যাই। বলে ও উঠে চলে গেল। চুপ করে এমন ভাবে শান্তনু বসেছিল যে সুব্রত ওকে কিছু বলতে পারল না। শান্তনু যেন অপরাধী। সন্ধ্যাটা যেন ওরই হাতে নিহত হল। ঘাটের ওইদিকের এক কোণে কতকগুলো ছেলে জুয়ো খেলে। তাদের উঁচু গলার ঝগড়া শোনা যাচ্ছে। ঢেউ

তুলে স্টীমার গেল। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে দুটো ছেলে-মেয়ে নিঃশেষিত হয়ে বাড়ি গেল। দূরের কুলিলাইনে ঢোল বাজছে, গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওপারে, চুঁচড়োয় কারা মাইকে গান বাজাচ্ছে। এপারে সেই গানের ধুয়ো ধরছে কটি স্কুলের ছেলে। সুব্রত ও শান্তনু বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর শান্তনু বলল—যাই আজ। সুব্রত শান্তনুকে বাধা দিল না। সুব্রত ভাবল ও বোধ হয় রুচিদের বাড়ির দিকেই যাবে। কিন্তু শান্তনু অন্যদিকের রাস্তা ধরল দেখে সুব্রত মুখ ফিরিয়ে নিল। আরো অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে সুব্রত শেষে ঠিক করল রুচির সঙ্গে একবার দেখা করেই যাওয়া যাক।

প্রকাশবাবু বাড়ি ছিলেন না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ছিল, সেখানেই গেছেন। রুচির মা এইরকম অসময়ে সুব্রতকে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলেন। রুচি রান্নাঘরে। সুব্রত এসেছে শুনে ছুটে এল। 'আপনি ?'

সুব্রত বলল—তুমি খুব রাগ করেছ ? স্নিগ্ধ বেলফুলের মতো একরাশ হাসি ছড়িয়ে দিল রুচি।

—শান্তদার কথায় রাগ করতে হলে এতদিন কেঁদেই যেতাম গলে। ও ছোটবেলা থেকেই ওইরকম।

—ওরও মেজাজ খুবই বিগড়েছে। গুম হয়ে চলে গেল।

—চা খাবেন।

—খুব চালাক মেয়ে হয়েছ তো ?

—কেন ?

—তোমার কথার মানে হল ঘড়ি দেখুন এখন ভাত খাবার সময় এবং বাড়ি যান।

—এ মা, আমি তা বলি নি মোটেই, চা খাবেন তো বলুন।

—না, চা এখন থাক। সুব্রত উঠল। রুচি বলল না আবার আসবেন। সুব্রত বলল আসি। সুব্রত দরজার দিকে পা বাড়াল। রুচি ওকে বাইরে এগিয়ে দিতে এল। লোহার হাফ ফটকের ধাতব শব্দটা বেজে উঠল। রুচি বলল—কাজলবাবু সত্যি কেউ নন।

সুব্রত হেসে ফেলল—কেউ যদি হনই আমার তাতে কী ? তুমি তো জানো আমার অর্থ নেই, নীতি আছে কিনা কে জানে! অধ্যাপনা পেলে,

বাঁচি। রুচি অপ্রস্তুত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল—জানেন শান্তদা সত্যিই রেজিগনেশন দিচ্ছে।

—কে বললে ?

—বাবা। ওকে ছোটবেলায় খেপাতাম অশান্তদা বলে, এখন দেখছি ও সত্যিই তাই।

সুব্রত ওর দিকে সটান একবার তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল তারপর বলল—আচ্ছা, আজ যাই। পথ নির্জন। ঠাণ্ডা। আকাশে বৃষ্টি-ধোয়া ছায়াপথ। শরতের মেয়েলি স্পর্শ বাতাসে। দূরে বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুব্রত দৌড়ল।

শান্তনু ওর ঘরের সামনে রোয়াকে বসেছিল। এটা বাইরের ঘর। রোয়াকটা বাইরের দিকে। সামনে ঘোষপাড়া রোড। ব্যারাকপুরের দিকে চলে গেছে। অনেক রাত্রে এই রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে শান্তনু বসে থাকে। বাইরের দরজার একটা চাবি থাকে ওর কাছে। প্রায়দিনই ওর ফিরতে রাত হয়। টেবিলে রাত্রির খাবার ঢাকা থাকে। ও খেয়ে নিয়ে বাইরের রোয়াকে বসে। নির্জন নিঃশব্দ রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট খায় আর নিজের সঙ্গে আপোস করার চেষ্টা করে। ইজিচেয়ারটাকে রোয়াকের ওপর পাতে। ঘরের জানলার কাছেই। দরকার হলে জানলায় পড়বার আলোটা জ্বালিয়ে নেয়। পড়তে ইচ্ছে না হলে আলো নিবিয়ে দেয়। পঞ্চাশ হাত দূরে একটা মস্ত অশথ গাছ। তারই দিকে তাকিয়ে থাকে। আপোস করতে হয় কেন নিজের সঙ্গে এটাই শান্তনুর কাছে দুরধিগম্য। আলো-জ্বালানো বোবা রাত্রে অশথ গাছের ডালে পাখিদের পাখা ঝাপটানি শুনতে শুনতে কতবার শান্তনুর মনে হয়েছে ফিউটাইল—সব কিছুই ফিউটাইল। যে তত্ত্বজ্ঞান কজন সাঁচ্চা মানুষ অন্তর দিয়ে উচ্চারণ করছে, রূপ দিতে চাইছে কাজে, আরো হাজার জন বদমাইস এবং ভণ্ড ঠিক সেই একই তত্ত্বজ্ঞানকে দোহাই হিসাবে ব্যবহার করছে। এই যে সেদিন পার্টির কেন্দ্রীয় সভার সদস্য আহ্‌লুওয়ালিয়াকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তত্ত্বজ্ঞান তার কিছু কম ছিল ? অথচ পার্টি-বিচার যদি সত্য হয় তাহলে লোকটা স্ত্রীর সঙ্গে ফিউডাল ব্যবহার করত। সারা জীবনের তত্ত্বজ্ঞান তাহলে তাকে আসলে পাল্টাতে পারে নি। আর যদি উল্টোটা সত্য হয়

তাহলেও একই কথা। কেননা দলাদলির মতলবে যদি আহলুওয়ালিয়ার বিপক্ষে ওই সব কথাগুলো বলা হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে মার্কসবাদ কাউকেই পরিবর্তিত করে নি, করে না। শান্তনুর নিজের কথা মনে পড়ল। রুচির ব্যাপারে তার যে দুর্বলতা, যে আকাঙ্ক্ষা তা কি শুধুই রুচিকে সত্যে স্থির দেখার বাসনা? না কি রুচির ব্যাপারে তার নিজেরই কোনো অধিকারস্পৃহা আছে? পনেরো বছরের রুচিকে ছুটোছুটি করে খেলা করতে করতে একবার চুমু খেয়েছিল। সেই নোনতা স্বাদ মুখ থেকে মুছে গেলেও মন থেকে মোছে নি বোধ হয়। অথচ রুচি হেসে ব্যাপারটা ধুয়ে ফেলেছে পরদিনই। ভালো করে রোজ দাঁত মাজতে বলেছিল শান্তনুকে। রমেন দেখতে চমৎকার। শার্ট প্যাণ্টে এত স্মার্ট দেখাত তাকে যে বলার নয়। শান্তনু সে তুলনায় অনেক ভোঁতা। সুব্রত সুন্দর নয়। কিন্তু রোগা লম্বা চেহারায় একটা ম্লান দৃঢ়তা আছে। কিন্তু কাজলবাবু নিঃসন্দেহে এদের সবাইকে হারিয়ে দেয়। শান্তনুর ভেবে কষ্ট হয় রুচি কোথাও স্থির হয় না কেন। রুচি কেন গভীরে যায় না। রমেনকে ঈর্ষা হত শান্তনুর। কিন্তু রুচি যদি অক্লেশে রমেনকে বাদ দিয়ে দেয় তা হলে শান্তনুর কষ্ট হবে। তাই সুব্রত রুচিকে নিয়ে রমেনদের বাড়ি যাক এটা শান্তনু চেয়েছিল। রুচিকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট করেছিল শান্তনু। এই অহমিকা থেকে শান্তনু বিদায় নিতে পারে না। অনেক দিকে অনেক পরাজয়ের পর রুচিও বিদায় নেবে সুখ, নিরাপত্তা, স্বস্তির লোভে এটা শান্তনুর কাছে আর এক পরাজয়। রুচি কেন রমেনকেই মনে রাখে না? সেও তো এক হিসাবে শান্তনুরই স্বাক্ষর। কিম্বা সুব্রতকে?

শান্তনুর মা বলেছিলেন, আমার আর সব ছেলেরাই কিছু না কিছু হয়েছে, বড় অফিসার, মেজ ডাক্তার, সেজ এ্যাডভোকেট—ছোটটাই কিছু হল না। শান্তনু মাঝে মাঝে এখন ঐ কথাটা ভাবে—আর সবাই কিছু না কিছু হয়েছে কেবল আমারই কিছু হওয়া হল না। দোতলা বাড়িটার ঘরে ঘরে মেজদা সেজদা বৌদিরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ওরা সকলেই তৃপ্ত। সুখী। অহঙ্কারী। বড় বৌদি একসঙ্গে থাকেন না। বড়দার সঙ্গে জেলায় জেলায় মফঃস্বলে ঘুরে বেড়ান। কচিৎ কখনো আসেন। যখন আসেন তখন তিন বৌদির প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে শান্তনু। অপরে কেমন নির্ঝঞ্ঝাট আয়েসের জীবন কাটাচ্ছে এটা বলার ছলে, সকলেই নিজ নিজ

দুরূহ জীবনের গৌরব প্রকাশ করতে চাইবেন। বড় বলবেন মেজকে, বেশ আছ তোমরা, সাত ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে আমরা আর পারি না। এক একবার বদলি হই, আর আমার ফার্নিচারগুলোর দফা নিকেশ হয়। মেজ বলবেন—এ তবু আছ ভালো, পাঁচটা দেশ দেখে বেড়াচ্ছ, আর আমাদের দেখ না ঘাঁটি ছেড়ে নড়বার উপায় নেই, সব সময় গোটা কত করে সিরিয়াস কেস। সেজই স্বাধীন এ কথা যখন সকলে মিলে সাব্যস্ত করবেন, সেজ বলবেন, বোলো না ভাই ওঁর মক্কেলদের টানাটানির ধাক্কায় যাওয়া হয়ে ওঠে না কোথাও, হরিদ্বারে যাব একবার ভাবলাম, ওখানে ওঁর তিন মক্কেলের তিনখানি বাড়ি। এ বলে আমার এখানে চলুন, ও বলে আমার এখানে—যাকেই 'না' বলবেন তারই মুখ ভার—রাগ করে বললেন দূর হোক গে যাক। সেজ একটু কৃপণ। দোহাই দেন দুই মেয়ে, এখন থেকে হাত টানতে হবে। বড় নিঃসন্তান। তিনিও কৃপণ। বলেন ছেলেমেয়ে নেই বুড়ো বয়েসে দেখবে কে বল! যে যার নিজের মতো ছোটখাট অহংকার বানিয়ে নিয়ে সুখে আছে। প্রত্যেকেরই ধারণা তার বিয়েয় তার বাবা সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করেছেন। নিজেরা পিতার কত প্রিয়পাত্রী ছিলেন এ ধারণাটা বোধ হয় তারই মাপকাঠি। 'বাবা তো বলেই দিলেন, ছেলে পছন্দ হয়ে গেলে টাকার জন্য আটকাবে না। এরা বলে এরা কিছু চায় নি। চাইবে কি, বাবা চাইতে দিলে তবে তো।' হেসে, নরম করে সৌজন্যের মোড়কে সেই সব অহঙ্কার বিনিময় দেখে দেখে শান্তনু ক্লান্ত।

শান্তনু সেখানে অনাত্মীয়। সে সমস্ত কথাবার্তা তার কাছে অবোধ্য। সে শুধু যা কোনো কাজে লাগে না সে ধরনের এক অতীত বিদ্যার ব্যর্থ এম. এ.। জেল ফেরত হয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা যেন আরো বেড়ে গেছে। অথচ ওঁরা তো কেউ লোক খারাপ নন। এখনো যদি দীর্ঘ কারাবাস শেষ করে যখন এই বড় বাড়িটার দরজার কাছে শান্তনু দাঁড়ায়—বৌদিদের অভ্যর্থনা পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে চায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চাই কি শান্তনুর প্রসঙ্গে মেজ বৌদি হয়তো তাঁর খুড়তুতো কাকার গল্প শোনাবেন, যিনি কুড়ি বছর আগে স্বদেশী করতেন, এখন কিছু করেন না, কিন্তু খদ্দর পরেন ঠিক। লোক সত্যিই ওঁরা খারাপ নন। এখানে ছেলেরা কেরিয়ার তৈরি করে, মেয়েরা রবীন্দ্রসংগীত শেখে। কেরিয়ার তৈরি করা এমন কি খারাপ কথা, রবীন্দ্রসংগীত শেখা তো যাকে বলে ভালোই। ভালো নয় যেটা তা হল ছাঁচ। ছাঁচ মানেই

কৃত্রিমতা। কৃত্রিমতা—কৃত্রিমতা—কৃত্রিমতা। বড়দা মেজদার সাহিত্য-আলোচনা শুনেছে শান্তনু। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' বইখানা তখন বেরিয়েছে। বইখানার ভালোমন্দ, সে কেবা জানে, কেবা খোঁজ রাখে। বইয়ের লেখক কে, দিল্লিতে তিনি কোথায় চাকরি করেন, লিখতে হলে এই রকম স্টার বই লেখাই উচিত—এই সব। শান্তনুর সনেট লেখা বাতিককে শুনিয়েই বোধ হয় বলেন—লিখলে শিবনাথবাবুর মতো লেখাই উচিত। আলিপুরে বাড়ি, গাড়ি, মন্ত্রীসভায় ঠাঁই। সব কিছুরই একটা প্রসপেক্‌ট থাকা চাই। ছাঁচ—ছাঁচ—কৃত্রিমতা। বোঝে না কৃত্রিমতাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থবিরতা। প্রকাশবাবুদের স্কুলে মাস্টারি নেওয়াটা ওদের কাছে কেবলমাত্র বাহাদুরি। ও যে দলের কাজ করে এটা তবু বাড়ির লোকে সহ্য করেছে। কিন্তু মাস্টারি নেওয়াটা একেবারেই বরদাস্ত করে নি। বড়দা কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে কিসের জন্য ও কেরিয়ারটাকে নষ্ট করল। শান্তনুর নিজের কাছেও কি বোধগম্য হচ্ছে? আগে যে আবেগে বোধগম্য হত, ঠিক তেমন করে?

(ক্রমশ)

পীট সীগরের গলায়

ঃ আমেরিকার নিগ্রো সমানাধিকারবাদীর গান

আমরা করব জয়, আমরা করব জয়,
আমরা করব জয়, সে-একদিন
আহা, আমার বুকের গভীরে (আমি জেনেছি যে)
আমি রেখেছি তো বিশ্বাস (আহা—),
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমাদের নেই ভয়, আমাদের নেই ভয়
আমাদের নেই ভয়, আজ-এইদিন,
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা যে নই একা,…(আজ-এইদিন)
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা যে হব মুক্ত, সত্যে মুক্ত…
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা হাঁটব হাতে-ধরে-হাত, পথ…
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

সহায় থাকেন প্রভু, আমরা অব্যাহত…
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন॥

We shall overcome, we shall overcome
We shall overcome someday.
Oh, deep in my heart (I know that)
I do believe (Oh—), we shall overcome someday.

We are nor afraid, we are nor afraid
We are nor afraid, today.
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall óvercome someday.

We are not alone···('today)
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome someday.

The truth will make us free···
We shall overcome someday.

We will walk hand in hand···
We shall overcome someday.

The Lord will see us through···
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome someday.

বঙ্গানুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

আজিজুল হক আল আহসান

ওকে বাঁচিয়ে রেখ

ওকে বাঁচিয়ে রেখ
বাঁচার ইতিহাস পল্লবময়, পয়মন্ত ছেলে
হোয়াইট হাউস ট্রিওলেট গুচ্ছে সূর্যের গতায়াত
ক্রেমলিন বাতায়নের দিকে অবাধ চোখ মেলে।
আণবিক আগ্নেয় স্বগতোক্তির ভিড়ে
এবং দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ
যাযাবর ফিনিক্স ফিরবে আপন নীড়ে
ধিক্‌কৃত, কেঁপে যাবে জল্লাদ।

শিশিরকুমার দাশ

ফেলে যেও না

ওকে তোমরা ফেলে যেও না নির্জন এই দ্বীপ
কালো পাহাড়, খাড়া পাহাড়, ন্যাড়া পাহাড়
ও যে এখন ঘুমিয়ে আছে, গভীর খাদের পাশে
ওর মুখে নীল দিনের আলো, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে যায় যে, দূরেই সাদা হাড়
অজানা কোন অভাগা নাবিকের, একটা জাহাজের
মাস্তলের শবদেহের, শব্দ শুধু অচঞ্চল জল।

ওকে তোমরা ফেলে যেও না নির্জন এই দ্বীপ
কালো পাহাড়, খাড়া পাহাড়, ন্যাড়া পাহাড়
ও যে এখন ঘুমিয়ে আছে, একটা মৌমাছি
গুনগুনিয়ে গুনগুনিয়ে মুখের কাছাকাছি
উড়ে যাচ্ছে কখন থেকে, বহুদূরের চিল

আকাশ থেকে ডানার ছায়া ফেলছে ওর মুখে
ভীষণ রোদ, সমুদ্র আজ উত্তাল উচ্ছল।

ওকে তোমরা ফেলে যেও না, শোন, শোন, শোন
কালো পাহাড়, খাড়া পাহাড়, ন্যাড়া পাহাড়,
ও যে এখন ঘুমিয়ে আছে, একটু আগেই ওর
ভালবাসা হারিয়ে গেছে, সমুদ্রের জলে,
জেগে উঠবে খুঁজবে সেই হারানো ভালবাসা,
শিশুর মত, ক্ষ্যাপার মত, কাঁদবে সারারাত
ফিরবে ঘরে কেমন ক'রে, সমুদ্র উন্মাদ
চিবিয়ে খায় ভালবাসার অস্থিমজ্জা হাড়॥

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মর্ম্মরমূর্তি

খর্জুর শাল্মলী তরুচ্ছায়া,—পার্শ্বে প্রশস্ত উদ্যান
দর্পিত প্রাসাদ, দ্বারী বিচিত্রভূষায় সুসজ্জিত।
সিংহদ্বারপ্রান্তে দৃশ্য দীর্ঘশোভা : ফোয়ারা উচ্ছ্রিত
দিব্যশ্রী, চঞ্চল মাছ জলাশয়ে, মর্মর সোপান।
রঙিন প্রস্তরখণ্ড আচ্ছাদিত পথ অভ্যন্তরে।
কচি ঘাস প্রসারিত বিসর্পিল দূরে ইতস্তত।
ভিন্‌দেশী অন্তর্বর্তী হলে ভ্রমে হবে প্রতিহত
কারণ, সতর্ক সদা সারমেয় উদ্যত নখরে।

দুর্ভেদ্য প্রাসাদ। তবু একদিন প্রার্থিত ভ্রমণে
আমন্ত্রিত, পৌঁছালাম। পরিদৃশ্যমান দৃশ্যে চোখ,
ম্রিয়মান। শুধু এক পরিত্যক্ত ভাস্কর্য—স্বর্লোক :
একটি মর্মরমূর্তি আবিষ্কার লতাগুল্মবনে।

একটি নিপুণ শিল্প : প্রস্তরিত মুখ—সন্নিধানে
অন্যান্য বৈচিত্র্য ভুলে যাই—এই সৌন্দর্যের টানে॥

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কৃতকর্ম

রুটিন-মাফিক হাঁটা-চলা, এই অপূর্ণতার
মধ্যে বাজলো বাঁশি ;
এক ফুঁয়ে শুধু ঘুরলো বাল্য, সন্ধ্যামালতী,
জন্মভিটার
কে বললে, এই আসি !

চাকায় জড়ালো ভালোবাসবার কথা ও ছন্দ,
প্রাণহীন, দেহাতীত !
থেকে-থেকে বাজে কীর্তনীয়ার করতাল, আর
মধুর মন্দ
ভূমধ্য সংগীত।

দেখি প্রকাণ্ড ছায়া পড়ে যায় ; কৃতকর্মের
ফল খাই আদ্যন্ত।
বাহবা দেবার লোক ছিলো বটে, কিন্তু তাহার
সমপর্ণের
মতো নই প্রাণবন্ত।

ভূতলে যখন ঘণ্টা বাজাও, আমার শ্রবণ
নেমে যায় দ্রুত বনে ;
আমি যার প্রতি জটিল এবং জর্জরিত
তাদের ভ্রমণ
দিগ্বালিকার ধ্বনে !

এক দেয়ালের মধ্যে এখন দিবসরজনী,
পূর্ব ও পশ্চিম।
সর্বস্ব কি আছে আর ঐ দূর প্রাঙ্গনে ?
আমার রমণী
বুকের রক্তে হিম।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আর একদিন পরে

বাহির মহলে আর কেবা শোনে মহতী সঙ্গীত ?
অবান্ধব অন্দরে বাহিরে
চন্দ্র মল্লিকার বুকে মাথা রেখে শুয়েছি যখন
বাতায়ন খুলে দিলো বাতাসের সঙ্গে চরাচর
অভিমান ভুলে গিয়ে। ঔপনিবেশিক বিহগেরা
প্রতিবন্ধকতাহীন বৃক্ষের শরীরে
কেন বারবার কেন আলোর সদিচ্ছা নিয়ে আসে ?

কোনো স্থিত, কোনো স্থিরতর মৃদু জলের ভিতরে
সমগ্র মধ্যাহ্ন আর সব অপরাহ্ণ খেলা করে।

শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যাবতীয় সকল সঙ্গীত
সংঘবদ্ধভাবে ধায় হৃদপিণ্ডের অন্দর মহলে,
নিজের রুধির কিংবা বন্ধুর শোণিত
অবশ্য পৃথকভাবে চেনা যায়। কারণ সকলে
একই রক্তস্রোত আর বক্ষদেশে বহন করে না।

গভীর ঘুমের মধ্যে রৌদ্রের আলস্যভরা দিন
ক্রমশ সমস্ত মুখ বন্ধনবিহীন।

শেষবার দেখা হোলো কৃষ্ণপক্ষে অরণ্যসভায়
বনস্পতি-দেহ অন্ধকার,
পিছু হটবো না আমি কোনোদিন ফেরাবো না মুখ
প্রতিশ্রুতি তার।

রমানাথ রায়

দুর্বোধ্য

আজকাল প্রায়ই আমার মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে। একটু ঘুরলে কিংবা বেশি কথা বললে মাথার মধ্যে দপদপ করে, মনে হয় মাথার শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে যাবে। আর যদি একটু পড়ার ইচ্ছে হয়, কোনো বইয়ের পাতা চোখের সামনে মেলে ধরি, অমনি কিছুক্ষণের মধ্যে দু-চোখের পাশ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে শুরু করে। অবশ্য এই অসুখটা আমার নতুন নয়, অনেকদিনের পুরনো। প্রায়ই মাঝে মাঝে দেখা দেয়। তবে আজকাল অসুখটা বেড়েছে।

এই অসুখটা যখন আমি আবিষ্কার করেছিলাম, তখন আমার বয়স ষোল। ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে যখন ক্লাসের সবাই অঙ্ক টুকে নিত, আমি তখন পেন্সিল মুখে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম। মাস্টারমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষে দিচ্ছেন, আমি সেদিকে তাকিয়ে কালো বোর্ডের ওপর শাদা খড়ির দাগ দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমস্ত কিছু বৃষ্টির মধ্যে দূরের গাছপালার মতো ঝাপসা ঠেকত, কিছু পড়তে পারতাম না। ফলে, নিজের ওপর ক্ষোভ জন্মাত। কিন্তু কেন যে আর পাঁচজনের মতো পরিষ্কার ভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তার কারণ বুঝতে পারতাম না। এক-একবার মনে হত, আমার হয়তো চোখ খারাপ হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবতাম, বাড়িতে এই কথাটা জানানো দরকার। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না ভেবে আর জানাই নি। বস্তুত, আমাদের বাড়ির কারোর চোখে চশমা নেই, প্রত্যেকেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। আর সেই বাড়ির ছেলে হয়ে আমার চোখ খারাপ হয়েছে, এর মতো অবিশ্বাস্য আর কি হতে পারে?

তবে শেষ পর্যন্ত এই গোপন ব্যাধির কথা বাড়িতে না বলে পারি নি। বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার না দেখতে পাওয়ার অসুবিধে যদি ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে হয়তো বাড়িতে একথা বলতাম না। কিন্তু

সকলে যখন রাত্রে এক আকাশ তারা দেখত, দেখত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, কিংবা বর্ষার মেঘ, তখন আমি বোকার মতো চোখ মেলে চারদিক হাতড়ে বেড়াতাম। কিছুই দেখতে পেতাম না; তারা দূরের কথা, চাঁদটাও খুব ভালো করে চোখে পড়ত না। আমার খুব কষ্ট হত। এক-একদিন রাতের আকাশের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক তাকিয়ে থেকেছি; মুহূর্তের জন্যেও যদি চাঁদটা হঠাৎ আমার চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার অপেক্ষা করেছি, কিন্তু কোনোদিন ভুলেও চাঁদটাকে অস্পষ্ট ধূসর একটা আলোর তাল ছাড়া কিছু ভাবতে পারি নি। তাই বইয়ের ছবি দেখে, লোকের মুখে শুনে কল্পনা করেছি রাতের বিজন আকাশ, চোখ বন্ধ করে দেখতে চেয়েছি, নক্ষত্রেরা মুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে, আর তার মাঝখানে এক অলৌকিক স্তব্ধতা নিয়ে চাঁদ থমথম করছে। কোনো কোনোদিন ভাবতে চেষ্টা করেছি, বৈশাখ মাসে ঝড় উঠলে কি ভাবে মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে নিজেকে চতুর্দিকে বিস্তার করে দেয়। কখনও ভেবেছি সূর্যোদয়ে কিংবা সূর্যাস্তে গোটা আকাশ কিরকম অদ্ভুতভাবে রঙের রহস্যে অলৌকিক হয়ে ওঠে। আমি প্রতিদিন সেই সব রহস্যময় দৃশ্যের কথা ভেবেছি যা দূরের এবং আমার দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু সে সব দেখতে পেতাম না বলে আমার কষ্টের সীমা ছিল না। আর এই কারণেই শেষ পর্যন্ত আমার অসুখের কথা বাড়িতে না জানিয়ে পারি নি। তারা আমার কথা শুনে প্রথমে খুব অবাক হয়েছিল। তারপর নানাভাবে আমার দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করে শেষে বুঝতে পারল যে আমার চোখ খারাপ হয়েছে, এ অসুখ বানানো নয়; তারা বিশ্বাস করল, আমি দূরের জিনিস সত্যি সত্যি দেখতে পাই না, যা তারা অনায়াসে চোখ তুললেই দেখতে পায়।

তারপর তারা আমায় লাল টাই-পরা এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন, আমার চোখ অস্বাভাবিক রকমের খারাপ। আমি তখন তাঁকে আচমকা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার চোখ এত খারাপ হল কেন? তিনি এই প্রশ্নে আমার দিকে ক্ষণেকের জন্য চোখ তুলে নামিয়ে নিয়েছিলেন। এর কোনো জবাব দেন নি। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আমিও ভয়ে দ্বিতীয়বার আর জিজ্ঞাসা করি নি।

এর ঠিক দু-দিন পরে তিনি আমায় একটা চশমা দিয়েছিলেন। সেই

চশমা চোখে দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত বোধ পাল্টে গিয়েছিল। গোটা পৃথিবী হঠাৎ এত বেশি নগ্ন হয়ে উঠেছিল যে সহ্য করতে পারি নি, চশমা চোখে দিয়েই খুলে রাখতে হয়েছিল। অবশ্য ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, এরকম কয়েকদিন হবে, তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

বাস্তবিক, চশমাটা আমার জীবনে এক নিষ্ঠুর পরিবর্তন এনেছিল। গাছপালা, ঘরবাড়ি, লোকজন সবকিছুর চেহারা রাতারাতি পাল্টে গিয়েছিল। সবকিছু আমার কাছে বড় বেশি অচেনা বলে মনে হয়েছিল। এমন কি নিজের বাড়ি, ঘরদোর, বাবা মা প্রত্যেকেই, যাদের সঙ্গে জন্ম থেকেই সম্পর্কিত, তারাও আমার অপরিচিত হয়ে উঠেছিল। বাড়ির রঙ যে এত মলিন তা কোনোদিন ভাবি নি, বাবার মুখের অদ্ভুত কালো কালো দাগ আমার অগোচর ছিল, মাকে যে এত রোগা আর কালো দেখতে তা ধারণা করতে পারি নি। নিজের বাড়ি ও বাবা মাকে এতকাল কি অদ্ভুত ভাবে কল্পনা করে এসেছি, তা মনে করে আমার চোখ ফেটে জল এসেছে। মাঝে মাঝে ভেবেছি, চশমাটা না নিলেই হত। কখনও কখনও ক্ষোভে দুঃখে চশমাটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে; কিন্তু পারি নি, কেননা এই চশমা পরেই ভালো করে রাতের আকাশ দেখেছি, বর্ষার মেঘ দেখেছি, দেখেছি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

এবং সেই থেকে আজও আমার চোখের ওপর চশমাটা রয়ে গেছে। এর মধ্যে বহুবার আমার মাথা ধরেছে, চোখ দিয়ে জল পড়েছে, এবং চশমার কাচও যে কতবার পাল্টেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আজও বুঝতে পারি নি, এত করেও আমার অসুখ কেন তেমনি রয়ে গেল।

অবশ্য এই বয়সে চোখের অসুখের ধরনটা একটু অন্যরকম। এক সময় আমি যা কিছু দূরের এবং ঝাপসা, তা স্পষ্ট করে দেখার জন্যে চশমা নিয়েছি এবং সেই চশমা পরেই আমি তখন সবকিছু বড় স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছি, যার অনেককিছু হয়তো অত স্পষ্ট করে না দেখতে পেলেই ভালো হত। তবে এই বয়সে দূরের নয়, কাছের জিনিস আর তেমন ভালো করে দেখতে পাই না। কেমন ঝাপসা ঠেকে। বই কিংবা খবরের কাগজ পড়তে বসলেই, চোখ টনটন করে, মাথা ধরে। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম, ডাক্তারের কাছে যাব না; কেননা, আমার মনে হয়েছে এ অসুখ আমার সারবে না, সারবার নয়।

কিন্তু অসুখটা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় আমার কেমন ভয় হতে লাগল। মনে হল, আমি হয়তো অন্ধ হয়ে যাব। তাই শেষ পর্যন্ত আমায় এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হল। ডাক্তার প্রায় তিনদিন ধরে আমার চোখ পরীক্ষা করলেন; করে যে চশমা দিলেন তাতে আমি ফের ছাপা হরফ পড়তে পারলাম। আর ঝাপসা ঠেকল না। চশমা চোখে নিয়ে আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, চশমা কি আর পাল্টাতে হবে? নাকি এতেই চলে যাবে?

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, বোধ হয় আর পাল্টাতে হবে না।

কথাটা শুনে আমার আনন্দ হল। কেননা, ডাক্তারের কথায় যেন মনে হল, আমার চোখের অসুখ তাহলে সেরে যাবে। ডাক্তারের মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে নীরবে ধন্যবাদ জানালাম।

বাস্তবিক, আমি কয়েকদিন ধরে বেশ লক্ষ্য করলাম যে বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে চোখের পাশ দিয়ে আর জল গড়িয়ে পড়ে না। কিংবা হঠাৎ অকারণে আর মাথা ধরে না। এটা লক্ষ্য করে মনে মনে স্বস্তি পেলাম। বুঝলাম, এখন আমার সত্যি সত্যি চোখের অসুখ সেরে গেছে। এবং এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না। এখন ছাপা হরফ যেমন স্পষ্ট দেখতে পাই, তেমনি দূরের মেঘ কিংবা নক্ষত্রও দেখতে পাই। সবকিছুই, অর্থাৎ বাইরের এই চোখটা দিয়ে যা দেখা সম্ভব, এবং সকলেই যা দেখতে পায়, তা এখন আমিও দেখতে পাই। কোনো অসুবিধে হয় না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে টের পেলাম, মাথার ভেতর দপদপ করছে। কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। কিছুতে বুঝতে পারলাম না, ফের আমার মাথা-ধরা শুরু হল কেন? কিছুক্ষণের মধ্যে মাথার যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠল। ঘুমুতে গিয়ে ঘুম এল না। যন্ত্রণায় বিছানার ওপর কেবল এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম।

শেষে থাকতে না পেরে কপালের ওপর ভালো করে নীল মলম লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দিতে বেশ আরাম বোধ করলাম। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। আস্তে আস্তে মাথার ভিতরের প্রচণ্ড দপদপানি কমে এল। আর ঠিক সেই সময় আমি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু পরদিন রাতে আবার মাথা কামড়াতে শুরু করল। দু-চোখের পাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে গালের ওপর জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বুঝলাম, আবার চোখ খারাপ হয়েছে এবং এই অসুখের হাত থেকে আমার রেহাই নেই, ব্যাধের মতো সারাজীবন আমাকে ধাওয়া করবে।

একদিন ফের সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি অনেক্ষকণ ধরে আমার চোখ পরীক্ষা করে দেখলেন, আমি নির্ভুলভাবে সমস্ত কিছু দেখতে পাই কিনা। দূরের এবং কাছের কোনো অক্ষর পড়তে আমার অসুবিধে হয় কিনা। এতে তিনি অনেকটা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। এই সময় তাঁকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। তবু তিনি শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে একটা ওষুধ আমাকে নিয়মিত ব্যবহার করতে বললেন।

আমি সেই ওষুধ তাঁর কথামতো প্রায় ঘড়ি ধরে ব্যবহার করলাম। কিন্তু অসুখ আমার তেমনি রয়ে গেল। মাথা-ধরা কিংবা চোখ দিয়ে জল পড়া বন্ধ হল না।

আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি ফের ওষুধ দিলেন। কিন্তু কিছু ফল হল না। এবং তাঁকে বিশ্বাস করে এভাবে আমার বহুদিন চলে গেল।

শেষে ধীরে ধীরে নিজের কাছে নিজের অসুখ বড় দুর্বোধ্য আর রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। কিছুতে বুঝতে পারলাম না, আমি এখন এই বয়সে এমন কোন্ অলৌকিক দৃশ্যের অপেক্ষা করব, যার জন্যে আমার মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডব্লু. ই. বি. ডুবয় ও নিগ্রো স্বাধিকারের দাবী

"Blessed are the Peacemakers for they shall be called communists. Is this shame for the Peacemakers or praise for the communists? Accursed are the communists, for they claim to be Peacemakers. Is this shame for the communists or praise for the peacemakers? This is the paradox which faces America."—W. E. B. Dubois, 1952.

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে স্বাধিকারের দাবীতে নিগ্রো সমাজের আন্দোলন ক্রমশ বলীয়ান হয়ে উঠতে লাগল। আর প্রায় সেই মুহূর্তেই সেই আন্দোলনের অন্যতম আদিপুরুষ ডক্টর ডুবয়ের মৃত্যু হল। এবারের আন্দোলনের পশ্চাতে প্যান্-আফ্রিকান চেতনার যে ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি, সেই প্যান্-আফ্রিকান আন্দোলনেরও প্রতিষ্ঠাতা ও আদি সংগঠক ডক্টর ডুবয়; তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে প্রথম প্যান্-আফ্রিকান কংগ্রেস প্যারিতে অনুষ্ঠিত হয়। যে-ইতিহাস এই আন্দোলনের পটভূমিকা, সেই ইতিহাসের মধ্যে ডক্টর ডব্লু. ই. বার্গহার্ট ডুবয় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন। নিগ্রো সমাজের পক্ষ থেকে পল রোবসন ১৯৫৮ সালে তাঁর আত্ম-কথার পাতায় যে কথা বলেন, তার সত্যতাই বোধ হয় ডক্টর ডুবয় সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা। রোবসন বলেছিলেন, "তিনি আমাদের মুক্তি আন্দোলনের জনক।...তিনি আমাদের শতাব্দীর যথার্থ মহৎ আমেরিকানদের অন্যতম।" ৯৫ বছর বয়সে যার জীবনাবসান হল, তাঁর জীবনের ছিয়াত্তর বছর নিগ্রো সমাজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অঙ্গ।

১৮৮৮ সালে ফিস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরুবার আগেই উনিশ বছর বয়সে, অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে ডুবয়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপের শুরু (ওঁর নিজেরই মতে)—মদ্যপান-নিবারণী আন্দোলনের প্ল্যাটফর্মে। তখনও কিন্তু ডুবয় আসলে নিষ্ঠাবান ছাত্র, দেশীয় বা জাতীয় রাজনীতিতে প্রায় একেবারেই অনুৎসাহী। তারপর হার্ভার্ডে কাটল চার বছর। এখানে ডুবয় দর্শন,

ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বে শিক্ষা নেন উইলিয়ম জেম্স্, জোসিয়া রয়েস্, জর্জ সান্টায়ানা, এবং অ্যালবার্ট বুশনেল হার্ট প্রমুখ দিকপালদের কাছে। এখান থেকে তিনি আদর্শ হিসেবে বেছে নেন "শুধু জ্ঞানাহরণ"। ১৮৮৯ সালে হ্যারিয়নের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডুবয় তাই প্রায় উদাসীন! "আমার সব চিন্তা তখন পড়াশোনায়; নতুন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে তখন কী বলেছিলাম, কী ভেবেছিলাম; তার প্রায় কিছুই মনে পড়ে না।" সে-আমলে মার্কিন ছাত্রদের রেওয়াজই ছিল ইওরোপে পড়তে যাবার। কিন্তু ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখনও মার্কিনী ডিগ্রি স্বীকার করে না। ডুবয়ের শখ ছিল জর্মনি যাবার। স্লেটার ফাণ্ডের স্কলারশিপের দৌলতে সেই সুযোগ জোটে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালেই (১৮৯২-১৮৯৪) গুস্তাফ শ্‌মোলারের কাছে ডুবয় শিখলেন যে, অজ্ঞতাই বর্ণবৈষম্যের উৎস, এবং বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই সত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করলেই সমাধানের দিকে এগোনো যায়। ফিরে এসে হার্ভার্ডে ডুবয় তাঁর গবেষণার পরিণতিস্বরূপ 'আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের দমন' সম্পর্কে প্রবন্ধের জন্য ডক্টরেট লাভ করেন। ১৮৯৬ সালে নতুন 'হার্ভার্ড ঐতিহাসিক বিচার' পর্যায়ের প্রথম বই হিসেবে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। শ্‌মোলারের শিক্ষাই তখনও তাঁর মনে কাজ করছে। ১৮৯৯ সালে পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় 'ফিলাডেলফিয়ার নিগ্রো : একটি সামাজিক সমীক্ষা'। তখনই তিনি আটলাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজ নেন। এখানে তিনি অধ্যয়নের ও গবেষণার একটি বিশেষ পরিকল্পনা চালু করেন—মার্কিনী নিগ্রো সম্পর্কে এই শিক্ষাক্রম হবে "মূলত বিজ্ঞানানুসারী—সঙ্গতি ও মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সততার সঙ্গে গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে সত্যের সন্ধান"। আটলাণ্টায় এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলতে থাকে, ডক্টর ডুবয়ের পরিচালনায়। এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতেই ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় 'দ্য সোল্‌স্ অফ্ ব্ল্যাক্ ফোক্'। ফিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ডুবয় ছুটিতে ছুটিতে টেনেসি প্রদেশে গ্রামের ছোট ছোট নিগ্রো স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন; সেই অভিজ্ঞতাও তাঁকে তথ্য যুগিয়েছিল। কিন্তু এই ১৯০৩ সালেই ডুবয়ের মনে হতে থাকে, শুধু সত্য ঘোষণাতেই "সমাজ সংস্কার ত্বরান্বিত হয় না।"

ওদিকে তখন বুকার ওয়াশিংটনের আবির্ভাব হয়েছে। আলাবামায়

তাঁর টাস্কেগী স্কুলে তিনি নিগ্রোদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিগ্রো হিসেবে হীনতর সামাজিক মর্যাদায় সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষা দিতে থাকেন। আর এখানে চরম লক্ষ্য ছিল নিগ্রোদের দক্ষ রাজমিস্ত্রী, পাচক, ক্ষেতমজুর, ও মেকানিক করে তোলা, আর কিছুই নয়। বুকার ওয়াশিংটন দক্ষিণীদের বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর পাঠশালায় আসলে নিগ্রোদের বিষদাঁত ভেঙে সাহেবী কর্তাদের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তোলা হয়। এখানকার শিক্ষক ডক্টর ই. ফ্র্যাংক্লিন ফ্রেজিয়ার 'নিগ্রো বিপ্লবের' ইতিহাসকার লুই লোমাক্সকে বলেন যে, সাহেবরা যাতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে এখানে নিগ্রোদের চিন্তা করতে দেওয়া হয় না, সেজন্য ওয়াশিংটন যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯১৬-১৯১৭ সালে ফ্রেজিয়ার একদিন স্কুলের ভিতরে একতাড়া বই নিয়ে চলতে গিয়ে ওয়াশিংটনের ধমক খান। ওয়াশিংটনের ভয়, তাঁর হাতে এত বই দেখে সাহেবরা পাছে ভাবে যে এখানে নিগ্রোদের হাতের কাজ না শিখিয়ে তাদের বুদ্ধিতে শান দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার বদলে শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার এই পরিকল্পনায় নিগ্রোর সমানাধিকারের দাবিকে চাপা দিয়ে সামাজিক মর্যাদায় তার হীনতাকে স্থায়ী করে তোলার চেষ্টা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ, কার্যত এই আপোসরফায় সামাজিক হীনতাকে মেনে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছ থেকে কিছুটা আর্থিক সুবিধা আদায় করার চেষ্টা হয়। রাজনৈতিক অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উচ্চশিক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে 'টাকা করার' এই পরিকল্পনা, আত্মাবমাননার এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান ডক্টর ডুবয়। তিনি বলেন: "নিগ্রোদের শিক্ষার প্রশ্নে প্রথমেই জোর দিতে হবে সমাজের প্রতিভাবান দশমাংশের উপর। এই সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এঁরা নিজেদের সমাজের বা বাইরের হীনতম অংশের বিষাক্ত প্রভাব ও মারণপদ্ধতি থেকে এই সমাজের বৃহত্তম অংশকে বাঁচিয়ে রাখার মতো সুযোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারেন।" ডুবয়ের পক্ষে সমর্থক জোটে মুষ্টিমেয়—উত্তরের কিছু নিগ্রো বুদ্ধিজীবী, আর শ্বেতাঙ্গ অ্যাবলিশনিস্টদের শেষ কয়েকজন প্রতিনিধি। ওদিকে উত্তরের দাক্ষিণ্যের হস্ত হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে এল। আটলাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ এল: ডুবয় যতদিন তাঁদের শিক্ষক শ্রেণীতে থাকবেন, ততদিন কোনো কোনো ফাউণ্ডেশন থেকে আর কোনো

উপরি গ্রাণ্ট মিলবে না। আটলাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের দিকে চেয়ে ডুবয় পদত্যাগ করলেন, পদত্যাগ করে নিউইয়র্কে এলেন।

সরকারী আনুকূল্যে বুকার ওয়াশিংটন ১৯১০ সালে ইংলণ্ডে গেলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো সমাজের সুখী জীবনের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করতে। ডঃ ডুবয়ের নেতৃত্বে নিগ্রো বুদ্ধিজীবীরা ইওরোপের জনসাধারণের উদ্দেশে রচিত এক বাণীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোর দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করে উপসংহারে বলেন, "এই নীতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, বলিষ্ঠ ও সাহসী আমেরিকানরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। মনুষ্যত্বের স্বীকৃতির দাবিতে তাঁদের এই ধর্মযুদ্ধে তাঁদের দরকার—বড় দরকার—ইংলণ্ড ও ইওরোপের নৈতিক সমর্থনটুকুর।…এ বড় কঠিন আঘাত, যখন দেখি, আমেরিকায় প্রতিদিন অপমান ও লাঞ্ছনা যার অভিজ্ঞতা, এমন একজন বাইরে গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে, এখানে সব ঠিক আছে।" কিন্তু এই বিবৃতির আগেই নিগ্রো বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হতে শুরু করেছেন। ডঃ ডুবয়ের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে ক্যানাডার নায়াগারা ফল্স্-এ এঁদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে নায়াগারা মুভ্মেণ্ট নামে এক সংগঠনের জন্ম হয়। ১৯০৬ সালের সম্মেলনে হারপার্স ফেরিতে এঁরা এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন: "…এই আধুনিক যুগে আগে কখনও এমন দেখা যায়নি যে, একটি মহান ও সুসভ্য জাতি তাদের নিজেদেরই দেশের মাটিতে লালিত নাগরিকদের প্রতি ব্যবহারে এমন কাপুরুষোচিত নীতি প্রয়োগ করে। বড় বড় ফাঁপা কথাগুলো বাদ দিয়ে তার নগ্ন কদর্যতাকে উপলব্ধি করলে দেখা যায়, এই নতুন মার্কিনী নীতি বলে: পাছে তারা শ্বেতাঙ্গদের সমান হয় ওঠে, তাই কালো মানুষগুলোকে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করতে দিও না। আর এই দেশই দাবি করে যে, এরা নাকি যীশু খ্রীষ্টের অনুগামী। এই অধর্মের তুলনা কেবল এদেরই কাপুরুষতা।" দু' বছর এই মুভ্মেণ্টের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সমর্থনও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সাংবাদিক মেরী হোয়াইট ওভিংটন ১৯০৫-এর সভায় এসেছিলেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি-রূপে, ফিরে যান অনেক ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। তিনি ফিরে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ মহলে যোগাযোগ শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালে ইলিনয়ার স্প্রিংফীল্ডে এক রক্তাক্ত দাঙ্গা হয়ে গেল বর্ণের প্রশ্নে। শ্বেতাঙ্গ সমাজের এক প্রগতিশীল অংশ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন

ফর দি অ্যাড্‌ভান্‌স্‌মেণ্ট অফ কলর্ড্‌ পীপ্‌ল্‌' (এন্‌. এ. এ. সি. পি.) গঠন করতে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেরী ওভিংটন ছাড়াও জেন অ্যাডাম্‌স্‌, উইলিয়ম ডীন হাওয়েল্‌স্‌, জন ডিউই, আর্থার স্পিঙ্গার্ন, প্রমুখ। এঁদের আহ্বানে ডক্টর ডুবয় সহ নায়াগারা মুভমেণ্টের অধিকাংশ কর্মীই এন্‌. এ. এ, সি. পি-তে যোগ দেন। ১৯১০ সালে সরকারীভাবে এই সংগঠনের পত্তন হয়; ডুবয় হন এই সংগঠনের একমাত্র নিগ্রো কর্মকর্তা। এন্‌, এ. এ. সি. পি-র ঘোষিত লক্ষ্য ছিল: (১) বর্ণবিভেদী নীতির অবলুপ্তিসাধন, (২) শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সমানাধিকার, (৩) নিগ্রোর ভোটাধিকার; (৪) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রয়োগ।

এন্‌. এ. এ. সি. পি-র কর্মধারায় ডক্টর ডুবয়ের উপর দায়িত্ব পড়ে 'দ্য ক্রাইসিস্‌', নামে সংগঠনের মুখপত্র সম্পাদনার। এই কাজেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় কবি ও সমালোচক অধ্যাপক জে. ই. স্পিঙ্গার্নের সঙ্গে। বয়স, মেজাজ ও চিন্তাধারার সাদৃশ্যে তাঁরা খুব সহজেই বন্ধুত্বে বাঁধা পড়েন। তাঁদের কথাবার্তা চলত গভীরতম অন্তরঙ্গতায়। এন্‌. এ. এ. সি. পি-র শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্তেরা ডুবয়ের জঙ্গী মনোভাবে প্রায়ই ভয় পেতেন, কিন্তু সম্পাদকীয় বোর্ডের সভাপতি স্পিঙ্গার্ন পাশেই ছিলেন; তাই 'ক্রাইসিস্‌'-এর সম্পাদকীয় কলমে ডুবয়ের স্বাধীনতা ছিল। এন্‌. এ. এ. সি. পি 'ক্রাইসিস'-এর আর্থিক দায়িত্ব নেন নি। কথা ছিল এইমাত্র যে, মাসিক ঘাটতি পঞ্চাশ ডলারের বেশি না হলে সংগঠন তা পূরণ করতে রাজী আছেন। ডুবয়ের পরিচালনা গুণে সংগঠনকে কখনই ঘাটতি পূরণ করতে হয়নি। ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত সংগঠন ডঃ ডুবয়ের ভাতা আর অফিস খরচের একাংশ বহন করেছিল। তারপর 'ক্রাইসিস্‌'-এর প্রচারসংখ্যা বাড়ে, 'ক্রাইসিস্‌' সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভর হয়ে ওঠে। 'ক্রাইসিস্‌'-এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণই ছিল ডক্টর ডুবয়ের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির জনপ্রিয়তা। এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে নিগ্রো সমাজকে রাজনৈতিক চেতনা দানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি বিশেষ বিশেষ প্রার্থীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করতে থাকেন।

১৯১১ সালে ডুবয় সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর মনে হয় যে, এই দলের সদস্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অন্য দলের প্রার্থীকে সমর্থন জানানো পার্টির নীতি-বিরুদ্ধ। অথচ এ না করলে, তা হবে "নিগ্রো

সমাজের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। অন্তত আংশিকভাবেও তাদের ভোটের জোর যার পেছনে নেই এমন কোনো লোক হোয়াইট্ হাউসে যাবে, এ পরিস্থিতি তাদের পক্ষে বিপজ্জনক।" এই সংকটের তাড়নায় ডঃ ডুবয় সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। রাজনৈতিক ভাবে নির্দলীয় যে ভূমিকা তিনি এই সময়ে গ্রহণ করেন, সেই ভূমিকাই তিনি প্রায় সারা জীবন বজায় রেখেছিলেন। ১৯৪৮ সালে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন: "আমার এই পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি প্রথমেই দেখতে পাই যে এই কার্যকলাপ আমার চিন্তা ও কর্মে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশই গ্রহণ করেছে। নিগ্রো সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং পৃথিবীর কাছে নিগ্রো সমাজের সত্যস্বরূপ উন্মোচনের যে-প্রয়াস আমার মূল প্রয়াস, এ সবকিছুই তারই অঙ্গমাত্র। অথচ এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমার পুরনো দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে। আমি আগে ভাবতাম যে, সামাজিক কর্মকাণ্ডের সমগ্রতা থেকে রাজনীতিকে একেবারে নির্বাসন দিতে হবে। এখন আমি যথার্থতর এক ধারণায় পৌঁছেছি যে, রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি অর্থনৈতিক, এবং তা হবেই।"

১৯১২ সালেই কিন্তু ডুবয় "বিপজ্জনক" বলে সরকারী মহলের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছেন। এই বছরই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-প্রার্থী থিয়োডোর রুজভেল্ট জোয়েল স্পিঙ্গার্নকে সতর্ক করে দেন, "ঐ ডুবয় লোকটা" সম্পর্কে সাবধান থাকতে বলে দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে স্পিঙ্গার্নের চেষ্টা সত্ত্বেও ডুবয়কে নিগ্রো সৈনিকদের সর্বাঙ্গীন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না—সরকারী বাধা ও সতর্কতাকে কিছুতেই নাড়া দেওয়া যায় না। স্পিঙ্গার্ন যুদ্ধে গেলেন, ডুবয় 'ক্রাইসিস্'-এর সম্পাদনা নিয়ে রয়ে গেলেন।

১৯০০ সালে মার্কিন সরকারের প্রদর্শনীর সঙ্গে ডুবয় প্যারিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে লণ্ডনে গিয়ে তিনি এক প্যান্-আফ্রিকান সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯১১ সালে লণ্ডনে সর্বজাতিবর্ণ কংগ্রেসে মার্কিন বিভাগের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদকরূপে তিনি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে দু-বার বক্তৃতা দেন। ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন যখন ভার্সাই যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, ডুবয় তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন: "আন্তর্জাতিক শান্তি কংগ্রেস জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে কি নেই, বিবেচনা করতে যাচ্ছেন। 'শাসিতদের সম্মতি' ও 'প্রতিনিধি মারফৎ দেশ শাসনের' নীতির

প্রবক্তা এক জাতির প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এই জাতি আমাদের জাতি। এই জাতির অন্তর্গত ১২০ লক্ষ মানুষের শাসিত হওয়ার ব্যাপারে কখনও কোনো সম্মতি প্রার্থনা করা হয় নি। যে সব রাজ্যে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে আইনপরিষদে তাঁদের কোনো সদস্য নেই, জাতীয় কংগ্রেসে তাঁদের একজনও প্রতিনিধি নেই।" এই বছর নিউইয়র্কে সিটি ক্লাবে এক ভোজসভায় ডুবয়ের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এন্. এ. এ. সি. পি.-র শাখা সমূহের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি রৌপ্য কাপ উপহার দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালে ডক্টর ডুবয়ের উদ্যোগে প্যারিতে প্রথম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পনেরোটি দেশের সাতান্ন জন প্রতিনিধি মিলিত হয়ে লীগ অফ্ নেশন্‌স্-এর কাছে আফ্রিকান জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি দেবার দাবি জানান। দু'বছর পর দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় আরো ব্যাপকরূপে। ১৯২৩ সালে লণ্ডন ও লিসবনে প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। ঘটনাক্রমে ডুবয় লাইবেরিয়ায় রাষ্ট্রপতি কিং-এর শাসনভার গ্রহণের অনুষ্ঠানে মার্কিন সরকারী প্রতিনিধি হবার সুযোগ পেয়ে যান। ডুবয় ফিরে এসে রাষ্ট্রপতি কুলিজকে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণী শোনান, আফ্রিকার উপকারার্থে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন—"তিনি খুব ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন; আমি যা বললাম, তার কিছু বুঝেছিলেন কিনা, আমি অবশ্য নিশ্চিত নই। তিনি আমার পরামর্শের কিছুই গ্রহণ করেন নি।"

যুদ্ধান্তে দেখা গেল, এন্. এ. এ. সি. পি.-র সঙ্গে ডক্টর ডুবয়ের মতবিরোধ ক্রমশই বাড়ছে। স্পিঙ্গার্নও আর পুরোপুরি ডুবয়ের সঙ্গে নেই। ডুবয় ১৯২৮ সালে সোভিয়েত সফরে গেলেন, ফিরে এলেন এই গভীর বিশ্বাস নিয়ে যে, "সমাজতন্ত্রই প্রগতির একমাত্র পথ।" ১৯৩৪ সালে এন্. এ. এ. সি. পি. 'ক্রাইসিস্' সম্পাদকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে উদ্যোগী হলে ডক্টর ডুবয় সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আবার আটলাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-কর্মে ফিরে এলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি দীর্ঘ সফরে আবার জর্মনি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাপান ও হাওয়াই ঘুরে স্বদেশে ফেরেন। এদিকে ডুবয় লক্ষ্য করেছিলেন যে, নিগ্রো বুদ্ধিজীবী সমাজের বৃহদংশই শ্বেতাঙ্গ বিত্তশালী সমাজের শোষণ ও ব্যক্তিগত লাভের মৃগয়ায় সর্ব নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের ঢেলে দিচ্ছেন। 'দ্য ক্রাইসিস'-এর পাতায় তিনি এ সম্পর্কে বহুবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এবার আটলাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি আরেক নতুন

পরিকল্পনা রচনা করেন—আটলান্টা বিশ্ববিত্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ এবং সব কটি নিগ্রো কলেজের যৌথ সমাজসমীক্ষা তথা কার্যত আত্মোপলব্ধির পরিকল্পনা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কুটিল রাজনীতিতে বয়ঃসীমার অজুহাতে ১৯৪৪ সালে ডক্টর ডুবয়ের চাকরি গেল, তিনি আবার নিউ ইয়র্কে ফিরলেন এন্. এ. এ. সি. পি.-র বিশেষ গবেষণা বিভাগের প্রধানরূপে।

১৯৪৫ সালে মার্কিন প্রতিনিধিদলের অন্যতম উপদেষ্টারূপে ডক্টর ডুবয় সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোয় জাতিসংঘে আসেন। তাঁর চেষ্টা ছিল, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত জনসাধারণের উল্লেখ যুক্ত করা। ১৯৪৫ সালের ১৬ই মে তারিখে তিনি লেখেন: "এই মানুষগুলি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকার অর্থই এই যে, স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক নন বলেই এঁদের বাদ রেখে দেওয়া হল, এবং তাঁদের মুক্তি ও সুখ--স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন তাঁদের মালিক দেশগুলির ইচ্ছামাফিক বিবেচিত হবে, সচেতন বিশ্ব-জনমতের দাবিতে নয়।" জন ফস্টার ডালেস্ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উদাসীনতায় ডক্টর ডুবয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে এই বছর পঞ্চম প্যান্-আফ্রিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; সভাপতিত্ব করেন ডক্টর ডুবয়; প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন নক্রুমা, কেনিয়াট্টা প্রমুখ আফ্রিকান নেতৃবৃন্দ। লণ্ডনের স্কুল অফ্ একনমিক্‌স্-এ অতিথি লেকচাররূপে তিনি অধ্যাপক ল্যাস্কির সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

১৯৪৪ সালে ডক্টর ডুবয় আরো সক্রিয় রাজনীতির দিকে এগোতে থাকেন। প্রোগ্রেসিভ পার্টি ও হেনরি ওয়ালেসের সঙ্গে তিনি কাজ করতে থাকেন। এই অপরাধে এবং উগ্রপন্থী হওয়ার অভিযোগে (অবশ্য পরোক্ষভাবে) এন্. এ. এ. সি. পি. থেকে তিনি বরখাস্ত হন ১৯৪৮ সালে। আরো কিছুদিন বিনা বেতনে তিনি প্রোগ্রেসিভ পার্টির সঙ্গে কাজ করে চলেন। মাঝে এমন অবস্থাও আসে যে: "মনে হল, আমি আর লেখাপড়া বোধ হয় চালাতে পারব না।" হেনরি ওয়ালেসের প্রগতিশীল ভাবধারা ত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়ে ডুবয় এই পার্টি ত্যাগ করেন।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শান্তি সমাবেশের অন্যতম আহ্বায়করূপে ডক্টর ডুবয় বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে যোগ দেন। এপ্রিলে প্যারির বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসেও ডক্টর ডুবয় মার্কিন প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। বিপুল বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে ডক্টর ডুবয় এই কংগ্রেসে বলেন: "যে সব মতপার্থক্য

থেকে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, সমাজতন্ত্রের প্রসার বা কমিউনিজম্‌-এর সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রসার তার প্রকৃত কারণ নয়। সমাজতন্ত্র সারা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ব্যতিক্রম নয়।···সমাজতন্ত্রের এই প্রসারের বিরুদ্ধে যে একটি আধুনিক ব্যবস্থা লড়াই করে চলেছে, তার নাম ঔপনিবেশিকতাবাদ। এই ঔপনিবেশিকতাবাদ অতীতে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ থেকেছে, আজও আছে, চিরকাল থাকবেও।···আমার পিতা-পিতামহের শ্রম ও রক্তে গড়া আমার মাতৃভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ এই নতুন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহান্‌ দেশ, ঈশ্বরের কৃপায় সমৃদ্ধ, তার সাধারণতম নাগরিকদের কঠোর শ্রমে সমৃদ্ধতর।···মানুষের যে দাসত্ব একদিন আমাদের কাল হয়েছিল, শক্তির মদমত্ততায় সেই একই দাসত্বের ফাঁসে বেঁধে আমরা দুনিয়াকে নরকের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সর্বনাশা এক তৃতীয় মহাযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" জুলাই মাসে লাইনাস পাউলিঙ প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ডক্টর দুবয় অন্যতম আহ্বায়করূপে বিশ্বশান্তির জন্য মার্কিন মহাদেশের কংগ্রেস আহ্বান করেন। অগস্টে তিনি মস্কোয় নিখিল সোভিয়েত শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৫০-এর এপ্রিলে তিনি প্যারিতে শান্তিকর্মীদের বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ দেন। স্টক্‌হোম আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের সূত্রেই যে শান্তি-সংবাদ কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হন দুবয়। দুবয় পরে সবিনয়ে বলেন, "আমি সভাপতি হলাম এই সহজ কারণে যে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমি শিখেছিলাম, কোনো কমিটি বা একদল লোককে একত্র করে কাজ চালানোর নিয়মকানুনে জড়িয়ে না পড়ে কাজ সমাধা কী ভাবে করাতে হয়। আর আমার নাকি অভ্যাস ছিল যে, আমি সময়ে চলি, আর মধ্যরাত্রির আগে সভা মুলতুবী রাখতে জানি।" সাত মাস স্থায়ী ছিল এই শান্তি-সংবাদ কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে দুবয়ের সহকর্মী ছিলেন পল রোবসন, শার্লি গ্রাহাম, অ্যালবার্ট কান প্রমুখ। এই কেন্দ্র এই সাত মাসেই বিভিন্ন দেশে যুদ্ধপ্রস্তুতি ও শান্তি-আন্দোলনের খবরাখবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার করেন স্টকহোম্‌ আবেদন পুনর্মুদ্রণ করে আড়াই কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করে।

ওদিকে ডক্টর দুবয় তখন আরো একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৮ সালে এন্‌. এ. এ. সি. পি. থেকে বরখাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাউন্‌সিল অন্‌

আফ্রিকান অ্যাফায়ার্সের আহ্বানে এই সংগঠনের অবৈতনিক সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। বেতন না থাকলেও কাউন্সিল দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ডক্টর ডুবয়ের জন্য একটি অফিস ও একজন সেক্রেটারি যোগাবার। ঐ সুযোগটুকু নিয়েই ডক্টর ডুবয় কাজ করতে থাকেন। সংগঠনের অর্থবল কিন্তু নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ১৯৫০ সালে ডক্টর ডুবয় নিজেই বলেন যে, তাঁর অফিসের ভাড়া ও কেরানীর মাইনের ভার থেকে তিনি সংগঠনকে মুক্ত করতে চান। কর্মকর্তারা পাল্টা প্রস্তাব দিলেন, তাঁরা ১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ডক্টর ডুবয়ের তিরাশীতম জন্মবার্ষিকী পালন করতে চান; এই উপলক্ষে সংগৃহীত তহবিল থেকে যা বাঁচানো যাবে, তাতে ডুবয়ের অফিসের খরচ বেশ কিছুকাল মেটানো যাবে, এবং তাঁর রচনাবলীর প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 'বিরক্তি সত্ত্বে'ও সংগঠনের মুখ চেয়ে ডক্টর ডুবয় রাজী হলেন। এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন আইনস্টাইন, ল্যাংস্টন হিউজ, লায়ন ফিউখট্‌ওয়াঙ্গার, টমাস মান, অ্যালেন লক, ডক্টর ফ্রাংক্‌লিন ফ্রেজিয়ার প্রমুখ।

২৩শে ফেব্রুয়ারি জন্মোৎসব, আর ৯ই ফেব্রুয়ারি আরো একটি উপলক্ষ। আগের বছর ডক্টর ডুবয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ডক্টর ডুবয় বলেন, "আমার তখন বড় একা লাগে, ছেলেবেলার এত বন্ধু মারা গেছে। আর আমার নিজের কী এক অযৌক্তিক সঙ্কোচের কারণে আমার কখনই বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধু জোটে নি। কিন্তু এক তরুণী ছিলেন—সাহিত্যের ব্যাপারে আর জীবনের দুর্যোগে আমি বহু বর্ষ তার ফাদার কনফেসর থেকেছি, বিশেষত পনেরো বছর আগে তার বাবার মৃত্যুর পরে। আমি তার কষ্টের কথা জানতাম, আমি তার সাফল্যে আনন্দ পেয়েছি। শার্লি গ্রাহাম তার সেই আশ্চর্য শহীদের মন নিয়ে নিজেকে শেষে বোঝাল যে তার সাহায্য ও সঙ্গ আমার দরকার; সত্যিই দরকার ছিল। আমরা তাই স্থির করলাম, আমার পরের জন্মদিনের দিন কয়েকের মধ্যেই আমরা বিবাহ করব।" ৯ই ফেব্রুয়ারি দিন স্থির ছিল; সেই বিবাহের যা-কিছু সামান্য প্রস্তুতি, আংটি, বিবাহের লাইসেন্স ইত্যাদির কাজ সমাধা হল। আঁরির রেস্তোরাঁয় ডক্টর ডুবয় ও শ্রীমতী গ্রাহাম একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজ সারলেন (শ্রীমতী শার্লি গ্রাহাম বলেন: "ফরাসী রেস্তোরাঁ ডব্লু. ই. বি.-র সব সময়ই পছন্দ। ওয়েটাররা তাঁকে ভালোবাসে, কারণ তিনি ফরাসী ভাষায় তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তাদের কথা মন দিয়ে শোনেন, তাদের সুপারিশ মেনে নেন।") ডুবয় অফিসে চলে গেলেন। শ্রীমতী গ্রাহাম বাড়ি ফিরে এলেন।

রাত সাড়ে নটায় ডক্টর ডুবয়ের ফোন এল—শান্তি সংবাদ কেন্দ্র ও তার সভাপতি ডক্টর ডুবয়-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে; অভিযোগ—কেন তাঁরা বিদেশী সংগঠনের দালাল বলে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রি করান নি। মামলা মানেই হয়তো জেল। শ্রীমতী গ্রাহাম আবার ফোন করলেন, "আমাদের পুরনো পরিকল্পনা ভেঙে দিতে হবে। আমাদের এখনই বিয়ে করতে হবে।" শ্রীমতী গ্রাহাম লিখেছেন, "উনি জেলে গেলে একমাত্র স্ত্রীই সেখানে প্রবেশাধিকার পাবে। উনি জেলে থাকলে, একমাত্র স্ত্রীই ওঁর কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। ওঁর পাশে দাঁড়াবার সুযোগ আমায় করে নিতেই হবে—আমার মনে হল, এটা অপরিহার্য।" ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল—বিনা আড়ম্বরেই। পরের দিনই তাঁরা ওয়াশিংটন রওয়ানা হলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁরা ওয়াশিংটনে কোর্টে হাজিরা দিলেন। প্রথমে শুনানীর দিন স্থির হল, তারপরেই ডুবয়ের হাতে হাতকড়া পরানো হল (পরে অবশ্য অ্যাটর্নির প্রতিবাদে এই হাতকড়া খুলে দিতে হয়), এক হাজার ডলারের জামিনে শেষে তিনি মুক্তি পেলেন।

জামিনে মুক্ত হয়ে এসেই ডক্টর ডুবয় এসে পড়লেন আরেক নতুন আন্দোলনের মধ্যে—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবীতে জাতীয় আন্দোলনে। ওদিকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি খবর এল, যে হোটেলে ডুবয়ের জন্মোৎসবের ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা বাতিল করে টাকা ফেরত দিচ্ছেন। উদ্যোক্তারাও কেউ কেউ পিছিয়ে গেলেন। তখন হার্লেমের বিখ্যাত স্মলস্ প্যারাডাইসে নতুন করে আয়োজন হল। এখানকার মালিক রাজী ছিলেন, এমন এক প্রয়াসে যে-কোনো ক্ষতি স্বীকার করে নিতে। ৭০০জন লোক চাঁদা দিয়ে এই সভায় যোগ দেন—৬,৫৫৭ ডলারের তহবিল ওঠে। ডক্টর ফ্রাংকলিন ফ্রেজিয়ার সভাপতিত্ব করেন। রোবসন ভাষণ দেন। বার্নাল, আইভর মণ্টেগু, হিউলেট জনসন, জোলিও কুরী, এহ্রেনবুর্গ, ফাদেইয়েভ, তিখোনভ, শোশটাকোভিচ, লুকাক্স্, নেন্নি, গাব্রিয়েল দ্য আরবুসিয়ে, আর্নল্ড্ ৎসোয়াইগ, মেরী ওভিংটন, হিউবার্ট ডেলানি, ল্যাংস্টন হিউজ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের অভিনন্দন পাঠ করে শোনানো হয়।

সারা দেশ ঘুরে ডুবয় দম্পতি জনমত গড়বার চেষ্টায় নামেন, অসংখ্য সভা সমাবেশে সরকারী অপচেষ্টাসমূহকে প্রতিহত করে তাঁদের বক্তব্য রাখতে থাকেন। মামলা লড়বার টাকা চাই, তাছাড়া, "আমরা উপলব্ধি করি যে

এই বিচার আইনের বিচার নয়, রাজনৈতিক নিপীড়ন; এর ফলাফল তাই জনমতের উপরেই নির্ভর করবে।" দেশের মধ্যে প্রচার চলে, দেশের বাইরে থেকেও পত্রাদি আসতে থাকে। ডক্টর ডুবয়ের সমর্থনে একটি আন্তর্জাতিক কমিটিও গঠিত হয়। ডক্টর ডুবয় ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে মামলা পরিচালনার ভার নেন আইনজীবী কুমারী গ্লোবিয়া অ্যাগ্রিন ও ভিটো মার্ক্যাণ্টোনিয়ো—উভয়েই বিনা পারিশ্রমিকে। ডক্টর ডুবয়ের সপক্ষে "যা-কিছু করা সম্ভব" করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। দীর্ঘ বিচারের পর প্রমাণাভাবে নভেম্বর মাসে ডক্টর ডুবয় ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ নির্দোষ ঘোষিত হন। ৮৩ বছরের বৃদ্ধ উইলিয়ম এড্ওয়ার্ড ডুবয় এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সহ্য করেও আন্দোলনের পথ ছাড়েন নি।

অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ডক্টর ডুবয় ক্রমেই তাঁর পুরনো অরাজনৈতিক নির্দলীয় অভিযানের পথ ছেড়ে মার্কসবাদের কাছে সরে এসেছেন, শেষে কমিউনিস্ট পার্টির উপর চরম অগণতান্ত্রিক সরকারী নিষ্পেষণের মধ্যেই ১৯৫৯ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পুরনো লেখা পড়লে বোঝা যায় যে, তাঁর ধারণা কী ভাবে বদলেছে, এবং প্রগতির পথ ধরেই। ১৯৬০ সালে ঘানা সরকারের আমন্ত্রণে ঘানার জাতীয় তথ্যকোষ রচনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি আক্রায় আসেন, ঘানার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের স্বার্থে যাঁর জীবনব্যাপী আন্দোলন, সেই ক্লান্ত যোদ্ধাকে নবোত্থিত ঘানার সরকার যে সম্মান দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল।

আক্রাতেই গত ২৭শে অগস্ট ডক্টর ডুবয়ের জীবনাবসান হল। সেই দুঃসংবাদ যখন আমেরিকায় পৌঁছয়, তখন ওয়াশিংটনের ২৮শে অগস্টের স্মরণীয় শোভাযাত্রার যাত্রা শুরু হচ্ছে। যাত্রার শুরুতে আড়াই লক্ষ শোভাযাত্রী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নীরবে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়। একের পর এক বক্তা তাঁর কাছে এই আন্দোলনের ঋণ স্বীকার করেন। নিগ্রো নাট্যকার ওসি ডেভিস সেই জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, "এই আন্দোলন তাঁরই রচনা।"

রুদ্র সেনগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল ও শেক্সপীয়র

এই উনিশশো তেষট্টি সাল জুড়ে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় এবং অন্যত্র দ্বিজেন্দ্র শতবর্ষপূর্তি-উৎসব উদযাপিত হল। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলার এই কৃতী সন্তানের কাছে আমাদের ঋণ এখনো বহুলাংশে রয়ে গেছে। এ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকীর্তির যেটুকু মূল্যায়ন হয়েছে তা নিতান্তই সামান্য। ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে কবি এবং স্যাটায়ারিষ্ট দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে প্রশংসনীয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বিশেষ কোথাও উল্লেখযোগ্য আলোচনা চোখে পড়ে নি। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার পরিপূর্ণ আলোচনা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁর নাটকের একটি বিশেষত্বের পর্যালোচনা। সেই বিশেষ দিকটি হল দ্বিজেন্দ্রলালের শেক্সপীয়র-মনস্কতা।

বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করা হয়েছে প্রায় শুরু থেকেই। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ প্রাক্-দ্বিজেন্দ্র যুগের প্রত্যেক নাট্যকারের রচনাতেই শেক্সপীয়রের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। এঁদের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের কথা স্মরণ রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই শেক্সপীয়রের প্রভাব সর্বাধিক সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ।

শেক্সপীয়রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই। শেক্সপীয়রের নাটক তিনি বারবার পড়তেন এবং "যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হত, মুখস্থ করতেন।" ইংলণ্ডে যাওয়ার পর এই আকর্ষণ আরও গভীর হয়ে ওঠে। মহাকবির জন্মভূমিতে গিয়ে তাঁর সমাধি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ বাঙ্গালী কবি আবেগকম্পিত কণ্ঠে যা বলেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে প্রণিধান-যোগ্য: "ঘুমাও কবিবর! যেখানে ইংরাজি ভাষা বিদিত সেখানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না।···দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান

তোমাকে ভারতীর বরপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।"[১] এই প্রতিশ্রুতি পালনের চিহ্ন দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাধনার সর্বস্তরে পরিস্ফুট। শেক্সপীয়রের সঙ্গে বাল্যাবধি গড়ে ওঠা এই সুগভীর পরিচিতির ছাপ তাঁর নাটকে স্বপ্রকাশ। নাটকের ভাষা, ঘটনা-সংস্থাপনা, আংশিক বা সামগ্রিক চরিত্র-পরিকল্পনা, মায় ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনাতেও মহাকবির প্রভাব সুস্পষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লেখা শুরু করেন শেক্সপীয়রের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। 'তারাবাঈ' প্রকাশিত হবার পর নবীনচন্দ্র তাঁকে পরামর্শ দেন যে এই নতুন ধরনের অমিত্রাক্ষরে মাইকেলের ছন্দোমাধুরী নেই। সুতরাং গদ্যে নাটক রচনাই বিধেয়। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের "মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষর নাটক এখন চলিতে পারে না। তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিস। সেই জন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম।"[২] নিঃসন্দেহে অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ভিত্তিহীন। শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে এলিয়টের কাব্যনাট্য তার প্রমাণ। আসল কথা দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর নাটকের প্রয়োজন মেটাতে পারে নি। যাই হোক্ তিনি এখন থেকে গদ্যে নাটক লেখা শুরু করলেন। কিন্তু পরবর্তী নাটকসমূহের বহু স্থানে তাঁর গদ্য (যেমন 'সাজাহান' নাটকের ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে সাজাহানের স্বগতোক্তি) কাব্যাশ্রয়ী। এবং অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যের এই কাব্যময়তার উৎস সম্ভবত শেক্সপীয়রের ভাষা নিয়ে তাঁর প্রথম দিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ভাষার ব্যাপার ছাড়া বিভিন্ন ঘটনা-সংস্থাপনার ক্ষেত্রেও শেক্সপীয়রের কাছে দ্বিজেন্দ্রলাল ঋণী। 'ভীষ্ম' নাটকের শান্ব-সত্যবতীর দৃশ্যটি (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) নিঃসন্দেহে 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রভাবে রচিত। 'তারাবাঈ' নাটকের সূর্যমল ও তমসার কাহিনী 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুসরণে পরিকল্পিত। ম্যাকবেথের ডানকানপ্রীতির মতো সূর্যমলের চরিত্রেও রয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য বাৎসল্য। আবার ম্যাকবেথের মতোই সূর্যমল রাজ্যলোভকে অস্বীকার করতে পারছে না। এই লোভকে উইচ্‌দের মতো চারণীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রজ্জলিত করে তুলেছে। আবার সূর্যমল-পত্নী তমসা

যখন স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কার্যকর করে তোলার প্ররোচনায় প্রয়াসী তখন আমাদের লেডি ম্যাকবেথের কথা মনে পড়ে যায়। 'নূরজাহান' নাটকের লায়লা চরিত্রের সঙ্গে 'হ্যামলেট' নাটকের নায়কের অবস্থাগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। পিতৃহন্তাকে যে তার মা বিবাহ করেছে হ্যামলেটের মতো লায়লার কাছেও তা অসহ্য। হ্যামলেটের মতোই সে তার মাকে সমালোচনা করেছে এবং পিতৃহন্তাকে ধ্বংস করার শপথ নিয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে পরবর্তী কালের লায়লা—যার নারীত্ব অন্যান্য সবকিছুর উপরে—হ্যামলেটের থেকে অনেক পৃথক এবং দুর্বল। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। উপরোক্ত নাটকগুলি রচনাকালে দ্বিজেন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। ফলত এদের সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকগুলির সাদৃশ্য নিতান্তই অবস্থাগত এবং বহিরঙ্গ।

ভাষা বা ঘটনা-সংস্থাপনার থেকে দ্বিজেন্দ্র-নাটকের চরিত্রাবলী অধিকতর শেক্সপীয়র প্রভাবপুষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাধিক প্রিয় লীয়ার চরিত্রের ছায়া তাঁর বহু চরিত্রেই লক্ষণীয়। 'মেবারপতন'-এর গোবিন্দসিংহ, 'সিংহল-বিজয়'-এর সিংহবাহু এবং 'পরপারে'-র বিশ্বেশ্বর প্রমুখ চরিত্রের সঙ্গে লীয়ারের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। লীয়ারের পরেই দ্বিজেন্দ্রলালের ঋণ হ্যামলেটের কাছে। হ্যামলেটের প্রভাব লায়লার চরিত্র ছাড়া 'সিংহল-বিজয়' নাটকের কুবেণী চরিত্রের উপরেও পড়েছে। সূর্যমল, তমসা প্রভৃতি চরিত্রের উপর অন্যান্য শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের প্রভাবের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই শেক্সপীয়রের সাহায্য নিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে সমধর্মী চরিত্রের মুখে শেক্সপীয়রের চরিত্রের সংলাপের প্রায় বঙ্গানুবাদ জুড়ে দিতেও ইতস্তত করেন নি। তাই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অপমানিতা মুরাকে যখন বলতে শুনি :

> "শূদ্রাণী! শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই?"[৩]

তখন শাইলকের অনুরূপ সংলাপ :

> "I am a Jew. Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?"[৪]

সহজেই স্মরণে আসে।

চরিত্র পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা আংশিক ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল-সৃষ্ট কয়েকটি প্রধান চরিত্র 'প্রায় আগাগোড়া শেক্সপীয়রের কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। 'সাজাহান' নাটকের দিলদার ও সম্রাট সাজাহান এবং 'নূরজাহান' নাটকের নূরজাহান পুরোপুরি শেক্সপীয়র-নির্ভর চরিত্র। দিলদার চরিত্রের সঙ্গে 'কিং লীয়ার'-এর ফুল-এর মিল বড় অল্প নয়।' এমন কি কখনো কখনো দিলদারের সংলাপ শেক্সপীয়রের ভাষান্তর মাত্র। তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল শেষরক্ষা করতে পারেন নি। "দিলদার চরিত্রটি ক্রমশই তার রহস্যময় দ্বৈত ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে—'কমিক' উপাদান ধীরে ধীরে শূন্যতায় মিলিয়ে গিয়ে একটি 'সিরিয়াস' চরিত্রেই পরিণত হয়েছে। রাজা লীয়রের 'ফুল' শেক্সপীয়রের অনবদ্য সৃষ্টি—দ্বিজেন্দ্রলাল···তার ছায়ায় দিলদারকে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাটকের মাঝখানেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।"[৫] সাজাহান চরিত্রের পরিকল্পনা পুরোপুরি লীয়ারের চরিত্রানুগ। সাজাহানের অবস্থাগত মিল (সন্তানের কৃতঘ্নতা), নিদারুণ ট্র্যাজেডির সামনে নিষ্ক্রিয়তা, উন্মাদ হয়ে নিজের আক্রোশ ও অভিশাপ রুদ্র প্রকৃতির মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া—এসবই লীয়ারের চরিত্রানুসরণে পরিকল্পিত। 'সাজাহান'-এর পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য তো 'কিং লীয়ার'-এর Storm scene-এরই ভাবানুবাদ! সাজাহানের নিষ্ফল চিৎকার—"ইচ্ছা কৰ্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই।···মেঘ! বারবার কি নিস্ফল গর্জ্জন কৰ্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ থান থান করে দিতে পারো?" (৫।৩)—Storm scene-এ লীয়ারের আর্তির প্রতিধ্বনি। কিন্তু সাজাহান বা দিলদার চরিত্রের চেয়ে নূরজাহান চরিত্রে শেক্সপীয়রের প্রভাব অনেক বেশি সার্থক হয়েছে। শেক্সপীয়র যে ধাতুতে লেডি ম্যাকবেথকে গড়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ধাতুতেই নূরজাহানকে গড়েছেন। দু-জনেরই ট্র্যাজেডির বীজ চরিত্রের ভেতরে নিহিত, বাইরের ঘটনা থেকে সৃষ্ট নয়। নূরজাহানের শেষ অবস্থা sleep-walking scene-এর লেডি ম্যাকবেথকে স্মরণ করায়।

শেক্সপীয়রের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের ঋণ চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকবির বহুবিধ নাটকীয় device দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিভিন্ন নাটকে অসঙ্কোচে কাজে লাগিয়েছেন। 'সিংহল-বিজয়' নাটকে লীলার বালকের

ছদ্মবেশ ধারণ নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় Sex-concealment device দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'সাজাহান'-এর পঞ্চমাঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যে ঔরংজীবের hallucination-এ —"দারার ছিন্ন শির", "সুজার রক্তাক্ত দেহ", "মোরাদের কবন্ধ"—ম্যাকবেথের ছায়াছবি বা ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাদর্শন, কিংবা হ্যামলেটের প্রেতাত্মা-দর্শন দৃশ্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি সঙ্গীতের ব্যবহার বাংলা নাটকে নতুন না হলেও এর নাটকীয় সম্ভাবনাকে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো এত সুন্দরভাবে কেউই কাজে লাগাতে পারেন নি। প্রাক্-দ্বিজেন্দ্র যুগের নাটকে প্রায়শই গানের একচেটিয়া মালিকানা ছিল 'বিবেকে'র বা 'নিয়তি'র বা এদের প্রতিভূর। দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম গানকে সার্থকভাবে নাটকীয় করে তোলেন। তাঁর নাটকে গান সংলাপের কাজ করে, নিছক গানই থাকে না। এই ব্যাপারেও শেক্সপীয়র দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রভাবিত করেছেন বললে তা নিছক কষ্টকল্পনা হবে না।

এতাবৎ দ্বিজেন্দ্র-নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির যে সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি তা নিতান্তই বহিরাশ্রয়ী। দু-জনের মধ্যে প্রকৃত মিল উভয়ের ট্র্যাজেডির সমধর্মিতায়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বলেছেন, "অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকেই দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ উঠাইতে না পারিলে বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণি ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করতে পারেন না।"[৬] এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির প্রাণবস্তুস্বরূপ এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সার্থক নাটকের প্রকৃত শক্তি আহরণ করেছেন। তাঁর নাট্যসাধনার শুরু থেকেই এই বিশেষ গুণটি আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। 'তারাবাঈ' নাটকে সূর্যমল-তমসার কাহিনী শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির তারে বাঁধা। অবশ্য মাঝপথেই সূর্যমল চরিত্রটি অতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তমসা অতি-নাটকীয়তার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তি অনেক বেশি সংহত হয়ে ওঠে। এই সময় রচিত 'সাজাহান' নাটকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক রীতির প্রয়োগ সার্থকতর এবং অধিকতর শিল্পসম্মত। 'নূরজাহান' নাটকে ঘটে তাঁর শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। এই নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন, "নূরজাহান···নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি।" নিঃসন্দেহে 'নূরজাহান' নাটকটি এই প্রতিশ্রুতি পালনের স্বাক্ষর। যেভাবে আদিম প্রবৃত্তির ক্রিয়াচঞ্চল রূপ এখানে দেখানো হয়েছে এবং চরিত্রের ভেতর থেকেই

ট্র্যাজেডিকে উৎসারিত করা হয়েছে তাতে নাটকটিকে নির্দ্বিধায় শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির সমধর্মী বলে মেনে নেওয়া যায়। গতিবেগের তীব্রতা ও অনিবার্যতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনায় 'নূরজাহান' বাংলাদেশের শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির প্রথম সার্থক রূপায়ন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মহাকবির থেকে অনেক নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ঋণ শুধু অনুকরণমাত্র নয়। তাঁর সার্থক নাটকগুলি পড়ে কখনো একথা মনে হয় না যে যা দেখছি বা শুনছি তা অভারতীয়। শেক্সপীয়রের বিরাট প্রভাব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে রেনেসাঁ জীবনদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় জীবনদর্শনের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই 'সাজাহান' নাটকে নিদারুণ ট্র্যাজেডির মুখোমুখি দিলদারকে বলতে শুনি, "তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝতে পার্চ্ছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। নইলে এতখানি মিথ্যা এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে?" সাজাহানের ট্র্যাজেডি শেক্সপীয়রীয়: দিলদারের দার্শনিকতা ভারতের একান্ত নিজের। 'পরপারে' নাটকেও বিশ্বেশ্বর চরিত্র গড়ে উঠেছে লীয়ারের ছায়া অবলম্বনে, কিন্তু তার mysticism নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যসম্মত। দ্বিজেন্দ্রলালের শেক্সপীয়র-মনস্কতা কোনো মতেই শুধুমাত্র নকলনবিশী নয়। যাঁরা তাঁকে শেক্সপীয়রের বাঙ্গালী সংস্করণ ছাড়া আর কিছু মনে করতে রাজী নন তাঁরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বুঝবেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি সুদূর স্ট্র্যাটফোর্ডে থাকলেও তাঁর হৃদয়ের যোগ ছিল বাংলার মাটির সঙ্গে। এবং সেইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় গৌরব।

১। বিলাত-প্রবাসী [বিলাতের পত্র]; ১৬ নং চিঠি।

২। 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

৩। চন্দ্রগুপ্ত—প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

৪। Merchant of Venice—তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়।

৬। 'নাটকত্ব' (প্রবন্ধ পত্রিকায় পুনঃ প্রকাশিত)—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মিছিলের শহর

কলকাতায় নভশ্চরী, নভশ্চর

ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তানিয়ার সঙ্গে আমার আলাপ হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ছোট্ট রুশী মেয়ে তানিয়া। হাতে একগাছা ফুলের এক সুন্দর তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্টে। হেমন্তের এক সকালবেলা। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে জড়ানো সূর্যের আলো। তারিখটা হল নভেম্বরের একুশে, সাল উনিশশো তেষট্টি।

কিন্তু আলাপ হতেই হয়। কারণ, সে আর তার ভাই সের্গেই, তার বাবা মা আর তারই মতো আরো অনেকের সঙ্গে আমরা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি দমদম বিমানবন্দরে। আকাশের দিকে চোখ উঁচু করে তাকাচ্ছি, কখন সেই এক প্লেনের রূপালী ডানাটা দেখা যায়, যা একটু পরেই আকাশ থেকে নেমে এসে এই শহরের মাটি ছোঁবে, আর তা থেকে নেমে আসবে—কে? কারা?···

আর বলতে হল না, প্লেনের ঘড় ঘড় আওয়াজ কানে আসতেই তানিয়ারা তাদের দলবল নিয়ে এক ছুট দিল ট্যারম্যাকের দিকে, যেখানে

সেই রূপালী পাখিটা এসে নামবে। আর তর সইছে না। কতক্ষণে তার দরজা খুলে যাবে আর বেরিয়ে আসবে সেই তারা। যাদের জন্যে এত অপেক্ষা।

এত অপেক্ষা ছোট্ট তানিয়ার সঙ্গে আমাদের, সকলের, সারা শহরের। নিশ্চয়ই এতক্ষণে শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোকজন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফুল আর তোরণে সেজে মহানগরী অপেক্ষা করছে। অতিথিরা আসবে ঘরে। সেই অতিথি, মাটির মানুষ হয়েও আজ যাদের একমাত্র পরিচয় মহাকাশচারিণী, মহাকাশচারী।

"দোব্রী দেন": এ সম্ভাষণ এখন কলকাতার প্রায় অনেকেরই কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।

"দোব্রী দেন"। হাঁ, সেই প্লেনটা এখন দমদমের মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলে গেল। আর দেখা গেল একখানি হাসিভরা সরল মুখ, এয়ারপোর্টের জনতার দিকে ঘন ঘন হাত-নাড়া ইতিহাসের প্রথমা সেই নারী মহাকাশ-বিজয়িণীর গলা থেকে ভেসে আসা এক টুকরো সম্ভাষণ: "শুভদিন।" আর দেখি, তানিয়া আর তার ছোট্ট রুশী ছেলেমেয়েদের দল ছুটে গিয়ে ভালেন্তিনা তেরেস্‌কোভার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে আসা। আগ্রহে তাদের ছোট্ট ছোট্ট চোখ-মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কলকাতা-প্রবাসী সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের এই ছেলেমেয়েদের। আমাদের অতিথি আর তাদেরই স্বজন মহাকাশবীরেরা এসেছেন এই শহরে। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আর পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী ও বিশিষ্ট অভ্যাগতজনদের ভীড় ঠেলে সবপ্রথম তাঁরাই পৌঁছান ক্যাপ্টেন ভালেন্তিনা তেরেসকোভা-নিকোলায়েভা, তাঁর স্বামী মেজর আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ ও লেঃ কর্নেল ভালেরী বিকোভস্কী ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী শ্রীমতী বিকোভস্কায়ার কাছে। সেই মহাকাচারীত্রয়ীর করমর্দন সেরে ফিরে এল একমুখ খুশিতে ডগমগ হয়ে। তখন তানিয়ার ছোট্ট হাতটুকু ধরে আমিও তাকে না বলে পারলাম না: "খারোশ" (ভালো)। মিটমিটে চোখে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসি আমাকেও সে উপহার দিয়ে যেতে ভুলল না।

তারপর শুরু হয়ে গেল এই মিছিলের শহরে পুরো দুটো দিন ধরে আনন্দ উত্তেজনা আর মহাকাশবীরদের নিয়ে সম্বর্ধনা আর জয়ধ্বনির পালা। এ উৎসব গর্বের, আনন্দের। ভারত সফরে মৈত্রীর জয়যাত্রায় তাঁরা বেরিয়েছেন,

এই সোভিয়েত মহাকাশবীরেরা। আমাদের গর্ব যে, এদেশই প্রথম পেল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরে পর পর পাঁচজন সোভিয়েত মহাকাশচারীকে সম্বর্ধনা জানাতে। আগে এই কলকাতাতেই আমরা পেয়েছিলাম বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী শ্রীয়ুরি গাগারিন-কে। তারপর তিতোফ এ দেশ ঘুরে গেছেন। এবার এলেন এঁরা তিনজন—আর বলাই বাহুল্য যে এবার মধ্যমণি হলেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী শ্রীমতী ভালেন্তিনা। তাঁকেই ঘিরেই এই ক-দিনের উৎসব-উদ্দীপনা যেন আবর্তিত হল। একজন মেয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম বহিরাকাশে পরিক্রমা করে এলেন, তাই সেই সোভিয়েত ভগিনীকে দেখার জন্য আমাদের মেয়েদের উত্তেজনাও যেন বাঁধ ভেঙেছিল।

তাই সবচেয়ে সুন্দর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন মেয়েরা কলকাতায় ইতিহাসের বৃহত্তম নারী সমাবেশে ভালেন্তিনা, নিকোলায়েভ ও বিকোভস্কীকে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। শুরুতেই যেমন "দোব্রী দেন" দিয়ে শুভদিনটির শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল, চললও সারাদিন ধরে তাই-ই, তার পরের দিনটিও। উৎসব-সম্বর্ধনা আর উৎসব। লক্ষ লক্ষ মানুষ কাতারে কাতারে মহাকাশচারীত্রয়ের যাতায়াতের পথের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি জানিয়েছেন, ফুল ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের দিকে। প্রথম যেদিনটিতে তাঁরা শহরে এলেন সেদিনটি থেকে তাঁদের চলে যাওয়ার দিনটি পর্যন্তও এই অবিরাম উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। তাঁদের আসার দিনটির সেই একটি কথা মনে আছে। মহাকাশচারীদের নিয়ে মোটর-কনভয় দমদম বিমানঘাঁটি থেকে শহরের দিকে চলতে শুরু করেছে। যশোর রোডের উপর পড়ল অনেকগুলি স্বাগতম-তোরণ। কোনোটি বা পাড়ার মানুষদের, কোনোটি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির, কোনোটি বা রক্তপতাকা-সাজানো কমিউনিস্ট পার্টির। তার সঙ্গে তেরঙা জাতীয় পতাকা উড়ছে পতপত করে। পথের ধারে ধারে কত অজস্র বর্ণ ছড়ানো-ছিটানো। নানা রঙের শাড়ি-জামা-পরা মেয়েরা আর স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা। যত লোক এই অভ্যর্থনা সারিতে দাঁড়িয়ে তার নিশ্চয়ই সত্তরভাগ ছিল মেয়েরা—বর্ষীয়সী গৃহিণী থেকে সমবয়সী মেয়ে আর ছোট্ট ছেলেরা। তাই বলছিলাম তেরেসকোভা মেয়ে বলেই মেয়েদের টানটাই সবচেয়ে বেশি। তেরেসকোভা বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী, তাই নারীমুক্তিরও প্রতিকরূপিণী, সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজয়িনী কন্যা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা। ছয় নং "ভোস্তক"-এ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে নেমে আসার পর মস্কোর রেড স্কোয়ারে তেরেসকোভা, বিকোভস্কী আর সোভিয়েত মহাকাশবীরদের নিয়ে যে বিপুল সম্বর্ধনা হয়েছিল তার একটি বিবরণীর কথা। তখন তো ভালেন্তিনাকে দেখি নি। কিন্তু কলকাতায় তাঁরা আসতে সেই বিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলাম। যে সংবাদপত্রে এ বিবরণী বেরিয়েছিল সেটি কিন্তু একটি পশ্চিমী কাগজ, বিলেতের 'অবজার্ভার'। তার মস্কোস্থ প্রতিনিধি তেরেসকোভা সম্পর্কে লিখেছিলেন: "রেড স্কোয়ারের সমাবেশে বিভিন্ন বক্তৃতা শোনার সময়ে তাঁর চুলগুলি বাতাসে অল্প অল্প উড়ছিল। সুন্দর গড়নের তাঁর মুখ যখন হাসিতে কোমল হয়ে উঠল, তখন তাঁকে সোভিয়েত নারীত্বের এক নিখুঁত প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়েছিল।"

এ বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য, পশ্চিমী সাংবাদিকের চোখেও যা না পড়ে পারে নি। শুধু তো তেরেসকোভা নন, এই মহাকাশচারীত্রয়েরই রয়েছে সেই সোভিয়েত মুখাবয়ব। কারও মুখেই নেই সেই অতি-আত্মসচেতন কৃত্রিমতার লেশমাত্র যাতে কিনা মনে হয় তাঁরা এক একজন বীর, সাধারণ জনতা থেকে পৃথক আলাদা, একথা প্রমাণ করার জন্যেই যেন সব সহজ স্বাচ্ছন্দ্যকে চাপা দিতে হবে। তারুণ্যের পক্ষে স্বাভাবিক যে প্রাণোচ্ছলতা, তার সঙ্গে বিনয়ের সমন্বয় এবং যথার্থ বীর-চরিত্রের মূলভিত্তি যে সরলতা, এইগুলিই হল এই সব তরুণদের এবং এখন এই তরুণীটির খুব সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ হল সেই দেশের সব তরুণ-তরুণীদের মুখচ্ছবি যারা গঠন করছে কমিউনিজম নিজেদের মাতৃভূমিতে, সারা বিশ্বের জন্য সৃষ্টি করছে ভবিষ্যৎ, সেই সব মূল্যবোধ ও আদর্শই এই সব অনুপ্রাণিত মুখাবয়বের ছাঁদ তৈরি করে দিয়েছে যেন।

আমার কথা নয়, আরও একটু শোনাব খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেমস অ্যালড্রিজের কথা। তিনিও মস্কোয় সে সময় উপস্থিত ছিলেন। নতুন সমাজের এই নতুন মানুষদের চাক্ষুষ করে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। আর ধরেছিলেন ঠিক তার তাৎপর্যের কথা। বিশেষ করে ভালেন্তিনার সাফল্য তাঁকে দিয়ে এই ক্লটি লাইন লিখিয়েছিল: "ব্রহ্মাণ্ডলোকের এই নব আবিষ্কৃত রোমাঞ্চকর জগতে নারীর ভূমিকার ক্ষেত্রে ভালেন্তিনা এই উপলব্ধিটা এনে দিয়েছেন যে, তিনি এমন একটা সমাজের অঙ্গ যে সমাজ

তাঁকে বাধা দেবার বদলে উৎসাহিতই করেছে। ধরে নিতে পারি যে রকেট, স্পুৎনিক আর ভোস্তোকগুলিকে যাঁরা মহাশূন্যে পাঠিয়েছেন সেই সব ইঞ্জিনিয়ার-কারিগর-বিশেষজ্ঞদের অর্ধাংশ হলেন নারী। সোভিয়েত জনসাধারণের কাছে এটা একটা খুব স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে এতটা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নয় এজন্য যে আমাদের দেশে নারী-ইঞ্জিনিয়ার বলতে গেলে নেই, নারী বৈমানিকের সংখ্যা খুব কম, নারী-প্যারাশুটবিদদের সংখ্যা আরও কম, কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমকক্ষ নারীর সংখ্যা যৎসামান্য। বলা বাহুল্য আমাদের নারীরা সোভিয়েত নারীদের মতোই বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী এবং তাঁরাও তাঁদের মতোই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থাটাই এমন যে"...ইত্যাদি। তাই অ্যালড্রিজকে একথাও স্পষ্ট করে লিখতে হয়: "মানুষের প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্রে সোভিয়েত ব্যবস্থা যে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, তার প্রধান ও প্রাথমিক সূত্রই হল সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি। সুতরাং নারীমুক্তি এর একটা অবিচ্ছেদ্য শর্ত। এই দিক থেকেই সাফল্যের গুরুত্ব এত বেশি। এই সাদাসিধে সোভিয়েত মেয়েটি শুধু যে বাস্তব কার্যক্ষেত্রেই নারীর যথার্থ সম-অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার দিকেই আমাদের কয়েক পা এগিয়ে দিয়েছেন তাই নয়; যথার্থ বন্দীদশার ও অন্ধদশার শুরু ও শেষ যেখানে, পুরুষদের সেই মনের জেলখানার আরেকটি লৌহকপাটও তিনি ভেঙে দিয়েছেন।"

ইংরেজ ঔপন্যাসিক অ্যালড্রিজের এতখানি উদ্ধৃতি এই 'মিছিলের শহর' লিখতে গিয়ে দিতে হল এজন্যই যে, বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী ভালেন্তিনাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমাদের ঘরের মা-বোনেরা কেন এত উন্মাদনা বোধ করেছিলেন এবং কেনই বা কিছু রক্ষণশীল বন্ধু "এত হৈচৈ-এরই বা কি আছে এতে" বলে উঠেছিলেন, তারই একটা সদুত্তর দিতে। অনেকের থেকেই অ্যালড্রিজ যথেষ্ট গুছিয়ে তার যথার্থ তাৎপর্যটুকু ধরে দিতে পেরেছেন। এখন ফেরা যাক আগের কথায়।

নভেম্বর মাসের সেই দুই কিংবা আড়াইটা দিন, বিশ্বের মহাকাশচারিণীসহ সোভিয়েত মহাকাশচারীরা যতক্ষণ ছিলেন, এরকমই মেতে উঠেছিল আমাদের এই শহর। দুটো দিনই ঠাসা ছিল তাঁদের অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে। শহরে উপস্থিত হয়েই তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠানটি হল সাংবাদিকদের সঙ্গে, এক সাংবাদিক বৈঠকে। অজস্র প্রশ্নের তাঁরা অক্লান্ত উত্তর জুগিয়ে

যাচ্ছিলেন হাসিমুখে, একটুও ক্লান্ত না হয়ে। মুখর সাংবাদিকদের সে সব প্রশ্নের এক্তিয়ারে বাকি ছিল না কিছুই। সোভিয়েত মহাকাশযাত্রা ও মহাকাশযানের খুঁটিনাটি থেকে এমন কি নিকোলায়েভ-কে জিজ্ঞাসিত এরকম প্রশ্নও: "আপনাদের বিয়েতে কি ওদেশের বিজ্ঞানীরা ঘটকালি করেছিলেন?" উত্তরও শ্রীযুক্ত নিকোলায়েভ-এর মুখে মুখেই তৈরি: "না, আমাদের বিয়েটা ঠিক সেইভাবেই ঠিক হয়েছিল, আপনারও যেমন কাউকে পছন্দ হয়ে গেলে বিয়ের প্রস্তাব পাড়েন।" এ উত্তরে তারপর স্বভাবতই সকলকে হেসে ফেলতেই হয়। নববিবাহিতা শ্রীমতী তেরেসকোভাকেও সলজ্জভাবে, স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে। আর, এমনি দেখেছিলাম সদাপরিহাসপ্রিয় সর্বদা হাসিমুখ শ্রীভালেরি বিকোভস্কীকে। মেয়েদের সম্বর্ধনায় গিয়ে অজস্র ফুলের পাপড়ি পড়ছিল গায়ে। তার খানিকটা মুঠো করে নিয়ে নিজেই ছড়িয়ে দিলেন স্ত্রী শ্রীমতী বিকোভস্কায়ার একরাশ সোনালী চুলভরা মাথায়। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও তারপর কিন্তু দেখেছিলাম স্বামীর দেওয়া গোলাপ ফুলের পাপড়ি সুন্দরী শ্রীমতী আরও সযত্নে চুলের মধ্যে গুঁজে গুঁজে রাখছেন মৃদু হেসে।

আরও মনে আছে, এত হাসি-উৎসব-আনন্দের স্রোতের মধ্যেও সোভিয়েত নভশ্চরী, নভশ্চরেরা ভোলেন নি যে তাঁরা মহাকাশজয়ী বীরদেরও ললাটিকা পরে এলেও আসলে এই পৃথিবীর শান্তির তুতিয়ালি করার দায় কাঁধে করেই জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন। এই প্রখর চেতনা তাঁদের অধিকতর প্রাণবন্ত, অধিক রমণীয় করেছে। ভালেন্তিনা ভোলেন নি তিনি সোভিয়েতের যৌথ খামারের একজন ট্রাক্টর চালকের সন্তান, ফ্যাসীবিরোধী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেশরক্ষার সংগ্রামে যাঁর পিতা প্রাণ দিয়েছেন। শ্রমিক-কৃষকের ঘরের সন্তান তাঁরা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই তাঁদের জীবনে, এবং এরকম প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের জীবনে এনে দিয়েছে কর্ম ও বাস্তবের নবদিগন্ত। তেরেসকোভা তাই মেয়েদের সভাতেই বলেন এদেশের আর বিশ্বের সমস্ত মেয়েদের ডাক দিয়ে: দাঁড়ান আপনারা শান্তির সংগ্রামে। মহাকাশযানে চড়ে যখন এই পৃথিবীর চারপাশে আমি ঘুরে বেড়াই, আর দেখি আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর প্রিয়তম গ্রহটিকে, তখন মনে হয় সমস্ত মানুষকে ডাক দিয়ে চিৎকার করে উঠি,—বাঁচাও, এই সুন্দর পৃথিবীকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের সর্বনাশ থেকে। একে রক্ষা কর।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমাবেশে তাই তিনি সেই গানই না গেয়ে পারেন না, মস্কোর বিশ্বনারী কংগ্রেসে যে শান্তির গানটি পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বজাতির মেয়েরা গেয়েছিলেন। সে গানের বাণীতে বলে: "চিরকাল থাকুক সূর্যালোক, থাক আকাশ, চিরজীবী থাকুক বাবা-মা, চিরস্থায়ী হোক শান্তি।" শান্তির জন্য মহাকাশ গবেষণায় ভারত যখন থুম্বা রকেটঘাটি থেকে প্রথম একটি আবহ-গবেষণা রকেট ছুঁড়ে সাফল্য অর্জন করে সেইদিনই কলকাতার নাগরিক সম্বর্ধনায় নিকোলায়েভ তাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। বিকোভস্কির কথায় জানি যে, সম্প্রতি শুক্রগ্রহে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে তরঙ্গবার্তা পাঠিয়েছিলেন আর যা শুক্র থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, তাতে এই কটি শব্দই ছিল: "লেনিন-শান্তি-সোভিয়েত ইউনিয়ন"।

এমনি করেই নভেম্বরের দুটি অবিস্মরণীয় দিনে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম সোভিয়েতের মহাকাশ অতিথিদের, পেয়েছিলাম বিশ্বের প্রথম মহাকাশবিজয়িনীকে। ভালেন্তিনা তেরেসকোভার নিজের ভাষায় নিজের মহাকাশচারণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা খানিকটা তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

তার আগে একটি সাধারণ প্রশ্ন কয়েক মহল শোনায় সেটিও বলছি। কথা উঠেছিল 'মহাকাশ-পীড়া' নিয়ে। এরকম কিছু আছে নাকি? সমুদ্র ভ্রমণকালে যেমন 'সমুদ্র-পীড়া' ("সী-সিকনেস") হয়, কিংবা বিমানে চেপে অনেকের 'বিমান-পীড়া' হয়, তেমনি মহাকাশেও 'মহাকাশ-পীড়া' বা 'স্পেস-সিকনেস' হবার বিপদ আছে নাকি? অনেকে মনে করেন, যেহেতু পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই সমুদ্রপীড়া বা বিমানপীড়ায় বেশি ভোগেন, সেহেতু মহাকাশচারিণীদেরই এই মহাকাশপীড়ায় বেশি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরীক্ষাকালে এ মত ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। দোলন-চেয়ারে, নাগরদোলায় আর ঘূর্ণায়মান কক্ষে অভ্যস্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ভালেন্তিনাও এ-ব্যাপারে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে শ্বাসনালীকে অতিরিক্ত চাপে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে ভালেন্তিনাকে প্যারাশুট-ঝাঁপ আর দীর্ঘকালব্যাপী ডুব-সাঁতারে অভ্যস্ত হবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

এবার ভালেন্তিনার নিজের কথা: "খোলাখুলিই বলি। মহাকাশচারীদের দলে যে দিন যোগ দিতে যাই সে দিন মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। কি ভাবে তাঁরা আমায় গ্রহণ করবেন?

সত্যিকারের বিমান চালকরা এসে যোগ দিয়েছেন। জেট বিমানে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা উড্ডয়নের রেকর্ড তাঁদের আছে। তাঁদের ভেতরে দুজন—গাগারিন ও তিতোফ বীরের সম্মান পেয়েছেন গোটা পৃথিবীতে। আর দু-জনও সমগ্র জটিল ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে কেন্দ্রাতিগ যন্ত্র, শব্দ-নিরোধী কক্ষ ও অন্যান্য ব্যবস্থা সহজ হয়ে এসেছে।

আমার আর কতটুকু জানা আছে? প্যারাশুটে ঝাঁপ দিয়েছি শুধু। মাত্র ঐটুকুই আমার জানা। তাই মনে আশঙ্কা থাকা তো স্বাভাবিক। বাইরে যতই শান্ত থাকি না কেন, মনের চাঞ্চল্য ও আবেগ লুকিয়ে রাখা কঠিন। আমি জানতাম যে, কোনও বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই একাগ্রচিত্তে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া।...প্রথমত মহাকাশযানের কঠোর ও সুদীর্ঘ পথ সম্পর্কে সবকিছুর সঙ্গেই আমাদের পরিচিত করে দেওয়া হয়েছে। সবকিছুই আয়ত্ত করতে শেখানো হয়েছে। একদা য়ুরি গাগারিন ঠিকই বলেছিলেন, আমাদের উড্ডয়ন শুরু হয়েছিল এই পৃথিবীতেই। আমাদের এক ল্যাবরেটরি থেকে আর এক ল্যাবরেটরিতে যেতে হয়েছে। একটি ল্যাবরেটরিতে ছিল "চলন্ত পথ"—প্রশস্ত চলমান একটি ফিতা। এই ফিতার ওপর দাঁড়ালেই ফিতাটি প্রচণ্ড বেগে চলতে থাকে। ফিতার ওপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেই উল্টে যেতে হবে। তাই ফিতা যেদিকে চলেছে তার উল্টো দিকে দৌড়তে হয়। রোটর যন্ত্রে আমাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা জন্মেছে। একই সঙ্গে তিন সমতলে কেবিনটি ঘুরত। যে চেয়ারটায় বসতে হয়, সেই চেয়ার একটি অক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকে। যে ফ্রেমটার সঙ্গে কেবিন আঁটা সেই কেবিনটা ঘোরে অপর এক সমতলে এবং সমগ্র যন্ত্রটা ঘোরে তৃতীয় এক সমতলে। এতে এক অদ্ভুত জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই যন্ত্রে ট্রেনিং নেওয়া দেখলে পর্যন্ত আমাদের মাথা ঘুরত। তারপর আমাদের দেখানো হয়েছে তাপকক্ষ। এখানে বসে নানা জটিল কাজ করতে হয়েছে আমাদের। তারপর আমরা গিয়েছি কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রে। পরিশেষে শব্দ-নিরোধক কক্ষে। বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই কক্ষ। বিন্দুমাত্র কম্পন অনুভব করা যাবে না। এতটুকুও শব্দ শোনা যাবে না। ভাবী মহাকাশচারীদের সম্পূর্ণ একলা কাটাতে হবে এখানে। এই "নিস্তব্ধ কক্ষে" গেরমান তিতোফ পুশকিনের কবিতা আবৃত্তি করেছেন, পাভেল পপোভিচ গেয়েছেন ইউক্রানীয় গান, ভ্যালেরি বিকোভস্কী এঁকেছেন কার্টুন।"

এমনি করে ভালেন্তিনা শেষ পর্যন্ত পৌছান শেষ পর্যন্ত তার জীবনের শুভদিন, (ফের সেই "দোব্রী দেন" নয় কি ?) ভোস্তক ৬-এ চড়ে পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোকে উধাও হওয়ার কাহিনীতে: "চাইকা! "চাইকা! জারিয়া ডাকছেন। য়ুরি গাগারিনের কণ্ঠস্বর। তিনি জিজ্ঞেস করছেন আমি কেমন অনুভব করছি। জবাব দিলাম—ভালো, সব ভালো। সেই কথাই বলেছিলাম। উত্তেজনা আর নেই, এখন প্রত্যাশা, অজানা অপূর্ব একটা কিছুর প্রত্যাশা।

পূর্ব স্মৃতির সময় এ নয়। পার্থিব ঘড়ির কাঁটা শেষে মিনিটের দিকে এগিয়ে চলেছে। মহাকাশযানের প্রধান নকশাকার আমার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর আবার য়ুরা। তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমার শুভ উড্ডয়ন কামনা করলেন। প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদের এই দরদ ও সহানুভূতির জন্য আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। পার্টি ও দেশ আমার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তা পালনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। প্রস্তুত হবার মুহূর্ত ঘোষিত হল। টিক, টিক, টিক। মেট্রোনোমের সেকেণ্ডের কাঁটার শব্দ। না না, সে তো মেট্রোনোমের শব্দ নয়, আমার হৃদস্পন্দন। শেষ নির্দেশ।...মস্কোর সময় ১২টা ৩০ মিনিট। চলো!

যাত্রা শুরুর সঙ্গীতে কাদের স্বর! শোনাচ্ছে স্দুরের বজ্র গর্জনের মতো। কেঁপে উঠল রকেটটা। বাড়তে লাগল শব্দ উচ্চ গ্রামে। অপ্রত্যাশিতভাবে চীৎকার করে উঠলাম উঠেছি, আমি উঠেছি। অতিভার বেড়ে চলল। একটি আঙুল নাড়ানও কঠিন। চমৎকার। এমনিই তো হবে। তার মানে সব ঠিক চলেছে। ঐ নক্ষত্রলোকে একাকী ছুটে চলেছে এক নক্ষত্রযান। তার চালক ভালেরি বিকোভস্কী। ভালেরি বললেন, প্রতীক্ষা করছি।' পৃথিবীর সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ কালে ভালেরি সংক্ষেপে এই কথা আমায় বলেছিলেন। টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিলেন।

একটু পরে গ্যাসের প্রবল শক্তি পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন কেটে দিল। অতিভার কমে গেল। গবাক্ষ পথে দেখতে পেলাম আমাদের গ্রহের চারিদিকে অবর্ণনীয় অপূর্ব আলোকচ্ছটা—রামধনুর মতো। ওগো! মহাবিশ্ব!"

ভালেন্তিনার নিজের কথা এই পর্যন্তই থাক। জয়তু সোভিয়েত নভশ্চরী, বিশ্বের প্রথমা নারী! তোমার আশ্চর্য সুন্দর অভিজ্ঞতায় আমাদের এই শহরবাসীকে অংশভাক করে নিয়ে গেলে। জয়তু সোভিয়েত নভশ্চর বীরেরা! তোমাদের বীরত্বে আমাদের এই সুন্দর বাসগ্রহ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি নেমে আসুক।

সাংবাদিক

পুস্তক-পরিচয়

বিদ্রোহী ডিরোজিও ॥ বিনয় ঘোষ। বাক্-সাহিত্য। পাঁচ টাকা॥
ডিরোজিয়ো॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ। গ্রন্থ-নিলয়। ছু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা॥

মাত্র বাইশ বছর আট মাস কয়েকদিনের আয়ুর পরিধিতে একটি তরুণ যুবক সমাজে যে আলোড়ন ও বিক্ষোভের ঝড় তুলেছিলেন, তা প্রথমে অবিশ্বাস্য ঠেকলেও হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র কর্মকাণ্ড আমাদের বিমূঢ় করবে সন্দেহ নেই। বাইশ বছরের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছর সময় পেয়েছিলেন আপ্তবাক্য-বিশ্বাসহীন সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ সৃষ্টি করার, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সকল প্রকার মতামতের অবাধ আলোচনা মানুষের অব্যক্ত প্রতিভা ও মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশে সহায়ক। নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাস ও তদ্অনুযায়ী কার্যসম্পাদন বিগত শতাব্দীতে বিপ্লবমূলক বলে বিবেচিত, বিশেষত উক্ত শতকের প্রথম-অর্ধে; যদিও রামমোহন রায় তখন প্রায় একাকী বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বীয় লক্ষ্যে ভীষ্মের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডিরোজিও রামমোহনের মতো যুগন্ধর পুরুষ না হলেও স্বল্প সময়ে তিনি তরুণ দলের পুরোধা হয়ে আমাদের অনড় অচল সমাজে বিক্ষোভের কারণ হয়ে উঠলেন, তা ইতিহাসে কদাচিৎ দৃষ্ট, সেজন্য তিনি আমাদের অবশ্য স্মরণীয়, সেজন্য তিনি বিদ্রোহী ডিরোজিও।

বিনয় ঘোষ ডিরোজিও-র বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন বলেই তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ ও ব্যক্তিজীবনের সাধারণ পরিচয়ের প্রেক্ষিতে ডিরোজিও-র বিদ্রোহাত্মক কর্মাবলীর নিদর্শন উপস্থাপিত করেন। বস্তুত কোনও ব্যক্তি স্বয়ম্ভু নন, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় পরিবার-পরিবেশ সমাজ-সভ্যতার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে, যদিচ এমন প্রভাবের সরল সমীকরণ অসতর্ক প্রয়োগে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। লেখক তাই অতি সতর্কে ডিরোজিও-র ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পটভূমি বিশ্লেষণ করে নিপুণভাবেই পরিবার অপেক্ষা সমাজ ও তৎকালীন সমাজে বিপ্লবের প্রস্ফুটিত অঙ্কুরের নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিতের মধ্যে হেনরি লুই ভিভিয়ানের ভবিষ্যৎ ভূমিকার তাৎপর্য অনুসন্ধান করেন। যে-শিশুর যাত্রা শুরু হয়েছিল ডেভিড

ড্রামণ্ড-এর মতো "তরুণদের সার্থক শিক্ষকের" অধীনে, সে-শিশুই যৌবনে শিষ্য হিসাবে পেয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ কৃতবিদ্ সন্তানদের। বিনয়বাবু সেই শিশুর ক্রমবিকাশ ও পরিণতির বিকাশে তাই যথার্থভাবে সামাজিক পরিবেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং সেই সূত্রে ডিরোজিও-র ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দর্শাতে বিস্মৃত হন না। তাই আঠারো বছর বয়েসে লিখিত 'ক্রীতদাসের মুক্তি' কবিতায় মুক্তি ও স্বাধীনতার বার্তায় আগ্রহী ডিরোজিও-র ভাবজীবনের গভীর ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়। তৎকালীন আকাশে বাতাসে দাসত্বের যে অবমাননা ও পীড়াকর অস্তিত্ব বিগুমান ছিল, তরুণ কবি, ভবিষ্যতের বিদ্রোহী বলেই, স্বাভাবিকভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন। অবশ্য এ-বোধ যদি তাঁর কাব্যকলায় নিঃশেষ হত, তবে বিদ্রোহী-কবি আখ্যায় ভূষিত হলেও তিনি সমাজ-শিরোমণিগণের শিরঃপীড়ার কারণ হতেন না। এই স্থলেই তিনি কথায় ও কর্মে আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন, সেজন্য তিনি বিদ্রোহী। বিনয়বাবু "ঝড়" পরিচ্ছেদে ডিরোজিও-র কর্মজীবনের শেষ অধ্যায় বর্ণনা করেছেন এবং তখনি আমরা ডিরোজিও-র ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হই যখন দেখি তাঁকে অপসারণের জন্য প্রায় ষড়যন্ত্র চলছে। বিনয়বাবু এই অধ্যায় অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বিশেষ করে উইলসনের উত্তরে ডিরোজিও-র পত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্ট অংশ সংযোজনায় কবি ডিরোজিও, শিক্ষক ডিরোজিও সম্পর্কে তৎকালীন বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও ব্যক্তিদের মতামত ডিরোজিও-র স্বরূপ বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। বিনয়বাবু অতি সংক্ষেপে বিদ্রোহী ডিরোজিও-র চিত্র পরিবেশন করে পাঠকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার পাত্র হবেন এ-বিষয়ে সমালোচক নিঃসন্দিগ্ধ।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিদ্রোহী ডিরোজিও-র জীবনের শেষ কয়েকটি মাসের ঘটনা অবলম্বন করে তিন অঙ্কে 'ডিরোজিয়ো' নাটক রচনা করেছেন। ডিরোজিও-র শৈশবে বা কৈশোরে অথবা যৌবনের প্রারম্ভিক জীবনে নাটকীয় উপাদান আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু শেষ কয়েক মাস একটি তরুণের ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জীবনে নাটকীয় তাৎপর্য অনুসন্ধান নিশ্চয়ই সার্থক, এবং চিত্তবাবু এই ক-মাস ঘটনা হিসাবে নির্বাচিত করে দক্ষ নাট্যকারের ক্ষমতারই পরিচয় দিয়েছেন। তিন অঙ্কে তিনটি বিশেষ দিনের মধ্যে ডিরোজিও-র যে চিত্র

অঙ্কিত করেন সেই চিত্রে একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিক ট্র্যাজিক নায়ক মূর্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম দৃশ্য শুরু হয়েছে ভগ্নী আমেলিয়ার সঙ্গে ডিরোজিও-র সংলাপে, নাটকের সমাপ্তি হয়েছে উভয়ের কথোপকথনে ও নায়কের মৃত্যুতে। প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে তৎকালে ডিরোজিও-র ভগ্নী সংক্রান্ত কুৎসা যথেষ্ট রটনা করা হয়েছিল, তার তাৎপর্য কত গভীর ছিল তা আমরা জানতে পারি উইলসন সাহেবের পত্রে সামান্য উল্লেখে। চিত্তবাবু সেই কুৎসার মূলে কুঠারাঘাত করেন ভ্রাতা-ভগ্নীর মধুর সম্পর্ক চিত্রণে। অল্প দু-এক কথায় ও ইঙ্গিতে তিনি ডিরোজিও-র আপন কবিত্ব-সম্পর্কে অহমিকা, কোনো কোনো সময় অসহিষ্ণুতা অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ওই স্বল্প পরিসরে আমরা সোফিয়া, ফ্রাংক-কে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পারি, এমন কি তাঁর শিষ্যদের চরিত্রও অতি অল্প আয়াসে চিত্তবাবু উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এই নাটক পাঠ করে আমরা ডিরোজিও-র কর্মকাণ্ডের সম্যক পরিচয় পাই, তবু নাটকটিতে ইংরেজি সংলাপের আধিক্য পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চিত্তবাবু এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হলে দর্শকগণ খুশি হবেন সন্দেহ নেই, কারণ অত্যধিক ইংরেজি সংলাপের প্রয়োগে নাটকটির রস গ্রহণ অনেকের পক্ষে সহজ হবে না বলে মনে হয়, যদিও এ-নাটক অভিনীত হলে সাফল্য অর্জন করবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা দুষ্কর নয়।

কুশল লাহিড়ী

অভিনব একাঙ্ক। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। চার টাকা।

বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটকের পুঁজি আজ খুব অল্প নয়। বেশ কয়েকজন গণনীয় লেখক আছেন, যাঁরা নিয়মিত ভাবে শুধু একাঙ্ক নাটকই লেখেন। নিয়মিত ভাবে একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করেন, এমন কতকগুলি শৌখিন নাট্য-প্রতিষ্ঠানও তৈরি হয়েছে দেশে। বলা বাহুল্য এ আশা ও আনন্দেরই কথা।

এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে কিন্তু অবস্থাটা এরকম ছিল না। তৃতীয় দশকের গোড়ায় মন্মথ রায় প্রথম নাট্যসাহিত্যের এই বিভাগটি যখন বাংলায় আমদানি করেন, তখনো বাঙালী পাঠক তার স্বাদে অভ্যস্ত হন নি। উক্ত দশকের শেষভাগে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, শিবরাম চক্রবর্তী এবং চতুর্থ দশকের শুরুতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বর্তমান

লেখক যখন একাঙ্ক রচনা করেন, তখনো অবস্থা একই চলেছে। যদি বা অধ্যয়নে তার আংশিক স্বীকৃতি হয়েছে, অভিনয়ে তার উপযোগীতা কেউ মেনে নিতে পারেন নি।

পঞ্চম দশকের মাঝামাঝিতে হঠাৎ নব্যনাট্য আন্দোলনের জোয়ার এল এবং তার ধাক্কায় আমাদের নাট্যরুচির বন্ধ্যা মৃত্তিকা নতুন ফসলে সমৃদ্ধ হতে লাগল। শৌখিন নাট্যালয় স্থাপিত হতে শুরু করল একের পর এক এবং তার চাহিদাতেই একাঙ্ক দু-অঙ্ক নাটক লেখা শুরু হল পর্যাপ্ত সংখ্যায়। নাট্যকার, নট ও প্রয়োগশিল্পী তিন বিভাগেই দেখা দিলেন কুশলী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষরা।

সেই আন্দোলনের সূচনা পর্বের একজন দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বলাই বাহুল্য প্রধান একজন। বহু পূর্ণায়তন নাটক লিখেছেন তিনি, লিখেছেন একাঙ্ক নাটকও এবং মঞ্চায়িত হয়ে তার বেশির ভাগই বাঙালী দর্শককে একসঙ্গে রসের পণ্য ও চিন্তার উপকরণ জুগিয়েছে। তিনি জীবন এবং সমাজকে যেমন চেনেন, তেমনি চেনেন রঙ্গমঞ্চকে। এ দুইয়ের সমাবেশ তাঁর নাট্যপ্রতিভায় হয়েছে মণিকাঞ্চন যোগের মতো।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাঁর সমুদয় নাট্য রচনা নিয়ে চর্চার অবসর হবে না। এখানে আমি শুধু তাঁর 'অভিনব একাঙ্ক' নামে সম্প্রতি যে একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়েছে, তার কথাই বলব। এটি তাঁর আধুনিকতম রচনার সংগ্রহ তো বটেই, এক হিসাবে তাঁর বিশিষ্টতম একাঙ্ক নাটকাবলীরও সাক্ষাৎ মিলবে এতে। সুতরাং এই একটি বই পর্যালোচনা করলেই আমরা নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোটামুটি চিনতে পারব।

আলোচ্য সংগ্রহে মোট আটটি ছোট-বড় একাঙ্ক নাটক সঙ্কলিত হয়েছে। এর মধ্যে তণ্ডুল যজ্ঞ হল রূপক নাট্য এবং চিড়িয়া বিদ্রোহ মুখোস নাট্য। বাকীগুলি সবই সমাজ-সমস্যামূলক। তার মধ্যে কোনোটায় সমস্যা প্রচ্ছন্ন, জীবনের দ্বন্দ্ব, মতের সঙ্গে মতের, আবেগের সঙ্গে আবেগের সজ্ঘাতই নিয়েছে প্রাধান্য। কোনোটায় বা জীবন রয়েছে পশ্চাৎপটে, সমস্যাটা এসেছে অগ্রবর্তী হয়ে। কিন্তু কোনোটাতেই আখ্যানবস্তু তার নাটকীয় গতিবেগ হারায় নি। অর্থাৎ নাটিকাগুলির কোনোটা সংসার লোকের ওপর করেছে আলোকপাত, কোনোটা খুলে দিয়েছে অন্তর্লোকের দুয়ার। আর এই দুই নিয়েই তো নাটক!

সংলাপে, সংবেদনশীল আবেগের স্পর্শে চরিত্রগুলি সবই তাঁর জীবন্ত। তবু জীবনোত্তাপে তাদের মধ্যে আছে স্তরভেদ এবং এটাই উদ্‌ঘাটিত করে নাট্যকারের অভিজ্ঞতাভূয়িষ্ঠ বৃহৎ জীবনবোধ। 'কেউ দায়ী নয়', 'অভিনেত্রীর নবজন্ম', 'অন্তস্তল'—এই তিনখানি একাঙ্ক যিনি মন দিয়ে পড়বেন, তিনি দেখবেন, কত বিচিত্র মানুষের মিছিল সৃষ্টি করেছেন তিনি! কত বিচিত্র স্বপ্ন, অনুভূতি এবং নিভৃত বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন, সেই সব মানুষের কথা, কাজ ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে! এক ঝলকেই যেন দেশ, জাতি ও সমাজের অনুদ্‌ঘাটিত বিচিত্র দিক আত্মপ্রকাশ করে পাঠক ও দর্শকের চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, নতুন প্রাণবন্ত সমাজের আশাও আবিষ্ট করে তাঁর ভাবভূমিকে।

এই সংগ্রহের 'হারানো সুর' এবং 'দুইয়ের পিঠে এক—শূন্য' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হলে নিঃসন্দেহে সর্বজন গ্রহণীয় হবে। বইয়ের ভূমিকাটি সুলিখিত ও মূল্যবান। সংগ্রহটির যোগ্য সমাদর কামনা করি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শহরতলির শয়তান। বারট্রাণ্ড রাসেল। অনুবাদ—অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

'নিউ হোপস ফর এ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড' বা 'দি ইমপ্যাক্ট অব্ সায়ান্স অন সোসাইটি' কিংবা 'হ্যাজ ম্যান এ ফিউচার' প্রমাণ করে বার্ট্রাণ্ড রাসেল নিরপেক্ষ দার্শনিকতার তথাকথিত শুদ্ধতা ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ রিয়ালিজম্ বা নিও-রিয়ালিজম-এ বিশ্বাসী রাসেল তাঁর পীড়াদায়ক ইতিহাসবিমুখতা আর হয়তো পোষণ করেন না। বোধ করি, এই জীবনে নেমে আসার আবেগী ও শুদ্ধ টানেই সংশয়ী রাসেল গল্প লেখেন—যার প্রথম প্রকাশ উনিশ শো তিপ্পান্ন—বাংলায় অনুবাদ উনিশ শো বাষট্টিতে। যদিও রাসেল তাঁর দর্শন ও ধর্মনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ টানতে ইচ্ছুক—তবুও স্পষ্টই বোঝা যায় রাসেলের ইচ্ছা সত্ত্বেও তা ঘটেনি—কারণ ঘটতে পারে না। তাই রাসেলের গল্পাবলীর পরিচিতির পূর্বে তাঁর দর্শন প্রসঙ্গে দু-এক কথা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রাসেলের কাছে দর্শন ন্যায়-এর মধ্যেই সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নৈয়ায়িক সূত্রে ও প্রাথমিক সংবেদনে। ফলে যুক্তি বা রীজন-এর অবস্থিতি

অন্য বিশ্বে, আমাদের চেনা-জানা এই বিশ্বে নয়। অন্য বিশ্বের কারবার বিমূর্ত ন্যায় নিয়ে, আবেগ ইচ্ছামুক্ত এর শুদ্ধতায় বুদ্ধি আনন্দিত। স্বভাবতই এর ফলে দার্শনিকদের সঙ্গে এই জগৎ, জীবন ও মানবসমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, অন্তত রাসেলের চিন্তায়। এবং যে প্রজ্ঞাময় চিন্তা দার্শনিকরা মানুষকে দেন, তার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হতে হবে চিন্তাশীল নয়, মূর্খদের ধ্যানধারণা বা নীতির কাছে, চিন্তা নয় মত্ত আবেগই হবে চালিকাশক্তি, আদর্শ নয় খেয়াল, নীতি নয় সুবিধাবাদই হবে আমাদের মূল সূত্র। এথিকস, মর‍্যাল প্রভৃতির থেকে যুক্তির নির্বাসন এই দর্শনের অন্যতম ফলশ্রুতি যার ফলে ভালো, খারাপ বোধ নেহাতই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ।* কিন্তু এর ফল আরও মারাত্মক। 'বাস্তব জগতের অর্থ বা মূল্য নিরূপণে যুক্তির এই বন্ধ্যাত্ব কল্পনা নিঃসন্দেহেই দুঃখবাদী দর্শন। এর থেকেই পদার্থিক বিশ্ব ও মানুষের বিশ্বাস-সমৃদ্ধ ধ্যানধারণার মধ্যে অসেতুসম্ভব বিরোধে তাঁর বিশ্বাসের জন্ম। বাস্তব জগৎ "সর্বশক্তিমান বস্তু, ভালো-মন্দের প্রতি অন্ধ, মানবজীবন ও মানুষের আদর্শের প্রতি উদাসীন সুতরাং আন্তর মুক্তির উপায় আশার নির্বাসনে, প্রতিবাদহীন সহনশীলতায়, মানবিক মূল্যের প্রতি বীরত্বপূর্ণ কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক আস্থায়।"

যদিও রাসেল জীবন-সম্পর্কিত তাঁর মতাবলীকে তাঁর দর্শন থেকে পৃথক করেন, তথাপি এরা যে পারস্পরিক সম্পর্কিত তা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও নৈতিকতার মধ্যে দ্বৈত বিরোধের আরোপ থেকেই রাসেল—প্রগতিতে বিশ্বাস বিজ্ঞানে নেই—এই সিদ্ধান্তে পৌছান, আমাদের ধ্যানধারণা ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাই, রাসেলের মতে, বিজ্ঞান নীরব। এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কেও রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গি দুঃখবাদীর। এই মানবপ্রকৃতির মধ্যেই নাকি যুদ্ধের বীজ নিহিত। এক্ষেত্রে পরিবেশ, সমাজ প্রভৃতি সবকিছুই রাসেলের কাছে অগ্রাহ্য। ফলত রাসেলের সমস্ত সংস্কারবাদী বা রিফর্মিস্ট লেখাতেই এই নৈরাশ্যের ছায়াপাত।

রাসেলের গল্প সংকলনের আলোচনাতে উপরিউক্ত মন্তব্যাবলী সর্বদা স্মরণীয়।

---

* মজার ব্যাপারটা এই যে, রাসেল তাঁর নিজের রচনাতেই যে নৈতিক মান নির্দিষ্ট করেন, তাঁর বিশ্বাস, তা সর্বজনীন ভাবেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং এগুলো, তাঁর মতেই, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

যদিচ ভূমিকায় রাসেল জানিয়েছেন, "গল্পগুলো কোনো নীতি বা তত্ত্ব বোঝাতে চাইছে একথা কেউ ভাবলে আমি বড় দুঃখ পাব। প্রত্যেকটি গল্প তার নিজের খাতিরে নিছক গল্প হিসেবেই লেখা, পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দিতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ।" তথাপি জীবন ও সমাজসম্পর্কিত রাসেলের ভাবনার প্রকাশ এখানে অনেকটাই এবং এই গল্প পাঠে পাঠক-পাঠিকা যতটা আনন্দিত হন, তার থেকে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। অন্তত প্রথম তিনটি গল্পে দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পরিচিত ছবিটিই দেখতে পাই—বিচলিত, হতাশ, অথচ সমাজের ব্যাধি সম্পর্কে তীব্র সজাগ, মুক্তির পথ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত—দুঃখবাদী।

এই সংকলনের প্রথম গল্প "শহরতলীর শয়তান'। এই গল্পে ডাঃ মার্ডাক মালাকোর প্ররোচনায় কী ভাবে কয়েকটি জীবন বিড়ম্বিত হল তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মালাকো তাঁর বাল্যজীবন ভুলতে পারেনি— "আমার মায়ের নিষ্ঠুরতা, প্রতিবেশীর হৃদয়হীনতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, বন্ধুহীন অবস্থা, নিরাশার ঘন অন্ধকার; এই সবই, আমার সৌভাগ্য শুরু হবার পরও সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে রইল।" এর ফলে, তার মানবজাতির প্রতি ঘৃণা—"পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, একজনও নয়, যাকে আমি চরম যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখতে না চাই।" এই ব্যক্তির প্ররোচনায়, কাজ করতে গিয়ে মিঃ প্র্যাবাবক্রম্বিব কারাবরণ, মিঃ বোশার আত্মহত্যা, মিঃ কার্টরাইট-এর প্রবাসে নির্বাসন, শ্রীমতী এলারকারের উন্মাদ হওয়া। এখানে স্মর্তব্য, উপরিউক্ত চারজনই, মালাকোর ভয়ঙ্কর প্রভাবে, তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ কাজে মেতেছিলেন। অর্থাৎ টাকা চুরি, নোংরা সাহিত্য প্রচারের ব্যবসা প্রভৃতি এই সব নিষ্কলঙ্ক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রকৃতিতেই রয়ে গেছে—শুধু মালাকোর উৎসাহেই তার প্রকাশ ঘটেছে ও মালাকোর চক্রান্তেই তাদের পরিণতি ভয়াবহ। অথচ মালাকো এ সবের জন্য লাভবান হয় না কিছুই—সে কখনো নিজের জন্য কিছু করে না। শুধু ঘৃণা থেকে এর উৎপত্তি। কিন্তু সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উত্তমপুরুষে যিনি গল্পটি বলেছেন তাঁর পরিণতি। তিনিও মালাকোর কবলে পড়েছিলেন—কিন্তু জটিল বৈজ্ঞানিক কাজে ডুবে গিয়ে তিনি আপাতত রক্ষা পেলেন। শ্রীমতী এলারকারের ঘটনাটিই তাঁকে বিচলিত করে তুলল—এবং "সমগ্র মানবজাতির প্রতি একটা ব্যাপক ঘৃণা আমার মনের ভেতর বেড়েই চলল।" মনে হল "ডাঃ মালাকোই দুনিয়ার

রাজা।”...“যারা নিতান্তই ভীরু স্বভাবের দরুণ সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন করে তাদের অনেকের মনেই লুকিয়ে থাকে চমকদার পাপ করবার আশা, ক্ষমতার লোভ, ধ্বংস করার প্রবৃত্তি।” ফলত “আমার মনে হল মানুষ জাতটাই ভুল।” পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা করে তিনি পেলেন মানবজীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত। কিন্তু ডাঃ মালাকোর কাছে গিয়ে তিনি বুঝলেন তাঁর উপায়ে ত্রুটি আছে; ডাঃ মালাকো তাঁকে কাজে লাগাতে চাইলেন। এবং তিনি ভাবলেন, “লোকটি পাপিষ্ঠ, সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস ছিল গভীর। তিনি (মালাকো—লেখক) যখন পৃথিবী ধ্বংস করতে চান, তখন, আমার মনে হল পৃথিবী ধ্বংস করাটা পাপ।” তিনি গুলি করলেন ডাঃ মালাকোকে। কিন্তু এর পরও তিনি রেহাই পেলেন না—লুকিয়ে চোরের মতো হত্যা ও মালাকোর দুঃসহ চিন্তায়—তিনিও উন্মাদ হয়ে গেলেন। গল্পটির শেষ কথা, “বছরে একবার আমার দেখা হবে শ্রীমতী এলারকারের সঙ্গে, যাঁকে ভুলতে চেষ্টা করা আমার কখনোই উচিত হয় নি। আর, যখন আমাদের দেখা হবে, তখন দুজনে মিলে অবাক হয়ে ভাবব দুজনের বেশি প্রকৃতিস্থ লোক পৃথিবীতে কখনো থাকবে কিনা”। আলোচনার শুরুতে রাসেলের যে দর্শনচিন্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার ছায়া কি আমরা এখানে দেখতে পাই না?

পরের গল্প ‘কুমারী একস্‌-এর অগ্নি পরীক্ষাতে’ও এই একই মনোভঙ্গি। প্রাক্‌-কেলটিক্ অলংকরণ শিল্পবিদ প্রফেসর এন-এর সেক্রেটারী কুমারী একস কর্সিকা থেকে ঘুরে এসেই বিড়ম্বিত। সেখানে সে শুনেছে যে সেখানকার অধিবাসীদের মতে মানবজাতি একটা ভয়ংকর ব্যাধিতে ভুগছে, সেই ব্যাধিটি হচ্ছে সরকারী শাসন। এর বিনাশের উপায় শাসকদের বিলোপ সাধন। শুধু একুশটি রাষ্ট্রের একুশজন প্রধান শাসকের মৃত্যুই নয়, প্রফেসর এন-এর মৃত্যুও এরা চায়। কারণ প্রফেসর বলেছেন যে প্রাক্‌-কেলটিক অলংকরণ শিল্প ইওরোপে বিস্তার লাভ করেছে পিথুয়ানিয়া থেকে অথচ কর্সিকাবাসীদের মতে কর্সিকা থেকে। কুমারী একস্ ধরা পড়ে গিয়ে এই শেষোক্ত কার্য সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। ফলে তার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—“কোনটা বৃহত্তর পাপ—যে ভালো মানুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁকে হত্যা করা না সম্মান-বুদ্ধির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শপথ ভঙ্গ করা?” কিন্তু এর সমাধান হয় প্রফেসর ও তাঁর সেক্রেটারীর যৌথ আত্মহত্যায়। আর যিনি গল্পটি বলেছেন তাঁর মনে হল “আমার জীবনধারণ বৃথা হয় নি, কারণ চোখের সামনে আমি

দুটো মহৎ মৃত্যু দেখলাম।” সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্সিকাবাসীদের হাত থেকে “পৃথিবীর অপদার্থ শাসকগুলি”কে রক্ষার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে গেলেন। নিজের আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সংঘাত, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় না বুঝতে পারা (বাস্তবিক কুমারী একস্-এর যে মানসিক দ্বন্দ্ব তা “নিরপেক্ষ শুদ্ধ” দার্শনিক রাসেলের লেখা বলেই সম্ভব হয়েছে), দুজন নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যু কিন্তু অপদার্থ শাসকদের বাঁচানোর প্রচেষ্টা—সব মিলিয়ে সেই নিষ্ঠুর হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই উপস্থিত করে।

পরের গল্প ‘ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ’ রূপকের ঢঙেই লেখা। বিশেষত যুক্ত জাতিসংঘে বিভিন্ন প্রতিনিধির বক্তৃতা তো একটা চমৎকার চিত্র। চারজন ব্যক্তিতে মিলে ‘ইনফ্রা রেডিওস্কোপে’র মাধ্যমে কী ভাবে অর্থ উপার্জনের বিরাট ব্যবস্থা করে এবং সারা পৃথিবীতে নেহাতই অর্থ ও ক্ষমতাবলে এক বিরাট ধাপ্পাকে সত্য বলে চালায়—ফলত কি ভাবে ভয়ঙ্কর শত্রুর সামনে সব বিবাদী রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হয় এবং যখন ধাপ্পা ধরা পড়ে তখন আবার যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়—এবং সেই সুযোগে আসল শত্রু মঙ্গলগ্রহীরা এসে মানবজাতিকে শেষ করে—এই কাহিনী প্রায় পুরোপুরিই রূপক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটি নিপুণ ছবি। এই গল্প সংকলনে এইটিই শ্রেষ্ঠ গল্প। তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও চাপা ব্যঙ্গে গল্পটি যেমন চিন্তান্বিত করে, তেমনি উপভোগ্য। তবু এ গল্পেও সেই নিবিড় অন্ধকার—মানবজাতির শেষ সন্নিকটবর্তী। বাস্তবিক পারমাণবিক যুগে এসে কেউ কেউ ঈশ্বরকেই অবলম্বন করেছেন, আবার বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদীদের কাছে হতাশা ছাড়া কিছুই নেই। তবুও শান্তির জন্য আশাহীন হলেও বীরত্বপূর্ণ লড়াই করতে হবে, তাই বৃদ্ধ বয়সেও রাসেলের সংশয়ী-নিরপেক্ষ মন হাত বাড়ায় শান্তির মানুষদের কাছে, নব উদ্দীপনায় এ-পৃথিবীতে শান্তি আনার শুদ্ধতম কর্মে রাসেল ভাস্বর হয়ে ওঠেন।

পরের গল্প দুটি ‘পার্নেসাস-এর রক্ষকবৃন্দ’ ও ‘পাদ্রীর সুবিধা’ কম উচ্চাভিলাষী। বিশেষত শেষের গল্পটি তো একটি মিষ্টি গল্প। প্রথম গল্পটিতে প্রফেসর গ্রেটোরেকস্-এর প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহায় কী ভাবে অধ্যক্ষ মিঃ ব্রাউনের জীবন বিষময় হয়ে গেল তার গল্প। এখানে লক্ষণীয়, মিঃ ব্রাউন-এর দুর্ভোগের মূলে কিন্তু এক মিথ্যা অপবাদ। এবং সে অপবাদ সত্য কিনা তা কেউ যাচিয়েও দেখতে ইচ্ছুক হয় নি। ‘পাদ্রীর সুবিধা’য় ফিলিপ ধর্মযাজক-এর কন্যা পেনিলোপিকে কিভাবে নিজের পাদ্রী পরিচয়

গোপন করে বিবাহ করে, ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিচ্ছেদ ও পরে মিলন হয়—তার একটি মিষ্টি গল্প।

বাস্তবিক শেষের দুটো, বিশেষত শেষেরটি বাদ দিলে, আর সব গল্পেই রাসেলের সংশয়ী মনের ছায়াপাত—আশ্চর্যের বিষয় রাসেল দুর্নীতি, দুরাচার প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েও এর থেকে মুক্তির উপায়ের কোনো পথই পান না। বোঝেন না ডাঃ মালাকো, ইনফ্রা রেডিওস্কোপ চক্রান্তকারীরা বা অপদার্থ শাসকবৃন্দ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজের থেকেই তাদের উৎপত্তি—সুতরাং সামাজিক পরিবেশ না পাল্টালে এই বিষবৃক্ষ নিশ্চিহ্ন করা যায় না। রাসেল একথা যেন বুঝেও বোঝেন না—নাকি দার্শনিক নিরপেক্ষতায় তিনি এ ব্যাপারে নীরবই থাকতে চান।

অবশ্যই গল্পের বিচার নিশ্চয়ই প্রাথমিকভাবে গল্প হিসাবে। সেই কারণে, রাসেলের গল্পেরও আলোচনাতে আমাদের দেখতে হবে গল্প হিসাবে গল্পগুলি কেমন হয়েছে। অবশ্যই গল্প হিসাবে এই সংকলন রাসেলের প্রথম প্রচেষ্টা। হয়তো সে কারণেই গল্পগুলি গল্প হিসাবে নিখুঁত হয় নি। প্রথমত, প্রায় গল্পই শিথিল হয়ে পড়েছে। ফলে, গল্পের প্রয়োজন ছাড়াও অনেক বর্ণনা, অনেক অংশ রয়ে গেছে। গল্পগুলো অযথা বিস্তৃতও হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গল্পের পাত্রপাত্রীদের তিনি যে দ্বন্দ্বের মধ্যে নিয়ে গেছেন তার সমাধান যেমন আকস্মিক ও তেমনি সোজা। উপরন্তু, চরিত্রের পরিবর্তনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দ্রুত। তৃতীয়ত, গল্পগুলি মাঝে মাঝেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। ইনফ্রা রেডিওস্কোপের মতো চমৎকার গল্পেও প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের রূপক মেলানো কঠিন। রাসেল-এর আসল লক্ষ্যও তাই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে। কিংবা হয়তো লক্ষ্যের দ্বৈত ভাব থেকেই এটা হয়েছে। অবশ্য এসব ত্রুটি এখানে বড় কথা নয়। কারণ রাসেল গল্প লিখেছেন এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

সাটার্ন ইন্ দি সাবার্বস-এর অনুবাদকর্মে অজিতকৃষ্ণ বসু মুনসীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষা সাবলীল ও ঝরঝরে—অনুবাদের আড়ষ্টতা প্রায় নেই। রাসেলের চমৎকার গদ্যের খানিকটা স্বাদও তিনি এনেছেন। তবে অনুবাদ নিখুঁত বলতে পারলেই সুখী হতাম। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ করার ফলে, ভাষা জটিল হয়ে পড়েছে। যেমন কুমারী একস্-এর অগ্নি পরীক্ষায়: "শ্রীমতী মেনহেনেটের বন্ধু হিসাবে তিনি

অন্তরঙ্গ মহলে ঠাঁই পেয়েছিলেন, যাঁরা আইনের আওতার ভিতরে থেকেই হোক বা বাইরে থেকেই হোক, বাঁচিয়ে রেখেছিল স্বাধীনতার প্রাচীন ঐতিহ্য যা তাঁদের গিবেলাইন পূর্বপুরুষেরা নিয়ে এসেছিলেন উত্তর ইতালীর তখনো প্রাণবন্ত গণতন্ত্রগুলি থেকে। যারা শুধু পাহাড়, মেষপালকদের কুটির আর কয়েকটা ছোটখাট গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি, সেই ধরনের পর্যটকদের দৃষ্টির অগোচর পার্বত্য গোপন এলাকাগুলোতে তাঁর অবাধ গতি ছিল মধ্যযুগীয় জাঁকজমকে ভরা একাধিক পুরনো প্রাসাদে, যার ভেতর দেখতে পাওয়া যেত প্রাচীন গণফ্যালনিয়াকদের কর্ম এবং বিশ্ববিখ্যাত কণ্ডটিয়ারদের মণিমাণিক্য-খচিত তরবারি।" কিংবা On the morning after my return I presented myself at the house of professor N. I found him sunk in bloom, decorative art forgotten, and Miss X. absent এই অংশের অনুবাদে andটিকে যখন অনুবাদক উপেক্ষা করেন তখনও অনুবাদের বাক্যটিও ঝুলে পড়ে। কদাচিৎ হলেও, অনুবাদের উন্নতিরও অবকাশ রয়েছে। অবশ্যই এসব ছোটখাট ত্রুটি। এবং আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলো সংশোধিত হবে।

জানি না, এই গল্পগুলি বার্ট্রাণ্ড রাসেল এখন লিখলে—এই দশ বছর পরে—কি লিখতেন। বিশেষত কিউবার সংকটের পর তাঁর মনোভঙ্গি কী একরকম ভাবেই প্রতিফলিত হবে? তিনি কি এখনও ভাবেন, "The world was moving more and more in the direction of war and dictatorship, I saw nothing useful that I could do in practical matters." অন্তত তাঁর শান্তির সপক্ষে ঐতিহাসিক সংগ্রাম থেকে সে কথা মনে হয় না। এই শান্তির জন্য সংগ্রাম রাসেলের প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে—এমন কি এই শান্তির জন্যই হয়তো তিনি দুর্নিবার ভ্রান্ত পথে রাশিয়াকে শেষ করে দিতে বলেছিলেন; এখন তাঁর দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ—আরও ইতিহাস-চেতনা সমৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ যুক্তির পথ বেয়েই রাসেলের আত্মিক উত্তরণ এই শান্তির জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামে, পারমাণবিক যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখার অকুণ্ঠ প্রয়াসে—বুঝি বা তাঁর দার্শনিক নিরপেক্ষতাও তিনি ত্যাগ করবেন। এই প্রচণ্ড মানবিকতায় হয়তো, কলিংউড যেমন বলেছেন, রাসেলও বুঝেছেন: "..the minute philosophers of my youth, for all their profession of a purely scientific detachment from practical affairs were the propagandists of a coming Fascism."

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকাশ-জয়ের দিকে আর এক পা

আজ থেকে মাত্র ছয় বছর আগে প্রথম মনুষ্যনির্মিত উপগ্রহটি মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হয়। কিন্তু মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস এত বিচিত্র যে যত রকমের মহাকাশযান এ পর্যন্ত পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলির মাত্র একটি বর্ণনামূলক তালিকা দিতে গেলেই তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই, মহাকাশ-জয়ের পথে কতকগুলি খুব বড় রকমের পদক্ষেপ হিসেবে কয়েকটি মহাকাশযানের নাম করা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই হল সোভিয়েত সাফল্যের সূচক: "স্পুৎনিক—১", "ল্যুনিক—১", "ভোস্তোক—১", "কস্‌মস্—১" সোভিয়েত মহাকাশ-কার্যসূচীর কতকগুলি অতি উজ্জ্বল পর্যায়ক্রমিক সাফল্যের প্রথম অগ্রদূত।

১লা নভেম্বর, ১৯৬৩, তারিখে এই তালিকায় আরেকটি নাম যুক্ত হল—"পলিয়ট—১"। পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমারত অবস্থায় এই মহাকাশযানটির ইচ্ছামত দিক পরিবর্তন করা যাবে। মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে এটা একটা খুব বড় রকমের দিকচিহ্নকে সূচিত করছে।

পৃথিবীর নিকটতর শূন্যলোকে ডাইনে-বাঁয়ে ওপরে-নিচে ইচ্ছামত চারদিক পরিবর্তন করা যায় এমন একটা মহাকাশযানের গুরুত্ব সম্পর্কে খুব বেশি বুঝিয়ে বলা বাহুল্য। গ্রহান্তর-যাত্রার প্রস্তুতিপর্বে যে আন্তর্গ্রহ স্টেশন স্থাপন করা দরকার, তার জন্যে পলিয়ট শ্রেণীর মহাকাশযান অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করার জন্যে উৎক্ষেপণ-বেগ সঞ্চার করা দরকার; কিন্তু কক্ষে স্থাপিত হওয়ার পর তার ঘূর্ণ্যন-পথ অপরিবর্তনীয় থাকে—একটা বৃত্ত বা উপবৃত্ত ধরে তা পৃথিবী পরিক্রমা করে, এই নির্দিষ্ট কক্ষপথের বাইরে তার পক্ষে চলে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা একটা মস্ত বড় সীমাবদ্ধতা। স্পুৎনিকগুলিকে ক্রমেই এমন সব কাজের দায়িত্ব দিয়ে মহাশূন্যে পাঠানো হচ্ছে যার দরুণ তার ইচ্ছামত দিক পরিবর্তন না করলে চলবে না। যেমন, পৃথিবীকে ঘিরে কতকগুলি বিকিরণ-বলয় ও বিপজ্জনক এলাকা রয়েছে। গ্রহান্তরযাত্রীকে সেই সব এলাকাগুলিকে এড়িয়ে

পার হয়ে যেতে হবে। তাছাড়া, উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্যেও মহাকাশযানের দিক পরিবর্তন করা দরকার।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির বাস্তব প্রয়োগের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আবহাওয়া অনুশীলন। বিশেষ করে, হ্যারিকেন বা ঝঞ্ঝাবাত্যার গতিপথ পৃথিবীস্থিত স্টেশনগুলিকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে আবহাওয়া-উপগ্রহের পক্ষে সেই ঝঞ্ঝাবাত্যার দিক পরিবর্তনকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। কৃত্রিম উপগ্রহগুলির অন্যান্য প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে—পৃথিবীর সঠিক আকার ও পৃষ্ঠদেশ অনুশীলন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে বস্তুর পরিবেশন, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ও অন্যান্য ভূ-ভৌতিক গবেষণা সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালানো। এ সবের জন্যেও কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কক্ষ পরিবর্তনে সমর্থ হওয়া প্রয়োজন।

দিকপরিবর্তন কি করে

মহাকাশযান কি করে দিক পরিবর্তন করে? এর জন্যে একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন, কতকগুলি বাড়তি জেট ইঞ্জিন তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে—যে ইঞ্জিনগুলিকে ইচ্ছামত কতকগুলি বিশেষ কোণে নির্ধারণ করে চালালে মহাকাশযানটি তার বিপরীত দিকে গতিশীল হবে। আরেকটি উপায়েও তা করা যেতে পারে: সূর্যরশ্মির চাপ বা প্রেশারকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। পৃথিবীর নিকটতর মহাশূন্যে প্রতিফলন-সক্ষম কোনো বস্তুর ওপরে এই সূর্যরশ্মির চাপ হল প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ০·৯ মিলিগ্রাম। বলা বাহুল্য, এই চাপ এতই অকিঞ্চিৎকর যে পৃথিবীর আকর্ষণের অধীন কোনো মহাকাশযানকে তা সরাতে পারে না। কিন্তু পার্থিব আকর্ষণক্ষেত্রের বাইরে মহাশূন্যদেশে মহাকাশযানের দিক পরিবর্তনে এটুকু বল বা ফোর্সকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। এর জন্যে বাতাসের জোরে নৌকা চালাবার সময়ে যেমন পাল তোলা হয়ে থাকে, তেমনি কতকগুলি আয়না-ফলক এই মহাকাশযানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তার 'পাল' হিসেবে। বাতাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৌকার পালকে যেমন দরকারমতো ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, মহাকাশযানের ওই আয়না-ফলকের 'পাল'গুলিও তেমনি সব সময় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যাতে কিনা সূর্যরশ্মিগুলো সর্বদা সেগুলির ওপরে লম্বভাবে এসে পড়বে। তাছাড়া, মহাকাশযানের চালক ভেতরে থেকে যন্ত্রব্যবস্থায় প্রয়োজনী দিক

পরিবর্তন করার জন্যে বাইরের ওই আয়না-ফলকগুলিকে ভাঁজ করে গুটিয়ে নিতে পারবেন অথবা সূর্যরশ্মির সঙ্গে নির্ধারিত কোণে সেগুলিকে খুলে ধরতে পারবেন।

মহাকাশযানের দিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রকেও কাজে লাগানো সম্ভব: মহাকাশযানের ভেতরে যদি একটা বিদ্যুৎ-পরিবাহী কণ্ডাক্টর রেখে সেটাকে একটা নির্দিষ্ট ধরনে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুবিন্দুর সম্বন্ধপাতে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহলে ওই কণ্ডাক্টর ও পৃথিবীর পারস্পরিক বৈদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ায় মহাকাশযানের গতিমুখ প্রভাবিত হবে। এক্ষেত্রে, ইলেকট্রিক মোটরের নীতিকেই কাজে লাগানো হচ্ছে। মহাকাশযানের ভেতরে রাখা কণ্ডাক্টরের অবস্থান বদলে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ কমিয়ে বাড়িয়ে মহাকাশযানের গতিমুখ ইচ্ছামতো পরিচালিত করা সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট কক্ষে পরিক্রমারত স্পুৎনিকের চেয়ে গ্রহান্তরযাত্রী মহাকাশযানের যন্ত্রব্যবস্থা কত বেশি জটিল।

"নিরেট" স্পুৎনিক থেকে "জটিল" মহাকাশযান

প্রথম যে স্পুৎনিকগুলিকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল, বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি ছিল নানারকম মাপজোকের যন্ত্রপাতি, বেতার ট্রান্সমিটার ও ব্যাটারি ইত্যাদিতে ভর্তি খোল মাত্র। সেজন্যে বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন "নিরেট" স্পুৎনিক। কিন্তু, আগে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তার থেকেই বোঝা যাবে যে মনুষ্যবাহী মহাকাশযানগুলির যন্ত্রব্যবস্থা কত জটিল। সেদিক থেকে, "পলিয়ট—১" হল আরেকটি উন্নততর ও জটিলতর যান্ত্রিক সাফল্য। "নিরেট" স্পুৎনিক থেকে জটিল মহাকাশযানে অগ্রগতির অর্থ হল—একদিকে ডিজাইনের অসংখ্য খুটিনাটি জটিলতা বৃদ্ধি, গুণ ও নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন সাধন এবং অপর দিকে গ্রহান্তর যাত্রার লক্ষ্যে বড় রকমের পদক্ষেপ।

মহাকাশ-স্টেশন

পলিয়ট মহাকাশযানকে নিখুঁত করে তোলার পরবর্তী অধ্যায় হবে নিঃসন্দেহে মধ্যবর্তী "স্পেস স্টেশন" স্থাপন করা—যেখান থেকে দূরপাল্লার মহাকাশ-যানগুলি ভিন্ গ্রহে রওনা দিতে পারবে কিংবা পৃথিবীতে ফেরার পথে এসে

নামবে। এই মধ্যবর্তী স্টেশনগুলি হবে এক-একটি বিরাটকায় স্পুৎনিক, যদিও সেগুলির চেহারা বা আকার কিরকম হবে তা এখনই বলা যায় না।

ইতিমধ্যেই, স্পেস রকেটগুলির ভার ও আকার বিপুল হয়ে উঠেছে। দূরপাল্লার মহাকাশযাত্রায়—যেমন, ধরা যাক, মঙ্গল বা শুক্র গ্রহে রওনা দেবার জন্যে—ধারণাতীত বৃহদাকার রকেটের প্রয়োজন হবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন—এর জন্যে দরকার হবে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান উঁচু ও আয়তনের কোটি কোটি অশ্বশক্তিসম্পন্ন উৎক্ষেপক-রকেট। সেই জায়গায় পারমাণবিক জ্বালানি-চালিত রকেট ব্যবহার করা যেতে পারলে খুবই সুবিধা হয়। কিন্তু সেটা হবে আরও ঢের বেশি জটিল ও উন্নততর যন্ত্রব্যবস্থা।

অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞানীরা এরকম একটা কথা ভাবছেন যে আন্তগ্রহচারী মহাকাশযান একেবারেই পৃথিবী থেকে একটি সম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে রওনা না দিয়ে, তার বিভিন্ন অংশ মহাশূন্যদেশে জুড়ে নিয়ে তারপর তাতে চেপে রওনা হওয়াই ঢের বেশি সুবিধাজনক। মহাশূন্যে ভারহীন অবস্থায় এই অংশ জোড়ার কাজটি হবে অনেক সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এর জন্যে অবশ্য চাই একটি মধ্যবর্তী স্টেশন। এই স্টেশনটি হবে একাধারে স্থায়ী একটি মহাকাশ-গবেষণাগার এবং গ্রহান্তরগামী মহাকাশ-যানগুলির "ফিলিং স্টেশন"। বলা বাহুল্য, ওই মধ্যবর্তী স্টেশনটিকেও গড়ে তুলতে হবে তার বিভিন্ন অংশ জুড়ে জুড়ে—পৃথিবীর এক পূর্বনির্ধারিত কক্ষপথে। এর জন্যে চাই ইচ্ছামতো দিক পরিবর্তনে সক্ষম মহাকাশযান—বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন "ট্রাক স্পেস-শিপ"। এই দিক থেকেই, পলিয়ট-১-এর উৎক্ষেপণ সাফল্য সূচিত করছে মহাকাশ-গবেষণার এক নতুন যুগকে।

সংগ্রাহক

থুম্বা রকেট

গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা বেজে ২৫ মিনিটে ভারতের মাটি থেকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রথম রকেট ছোঁড়া হল। ক্ষেপণকেন্দ্র ছিল থুম্বা, ত্রিবান্দ্রাম থেকে ১৩ মাইল উত্তরে আরবসাগর তীরবর্তী একটি স্থান। রকেটটি অবশ্য ভারতে নির্মিত নয়—এর প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাদের একত্র করে রকেটটিকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণের উপযোগী করে তোলেন।

রকেটটি ছিল দুই স্তরবিশিষ্ট—প্রথম স্তরটির নাম 'নাইকে', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'আপাচি', দৈর্ঘ্যে পঁচিশ ফুট এবং মোট ওজন ছিল কুড়ি মণ। রকেটের জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি কঠিন পদার্থ।

রকেটটি ছোঁড়ার ৩½ সেকেণ্ড বাদে প্রথম স্তরের জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার খোলটি ক্ষেপণকেন্দ্র থেকে আড়াই মাইল দূরে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। রকেটের দ্বিতীয় স্তরের জ্বালানী পঁচিশ সেকেণ্ড বাদে নিঃশেষ হয় এবং তার গতিপথের পেছনে আকাশের বুকে ফুটে ওঠে রক্তবর্ণ সুন্দর সোডিয়াম বাষ্প দিয়ে গড়া একটি মেঘের রেখা। কৃত্রিমভাবে ঐ সোডিয়াম বাষ্পের মেঘ তৈরি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরের খোলটি ক্ষেপণকেন্দ্র থেকে প্রায় একশ পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে পড়ে। রকেটটি গতিবেগ অর্জন করেছিল ঘণ্টায় ২৪০০ মাইল এবং পৃথিবী থেকে তার সর্বোচ্চ দূরত্ব দাঁড়িয়েছিল ১১২½ মাইল। রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে অবশ্য কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা তার অভ্যন্তরে ছিল না।

৬২½ মাইল উচ্চতায় রকেটের মাথায় বসানো আধার থেকে সোডিয়াম বাষ্প নির্গত করে যে কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করা হয়েছিল কন্যাকুমারী, আলামকোট্টা, কোট্টায়ম ও কোদাইকানালে স্থাপিত বিশেষ ক্যামেরা যন্ত্রের সাহায্যে সেই সোডিয়াম-মেঘের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী রকেটের সমগ্র ক্ষেপণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

থুম্বা পৃথিবীর চৌম্বক বিষুব-রেখার ওপরে অবস্থিত। ভারতের মাটি থেকে এই রকেট ক্ষেপণের মূল বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপরে বিদ্যুৎস্রোতের প্রবাহ এবং ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুস্রোতের গতিবিধি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। অবশ্য ভূ-চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর অবস্থিত অন্য যে কোনো জায়গা থেকেই এই পরীক্ষা-কাজ পরিচালিত হতে পারত।

পৃথিবীর সূর্যালোকিত অংশে ভূ-চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর একটি বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হয়, বায়ুমণ্ডলের আয়নস্তরে পৃথিবীর ৫৬ থেকে ৬২ মাইল দূরত্বের মধ্যে যার অবস্থিতি এবং দু-পাশে যার বিস্তৃতি ৬২ থেকে ১২৪ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৬২ মাইল দূরত্বে রকেটের দ্বিতীয় স্তর থেকে সোডিয়াম বাষ্পের মেঘ নির্গত হবার পর সূর্যালোকিত সেই মেঘের

চেহারা যেরকম সর্পিল গতি লাভ করেছিল, তার আলোকচিত্রের মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি সংক্রান্ত কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটির সভাপতি ডক্টর বিক্রম সরাভাই জানিয়েছেন, মহাকাশে শান্তিপূর্ণ অনুসন্ধানের জন্যে ভারতে পরবর্তী রকেট ক্ষেপণ আগামী জানুয়ারি মাসে ঘটতে পারে। থুম্বার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রদের হাতে থুম্বাকেন্দ্র ছেড়ে দেবার জন্যে ভারত সরকার একটি প্রস্তাব করেছেন। সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবার জন্যে রাষ্ট্রসংঘ মহাকাশ কমিটির উদ্যোগে একদল বিজ্ঞানী শীঘ্রই ঐ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করবেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

চিত্রপ্রসঙ্গ

মুকুল দে

কিছুদিন আগে স্থানীয় আর্টস্ অ্যাণ্ড প্রিন্টস্ গ্যালারি শিল্পী মুকুল দে-র ড্রাইপয়েন্ট এচিং ও ড্রয়িংয়ের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে চিত্রকলা-রসিকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। দীর্ঘকাল পরে শ্রীমুকুল দে-র একসঙ্গে এতোগুলি রচনার এই প্রদর্শনী কলকাতার কলাজগতে এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পকে যাঁরা তার নিজস্ব জাতীয় উত্তরাধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন, সেই অবনীন্দ্র-নন্দলালের অন্যতম সহযোগী ও উত্তরাধিকারী প্রবীণ শিল্পী মুকুল দে-র এই প্রতিনিধিস্থানীয় রচনাগুলি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করতে পারে। আমাদের যেসব অন্যমনা উদ্‌ভ্রান্ত মডার্নিস্ট চিত্রকর আজ নিজেদের ভুলতে বসেছেন, তাঁদের নিজেদের চেনার জন্যে এই ধরনের প্রদর্শনীর আজ বহুল প্রয়োজন।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের জাতীয় চেতনার নব বিকাশের যুগে, ঐতিহ্যধারাবাহী ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির অনুশীলন ছিল নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। অবনীন্দ্র-নন্দলাল-প্রবর্তিত, এবং মুকুল দে-র মতো কয়েকজন শিল্পী কর্তৃক পুষ্ট, সেই নব্য-ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিকে যাঁরা "পুরাতনের চর্বিতচর্বণ", "রিভাইভ্যালিজম", "মিউজিয়ম পীস" ইত্যাদি বলে নস্যাৎ করে দিতে চাচ্ছেন, তাঁরা এর এই ঐতিহাসিক পটভূমিটুকু স্মরণে রাখেন না—অথবা জানেন না। ভারতশিল্পের জাতীয় ধারাকে যাঁরা নতুন এক মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে, আমাদের চিত্রকলার নিজস্ব ঐতিহ্যের নবরূপায়নের ও নবমূল্যায়নের বিষয়ে, এক নির্বোধ উন্নাসিক অবজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বিলিতী মালিকপুষ্ট (বর্তমানে দেশী-বিলিতী সংকর-মালিকানাধীন) একটি ট্যাঁস দৈনিকের পাতায়।

শ্রীমুকুল দে-র এই রচনাগুলি দেখে আরেকবার উপলব্ধি করা গেল যে ভারতশিল্পে সেই নব্য জাতীয় ধারা প্রবর্তনে উদ্যোগী শিল্পীরা তার ঐতিহ্যানুসারী মৌল চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে, এর রেখানির্ভর গঠনপদ্ধতির মূলগত গুণগুলিকে না

বদলিয়ে, চিত্রের সংস্থাপনে আর বিন্যাসে পাশ্চাত্ত্য রীতিপদ্ধতিকে কতো সহজে কাজে লাগিয়েছিলেন।—এই দিক থেকেই নব্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা আমাদের জাতীয় শিল্পের ধারায় এক নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শিল্পী মুকুল দে-র রচনার সবচেয়ে বড়ো গুণ হল তার পরম্পরাগত ভারতীয় লিনিয়রিজ্‌ম্‌। প্রায় প্রত্যেকটি রচনাতেই তাঁর সেই সুচারু রেখার বিন্যাস আমাদের খাঁটি দেশজ লিনিয়রিজ্‌ম্‌-এর সমস্ত গুণগুলিকে আত্মস্থ করেছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে—নিসর্গবর্ণনা, প্রতিকৃতি আর কাহিনীচিত্র—এই তিন শ্রেণীর রচনা প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল এবং প্রত্যেকটিই অপূর্ব রেখার সুষমায় ছন্দমণ্ডিত। পোর্ট্রেটগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই যেমন ফুটেছে ব্যক্তিচরিত্রের বিশিষ্টতার ছাপ, তেমনি অন্যান্য ছবিগুলিতে—বিশেষত নিসর্গদৃশ্যগুলিতে—অভিব্যক্তি পেয়েছে শিল্পীর গীতিকাব্যধর্মী কবিমনের পরিচয়। সমকালীন সমাজজীবনের নানা ব্যর্থতা-বেদনার দিক তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে—মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির পটভূমিকায় রচিত ছবিগুলি তার প্রমাণ।

কল্যাণ সেন

আমাদের মতো সাধারণ পথচলতি লোক, যারা এই শহরের গুটিকয়েক বাঁধা জায়গায় সারা বছর ধরে বিভিন্ন চিত্রপ্রদর্শনী দেখে বেড়ায়, তারা যে আমাদের চিত্রকলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছুটা বিমূঢ়, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের আর্টের ক্ষেত্রে ইদানিং আপন-সত্তাহীন উদ্ভট এক বিজাতীয়তার যে উৎকট রক-'ন্‌-রোল চলেছে, তাকে উৎসাহিত করার পেছনে কোনো কোনো স্নব মহলের অবদান তো আছেই। আর আছে—এদেরই হাততালির তালে তালে এক শ্রেণীর শিল্পীর বাজারী তাঁবুর নিচে নাচওয়ালী-সুলভ অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন-ফরাসী ট্যুরিস্টদের পকেট-লক্ষ্য ব্যবসায়িক অপাঙ্গ-দৃষ্টি। দুর্ভাগ্যের কথা, এঁরাই আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে এবং তা পড়ে বলেই আমাদের—পথ-চলতি সাধারণ চিত্রকলা-আগ্রহী মানুষদের—ওই বিমূঢ়তাটুকু হয়তো এখনও পুরোপুরি নৈরাশ্যে পরিণত হয়নি। এই রকম একটি ব্যতিক্রম হলেন শিল্পী কল্যাণ সেন। সম্প্রতি আর্টস্‌ অ্যাণ্ড প্রিণ্টস্‌ গ্যালারী ও গ্র্যাণ্ট অ্যাড্‌ভার্টাইজিং ইন্‌কর্পোরেটেডের যুক্ত উদ্যোগে শ্রীসেনের অনেকগুলি রচনার একটি সুন্দর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। চিত্রকলার

ভাষাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্যেই যে তার জাতীয় চরিত্রের উৎস সন্ধানে যেতে হবে, তার ট্র্যাডিশনের মূল উৎস থেকে রস আহরণ করতে হবে, সে কথাটা আবার নতুন করে মনে হল কল্যাণ সেনের ছবিগুলি দেখে।

শ্রীসেনের রচনা প্রধানত অলঙ্কার-নির্ভর, প্যাটার্ন-প্রধান। দ্বিমাত্রিক গভীরতায় ক্রমপ্রসারী মিশ্রিত রঙ। পরিপ্রেক্ষিত ফ্ল্যাট। গাছপালা, মাছ-পশু আর মানুষের ফিগারগুলি স্টাইলাইজড্।—এ সবই আমাদের লোকশিল্পের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। এবং, কল্যাণ সেন লোকশিল্প থেকে যেমন প্রেরণা নিয়েছেন, তেমনি পাশ্চাত্ত্য চিত্ররীতির কতকগুলি গুণবৈশিষ্ট্যও তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে সমন্বিত—যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ফর্মের ছন্দপূর্ণ বিষমানুপাতিক ভাঙচুর। কল্যাণ সেনের রচনার উজ্জ্বল টেক্সচারে আর রেখার বলিষ্ঠতায় ভারতীয় চিত্রকলার স্টাইলাইজড্ ভাষা অতি সুন্দর রূপে সমন্বিত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য নীতির বাগবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। তাঁর রচনার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য দর্শকদের গভীর আনন্দ দিয়েছে।

মূক-বধির কিশোর শিল্পীদল

এই মাসের গোড়ার দিকে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ হলে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আঁকা ছবির মেলা বসিয়ে এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রদর্শনীটি দেখে বারবার মনে হল—এখানকার ছাত্ররা সরাসরি জীবনের পাঠশালা থেকেই তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা আহরণ করছেন। ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সী প্রায় ২০ জন ছেলের শতাধিক ছবি আর কাঁচা মাটির কাজগুলিতে এমন সুন্দর একটি স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ অভিব্যক্তি পেয়েছে যা শিশু-কিশোর মনের সহজ কল্পনার জগৎ থেকে স্বতোৎসারিত।

অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সীদের অনেকের কাজের মধ্যেই বেশ একটি পরিণত রূপদৃষ্টির ও কারুকুশলতার পরিচয় পাওয়া গেল—যেমন, অমল রেবা (১৬), গুরুদাস কুণ্ডু (১৬), নারায়ণ দত্ত (১৫), সরল দাস (১৩), মহম্মদ মহসীন (১৩), ত্রিদিব রায় (১৩) প্রভৃতির রচনায়।—বিশেষত মহম্মদ মহসীনের রচনায় পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আশ্চর্য সচেতনতার পরিচয় আছে। তেমনি ৬।৭।৮ বছর বয়সী আশীষ মৈত্র, রাধেশ্যাম ঘোষ,

বিনয় পাঠক প্রভৃতির ছবিতে আর শুকিয়ে-নেওয়া মাটির ওপরে রঙ-ছিটানো মডেলিংয়ে আছে অনুসন্ধিৎসু শিশুমনের অপূর্ব কল্পনাশক্তির পরিচয়।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষককে ধন্যবাদ—তিনি তাঁর শিশু-কিশোর ছাত্রদের দিয়েছেন সৃষ্টির স্বাধীনতা, যে-স্বাধীনতা তাদের নিজ নিজ শিল্পী-সত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য।

আশি বছরে শিল্পাচার্য

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে "পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি" আশীর্বাদ জানিয়ে "সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা" রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি অবিস্মরণীয় কবিতা রচনা করেছিলেন। রূপস্রষ্টা সেই কিশোর গুণী গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে স্বয়ং আশি বছরের প্রবীণ যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নন্দলালের জীবনব্যাপী শিল্পকর্মে যে ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য, তার মূল কথাটি হল—তাঁর রূপসন্ধান প্রথম থেকেই নব নব অভিযানে বের হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনো রীতিপদ্ধতির মধ্যে তিনি নিজেকে আটকে যেতে দেননি। ভারতীয় চিত্রকলা—বিশেষত বাংলার লোকশিল্প—যেমন তাঁর প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি প্রেরণা নিয়েছেন তিনি ইওরোপীয় চীনা জাপানী চিত্রকলার বিভিন্ন ধারা থেকেও। বিশ্বশিল্পের রূপস্রোতে তিনি স্নান করে এসেছেন। নিজের দেশের ঐতিহ্য আর জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ আঙ্গিক-আদর্শকে আত্মস্থ করে তাকে দেশের মনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েই তাঁর রীতিবৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। তাই, নন্দলালের প্রত্যেকটি তুলির টানে আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে মূর্ত হয়েছে আমাদের দেশের নিজস্ব এক মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ আনন্দ।

নন্দলালের আশি বছর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে আমরা আমাদের হৃদয় যোগ করছি। জীবতু শারদঃ শতং।

রবীন্দ্র মজুমদার

রুশী-বিস্ময়

Das russische wunder—Directed & Produced by Annelie and Andrew Thorndike : D E F A Studios. G. D. R :

সাম্প্রতিক সোভিয়েত শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্র বিতর্ক প্রসঙ্গে একটি ছবির নাম আমরা ঘুরে ফিরে বারবার শুনেছি। স্বয়ং শ্রীক্রুশ্চেভের বক্তৃতাতেও তার সপ্রশংস উল্লেখ ছিল। কিন্তু ছবিটি এখনও এদেশে আমরা চোখে দেখিনি বলে ক্রুশ্চভের ঐ উক্তির যাথার্থ্য ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমে আমাদের সুযোগ ছিল কম। সম্প্রতি সে সুযোগ যথাতিরিক্তভাবে ঘটে যাওয়ায়, আমাদের যাদের এই ছবিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, বুঝেছি যে এক অসাধারণ চলচ্চিত্র সৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছি আমরা—তথ্যচিত্র ডকুমেণ্টারির ইতিহাসে এমন একটি সৃষ্টি সত্যিই এক অসাধারণ গুরুত্ব বহন করছে।

আরও, সৌভাগ্য আমাদের এই জন্যই যে সেই সঙ্গে এই চিত্রের নির্মাতা ও স্রষ্টাদ্বয় থর্ণডাইক দম্পতিকেও আমরা সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম কলকাতার সোভিয়েত দূতস্থানে তাঁদের জন্য আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। সোভিয়েত কন্সাল-জেনারেল ও জর্মন গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের বাণিজ্য প্রতিনিধির আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এই জর্মন ডকুমেণ্টারি ফিল্মটির দুই দিন ধরে দুইটি খণ্ডের প্রদর্শনী প্রকৃতই দর্শকদের অভিভূত করে রেখেছিল।

শ্রীমতী আন্নেলিয়ে ও শ্রীঅ্যাণ্ড্রু থর্ণডাইক এই অসাধারণ ডকুমেণ্টারি ফিল্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে, ইংরেজী সাব-টাইটেল-এ যার নাম দেওয়া হয়েছে "দি রাশ্যান মির‍্যাকল", তাতে নিজেরাও বলা চলে, অসাধ্যসাধন করেছেন। দুই অংশে বিভক্ত এই "রুশী-বিস্ময়" বিশ-শতকের বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজকের সোভিয়েতে কমিউনিস্ট সমাজ গঠনকার্য পর্যন্ত যে বিরাট প্রেক্ষাপট উন্মোচন করেছে, চলচ্চিত্র শিল্পজগতে, সজীব ডকুমেণ্টারিতে এ রকম কঠিন ও সফল প্রয়াসকে অভূতপূর্বই বলতে হয়। এই তথ্যচিত্রটি পৃথিবীর সেরা তথ্য-চিত্রগুলির প্রথম সারিতেই পাশাপাশি আসন পাবে।

"রুশী-বিস্ময়" সত্যই বিস্ময়কর। কেননা, এ হল পৃথিবীর ইতিহাসের সেই মোড় ফেরান বিপ্লবের চলচ্চিত্র কাহিনী, অদ্বিতীয় বিপ্লব, 'অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এ ছবি রুশরা নির্মাণ করেন নি, করেছেন জর্মনরা। রুশ চলচ্চিত্র দর্শকদের জন্য নয়, যতটা এ ছবির আবেদন হল এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার মানুষের জন্য। যে পশ্চিমী মহলগুলি রুশ বিপ্লবকে একটা "হেঁয়ালি" বলে অবিরত প্রচার চালিয়ে আসছিল, সেই সব দেশেরই জনগণের জন্য। কারণ, এ চলচ্ছবি তুলে ধরেছে তথ্য ও সত্যকে, শত অপপ্রচারের কুহেলিকার আবরণকে ছিঁড়ে দিয়ে। যে দেশ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও ইওরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলির ধারে কাছেও ছিল না, সেই দেশ সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, গৃহযুদ্ধ, আর হিটলারী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব ধ্বংসকে অতিক্রম করে দুনিয়ার সব সেরা পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ আপন শ্রমে, সম্পদে, বিজ্ঞান ও কারিগরীতে ছাড়িয়ে গেল সমস্ত দেশকে —স্থাপন করল মহাকাশে প্রথম স্পুৎনিক, পাঠাল মহাব্যোমে প্রথম মানুষ— এ কি করে সম্ভব, কোন "বুর্জোয়া মহাসত্যে"? জারতন্ত্র পতনের পর পশ্চাদপদ রাশিয়ায় এই দারুণ প্রায়-অসম্ভব দ্রুত অগ্রগতির চাবিকাঠি কোনখানে? পশ্চিমী প্রচারকদের কাছে এ রুশী ধাঁধাঁ, "রুশী বিস্ময়" চলচ্চিত্রে সেই চাবিকাঠির, সেই "যাদুমন্ত্রেরই" সন্ধান দেয়; যার নাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপরাজেয় শক্তিই আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছেন থর্ণডাইক দম্পতি একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই চলচ্চিত্রে। এ তথ্যচিত্রের মালমশলা সংগ্রহের জন্য পাঁচ বৎসর কাটিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে, উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নানান দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে, গবেষণা করে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, লাইপৎজিগ, বার্লিন, মিউনিক, ওয়ারশ, প্রাগ, ভিয়েনা, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক—দুনিয়ার কোনো রাজধানীই এই গবেষক-চিত্রনির্মাতাদের অনুসন্ধানের এক্তিয়ার থেকে বাদ পড়ে নি। এরকমভাবেই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, চারশ'র বেশি ঐতিহাসিক দলিল, ফটোগ্রাফ নিয়েছেন চার হাজার, মোট এক লক্ষ ফিল্ম তাঁরা আলোকচিত্র গ্রহণে ব্যবহার করেছেন।

ছবির প্রথমাংশে দেখি বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লবে জারতন্ত্র উচ্ছেদের পর মস্কোর রেড স্কোয়ারে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের সেই বিখ্যাত আহ্বান দৃশ্য—সেদিনের সেই প্রায়-নিঃস্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে,

শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীকে ডাক দিয়ে বলছেন শিল্পে ও সম্পদে ধনী শ্রেষ্ঠ পুঁজিতন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নাগাল ধরে তাকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য। আর এই অংশের শেষে দেখলাম সেই সোভিয়েত ইউনিয়নই আজ য়ুরি গাগারিনকে সর্বপ্রথম মহাকাশে প্রেরণ করে মানবিক প্রয়াসের চরম সাফল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই "রুশী বিস্ময়" আগাগোড়া অভিভূত করে রাখে। ছবির দ্বিতীয়াংশে সোভিয়েতের দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে কমিউনিজম গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ ও লেনিন নির্দেশিত পথে ওদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজ জীবনে কী বিরাট ব্যাপ্তি ও সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটেছে, দৃশ্যাবলীর পর দৃশ্যাবলীতে তার অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হই। দুই অংশে সমাপ্ত ঘটনাবহুল এই ডকুমেণ্টারিতে থর্ণডাইক দম্পতি পার্থক্যমূলক ও তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে জারতন্ত্রের রাশিয়ায় ছিল দারিদ্র্যের চরম, বেকারি, নিরক্ষরতা সর্বজনীন। শ্রমজীবী মানুষের আবাস ছিল যেন প্রাক্-ইতিহাসের। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য ছিল বন্দীর কঠোর শ্রম, নির্বাসন, গুলি ও পুলিশের নির্যাতন। আর তার পাশেই ছিল শ্রমিক ও কৃষকের ঘর্মে-কর্মে পুষ্ট মুষ্টিমেয়ের ধন দৌলত, ব্যসন-বিলাস।

অক্টোবর বিপ্লব এই সমস্ত কিছুর রূপান্তরের সূচনা করল, একেবারে ভিত্তি ও বনিয়াদ বদলে। আজ সেই সোভিয়েত রাষ্ট্র ৪৬ বছর পূর্ণ করেছে। বিস্ময়কর হল, এই ৪৬ বছরের মধ্যে ২০টি বছরই গিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের চাপান যুদ্ধ বিগ্রহে এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে। সুতরাং থাকল মাত্র ২৫টি বছর। এই পঁচিশ বছরই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, অসাধ্যসাধন হয়েছে। পশ্চাপদ অবস্থা থেকে অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে, বিরাট বিরাট পদক্ষেপে, পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপনে, মহাকাশ বিজয়ী প্রথম পুরুষ গাগারিন, প্রথম নারী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা আর তাঁর সহযোগীদের মহাকাশ আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর অভিযানে—এই "রুশী বিস্ময়" সাধন হয়েছে।

এই চলচ্চিত্র নির্মাতা থর্ণডাইক-দম্পতি এই ফিল্মে ব্যবহার করেছেন সেই সব প্রতিটি সাধারণ অথচ প্রকৃতই অসাধারণ অধ্যবসায়ী সোভিয়েত নরনারীর মুখাকৃতি, শ্রমিক ও কৃষক যাঁরা আজ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা, তাঁদের জীবনালেখ্য এই ছবিটির গতিশীলতায় জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। অবশ্য যত উপকরণ ও কাহিনী তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন, ছবির দৈর্ঘ্য ক্রমেই

বেড়ে যায় দেখে তার অনেকখানিই তাঁরা ছবিতে সংযোজনার অবকাশ পান নি। ছবির দ্বিতীয়াংশে এ রকম যে একজনের জীবনালেখ্য আমরা দেখতে পাই তাঁর নাম ভাসিলি এমেলিয়ানোফ। ছবিতে আমরা দেখি, ভরোনেজ শহরের কাছে আজ যেখানে শক্তিশালী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে একদা ছিল একটি অখ্যাত গ্রাম। অক্টোবর বিপ্লবের আগে চরম দারিদ্র্যে পীড়িত ঐ গ্রাম। গরীব কৃষক এমেলিয়ানোফের বৃহৎ পরিবারে বালক ভাসিলির জন্ম। পাঁচটি জীবিত সন্তানের সেই জ্যেষ্ঠ। ছোট এক বালকের ছবি ভেসে ওঠে পর্দায়। সেই বালক একদিন হল অধ্যাপক, বিজ্ঞান একাদেমির করেসপণ্ডিং সদস্য, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের রাষ্ট্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি। তাঁর জীবনে দেখি তিনি অধ্যয়ন করছেন, গৃহযুদ্ধে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে পরিখায় লড়ছেন, ল্যাবরেটরিতে অক্লান্ত গবেষণা করেছেন, কর্মে ও সাধনায় আত্মনিযুক্ত একজন সোভিয়েত মানুষ। ভাসিলি এমেলিয়ানোফের জীবনপথ একটি ব্যতিক্রম নয়। ও-দেশের কোটি কোটি মানুষেরই জীবনধারার একটি। এ রকমই হলেন কাজাখস্তানের মহিলা ডাক্তারটি, উরালের তরুণ শ্রমিক, সাইবেরিয়ার নতুন শিল্পনগরীর শ্রমিক মানুষ।

১৯১৮-র প্রথম, লেনিন এক সোভিয়েত সভায় দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য প্রত্যেকটি শ্রমিককে সর্বশক্তি নিয়োগের ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মহাসাধনার এক একটি অধ্যায়ের পর অধ্যায় খুলে যায় ছবিতে দৃশ্যের পর দৃশ্যে, পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ছবির শেষ হয় লেনিনেরই সমাধিভূমির পাশে সার দিয়ে দাঁড়ান সারি সারি, বিরাট মানুষের—সারা সোভিয়েত ও পৃথিবীর নানাদেশী আন্তর্জাতিক এক সারির বিমুগ্ধ ক্লাসিক একটি দৃশ্যে, রেডস্কোয়ারের চারদিকে নিষ্কলুষ সাদা তুষারপাতের মধ্য দিয়ে এই আন্তর্জাতিক মিছিল এঁকেবেঁকে চলেছে, চলেছে—লেনিনের স্মৃতিসৌধের দ্বারের দিকে, বিনত শ্রদ্ধায়।

একটি কথা থাকে। এই অসাধারণ ঐতিহাসিক ডকুমেণ্টারির এদেশে সর্বসাধারণের জন্য শো-হাউসগুলিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের পথে বাধা কোথায়?

সত্যেশ রায়

ভাষাচিন্তা বনাম উপন্যাস

'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

'পরিচয়'-এর গত শ্রাবণ, ১৩৭০ সংখ্যায় শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী লিখিত "উপন্যাস: ভাষা ও চিন্তা" প্রবন্ধের প্রথমাংশে শ্রীকমলকুমার মজুমদারের "অন্তর্জলী যাত্রা" উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা পড়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছি। কিংবা হয়তো এতে বিস্ময়ের কিছু নেই; কেননা, একেবারে একেলে গল্প-কবিতার লেখক ও তার সহমর্মী সমালোচকদের রচনা এতই ব্যক্তিক (subjective) ও অনন্য যে আদারব্যাপারি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তার প্রায় সবটুকুই বিস্ময়। আর এ-বিস্ময় এখন আমাদের এতটা গা-সহা হয়ে গেছে যে আজ বিস্মিত হওয়াটাই হয়তো বিস্ময়কর! তবু যে বিস্মিত হয়েছি তার কারণ নিম্নরূপ। যুগান্তরবাবু ওই প্রবন্ধে উপন্যাসের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে যে-সব সামান্য (general) প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা থেকে কেমন-যেন মনে হয়েছে আমাদের সেকেলে সমালোচকদের মামুলি ইতিহাসবোধ আর বিষয়মুখ (objective) সাহিত্যদৃষ্টি তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত। তবু "অন্তর্জলী যাত্রা"-র বিচারের ক্ষেত্রে নিজের উত্থাপিত মৌল নন্দনতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলিকে নিজেই পাশ কাটিয়ে গিয়ে, সর্বপ্রকার যুক্তি-প্রমাণ উপেক্ষা করে নিজের ব্যক্তিগত ভালোলাগাকে সমালোচনার আসনে কেন যে তিনি বসালেন তাই ভেবেই আমাদের বিস্ময়। শুধু তাই নয়। মনে সর্বক্ষণ প্রশ্নের কাঁটা খচখচ করতে থাকলে কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আপন ভালোবাসার কথাটুকু নির্ভেজাল ব্যক্ত করা চলে? যুগান্তরবাবুরও সেই দশা! ফলে তাঁকে আগাগোড়া পরস্পরবিরোধী উক্তি করতে হয়েছে। যেমন, কখনো কমলকুমার মজুমদার-প্রসঙ্গে তিনি বলছেন:

"কোনো কোনো লেখকের ক্ষেত্রে ভাষার সহিত জড়িত এই সমস্যা (দীর্ঘদিনের বহুব্যবহারে শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাষা জীর্ণ ও অব্যবহার্য হয়ে পড়ার সমস্যা—পত্রলেখক) ও প্রশ্ন এমন চরম, নির্বিকল্প মূল্য পায় যে

উক্ত লেখকের সাহিত্যচর্চা এই সমস্যার সমাধান ও প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের ইতিহাসমাত্র বলা চলে।"

আবার কখনো ওই প্রসঙ্গেই :

"...ভাষা ও ভাবনার অব্যর্থ ঐক্যে, অভিপ্রেত তাৎপর্যে কমলকুমার মজুমদারের আশ্চর্য সিদ্ধি না-মেনে উপায় থাকে না।"

'অন্তর্জলী যাত্রা'র আলোচনায় কখনো যুগান্তরবাবু বলছেন :

"...মহৎ উপন্যাসমাত্রই...কবিতার লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়..."

এবং :

"'অন্তর্জলী যাত্রা'-র কালচিত্রণ ও প্রতিবেশ রচনায় কমলকুমার মজুমদারের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা যদিও বর্তমান বাংলাসাহিত্যে অভূতপূর্ব, তথাপি..."

'তথাপি' কী? না—

"'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভাষা ও বিষয়-ভাবনায় কমলকুমার মজুমদার যে-সমস্যা উপস্থাপিত করেন সে-সমস্যা উপন্যাসের নয়, কবিতার।"..."'অন্তর্জলী যাত্রা'-র সর্বত্র কবিতার শুদ্ধ কাজ।"

এবং পরিশেষে :

"'অন্তর্জলী যাত্রা' এক অমোঘ কাব্যের মর্মস্থলে স্থাপিত।"

বুঝুন একবার ব্যাপারখানা! ভাষা-ব্যবহারের সমস্যা যে-লেখকের কাছে "চরম, নির্বিকল্প মূল্য পায়," যাঁর "সাহিত্যচর্চা" "এই সমস্যা" সমাধানের "ইতিহাসমাত্র বলা চলে," তিনিই যে কী করে "ভাষা ও ভাবনার অব্যর্থ ঐক্যে, অভিপ্রেত তাৎপর্যে...আশ্চর্য সিদ্ধি" অর্জন করেন, অন্তত আমাদের আলোচ্য সমালোচনা থেকে তার কোনো হদিস মেলে না। আবার এও আমাদের বিনা প্রশ্নে শুনতে ও মানতে হয়, উপন্যাস-শিল্পের এই "আশ্চর্য সিদ্ধি," মহৎ উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত "'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভাষা ও বিষয়-ভাবনায় ...যে-সমস্যা উপস্থিত...সে-সমস্যা উপন্যাসের নয়, কবিতার"! অহো! "'অন্তর্জলী যাত্রা' এক অমোঘ কাব্যের মর্মস্থলে স্থাপিত!"

এখন বিমূঢ় পাঠকের প্রশ্ন এই : 'অন্তর্জলী যাত্রা' যদি কবিতাই হয় তবে উপন্যাসতত্ত্ব সম্পর্কে যুগান্তরবাবুর এত জ্ঞানগম্ভীর গবেষণার প্রয়োজন কী ছিল? তাছাড়া, উপন্যাস বা কবিতা যাই হোক না কেন, আলোচ্য শিল্পকর্মটি সম্বন্ধে সমালোচকের বিশ্লেষণমূলক আলোচনাই বা কোথায়? শুধু তাঁর কতগুলি বিক্ষিপ্ত জমকালো স্তুতিবাচনকেই কি আমরা ঋষিবাক্য বলে ধরে নেব?

নাকি, তিনি মনে করেন, তাঁর আলোচনাটিও আর একটি সহৃদয়হৃদয়সংবাদী 'অমোঘ কবিতা', ওরফে, একটি যথার্থ একেলে অ্যাংরি-হাংরিআলিস্ট কাব্য-সমালোচনা?—বেচারি যুগান্তরবাবু! তাঁর অবস্থা বিষ্ণু দে-র কাব্যের সেই 'ডলু'র মতো—"ঝগড়া করতে গেলেও ডলুর প্রেমই জাগে"! সাহিত্য-আলোচনাও নিশ্চয় প্রেমেরই প্রকাশ; তবে সে প্রেম কি নিছক ব্যক্তিগত ভালোলাগা, না বিচারবুদ্ধি ও রুচিবোধের হরিহর-মিলনে তার স্ফূর্তি?

অবশ্য এহ বাহ্য। যুগান্তরবাবুর আলোচনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র তথা কমলকুমার মজুমদারের ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে আলাপ। যুগান্তরবাবু বলছেন, "·· কথা এই যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র স্বরূপ ও সিদ্ধি নিয়ে মতামত যাই হোক না কেন, ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধের যে মৌলিক প্রশ্ন কমলকুমার মজুমদার উত্থাপন করেন, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে তা দিগ্‌নির্দেশকারী।"—কিন্তু কমলবাবুর 'ভাষাচিন্তা' বস্তুটি কী? যুগান্তরবাবুর ভাষায়, "কমলকুমার মজুমদারের অন্যান্য রচনার ন্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা'-ও সেই ভাষায় রচিত যা চলিত অর্থে সাধুভাষা। কিন্তু এই শুদ্ধ ভাষা শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের প্রচলিত সাধুত্বের উপর নির্ভর করে না।···বাংলা গদ্যভাষার ধারাবাহিক বিবর্তনকে 'অস্বীকার করে', শুদ্ধতার প্রয়োজনে অদ্যাবধি ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের সকল অনুষঙ্গের অতীত, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গদ্যের শুদ্ধ উৎসে কমলকুমার মজুমদার আত্মমুক্তির পথ খোঁজেন। এবং প্রাচীনতার উৎস সন্ধানে, মনে হয়, কমলকুমার মজুমদার ইংরেজপূর্ব বাংলা গদ্যভাষার সুপ্রাচীন নিদর্শন অবধি অগ্রসর হন।"

সত্যি, বাংলা ভাষার মামুলি ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সাহিত্য-সমালোচকের জ্ঞানের এহেন দৈন্য দেখে আমরা হতচকিত। তাঁর সেন্টিমেণ্টাল হতে পারার অপরিসীম ক্ষমতায় তো রীতিমত বিমূঢ়ই। কিন্তু ব্যাপারটা কী? বর্তমানে কিংবা আজ পর্যন্ত যে বাংলা গদ্য প্রচলিত, আমাদের আঠারো বা উনিশ শতকের তথাকথিত 'প্রাচীন' গদ্য (যুগান্তরবাবুরা নিতান্ত নবীন, তাই একশো বা দু-শো বছরের পুরনো ভাষাই তাঁদের কাছে কখনো 'প্রাচীন', কখনো 'সুপ্রাচীন' ঠেকে!) কি সেই আধুনিক গদ্যের "সকল অনুষঙ্গের অতীত"? আমাদের আধুনিক গদ্য কি তবে সম্পূর্ণ ভুঁইফোঁড়? তাহলে, ঠিক কোন্ সালে কার মস্তিষ্ক থেকে এই ভুঁইফোঁড় পদার্থটির জন্ম হল? কোন্ সাল থেকে কোন্ দৈবদুর্বিপাকে-বা যুগান্তরবাবুকথিত 'প্রাচীন' গদ্যের

বিলোপসাধন ঘটল?—আসলে উক্তিটি ভাষা-ইতিহাসের বিচারে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী ও অর্থহীন। আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের বিশশতকী গদ্যে পরিণতি, যুগপৎ ইংরেজি বা ইংরেজি-প্রভাবিত এবং সংস্কৃতশব্দ সম্ভার, বাক্য-বিন্যাস রীতি ইত্যাদির প্রভাব সত্ত্বেও, ভাষার ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলমাত্র। কাজেই একমাত্র প্রাচীনতাপ্রীতির অন্ধতায় ছাড়া বাস্তবে কোথাও আধুনিক গদ্যের "সকল অনুষঙ্গের অতীত" প্রাচীন গদ্যের অস্তিত্ব ছিল না বা নেই। দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে ওই 'প্রাচীন' গদ্যকেই 'ঐতিহ্যবাহী' বলার অর্থ কি? তবে কি বর্তমানে প্রচলিত গদ্য ঐতিহ্যবাহী নয়? এই দৃষ্টিভঙ্গিও একেবারে একদেশদর্শী এবং অন্ধতাপ্রসূত। খুব সম্ভব, যুগান্তরবাবু 'ঐতিহ্য' বলতে ইংরেজপূর্ব বাংলার সামাজিক রীতিনীতির অনুষঙ্গবাহী শব্দ, বাক্যাংশ বা দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝাচ্ছেন। এটা ঠিক যে, ওই সমস্ত শব্দ ইত্যাদি পুরোপুরি বর্তমান গদ্যে প্রচলিত নেই। এবং এও ধরে নেওয়া যায়, ওই ধরনের কিছু কিছু শব্দ, বাক্যাংশ ইত্যাদির পুনরুদ্ধার আধুনিক গদ্যকে সমৃদ্ধই করবে। তবু একথা বলতেই হবে যে, যা প্রাচীন তার সবটুকুই আমাদের ঐতিহ্য নয়। ইতিহাসের কিছু অংশ পরবর্তী জীবনচর্যার ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হয়, আর কিছু স্বভাবতই যায় আঁস্তাকুড়ে। অতএব যা কিছু আমাদের পুরনো ইতিহাসের অন্তর্বর্তী, তাকেই 'ঐতিহ্য' বলে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা হাস্যকর প্রাচীনতাপ্রীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

অতঃপর, বিবেচনা করা যাক, কমলকুমার মজুমদারের 'ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধ' ব্যাপারটি কি। কী সেই ভাষা, যার কথা বলতে গিয়ে যুগান্তরবাবু বারবার নিজের সমালোচক-সত্তাকে চোখ ঠার দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন। একাধিকবার ন্যায়ত তিনি প্রশ্ন তোলেন:

"উপন্যাসের ভাষামুক্তির প্রয়োজনে বাংলাগদ্যের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন কি কিছুমাত্র সত্য নয়?" (প্রসঙ্গত, লক্ষ্যণীয় যে 'বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন' ব্যাপারটি যুগান্তরবাবু কিন্তু ভালো করেই জানেন এবং মানেন।)

কিংবা:

"আপনকালের কথিত ভাষায় শুদ্ধতার জটিল সম্ভাবনা অনুসন্ধান না করে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় উপন্যাসের ভাষাশক্তির কোন প্রয়োজন সাধিত হয়?"

এবং :

"কথিত ভাষা ও ভাষা-ঐতিহ্যের সমন্বয়ে উপন্যাসের ভাষাচিন্তার প্রয়োজনীয় সমাধান যদিও 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় অসম্পূর্ণ থাকে…"

তথাপি, প্রায় প্রত্যাদেশ পাওয়ার স্বরে, পরিশেষে যুগান্তরবাবু বলেন :

"…তথাপি কমলকুমার মজুমদার-নির্দেশিত ভাষা-ঐতিহ্যের উৎসেই হয়তো বাংলা গদ্যভাষার মুক্তি নিহিত আছে।"

—কেন? কোনো কারণ তিনি নির্দেশ করেন নি। কেননা, সম্ভবত, প্রত্যাদেশের কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি সাহিত্যিক রায় আমাদের মাথা নিচু করে শুনে যেতে হয়।

কিন্তু কমলবাবুর 'ভাষা-ঐতিহ্য' বস্তুটি কি? এটা ঠিক যে, তাঁর ভাষা বর্তমান বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রচলিত লক্ষ নয়। কমলবাবু তাঁর গদ্যে কিছু পরিমাণে অধুনা-অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত পুরাতন (archaic) শব্দ, শব্দসমষ্টি ও বাক্যাংশ ব্যবহার করে পাঠকের স্বাদবদলের আয়োজন করেন। যদিও, আমার ধারণা, এই সমস্ত শব্দ-আহরণে বা 'ভাষা-ঐতিহ্যে'র সন্ধানে তাঁকে অধিকাংশ সময়েই বঙ্কিম কি বড়জোর বিদ্যাসাগর-যুগ পর্যন্ত পিছু হটতে হয়, তার বেশি নয়। কিন্তু কমলবাবুর ভাষার যে-গুণটি বিশেষ করে পাঠকসাধারণকে আকৃষ্ট করে এবং সম্ভবত যার সন্ধান পেয়েই যুগান্তরবাবু তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তা হল ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধি। কমলবাবুর ভাষায় চিত্রময়তা এবং অতর্কিত ব্যঞ্জনার এই প্রসাদ, এই শিল্পগুণ তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে বেশ কিছু প্রশংসা কমলবাবুর অবশ্যপ্রাপ্য। কিন্তু হলে হবে কী, এরই সঙ্গে কমলবাবু তাঁর নিজশিল্পের মৃত্যুবাণও বেশ আয়াস করে গড়ে তুলেছেন। তা হল, তাঁর অতিরিক্ত, অপ্রতিরোধ্য ভাষা-মনস্কতা এবং মানসিক খামখেয়াল বা উৎকেন্দ্রিকতা। এই উৎকেন্দ্রিকতা থেকে তাঁর ভাষায় বেশ কিছু দোষও বর্তেছে। যেমন, প্রথমত, কমলবাবুর গদ্যে থেকে থেকে গুরুচণ্ডালীর আকস্মিক ও শ্রুতিকটু প্রয়োগ। ফলে, এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ভাষার ভারসাম্য নষ্ট হয় :

(ক) "চতুর্দোলার আসনে যজ্ঞবাট করা হইয়াছে, চারিভিতে ছোঁড়া কদলীবৃক্ষ লাল সূতা দিয়া গণ্ডীবদ্ধ।"

(খ) "সে বলিতে চাহিল, আচ্ছা সারা দুনিয়ার লোক মিলে যদি হা হুতাশ করে, আকাশে কি তাহলে টেলিগ্রাফ হবে?"

এখানে (ক)-অংশের 'ছোঁড়া' ও (খ)-অংশের 'টেলিগ্রাফ' শব্দটি লক্ষণীয়। তাছাড়া দ্বিতীয় শব্দটির (একেলে শিল্পাঞ্চলের বুলির) ব্যবহারে স্থান ও কালানৌচিত্য-দোষও ঠাহর করবার মতো। এভাবে পাঠককে চমক দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমলবাবুর পক্ষে অশুভ হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত, কমলবাবু ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে প্রায়-নিরঙ্কুশ। অবশ্য সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষার মতো বাংলায় ক্রিয়ার কালের ব্যবহার সম্পর্কে অতটা কড়াকড়ি নেই এবং অতীতের আওতায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যতে অতীত ও বর্তমান কালের সুসমঞ্জস, সংযত প্রয়োগ বাংলায় যথেষ্টই চলে। কিন্তু মনে হয়, কমলবাবু ভাষারচনায় 'সামঞ্জস্য' ও 'সংযম' কথা দুটোর তেমন পক্ষপাতী নন। তাই এক্ষেত্রে তিনি আংশিক স্বাধীনতার একেবারে পরাকাষ্ঠা করে ছাড়েন। আমরা জানি, প্রতিটি অনিয়মের মধ্যে একটি অলিখিত নিয়ম থাকে। এক্ষেত্রে সেই অলিখিত নিয়মটি সময় সময় কমলবাবু এমন মজাদারভাবে লঙ্ঘন করেন যে মনে হয় বুঝি-বা তিনি স্বয়ং মহাকালের মতো সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে কালবাচক ক্রিয়াপদগুলিকে তাদের নিজ নিজ মর্জি অনুসারে যত্রতত্র স্থানগ্রহণের অবাধ অধিকার দিয়েছেন:

(ক) "গীতের বাণী পোড়া কাগজের মতো গঙ্গার হাওয়ায় ফরফর করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, তথাপি শ্রোতাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; বৈজু এখনও তাহার হাঁটুর প্রায় কাছেই চাপড় মারিয়া হৈ-হৈ করিয়া গাহে।"

(খ) "এখন তাঁহাদের পরিক্রমণ করিয়া সাত পাক চলিতেছে, সীতারাম অনেকবার আপনার ভারাক্রান্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে চাহিলেন, ফলে তাঁহার দুর্বল স্কন্ধই কাঁপিয়াছিল।"

তৃতীয়ত, কমলবাবুর যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটির কথা আগেই বলা হয়েছে, অর্থাৎ, তাঁর ভাষার চিত্ররূপময়তা ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধি এবং যে-বিশেষ গুণটি আয়ত্ত করার জন্যে তাঁকে ভাষার খাঁটি বাঙালিয়ানা বা তথাকথিত 'শুদ্ধতা' পরিহার করে অনেক সময় ইংরেজি বাক্যগঠনের অনুসরণে বাক্যান্তর্গত অসংলগ্ন অপ্রধান বাক্য বা বাক্যাংশ (parenthesis) ব্যবহার করতে হয়, সময় সময় সেই বৈশিষ্ট্যটিরও অসংযত ও উৎকেন্দ্রিক প্রয়োগ কষ্টপাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি-শিক্ষিতের বাংলা ভাষায় ইংরেজি-ধরনের চিন্তা ও বাক্যবিন্যাসের প্রভাব অবশ্য গত একশো বছর ধরে একরকম স্বতঃসিদ্ধ। এতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু মতান্তরের ন্যায্য কারণ থাকে তখন, যখন কমলবাবুর

অসতর্ক (কিংবা অতি-সতর্ক ?) গন্থ সাবেকি ইংরেজি গন্থের প্রায় তর্জমা বলে ভ্রম হয় :

(ক) "প্রজ্বলিত চিতা তাহার পথরোধ করিল ; যে চিতা, যাহা দাহ্যমান (sic !), যাহা অনির্ব্বাণ, যাহা শেষ, যাহা বন্ধুহীন !"

(খ) "বৈজুনাথের ওষ্ঠ ওঠানামা করে ; ঝটিতি, এই গহনরাত্রে যাহার একান্তে কুয়াশা আবৃত খরধারা, তাহার ভগ্নস্বর শ্রুত হইল।"

অথচ মজা এই, যুগান্তরবাবুরা কমলকুমারের ভাষার কবিত্ব ও অভিনবত্বে এতদূর মুগ্ধ যে সে-ভাষায় ইংরেজির এই প্রবল প্রভাব তাঁদের চোখ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। তাঁরা বোধহয় অচলিত বাংলা শব্দের নামাবলীটি দেখেই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, সে-নামাবলীর আড়ালে কোন্ ম্লেচ্ছ উঁকি দিচ্ছে সেদিকে নজর দেবার ফুরসত নেই।

পরিশেষে, বলা দরকার, এত কথা থেকে কেউ যেন না মনে করেন বর্তমান পত্রলেখক কমলবাবুর সাহিত্যের বিরোধী। বিশেষ করে পত্রলেখক তাঁর 'অন্তর্জলী যাত্রা'র সত্যিই গুণগ্রাহী। অল্পাধিক বীভৎসা ও অতি-নাটকীয়তা-ত্রুটি সত্ত্বেও, মহাশ্মশানে নিশ্চিত বিনাশের মুখোমুখি সীতারাম, যশোবতী ও চাঁড়াল বৈজুনাথের অভিনব পরস্পর-সম্পর্ক ও জীবনলীলা এবং সেই অমোঘ বিনাশ ও ক্ষয়ের বিরুদ্ধে যশোবতী-বৈজুনাথের তীব্র, তীব্রতর প্রতিবাদের প্রবল অভিঘাতে এই পত্রলেখকও অভিভূত ! বিশেষত এক ট্রাজিক পরিণামের পূর্বাহ্ণে এই তীক্ষ্ণ মানবিক আবেদনটুকুই কালের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে পাঠকের মনের সেতুবন্ধন ঘটায়। অধিকন্তু, কমলবাবুর ভাষার পূর্বোক্ত চিত্রময়তা ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধি এই সাযুজ্য সংঘটনে সাহায্য করে। বইটিকে পুরোদস্তর উপন্যাস বলা চলে কিনা এবং এটি কী সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও, রচনাটি নিঃসন্দেহে বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি উল্লেখ্য ও বিশিষ্ট সংযোজন। তবু, সব সত্ত্বেও আবার বলব, কমলকুমার মজুমদারের ভাষায় অতিরিক্ত আয়াসচিহ্ন, মুদ্রাদোষের আধিক্য ও উৎকট উৎকেন্দ্রিকতা তাঁর শিল্পের রসোপলব্ধির পথে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় যদিও এ-ত্রুটি অপেক্ষাকৃত কম চোখে পড়ে, তাঁর দুর্বলতর বেশ কিছু রচনায় তবু এই বাধাই একেবারে শিল্প-সংহারক মূর্তিতে দেখা দেয়।

একটা কথা। শুধু যুগান্তরবাবু নন, সম্প্রতির লেখক-সমালোচক মহলে

তথাকথিত 'শুদ্ধতা' ব্যাপারটি সম্পর্কে একটা অন্ধ ভক্তি বা fetishism লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্ভবত, 'শুদ্ধতা' বলতে এঁরা বস্তু বা শিল্পের বিশুদ্ধ রূপ কিংবা যাথার্থ্য বোঝাতে চাইছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় ও মানসিকতায় শুদ্ধতার একান্ত অভাব থেকেই কি এর এত চাহিদা? সে যাই হোক, কিন্তু যুগান্তরবাবুরা কি মনে করেন, শব্দের জোড়-বিজোড় খেলায় মেতে শুধুমাত্র শিল্পের মাধ্যমে 'শুদ্ধতা'-চর্চায় পরমার্থ মিলবে? শুদ্ধতা-অর্জন কি শুধুই শিল্পনৈপুণ্যের আয়ত্ত? মূলত, শিল্পীর জীবনচর্যাগত ও আত্মিক শুদ্ধতা থেকেই কি শিল্পে শুদ্ধতা আসে না? যুগান্তরবাবুদের লেখা পড়ে কিন্তু মনে হয়, তাঁরা শুদ্ধতা-অর্জনের 'মেড-ইজি' বুঝি আবিষ্কার করে ফেলেছেন! কিন্তু তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি, শিল্পের শুদ্ধতা শুধু পুরাতন শব্দ ও ভাষা-নির্বাচনে নেই, যেমন নেই ধর্মের শুদ্ধতা ফোঁটা-তিলক-নামাবলী আর বিধিমতে সন্ধ্যাহ্নিকের মধ্যেই। ইতি—

অনিরুদ্ধ রায়

"চিত্রভাষা ও সমকালীন শিল্পী"

সম্পাদক সমীপেষু,

বেশ কিছুকাল পূর্বে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত "ভারতীয় শিল্পী এবং সমকালীন শিল্প" শীর্ষক শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মননশীল প্রবন্ধটি পাঠ করে পরিচয়ের পাঠক হিসেবে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে।

লেখক নিজে শিল্পী। আর, ভূমিকাতেই মধ্যযুগের হারিয়ে-যাওয়া "আলপনা আঁকা দূর দূরান্তের" স্মৃতির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন; তার জন্য দায়ী করেছেন যন্ত্রদানবকে। প্রশ্ন করি, সামন্ততান্ত্রিক জীবনবিন্যাসের উপাদানই কি তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ আর্টের বাহন? আর যন্ত্র কি শুধু দানবই, না যন্ত্র যন্ত্রই—যার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে অধিক আদায় করতে পারছে। যে সমাজব্যবস্থা মানুষের শ্রমকে রূপান্তরিত করে মুনাফায় সেখানে সে দানব; কিন্তু যেখানে মানুষের শ্রম তার সমাজের প্রত্যেকের মহত্তম বিকাশের জন্য, সেখানে যন্ত্র কি বন্ধু নয়? কায়িক শ্রমকে লাঘব করে সেই তো করে দেয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিল্পচর্চার অবকাশ।

আর পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শ আজ নতুন নয়, রামমোহন

থেকে রবীন্দ্রনাথ তার ফলশ্রুতি। কাজেই সংস্কৃতির রূপ শুধু বর্তমানেই বদলাচ্ছে না, অনেক আগেই বদলেছে।

তাছাড়া, আজকে শুধু পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শ বললে সব কিছু বলা হয় না। ভিন্নধর্মী সমাজবিন্যাসে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পশ্চিমের নানা দেশে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আমাদের দেশের শিল্পী তার অনুকূল রুচির মালমশলা সেখান থেকে গ্রহণ করছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে শিল্পীর সৃজন শক্তিকে যে সমস্ত উদ্দীপক উদ্বোধিত করছে সেখানে সে সার্থকতা লাভ করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যেখানে নতুন আন্দোলনের জন্যই আন্দোলন, সস্তা মোক্ষই মুখ্য—ব্যর্থতা সেখানে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। দেবব্রতবাবুর কাছে সে আলোচনার প্রত্যাশা স্বভাবতই থাকে।

নতুন শিল্পধারার আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি দুটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, একটি অন্তর্মুখী অপরটি বহির্মুখী। স্যুররিয়ালিজম্ এবং কিউবিজম্ কোন সংজ্ঞা বহির্মুখী জানা নেই। কারণ স্যুররিয়ালিজমের ভিত্তিই যে তথাকথিত অবচেতনকে নিয়ে এটাই জানা ছিল এতদিন। আমি শিল্পরসিক নই, তবে চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে যেটুকু শিক্ষার অবকাশ পেয়েছি তাতে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হয়েছে।

মাতৃভাষার একটা সীমিত গণ্ডী আছে জানি কিন্তু শিল্প-ভাষা যে সম্পূর্ণ জাতিগত এটা জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা বাংলা সাহিত্যের গল্প, নিঃসন্দেহ। কিন্তু যে কোনো ভাষায় অনূদিত হলে পাঠকরা কি তার রসগ্রহণে অসমর্থ হবেন। র‍্যাফেলের মোনালিসা কি আমাদের কাছে কোনো সংবেদনের সৃষ্টি করে না। তাছাড়া, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো যেদিন থেকে আমাদের সংস্কৃতি জগতে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে, সেদিনই কি সে আন্তর্জাগতিক চরিত্রে অভিষিক্ত হয় নি। তাতে আমাদের ভাষা কিংবা শিল্পের অগ্রগতি কি ব্যাহত হয়েছে না সমৃদ্ধতর রূপ পেয়েছে। ভাষা-প্রীতি মানুষের জন্মগত, কারণ সে-ভাষা তার চিন্তা এবং অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। এবং সেই ভাষাকেই সমৃদ্ধ করার জন্যই সে বিশ্বের সঙ্গে করে মিতালি। চিত্রের ভাষা মূক ভাষা, কাজেই তাকে বুঝতে হলে হরফ চিনতে হয় না বরঞ্চ রঙ ও রেখার বিশ্বজাগতিক রূপেই সে মুখর। ভাবা-প্রীতি কিংবা দেশীয় পদ্ধতিতে শিল্প-রচনা কোনোক্রমেই আন্তর্জাতিকতার বিরোধী হতে পারে না। অতিরিক্ত স্বদেশীয়ানার জেরই বিশ্বের ইতিহাসে বেদনাদায়ক।

রমেন্দ্রনাথ দাস

কেনেডির রক্তাক্ত অপসারণ ও "মুক্ত গণতন্ত্র"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ প্রেসিডেণ্ট জন ফিট্‌জেরাল্ড কেনেডির হীন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যেমন মর্মান্তিক, তেমনই নিষ্ঠুর। এই শোকাবহ ঘটনায় সম্প্রতিকালের মধ্যে সারা বিশ্ব এমন চকিত নাড়া খেয়েছে, যা আর কিছুতে নয়। স্বদেশীয় আততায়ীর গুলিতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিরোমণি রাষ্ট্র মার্কিন দেশের সর্বপ্রধান ক্ষমতাসীন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতিকেও যে অকালে তরুণ বয়সে রক্তাক্ত দেহে ভূলুণ্ঠিত হতে হয়েছে, এ ঘটনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। কারণ, আততায়ী একজন নয়, এ নৃশংস হত্যার রহস্যসূত্র যত বেশি ঘনীভূত হয়েছে, তত বিশ্ববাসী দেখেছে—এই প্রেসিডেণ্ট হত্যার পিছনে রয়েছে দস্তুরমত সংগঠিত একটি চক্র, হত্যাকারী সে মাত্র কেউ একজন নয়—তাহলে এরা কারা?

টেক্সাসের ডালাস, যেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি খুন হলেন সেই শহরের বাতাস পর্যন্ত কুৎসিত বর্ণবিদ্বেষে বিষিয়ে-ওঠা। হত্যাকাণ্ডের পট যত উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তত দেখা যায় পর পর আরও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। অসওয়াল্ড, যাকে প্রেসিডেণ্টের খুনের দায়ে ধরা হল, দেখা গেল তাকেও খুনের জন্য এগিয়ে এল আর একজন, জ্যাক রুবি। ডালাসের পুলিশের দপ্তরে প্রকাশ্য দিবালোকে সাংবাদিকদল আর পুলিশের চোখের সামনে প্রেসিডেণ্টের আততায়ীকে আর একজন গুলি করে মেরে যায়—এ রহস্যের মর্মভেদ কে করবে? তার আগেই খুন হয়ে যায় আরও দুজন। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে দুনিয়ার চার কোণের মানুষ এই সব সংবাদ-হেডলাইন দেখে দেখে স্তম্ভিত হন। মার্কিন দেশের সাধারণ মানুষ দেখেন টেলিভিশনের পর্দায় পর পর হত্যাকাণ্ডগুলির দৃশ্য, আর শিহরিত হন। এই সব কি কেনেডি হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সাক্ষ্য সূত্রগুলি লোপ করে দেবার সুপরিকল্পিত ঘটনা-পরম্পরা নয়? তরুণ প্রেসিডেণ্টের হত্যা, তারপর সেই শোকাহত প্রেসিডেণ্ট পত্নী জ্যাকুইলিন কেনেডি, তাঁর দুই শিশু—ক্যারোলিন ও জন; টেলিভিশনের পর্দার প্রতিফলনে এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য ভেসে ওঠে—শোকে ও আঘাতে সকলেই বিমূঢ় হয়ে যান।

কিন্তু, প্রেসিডেণ্ট হত্যাবৃত্তান্ত যত স্পষ্ট হচ্ছে, তত দেখা যাচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রে উগ্রতম সমরবাদী জঙ্গী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি কেনেডি হত্যার পিছনে কেমনভাবে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করছিল। এটা কি সত্য নয় যে,

মার্কিনেরই প্রতিক্রিয়ার উগ্রতম শক্তিগুলিই কেনেডির কিছুটা বাস্তববাদী উদারনৈতিক 'নিউ ফ্রন্টিয়ার্স' দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতায় নেমে পড়েছিল? আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেনেডিকে হারিয়ে দেবার জন্য সেনেটর গোল্ড-ওয়াটারকে ঘিরে ওদেশজোড়া দক্ষিণপন্থী সমাবেশ—যার কর্ণধার ছিলেন টেক্সাসের সেনেটর টাওয়ার? কেনেডি হত্যাকে কুহেলিকা করে কমিউনিজম ও কিউবা-বিরোধী জিগির তোলবার সুপরিচিত ফ্যাসিস্ত কায়দা? 'নিউ ফ্রন্টিয়ার্স' দৃষ্টিভঙ্গির প্রেসিডেন্ট বিশ্বাসী হয়েছেন বাস্তবগতভাবে ক্রুশ্চেভের "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান"-এ, প্রথম দিকে কিউবায় হটকারিতার পর সম্মত হয়েছেন অনাক্রমণ প্রতিশ্রুতিতে, পারমাণবিক পরীক্ষার আংশিক নিরোধের মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন এবং সেনেটকে দিয়ে তা গ্রহণ করিয়েছেন, ক্রেমলিনের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের "হটলাইন" যোগাযোগে এসেছেন, এবং স্বীকার করেছেন "স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কে নীতি পুনর্বিবেচনা"য়। মনে পড়ে রুজভেল্টের "নিউ ডীল"-ও মার্কিন দেশের চরম প্রতিক্রিয়ার বিরাগভাজন হয়েছিল।

কিন্তু, ততোধিক। পুঁজিবাদী দুনিয়ার চূড়ামণি মার্কিন রাষ্ট্রে কোটি কোটি নিগ্রোর স্বাধিকার নেই, আজও অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের সংস্কার উদ্যোগের পুরো এক শতাব্দী পরেও। "মুক্ত গণতন্ত্র"ই বটে! তরুণ কেনেডি লিঙ্কনের এক শত বছর পরেও তাঁর আরব্ধ কিছু কাজকে সমাপন করবেন কেন ভেবেছিলেন, নিগ্রো "সিভিল রাইটস বিল" আনতে চেয়ে? প্রেসিডেন্টের এ এক অমার্জনীয় "অপরাধ"। নিশ্চয়ই, "মুক্ত গণতন্ত্র"! এমনই "মুক্ত ও অবাধ গণতন্ত্রে"র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে তার জন্য হিংস্র হত্যাকাণ্ডে তাই রাষ্ট্রপতি কেনেডির রক্তাক্ত অপসারণ হতেই হয়।

মার্কিন দেশের ৩৫তম রাষ্ট্রপতির এরকম নগ্ন ফ্যাসিস্ত কায়দায় অপসারণ ক্রিয়ার পর, নতুন ৩৬তম রাষ্ট্রপতি জনসন বলেছেন কেনেডি নীতিকে তিনি চালু রাখবেন। ইতিহাস তাঁর এ প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা করবে। আমরা আপাতত আমাদের দেশেরই কিছু "মুক্ত গণতন্ত্রে"র পূজারীদের কাছে নিবেদন রাখি: অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এমন কি "শিল্পীর স্বাধীনতা"র জন্য তাঁরা কোনো এক বিশ্ববীক্ষাকে চুরমার করে দিতে সম্প্রতি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন; তাঁরা আজ স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করুন: "মুক্ত দুনিয়ার" অবাধ "ব্যক্তি-স্বাধীনতা" কতখানি, যেখানে নাগরিক সমানাধিকারের সামান্যতম সৎ প্রচেষ্টা করতে গিয়েও জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির মতো ক্ষমতাশীর্ষাধিষ্ঠিত একজন প্রতিভাবান

তরুণকে ধূমায়িত বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে নিজের "ব্যক্তি-স্বাধীনতা"টুকুকে চিরকালের মতো বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হয়। জানি না, এই ভয়াবহ মর্মান্তিক সত্যটির তাৎপর্য যদিইবা তাঁদের মস্তিষ্কে ঢোকে!

পুঞ্চের শোক

বিগত মাসে শোচনীয় জীবনাবসানের তালিকায় যুক্ত হল পুঞ্চের কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ভারতীয় সেনানীমণ্ডলীর পাঁচজন সেনাধক্ষ্যের নাম। আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষায় এই সেনাধক্ষ্যদের শোকাবহ অকালমৃত্যু এক গুরুতর ক্ষতিসাধন করল। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদের অন্ত্যেষ্টি পালিত হয়েছে।

পানিক্করের মৃত্যু

সর্দার কে. এম. পানিক্করের মৃত্যু শুধু মাত্র একজন খ্যাতনামা কূটনীতিজ্ঞকে নয়, একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও চিন্তাবিদকেও জাতীয় জীবন থেকে হরণ করল। আমরা আমাদের শোক জ্ঞাপন করি।

শঙ্কর দেব

পাঠক ও অনুরাগীদের প্রতি নিবেদন

আগামী ১৯৬৪ সালে শেক্সপীয়রের চারশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব সারা পৃথিবী জুড়ে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে, 'পরিচয়'-ও তার সীমাবদ্ধ সাধ্য নিয়ে এই শেক্সপীয়র উৎসবে যোগদানের আয়োজন করছে। আগামী বছর মে মাসে এজন্য 'পরিচয়'-এর একটি বিশেষ শেক্সপীয়র-সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞ, বিদ্বৎজন ও খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের রচনাসহ এই সংখ্যাটিকে যথোচিত সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে কোনও চেষ্টারই ত্রুটি রাখা হবে না। দেশ-বিদেশে শেক্সপীয়র-চর্চার বিবরণীও আমরা ঐ সংখ্যাটিতে সংযোজিত করতে পারব বলে আশা রাখছি। এই উপলক্ষেই 'পরিচয়'-এর পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যার মধ্যেই আমরা শেক্সপীয়রের জীবন-আখ্যান নিয়ে রচিত ব্রিটিশ নাট্যকার ক্লিমেন্স ডেন-এর কাব্যনাট্য 'will Shakespeare ; an invention in four acts' কাব্যনাট্যটি ধারাবাহিকভাবে পত্রস্থ করব। এর অনুবাদ করেছেন রুদ্র সেনগুপ্ত।

প্রসঙ্গত, 'পরিচয়'-এর অগণিত পাঠক ও সুহৃদ-অনুরাগীদের কাছে আমরা একটি নিবেদন জানিয়ে রাখি। সাম্প্রতিক কয়েকটি সংখ্যা থেকে 'পরিচয়'-এর ক্রমবর্ধিত চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের 'পরিচয়'-পত্রিকার যোগান দিয়ে উঠতে না পারায় ক্ষমাপ্রার্থী। সেজন্য, আরও অধিক সংখ্যায় 'পরিচয়' যাতে ছাপা হয়, তজ্জন্য আমরা এখন থেকে প্রেস ও কাগজ-সংক্রান্ত যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শান্তি ও মৈত্রীর জন্য

'পরিচয়'-এর বিগত সংখ্যা এবং এই অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশের মাঝামাঝি আমাদের দেশে এবং এই কলকাতা শহরেই যে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে গেল তা হল আমাদের দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক গভীর ও ক্রম-উজ্জ্বলতর মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের অভিব্যক্তি-ঘটানো অবিস্মরণীয় ঘটনাটি।

এই মহানগরেরই আতিথ্য গ্রহণ করে দিন দুই কাটিয়ে গেলেন সোভিয়েত মহাকাশচারীত্রয়ী, যার মধ্যমণি ছিলেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী শ্রীমতী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। এবারের "মিছিলের শহর" তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদিত হল। এর কিছু আগেই হয়েছে রাঁচী ও দুর্গাপুরে সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার উদ্বোধন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিশ্বশান্তির স্বার্থে আমাদের উভয় দেশের মৈত্রীকে ব্যাপক ও দৃঢ়-ভিত্তিক করে তোলবার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সেদিনই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সোভিয়েত শিল্পীর ভাস্কর্য 'রবীন্দ্রনাথ' উপহারপ্রদান অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই সব ঘটনাই আমাদের দেশের সাম্প্রতিক গতিপথটির একটি দিকের নিঃসন্দেহ নির্দেশ দিচ্ছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে 'পার্লামেণ্টারিয়ান ফর পীস' সংস্থাটির উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও বিশ্বশান্তি" সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হল। আমাদের পার্লামেণ্টের সর্বদলমতের আড়াই শত সদস্য এ সংস্থার আলোচনাচক্রের উদ্যোগী। বিদেশাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্যাসহ তিনজন প্রতিনিধি, যুগোশ্লাভ কমিটি অফ দি ইণ্টারপার্লামেণ্টারী ইউনিয়নের প্রতিনিধি, সিংহল পার্লামেণ্ট, বৃটিশ পার্লামেণ্ট সদস্য ও লেবর দলের সভাপতি, আরব লীগের প্রতিনিধি ও অন্যান্যরা। যে ছয়টি বিষয়ে এ আলোচনা-চক্রের কমিশনগুলি আলোচনা করলেন, বর্তমান বিশ্বে সেগুলির তাৎপর্য অসীম। যেমন, "নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক বিপদ", "ভারত প্রতিবেশী দেশ ও পৃথিবী", "নিরস্ত্রীকরণের অর্থনীতি", "উপনিবেশবাদ", "বর্ণ-বৈষম্যবাদ ও মানবিক অধিকার" ও "ঠাণ্ডাযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সহযোগের পথে পদক্ষেপ"। আলোচনার উদ্বোধনে শ্রীজওহরলাল নেহরুর ঘোষণাটিও স্পষ্ট: "আজকের

নানা অসুবিধা, চৈনিক আক্রমণ ও আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ভারতকে সচেষ্ট হতে হবে শান্তির জন্যই। কারণ শেষ পর্যন্ত শান্তিই হচ্ছে মৌল লক্ষ্য, আর অন্য সব সমস্যাই হচ্ছে আপেক্ষিকভাবে গৌণ।" বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতের পার্লামেণ্ট সদস্যরা যে আগামী দিনে এক বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নিলেন, তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পীট সীগরের গান

কলকাতায় ঘুরে গেলেন আমেরিকার খ্যাতনামা লোকসঙ্গীতশিল্পী পীট সীগর। একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানে ও পার্ক সার্কাস ময়দানে খোলা মঞ্চে তাঁর গলায় গান শুনে বুঝি, সত্যিই এ এক অভিজ্ঞতা।

সম্প্রতি মার্কিন দেশের হতবুদ্ধিকর রাজনৈতিক ঘটনাকাণ্ডের পর, সেই দেশেরই আর এক সুস্থ, সুসমঞ্জস, গণসংস্কৃতির রূপ পীট সীগরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখে আমরা আর এক প্রাণবন্ত আমেরিকার স্পন্দন পেলাম। সে আমেরিকা হুইটম্যানের, মার্ক টোয়েনের, পল রোবসনের। 'টুইস্ট' নৃত্য আর 'পপ' সঙ্গীতের, রক-এন-রোল সংস্কৃতির এ আমেরিকা নয়। মার্কিন লোকসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গীত-সংগ্রাহক, রচয়িতা ও সুরকার পীট সীগর। কার্ল স্যাণ্ডবার্গ যাঁর সম্পর্কে বলেন "তাঁকে আমি স্থান দেব মার্কিন লোকসঙ্গীত গায়কদের প্রথম সারিতে।"

নিজ দেশ আমেরিকার লোকগাথা সংগ্রহেই তুষ্ট না থেকে, এখন তিনি বেরিয়েছেন তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার ভরে তুলতে বিশ্ব পর্যটনে। তাঁর গানের ভাণ্ডার ভরে উঠছে শুধু ওদেশের নয়, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার লোকসঙ্গীতের চয়নে। কলকাতায় দু-দিন থাকা কালে তিনি শুধু শহরেই কাটান নি, গেছেন বোলপুরে, দুবরাজপুর বাউল সম্মিলনে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন বাংলার বাউল গান। আর কলকাতার সভায় দাঁড়িয়ে লোকসঙ্গীতের পর লোকসঙ্গীতের মালা গেঁথে শুনিয়ে আমাদের মুগ্ধ, বিচলিত, উদ্বুদ্ধ করে দিয়ে গেছেন। এই সব গানগুলির মধ্য দিয়ে মার্কিন দেশের মানুষের বেদনা, ক্ষোভ, শ্রম, আনন্দ, মুক্তি-কামনা ফুটে উঠেছে। গেয়েছেন কয়লা খনি শ্রমিকের গান, টেক্সাসের বন্দীদের গান, বক্সার ডেভি মুরের মৃত্যুর প্রতিবাদে মুখর দৃপ্ত গান, নীলনয়ন বালকের ট্রাজিক গান,

ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের মৃত্যুতে লেখা গানটি ও জন কেনেডি হত্যার পটভূমিতে গেয়ে আমাদের উদ্বেল করেছেন। আর সগর্বে গেয়েছেন সেই ওয়েলিংটনে নিগ্রো মুক্তিপদযাত্রীর বিখ্যাত গানটি: "We shall over-come", যে গানটির মূল ও বঙ্গানুবাদ 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল। লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এই গান গেয়ে বর্ণসমানাধিকারের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে অভিযান করেছিলেন। এই গানটি গাইবার সময় সীগর শ্রোতাদেরও কণ্ঠ মেলাতে ডাক দিয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে মিলেছিল অনেকেরই কণ্ঠ। সত্যই সীগর-অনুষ্ঠান শোনা এক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এমন দরদী মানুষ ও শিল্পী সীগর কিন্তু স্বদেশে, বিশেষত ম্যাকার্থী-কলঙ্কিত দিনগুলিতে মার্কিন রাজ্যে নিষ্কণ্টকে দিন কাটাতে স্বভাবতই পারেন নি। "অমার্কিন কার্যকলাপ"-এর দায় তাঁর ওপরেও পড়েছিল এবং সেই একই অভিযোগে পল রোবসন, জন হাওয়ার্ড লসন, ডঃ ডুবয়া প্রমুখের সঙ্গে তিনিও ছিলেন অভিযুক্ত। দণ্ডাদেশও ছিল, পরে অবশ্য যেটা নাকচ করে দিতে হয়। সীগরের সঙ্গীতসাধন শুনে আমাদের দেশের প্রগতিশীল ও যৌথ গণ-সঙ্গীত শিল্পীদের আন্দোলনের মরাগাঙে যদি আবার স্রোত জাগে।

মনীষী সম্বর্ধনা

সায়াত নোভা অর্থ হল গানের রাজা। সম্প্রতিই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর নানাদেশে আর্মেনীয় মহাকবি সায়াত নোভার আড়াইশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হল। পৃথিবীব্যাপী এ-উৎসব পালনের জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদ আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা আর্মেনীয় ছাড়াও, জর্জীয়, আজারবাইজানী ও প্রাচীন পারসিক ভাষাতেও সুপণ্ডিত কবি অনবদ্য কাব্য রচনা করেছিলেন।

আগামী জানুয়ারিতে আমাদের বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সত্তরতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। এতদুদ্দেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিদ্বৎজনদের নিয়ে একটি জন্মোৎসব কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই কমিটি এ উপলক্ষে একটি মূল্যবান স্মারক গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা করছেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকার অতি-নিকট সম্পর্ক। তাঁর কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশের গৌরবও এই 'পরিচয়'-এরই। আমরা তাঁর সত্তরতম জন্মোৎসবের প্রাক্কালে তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই।

এই বৎসর শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসব ও সমাবর্তনে বিশ্বভারতী কবি অমিয় চক্রবর্তীকে "দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করে সম্মাননা জানাচ্ছেন। বাঙলা কবিতায় ও শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি জগতে কবি অমিয় চক্রবর্তীর অবদান স্বপ্রতিষ্ঠ। তাঁর সম্মাননায় আমরা আনন্দ প্রকাশ করি ও তাঁকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা।

পরিচয়

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৬
পৌষ, ১৩৭০

সূচীপত্র

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতিটি এঁকেছেন নিখিলেশ দাস

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

'পরিচয়'-এর নিয়মাবলী

- পরিচয় মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণ মাসে বর্ষারম্ভ। কিন্তু যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

- প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষান্মাসিক ৫'৫০ নয়া পয়সা।

- টাকাকড়ি ও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য : ম্যানেজার, পরিচয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ও পরিচয়-এর প্রারম্ভ

ইংরাজী নববর্ষে পয়লা জানুয়ারিতে কলকাতায় আচার্য সত্যেন বোসের সপ্ততিতম জয়ন্তী পালিত হল যোগ্য সমারোহে। 'পরিচয়'-এর পক্ষেও আজ আচার্য বোসকে অভিনন্দিত করার কথা। 'পরিচয়'-এর জন্মকাল থেকেই তিনি 'পরিচয়' ও পরিচয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রথম বাংলা রচনা 'বিজ্ঞানের সঙ্কট' পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার গৌরব বর্ধন করেছে। ঢাকা থেকে কলকাতায় এলে যোগ দিতেন 'পরিচয়'-এর বৈঠকে। কিন্তু এ-সব কারণ ছাড়া একটি গূঢ় কারণ আছে যার খবর অবগত শুধু 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা-স্বরূপ জন তিনেক,—অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ, আমি ও নীরেন্দ্রনাথ। এ ছাড়া অবগত আচার্য বোস নিজে।

কারণটি এই: সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যে-আলাপ হওয়ার ফলে পরিকল্পনা হল 'পরিচয়' প্রকাশের, সে আলাপ-সংযোগ করেন আচার্য বোস। ১৯৩০ অব্দে গ্রীষ্মকালে অপ্রত্যাশিতভাবে বোস এসে হাজির হলেন ডালহৌসী-স্কোয়ারে আমার আপিস ঘরে। সঙ্গে ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল দীর্ঘতনু কন্দর্পকান্তি এক যুবক। ইনি সুধীন্দ্রনাথ। বললেন, তোমার সঙ্গে সুধীন্দ্রর আলাপ করিয়ে দি। তোমার আপিসের পাশেই এঁর আপিস। দুজনেই তোমরা কবিগুরুর সঙ্গী হয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছ। সেবার যেমন তুমি গিয়েছিলে কবির সঙ্গে ফ্রান্সে, এবার তেমন ইনি গিয়েছিলেন অ্যামেরিকায়, ফিরেছেন সদ্য। দুজনেই তোমরা কবির কৃপা লাভ করেছ। তোমাদের আলাপ জমবে ভালো, মিল হবে খুব। বোস চলে গেলেন ঢাকায়; আলাপ আমাদের জমল ভালোই।

প্রতিদিনই সুধীন্দ্রর সঙ্গে আপিস ফেরত গিয়ে সন্ধ্যাটুকু কাটাতাম তাঁদের বাড়িতে, তাঁর বসবার ঘরে। যোগ দিতেন তাঁর স্ত্রী, জমে উঠত বিশ্রম্ভালাপ। পত্রিকা প্রকাশের কথা কিন্তু সদ্য ওঠে নি। উঠল বেশ কিছুকাল পরে, যেদিন প্রবাসীতে ছাপা আমার 'নৌকাডুবির প্লট' পড়ে শোনালাম তাঁকে। আগের দিন তিনি হঠাৎ 'অর্কেস্ট্রা'র পাণ্ডুলিপি এনে পড়ে শুনিয়েছিলেন কয়েকটি কবিতা তা থেকে। কবিতাগুলি শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম, বলেছিলাম তাঁকে। আমার লেখা শুনে কী মনে হল,—বললেন, বেশ হাত আপনার সমালোচনার। আসুন একটা পত্রিকা বার করা যাক। সত্যেন্দ্রর কাছে শুনেছি আপনার বন্ধু নীরেন্দ্রর কথা, তাঁকে ডাকা চাই। আপনার অন্যান্য বন্ধুদেরও ডাকতে হবে, যাঁরা ছিলেন ভারত-ফরাসী মৈত্রী সংস্থার সভ্য। নীরেন্দ্রকে ডাকলাম, ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রবোধ বাগচী, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, হরিশ সিংহ, আমার দাদা পশুপতিবাবু—ইত্যাদি অনেককে ডেকে আনলাম। আলাপ করে দিলাম সুধীন্দ্রর সঙ্গে। নীরেন্দ্রের প্রস্তাবে স্থির হল পত্রিকা হবে ত্রৈমাসিক, সারগর্ভ। থাকবে না তাতে বিজ্ঞাপন ও ছবি। গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও প্রবন্ধাদি আঙ্গিক ছাড়া তার বৈশিষ্ট্য হবে সমালোচনার গুরুত্ব ও পুস্তক-পরিচয়। পত্রিকা ভার নেবে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করে দেবার—বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান সকল ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে। নীরেন্দ্রই পত্রিকার নাম দিলেন 'পরিচয়'। স্থির হল সাপ্তাহিক একটা বৈঠক হবে 'পরিচয়'-এর, আর শুরুতে কবিগুরুর কাছে না গিয়ে প্রথম সংখ্যা বার হলে সেইটি নিয়ে যাওয়া হবে। এই সংখ্যার জন্য আচার্য বোস লিখে দিলেন তাঁর 'বিজ্ঞানের সঙ্কট'। যোগ দিলেন সুশোভন সরকার, হিরণকুমার, চারু দত্ত, বিষ্ণু দে, শ্যামল ঘোষ ও নব আবিষ্কৃত পরিচয়-এর অন্য সব লেখক। সুধীন্দ্রের পিতা বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহায্য করলেন নেপথ্য থেকে। ধারাবাহিক প্রকাশিত হল তাঁর 'যাজ্ঞবল্কের অদ্বৈতবাদ'। বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ শ্রাবণে (ইং ১৯৩১) 'পরিচয়' প্রকাশিত হল। কবিগুরুর হাতে প্রথম সংখ্যাটি দিলে অত্যন্ত খুশি হয়ে লিখে দিলেন দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য "পত্রিকা" নামে এক চিঠি।

আচার্য বোসের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর পরিকল্পনা ও প্রকাশের যে সম্পর্ক তা সবিস্তারে বলা হল। জগতে অনেক কিছু ঘটে তাৎপর্যময় যার পিছনের কিছু খবর-খুঁজি পাওয়া যায় না। সেখানে কাজ হয় অলক্ষিতে। আমার

সঙ্গে সুধীন্দ্রর আলাপ করিয়ে দেওয়া ও নীরেনের কথা তাঁকে বলা এই সংযোগের ফলে যে সম্ভাবনা সঞ্জীবিত হল তার প্রচ্ছন্ন ইসারা পেয়েছিলেন নিশ্চয় বোস। পরে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারকল্পে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকা ও 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। যেমন বিজ্ঞান ও বিশ্বরহস্যের বার্তা, তেমনি মানবিকতার বার্তা ও মাতৃভাষার বার্তা পৌঁছেছিল তাঁর কাছে সেই অলক্ষিত পথে যে পথ প্রশস্ত হয় তাঁদের কাছে যাঁরা পৌঁছান মানসলোকের ঊর্ধ্বস্তরে। সেই অলক্ষিত পথ দিয়ে 'পরিচয়'-এর যাত্রা করিয়ে দিয়েছিলেন বোস। আমি জানি বলেই বললাম সেই কথা।

'পরিচয়'-এর বহুকাল আগে বোসেরই পরিকল্পনায় ও সম্পাদনে রচিত হয়েছিল আর এক পত্রিকা। হাতে লেখা পত্রিকা, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'মনীষা'। 'মনীষা' বার করা হয় আমাদের বাড়ি থেকে, ১৯১২ অব্দে। তখন ছিলেন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাতে যাঁরা লিখতেন তাঁরা হলেন, সত্যেন্দ্র নিজে, তারক দাস, রজনী পালিত, পূর্ণ সেন, প্রমথ মিত্র, ভূপালভূষণ, পশুপতি-দাদা, আমি ও আর কয়েকজন, বন্ধুরা মিলে। বাংলা সরস্বতীর পুষ্পোত্থানে ফুল ফোটাবার প্রথম প্রয়াস এটি সত্যেন্দ্রর। তিন বা চার সংখ্যা বার হয়ে 'মনীষা' বন্ধ হয়ে যায়।

বোস-আইনস্টাইন সামষ্টিক সূত্র জগতে কীর্তিত। চল্লিশ বছর আগে সেটি প্রণয়ন করে আচার্য বোস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আইনস্টাইনের কাছে। আইনস্টাইন তাকে বিজ্ঞানাসরে স্বাগত জানিয়ে সমর্থিত করেন ও প্রচারিত করেন। বিশ্ব বিজ্ঞানীরা এই সূত্রকে বিপুল সম্মানিত করেছেন আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে বোসের নাম যুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গীত করেছেন তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বোসকে। দেশবাসী ধন্য তাঁকে সম্বর্ধিত করে।

বত্রিশ বছর আগে, ১৯৩২ অব্দে, 'পরিচয়ে'র কার্তিক সংখ্যায় বোস সামষ্টিক-সূত্রের সাধারণোপযোগী এক বিবরণ লিখেছিলাম। সম্বর্ধনা কমিটি বোস স্মারক-গ্রন্থে সেটি পুনর্মুদ্রিত করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। যে তথ্যের ওপর বোস-সূত্রটি প্রতিষ্ঠিত সে হল এই যে গণিতে ব্যষ্টির আচরণের যোগবিয়োগাদি করে সমষ্টিগত আচরণের সূত্র নিরূপিত হতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একত্রিত হয়েই হয় বৃহৎ কিন্তু একত্রিত অবস্থায় বৃহতের জন্মায় এক পৃথক সত্তা। বিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞতা যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দ্বৈত। যে সূত্রে যে প্রকারে ব্যষ্টিকে ধরা যায় সে সূত্র ব্যবহারে সমষ্টিকে ধরা যায় না। সমষ্টির জন্য

চাই, অন্য দৃষ্টি অন্য সমীকরণ-সূত্র। ব্যষ্টির আচরণের উদাহরণ ক্রিকেট বা বিলিয়ার্ড বল বা বুলেটের গতি, পতনশীল ঢিলের গতি, সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহদের গতিবিধি। সামষ্টিক আচরণের উদাহরণ গ্যাসের চাপ ও তাপ, উত্তাপের অপচয়—entropy। অসংবদ্ধ পথিক এক বস্তু, জনতার ভিড় আর এক। ভিড়ের চাপে পড়ে যিনি গেছেন ছিটকে, দমবন্ধ হয়ে তিনিই বুঝেছেন কতকটা সমষ্টি কী বস্তু। প্রয়াগ সঙ্গমে মেলায় শত শত লোক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন কেবল মাত্র ভিড়ের চাপে। গতিতে ব্যষ্টির আচরণসূত্র প্রতিষ্ঠা করেন, গ্যালিলিও, নিউটন। সামষ্টিক সূত্রের উদ্ভাবক ক্লসিয়াস ও ম্যাক্সওয়েল। ক্লসিয়াস, ম্যাক্সওয়েলের সূত্রের ক্ষেত্র ছিল গ্যাসের আচরণ। তেজ বা তাপ-বিকীরণ সংক্রান্ত সামষ্টিক সূত্রের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন লর্ড রেলে, বোলৎস্মান প্লাঙ্ক প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। এই সূত্র প্রণয়নের প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শন করেন বোস। সংক্ষেপে এই হল বোস-সামষ্টিক সূত্রের বিবরণ। এই সূত্র বিনা বিজ্ঞানের এক দিকের পথ চলায় বিঘ্ন হচ্ছিল। তাই আইনস্টাইন বলেছিলেন বোস-সূত্র অগ্রসর করেছে বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞানের পথচলায় পরে পরে চারদিকে জমে ওঠে বাধা-বিঘ্ন। তখন কোনো বিজ্ঞান-স্রষ্টা নতুন পন্থা অবলম্বনে বিপ্লব ঘটান। বিপ্লব সহসা সমূলে উচ্ছেদ করে বাধা-বিঘ্ন, পথ করে দেয় অগ্রসরের। দ্য-ব্রলী বলেছেন বিশ শতকে বিপুল বিপ্লব ঘটেছে বিজ্ঞানে। বোস-সূত্র সেই বিপ্লবে একাংশ গ্রহণ করেছে।

আলোক কণিকা 'ফোটন' অবলম্বনে বোস রচনা করেন এই সূত্র। ফোটনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করেন আইনস্টাইন। প্লাঙ্ক সিদ্ধান্ত করেন তেজ বা তাপ-বিকীরণও কণিকারূপী। উভয়েরই পরিচয় ছিল বিজ্ঞানে তরঙ্গরূপে, এখন থেকে তাদের কণিকা রূপও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হল। তেজ কণিকার নাম হল 'কোয়াণ্টাম'। বোস-সমষ্টিসূত্র সিদ্ধকাম হল 'ফোটন' ও 'কোয়াণ্টামে'র আচরণ-ব্যাখ্যায়। যে সূত্রের সন্ধান করছিলেন বোলৎস্মান, প্লাঙ্ক প্রভৃতি সে সূত্রের সুসিদ্ধ আকৃতি আবিষ্কৃত হল। কিন্তু 'ফোটন', 'কোয়াণ্টাম'-এর জন্য উদ্ভাবিত হলেও আইনস্টাইন বললেন বোস সমষ্টি-সূত্র সকল রকম কণিকা সমাবেশ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ সম্ভব। নিজে তিনি এ সূত্রকে প্রয়োগ করে দেখালেন ইলেক্ট্রণ কণিকার গ্যাস-সমাবেশে! বস্তুত বোস-সমষ্টিসূত্র বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করল। বোস-সমষ্টিসূত্র রচিত হবার পরে ফের্মি ও ডিরাক কর্তৃক আর একটি সমষ্টিসূত্র রচিত

হয়েছে। বিজ্ঞানাঙ্গনে ভিড় করে আছে অণু, পরাণু, 'ফোটন', 'কোয়াণ্টাম', 'ইলেকট্রন' প্রোটন, নিউট্রন, নিউট্রিনো, বহুতর-মেসন আদি। দেখা গেছে এ-সব কণিকাদের একদল বোস-সূত্রের নিয়মাধীন আর একদল ফের্মি-ডিরাক সূত্রের। ডিরাক নাম দিয়েছেন এদের যথাক্রমে 'বোসন' ও 'ফের্মিয়ন'। যতদিন বিজ্ঞান থাকবে জগতে প্রতিষ্ঠিত ততদিন আচার্য বোসের নাম থাকবে কীর্তিত।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল বহু ও বিবিধকে ন্যূনতমের পর্যায়ে সীমিত করা। বিজ্ঞানে সূত্র ও সমীজ্ঞা (equation) রচিত হয় এই লক্ষ্য সাধনে। আইনস্টাইন মহাকর্ষ, আলোক, জড়, শক্তি, কাল, দেশ ইত্যাদিকে একটিমাত্র ক্ষেত্র-সমীজ্ঞায় (field equation) গেঁথেছিলেন। এই সমীজ্ঞার অপূর্ব সফলতার ফলে তিনি চেয়েছিলেন ঐ সঙ্গে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্তাকে একই ঐকিক ক্ষেত্র-সমীজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করতে। এই চেষ্টায় তিনি যে সমীজ্ঞায় উপনীত হন তার মধ্যে ছিল অনেকগুলি সমীজ্ঞা ও ধ্রুবাঙ্ক। এগুলির সংখ্যাধিক্য ও প্রতিকল্প সম্বন্ধে তিনি কিন্তু নিঃসংশয় হতে পারেন নি। নিঃসংশয়কল্পে বোস নিজস্ব কয়েকটি সমীজ্ঞা রচনা করলেন, ও সেগুলি নোবেল লরিয়েট ছ'-ব্রলী প্রকাশিত করলেন সাগ্রহে। সমীজ্ঞাগুলির সম্যক আলোচনা ও প্রমাণ অতীব দুরূহ। যোগ্য ও ইচ্ছুক আলোচনাকারীর অভাব একটা অন্তরায়। সুতরাং বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে এগুলি অসংশয়ে গৃহীত হওয়া সময়সাপেক্ষ। আপেক্ষিকতাবাদ গৃহীত হতে সময় লেগেছিল পনেরো বছর।

এখানে বোসের বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয় আমার। কিন্তু তাঁর কর্মোদ্যমের আর একটা দিক আছে যার সম্বন্ধে যৎসামান্য বলা যেতে পারে এখানে। বিজ্ঞানের ধর্ম হল জড় ও প্রাণ-প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন, কিন্তু বিজ্ঞানের মর্ম হল প্রকৃতি-রহস্য ভেদ করে জড়ের ওপর মানুষের অধিকার বিস্তার, অজ্ঞান ও অভাব থেকে মুক্তিদান, বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা, সারা মানবজাতির মৈত্রী ও একাত্মতা সংঘটন, মহামানব-সমাজ প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞান পুরোধারা ব্যাপৃত হন এই নিয়ে। আচার্য বোসকৃত 'জ্ঞান বিজ্ঞান' ও 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠার অন্তর্লীন মর্মও এই। তাতেই হবে আমাদের কল্যাণ, আমাদের মৈত্রী স্থাপন—কেননা তা আনয়ন করবে বিজ্ঞানের প্রসার। সাম্প্রতিক কয়েকটি ভাষণে আচার্য বোস আলোচনা করেছেন এই কথার। জগতে মহাপুরুষরা ধর্মের পথে চালনা করে কল্যাণ,

মৈত্রী ও মুক্তির দ্বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন মানুষকে। কিন্তু ধর্মের প্রকরণ মানুষকে প্রলুব্ধ করেছে পৃথক পৃথক মুক্তির সাধনায়। বিজ্ঞানের পথই প্রকৃষ্ট কল্যাণের, মৈত্রীর, মুক্তির পথ—সার্বভৌম মানবের সামষ্টিক কল্যাণ, সামষ্টিক মুক্তি। বিজ্ঞানই পারে মানুষের অভাব দূর করতে, মানুষের মধ্যে সমতা শান্তি আনতে, মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে। 'পরিচয়'ও যাত্রারম্ভে অনুপ্রাণিত হয়েছিল সকল দেশের সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞানের পরিচয় অর্জন করে মহামানবের আদর্শে পৌঁছাতে। আচার্য বোসের সম্বর্ধনার দিনটি 'পরিচয়'-এর বিশেষ স্মরণীয় দিন হোক।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

কার্ল পপার-এর খণ্ডনবাদ

বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীতে কার্ল পপার-এর সংশোধন-প্রচেষ্টা অনুধাবনযোগ্য। তিনি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং Inductive বা আরোহ পদ্ধতিকে আক্রমণ করেছেন। তিনি নিজে Deductive বা অবরোহ পদ্ধতির অনুবর্তী। আরোহ পদ্ধতিতে তথ্য পর্যবেক্ষণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রকল্প (hypothesis) গ্রহণ। অবরোহ পদ্ধতিতে পূর্ব থেকেই প্রকল্প তৈরি হয়ে থাকে, সেই প্রকল্প পরীক্ষিত হয় তথ্য পর্যবেক্ষণের দ্বারা। সুতরাং প্রকল্প হচ্ছে পূর্ববর্তী ক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণ পরবর্তী ক্রিয়া। গবেষণা-ক্ষেত্রে যাবতীয় ঘটনাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি না, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নির্বাচন করি। নির্বাচন সম্ভব হয় কিরূপে? কোনো একটা প্রকল্পকে আমরা পরীক্ষা করতে চাই, সেইজন্য সীমিত ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঘটনাগুলিকে নিরীক্ষণ করি। কাজে কাজেই একথা ধরে নিতে হবে যে প্রকল্প ব্যতীত পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। প্রকল্প থেকেই বৈজ্ঞানিকের যাত্রা হয় শুরু। প্রকল্পের পরীক্ষা (test) চলে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে।

কার্ল পপার-এর মোটামুটি বক্তব্যগুলি এইরূপ :

(ক) "Induction, i. e., inference based on many observations is a myth. ...the actual procedure of science is to operate with conjectures."

অর্থাৎ, Induction বা আরোহ-পদ্ধতি একটা বাজে কথা মাত্র। অনেকগুলি ঘটনা দেখলাম, তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম—এ-জাতীয় আরোহ-প্রণালী কখনও অনুসরণ করেন না বৈজ্ঞানিক। তাঁর অবলম্বন হচ্ছে প্রকল্প। তিনি প্রকল্পের সাহায্যে কাজ চালিয়ে যান।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে তফাৎকরণ বা demarcation হচ্ছে প্রাথমিক সমস্যা। কি করে উভয়ের মধ্যে তফাৎ করতে হবে?

প্রচলিত মতে Verifiability বা প্রমাণ-যোগ্যতা হচ্ছে তফাৎকরণের সূত্র। বৈজ্ঞানিক বচনগুলি পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণের যোগ্য। অবৈজ্ঞানিক বচনগুলি প্রমাণের অযোগ্য। বৈজ্ঞানিক বচনগুলি অর্থপূর্ণ বা meaningful বাক্য। অবৈজ্ঞানিক বচনগুলি অর্থহীন বা meaningless বাক্য। এই মতকে বলা চলতে পারে Verificationism বা প্রমাণবাদ। Inductionist বা আরোহবাদীরা হচ্ছেন সাধারণত প্রমাণবাদী। তাঁরা প্রমাণের উপর জোর দেন। প্রথমে পর্যবেক্ষণ, তারপর প্রকল্প গ্রহণ, তারপর প্রমাণ-প্রক্রিয়া—এই জাতীয় পর্যায়ক্রম তাঁরা অনুসরণ করেন।

পপার প্রমাণবাদকে পদ্ধতি হিসেবে আক্রমণ করেছেন! সত্য-নির্ণয় বা অর্থ (meaning) উদ্‌ঘাটন প্রকৃত সমস্যা নয়। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের লক্ষণ হচ্ছে falsifiability বা খণ্ডনযোগ্যতা। বৈজ্ঞানিক উক্তি হবে খণ্ডন-যোগ্য।

"Falsifiability or refutability is a criterion of the scientific status of a theory."

অর্থাৎ, যে কোনো প্রকল্পই খণ্ডনযোগ্য নয়। যে প্রকল্প খণ্ডনযোগ্য তাকেই শুধু বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেওয়া চলে।

এই মত Falsificationism বা খণ্ডনবাদ-রূপে বিবেচিত হতে পারে। এই পদ্ধতি হচ্ছে negative বা নেতিমূলক আকৃতিযুক্ত। অপর পক্ষে প্রমাণবাদ হচ্ছে positive বা স্বীকৃতিমূলক পদ্ধতি।

পপার-এর মতে পরীক্ষাকার্য হচ্ছে খণ্ডনমূলক। একটা প্রকল্প উপস্থাপিত হয়েছে, তাকে পরীক্ষা (test) করা হচ্ছে। অর্থাৎ, তাকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু খণ্ডন করা যাচ্ছে না। তখন তা পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত (corroborated) সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হবে।

নেতিমূলক রাস্তা দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের পরীক্ষণকার্য চলে।

"Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it."

অর্থাৎ, যথার্থ পরীক্ষণকার্য মানেই খণ্ডনের চেষ্টা।

যে উক্তিকে পরীক্ষার ভিতর দিয়ে খণ্ডনের চেষ্টা করেও খণ্ডন করা গেল না তার বৈজ্ঞানিক মূল্য বাড়ল।

এ-প্রসঙ্গে পপার-প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা :

মার্কসীয় ইতিহাসবাদের একটা অংশে প্রতিপাদ্য হয়েছে বিপ্লববাদ। আগামী বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বাণী খণ্ডিত হয়েছে। খণ্ডিত

প্রকল্প পরিত্যাজ্য। কিন্তু মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বর্জিত হয় নি। সুতরাং মার্কসীয় প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, বিশেষত Id বা অবচেতন-প্রবৃত্তি বিষয়ক প্রকল্প খণ্ডনের যোগ্য নয়, অর্থাৎ, পরীক্ষণের যোগ্য নয়। সুতরাং এর কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই।

অ্যাড্‌লার-এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব, হীনমন্যতার মনস্তত্ত্ব পরীক্ষণযোগ্য বা খণ্ডনযোগ্য নয়। সুতরাং এর বৈজ্ঞানিক মূল্য অস্বীকার্য।

কিন্তু আইনস্টাইন-এর মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্পটি ছিল খণ্ডনযোগ্য। ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণ ঘটল। গ্রহণের ফলাফল লক্ষিত হল। এই পর্যবেক্ষণের ফলে আইনস্টাইন-এর প্রকল্প খণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু খণ্ডিত হল না বলেই উচ্চতর বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় উন্নীত হল।

বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মধ্যে থাকে risk বা সঙ্কটের সম্ভাবনা। এ-জাতীয় প্রকল্প খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যদি খণ্ডিত না হয়, তবেই এর বৈজ্ঞানিক মূল্য বাড়বে। খণ্ডনকে এড়িয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীর লক্ষ্য নয়। তাঁর উক্তির খণ্ডনের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকেন।

(গ) পপার বলেন যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে trial and error, অর্থাৎ পরীক্ষণ এবং ভ্রমের ভিতর দিয়ে অগ্রগমন। বৈজ্ঞানিক ভুল করেন। তাঁর ভুল ধরা পড়ে পরীক্ষণের মাধ্যমে। ভুল করবার সাহস না থাকলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলতে পারে না। যে প্রকল্প খণ্ডিত হয় তা ভ্রান্ত।

বৈজ্ঞানিকের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ-প্রসূত নয়। পরন্তু conjecture বা আন্দাজ মাত্র। সাহসিকতার সঙ্গে আন্দাজটি উপস্থাপিত হল। খণ্ডিত হল পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে। পরিত্যক্ত হল। খণ্ডিত না হলে সমর্থনযোগ্য হল। অর্থাৎ, প্রকল্পের পরে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের সহায়তায় প্রকল্প তৈরি হয় না। বৈজ্ঞানিক কখনও পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করেন না, একটি প্রকল্প মাথায় রেখে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান।

স্বভাবত প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের প্রত্যাশা করি আমরা। জৈব প্রয়োজনে এই নিয়মের প্রত্যাশা। Point of view বা বা দৃষ্টিভঙ্গী, problem বা সমস্যা থেকে এই প্রত্যাশা। ক্ষুধার্ত পশু, পলায়ন-রত পশু, নবজাত শিশুর আচরণে এই প্রত্যাশা অভিব্যক্ত। বিজ্ঞানীর মধ্যেও আমরা দেখি নিয়মের প্রত্যাশা, যার মূলে রয়েছে বিশেষ ধরনের সমস্যাবোধ।

প্রকৃতির ক্রোড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না নিয়মের জ্ঞান। ঘটনা দেখে নিয়মের জ্ঞান হয় না। স্বকল্পিত নিয়মকে মানুষ যাচাই করে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে।

এক্ষেত্রে ক্যাণ্ট-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে মানবীয় বুদ্ধি প্রকৃতির উপর নিয়ম চাপিয়ে দেয়। এই নিয়ম হচ্ছে apriori বা প্রাক্-প্রত্যক্ষ সংযোগ-সূত্র, সুতরাং নিশ্চিতরূপে সত্য। এর সহায়তায় প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট অবিন্যস্ত ঘটনাগুলিকে সংযোজিত করা হয়। পপার ক্যাণ্ট-এর উক্তিকে সংশোধন করে বলতে চান যে মানুষ স্ব-কল্পিত নিয়মকে প্রত্যাশা করে প্রকৃতির মধ্যে। এই প্রত্যাশা প্রতি পদে পদে বাধা পায় প্রকৃতির কাছ থেকে। সুতরাং অ্যাপ্রায়রাই হলেও নিয়মের প্রত্যাশা অভ্রান্ত নয়। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প অনবরত খণ্ডিত হতে থাকে, পরিত্যক্ত বা সংশোধিত হতে থাকে।

পপার বলেছেন যে dogmatic attitude বা অবিচারী প্রাক্-বৈজ্ঞানিক প্রবণতা হচ্ছে খণ্ডিত সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাকার দিকে। Critical বা বিচারী বৈজ্ঞানিক প্রবণতা হচ্ছে খণ্ডিত সিদ্ধান্তকে বর্জনের দিকে। ক্যাণ্ট-এর বিচারবাদ (criticism) থেকে স্বতন্ত্র পথচারী পপার-এর বিচারবাদ।

ক্যাণ্ট-এর মতে সত্যতা (validity) অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়, পরন্তু অ্যাপ্রায়রাই বা প্রাক্-প্রত্যক্ষ। মানস থেকে নিয়মের জন্ম, তাই তার নিশ্চয়তা। পপার-মতে প্রকল্পমাত্রেই হচ্ছে অ্যাপ্রায়রাই, কিন্তু তাই বলে নিশ্চিত নয়। তাঁর একটি মূল্যবান উক্তি অনুসারে সর্বপ্রকার নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পই হচ্ছে আন্দাজমাত্র, এমনকি যখন আমরা এই নিয়মগুলির বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। ভ্রান্তি প্রকট হয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় কোনো থিওরী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় কিংবা সমর্থিত হয়। এই সমর্থনের বা corroboration-এর মাত্রা কম বা বেশি হতে পারে। কোনো প্রকল্প বাস্তবের দ্বারা অধিক সমর্থিত হয়, কোনোটি হয়তো কম সমর্থিত হয়। যে থিওরী পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে খণ্ডিত (falsified) হয় না তার সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা দাবি করা যায় না। নিশ্চয়তা বা সম্ভাব্যতা (probability) বিজ্ঞানের লক্ষ্য হতে পারে না। কম সম্ভাব্য থিওরীও লালিত হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যদি তার মধ্যে ভালো ব্যাখ্যা-সূত্র থাকে।

"Although we saek theories with a high degree of

corroboration, as scientists we do not seek highly probable theories but explanations."

অর্থাৎ, আমরা এমন থিওরী খুঁজি যা অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়। সেই থিওরী কম সম্ভাব্য হয়েও ভালো ব্যাখ্যা-সূত্র হতে পারে।

পপার-এর চিন্তা-প্রণালীতে কয়েকটি দিক লক্ষণীয়। যথা :

(১) Apriorism বা প্রাক্-প্রত্যক্ষবাদ ;

(২) Induction বা আরোহ পদ্ধতির পরিবর্তে Deduction বা অবরোহ পদ্ধতিকে স্বীকার ;

(৩) Hypothesis বা প্রকল্পের উর্ধ্বে বিজ্ঞান উঠতে পারে না এই মতের প্রতিপাদন ;

(৪) Falsificationism বা খণ্ডনবাদ ,

(৫) Corroboration বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমর্থনকে বিজ্ঞানের লক্ষ্যরূপে প্রতিপাদন।

[pp. 155—187, British Philosophy in Mid-century, Philosophy of Science, K. R. Popper, 1957]

পপার-এর চিন্তাধারায় অভিনবত্ব লক্ষণীয়। জ্ঞান-বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নন কিংবা সম্ভাবনাবাদীও নন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্যাণ্ট ছিলেন আশাবাদী, যদিও অধিবিদ্যাকে নস্যাৎ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক আশাবাদ Inductionist বা আরোহবাদীরা অনেক সময়েই পোষণ করে থাকেন। তাই হচ্ছে পপার-এর আক্রমণস্থল। অবিচারী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রে খণ্ডিত সিদ্ধান্তকেও আঁকড়ে থাকে। এইরূপ দৃষ্টিকোণকে পপার আঘাত হেনেছেন। তাঁর মতে সর্ববিধ প্রকল্পই আন্দাজমাত্র। কোনোটি অভিজ্ঞতার দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে, কোনোটি খণ্ডিত হয় নি। খণ্ডিত সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাকার মনোবৃত্তি অবৈজ্ঞানিক। পপার-এর বিচারবাদ বহুলাংশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদ।

পপার বলেছেন যে প্রকল্পের আদি উৎস হচ্ছে মানসিক প্রত্যাশা। প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে প্রকল্প উদ্ভূত হয় না। প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্তী এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা পাই না। এই জ্ঞান সহজাত বিশ্বাস-প্রসূত, সুতরাং অ্যাপ্রায়রাই। নিয়মের প্রত্যাশা থেকে প্রকল্পের জন্ম। সেই প্রকল্প পরীক্ষিত হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা।

প্রকল্প (hypothesis) হচ্ছে ঘটনা বা fact-এর ব্যাখ্যা-সূত্র। ঘটনা বা তথ্য সম্মুখে নেই, সেরূপ ক্ষেত্রে প্রকল্প তৈরি হয় না। ঘটনা মনের উপর কাজ করে, তার প্রতিক্রিয়ায় মন ব্যাখ্যা-সূত্র খুঁজতে থাকে। সেই ব্যাখ্যা-সূত্রই হচ্ছে প্রকল্প। তথ্য পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উদ্ভব হতে পারে না। পপার বলেছেন যে পর্যবেক্ষণের পূর্বেই প্রকল্প তৈরি হয়। অর্থাৎ প্রকল্প হচ্ছে অ্যাপ্রায়রাই মানসিক ক্রিয়া। এই মতকে মেনে নেওয়া কঠিন।

নিয়মের প্রত্যাশা হচ্ছে সহজাত বা অ্যাপ্রায়রাই। পপার-এর এই উক্তি সহজবোধ্য। নিয়মের প্রত্যাশা আছে বলেই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প গঠনে প্রবৃত্ত হই আমরা। কিন্তু নিয়মের প্রত্যাশা এবং তথ্যের ব্যাখ্যা-সূত্র হিসেবে প্রকল্প গঠন এক জিনিস নয়। তথ্য পর্যবেক্ষণের পরেই প্রকল্প গঠিত হয় সেই তথ্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্য।

ইতর জীবের মধ্যে, এমনকি প্রাথমিক এককোষী প্রাণী অ্যামিবার মধ্যে অচেতন নিয়মের প্রত্যাশা লক্ষিত হয়। অ্যামিবা খাদ্য ও অখাদ্যের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে। এই শ্রেণীকরণ ঠিক অ্যাপ্রায়রাই ব্যাপার নয়। খাদ্য ও অখাদ্যের শ্রেণীকরণ সম্ভব হয় পরীক্ষণের ভিতর দিয়ে।

মানবীয় শিশুর নিকটে ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে কোনো সীমারেখা থাকে না। তার ভক্ষণ-প্রবৃত্তি সহজাত বা অ্যাপ্রায়রাই ব্যাপার। কিন্তু সে খাদ্য ও অখাদ্যের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করতে শেখে পরীক্ষণের ভিতর দিয়ে। তার খাদ্য-সম্বন্ধীয় ধারণা অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী বা অ্যাপ্রায়রাই নয়।

জন্মান্ধ ব্যক্তি বর্ণের শ্রেণীবিভাগ করতে অক্ষম। জন্ম-বধির ব্যক্তি শব্দ বিষয়ে কোনো ধারণা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও জেব্রা দেখে নি বা কারও কাছে জেব্রার কথা শোনে নি তার পক্ষে জেব্রার ধারণা করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য যে জাতি-ধারণা বা class-idea গঠনের প্রবণতা মনোগত বা অ্যাপ্রায়রাই বৃত্তি। গো-ব্যক্তির চেহারায় গো-জাতি প্রতিভাত নয়। গো-ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব আছে। গো-জাতি মানসিক কল্পনামাত্র। কিন্তু গো-ব্যক্তি না দেখলে গো-জাতির ধারণা জন্মায় না। গো-ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করবার জন্য গো-জাতির ধারণা আবশ্যক। সেই ধারণা গঠিত হয় গো-ব্যক্তি পর্যবেক্ষণের পর, যদিও এই ধারণা গঠনের প্রবণতা একান্তই মনোগত।

Idea বা ধারণামাত্রই এক হিসাবে মানসিক। বস্তুজগতে শুধুমাত্র ব্যক্তির

অস্তিত্ব আছে। Society—সমাজ, State—রাষ্ট্র, Nation—আঞ্চলিক জাতি—প্রভৃতিও হচ্ছে মানসিক ধারণা। ব্যক্তি মানুষদের বিশেষ সমাবেশকে সমাজ নাম দেওয়া হয়েছে, ভিন্ন ধরনের সমাবেশকে রাষ্ট্র বলা হয় এবং আর একজাতীয় সমাবেশকে নেশন-রূপে আখ্যাত করা হয়। চোখে দেখার জিনিস নয় এই ধারণাগুলি। আমরা শুধু ব্যক্তি মানুষকেই চোখে দেখি। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের বিশেষ সমাবেশ-গত আচরণ লক্ষ্য করেই এই ধারণাগুলি উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং এই ধারণাগুলির অ্যাপ্রায়রাই বা মানসিক উৎপত্তি ধরে নেওয়া যায় না। বস্তুগত পর্যবেক্ষণের প্রভাবে ধারণাগুলি জন্মাতে থাকে আমাদের মনের ভিতরে, যেহেতু জৈবগত প্রয়োজনে ধারণা গঠনের অ্যাপ্রায়রাই প্রবণতা রয়েছে আমাদের।

পৃথিবীতে কত শত জাতি বা species-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে আমাদের। আসলে চোখে দেখি আমরা ব্যক্তিকে। জাতিকে চোখে দেখি না। ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে জাতির ধারণা গঠনে প্রবৃত্ত হই, যেহেতু অসংখ্য ব্যক্তিকে স্মরণে রাখা সম্ভব নয়। জৈব প্রয়োজনে চিন্তা-সংক্ষেপ না হলে চলে না। তাই বিভিন্ন জাতি-ধারণার খোপে খোপে ব্যক্তিগুলিকে সাজাই কল্পনার সহায়তায়। ব্যক্তিকে দেখেই জাতি-ধারণা আবশ্যক হয়। জাতি-ধারণাগুলি পর্যবেক্ষণের ফল। জন্মকালে এগুলি আমাদের মাথার মধ্যে ছিল না।

প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে প্রকল্প গঠনের প্রবণতাও হচ্ছে অ্যাপ্রায়রাই বা মনোগত। প্রকৃতির মধ্যে ঘটমান ঘটনা চোখে দেখা যায়, দুই ঘটনার মধ্যে ক্রমিকতাও চোখে দেখি আমরা। কিন্তু কার্য-কারণ নিয়ম চোখে দেখার জিনিস নয়। দৃষ্ট ঘটনাকে ব্যাখ্যার জন্য নিয়মের কল্পনা করি আমরা জৈব প্রয়োজনে। নিয়মের ধারণা আমাদের জীবনধারণকে সহজতর করে। কিন্তু বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবার পরই তার ব্যাখ্যা-সূত্র হিসেবে নিয়মের প্রকল্প আবশ্যক হয়। আগে থেকেই এই ব্যাখ্যাসূত্র মাথার মধ্যে থাকে না। সুতরাং প্রকল্পের উদ্ভব পর্যবেক্ষণ-জনিত। অর্থাৎ, কোনো প্রকল্পই অ্যাপ্রায়রাই নয়।

প্রকল্পের উপকরণ পর্যবেক্ষণ থেকেই আহৃত হয়।

(১) আপেল ফলের মাটিতে পতন লক্ষ্য করবার পর পতন-সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এই সমস্যার কল্পিত সমাধান হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ নামক ব্যাখ্যা-সূত্র।

(২) একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বাষ্পের কার্য লক্ষিত হওয়ার পর বাষ্পশক্তি-সংক্রান্ত প্রকল্প গঠিত হয়েছিল। বাষ্পশক্তির কার্যকরী প্রয়োগ-সমস্যার সঙ্গে জড়িত ছিল সমসাময়িক শিল্পগত প্রয়োজনবোধ।

(৩) যিনি আলোক দেখেছেন এবং স্বল্প সূর্যালোকে ধাবমান অণু সকল লক্ষ্য করেছেন তাঁর পক্ষেই আলোকের অণু (corpuscle) কল্পনা করা সম্ভব। জল-তরঙ্গ দেখে আলোক-তরঙ্গ কল্পনা সম্ভব হয়েছে। আবার দুই কল্পনা এসে মিশেছে আলোক-তরঙ্গের অণুবৎ আচরণ সংক্রান্ত আধুনিক প্রকল্পের মধ্যে।

Liquid বা স্থূল তরল পদার্থ দেখে fluid বা সূক্ষ্ম তরল-পদার্থের কল্পনা সম্ভব হয়েছে। যথা, বায়ুকে ফ্লুইড-রূপে কল্পনা।

কোনো কোনো প্রকল্প সোজাসুজি পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না। কিন্তু এগুলির পশ্চাতে বাহ্য প্রভাব নেই একথা বলা যায় না। সামাজিক প্রভাব, সমসাময়িক জ্ঞানের স্তর, প্রশিক্ষণের প্রভাব প্রকল্প গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব সম্ভব হয়েছে আধুনিক গাণিতিক জ্ঞানের অগ্রগতির দরুণ। মধ্যযুগীয় জ্ঞানের অবস্থায় এই তত্ত্ব উদ্‌ভাবন সম্ভব ছিল না।

পপার প্রকল্প গঠনের মূলীভূত সমস্যা বা দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তুলেছেন। এই সমস্যা-বোধ সর্বদাই সমকালীন জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অ্যালকেমির যুগে আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের সমস্যাগুলি দেখা দেয় নি। বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ যে লাভ করে নি তার মস্তিষ্ক ইলেকট্রনের কক্ষচ্যুতির ব্যাপারে কখনও বিব্রত হবে না। আদিম আন্দামানবাসীর নিকটে আণবিক সমস্যা নিরর্থক।

সমস্যা-বোধ যুগভেদে ভিন্ন হয়। প্রাকৃতিক উৎপাত প্রাচীনকালের মানুষের নিকটে একটি সমস্যা-রূপে গণ্য ছিল, একালেও সমস্যা-রূপে বিবেচিত। কিন্তু সেকালের ব্যাখ্যা-সূত্র ছিল দেবতার প্রভাব এবং সমাধান ছিল তুকতাক বা ম্যাজিক। প্রাকৃতিক উৎপাত দৈব প্রভাবের ফল, দৈব প্রভাবকে শান্ত করবার জন্য তুকতাকের ব্যবস্থা। যেমন সমস্যা-বোধ, ঠিক তেমনি সমাধানের দাওয়াই। একালের সমস্যা-বোধ এবং সমাধান একেবারেই আলাদা।

সমস্যা-চেতনায় ও প্রকল্প গঠনে সমসাময়িক জ্ঞানের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। একালের কোনো বিজ্ঞানী গ্রহগত প্রভাব এবং তাবিজের সমাধান উপস্থাপিত করলে তাঁর সহকর্মীদের হাস্যরস সৃষ্টি করবেন। অ্যাস্ট্রলজি বা ফলিত জ্যোতিষ

এখনও টিকে আছে ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনার জন্য, কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণাগারে এর কোনো কদর নেই। ফলিত জ্যোতিষের প্রকল্প যথার্থভাবে প্রমাণযোগ্যও নয়, খণ্ডনযোগ্যও নয়। সমসাময়িক জ্ঞানের অবস্থায় এর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে অনিচ্ছুক আধুনিক বিজ্ঞানী।

সুতরাং খেয়াল ও খুশিমতো প্রকল্পের প্রস্তাব বিজ্ঞান-জগতের আচরণ-বহির্ভূত। কোনো প্রকল্পই একেবারে মনগড়া বা অ্যাপ্রায়রাই নয়, পরন্তু সমসাময়িক জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত। এই বাহ্যিক প্রভাবকে পপার উপেক্ষা করেছেন।

যে কোনো প্রকল্প বা ব্যাখ্যা-সূত্র এক দিক দিয়ে ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি, আর এক দিক দিয়ে social product বা সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক চাহিদা বিশেষভাবে প্রকল্প গঠনকে প্রভাবিত করে। পূর্বকালের ঐশ সৃষ্টির প্রকল্প কিংবা একালের সৌরজগতের বিবর্তন-প্রকল্প প্রমাণযোগ্য বা খণ্ডনযোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমানের পক্ষপাত হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকল্পের উপর।

পপারের প্রস্তাবিত খণ্ডনবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা আনতে চেয়েছে। তাঁর মতে প্রমাণবাদ অবৈজ্ঞানিক প্রকল্পকে প্রশ্রয় দান করে। কিন্তু কিছু কিছু প্রকল্প খণ্ডনযোগ্য না হয়েও লালিত হয়ে এসেছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। যথা:

(১) ইথারের প্রকল্প;

(২) Instinct বা সহজাত বৃত্তি সংক্রান্ত প্রকল্প;

(৩) Unconscious বা অবচেতন সংক্রান্ত প্রকল্প;

(৪) বংশধারা ব্যাখ্যার জন্য gene বা বংশবীজ প্রকল্প ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত আচরণকে ব্যাখ্যার জন্য পূর্ব জন্মের সংস্কার-প্রকল্প এককালে আদৃত হত। বর্তমানে পরিবেশ ও বংশধারার কথা বলা হয়। সেকালও নেই, সেই মানুষের মনও নেই। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা-সূত্র বদলাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বদলাবে। আদতে আমাদের মনটা হচ্ছে বহুলাংশে social product বা সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক প্রভাবের দিকটা দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও বিবেচনীয় হওয়া উচিত।

পপার-এর আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবিচারী মনোবৃত্তি।

নৃবিজ্ঞানে এবং সমাজবিজ্ঞানে অবিচারী মনোবৃত্তি অনেক সময়ে প্রকট

হয়েছে। মর্গানবাদের যে-অংশগুলি খণ্ডিত হয়েছে সেগুলির প্রতি এখনও অনুরাগ প্রদর্শিত হয়।

ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভব এক সময়ে কল্পিত হয়েছিল। এই প্রকল্প খণ্ডিত হয়েও পরিত্যক্ত হয় নি।

মাতৃকাচর্চার তাৎপর্য হচ্ছে উর্বরতা-মূলক ম্যাজিক। এর সঙ্গে মাতৃশাসন বা মেট্রিয়ার্কির কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এখনও অনেকে মাতৃকাচর্যাকে যুক্ত করেন মাতৃতন্ত্রের সঙ্গে। বঙ্গদেশীয় শক্তিপূজার মূলে আদিম মাতৃতন্ত্রের প্রভাব এখনও অনুমিত হয়।

ইতিহাসের নৃবংশীয় ব্যাখ্যা বা Racial interpretation of history খণ্ডিত হয়েছে। বিশুদ্ধ নৃবংশ কোথাও দৃষ্ট হয় না। আধুনিক গোষ্ঠীগুলিতে নৃবংশীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এখনও নৃবংশীয় ব্যাখ্যা-সূত্র কোনো কোনো মহলে সমাদৃত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জট-মোচনের ব্যাপারে পপার-এর বিচারবাদ কার্যকরী হতে পারে।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

একটি শিশিরবিন্দু

চোখ চেয়ে পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম সজ্ঞান পরিচয় শহরে—জীবিকার পাটে।

নোয়াখালির বাসাবাড়িতে সে পরিচয়ে বাধা ছিল না। গৃহপরিধি আত্মীয়স্বজন আমাদের কম নয়। শিশুদের পরিচয়-পরিধিও তাই খর্বিত হত না। তার ওপর শহরটা ছিল নামেই সদর, আসলে প্রায় গ্রাম। শহরবাসীরা আবার অনেকেই ঢাকা-ফরিদপুরের জীবিকান্বেষী, সাধারণভাবে তাদের সে অঞ্চলে পরিচয় 'বিক্রমপুরী'। সত্যই, শহরটা যেন বিক্রমপুরেরই উপনিবেশ। বিলিতী ঔপনিবেশিকতাই এই নেটিব সংস্করণটিও নিজের প্রয়োজনে গড়েছিল। ইংরেজ শাসকেরা পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের তল্পীদার করে নিয়েছিল উত্তর ভারতে শাসন ও শোষণ চালাতে। সেই সূত্রে সে ভদ্রলোকেরাও সেখানে উপনিবেশ গড়েন, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, শিক্ষাদীক্ষা ও দশটা সৎকর্মে বাঙালীই হয় পশ্চিমের অনেক শহরে অগ্রণী। কিন্তু সেখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যেতে চান নি, নিজেদের রেখেছেন স্বতন্ত্র করে—'বাঙালীবাবু' যেন একধাপ উঁচুতে। 'বিক্রমপুরী'দেরও এ শহরে লাভ হয়েছিল ছোট পরিসরে সেরূপ সুযোগ, সেরূপ প্রতিষ্ঠা, সেরূপ প্রাধান্য; আর ছিল সেরূপ স্বাতন্ত্র্য। অবস্থার অসংগতিটা মৌলিক।

ব্যাপারটা মূলত হাস্যকর—পেটি বুর্জোয়ার কর্তাগিরি। ইংরেজ দেশের মালিক, সে 'দেশের মানুষ' নয়। সাহেবের লাথি সবাই তাই সহ্য করে উপায় নেই বলে—কিন্তু কেরানির কাণমলার অধিকার সহ্য করবে কোন্ ভয়ে? এই হাস্যকর 'বড়বাবু'পনা শেষ পর্যন্ত শোচনীয় হয়েও ওঠে—বাঙলার বাইরে সর্বত্রই আজ তা দেখছি। নোয়াখালি শহরে 'বিক্রমপুরী'দের ভাগ্যেও সে ফলই জোটে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে। 'হ্যাভ' ও

'হ্যাভনটসে'র প্রশ্ন—তেমনি চাকরি নিয়ে। 'দেশী' ও 'বিক্রমপুরী' দু-এরই পেটি-বুর্জোয়া প্রার্থনা "চাকর রাখো জী।" প্রার্থনাটা আমলারাজের কাছে—অথচ তখন স্বদেশীতেও সকলেই সক্রিয়! সেই আড়াআড়িতে যখন 'বিক্রমপুরী'রা কোনঠাসা, ঠিক তখন শতকরা ৭২জন সে যুদ্ধে নামল। দুয়েকেই কোনঠাসা করেও তারা থামল না। সাম্প্রদায়িক জেহাদের মুখে তখন 'দেশী'-'বিক্রমপুরী' দুইই ধুলোয় মিশিয়ে একাকার হয়ে যেতে থাকে। এ ১৯৪৬ সালের 'লড়কে লেঙ্গে'র কথা নয়। সেই জাতি-ভাঙার মহড়া বিশ বৎসর পূর্বেই এ শহরে শুরু হয়। অসহযোগের ব্যর্থতার সঙ্গেই খেলাফতের কর্মীরা সেখানে কংগ্রেসবিরোধী হয়ে উঠছিলেন। অবশ্য সে ভাঙন আগেই যেন বাস্তব হয়েই দেখা দিয়েছিল এ শহরে মেঘনার ভাঙনের আকারে। নদীর গ্রাসে সেই নোয়াখালি শহর যখন তার পথঘাট, বাগান, পুকুর, বাড়িঘর সবশুদ্ধ নিশ্চিহ্ন হতে লাগল তখন সেখানকার ভদ্রলোকের সেই বিশেষ ধাঁচের ঔপনিবেশিক পরিবেশও বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে; তার ভাবনা ও জীবনযাত্রার রাজ্যেও ভাঙন হয় অনিবার্য। কিন্তু তারপরেও এ শহরে সেই জীবনের অসংগতি অসংগত হয়ে ওঠে নি। ততক্ষণ সেই 'পেটি বুর্জোয়া'র জীবনের মধ্যে সেই 'পেটি-বুর্জোয়া' ক্ষুদ্রতাও ঠাঁই পেত না এবং একটা সহজ ধরনের শ্রী ও সংযম ছিল, সবশুদ্ধ ছিল একটা অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া।

প্রায় সকলেই এ শহরে নবাগত—পরস্পরের স্বজন। পরিবারে আর পরিবেশে তাই মিলন ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবে। বাইরে পুরুষদের কর্মসূত্রে দেখা-সাক্ষাতে, আলাপে-গল্পে, আর অন্দরে গৃহিণীদের গতায়াতে, খবরাখবরে এ শহরের সমাজ আপনা থেকেই একটা আত্মীয়তার হাওয়ায় গড়ে উঠেছে। ধাঁচটা তার বৃত্তিজীবী বিক্রমপুরী ভদ্রলোকের—কিন্তু সম্পর্কটা মানুষে মানুষে স্বাভাবিক আত্মীয়তার। আমাদের মতো শিশু ও বালকদের পক্ষে তাই সকল বাড়িই ছিল নিজের বাড়ি—বাধা ছিল না তাতে নিজগৃহে ও অন্য গৃহেও।

আমাদের ডাক্তারের বাড়ি—ঔষধপত্রের স্বচ্ছল ব্যবসাও আছে—যদিও ব্যবসায়ী হয়ে ওঠা ভদ্রলোকের পক্ষে সহজ নয়। বাঙালী ভদ্রলোক মানেই মূলত কেরানি, অন্তত চাকরিজীবী। তবে তার মধ্যেও আমাদের বাড়িতে চাকরির বদ্ধ বাতাস অপেক্ষা বোধহয় 'স্বাধীন ব্যবসায়ের' মুক্ত হাওয়া বেশি বইত। দোকানের মিষ্টান্ন, বাড়ির বাসি রান্না, গুরু-পুরোহিতের

মুখের প্রসাদ যেমন ছিল আমাদের নিকট আবাল্য অগ্রাহ্য, তেমনি বিলিতী ঔষধপত্র ও বিস্কুটের সঙ্গে আফাজুদ্দীনের পাঁউরুটিও ছিল বাড়িতে সুপ্রচলিত। স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করেও ভদ্রতার বিধি লঙ্ঘন না করে একটা সুস্থ নমনীয়তা ছিল বাড়ির আচারে-নিয়মে, শিশুদের লালনপালনে, শিশুদের শাসন-তাড়নে, আর শেষে যুবকদের প্রতি মিত্রবদাচরণে। অতটা ঢিলে আচার ও ঢিলে শাসন সকল পরিবারের পছন্দ হত না। আমাদের বাড়ির এই স্বচ্ছন্দ রীতির সমালোচনা অনেকে করতেন। কিন্তু বাইরের পক্ষে যেমন আমরা পাই নি শাসনের কঠিন নিষেধ, ঘরের মধ্যেও পাই নি আদরের অধিক প্রশ্রয়। মুক্তি ছিল সেই সংহত যৌথ পরিবারে মুক্তপদে চলার।

সমগ্র পরিবেশটা ছিল মাটিতে-মানুষে মিলে একই কালে গ্রামে-শহরে মিশ্রিত। নোয়াখালি শহর শেষ-অবধিও গ্রাম ও শহরের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারে নি। সরকারি কাছারি কুঠি, জমিদার কাছারি, বাজারের খানিকটা—এই মাত্র পাকাবাড়ি। বাড়িঘরের থেকে বাগান বেশি, বাগানের থেকেও বেশি মাঠ। অধিকাংশ বাড়িঘর কাঁচা—ছনের চালা, মুলিবাঁশের 'তরজার' বেড়া, কাঁচা মাটির মেজে। পথঘাটে গাড়িঘোড়া লোকজন খুবই কম। এই সামান্য শহরের অসামান্যতা আমার কাছে এখনো তবু স্বতঃসিদ্ধ। লাল-ইটের গুঁড়োয় ঢাকা পরিচ্ছন্ন পথঘাট, দু-ধারে বাতাসের গুঞ্জনে ধ্বনিত ঝাউ-এর সার, নারিকেল-সুপারির ঘন ছায়ায় নিদ্রাচ্ছন্ন অফুরন্ত বাগান, টলটলে জলে-ভরা দীঘি পুষ্করিণী, ঘাসে-ছাওয়া প্রকাণ্ড প্রান্তর, মুক্ত হাওয়ার অজস্র খেলার মাঠ, সমুদ্র সঙ্গমে দিগ্‌দেশহীন মেঘনার বান-ডাকা উন্মাদ রঙ্গ—আর সব শেষে তার মানুষ, সাধারণ মানুষ,—একজনও যেখানে জন্মান নি মহাপুরুষ, অসাধারণ মানুষ—সেই সাধারণ মানুষের অসাধারণতা—এ সব আমার কাছে শুধু স্মৃতি নয়, উত্তরাধিকার—যা ভোগ করতে পারি, কিন্তু হস্তান্তর করতে পারি না।

বাস্তবত এই নোয়াখালিও এখন শুধু স্মৃতিরই সঞ্চয়, সুদূরের স্বপ্ন, Far Away and Long Ago-র কথা। কোনো বাঙালী হাড্‌সন জন্মালে তার কথা তেমন করে প্রকাশিত করতে পারতেন। আমরা বাঙালীরা সত্যই 'আত্মবিস্মৃত জাতি'। হয়তো আত্মায় সুষুপ্ত জাতি। আমরা আমাদের গ্রাম ও শহর নিয়ে কাব্যোচ্ছ্বাস করি। নাম-করা ফুল-ফল-লতাপাতার

একটা 'ল-সা-গু' করা বর্ণনায় তা সাজাই। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ গ্রাম, বিশেষ শহর, একটি বিশেষ নদীর পরিচয়ও কি আমরা লিখি? হয়তো আমরা তার পরিচয় জানি না, আমরা তা দেখিই না। বরং এদিকে দেখেছি, নীরদ চৌধুরী কিশোরগঞ্জের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে ছাড়া আত্মপরিচয় ভাবতে পারেন নি। কলিকাতার আকাশে আঁকা সৌধরেখা তার মনের পটে আঁক রেখেছে। কিন্তু নীরদ চৌধুরী তো "ইংরেজ"—বোধহয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ইংরেজ। The last of the Imperialist Englishmen. কিন্তু বাঙালীরা কেউ কি কলকাতা দেখেন না? কিম্বা দেখেন না নিজের গ্রাম, নিজের শহর? এই অতি-সমতল বাঙলারও নানা বিশিষ্ট রূপ আছে—গ্রাম-ছাড়া রাঙামাটির পথ আর ভরানদী ক্ষুরধারা ক্ষুরপরশা পদ্মার মতো কত রূপ তার, কে দেখে? দার্জিলিং, কালিম্পং যেতে হবে হবে কেন? চট্টগ্রাম শিলেটের রূপ কি কম? নোয়াখালি সে তুলনায় 'সাধারণ মেয়ে'। তবু বহু দেশ ঘুরে বহু দেশ দেখে যখনই আবার ফিরে আসি বাঙলায় তখনি দুয়ার হতে অদূরে দেখি 'একটি ধানের শিসের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'—মেঘনার মুখে টল-টলায়মান নোয়াখালি শহরটি।

এই নোয়াখালি ছিল নতুন জেলার নতুন সদর। তার ইতিহাস নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ভূগোলও এমন জটিল নয়। ভুলুয়া পরগণা 'বার ভুঞার' লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্য হলেই বা কি না হলেই বা কি, 'হুদা ভুলা' সেই 'খোদ ভুলুয়া'র নাম হলেও যা না হলেও তা, আমার পক্ষে এদ্দিনে একই কথা। আমার কাছে বরং তার ইতিহাস এই: রবীন্দ্রনাথ দু-বার তার উল্লেখ করেছেন, একবার 'রাজর্ষি'তে রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্যের পথের বর্ণনায়, আর-একবার 'একরাত্রিতে'—ছোট গল্পের পরিধিতে একটি অপূর্ব অনুভূতির বর্ণনায়। হয়তো ইতিহাসে আরও দু-এক পংক্তি যোজনা হয়ে থাকবে—কারণ প্রায় একই কালে এখানে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে এসে মিলেছিলেন তরুণ অচিন্ত্যকুমার, কিশোর হুমায়ুন কবির ও বালক বুদ্ধদেব বসু। তাঁরা কি সংগ্রহ করেছেন ওখান থেকে জানি না। ভবিষ্যতের গবেষকের তা জিজ্ঞাস্য। আমার জিজ্ঞাসা নেই—আছে সেই পরিবেশের পরিচয়।

নোয়াখালি চালাঘরের শহর। তার বিস্তৃত মাঠের মধ্যে এক-একটি 'দ্বীপ'—সাহেব শাসকদের বিশাল কুঠি, চালাঘরের রাজ্যে আমলারাজের

রাজপ্রসাদ। শহর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, শহরবাসীর থেকেও। সেদিনের দু-একজন সাহেব মুরুব্বির মতো আমলা-কর্মচারীদের অনুগ্রহ করতেন, গাঁয়ের ছেলেদের চাকরি দিতেন, তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহারও করতেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা ছিল ব্রিটিশ রাজের প্রণীত ও বাঞ্ছিত ব্যবস্থা। দশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা দূর করে ফেলতে পেরেছিলেন তবু এ শহরে দু-একজন বড়ো কর্মচারী স্বচেষ্টায়—সূর্যকুমার আগস্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আগস্তী সাহেব শহরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতেন, তাঁর গৃহে তাঁদের খানাপিনাও চলত, খানার চেয়ে পিনা কম থাকত না। লেখাপড়ার তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী। তিনিই নির্মাণ করেছিলেন এখানকার 'টাউন হল', আর টাউন হলে তাঁর বড়ো তৈলচিত্র ছিল তাঁর প্রতি শহরবাসীর প্রীতির প্রমাণ। টাউন হলটা শুধু এ শহরের সভাগৃহ নয়, একটা জীবন-কেন্দ্র—তাতে সংলগ্ন ছিল নাট্যমঞ্চ অর্থাৎ নর্মক্ষেত্র; ক্লাব বা গোষ্ঠীগৃহ, বিলিয়ার্ড, টেনিস, ব্রিজ খেলারও ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল সাধারণ গ্রন্থাগার। এ টাউন হল আকারে ছোট হলেও সৌন্দর্যে পরিচ্ছন্নতায় দর্শনীয়। লাইব্রেরি আগস্তীর প্রদত্ত ও নির্বাচিত দেশী-বিদেশী বই-এর জন্য আদরণীয়। বছর পনের পরে আই. সি-এস. মিস্টার জে. এন. গুপ্ত সকল ব্যবস্থার আরও উন্নতি করেন। সে আমলটা এ-শহরের একটা সমারোহের যুগ—গোল্‌ডেন এজ। তারপরেই দেখা দিল তাতে ভাঙন। আমরা দু-এরই সাক্ষী। দেশীয় শিক্ষিতদের সংস্পর্শ থেকে আপনাদের বাঁচাতে বিদেশীয় রাজপুরুষরা তখন নিজেদের স্বতন্ত্র ক্লাব গঠন করেছিলেন—মাঠের মধ্যে তৈরি হয়েছিল আর-একটি দ্বীপ। এই সরকারী শাসকদের থেকে বরং বে-সরকারী সাহেবদেরই কাজ মনে রাখবার মতো হত—যদি তা টিঁকে থাকত।

কারণ কোম্পানির সহেবেরা এখানে একসময়ে কুঠি গড়েছিলেন, সম্ভবত নুনগোলার কুঠি। জেলা-স্কুলের বাড়িটার এই পরিচয়ই আমরা শুনেছি। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল সেই বাড়ি—অদূরে উত্তরে প্রকাণ্ড লালদীঘি। তার কাছাকাছি দু-একটা কুঠি কাছারি। এসব বেশি দিনের জিনিস হতে পারে না। এখানকার বর্ষায় ও নোনা জলে সবই তাড়াতাড়ি জীর্ণ হয়ে যায়। এর থেকে বেশি পুরনো মনে হয়—ঝাউ-এর ঘেরা, ঝিল পাড়ের দোতলা 'শাদা কুঠি', তারও উত্তর পূর্বের মাঠের মস্ত লম্বা ঝিল ও উত্তরের 'ভাঙা কুঠি'—যা ভেঙে আমাদের শৈশবে তৈরি হয় দোতলা 'লালকুঠি'।

এখান থেকে সেই লাল সড়ক দু-ধারে সারি-সারি ঝাউ-এর চামর-দোলানো হাওয়া খেতে খেতে টাউন হলের লাল স্তম্ভের বাড়ি ও কেয়ারি-করা বাগান ডানদিকে রেখে—বাঁদিকে রেখে জুবিলী স্কুল, ডাকঘর, সোজা গিয়ে পৌঁছেছিল সরকারী কাছারিতে। ও-পথ দিয়ে টগ-বগ করে শব্দ তুলে জেলা জজ ইউসুফ সাহেব সদর্পে ওয়ালার ঘোড়ার টম-টম হাঁকিয়ে কাছারিতে যেতেন—আসতেন। আমরা জজ পেনাল সাহেবকে দেখি নি—জেলা পুলিশ সাহেবকে, জেলে পাঠিয়ে এই আইরিশ-জাতীয় জজ সাহেব চাকরি খোয়ান, কিন্তু নোয়াখালির নাম ভারতবর্ষে পরিচিত করে যান। ১৯২৯-এ নোয়াখালির নাম শুনেই এর্নাকুলম-এর বর্ষীয়ান এডভোকেট বললেন—"নোয়াখালি অব দি পেনেল এ্যাণ্ড ওসমান আলী দারোগা।" ওসমান আলী সাহেবকে দেখেছি—প্রকাণ্ড বাড়ি জেলা স্কুলের উল্টোদিকে। পেনেল সাহেব থাকতেন কোথায় জানতাম না। ঝিলের কুঠি ও লালকুঠি ছিল আমাদের দিনে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠি—তার আশেপাশে পুলিশ সাহেব ডাক্তার সাহেবের কুঠি। লালকুঠির পশ্চিম দিকে পুকুরের পরেই বিবির বাজার, আর পূর্বদিকে আমাদের পাড়া—বাদামতলা।

আমার কাছে নোয়াখালির প্রাণকেন্দ্র এই বাদামতলা! ও-শহরের আত্মা বাদাম গাছের কোটরে নেই, মেঘনার পাড়ে নেই, নারিকেল গাছের ডালেও নেই, থাকলে আছে একটা বিশেষ পরিবেশে। সেই পরিবেশের প্রথম পাদপীঠ এই 'বাদামতলা', তারপর সেই সঙ্গে ওই শহরের 'টাউন হল'। বাদামতলায় আমার শৈশব-বাল্য-যৌবন আপনার নিয়মে পাতার পর পাতা মেলে দিয়েছে। টাউন হলে আমার প্রথম যৌবন আপনাকে জানবার তাগিদে করেছে প্রথম নর্ম-রচনা ও কর্মায়োজন।

জানি না কোথা থেকে কে রোপণ করেছিল এ দুটি বাদাম গাছ; কেন রোপণ করেছিল তা অবশ্য সুস্পষ্ট। শহরের সর্বাপেক্ষা উঁচু গাছ এ-দুটি, তাই তার নামে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে একটা গোটা পাড়া। বাজার থেকে পূর্ব দিকে 'লালকুঠি' ছাড়িয়ে গেলেই বাদামতলার শুরু, ভুলুয়ার কাছারি এলাকায় পৌঁছবার পূর্বেই এ পাড়ার শেষ। পথটা অবশ্য সে কাছারি ছাড়িয়ে সেনপাড়া পেরিয়ে শেষ হবে গিয়ে কালীতারার দীঘি ও হাটে। এই পথ থেকে হাত বিশ-ত্রিশ দক্ষিণে বাদামতলার বাদাম গাছ দুটি বিরাট দেহ বিস্তার করেছিল। একটা ছোট সড়ক দু-গাছের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে দক্ষিণে, আমাদের বাসাবাড়ির বড়ো পুকুরটা বাঁ পাশে রেখে তার

দক্ষিণ-কোণ পর্যন্ত পথটা বিস্তৃত। এটা বাদামতলার পথ। এ পথেরই ঠিক পাশে দুই বাদাম গাছের গায়ে দুটো পাকা ইটের স্তম্ভ—কোন্ কালের পুরনো ফটকের শেষ চিহ্ন, সেই স্তম্ভ আর প্রহরী সেই গাছদুটো। কিসের ফটক তা কে বলবে? এই গাছের ছায়ায় পুকুরের কোণে আমাদের বৈঠকখানা; আর পুকুরের উত্তর পাড় জুড়ে আমাদের বাইরের প্রাঙ্গণ, পূর্বপাড় জুড়ে আমাদের অন্দর মহল। ভেতরে ছোট বড়ো দুটো উঠোন—বাসঘরের আর রান্নাঘরের। বড়ো উঠোনটা যেন উঁচু ঘরের বাঁধানো ভিটে, কিম্বা বাঁধানো চাতাল। মাটি আর শ্যাওলায় ঢাকা তার মশলা-বাঁধা ইট বর্ষায় ক্ষয় হয় না—শুধু বেরিয়ে পড়ে। কী ছিল এখানে? পুকুরের ঠিক উল্টো কোণে বাদামতলার সড়ক যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে—আমাদের দিনে সেখানে ছিল আনন্দবাবুর বাসা। সে বাসাবাড়ির অন্দরে প্রকাণ্ড বড়ো একটা বাঁধানো চাতাল। এইখানেই বা ছিল কী? আজকালকার দিনে হলে মনে হত—ধানকলের চাতাল। চতুর্থ একটা জিনিস ছিল সদর রাস্তা ও আমাদের বাসাবাড়ির মধ্যে—রাস্তা বরাবর নিচু একটা ছোট মাঠ। সেখানে একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ, আর তার অদূরে সেই মাঠে একটা পাকাবাড়ি—চার-পাঁচখানা তাতে ঘর, আর কিছুর চিহ্ন নেই কোথাও। এই বাড়িটাই বা কী? আমাদের জন্মের আগে সেখানে স্থাপিত হয়েছিল 'বঙ্গবিদ্যালয়', সেই 'বঙ্গবিদ্যালয়'-এর পর্ব শেষ হয়ে গেলে 'বিদ্যালয়' হয় 'স্কুল', আর 'বঙ্গের' স্থান নেয় 'মাইনর'। আমাদের কালেই সে 'মাইনর' থেকে 'মিডল ইংলিশ' নাম নিয়ে কুলীনত্ব লাভ করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই জীর্ণ পাকাবাড়ি ভেঙে ফেলে তৈরি হল টিনের চালার, তরজার বেড়ার, বাঁধানো ভিটের তিন হাতার লম্বা ঘর—দেখে স্কুল না বলা অসাধ্য। কিন্তু মাঠটার নাম রয়ে গেল 'বঙ্গ বিদ্যালয়-এর মাঠ', আর পুরনো দিনের সাক্ষী রয়ে গেল ঝাউগাছটা—তার মাথায় হাওয়ায় জড়ানো চিরদিনের নিঃশ্বাস। কী ছিল সেই বাড়িটা? জানি না। আমরা বুঝতাম ওই 'ঝিলের কুঠি'—'ভাঙা কুঠি' থেকে এই বাদামতলা পর্যন্ত একটা এলাকা ছিল—যা বেশি অতীতের কথা নয়, তবু বিস্মৃত। বিস্মৃত বলেই প্রত্নতত্ত্ব আর প্রেততত্ত্ব বাদ দিয়েও তাতে রহস্যের স্পর্শ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কী ছিল সেখানে? কারা ছিল একদিন এই বাদামতলার ফটক-ঘেরা মহলের বাসিন্দা?

সে বাসিন্দারা এ শহরের জন্য কাজ এগিয়ে রেখে গিয়েছিল। সদর

স্থাপিত হলে নতুন করে সরকারী কাছারি, দপ্তরখানা ও সাহেবদের বড়ো বড়ো কুঠি গড়বার সুযোগ শাসকদের ভালোই জোটে। খালি জমি আর মাঠ ছিল পড়ে, বিনা দক্ষিণায় তার মালিকেরা তা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। তা ছাড়া, পূর্বেই সেই কুঠির সাহেবরা তৈরি করে গিয়েছিলেন এই সুন্দর সড়ক, দু-ধারে তার রোপণ করেছিলেন ঝাউ-এর সার, মাঝে মাঝে দীঘি আর ঝিল। তাঁদের আরেকটা কীর্তি তখন অব্যবহৃত, কিন্তু বিনষ্ট হয় নি—শহরের ঠিক বাইরে পূর্ব সীমায় 'ঘোড়দৌড়ের মাঠ'। শুপারি নারিকেল ঘেরা দু-তিনটি গ্রামকে ঘিরে প্রশস্ত একটা চক্কর। এ কালের মাঠের ক্লাব ঘরের থেকে অনেক তা লক্ষণীয়। এ চক্কর যারা তৈরি করেছিল আর তা ব্যবহারও করত তারা তো সংখ্যায় এক-আধজন হতে পারে না। অবশ্য তার থেকেও পুরনো বোধহয় পূর্ব ও পশ্চিম, দু-দিককার দুটি প্রধান দীঘি—শহরের পানীয় জলের তাই আধার। তবে এসবই বা কত কালের? পুরনো বললে বোধহয় শহরের দক্ষিণের ও পশ্চিমের দুটি গ্রামের কথাই বলা উচিত। দক্ষিণে সাহেবঘাটা—যেখানে বরিশাল হয়ে কলকাতার জাহাজ আসে। পশ্চিমে এজবেলিয়া—যেটা আমার শব্দতাত্ত্বিক বিদ্যায় বলে ইজাবেলারই অপভ্রংশ। কারণ, দু-গ্রামের বাসিন্দারাই পর্তুগীজদের বংশধর। তিন-চার শত বৎসরে গঞ্জাল্‌ভিস্‌-ফার্নান্‌দিজদের সন্তানসন্ততিরা এই দেশের জলে বাতাসে সম্পূর্ণ এদেশীয় হয়ে গিয়েছে। রঙে-রূপে কথাবার্তায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে, কাজে-কর্মে, চাল-চলনে একেবারেই সাধারণ চাষী, মজুর। বরং একটু বেশি দরিদ্র, একটু বেশি নিরীহ। থাকবার মধ্যে আছে রোমান ক্যাথোলিক ধর্ম, তার আইরিশ বা বেলজিয়ান পাদ্রির পৌরোহিত্য। আর সে চার্চের আওতায় দু-চারজনের সাহেবী শিক্ষা ও সভ্যতা এবং জীবিকার সুযোগ একটু আয়ত্ত করবার চেষ্টা। দু-এক অক্ষর ইংরেজি পড়ে, দু-একবার ফেল করে, রোজারিও, এন্টোনিও, মার্ক প্রভৃতি আমাদের সহপাঠীরা কোট-প্যাণ্ট পরে রেল-এ কাজ জুটিয়ে নিয়ে সাহেবিয়ানায় পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। তার বেশি তাদের সাধ্যও ছিল না, স্বপ্নও ছিল না। মনে পড়ে লাকসাম জংশনে মাতাল টিকেট চেকার কী অন্যায় আচরণের জন্য ধরা পড়ে হাউ-হাউ করে অভিমানভরে ইংরেজিতে বলছে, "আমাকে তোমরা অপমান করছ। অধ্যাপক পার্সিভেল আমার খুড়ো—তোমরা তাঁর ছাত্র না?" আমরা নই, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পার্সিভেল-এর

নামে তখনো আমাদের পূর্বেকার দু-পুরুষ ছাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।' অধ্যাপক পার্সিভেল ছিলেন চট্টগ্রামের লোক, একজন পর্তুগীজ বংশধর। কিন্তু দ্বিতীয় পার্সিভেল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো বংশেই কি আর বাঙলায় জন্মেছে? নোয়াখালির পর্তুগীজ বংশধরদের জীবনযাত্রা ছিল সঙ্কুচিত, নিস্তেজ, অবসন্ন—সর্ব রকমেই তারা নগণ্য।

নতুন পত্তনের সদরের জন্য এ জেলার হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান কেউ বেশি কাজে লাগে নি—জীবিকার দায়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে তখনো তারা নারাজ, ইংরেজি শিখতেও উদ্যোগী নয়; তাই জেলার বাইরে থেকে শুধু কেরানি কর্মচারীই একা আসে নি। এসেছে উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-মাস্টার আর সেই সঙ্গে ছোট বড়ো দোকানী-পশারী, কারিগর মিস্ত্রি পর্যন্ত। পানাম সোনারগাঁর ব্যবসায়ীরা কাপড়ের একচেটিয়া কারবারী; ঢাকার কাঁসারিরা বাসন-কোসনের, মাদারিপুর-নড়িয়ার গোয়ালারা দধি ক্ষীর মাখনের, গোলদারী কারবার শিলেট-ত্রিপুররা-চাঁদপুরের ব্যবসায়ীদের একমাত্র স্থানীয় মুসলমানরা জুতো-জামা-লুঙ্গি ও সওদাগরী ব্যবসায়ে এগিয়ে আসে, দিন মজুরের কাজে আর কারিগরী কাজে জুটে যায়। অবশ্য দু-একজন করে শহরীয় হিন্দু-মুসলমান শিক্ষায় এগুতেই চাকরি পেতেন, ক্রমে ওকালতিতে মোক্তারিতেও যোগ দেন। আসলে শহরটায় তারাই বিদ্বান। আরও আশ্চর্য ব্যাপার—জমিদার যাঁরা তাঁরাও স্থানীয় নন—পশ্চিমবঙ্গের। কারণ, বোধহয় ভূসম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হত এক সময়ে কলকাতায়। পাইকপাড়ার লালাবাবুর বংশধররা 'ভুলুয়ার' জমিদার। সব চেয়ে বড় জমিদার তাঁরা। তাঁদের প্রেরিত নায়েব হিসাবে আর এক জনা 'অমরাবাদের জমিদারীর স্রষ্টা।' 'ডিলেনি' আছেন সাহেব (ফরাসীয়) জমিদার। কেউ প্রায় তাদের মহাল চক্ষেও দেখেন নি। দু-একজন 'দেশোয়ালী' জমিদারও আছেন। সরকারী বেসরকারী সকল কাজে যে ঢাকা-ফরিদপুরের লোকেরা অগ্রবর্তী, তাঁরাই এসব অনুপস্থিত জমিদারীর স্থানীয় নায়েব বা পরিচালক, আর সেই সূত্রে অনুপস্থিত প্রভুদের কতকটা প্রতিপত্তির দাবীদার। কেউ কেউ ছোটখাটো তালুকও এখানে কিনেছেন, আত্মীয়-পরিজন, গ্রামের বন্ধু-বান্ধব অনুগতদেরও সরকারী বেসরকারী নানা কাজে জীবিকা জুটিয়ে দিয়েছেন, দেশের মমতা না ছাড়লেও এই প্রবাসেই স্থায়ী হয়ে বসেছেন, বরং এ জেলার দু'চারজন যাঁরা কর্মসূত্রে শহরে এসেছেন, তাঁরাই শহরে অস্থায়ী। ছুটিছাটা কেন, শনিবার রবিবারেও গ্রামের বাড়িতে

চলে যান—পরিবার-পরিজন সেখানে। এ-শহর তাঁদের কাছে প্রবাস—আর যারা বাইরের তাঁরাই হয়ে আছেন এর বাসিন্দা। শহরের পরিবেশটা সৃষ্টি করেছেন এই বাসিন্দারা—সেই বিক্রমপুরী উপনিবেশেরও যাঁরা উপজীবিকাজীবি। অতি অল্প করে হলেও তাঁরা কিন্তু একটা কথা বোঝে হয় বিদ্যা নয় বুদ্ধি নয় উদ্যোগ—এ ছাড়া জীবনে পথ নেই।

চালটা কিন্তু তাঁদের মোটা চালের—'চালাঘরের চাল।' বড়ো উকিলেরাও এক কালে পাল্কিতে গতায়াত করতেন, কিন্তু প্রায়ই থাকতেন খড়ের ঘরে। পাকাবাড়ি বলতে ভুলুয়ার জমিদারের কাছারিটাই ছিল প্রধান। দোতলা চকমিলানো বাড়ি—ভেতরে বাইরে প্রশস্ত দালান-বারান্দা, মধ্যখানে ঘাসে-ঢাকা চতুষ্কোণ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তিন দিকে কোঠায় কোঠায় কাছারির নানা দপ্তর, মালখানা, তোষাখানা ইত্যাদি। পুরনো দিনের ঢাল, তলোয়ার, বল্লমের সঙ্গে কয়েকটা গাদা বন্দুক ছিল একটা বড় ঘরে। নানা ঘরে নায়েব, আমিন, স্মারনবিশ প্রভৃতির নিজ নিজ দপ্তর। দোতলার লম্বা হল ঘরে বড় সেরেস্তায় আমলারা বিস্তৃত ফরাসে বসে কাজ করছেন। একের পর এক বসে তাঁরা কাঠের ডেক্‌সের উপর খাতা লিখছেন, পিছনে ঠেস্ দেবার জন্য আছে ঘামের দাগ-পড়া এক-একখানা চওড়া কাঠ, ও প্রান্তে সেরেস্তাদারবাবু বলরাম সিংহ (জমিদারদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর একজন) কখনো গুড়গুড়ির নল হাতে এক-আধটুকু সই করেন, প্রায়ই কারও সঙ্গে গুড়গুড়ি টানতে টানতে গল্প করেন। দেউড়ীতে জলঘড়িতে বাটিতে সময় মাপা হয়, ঘণ্টা বাজে—আমার ছেলেবেলার মাস্টারমশায় যোড়শী সেন মশায়কে দেখতে গেলে এসব দেখতাম। অবশ্য, কাছারিটা আমাদেরও চেনা—বাবাও ছিলেন জমিদারদের 'মোক্তার' অর্থাৎ বাঁধা উকিল; একটা ঘরে ছিল সেই আইন সেরেস্তা। আর তাঁর জ্যেষ্ঠ সুহৃদ প্রতিবেশী বসন্ত সেন ছিলেন সেখানকার ম্যানেজার—রাশভারী কড়া মানুষ, ওপরতলায় তাঁর কাঁচের ঘরের আপিসে যেতে আমরাও ভয় পেতাম—কর্মচারীরা কাঁপতেন।

ভুলুয়ার কাছারি আসলে একটা পাড়া। চারদিকে আমলা-কর্মচারী, ঘরদুয়ার, পাইক-বরকন্দাজ, ঘোড়াশালা নানা জিনিস। দক্ষিণে সদর রাস্তা—তার ওপারে কাছারির প্রকাণ্ড পুকুর। প্রশস্ত ঘাট নেমে গিয়েছে পরিষ্কার জলে। ঘাটের ওপর গুটি তিন বকুল গাছ, তিন দিকে বাঁধানো আলসে—পূর্ব দিকে ছোট শিবমন্দির—বকুল ফুলে ও গন্ধে ঘাটটা ভরে থাকে। কাছারিটা

ঘিরে সেদিনের জমিদারদের সর্ব আয়োজন। পার্শ্বের লালাবাবুর বংশধররা স্বভাবতই স্থাপন করেছিলেন গোপাল মন্দির—শুধু গোপাল নয়, একদিকে তাঁর জগন্নাথদেবের ছোট মন্দির ও রথ; অন্যদিকে গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ। সামনে পরিচ্ছন্ন নাটমন্দির। চারদিকে দেশী ফুলের সযত্ন পালিত বাগান—চাঁপায় বেলিতে, জুঁইতে, গাঁদায়, কাঞ্চনে শান্ত সুরভিত শ্রী ঘিরে থাকে গোপাল বাড়ি—ব্রজভূমির পূজারী বামুনটির ভক্তি ও রুচির তা পরিচয়।

আশ্চর্য কথা, গাছে পাতায় যে দেশ এত শ্যামল সেখানে কেন ফুলের বাগান এত অল্প? নোনা জলে ও ভেজা মাটিতে অবশ্য অনেক ফুল ও ফলের গাছ ভালো জন্মে না। আমাদের ল্যাংড়া আমের গাছটায় কখনো ফল দেখি নি। লিচু গাছটায় যা ফলতো তা আমাদের শিশুদেরও দুঃসাধ্য ভক্ষ্য। বাড়িতে বেল, গাঁদা, জবা, শেফালি, দোপাটির সঙ্গে ছিল পাতাবাহার। প্রকাণ্ড কদম গাছটার দান অজস্র ছিল—যেমন অজস্র দান ছিল কুল বেল আমলকি ও কাঠাল গাছগুলির। কিন্তু অনেক ফুল ফলই যে যত্ন পেলে ভালো ফলে তাও দেখেছি। শহরে সব চেয়ে সেরা বাগান ছিল যাঁর তিনি ভাগ্যান্বেষী ফরাসী সাহেব, মারসোঁ। এখানে নাকি এসেছিলেন নিঃসম্বল, কিন্তু বছর চল্লিশে নিজের উদ্যোগে, কর্মবলে আর চর্মবলে তিনি সুসম্পন্ন ক্যাপিটালিস্ট ফার্মার আর দপদার-ব্যবসায়ী। তাঁর কুঠিতে ছিল গোলাপ ও নানা বিলিতী ফুলের কেয়ারি, যত্নে রোপিত বাড়ির চারদিকে নারিকেল, সুপারি, লিচু প্রভৃতি ফলের বাগান। সাহেবদের সরকারী কুঠির বাগানে মাইনে-করা মালীর কাজ। মারসোঁর কুঠির ফুলের মতো ফুল তাতে ফোটে না। রুচির চর্চায় রূপের অনুভূতিতে এখনো সচেতন হয় নি কেন এখানকার মানুষ? প্রকৃতি যা দু-হাতে ঢেলে দিয়েছে তার দাম বুঝলে দু-হাতে তা নেয়। কিন্তু যার দাম না থাকলেও মূল্য আছে তাকে এখনো ভোগ করতে শেখে নি চোখ। নারিকেল-সুপারির চাষ বাড়াতে সবাই আগ্রহী, কিন্তু ফুলের সম্বন্ধে উদাসীন।

সুপারি আর নারিকেলের বাগানে বাড়িঘর সব ঘেরা। সে বাগান না থাকলেই আছে মাঠ—ঘাসে ঘাসে সেই মাঠ ঢাকা। গ্রীষ্মে ধু ধু করা মাঠ এখানে দেখা যায় না। চৈত্র-বৈশাখে রৌদ্র যখন কাঠ-ফাটা তখন শুধু ঘাসের ডগায় দেখা দেয় তাম্র আভা, গোড়ায় মাটির নিরার্দ্র শুষ্কতা, সেই সামান্য ধূসরতার আভাস শ্যামলতার উপরে দেখা দিতে না দিতেই কালবৈশাখীর রুদ্র খেলা শুরু হয়ে যাবে।

আকাশের রৌদ্রের আঁচ না নিভতেই ঘন ঘটায় পরিণত হবে অপরাহ্লের মেঘ রেখা। কালো ঘন কৃষ্ণ পাখা ছড়িয়ে ছুটে আসবে কালো বৈশাখী। আকাশ ঢেকে যাবে; বিদ্যুতের ছটা চমকে উঠবে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, গুরু গর্জন যাবে তার পিছনে পিছনে ধেয়ে বজ্রের দেবতা দিক থেকে দিগন্তরে। বাতাস উদ্দাম হয়ে সুপারি নারিকেলের মাথা নুইয়ে, আলুথালু করবে তার চুলের রাশি। অন্ত কোনো গাছের ডাল ভেঙে, পাতা ছিঁড়ে, কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলিকে দশ হাতে লুঠে উড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেবে মাঠে, পথে—লাল সড়কের উপরে—মাতামাতি শুরু করে দেবে ডাল, পাতা, ফুল পাক খেয়ে উঠবে এক-একটা ছোট ঘূর্ণীতে। তারপর আসবে টপটপ করে বড়ো ফোঁটার বৃষ্টি। কর্ণবিদারী বজ্রনির্ঘোষ, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে আর পৃথিবী তার তলায় মুহুর্মুহু বজ্রাঘাতে কাল-বৈশাখের বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীর মতো আকাশের প্রান্ত থেকে পৃথিবীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আকাশ থেকে নেমে আসছে তীরের ধারা। গাছের মাথার উপর দিয়ে, মাঠের খোলা বুকের উপর দিয়ে দীঘির দোলা-লাগা বুকের উপর দিয়ে বৃষ্টি সহস্রধারায় ছুটে আসবে দূর থেকে নিকটে, তারপরে একেবারে চারদিকে—ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল যেন সব—ঝম্ ঝম্ করে এবার নামল বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মতো দুরন্ত ধারা, অশান্ত আকাশ, দুর্দান্ত মেঘগর্জন ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কালবৈশাখী পৃথিবীর বুকে যেন ক্ষ্যাপা দেবতার মতো তাণ্ডবের খেলা খেলতে নেমেছে। মাটি ভিজে উঠল, গাছ-পাতা ধুয়ে নির্মল হয়ে গেল, জল জমতে লাগল ঘাসের গোড়ায়, মাটির ভেজা আঙিনায়। শুকনো গাছপাতা ধুয়ে চালা-ছাউনি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। গড়িয়ে পথ খুঁজে চলল ছোট ছোট জলের ধারা। তারপর আরও তা প্রশস্ত হল, আরও তা প্রবল হল পথ ঢেকে, মাটি ধুয়ে গড়িয়ে চলল নালা-ডোবা-খালের সন্ধানে। এখানে-ওখানে ঘাসের গোড়া ডুবে গেল—জলের মধ্যে জেগে রইল তার ডগাগুলি। শ্যামলতার বদলে দেখা দিল এক সজল স্বচ্ছতা, নতুন জলের রজত-ধারা। সেই জলের বুকে আবার বৃষ্টির অবিশ্রান্ত নৃত্য। এক-একটা বৃষ্টির ফোঁটা জলের উপর পড়ে, তখনি ফুটে ওঠে একটা জলের ফোঁটা হয়ে. শত শত, হাজার হাজার ফোঁটা—বয়ে চলে সার বেঁধে। একে অন্যের গায়ে মিশে ফেটে যায়, আবার গড়ে ওঠে, বড়ো হয়ে আবার ভাঙে। বৃষ্টির ফোঁটা নয়, আকাশ-চ্যুতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্সরার দল পৃথিবীতে নৃত্যের নিমন্ত্রণ পেয়েছে।

চোখের সম্মুখে ঘরের দুয়ারে পেতে বসেছে রূপের হাট। কিন্তু কতক্ষণ? হয়তো সূর্য পাটে নামবার আগেই এই ঘনঘটা মুছে যাবে, এই নৃত্যের আসরও ভেঙে যাবে। আর পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্রের ঝলক ঝিকমিক করে হেসে ছড়িয়ে পড়বে শেষবারের মতো পৃথিবীতে। ঘাসের ডগায় জলবিন্দুতে লেগে যাবে সোনার আভা। সকালবেলা যখন সূর্যদেব ফিরে আসবেন তখন সেই বৈশাখের তাপ-ম্লান গাছ-পাতা, নারিকেল বন, মাঠের ঘাস বর্ষণ-স্নাত নতুন স্নিগ্ধতায় শ্যাম সুচিক্কণ হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে রুদ্র বৈশাখও আতাম্র সন্ন্যাসী নয়। শ্যাম সুশোভন—আষাঢ়ের পূর্বেই এসে যায় বর্ষা—আর আশ্বিনের আঙিনা ছাড়িয়ে কার্তিকেও তার বর্ষণের শেষ নেই।

সেই দীর্ঘ বর্ষা আমার ভালো লাগত না। চৈত্র-বৈশাখের পরে বর্ষাকে ফাঁকি দিয়ে একেবারে শরৎকালে পৌঁছাতে পারলে কী আনন্দই হত! অনেক সময় মনে হয়েছে একবার রবীন্দ্রনাথকে এখানে বর্ষা যাপন করতে হলে দেখা যেত তিনি আর বর্ষামঙ্গলের কথা পাড়েন কিনা। না, তাঁকে সাধারণ মানুষের মতো খালি পায়ে ছাতা মাথায় হাট-বাজার করতে হত না, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় সাবধানে গুছিয়ে যেতে হত না ইস্কুলে আপিসে, ভেজা গায়ে বসে লিখতে হত না দপ্তরের হিসাবপত্র। না হয় ওই ঝিলের বাড়ির কুঠিতেই তিনি থাকতেন—ক্ষুধিত পাষাণ না হোক এই ঝিল-ঝাউ-এ ঘেরা শাদা বাড়িটার মধ্যে এককালের ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিলুপ্ত জীবনকথা তো কম রহস্যময় অনুভূতি জাগায় না। এখানে বসেই তিনি দেখতেন—দক্ষিণের মাঠের উপর দিয়ে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি—জলে-জলাকার মাঠটা, সবুজ ঘাসের উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃষ্টি এক-একটা আস্তরণ বিছিয়ে দিচ্ছে। খাল নালা জল বয়ে উঠতে পারছে না। সব ছাপিয়ে সেই বর্ষার জল একেবারে ঘরের দুয়ারে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। আকাশে মেঘ আর মেঘ আর মেঘ। কবির জন্মের দোসর তপনদেব দিনের পর দিন আর একবারও তাঁর সন্ধান দেন না। নিশ্চয়ই তিনি তবু কবিতা লিখতেন—কিন্তু কাউকে কি তিনি তা শোনাতে চাইতেন? কইতে চাইতেন কাউকে—"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী?" কাকে বলবেন? কাউকে নিয়ে চাইতেন বর্ষামঙ্গলের উৎসব করতে? কোথায় সেই লোক। আমরা তো অস্থির হয়ে পড়তাম ঘরে বন্দী থেকে। লতাপাতায়, মাটিতে, ঘরে-বাইরে একটা শ্যাওলা-ধরা আর্দ্রতা। রথযাত্রা-ঝুলনে তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। ভাদ্রের অমাবস্যা, পূর্ণিমায় মেঘনার 'বান' শুধু সমস্ত শহরকে টেনে

নিয়ে যেতো নদীর পাড়ে—সে দৃশ্য অবশ্য আর কোথাও দেখা যেত না। না হলে বৃষ্টিতে ভিজে প্রথম যে উল্লাস ভোগ করেছি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে, আষাঢ়-শ্রাবণে তাতে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে। শরতের নাগাল্ পেয়ে বাঁচলাম। বর্ষা কেউ ভালোবাসতে পারে? পথে বেরুবার উপায় নেই। ছাতায় বৃষ্টি বারণ হবে না। জুতোর প্রশ্ন নেই। জল কেন, পাকা সড়কও ভিজে কাদামাখা হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা না হতেই সন্ধ্যা—চারিদিকে ভেকের ব্যাঙও, রাত্রিব্যাপী সেই শব্দ। দিনব্যাপী রাত্রির অন্ধকার। সূর্যের মুখ দেখি না সাত দিনেও—আর সূর্য না দেখলে মানুষ বাঁচতে পারে? লণ্ডন কেন, সূর্যহীন স্বর্গও আমি চাই না!

কিন্তু নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথেও ভালো লাগত এখানকার নারিকেলের বাগান। এটা বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথ তার শালবন-তালবনের দেশে আর শিলাইদর পদ্মা আর গেরোই নদীর পাড়ই শুধু দেখলেন। পূর্ব বাঙলার ঘন সবুজের রাজ্যে তিনি বাস করলেন না—নোয়াখালি-বরিশালের নারিকেল বনের শ্রী উপভোগ করবার মতো অবকাশও তাঁর হল না। নোয়াখালি বলতেই আমার কাছে বোঝায় তার ঝাউ-এ ঢাকা সেই লাল সড়ক, আর তার ঘাসে ঢাকা মাঠ ও সুপারি নারিকেলের বাগানে ঘেরা ছনের ঘর। অনেক দূরে অনেক দেশে দেবদারু পাইনের নানা রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি—ভুলবার নয় সে সব রাজ্য, দেশের বা বিদেশের। আমি আমার স্ত্রীর মতো গাছ ও ফুল দেখে পাগল হই না। যে গাছটিকে অতি পরিচিত জেনেও আমি মুগ্ধ নেত্রে দেখতে পারি তা ওই নারিকেল গাছ। বন্ধুরা বলবেন হয়তো—"ফল চুরি করে খাওয়া ছিল তোমার কিশোরের ও যৌবনের প্রধান একটা ব্যসন—তার জন্যই তোমার ও গাছটির জন্য দরদ।" মুসলমানের মুর্গী পোষা। ঘটনাটা সত্য, ইঙ্গিতটা সত্য নয়। কৈশোরের দুরন্তপনায় জীবন উপভোগের যে তাড়না নিজের মধ্যে ছটফট করে বেড়াত তাতে আমাদের কাছে দুরারোহ নারিকেল গাছ হত একটা চ্যালেঞ্জ, তার ডাব চুরি ছিল একটা এ্যাডভেঞ্চার, আর সে জন্য লোক গঞ্জনা তিরস্কার ছিল আমাদের উদ্ধত আত্মপ্রসাদ। কিন্তু নারিকেল বন এজন্যই সুন্দর, এমন কথা বললে আজ বার্ধক্যের পাকা চক্ষুও তা মেনে নেবে না। অনেক গাছই সুন্দর—দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের বুকে অশ্বত্থকে দেখে উপনিষদের ঋষিরাও ধ্যান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতেন—দিবি তিষ্ঠত্যেক! এমনিতর, যেখানে যার শোভা। সাজানো বাগানে বিদেশী পামই কী অপূর্ব সুন্দর নয়? কিম্বা সাঁওতাল

পরগণায় ইকিউলিপটাস? শিলং-এ কিংবা হিমালয়ের কোলে যে পাইনের বন তাতে কি আপনাকে সঁপে দিতে ইচ্ছা করে না? তবুও এক-একটা জিনিসের এক-একটি আছে বিশেষ পরিবেশ। ওই শ্যামল পূর্ব বাঙলায় লবণার্দ্র ভূমিতে ঝাউ আর নারিকেলই স্থন্দরতম—ঝাউ-এর মাথায় বাতাসের গুঞ্জন, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, নারিকেলের পাতায় বাতাসের খেলা, সূর্যের আলো আর জ্যোৎস্নার রজত-বৃষ্টি—এ না দেখলে এদেশ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। প্রথম সচেতন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেছিলাম এই পরিবেশে।

স্কুলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আঙিনা থেকে এই পরিবেশের প্রাঙ্গণে এসে গেলাম। বাদামতলা থেকে পথ এগিয়ে গেল দক্ষিণে আকাশ-ছোঁয়া মাঠের পর মাঠে—আর স্কুলের ঝাউ-এ ঢাকা পথে শহরের নানা দিকে লোকালয়ে। বাড়ির চেনা মুখের সঙ্গে দেখা দিল বাইরের নতুন-চেনা মুখ। বাড়িতে পেয়েছিলাম খোলা মনের আবেষ্টনী, স্কুলে পেলাম খোলা পথের আমন্ত্রণ—Call of the Open Road.…

সে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর সেই মানুষের পরিবেশ দুই-ই অন্তর্হিত। আমিও তা ছাড়িয়ে এসেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে রাত্রির পর্দা সরিয়ে স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয় সেই বাদামতলার প্রশান্ত বিস্তৃত ছায়া; সেই ঝাউ-নারিকেলে ঘেরা, মেঘনার প্রবলোচ্ছ্বাসে ধোয়া ছোট নোয়াখালি শহর। শুধু 'পেটি বুর্জোয়া'র শহর বললে তার মাটিতে-মানুষে মেলানো সেই পরিচয় শেষ হয় না—ভারত-ইতিহাসের বিংশ শতকের প্রভাতে ধানের শিসের উপরে টলটলায়মান একটি শিশির বিন্দু।

(ক্রমশ)

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

লাতিন সাহিত্যে দু'হাজার বছরের পুরনো ভারতীয় গল্প

পর্যটক বা রাষ্ট্রদূতের রোজনামচা থেকে তথ্য চয়ন করে ইতিহাসের মালমশলা জোগাড় করা—প্রাচীন ইতিহাস রচনার চলতি রীতি। ভারত-রোম সম্পর্কের ইতিহাসও এইভাবে লিখিত হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস-গঠনে এই জাতের তথ্যপুঞ্জ নিশ্চয়ই অতি প্রয়োজনীয়। সাহিত্যের রসাল আধারে সে মালমশলার সন্ধান মেলে ইতিহাস রচনার চলতি রাস্তায় তার দাম এখনও নগণ্য বলেই বিবেচিত হয়। ঐতিহাসিকেরা যাই বলুন, সাহিত্যরসিকের কাছে এর কিন্তু স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে।

দু হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন লাতিন কবি ওবিদ্। রোম সেদিন ঐক্যবদ্ধ হতে চলেছে। কবি ওবিদের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩ অব্দে আর ২৬ অব্দে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য রাজার দূত রোমের সিংহদ্বারে করাঘাত করছে মৈত্রীর বাণী নিয়ে। তারপর দুশো বছর ধরে চলল ভারত-রোমের ঘনিষ্ঠতা।

দূত পাঠিয়েছিলেন কুশান সম্রাট দ্বিতীয় কদফিস রোমক সম্রাট ট্রাজানের (৫৮ খৃঃ—১১৭ খৃঃ) সভায়। কুশান সম্রাট কনিষ্কের সময়েও এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। কনিষ্কের তো আর একটি উপাধিই ছিল Kaiser বা Caesar; খবরটি জানিয়েছেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ডঃ লুদার্স (Luders)। [১]

কুশান-বংশীয় বা কুশান যুগের মুদ্রা থেকেও এই সম্পর্কের ইতিবৃত্ত সংকলিত হয়েছে। কুশান সম্রাট কদফিসের মুদ্রায় রোমক সম্রাটের 'মস্তকের' ছাপ ছিল। পণ্ডিতপ্রবর র‍্যাপ্সন, এ্যালান প্রভৃতি এই মুদ্রাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। মোটামুটি এইসব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যোগাযোগ বেশ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

দুই

ওবিদের সমসাময়িক হলেন ভার্জিল ও হোরেস। ভার্জিল হলেন রোমের জাতীয় কবি, যে-অর্থে হোমার গ্রীসের জাতীয় কবি, বাল্মীকি ও ব্যাস ভারতের

জাতীয় কবি। ভার্জিলের মহাকাব্যে রোমের মহিমামণ্ডিত ভবিষ্যতের বর্ণাঢ্য চিত্র আছে। ভার্জিল হলেন যথার্থই ক্লাসিক শিল্পী; আর ক্লাসিক যুগে জন্মেও ওবিদের মেজাজটি ছিল রোম্যান্টিক। তাই ওবিদ্ তাঁর যুগে শুধু অনাদৃত নন, নিষিদ্ধ। পরবর্তী যুগে তিনি হলেন মন্ত্রদাতা—রেণেসাঁসের গুরু। তাঁর জনৈক সাম্প্রতিক অনুবাদকের ভাষায়: "Providing a source from which the whole of Western European literature has derived inspiration." দান্তে, বোকাচ্চিও, চশার—সবাই তাঁর দৌলতখানার দোরে গিয়ে হাত পেতেছেন, এবং পেয়েছেন যা তা ধুলিমুঠি নয়, স্বর্ণমুঠি। ওবিদের প্রথম গ্রন্থ হল Amores। Heroides, Ars Amatoria, Metamorphoses তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

ওবিদের Ars Amatoria ও Metamorphoses গ্রন্থদ্বয়ে দুইটি পুরনো ভারতীয় গল্প অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। ওবিদের রসিক মনের ছাপ আছে গল্প দুটির দেহে, তাই শুধু ঐতিহাসিকদের নয়, পরিবেশিত হলে সাহিত্যিকদেরও স্বাদনীয় হতে পারে। Metamorphoses-এর গল্পটাই প্রথম বলছি। ওবিদ গ্রীক সূত্র থেকে 'রূপান্তরে'র নানা উপাখ্যান জড়ো করে একটি মালিকা গেঁথে গেছেন। গল্পগুলি বিচ্ছিন্ন; ভারতীয় সংগ্রহ-পুস্তক বেতাল পঞ্চবিংশতি, দ্বাদশ পুত্তলিকার মতোই তার রচনাশৈলী। শুধুমাত্র রূপান্তর গ্রহণের প্রসঙ্গ গল্পগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। আমাদের গল্পটিও এই ধরনের একটি গল্প; গ্রীক সূত্র এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

গল্পের নায়কের নাম অথিশ (অতীশ ?) তার জন্ম ভারতের প্রাণ প্রবাহিনী নদী গঙ্গার কাঁচ-স্বচ্ছ বারিপুঞ্জের গহীন দেশে; তার মা এক জলপরী। মায়ের নাম লিমনাই। অপরূপ দেহকান্তি অতীশের, দামী পোশাক-আশাক পরলে সেই দেহকে আরও সুন্দর দেখাত।[২]

তখন তার ষোলো বছর বয়স্ পূর্ণ হয়েছে, শক্তির মধ্য গগনে সে উপনীত। স্বর্ণখচিত রক্ত ও বেগুনীবর্ণ অঙ্গাবরণ সে পরিধান করত। কণ্ঠে শোভা পেত স্বর্ণহার, সুবাসিত কেশরাশিকে সে সোনার ফিতা দিয়ে জড়িয়ে রাখত।[৩]

বর্শা নিক্ষেপে তার এতই পটুত্ব ছিল যে যে-কোনো লক্ষ্যই সে বিদ্ধ করতে পারত, সে লক্ষ্য যত দূরবর্তীই হোক না কেন। তীর ধনুক ব্যবহারে সে ছিল দক্ষতর।[৪]

কিন্তু এই সময়ে সে ধনুকের কোণা বেঁকিয়ে জ্যা আরোপ করছিল, বেশ

কিছুটা গায়ের জোর দিয়েই। পারসিউস আচম্বিতে যজ্ঞবেদী থেকে ধূমায়িত কাষ্ঠখণ্ড তুলে নিয়ে তাই দিয়ে তাকে ভূপতিত করল। তার (অতীশের) মাথার খুলি গুঁড়ো হয়ে গেল, তার মুখখানা খুলির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। [৫]

লাইকাবার্স নামে এক আসাইরীয় যুবক অতীশের ছিল ঘনিষ্ঠতম সহযোগী। অতীশের প্রতি তার হৃদয়ে ছিল সুগভীর প্রেম; এবং সে কথা সে গোপন করতে চাইত না। [৬]

সে দেখল সাংঘাতিকভাবে আহত অতীশ তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে; যে দেহকান্তিকে সে এত উচ্চ প্রশংসা করত, সেই দেহ আজ রক্তের প্লাবনে আছাড়িবিছাড়ি করছে। লাইকাবাস প্রথমে তার বন্ধুর জন্য অশ্রুমোচন করল। [৭]

ঠিক সেই সময়ে লাইকাবাসকেও মারাত্মকভাবে আঘাত করল এক্রিসিউসের পুত্র। লাইকাবাসের চোখে অন্ধকার নেমে আসতে লাগল, জলসিক্ত চোখে সে চারপাশে তাকাল, তার চোখ দুটি অতীশের খোঁজ করে ফিরছিল, অতীশেরই পার্শ্বে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে সে মরল যে মৃত্যুতে তারা একত্র হতে পেয়েছে। [৮]

গঙ্গা! একটিমাত্র নদীর নাম স্মরণে ভারতের কত কাছের মানুষ হয়ে পড়েছেন কবি ওবিদ।

আসাইরীয় যুবকের সঙ্গে ভারতীয় যুবকের এই সৌহার্দ্যের বার্তাটুকুও প্রচুর ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ—মহেঞ্জোদারো থেকে মৌর্যযুগ পর্যন্ত ভারতের বহির্বিশ্ব সম্পর্কে এই সংবাদ অনন্যসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের গভীরতাটুকুও প্রণিধানযোগ্য। ভারতীয় যুবকের দেহশ্রী, বীরত্ব সব কিছুই উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—লেখকের রচনার বিশিষ্ট বর্ণ-সুষমা এই ক্ষুদ্র চিত্রেরও নানা স্থানে পড়েছে।

দ্বিতীয় গল্পটির সাক্ষাৎ পাচ্ছি—Ars Amatoria কাব্যে। গল্পটিতে দু হাজার বছর আগেকার এক সুপ্রাচীন জব চার্ণকের সন্ধান মিলছে।

কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা মান্যবর জব চার্ণকের কথা বলছি না; হিন্দু বিধবার পাণিপ্রার্থী প্রেমিকবর জব চার্ণকের কথা বলছি।

Ars Amatoria-তে প্রেম-বিদ্যার নানা পাঠ আছে; কবি স্বয়ং কাব্যের ভূমিকাতে বলে নিয়েছেন যে তিনি হলেন "singer of an idle day।" কাব্যের প্রথম খণ্ডে "কি করে প্রেম অর্জন করা যায়" (How to win

love)—এই মূল্যবান হিতোপদেশ দেবার ছলে তিনি দ্বিতীয় গল্পটি একবারে সূত্রাকারে বলেছেন।

পারসিউস সুদূরতম ভারতবর্ষ থেকে তার কালো পুতুল আন্দ্রোমেডাকে এনেছিল।[৯]

তারপর কাব্যটির তৃতীয় খণ্ডে ঐ গল্পটি পুরো বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি এইরূপ :

আন্দ্রোমেডা (এটা) আশাও করতে পারে নি, কারণ তখন তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে চিতায় তোলা হচ্ছে—সহমরণে চলেছে সে। ঠিক তখনই আকাশ-পথে চলেছিল পারসিউস। চিতায় সুন্দরী রমনীকে দেখে সে তার গতিবেগ সংযত করল, নেমে এল মাটিতে, হাতের বাঁধন খুলে তাকে মুক্ত করে দিল। একটু আগে যে ছিল চিতায়, সে হবে সুখী বধু।[১০]

এইভাবে জাল না পেতেই এবং না চাইতেই মৃগরা ধরা পড়ল। অন্যদিকে তোমার শিকারী কুকুরগুলো অযথা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।[১২]

বহু সময়ই বিধবারা চিতার আগুনের পাশে বসে তাদের কৃশগণ্ড ও বিস্রস্ত কেশপাশের সাহায্যে অন্য আগুন প্রজ্জ্বলিত করে থাকে এবং সোজাসুজি সেখানেই দ্বিতীয় স্বামীর সাক্ষাৎ ঘটে যায়। কারণ অশ্রুবর্ষী চোখে এবং অশ্রুসিক্তবদনে এক বিশেষ রকমের মাধুর্য লুকিয়ে আছে।[১৩]

গল্প দুটিই নিছক গল্প। হয়তো বা গালগল্প। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট গল্প। ভারতের আচার ব্যবহারের সঙ্গে কবির সম্যক পরিচয় ছিল।

এখানে একটি মজাদার খবরও পাওয়া গেল যে ভারতীয় নারীর কালো রঙটাই পরদেশী পুরুষের পক্ষে আকর্ষণের বিশেষ হেতু হতে পারে। মেয়েটি কালো, কিন্তু এই খবরটি রঙীন। রমণীর নাম আন্দ্রোমেডা, হেক্‌টার-পত্নী আন্দ্রোমেকা নয়, কিন্তু আওয়াজটা কান-ঘেঁষা।

এ-যুগে ভারতীয়রা ইলিয়াদের গল্প জানত হয়তো বা পড়ত। খবরটি শুনিয়েছেন গ্রীক বাক্যবিদ (Orator) ডিওন ক্রাইমস্‌টম্‌। কাজেই তখনকার আধুনিক পিতামাতারা মেয়ের নাম গ্রীক অনুকরণে আন্দ্রোমেডা রাখলেও রাখতে পারেন। এ-যুগের বাপ-মায়েরা মেয়ের নাম লিলি, শেলী, এমন কি হেলেন রাখতেই কি লজ্জা পান ?

তিন

ওবিদের Metamorphoses গ্রন্থে ভারতবর্ষের উল্লেখ আরো আছে। ওবিদ সমসাময়িক ভার্জিলও তাঁর Georgios ও Aenid গ্রন্থদ্বয়ে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ বহুবার উল্লেখ করেছেন। Aenid থেকে ভারতপ্রসঙ্গের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমরা ক্ষান্ত হব।

Aenes-এর বিরোধী শক্তির নেতা হলেন Furnns। তাঁর নেতৃত্বে Latinum-এর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে চলেছে। সৈন্যদলের এই অগ্রগতিকে কবি বলছেন "That march was like Ganges rising silently and deepening along all his placid streams or Nile, when he was withdrawn his enriching currents from the river-plains, and is settled in his own bed once more (IX—30-34). এখানেও সেই গঙ্গা !

গঙ্গা নদীর গতিধারা সম্পর্কে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে তবেই শুধু এই রকম ছোট্ট উপমার অবয়বে এত বড় সংবাদ স্বচ্ছন্দে ধারণ করা যায়।

ভারতীয় সভ্যতা হল গাঙ্গেয় সভ্যতা। সেদিন গঙ্গা ও নীলনদ শুধু উপমার ক্ষেত্রেই পাশাপাশি বসত না—নব জীবনের যোগাযোগেরও সূত্র ছিল এই দুইটি নদী। লাতিন সাহিত্যে সেই পুরনো স্মৃতি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে বহু বছর শুধুমাত্র এই ঔদার্যের জোরেই টিকে রয়েছে। হয়তো টিকে থাকবেও।

১। Political History of Ancient India—H. C. Roy Chowdhury, 6th Edition, 1953 পৃষ্ঠা ৪৭১

২। There was Athis, an Indian, who was supposed to have been born under the glassy waters of the Ganges, his mother Limnace being one of the nymphs of the river. He was a wonderfully handsome boy, whose beauty was enhanced by his rich clothing (Metamorphoses—Ovid. Translated by Mary M. Innes. Penguin Books. পৃষ্ঠা ১২৭)

৩। Just sixteen years old, and in the flower of his strength he wore a cloak Tyrian purple, bordered with gold, chains of gold adorned his neck, a golden headband encircled his perfumed locks. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৪। He threw his javeline with such skill that he could hit any mark however distant and was even more adept with his bow. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৫। But on this occasson, as he was forcibly bending its pliant horns, Persens snatched up a brand which lay smoking on the altar, and struck him down. The bones of his skull were smashed; his face crushed into them. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৬। Lycabus, an Assyrian, was Athis' closest comrade and had never concealed his true affection for him. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৭। When he saw Athis breathing out his life, sorely wounded, the features he had praised so highly twitching in a welter of blood Lycabus first wept for his friend. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৭)

৮। Son of Acrisius killed him. Lycabus though dying, looked around with swimming eyes, as the 'darkness closed in on him; he looked for Athis, fell beside him, and bore to the shades the comfort that they were together in their death. (ঐ পৃষ্ঠা ১২৮)

৯। Persues from farthest India brought Andromeda his dusky toy; (Ars Amatoria—Ovid. Translated by F. A. wright. George Routledge and Sons Ltd. 1923. পৃষ্ঠা ১০৭)

১০। How could Andromeda have hoped
When she was to the diff—side.tied.
That by the flying man unroped
She would become a happy bride. (ঐ পৃষ্ঠা ২৭১)

১২। Thus stags unsought by nets are ta'en
While your hounds scour the hills in vain.

১৩। Often a widow by the pyre
With pallid cheeks and hair unbound
Has kindled there another fire.
And stairght a second husband found,
For there is a peculiar grace
In streaming eyes, and tear stain'd face. (ঐ পৃষ্ঠা ২৭১)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

নন্দিনীই প্রথম আবিষ্কার করল যে মায়ের কাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ও জেগেছিল। প্রিয়ব্রত যে গ্রাম্যের মতো ভাতের ওপর রাগ করে তার জোর খাটাতে চাইবে এটা তার অনুমানের বাইরে ছিল। এবং এতদিনে সে বুঝতে পারছিল যে প্রিয়ব্রতকে সে সবটা বুঝতে পারে নি। প্রিয়ব্রতর উচ্চাশা প্রিয়ব্রতর বাহন নয়। প্রিয়ব্রতই তার নিজের উচ্চাশার বাহন। এই প্রিয়ব্রত যখন নন্দিনীর ওপর জোর খাটাতে চায় তখন সেটা নন্দিনীর কাছে স্পর্ধা বলে মনে হয়। আর প্রিয়ব্রত যখন নন্দিনীর শরীরটাকে আদর করে নিজের পথে নন্দিনীকে নিয়ে যেতে চায় তখন নন্দিনীর মনে হয় এর চেয়ে ট্রাম-বাসের সেই কাছ-ঘেঁষে দাঁড়ানো লোকগুলিও ভালো। এই সব ভাবতে ভাবতে নন্দিনীর আর ঘুম এল না। এলোমেলো চিন্তা বড়ো বড়ো ছায়া ফেলতে লাগল ওর অনিদ্রার আকাশে। আর কখনো কখনো টুকরো টুকরো স্বপ্নের ভ্রূণ কিম্ভূত অসম্পূর্ণ আকার নিয়ে চোখের সামনে ভেঙে যেতে লাগল। কাদের বাড়ির কচি ছেলের দামাল কান্না শুনতে শুনতে নন্দিনী ভাবল খোকাটার মা বেকুব। এ্যাপ্রণ-পরা নার্সের মতো মনে হত লাগল শীর্ণ করবী গাছের ছায়াটাকে। একবার নিজেকেই দেখল ভাঙা স্বপ্নে অসহ্য যন্ত্রণায় নিরাবরণ। বাতাসে ডেটলের গন্ধ। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে প্রিয়ব্রত অশ্লীল ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে। কচি ছেলেটার কান্না হঠাৎ থেমে গেল। গায়ের জামাটা আলগা করল নন্দিনী, শির শির করে উঠল তার বুকের ভিতরটা।

তার পরেই আচমকা সে অনুভব করল তার শাশুড়ির কাসির পরিচিত শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। ও নিচেয় নেমে গেল। দু-বার দরজার বাইরে থেকে 'মা' 'মা' বলে ডাকতেও যখন সাড়া পেল না, তখন জানলার

কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। নিঃশ্বাসের শব্দটা কেমন বিলম্বিত ও অস্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি সুব্রতর ঘরে দু-বার ধাক্কা দিয়ে নন্দিনী ওপরে এসে প্রিয়ব্রতকে ডেকে তুলল। প্রিয়ব্রত হাই তুলে উঠে বসে ঘড়ির দিকে তাকাল। অনেক কষ্টে দরজাটা খুলে ওরা সকলে যখন মায়ের ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল তখন নন্দিনী বুঝতে না পারলেও সুব্রত আর প্রিয়ব্রত বেশ বুঝতে পারছিল যে মায়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মা—বলে ওরা দুজনেই ডাকল। কিন্তু নন্দিনীই লক্ষ্য করল দুজনের গলার স্বর কেমন বিভিন্ন। সুব্রতই অনুভব করতে পারছিল যে প্রিয়ব্রত আর তার মাঝখানে সেতুটা যেটুকু ছিল তা আজ ভেঙে যাবার মুখোমুখি। প্রিয়ব্রত কত স্থির। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে।

—ডাক্তার ডাকুন।

—কথা বলতে পারছেন না, না ?

—ডাকুন আপনি। সাড়া দেন কিনা দেখুন।

—মা।

বুড়ি সাড়া দিল। আর মনে হল কিছু বলতে চায়। সুব্রত মুখের কাছে কান নিয়ে গেল। শ্বাসকষ্টের মধ্যেই গোঙাতে গোঙাতে সুব্রতর মা কী বলছেন—একটু বাদে সুব্রত তা বুঝতে পারল—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম। নন্দিনী যা জানে না, সুব্রত যা বিশ্বাস করে না, এবং প্রিয়ব্রতর যাতে দরকার নেই বুড়ি সেই বিশ্বাসের কথা বলছিল। নন্দিনীর মনটা টন টন করে উঠল—এই বুড়িটা হারিয়ে গেলেই এই সংসারের সুতোটা হারিয়ে যাবে।

সকালটা এল খুব বিশ্রীভাবে।

সুব্রতর কাছে মায়ের অবস্থাটা মনে হল আকস্মিক। এবং অসাময়িক। সে যেন ধারণাই করতে পারে নি যে মায়ের শেষ সময়টা এত এগিয়ে এসেছে। আর এই প্রথম প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে সুব্রতর বিরক্তি এল। প্রিয়ব্রতই যেন মায়ের জন্য শোকের আবহাওয়াকে পূর্ণ হতে দিচ্ছে না। নন্দিনী মায়ের বিছানার পাশে নতমুখে বসে। পাড়া-প্রতিবাসীরা কেউ কখনো আসছেন, যাচ্ছেন। এখনই মাকে যেন মনে হচ্ছিল কত অস্পষ্ট। সধবা, সিঁদুর-জলজলে মা, এই তো সেদিনের কথা। ছোটবেলায় জ্বরে ভুগত সুব্রত। সকালের বাসিপাট সেরে, স্নান সেরে, এলো চুলে গিঁট দিয়ে মা এসে

সুব্রতর শিয়রে দাঁড়াত। ঠাণ্ডা হাতখানা সুব্রতর কপালে রাখত মা। তার মনে হত জ্বর বুঝি নেমে গেল। সেই মাকে যেন অনেকদিন হল সুব্রত হারিয়ে ফেলেছে।

—এই ইঞ্জেকসনটা কিনে আনুন।

—ডাক্তার, কী বলে।

—ঠিক করে কিচ্ছু না।

খুব নিচু স্বরে মৃদু বিলাপের মতো হরি ওম্ শব্দটা ভেসে আসছে। মা হয়তো গভীর যন্ত্রণা পাচ্ছে। কিম্বা স্মৃতির সবটুকুই হয়তো এখন বিলুপ্ত। মা কি জানে যে প্রিয়ব্রত আর এখানে থাকবে না। সুব্রতর জন্য কি মা আর কোনো বেদনা বোধ করছে? হঠাৎ সে যেন কেমন একটা অকৃতার্থতা দ্বারা আক্রান্ত হল। সে কি মাকে সুখী করতে পারত অথচ করল না? প্রশ্নটা নিরুত্তর হয়ে গলার কাছে বেধে রইল।

এ বেদনা আজ প্রথম দেখা দিল না। ইউ. জি.-র গোপনচারী দিনগুলোয়, জেলখানার রাত্রিতে, আরো অনেকদিনের রাতে—কাজে অকাজে এই বেদনার সঙ্গে সুব্রতর দেখা হয়েছে। কিন্তু সে তাকে আমল দেয় নি। আজ যেন মনে হল 'ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া' অনেক ছোট-খাট জিনিস সে হারিয়েছে, যেগুলোকে ছোট বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা ছোট নয়। অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে প্রিয়ব্রত ঢুকল। নন্দিনী জল গরম করছে।

—আর কথা বলতে পারছেন না, শুধু ঠোঁটটা নড়ছে।

—পা-দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা।

কী আশ্চর্য তবু তার অনুভূতিটা এত ভোঁতা কেন? বোধ হয় এইজন্যে যে তার মা তার জন্যে কোনো আবেগ আর ইদানীং অনুভব করত না। তাই বোধ হয় তারও কোনো আবেগ নেই। প্রিয়ব্রত গেল কাছের একটা বাড়ি থেকে কলকাতায় ফোন করতে। প্রিয়ব্রত নিজের কাছে অন্তত একথা বলতে পারবে যে একটা দিনের অনেকগুলো জরুরী কাজ মায়ের জন্য নষ্ট করল। সুব্রতর বলার কিছু নেই।

নন্দিনী নিষ্ঠুরের মতো একান্তভাবে কামনা করছিল যেন তার বুড়ি শাশুড়ি এ অবস্থাতেও টিকে থাকে। অনেকদিন। যেন কিছুতেই প্রিয়ব্রতর মুক্তি না আসে। কলকাতায় যাওয়া যেন তার না হয়। দিন গড়িয়ে যেতে

লাগল। কে বলল—ইন্‌জেকসনের কোনো রেসপন্‌স নেই। উনুনে আজ আঁচ পড়ে নি। বাড়িতে আজ বাসিপাট সারা হয় নি।

আর সুব্রতর মা—তিনি তখন ওপারের জন্যই ব্যস্ত।

গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম উচ্চারণ করতে করতেই তিনি অনুভব করলেন বাকরোধ হয়ে আসছে। চেতনা তখন সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে শেষবারের মতো দুলছে। অনেকদিন হল, সুব্রত জন্মাবার আগে তিনি স্বামীর সঙ্গে একবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। সমুদ্র বড়ো ভালো লেগেছিল। কানে বাজছে সেই অনেকদিন আগে শোনা সমুদ্রের ডাক। নন্দিনী স্টোভ জ্বালিয়ে জল গরম করছে। হঠাৎ তেল ওঠায় মুখ আটকে স্টোভটা নিবে গেল। নন্দিনী পোকার এনে স্টোভের মুখটা খুঁচিয়ে আবার জ্বালিয়ে দিল। সোঁ সোঁ শব্দটা ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

আর কিছু মনেও পড়ছে না। শুধু কারা যেন শব্দবিহীন পায়ে চলাফেরা করছে। কথা বলছে বোবা গলায়। কে বললে—গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা।

নন্দিনী খুঁজতে গেল। পেল না। শাশুড়ির কমণ্ডলুটা শুকনো। তুলসীপাতা হয়তো এ বাড়িতে না মিললে পাশের বাড়িতে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ সময়ে কেউ বুঝি দেয় না কিছু। কাজেই গঙ্গাজল তুলসীপাতা ছাড়াই সুব্রতর মাকে চৈতন্যের সীমা পেরিয়ে যেতে হল।

তখন আর তিনি সুব্রতর মা নন, প্রিয়ব্রতর মা নন, তখন তিনি মাত্র একটা জীব-দেহ। মাতাল নদীতে নোঙরটা ছিঁড়ে যাবার আগের যন্ত্রণাই তখন মুখ্য। কে যেন কবে নন্দিনীকে বলেছিল যে জন্মের যন্ত্রণা আর মৃত্যুর যন্ত্রণা দুইই সমান দুঃসহ। উপক্রমণিকা আর উপসংহারে এই যন্ত্রণার মিল। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস অনিয়মিত হয়ে যেতে লাগল।

যেন কোনো জটিল জঙ্গলে কেউ হারিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সূর্যালোকের দেখা পেলে সেই পথিক চেঁচিয়ে উঠছে—সাড়া দিতে চাইছে দূরের সঙ্গ-ছুট মানুষদের। তারপরেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে গভীর জঙ্গলে। রুদ্ধ নিঃশ্বাস বিলম্বে মুক্তি পেয়ে জানিয়ে দিচ্ছে প্রাণের অস্তিত্ব। তা না হলে সীমারেখাটা প্রায় অস্পষ্ট—আর মুছে যেতে বুঝি দেরি নেই। যে মরে সে ছাড়া, আর সকলেই অকিঞ্চিৎকর।

সুব্রতর মনে হল এই দীর্ঘতম নিঃশ্বাস সেই মহিলার জীবনের দীর্ঘতম ক্লান্তির চিহ্ন। নীরবে দেখল সুব্রত মা অস্তিত্বের অপর পারে চলে যাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ওর মনে হতে লাগল মৃত্যুর মতো হিংস্র আর কিছু নেই। দিন শেষ হয়ে এল। বিকেলের ছায়া পড়েছে উঠোনে। একটা কেমন যাই-যাই ভাব জেগেছে যেন। সুব্রতর মনে পড়ল জেলখানার দিনগুলোর কথা। ঠাণ্ডা লোহার গরাদে মাথা চেপে ধরে মায়ের ঠাণ্ডা হাতের কথা ভেবেছে কতদিন। কতদিন সিপাইয়ের লোহার নাল্-দেওয়া জুতোর খট-খট শব্দ ঘুমের মধ্যে মায়ের কাসির শব্দ বলে ভুল হয়েছে।

দু-ফোঁটা জল মায়ের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। নন্দিনীর দু-চোখে জল। শেষতম মুহূর্ত সমাসন্ন। ওষুধের গন্ধ—ইঞ্জেকসনের ভাঙা এ্যামপুল। ঘরটার অন্যত্র কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। ঘড়িটা ঠিক সময় দিচ্ছে। বিকেল হয়েছে। পশ্চিমের ঘুলঘুলি দিয়ে শেষ রোদের টুকরো ঘরের মধ্যে এসে ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছিল। এইবার মুছে গেল, পাঁচটার বাঁশি বাজল চটকলে।

সুব্রত দেখতে লাগল শেষ নিঃশ্বাসের স্পন্দন। প্রিয়ব্রত মায়ের কানে কানে বলল—হরের্নামৈব কেবলম। সুব্রত ও-সব মানে না। বিচ্ছিন্নের মতো দেখতে লাগল।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় সুব্রতর মা মারা গেল। আশ্চর্য তার তো কান্না এল না।

এমন আবেগহীন শোকের দৃশ্য সে কখনো দেখে নি। মৃত্যু এল বিকেল পাঁচটার ঘরে-ফেরা কেরানির মতো অভ্যস্ত পদক্ষেপে—এর এমন একটা গড়পড়তা রূপ হতে পারে সুব্রত কখনো ভাবে নি। নন্দিনী কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলল। প্রিয়ব্রত গেল শববাহীদের ডেকে আনতে। আর সুব্রতর মা নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। ছেলেদের কোনো ব্যাপারে মা কোনোদিন কথা বলে নি—আজকের এই চূড়ান্ত না-বলাটা যে তার থেকে পৃথক এটা সুব্রত ভাবতে পারল না। রুক্ষ চুল, বসে-যাওয়া চোখের কোল, এলিয়ে-যাওয়া শাড়ি জামায় অভুক্ত অস্নাত নন্দিনীর চেহারাটা শোকের নয়, দুর্ভোগের। ভোগান্তির। সম্পর্কের সূত্রটা স্বাধীনভাবে জন্মায়, তার শিকড়ে রসের ঘাটতি হলে সে নিঃশব্দে মরে যায়। রমেনের মৃত্যুসংবাদ তার কাছে অনেক বেশি আঘাত হেনেছিল। অথচ রমেন তার কে? সুব্রত যদি ঠিকমতো অনুভব করতে পারত যে এ বাড়ির তুলসীমঞ্চের গোড়ায়

প্রদীপ জালানো সত্যিই শেষ হয়ে গেল—এরা কেউ যদি সে কথা অনুভব করত তাহলে তাদের শোকের ভিতর দিয়েই তার মা জীবিত হয়ে উঠতে পারত। তা হয় নি। মায়ের শারীরিক যন্ত্রণায় নন্দিনীর চোখের জল তো সাধারণ সহানুভূতি।

শ্মশানঘাটে শবাগ্নির আলোয় ডোমগুলোর উকুন-বাছা দেখতে দেখতে, কুকুরগুলোর ভীতিকর স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুব্রত সেই কথাই শান্তনুকে বলছিল। শান্তনু খবর পেয়ে এসেছিল।

—এটা কেন হচ্ছে যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারছি না?

—বোধ হয় আমাদের বয়স অনেক বেড়ে গেছে এটা আমরা জানি না।

—তা নয় শান্তনু, আমাদের আশা করার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে বলেই আঘাত পাবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে।

—কেন আশা করার ক্ষমতা নষ্ট হল?

—সম্ভবত আমরা সব কিছুর মূল্য যাচাই করে ফেলেছি। আমাদের কাছে পরম বলে আর কিছু নেই।

—কিন্তু আমার মায়ের মূল্য তাতে আমার কাছে কমে গেল কেন?

—মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল কোথায়? মায়েরা যে ভাবে বাঁচতে চান সে বাঁচার সঙ্গে আমাদের বাঁচার মানে বলতে যা আমরা বুঝছি তার মিল কোথায়?

—এ অসঙ্গতির জন্য দায়ী কে?

—যতক্ষণ না আমাদের বাঁচার মানেটা ঠিক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ আমরা দায়ী।

মায়ের শবদেহটা পুড়ে যাচ্ছে। শ্মশানঘাটের মিউনিসিপ্যালিটির আলোটাকে ঘিরে অগুণতি পোকা। আধ-পোড়া কাঠের মোটা ডালের ওপর বসে বসে সুব্রত মাংস-পোড়া চিমসে গন্ধটাকে বারে বারে বুকে টেনে নিতে লাগল। মাথার খুলিটা ফাটানোর শব্দ, পা-দুটো দুমড়ে আগুনে পুরে দিতে দিতে শ্মশানবন্ধুদের হাসির শব্দ, গঙ্গায় ভারি নৌকার দাঁড় টানার শব্দ—সুব্রত আর শান্তনু নিজেরা নিঃশব্দ হয়ে গেল। প্রিয়ব্রত কাগজ-কলম নিয়ে কী একটা হিসেব করছে।

শুধু তার পরের দিন রাত্রে কম্বলের বিছানায়, মাটির ওপরে শুয়ে, এপাশ ওপাশ করতে করতে, থানার পেটা-ঘড়ির আওয়াজ শুনে শুনে ক্লান্ত

সুব্রত ঘুমুতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে হঠাৎ ডুবে যেতে লাগল একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতায়, তখনই সেই দূরে দূরে কুকুর-ডাকা, মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ ভেসে-আসা বিজন রাত্রে সুব্রত অনুভব করল তাকে ঘুম পাড়াতে পারত যে কাসির শব্দ, সেটা আর নেই।

সুব্রত অনেকক্ষণ কিছু ভাবল না। উঠে গিয়ে ও ঘরে দাঁড়ালে যেন এখনো সে একটা অস্তিত্বের সৌরভ পাবে। হ্যাঁ—শান্তনু ঠিক বলেছে। আমার মা বাঁচা কথাটার একটা মানে জানত। আমি সে মানেটা মানি নি। নিজে কোনো মানে জানিও না। আমরা তার কাছ থেকে দূরে সরে এলে সে অভিমানে বোবা হয়ে থেকেছে। আজ সুব্রতরও অভিমান হল। চলে যাব। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। প্রিয়ব্রতরাও যাবে। আমার নিজের মানে আমাকে খুঁজতে হবে। সুব্রতর মা কেন সুব্রতকে তাঁর কথা বোঝাতে চান নি—কেন সে-ই মাকে জানাতে চায় নি তার সবকিছু। এমনি করেই সে কখন হারিয়ে ফেলেছে তার আবেগ। পাতা-শিরশির হেমন্তের রাত্রি সুব্রতর কাছে উত্তপ্ত হয়েই রইল।

কম্বলের বালিশ থেকে নন্দিনীর মাথাটা সরে গিয়েছিল। রুক্ষ এলো চুল মাটিতে পড়ে। নন্দিনী স্বপ্ন দেখছিল। কারেণ্ট ফেল করেছে। লিফট মাঝখানে আটকে গেছে। লিফটম্যান নেই। ভয়ে উদ্বেগে নন্দিনীর শিরদাঁড়া বরফের মতো জমাট হয়ে গেছে যেন। ও কত চিৎকার করছে। ওপরের প্যাসেজে কত লোক কথা বলছে, যাতায়াত করছে। আর্দালিকে ডাকার জন্য বাজার-টা ঝিঁঝিঁয়ে উঠছে। কিন্তু কেউ একবার খোঁজও করছে না নন্দিনী কোথায়। গলা ভর্তি হয়ে যেতে চাইল কান্নায়। কেউ কি নেই—কেউ না? ফুঁপিয়ে উঠল ও। ঘুমের ঘোরে বিশ্রী আর্তনাদ করে ফেলল। চমকে উঠে পড়ল প্রিয়ব্রত। ওই ঘরের মেঝের ওপরেই আলাদা বিছানা পেতে প্রিয়ব্রত ঘুমোচ্ছিল। উঠে দেখল নন্দিনীর মাথাটা বালিশ থেকে পড়ে গেছে। চিৎ হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে শুয়ে আছে ও। আস্তে আস্তে নন্দিনীকে ডেকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিল প্রিয়ব্রত। গায়ে হাত দিয়ে দেখল ঘেমে ভিজে গেছে নন্দিনী। তারপর প্রিয়ব্রত আবার নিজের বিছানায় ফিরে গেল। নন্দিনীর ঘুম ততক্ষণে ভেঙে গেছে। তবু ও কিছু সাড়া দিল না। অনেকক্ষণ বাদে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে এল। বুঝল আর ঘুম আসবে না। দেখল প্রিয়ব্রত আবার

ঘুমোচ্ছে। সুস্থ ক্লান্ত মানুষের মতো। তারই কোনো ব্যর্থতা নেই। কোনো কাঁটা নেই। সফল মানুষের মতো সে তৃপ্তি নিয়ে ঘুমোচ্ছে। সারাদিন যা করবার ছিল করেছে। আবার আগামী কাল যা করবার তা করবে। নন্দিনী প্রিয়ব্রতর মাথায় একবার হাত রাখল। সান্নিধ্য শুধু অবজ্ঞার নয় ভালোবাসার জন্মভূমিও বটে। আর কিছু কিছু কাজের কথা নয়।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার মাসখানেক বাদে নন্দিনী সুব্রতকে বলল প্রিয়ব্রতর কথা।

—তুমি কী বলছ?

—আমার পরামর্শ শোনার জন্য সে এ-কথা তো বলছে না।

—আমায় তাহলে কি বলতে বলছ?

—সে তো আপনিই জানেন।

—প্রকৃতপক্ষে আমার তো কিছুই বলবার থাকতে পারে না।

—কেন?

—প্রিয়ব্রত যে কলকাতায় শিফট করতে চাইছে সে সম্বন্ধে অযাচিতভাবে আমি কী বলব?

—অযাচিতভাবে কেন? আপনি তো দাদা।

—এই কথাটার কোনো মানে হয়? আমি দাদার ভূমিকা কোনোদিন জানতে চাইলাম না, আজ হঠাৎ দাদা বললে ও শুনবে কেন?

—আমি তাহলে কী করি?

—নন্দিনী, প্রত্যেককেই তার নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে। তোমার যদি এ-সম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে বলে মনে হয়, তুমি করবে।

—বেশ, আমি যা ঠিক করেছি তা আপনাকে বলে রাখি। আমি চাকরি ছেড়ে দোব ভাবছি। ও চেঁচামেচি করবে। সে সময়টা মামার ওখানে গিয়ে থাকব।

—আবারও বলছি এটা তোমারই ব্যাপার। শুধু একটা কথা জানার আছে আমার। জান কি প্রিয়ব্রত বাড়িটা সম্বন্ধে কী ভাবছে?

—আমাকে বলে নি কিছু।

নন্দিনী যেন একটু বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল। সুব্রত এমন নিস্পৃহভাবে কথা বলবে এ-কথা নন্দিনী ভাবে নি। সুব্রত নন্দিনীর বিরক্তিতেও বিস্মিত

হল না। ভাবল প্রিয়ব্রতকেই জিজ্ঞাসা করবে। সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় সুব্রত প্রিয়ব্রতকে একা সুযোগমতো পেল। কথায় কথায় কথাটা উঠল। প্রিয়ব্রত বলল—দুটো ব্যবস্থার যে-কোনো একটা করা যায়। এক নম্বর, বাড়িটার গোটা নিচের তলা ভাড়া দেওয়া যায়। এখন বাড়িভাড়ার রেটও চড়া। সেটা তোমার দিক থেকে ভালো। কেননা তোমার কোনো স্থায়ী আয় নেই। আমি চলে যাচ্ছি। কলকাতায় তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে না নিশ্চয়।

—না।

—এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও হবে না। কাজেই ওটা হলেই ভালো হয়। তবে তাতে আমি কিছু লাভবান হই না। দু-নম্বর হচ্ছে—বাড়িটা বেচে দিলে অনায়াসে ভালো দর পাওয়া যাবে। তোমার শেয়ার তুমি নিলে। আমারও কিছু হার্ড ক্যাশ দরকার—সব দিকেই সুরাহা হয়। তবে সেটা—

—তুমি এখানকার বাস ওঠাবে এটা কি স্থিরই করে ফেলেছ ?

—প্রায়। নন্দিনী গাঁইগুঁই করছে। ছ্যাট ইজ সিলি। আমার কলকাতা না গেলে চলবে না।

—সে ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে বেচেই দাও।

প্রিয়ব্রত একটু বিস্মিত হল। কিন্তু বিস্ময়টা প্রকাশ করল না। মুখে বলল—তাহলে দালাল লাগাই।

কিন্তু নন্দিনী বাধা দিল। দিনকতক অপেক্ষা করে থাকার পর সে কথা বলল।

পরিষ্কার গলায় প্রিয়ব্রতর এই মনোভাবকে সে স্বেচ্ছাচারিতা বলে অভিহিত করল। এবং এও বলল যে তার সঙ্গে পরামর্শ না করে প্রিয়ব্রতর এমন পদক্ষেপের কোনো অধিকারই নাকি নেই। প্রিয়ব্রতর অসুবিধা হল এই যে নন্দিনীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় সে নন্দিনীর মতো নিরুত্তাপ থাকতে পারে না। নন্দিনী কখনো নিষ্ঠুরের মতো প্রিয়ব্রতর সমস্ত আচার-আচরণকে আঘাত করতে লাগল। কখনো অনুনয়ের সুর আনল গলায়। সেদিন প্রিয়ব্রত বলল—কিন্তু তুমিও তো আমার অংশীদার, আমার সঙ্গে সহযোগিতার দায় থেকে তুমি মুক্তি পাও কী করে ?

নন্দিনী বলল—মুক্তি পেতে চাচ্ছি না, যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করতে চাচ্ছি।

প্রিয়ব্রত বলল—ননসেন্স।

নন্দিনী বলল—না, ননসেন্স নয়। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম। লোভ যেটুকু আমার সেটা এইটুকুই। তুমি মেয়ে হলে বুঝতে এটা কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু আমি যেটা বুঝি নি সেটাই অপরাধ, সেটা হল তুমি আমাকে চাও নি।

—বাজে বোকো না নন্দিন।

—বাজে বকছি না। তুমিই বুঝছ না। আমি যদি তোমার সব কথা মেনে নিতে পারতাম তাহলে একরকম হত। কিন্তু আমি মানতে পারছি না আর তুমি জোর করছ, এটা মেনে নোব কেমন করে। তুমি জানো না তাতে আমার অপমান হয়।

—কেউ বোকার মতো এ-সব নিয়ে মাথা ঘামায় না আজকাল।

—আমি তাহলে আজকালের নই। তুমি শুনেছ, বলেছি আমার মা বলেছিল যে—

—থামো, আমি অনেক শুনেছি ও-সব গল্প। আজকের দিন হলে লোকে কী বলত তোমার মাকে জানো? বলত শি ইজ এ ফুল।

নন্দিনী মশারি সরিয়ে বিছানার বাইরে চলে এল। তারপর সারারাত্রি বসে বসে কাঁদল। প্রিয়ব্রত এগুলোকে স্বাভাবিক বলে মনে করে স্বাভাবিভাবে ঘুমোল। প্রিয়ব্রতর প্রাত্যহিক কাজেকর্মে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের জন্য কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটেছে এ-কথা মনে করার কোনো হেতু দেখা গেল না। যথানিয়মে তার অফিস যাওয়া, যথাপূর্বং দেরি করে ফেরা। মনে হয় নন্দিনীর সঙ্গে তার বিতণ্ডার ব্যাপারটাকে সে দৈনিক প্রোগ্রামের মধ্যে ধরে নিয়েছে। কাজেই দিনের পর দিন, প্রায় প্রতি রবিবারে দালাল আসতে লাগল। একো জনা খদ্দের বাড়িটার একোরকম অসুবিধা আবিষ্কার করল। প্রিয়ব্রত এবং সেই দালাল ভদ্রলোক বাড়িটার সুবিধার সংখ্যা শততম থেকে সহস্রতম করে তুলল। নন্দিনী এবং সুব্রত দুজনে দুই প্রান্তের সাক্ষী হিসাবে নীরব রইল।

সেদিন রবিবার। সুব্রত বাড়ি নেই। নন্দিনী সেদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর প্রিয়ব্রতকে বলল আজ বিকেলে চল আমার সঙ্গে। একটু

বেড়িয়ে আসি। এবং প্রিয়ব্রত রাজি হওয়াটাকে কৌশল ভেবেই রাজি হল।

নন্দিনী সুন্দর করে সাজল। সাধারণত আজকাল অফিস যাবার আগেই সাজে। বাড়ি ফিরে সাজের বোঝা খসাতে পারলেই সে যেন বাঁচে। আজ প্রিয়ব্রতর জন্য আলাদা করে সাজল। নিচু-কাটের ব্লাউজ পরল—লম্বা হাতা। বুকের দিকে তাকালে পথিক নিজেকে অপরাধী মনে করবে এমন কাটের, শাদা রঙের ওপর কালো বুটির ব্লাউজ। হার-লকেট সরিয়ে ফেলে খালি রাখল গলা। মনিবন্ধে ঘড়ি বাঁধল না। শাশুড়ির দেওয়া বালা দুটো পরল। লেস-বসানো সায়াটা পরতে পরতেই ভেবে নিল—নতুন তাঁতের শাড়ি নয়—ফুলে ফেঁপে থাকবে—ফিকে নীল পাইপিং পাড়ের জর্জেট আঁকড়ে ধরুক শরীরটাকে। চোখের কোলে আলতো করে কাজল ছোঁয়াল। টিপ দিল না ছোট্ট কপালে। তারপরে প্রিয়ব্রতকে ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে নিয়ে বলল, চল। মাথায় ভালো করে চুল ওঠে নি তখনো প্রিয়ব্রতর। ধুতি পাঞ্জাবীতে একটু রুগ্ন দেখাচ্ছিল। তাহলেও ভালোই লাগল।

—কোথায়?

—ওপারে, চার্চে বেড়িয়ে আসি চল। বাসে উঠে নৈহাটী যাব। নৈহাটীর ফেরিঘাটের লঞ্চে ভীড় ছিল না। চুঁচুড়ার গঙ্গার গলাগলি রাস্তাও ছিল পাতলা। ওরা হাঁটল। কথা বলল পুরনো দিনের মতো। ডিষ্ট্রিক্ট জেলের ফটকে পুরনো অকেজো কামানের সামনে ছেলেমানুষের মতো নন্দিনী দাঁড়াল। জুবিলি ব্রিজ দিয়ে গাড়ি যাওয়া দেখল। চার্চে যখন পৌছল তখন ভরা বিকেল। অনেক ছেলে। অনেক মেয়ে। পশ্চিমের রোদ ওপারের কারখানার চিমনির মাথায়। কেউ বসে গল্প শুনছে। কেউ শাড়ির নিচের দিকের ভাঁটুই বাছতে বাছতে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করছে। বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে নন্দিনীর বুকটা দুলে উঠল। বিয়ের আগে ওরা একবার এসেছিল এখানে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বসেছিল দুজনে। একটা তিনশ বছরের পুরনো জাহাজের মাস্তুল চার্চের এককোণে রাখা আছে। সেটাকে আর একবার দেখতে গিয়ে নন্দিনীর একটা বিচিত্র কথা মনে হল—তিন শ বছর কতদিন? এই সেদিনের চেয়েও কি সেদিন পুরনো হয়ে গেছে? গঙ্গার জলের কাছাকাছি গিয়ে বসল ওরা। ঢেউ নেই। নিথর গঙ্গা। হাওয়া নেই। স্থির গাছপালা। হেমন্তের দেরি নেই। আকাশ ফাঁকা। পালে বাতাস নেই।

—তোমাকে একটা কথা বলব ? গলা কাঁপছে নন্দিনীর।

—বলো।

—কী হবে আমাদের অনেক টাকা হয়ে ? নাই হল অনেক কিছু ?

—কী হবে তাহলে জানো ?

—দুঃখকষ্টের সংসার। দু-একটা ছেলেমেয়ে। তুমি অফিস করবে। আমি সংসার করব।

—কী লাভ এমন করে বাঁচায় ?

—দু-জনে ভালবাসতে পারব দু-জনকে, দু-জনের ছেলেমেয়েকে। আমি সংসার করতে চাই।

—নন্দিন, আমিও তো তাই চাই।

—তাহলে ? একটা ঘাসের পাতা দাঁত দিয়ে কাটল নন্দিনী।

—ঠিকমতো বাঁচতে চাইব না আমরা ?

—ঠিকমতো বাঁচতে চাওয়া মানে কি কেবল এই ছোটা, এই বুঝি অন্যে পেয়ে গেল সব, আমি হারালাম এই ভয় ?

—আর দুটো বছর—বিড়বিড় করল প্রিয়ব্রত। প্রায় মিনতির স্বর আনল গলায়। আর দুটো বছর দিতে পার না নন্দিন ?

চুপ করে বসে রইল ওরা। প্রিয়ব্রত কথা বলতে লাগল মাঝে মাঝে, গঙ্গার জলে মাটির ছোট ছোট টুকরোগুলো ফেলতে ফেলতে।—বাবা মারা গেল হঠাৎ। এক পয়সার সংস্থান নেই। সম্বলের মধ্যে ছিল বাড়িটা। অথচ বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন বাড়িটায় উৎসব যেন লেগেই থাকত। বড় বড় গানের আসর। খাওয়া-দাওয়া। শেষ যখন হল তখন একটু রেশও বাকি থাকল না। "তুমি দেখ নি আমাদের সে-সব দিন। দাদা ভালো ছাত্র, পড়ার খরচ লাগে নি। পার হয়ে গেল। আমি মিডিওকার। উদয়াস্ত ট্যুইশনি করে নিজের চরকায় তেল দেবার সময়ই পাই না। একটা বাইরে বেরুনোর সার্ট। নিজেই কেচে নিতে হয়। সব কিছু আমার ঘাড়ে—কোনোদিকে কোনো সুরাহা নেই। খেটে খেটে, না খেয়ে মা অসুখে পড়ল। দাদা পার্টি নিয়ে মেতে রইল। সিলি। তুমি জান না এ-সব, আমার এক কাকিমা থাকেন কালিঘাটে। এক-আধদিন সেখানে গেছি। ধোঁয়ায় কালো তক্তাপোষ। স্তূপাকার বিছানা। চায়ে-ভিজানো মুড়ির ব্রেকফাস্ট। বার্লি-ওয়াটারের মতো ডালের জল। মাসের দশ তারিখ থেকেই সেখানে শেষ মাস

শুরু হয়। কথা হারিয়ে যায়—হরিব্‌ল।" মাটি টুকরোটা জলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতের ময়লা ঝেড়ে ফেলল প্রিয়ব্রত।

—এ-সবের ছবি তো আমারও অজানা নয়। নন্দিনী বলল।

—তাহলে ?

—আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি, তাহলে কী হয়েছে ?

—তোমার খুব সাহস, না ?

—আমি মনে করি টাকা নেই এই যা, নইলে আমরা সত্যি সত্যি গরীব নই ; সাহসের কী আছে আর বলো, তবে এটা ঠিক তুমি কিন্তু বড্‌ড ভীতু।

—হ্যাঁ নন্দিনী, আমার বড় ভয় করে। গরীব হয়ে যেতে বড় ভয় করে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। এবার উঠতে হয়। অনেকেই ঘর-ফিরতি। প্রাচীন গীর্জার প্রাঙ্গণে নেমে আসছে একটা বিষণ্ন নির্জনতা। ওরা দুজনে উঠে পড়ল। নন্দিনীর মুখখানা যেন ভেঙে চুরে গেছে। মীমাংসা হল না কিছু। প্রিয়ব্রতর যেন লজ্জা করছে নন্দিনীর দিকে তাকাতে। এ ভাবল না এলেই হত, ও ভাবল আর কখনো আসব না। রাস্তার আলো জলেছে। ও-পারের আকাশ ম্লান। কে একজন ওদের দিকে এগিয়ে এল। প্রিয়ব্রত বলল—শান্তনুবাবু। নন্দিনী শান্তনুর কথা শুনেছে সুব্রতর কাছে। শাশুড়ীর মৃত্যুর দিন শান্তনু এসেছিল শ্মশানে, প্রিয়ব্রত বলেছিল সে কথা। কিন্তু এই মন-বিকল সন্ধ্যায় এই দাড়ি-গজানো রুক্ষ চেহারার যুবককে নন্দিনীর ভালো লাগল না। একটা নিঃসাড় হাসি হাসবার চেষ্টা করল শান্তনু। প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞাসা করল—বেড়াতে এসেছেন ? প্রিয়ব্রত বিনীত হাসি দিয়ে বেড়াতে আসার গৌরবকে হাল্‌কা করল।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করল—আপনি ?

শান্তনু বলল—ঘুরে বেড়াচ্ছি।

নন্দিনী বলল—আমরা শুধু বেড়াচ্ছি।

হেসে ফেলল শান্তনু। নন্দিনী দেখল হাসলে শান্তনুকে ততটা উজবুক বলে মনে হয় না। শান্তনু মন্তব্য করল—ঘুরে বেড়ানো আর শুধু বেড়ানোয় অবশ্যই অনেক তফাৎ। এবং ঘুরে বেড়াতে কেবল আমার মতো লোকেরাই পারে ?

—কেন ? নন্দিনীর মুখও একটু যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—কিছু করার নেই বলে।

তারপর প্রসঙ্গটাকে পরিহার করে শান্তনু অন্য কথায় গিয়ে দাঁড়াল।—আমি অনেকক্ষণ আপনাদের লক্ষ্য করেছি। তখন দেখলাম আপনারা···

প্রিয়ব্রত বলল—ঢেউ গুণতে চাইছিলাম। সকলে হেসে উঠল। শান্তনু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—না ঠিক তা নয়, কথা বলছিলেন আপনারা—

—ও মা তাতে কী, আপনি এলে আপনিও কথা বলতেন।

একটা খালি রিকসা যাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত থামাল রিকসাটাকে। ওদের রিকসায় তুলে দিতে দিতে শান্তনু বলল—খুব ভালো লাগল আপনাদের দুজনকে দেখে।

—হঠাৎ ?

—হঠাৎ নয়, আজ সারাদিন কেবল কান্নাকাটি দেখেছি। আমাদের স্কুলের এক সহকর্মীর স্ত্রী আজ মারা গেলেন। (ও মা) ভুগছিলেন অনেকদিন। কাঁচড়াপাড়া টি. বি. হসপিটালে ছিলেন। (ভেরি স্যাড) সাতদিন ধরে দিন-রাত্রি অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। গিয়েছিলাম সেখানে। লাস নিয়ে আসা, বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাগুলোর কান্নাকাটি সামলানো—(ইস্) ঝামেলা গেছে সারাদিন। এবং স্বভাবতই মেজাজটাও কেমন যেন ছানা কেটে গেছে। ওখানে সুব্রতদের পেলাম না। কী করি—এ পারে চলে এলাম। এখানে আপনাদের দুজনকে দেখে বেশ ভালো লাগল। আচ্ছা—আর আটকাব না। প্রিয়ব্রত হেসে বিদায়সূচক ঘাড় নাড়ল।

নন্দিনী বলল—আসবেন একদিন। রিকসা ছেড়ে দিল।

শান্তনু হাত তুলে বলল—নিশ্চয়।

চলন্ত রিকসায় ঠাণ্ডা হেমন্তের হাওয়া এসে নন্দিনীর উত্তপ্ত মুখের ওপর হাত বুলিয়ে গেল। প্রিয়ব্রত নিঃশব্দে সিগারেট ধরাল। পথের মোড়ে মোড়ে রোয়াকে রোয়াকে সান্ধ্য গুলতুনি। দরজায় দরজায় "আমি আর কক্ষনো আসব না," তুই যদি না যাস ভাই। নন্দিনী কিছু শুনছিল না। শান্তনু যে বলে গেল—আপনাদের দুজন—এ কথাটার কোনো মানে নেই। এ দুজন একজন এবং আর একজনের যোগফল নয়। এখানে দুই শব্দ শুধু সংখ্যা। আসলে সে একজন। প্রিয়ব্রত আর একজন।

রিকসাটা চলতে চলতে রেলওয়ে কালভার্টের তলা দিয়ে একটা জায়গায় পৌছল যেখানে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। রিকসাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল—কোন্ দিকে যাব বাবু ?

প্রিয়ব্রত বলল—সোজা।

কী দুঃসাহসী ব্লাউজ—

কথাটা শান্তনুর মাথায় হঠাৎ ভেসে উঠল।

একা একা পথ চলছিল। চুঁচুড়া লঞ্চঘাটে খেয়া পার হওয়াই সুবিধের। ট্রেনে ভাড়া চার পয়সা বেশি। হাঁটতে হাঁটতে শীত করে উঠল শান্তনুর। নিঃশ্বাসটা গরম হয়ে উঠল। মাথার দুপাশে যন্ত্রণা। শান্তনু বুঝল জর আসছে। সেদিন রাত্রের মতো। লঞ্চঘাটে যখন পৌছল তখনই একটা লঞ্চ ছেড়ে গেল। স্থির জলে মোটরের শব্দটা যেন ধাবমান হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ওপারের খেয়াঘাটে দিশারী আলো। খেয়াঘাটের জেটির রেলিঙে হাত রেখে জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও দু-বার থুথু ফেলল। মুখ অসম্ভব তেতো। সারা দিনের তর্জি সারা পায়ে দাঁত ফোটাচ্ছে এবার।

—কী দুঃসাহসী ব্লাউজ। কথাটা শান্তনুর জরের সুযোগ নিচ্ছে। প্রিয়ব্রত খুব সফল। সফল হলে সবই সদুপায়। নন্দিনীর বস্ত্রহরণের মালিক প্রিয়ব্রত, সেও তো সফলতা। কেমন করে নন্দিনীকে প্রিয়ব্রত পেয়েছে—সে প্রশ্ন নিরর্থক। সফলতাই জানায় যে সবই সদুপায়। ওপারে লঞ্চটা ছেড়েছে। ওটাই তার লঞ্চ। সম্ভবত শেষ লঞ্চ। খেয়াঘাট নির্জন। টিকিটবাবু ঢুলছে।

দোকানে ব্লাউজগুলো সাজায়, লক্ষ্য হল ক্রেতা। নন্দিনীর লক্ষ্য কী? শান্তনু নিজেকে তিরস্কার করল, বলল—অশ্লীল। জর আসছে। প্রিয়ব্রত ইজ এ সাকসেসফুল ম্যান। জল কেটে, ঢেউ তুলে লঞ্চটা জেটিতে ভিড়ল।

দূরের গঙ্গার বাঁকে চটকলের, কাগজকলের সারি সারি বিদ্যুৎ বাতির বাহার। তার ছায়া পড়েছে জলে। বেশি ভীড় ছিল না লঞ্চে। এপারের যাত্রীও বেশি নেই। লঞ্চের এক কোণায় নিজেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল শান্তনু। আমিই কিছু হতে পারি নি। সাঁচ্চা কমিউনিস্ট হতে চেয়েছিলাম। অনেক পরের কথা। অনেক সামর্থ্য লাগে তাতে। একটা সৎ কেরানী, কি, সাঁচ্চা স্কুল-মাস্টারও যদি হতে পারতাম। স্কুলে পড়াতে গিয়ে ঘুম আসে—রাগ হয়। সফলতা—কাকে সফলতা বলে সেটা জানা থাকলেও আমি আদ্ধেক সফল হয়ে যেতে পারতাম। টিং-টিং-টিং-টিং—লঞ্চ ছেড়ে দিল। আমি কিছুই হতে পারিনি। বাংলার এম. এ. এবং ব্যর্থ সনেট-লেখক। আমার দাদা, আমার দাদার শালা সকলেই একটা একটা কিছু হয়েছে। আর আমি সনেটের শেষ দু লাইনে মিল দিয়েই ফুরিয়ে যাব।

মেঘের মতো, গ্লানির মতো যখনই এই দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসে শান্তনুর মনে তখনই সে বোঝে তার জ্বর এসেছে। টুকরো টুকরো কথা ভাসছে লঞ্চে। "ঘোষ মিনিষ্ট্রি থাকলে আর দেখতে হত না। বাঙালদেরই রাজত্ব হয়ে যেত"। "এই বা কী ভালো হল মশাই, সে না হয় বাঙালদের পোয়া বারো হত, এ হয়েছে মেড়োদের রাজত্ব"। "রায় মিনিষ্ট্রির পেছনে মাড়োয়ারীরাই তো কলকাঠি নাড়ছে।" "তবু সে বাঙালদের থেকে ভালো"—"আর বাঙাল মানেই কম্যুনিস্ট।" "আরে বাঙালগুলো যদি নেড়েগুলোর সঙ্গে ঠিকমতো লড়ে যেত"···

চমৎকার···রামমোহনের নাতি-নাতকুড়েরা···চমৎকার। শান্তনু হিসেব করল—এক নম্বর এ্যান্টি-বাঙাল, দু নম্বর এ্যান্টি-মেড়ো, তিন নম্বর এ্যান্টি-কমিউনিস্ট, চার নম্বর এ্যান্টি-নেড়ে—বাঃ ভ্রাতরঃ মানবাঃ সর্বে, স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম্।—জ্বর আসছে। জ্বরের ঘোর রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। সুব্রত তুমি একটা ফুল। রুচিকে তুমি চেন না! ইনসারেকশনের স্বপ্ন ফেঁসে গেল, আর তুমি নিচুকাটের ব্লাউজ-ঢাকা রুচির বুকের স্বপ্নে বিভোল। ফুচিকের কমরেড না তুমি?

(ক্রমশ)

দিলীপকুমার সেন

দুটি অপ্রকাশিত কবিতা

মহাকাব্য

একাকী তোমার যুদ্ধে, নড়ে ওঠে সমস্ত পৃথিবী
কটাক্ষে সশস্ত্র ছটা ছুঁড়ে মারে মৃত্যুর শায়ক ;
সর্বাঙ্গে সমর বার্তা। রথ-চক্রও যদি বা দৈবী
পরাস্ত, অর্জুন হও, কুরুক্ষেত্রে ফেরারী নায়ক !
রাহুর বলিষ্ঠ যজ্ঞে থরো থরো ভয়ার্ত দ্রৌপদী
কাঁপে ! আসুরী সভায় তার রিক্ত তনুর প্রত্যাশী
অমৃতে বিষের পাত্র, ভাঙে নৃত্য দেবতারা যদি
অন্যথা অতনু জয়ী, দেখে ফেরে বিরক্ত সন্ন্যাসী।

একাকী তোমার যুদ্ধ ! শরীরে অজস্র প্রহরণ
সর্বত্র পোড়ায় অঙ্গ ; নবজাত গ্রহের যন্ত্রণা ;
খামারে বন্দরে, সীতা স্বর্ণদগ্ধ ! জটায়ু মন্ত্রণা
করে···ঘরে ঘরে, ক্রুর, অন্তরালে লেখে রামায়ণ।

ভস্ম অপমান ছাড়ো ! আদি অন্ত আণবিক প্রেম
চরম প্রশান্তি চেয়ে সেই গল্প, ঋষিরা শোনেন ॥

কোন এক শিল্পীর আঁকা ছবি

দুটি কি একটি রেখা রঙে রঙে অপরূপ তার
মুখের আশ্চর্য শিল্প খুঁজে পায় নিটোল ভূমিকা ;
দু বাহু অন্তিম হর্ষ, স্তনে লিপ্ত কণ্টকের হার
গড়নে ভাবনে পূর্ণ অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে গৌণ শিখা।

সহস্র স্মৃতির দৃশ্য কাচে আঁকে সমুদ্রের পট
শিয়রে তরঙ্গ ভঙ্গ, প্রথামত অরণ্যের ঠাট ;
সে খোলে একান্তে স্বর্গ শূন্যহাতে অন্ধকার জট
দীঘল বেণীর ভাঁজে, বাঁধে বণ্যা-শস্য-জলা-মাঠ।

স্বল্পায়ু রেখায় ভাসে জন্মলীন স্বলাজ ছলনা
হয়তো স্বরূপে মুগ্ধ অথবা সে ধ্বংসের সূচনা !
সে যদি সূর্যের দাহ, মাটি কাঁপে অঙ্কুরে শিখায়
হিরন্ময় ইচ্ছা এঁকে বুকে মুখে পুষ্প হয়ে যায়।

স্বভাবে রহস্য ঘেরা প্রেক্ষাগৃহ কাছাকাছি আছে
দুচোখ নিবিড় দেখ, পোড়ে তাও অঙ্গারের আঁচে।

শিবশম্ভু পাল

কবি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতিতে

এতখানি ভালোবাসা তোমাকে দেখার আগে দেখি নি, দিলীপ।
চৌরঙ্গীর ফুটপাথে, কফিঘরে, অথবা, হাওড়ায়
তোমার নির্জন ঘরে সর্বদাই তার কথা বলেছ সর্বদা ;
রাজনীতি, সম্পাদক, মহিলা—এসব নয়, কেবলই কবিতা !
এ এক অবাক করা স্ত্রৈণতায় তোমার নীলাভ চক্ষু দীপ্তমান ছিল।
আবেগে কণ্ঠের সঙ্গে কেঁপে উঠত পাণ্ডুলিপি থরথর করে,
কপালের শিরা তিনটে তরঙ্গের মতো যেন নেচে উঠত। আমি
এতখানি ভালোবাসা তোমাকে দেখার আগে দেখি নি, দিলীপ।

দীর্ঘদিন অদর্শন চিরবিরহের অন্ধকারে
লীন হয়ে গেল আজ। তোমাকে এখন দেখি বুকের গভীরে,
বড় স্পষ্ট বড় তীব্র ফুটে ওঠো চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে ;
ম্লান হতে ম্লানতর উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর তৈলাক্ত মসৃণ
সম্পাদকের রাস্তা, ভাড়াখাটা মননের বেণের দোকান।
তোমার স্মৃতির পার্শ্বে এরা কত দীন, কত করুণার পাত্র মনে হয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমার বুকের ভিতরে বসতবাটি

তোমার বুকের ভিতরে বসতবাটি
কে যায় ? কারা ? হে কারা ?
মাঠের ওপারে কোদালে-মেঘের ঘাঁটি
উঠান ছন্নছাড়া।

তোমার বুকের ভিতরে বসতবাটি
তোমার বুকের ভিতরে কে আছে ? কারা ?
ওদের বাগান আনন্দে পরিপাটি
মোড়ল, তোমার পাড়া ?

পরাণ মোড়ল, ঐ গ্রামে ছিলে ভালো
ঐ গ্রামে ছিলো কোষাগার—রাজধানী
এখন তোমার সত্তায় অগোছালো
হরিণীর হাতছানি।

লোকে বলেছিলো—তুমি তো বিদেশ যাবে
মলাক্কা থেকে আনবে মরিচাদানা
এখন রাংতা-বিজড়িত-কিংখাবে
ডুবন্ত উইছানা !

মোড়ল, কোথায় সেই স্বাধীনতাবোধ ?
কোথায় তোমার পরার্থপর প্রাণ
কোথায় তোমার স্বারূপ্য ন্যগ্রোধ
আত্মানুসন্ধান ?

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ

সংবাদে প্রকাশ

কে যেন ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে
গাছগুলোকে জ্যোৎস্নায়।
খুব জ্যোৎস্না হয়েছে
দৃশ্যটাকে
পরিষ্কার করে দেখাবার দরকারে।

জ্যোৎস্না।
এই মদির নামটুকু কানে রাখতে রাখতে
একটা ট্রাম আস্তে-আস্তে
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
টার্মিনাসে ঢুকছিলো।
ঠিক তখনই, হঠাৎ,
সেই লাইনবদলের মুখেই
দেখ্ দেখ্ করতে-না-করতেই
হাড়গোড়সুদ্ধ্ কাটা পড়লো
কলকাতা।

কাছেই স্টপেজে
লাস্ট বাসের টোপ ফেলে বসেছিলো কিছু লোক
তারা সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেও
এক পা নড়লো না।
যারা ইতিমধ্যে ভিড় করেছিলো
তাদের কয়েকজনকে তদন্ত করবার জন্য
ছড়িয়ে দিয়ে,
আরেক দল একটা বিহিত করতে
দৌড়ে চলে গেল উল্টোদিকে।

ভাবছিলাম দৌড়বো নাকি উল্টোদিকে,
আমার কানে-কানে কে যেন ভিড়ের মধ্যে
ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্র পড়লো, আত্মহত্যা নয়তো !

ঘোলাজলের বড়ো-বড়ো হাইড্রান্টগুলো
তখনও তাকিয়ে আছে উপরে
জ্যোৎস্নার দিকে
যেখানে
ভীষণ একটা তদন্তের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিলো
তখনও।

আশিস সান্যাল

অনেক সুদূরে আরো যেতে হবে

অনেক সুদূরে আরো যেতে হবে। কেননা হৃদয়
নিরভ্র প্রতিমা ছাড়া আর কোন নাম
দেখেনি দু'চোখ মেলে। রঙ্গিলা বৃক্ষের মতো আরো সমুজ্জ্বল
প্রণয় সমান দৃশ্যে ক্রমে বহমান
রঞ্জিত আস্বাদ কিছু নিতে হবে। এখনো তন্ময়
প্রকৃত ফুলের চেয়ে কোনোদিকে সহৃদয় দেখি না মহিমা।

অনেক বিহ্বল দেহে নক্ষত্রের উজ্জ্বল দেখেছি। অনেক নদীর
উন্মোচিত জলস্রোতে ভাসায়েছি বিশুদ্ধ তরণী।
তবু পলিমাটির কিছু দেখা হল না। তোমার মুখের।
রহস্যে বিনম্র ছায়া প্রবাহিত এখনো সুদূরে
অন্ধকার বনপথে সর্বাধিক উল্লসিত হে স্নিগ্ধ রমণী
তোমার প্রতিমা চেয়ে বহুকাল যেতে হবে অবিরাম উদ্ভাসিত
ব্যাপক গভীরে।

গোলাম কুদ্দুস

আর এক রমণী

যখন এক সোভিয়েত রমণী মহাকাশে পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে বেড়াতে এলেন তখন আমার আর এক রমণীর কথা মনে পড়ে গেল।

আপনি কার্ল মার্কসের সহধর্মিণী। আপনার কথা এমনভাবে আমার মনে এল কেন? মহাকাশযাত্রিনীর সঙ্গে আপনার কি যোগ?

যোগের কথা হয়তো সবিস্তারে বর্ণনা করা যেত। হয়তো এও বলা যেত যে, মার্কসের হাত ধরে আপনি যখন নির্বাসিতজীবনের অনিশ্চয়তার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, তখন তা ছিল ইতিহাসের বিচারে আরো অপার মহাশূন্যে পক্ষবিস্তার। এর যাথার্থ্য প্রমাণ করাও হয়তো শক্ত নয়। কিন্তু এ-সব দিকে আমার মন নেই। আমি ভাবছি, এমন আনন্দের মুহূর্তে কেন আপনার জীবনের কঠিন দুঃখের দিনগুলির ছবি আমার চোখে ভেসে এল? বৃক্ষচারা যারা রোপণ করেছিল তারা আজ ফলের উৎসবে অনুপস্থিত, আমার বেদনাবোধের এই কি কারণ?

অথচ এই বেদনাবোধ কোথায় যেন এক গভীর আনন্দের সঙ্গে মিশে গেছে।

ট্রায়ার শহরের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী ছিলেন আপনি। ধনীগৃহে আপনার জন্ম। কিন্তু আপনি সে-সব বিলাস-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে মার্কসের হাত ধরে বিশ্বের পথে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন অনায়াসে বিনা দ্বিধায়।

আমাদের দেশের কয়েকজন মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভের জন্য সহধর্মিনীদের পিছনে ফেলে এসেছিলেন। তাঁদের অর্ধাঙ্গিনীদের জন্য লোকের মনে আজো প্রচুর সহানুভূতি দেখা যায়। তবে এ-কথা বলতেই হবে যে, সে-ব্যাচারীদের আপনার মতো বহির্বিশ্বে বেরিয়ে দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি। আসলে এর আগে আর কোনো বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিনী আপনার মতো এমন ভাবে যুগ্মজীবনের রথ চালায় নি। আপনাকে তাঁদের মতো বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য করতে না হলেও বিপ্লবী জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার সবটাই বুক পেতে গ্রহণ

করতে হয়েছিল। তাই ধর্মহীন হয়েও আপনিই সত্যকার সহধর্মিনী। অথচ গত শতাব্দীকাল ধরে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এই প্রচারই করা যে, তারা পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করতে চায়।

মার্কসের স্ত্রী এবং বন্ধুভাগ্য ছিল। আপনার মতো স্ত্রী এবং এঙ্গেলসের মতো বন্ধু একসঙ্গে কজনের ভাগ্যে জোটে? আপনাদের দুইজনের সাহচর্য ব্যতিরেকে মার্কস কখনো কি মার্কস হতে পারতেন না? কথাটা আর একজনের মনেও উদয় হয়েছিল। তিনি আপনার স্বনামধন্য জামাতা পল লাফার্গ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্নও তুলেছিলেন—মার্কসের মনকে কে বেশি বুঝতেন, এঙ্গেলস না আপনি? তাঁর রায় আপনার পক্ষেই গিয়েছিল। বলা বাহুল্য এটা স্ত্রী কর্তৃক প্রচলিত অর্থে স্বামীর মন বোঝার ব্যাপার নয়, এটা ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার মনের উপযুক্ত সহচরী হওয়ার প্রশ্ন। লাফার্গের ভাষায় "স্ত্রীর বুদ্ধি এবং সমালোচনা শক্তির প্রতি মার্কসের এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি তাঁকে সকল রচনার খসড়া দেখাতেন এবং মতামতের উচ্চ মূল্য দিতেন।"

এর মূল্য যে কী, তা নতুন করে চোখে পড়ে যখন ভাবি মার্কসের দুর্যোগময় জীবনের সঙ্গিনী আপনার সদা প্রফুল্ল শান্ত মুখ তাঁকে কতটা শক্তি জোগাত। আমরা তো জানি অত্যধিক অভাব অনটনে মানুষ মুষড়ে পড়ে, সংসারে অশান্তি দেখা দেয়, প্রেমের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়, পারস্পরিক দোষারোপ শুরু হয়; প্রথম যৌবনের আদর্শ এবং স্বপ্নগুলি ক্রমে মিলিয়ে আসে। মাপ করবেন, আপনাদের ক্ষেত্রে এদিক থেকেও ব্যাপারটিকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। আপনাদের পারিবারিক সম্পর্কের কথা অল্পবিস্তর বহু লোকই লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আপনাদের সন্তানাদি থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমালোচক অনেকেই আছেন। তাঁরা আপনাদের নানা অবস্থায় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারো লেখা পড়েই আভাসে-ইঙ্গিতেও জানা যায় না যে, আপনাদের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সামান্যতম অশান্তির চিহ্ন বর্তমান ছিল। বরং তাঁদের লেখায় সরবে বা নীরবে এই সুরটিই ফুটে উঠেছে যে, মার্কস পরিবারের মধ্যে ঝর্ণাধারার মতোই স্নেহ প্রীতির স্রোত বয়ে যেত। এটা কি করে সম্ভব যদি না আপনি মার্কসের সাধনার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝে তাঁর সঙ্গে সর্বদা একত্রে আদর্শের উচ্চ শিখরে বিহার করতে পারতেন?

একবার আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, ওদের মধ্যেও তলে তলে নিশ্চয়ই কিছু ঝগড়াঝাটি হত, সে-কথা বাইরের লোক জানবে কি করে? আমি স্বীকার করছি বন্ধুর মতো অত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। ঝাপসা চোখে আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হয়েছে, অভাব অনটনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন আপনার প্রাণপ্রদীপে প্রেমের শিখা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। আপনার বিভিন্ন বন্ধু এবং বান্ধবীর কাছে লেখা এই সময়কার চিঠিগুলি আমার কাছে তার প্রমাণ বহন করে আনে। আপনার কলম দিয়ে যেন কালি ঝরে নি, রক্ত ঝরেছে। কিন্তু তাতে বাইরের দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের ঐশ্বর্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার কাছে তাই চিঠিগুলির এত দাম।

পরিপূর্ণ আত্মমর্যাদা বজায় রেখে নিজের জীবনের দারিদ্র্য বর্ণনা কত কঠিন তা ভুক্তভোগীরাই জানে। কজন এমন করে পারে? হয় তারা দুঃখ চেপে যায়, নতুবা মানসিক দৈন্য প্রকাশ করে। কিন্তু জোসেপ ওয়েডমেয়ারের কাছে লেখা আপনার নিম্নোক্ত পত্রে কি দেখতে পাচ্ছি।

"অবস্থার গতিকে আমি কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। আপনার কাছে আমার নিবেদন, পত্রিকার আয় থেকে যতটুকু অর্থ পাঠানো সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠান। আমাদের টাকার দরকার—খুবই দরকার। আমরা আত্মত্যাগ করেছি বলে হৈ-চৈয়ে মেতেছি, এমন অপবাদ নিশ্চয়ই কেউ দিতে পারবে না। জনসাধারণকে কখনো আমরা আমাদের অবস্থার কথা জানতে দিই নি। আমার স্বামী এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সে বরং চূড়ান্ত আত্মত্যাগে প্রস্তুত, কিন্তু কিছুতেই নামজাদা 'মহাপুরুষ'দের মতো গণতান্ত্রিক ভিক্ষার পথ গ্রহণ করবে না।

"আমি আপনার কাছে আমাদের জীবনের একটি দিনের বর্ণনা দেব। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল তাই জানাব। আপনি লক্ষ্য করবেন, এমন বিপাকে সম্ভবত খুব কম বাস্তুহারাকেই পড়তে হয়েছে। এখানে আমার খোকাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য ধাই রাখা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আমার বুকে পীঠে সাংঘাতিক ব্যথা, এক মুহূর্ত তা থেকে পরিত্রাণ নেই, তবুও আম ঠিক করেছিলাম খোকাকে আমি আমার বুকের দুধই খাওয়াব। জন্মানোর পর থেকে সে একটি রাতও ঘুমায় নি, বড় জোর দু-এক ঘণ্টা চোখের পাতা বুঁজেছে। ইদানীং তার ভয়ানক খিঁচুনি শুরু হয়েছে। মরা বাঁচার মধ্যে তার

দিন কাটছে। যন্ত্রণার চোটে সে এমন জোরে দুধ খায় যে, আমার বুক জ্বালা করে, চামড়া ফেটে রক্ত বের হয়, আর সে-রক্ত ঝরে পড়ে ওর থরথর করে কেঁপে-ওঠা কচি মুখের মধ্যে। এইভাবে আমি যখন একদিন ওকে কোলে করে বসে আছি, তখন আবির্ভাব ঘটল আমাদের বাড়িওয়ালার লোকের। ইনি মহিলা। আমরা শীতকালে তাঁকে ভাড়ার একাংশ দিয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে আমরা খোদ বাড়িওয়ালার হাতে টাকা দেব। কেননা ওঁর বিরুদ্ধে বাড়িওয়ালা সমনজারী করেছে। মহিলা এখন চুক্তির কথা অস্বীকার করলেন এবং বাকী ৫ পাউণ্ড দাবি করতে থাকলেন। আমাদের হাতে টাকা ছিল না। ইতিমধ্যে আদালতের বেলিফ এসে হাজির! তারা আমার যা কিছু সম্পত্তি—চাদর, বিছানা, কাপড়চোপড় সব কিছু—এমন কি খোকার দোলনাটি এবং আমার মেয়েদের ভালো ভালো খেলনা পর্যন্ত ক্রোক করল। আমার মেয়েরা কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিল। বেলিফরা ভয় দেখিয়ে গেল যে, দু-ঘণ্টার মধ্যে টাকা শোধ না করতে পারলে তারা সব জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। শীতে জমে-যাওয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাকে বুকের এই খারাপ অবস্থা নিয়ে শুতে হবে ঠাণ্ডা শূন্য মেঝেতে। শ্রাম নামে আমাদের বন্ধু আছে, সে আমাদের জন্য সাহায্যের প্রত্যাশায় ছুটল শহরের দিকে। একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছিল সে, ঘোড়া দুটো কেন জানি হঠাৎ পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎপাত হয়ে পড়ে, সে তখন লাফিয়ে নামতে গিয়েছিল গাড়ি থেকে। তাকে আমাদের বাড়িতে আনা হল রক্তাক্ত অবস্থায়। শীতে কাঁপুনিধরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তখন আমিও কেঁদেছিলাম।

"পরের দিন আমাদের বাড়ি ছাড়তে হল। সেদিন খুব শীত ছিল, তার উপর বৃষ্টি পড়ছিল। চারদিকে কেমন একটা গুমোট ভাব ঘনিয়ে এসেছিল। আমার স্বামী আমাদের জন্য আস্তানা জোগাড়ের চেষ্টা করল। তার মুখে আমাদের চারটি ছেলেমেয়ের কথা শোনার পর কেউই আমাদের মাথা গোঁজার স্থান দিতে রাজি হল না। অবশেষে এক বন্ধু এগিয়ে এলেন।

"এদিকে আমরা আমাদের বাকী ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। আর আমাকে তক্ষুনি সব জিনিসপত্র বিক্রি করতে হল যাতে ওষুধওয়ালা, রুটিওয়ালা, দুধওয়ালা, মাংসওয়ালার পাওনা মেটানো যায়। ওরা সবাই আমাদের জিনিসপত্র ক্রোক হতে দেখে পয়সা মারা যাওয়ার ভয়ে একসঙ্গে আমাকে এসে ঘিরে ধরেছে। আমাদের বিক্রি-করা বিছানাপত্র সব একে একে ঘর

থেকে বের করা হল, এবং একটা গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। এমন সময় বাড়িওয়ালা দুজন কনস্টেবল নিয়ে ছুটে এল আমাদের কাছে। অনেকক্ষণ সূর্য অস্ত গেছে, কাজেই এখন ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করলে নাকি আইন লঙ্ঘন করা হয়। বাড়িওয়ালার ভয়, আমাদের বিক্রি-করা জিনিসের মধ্যে তারও কোনো মালপত্র থাকতে পারে! তা ছাড়া আমরা নাকি এ-দেশ ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যাচ্ছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমাদের দরজার সামনে দু-তিন শ' লোকের ভিড় জমে গেল—যেন গোটা শেলসিয়া পাড়ার সবলোক এসে হাজির! বিছানাপত্র আবার ঘরে ফিরিয়ে আনা হল—পরদিন সূর্যোদয়ের আগে ওগুলো ক্রেতার হাতে দেওয়া চলবে না।

"যখন আমরা আমাদের সবকিছু বিক্রি করলাম, তখন ঋণের পাই-পয়সাটি পর্যন্ত আমরা শোধ করে দিলাম। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গিয়ে উঠলাম ছোট্ট দুটি কামরায়। এটা লিচেষ্টার স্কোয়ারের এক নম্বর লিচেষ্টার ষ্ট্রীটের একটি জার্মান হোটেল। এখানে আমরা হপ্তায় ৫ পাউণ্ডের বিনিময়ে মানবিক অভ্যর্থনা লাভ করলাম।

"প্রিয় বন্ধু, আপনি আমাদের জীবনের একটি দিনের ঘটনা সম্পর্কে এমন দীর্ঘ পত্র এবং এত বাক-বাহুল্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানি এটা সৌজন্যসম্মত নয়। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এই বুকের ভার আমাদের সবচেয়ে পুরনো সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে সত্যকারের বন্ধুর কাছে অন্তত বারেকের তরে আমাকে নামাতে দিন।"

জেনি মার্কস, আমি এ-কথা লুকাতে চাইনে আপনার চিঠির এই পর্যন্ত পড়ে আমার মনে পুনর্বার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কথা ভেসে উঠল, আর আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়েছিল, এমন সময় দেখলাম পত্রের পরবর্তী ছত্রে আপনি জলভরা মেঘের উপর আশ্চর্য ইন্দ্রধনু ফুটিয়ে ওয়েডমেয়ারকে লিখছেন :

"মনে করবেন না এইসব ছোটখাট দুশ্চিন্তা আমাকে নুইয়ে দিয়েছে। আমি খুব ভালোভাবেই জানি আমাদের এই সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আর বিশেষ করে আমি তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুখী এবং সৌভাগ্যবতীদেরই একজন! কারণ আমার বন্ধু, আমার স্বামী এবং আমার জীবনের সম্বল এখনো আমার পাশে রয়েছে।"

এই পর্যন্ত লিখে হয়তো কলম তুলে আপনি এক মুহূর্ত কী ভেবেছিলেন।

হৃদয়ভাবকে প্রকাশ করতে হয়তো একটু দ্বিধা হয়েছিল। তবু আপনি মার্কস সম্পর্কে মনোভাব গোপন করতে পারেন নি :

"আমার মনকে যা সত্যই পীড়া দেয় এবং যা ভাবলে আমার বুক ফেটে রক্ত ঝরে তা হচ্ছে, অতি তুচ্ছ জিনিসের জন্য তাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। অথচ তাকে প্রায় কিছু সাহায্য করা যাচ্ছে না। যে মানুষ স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে বহুজনকে সাহায্য করেছে সে নিজে আজ এত অক্ষম! কিন্তু প্রিয় বন্ধু ওয়েডমেয়ার, আপনি যেন না ভাবেন আমরা কারো কাছে কিছু দাবি করছি। অবশ্য আমার স্বামী নিশ্চয়ই এটুকু প্রত্যাশা করতে পারেন যে, যাঁদের তিনি উৎসাহ এবং চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন, তাঁরা পত্রিকাটির জন্য আর একটু তৎপর হবেন এবং সাহায্য করবেন। আমি গর্ব এবং জোরের সঙ্গেই এ-কথা বলতে পারি। আমার মনে হয় না এতে কারো উপর কিছু অন্যায় চাপ দেওয়া হয়। অথচ এই জিনিসটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দেয়। অবশ্য আমার স্বামী বিষয়টি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে।"

মার্কসের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করা! তার মানে আপনি মার্কসের ব্যক্তিত্বের তলায় অবলুপ্ত হয়ে যান নি। তাই কথাটা অবলীলাক্রমে বন্ধুকে লিখতে পেরেছেন।

এর পরের ছত্রেই স্বামীগর্বে-গর্বিতা মহিমান্বিতা নারী হিসাবে আপনি কতকটা নিজের অজ্ঞাতে মার্কসের যে অন্তরঙ্গ ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা অতি মূল্যবান এইজন্য যে, ঘনিষ্ঠতম সঙ্গিনী হিসাবে স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর বড় বিচারক কে আছে :

"কোনো দিন কোনো সময়—এমনকি চরম বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়েও—সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা হারায় নি বা তার কৌতুকপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। আমাকে খুশি থাকতে দেখলেই এবং আমাদের আদরের খোকাখুকুদের তাদের মা-মণির কোল-ঘেঁসে বসতে দেখলেই সে কৃতার্থ বোধ করে।"

এ হেন যে স্বামী তার কাছেও আপনাকে কিছু কিছু ব্যাপার গোপন করতে হত! কারণ আপনার চিঠিতেই দেখছি :

"প্রিয় ওয়েডমেয়ার, সে জানে না যে আমি আপনাকে আমাদের বর্তমান অবস্থা এমন সবিস্তারে লিখেছি। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি তাকে এই চিঠির সব কথা বলবেন না। সে শুধু এটুকু জানে যে, আমি

আপনাকে তার নাম করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে পাঠাতে বলেছি।"

আমি দেশ-বিদেশের নারীদের কথা বলতে পারব না, তবে আপনার চিঠির এ জায়গাটা পড়তে পড়তে আমার এই বাংলাদেশের অভাবী সংসারের মা-বোনদের কথাই মনে পড়ে গেল। আপনি যেন তাদের মতোই এক বাঙালী নারী! এঁরা চিরকাল নিজের ছেঁড়া আঁচল দিয়ে স্বামী-পুত্র-কন্যার চোখ থেকে অতি প্রকাশ্য দুঃখের চিত্রও সাধ্যমতো ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। কে যেন কৌতুক করে বলেছিল, এই বাঙালী জাতটা অনেক দিন 'মা' 'মা' বলে ডাকতে না পারলে হাঁপিয়ে ওঠে। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যে নয়। দেশকে এরা মাতৃমূর্তি হিসাবে কল্পনা করে এসেছে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এরা যদি একদিন আপনাকে জননীরূপে আপন করে নেয়, তাহলে সেটাও হয়তো জাতীয় চরিত্রের বিপরীত কিছু হবে না।

মার্কসের ছায়া পড়েছে জগৎজুড়ে, কিন্তু আপনার প্রভাবের প্রয়োজন কি কম? আপনি আমাদের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারেন না? যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন তাঁরা কি পারিবারিক ক্ষেত্রে আপনার আদর্শ সর্বদা পালন করেন? আর তাঁদের জীবনসঙ্গিনীদের কি আপনার কাছ থেকে কিছুই শেখার নেই? আমার আর একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করে। যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, অথচ গাড়ি-বাড়ি ঐশ্বর্যের আলোয় বাস করে পাশের অন্ধকার কুটিরের দীনদরিদ্র কমরেডটিকে চেয়েও দেখেন না, তাঁদের সম্মুখীন হলে আপনার কি মনে হত? টাকার শক্তির বিরুদ্ধে যোদ্ধা বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরা নিজেদের সম্পত্তির একাংশও যদি আন্দোলনের স্বার্থে সঁপে দিতে না পারেন, তাহলে আপনি তাঁদের সম্পর্কে কী মনোভাব অবলম্বন করতেন? আমার মনের মধ্যে আইরিশ নাট্যকার বার্নাড শ'র একটা উক্তি প্রায়ই দোলা দিয়ে যায়: "The most ardent socialist if he owns property can by no means do otherwise than the conservative proprietors until property is forcibly abolished by the whole nation." অর্থাৎ সবচেয়ে ব্যগ্র সমাজতান্ত্রিকও যদি সম্পত্তির মালিক হয়, তাহলে সে রক্ষণশীল মালিকদের থেকে ভিন্ন প্রকার কিছু করতে পারে না, যতক্ষণ না সমগ্র জাতি কর্তৃক বলপ্রয়োগ দ্বারা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

আপনিই বলুন বাস্তবতার দিক দিয়ে আইরিশ নাট্যকারের উক্তি কি মিথ্যা ? কিন্তু মার্কস কি তাঁর অনুরাগীদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে বলতেন ? না একে পরিবর্তনের পরামর্শ দিতেন ?

আপনার কাছে এ-সব আমার জিজ্ঞাস্য, কারণ আপনি বেদনার সিন্ধু পার হয়েছেন। অপার দারিদ্র্যের ঢেউ এসে একে একে আপনার চারটি সন্তানকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আর সন্তানদের মার্কস এবং আপনি যে কী রকম ভালোবাসতেন তা কে না জানে ? আমি এখনো চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি, জগদ্বিখ্যাত মার্কস ছোট মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে চারপেয়ে জীব ঘোড়ায় পরিণত হয়েছেন, শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার যোদ্ধা নিজের মুখে লাগাম পরেছেন, আর গম্ভীর দাড়িওয়ালা মুখে পীঠের যাত্রিনীর চাবুক খেয়ে খুশির ঝলমলানি প্রকাশ করছেন।

আপনি ওয়েডমেয়ারকে ঐ যে চিঠি লিখেছিলেন, তারপর এক বছরও কাটে নি, দারিদ্র্য আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছে। এই সময়ে আপনার ছোট্ট ছেলেটি মারা গেল। তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপনারা স্বামী-স্ত্রী মিলে কম চেষ্টা করেন নি। আপনি অর্থাভাবের বিড়ম্বনা এবং প্রথম মৃত্যুশোকের চিত্র এঁকেছেন মাত্র কয়েকটি কথায় অতি অনাড়ম্বর ভাষায় :

"আমার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, তবু কার্লের কাকার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই ভরসায় আমি অসুস্থ ছেলেকে ফেলে হল্যাণ্ড যাওয়া স্থির করলাম। বৃদ্ধ আমার অনুভূতি বুঝতে পারল না। আমি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। আমাকে দেখে এডগার একগাল হাসি নিয়ে ছুটে এল। আর ছোট্ট ফক্‌স তার দুটি ক্ষুদ্র হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। বেশিদিন তার স্নেহস্পর্শ আমি ভোগ করতে পারি নি। নভেম্বরে সে নিউমোনিয়ায় মারা গেল। আমার ব্যথার কোনো কূলকিনারা ছিল না। আমি তখনো বুঝতে পারি নি আরো কত দুঃখ আমার জন্য জমা হয়ে আছে।"

এই সময় দারুণ বসন্ত রোগে আপনি আক্রান্ত হলেন। ছেলেমেয়েদের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। অনেক চেষ্টার পর এক বন্ধুর বাসায় তাদের স্থানান্তরিত করা গেল। বসন্তের মারী গুটিকার সঙ্গে যুঝতে শূন্য বাসায় আপনার পাশে বসে রইলেন একা মার্কস্। মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন জয়ী হল, কিন্তু বীভৎস রোগ এসে ট্রীয়ারের সেরা সুন্দরীর সব রূপ নিঙড়ে নিয়ে গেল। তবু তাতে আপনার দুঃখ নেই। ভাগ্যকে পরিহাস করে আপনি লিখছেন :

"আমি এখন মার্কসের 'এইটিনথ ক্রমেয়ার'-এর কপি নকল করছি। বাইরের জগতের সঙ্গে এখন এই আমার একমাত্র যোগ।"

আর বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মার্কস কি করছিলেন? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দুটি মূল স্তম্ভ—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব—মার্কস সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যখন তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা দুর্দিন চলেছে। আর এই ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ সাল যখন আপনাদের জীবনের সংকট চরমে পৌঁচেছে তখন আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন জার্মান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু ভাইয়ের কাছে আপনি হাত পাতার কথা ভাবতেই পারেন নি।

প্রথম শোকের পর বছর না ঘুরতেই দ্বিতীয় শোকের শূল এসে বিঁধল আপনার বুকে। আপনার শান্ত সংযত লেখার ভঙ্গিটিই মর্মান্তিক অবস্থাকে আরো প্রকট করে তোলে :

"১৮৫২ সালের ইস্টারের সময় আমাদের ছোট খুকী ফ্রান্সিসকা কঠিন ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়। তিনদিন মরা-বাঁচার মধ্যে কাটে। নিদারুণ রোগযন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়। যখন সে মারা গেল তখন আমরা তার প্রাণহীন ক্ষুদ্র দেহটি পিছনের ঘরে রেখে সামনের ঘরে এলাম এবং মেঝেতে বিছানা পাতলাম। আমাদের তিনটি জীবিত সন্তান আমাদের পাশে শুয়ে আছে। আমরা সবাই একসঙ্গে ছোট মেয়েটির জন্য কাঁদতে লাগলাম। আমাদের খুকুমণির এমন সময় মৃত্যু হল যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি অনটন চলছে। আমাদের জার্মান বন্ধুরা তখন আমাদের কিছুই সাহায্য করতে পারেন নি। এই সময় আর্নেস্ট জোনস্ প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্য কোনো টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। সমস্ত দুঃখ বুকে চেপে আমি এক ফরাসী বাস্তহারা বন্ধুর কাছে গেলাম। তিনি তখন আমাদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে থাকতেন না এবং প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এখন আমাদের নিদারুণ প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালাম। তিনি তক্ষুনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আমার হাতে দুই পাউণ্ড গুঁজে দিলেন। এই টাকা দিয়ে আমার খুকুমণির জন্য কফিন কেনা হল। আমার খুকুমণি এখন সেই কফিনেই শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। সে যখন এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল তখন তার শোওয়ার জন্য একটা দোলনা

জোটে নি। আর তার শেষ শয্যা জুটতেও অনেক দেরি হল। কী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে আমরা তাকে কবরে শুইয়ে রেখে এলাম!"

কয়েক মাসের মধ্যে আপনার আর একটি সন্তান অসুখে পড়ল। সঙ্গতিহীন অবস্থায় তার মৃত্যুবর্ণনা আরো গভীর, আরো সংযত :

"এডগারের দেহে দুরারোগ্য ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিল। এক বছর ভুগে তার মৃত্যু হল। আমরা যদি এর আগে অস্বাস্থ্যকর ছোট ফ্ল্যাটটা ছেড়ে যেতে পারতাম এবং খোকাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়ার মতো পয়সা জোগাড় করতে পারতাম, তাহলে হয়তো তাকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু যে গেছে তাকে তো ফেরানো যাবে না..."

শতাব্দীর ব্যবধান পার হয়ে আপনার চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন আমার গায়ে এসে লাগছে—যে গেছে তাকে ফেরানো যাবে না!

বহু সন্তানবিয়োগ-বিধুরা আপনার চতুর্থ সন্তানের মৃত্যুবর্ণনা পড়লে সহসা কারো মনে হতে পারে আপনি প্রায় দার্শনিক নির্লিপ্ততায় পৌঁছেচেন। আসলে ভিতরের বিস্রস্তবিন্যাস আপনি মাত্র দুটি ছত্রের আবরণে এইভাবে ঢেকে রেখেছেন :

"৬ই জুলাই আমাদের সপ্তম সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু সামান্য একটু নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত সে মাত্র বেঁচে ছিল। তারপর সে তার ভাইবোনদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল।"

এ ছাড়া আপনি আর কি-ই বা লিখতে পারতেন! অথচ মাত্র কটি কথায় যেন আপনাদের জীবনের সমস্ত বঞ্চনা ভাষা পেয়েছে: "সে তার ভাইবোনদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল!" এইভাবেই চিরদিন গভীর বেদনার চাপে মুখর ভাষা মৌন হয়ে আসে!

এর তিন বছর পরে ওয়েডমেয়ারের স্ত্রীর কাছে তাঁর দুঃখের দিনে আপনি সুদীর্ঘ এক পত্র লিখেছিলেন। তাঁর শেষ ক-টি ছত্রে আপনি প্রিয় বান্ধবীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

"এই দারুণ দুঃসময়ে বীর হও! সাহসী হও! দুনিয়া তাদেরই যারা নির্ভীক! তোমার স্বামীর বিশ্বস্ত এবং দৃঢ় সঙ্গিনী হও! দেহ এবং মনের দিক দিয়ে সক্রিয় থাক! তোমার স্নেহের খোকাখুকুদের কাছে নকল-শ্রদ্ধার-মুখোসখোলা সত্যিকারের কমরেড হও!"

চিরকাল শুনে এসেছি: আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাবে। আপনি আপনার বান্ধবীর জন্য ঠিক তাই করেছেন। এ উপর থেকে উপদেশবর্ষণ নয়, ভিতর থেকে উৎসারিত মানবাত্মার মহাসঙ্গীত। তাই এ ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

বিজ্ঞানাচার্যের হৃদয়বত্তা

১৯০৯ সালের মাঝামাঝি আমি তখন হিন্দু স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। দর্জিপাড়ার বাড়ি হইতে নিত্য দু বেলা পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইত। এক দিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখি, মা তাঁর সমবয়সী এক মহিলার সহিত গল্প করিতেছেন। আমাকে বলিলেন, 'প্রণাম কর, তোর মাসিমা।' নূতন মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাকে দেখার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। কত ছোটটি দেখেছি, এখন কত বড়োটি হয়ে গেছ। তা তোমার লেখাপড়ায় অসুবিধার কথা শুনেছি। তুমি কাল সকালেই যেয়ো আমাদের বাড়ি। বোদে-কে বলে দেব, সে তোমার দেখাশোনা করবে।' বোদে সত্যেন্দ্রনাথের পারিবারিক ডাক নাম—বোধ হয় বৈদ্যনাথের সংক্ষিপ্ত রূপ।

সত্যেন্দ্রনাথ সেই বৎসরেই হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যে দশজন ছাত্র সে বৎসরে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মাসিক কুড়ি টাকা জলপানি পান, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে পঞ্চম। কিন্তু ছাত্রমহলে তাঁহার খ্যাতি তখনই ছিল তাহার অনেক ওপরে। সম্প্রতি অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁহার সত্তর জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন যে, 'সত্যেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হয়ে ভর্তি হয়েছে জেনে আমি উল্লসিত হয়ে উঠি, তার সঙ্গে আলাপ হবার সম্ভাবনায়।' এ হেন সত্যেন বোসের কাছে পড়িতে পাইব, এ ছিল আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের আদিনিবাস কাঁচড়াপাড়ার অনতিদূরে বড় জাগুলিয়া গ্রামে। কিন্তু সে গ্রামের সহিত তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি বরাবর কলিকাতাতেই মানুষ। যে বাড়িতে তিনি এখন থাকেন তা-ও তাঁর পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাওয়া। অবশ্য ইহার বর্তমান রূপ দিয়াছেন তাঁহার পিতা সুরেন্দ্রনাথ। ১৯০৯ সালে ইহার চেহারা ছিল একেবারে আলাদা।

নানা পারিবারিক কারণে সুরেন্দ্রনাথকে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় থাকিতে হইত কলিকাতার বাহিরে। বাড়িটি তখন ভাড়া দেওয়া হইত। স্ত্রী ও শিশু পুত্র কন্যাকে অনেক সময় বিদেশে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না, তাহাদের রাখিয়া যাইতেন অন্য একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়া। এই পর্বে দর্জিপাড়ায় এক সরু গলিতে একটি বাড়িতে পাশাপাশি দুই অংশে বাস করার ফলে আমার মায়ের সহিত সখীত্ব হয় মাসিমার। আমি তখন এত ছোট ছিলাম যে সে সময়ের কোনো স্মৃতি আমার ছিল না। আমার দিদি সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক মাসের বড়। তার রং ছিল খুব ফরসা, ও চোখ কটা। তাই তার একটি আদরের নাম ছিল মেরী। দুটি পরিবার কয়েক মাস একত্রে থাকার পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ভাড়াটিয়া জীবনের নিয়মানুসারে। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যান আসামের সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে রেল লাইন পাতার কাজে হিসাবরক্ষক হইয়া। আমার এক নিকট আত্মীয় পরিবারও সেখানে যান চাকুরীর তাগিদে। সাপটগ্রামে এই পরিবারের সহিত মাসিমার যোগাযোগ হয়। আলাপ-প্রসঙ্গে 'মেরী' এই অপ্রচলিত নামের বালিকার উল্লেখে মাসিমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। তাঁদের নিকট হইতে আমাদের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার তাঁর পুরানো সখীকে খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁদের পুনর্মিলন আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পরদিন সকালে গেলাম সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। কাছাকাছি পড়িয়া থাকায় আমাদের মুখ-চেনা ছিল, তাই সংকোচ কাটিয়া গেল সহজেই। ঠিক হইল তখন হইতে আমি প্রত্যহ দু-বেলা সত্যেন্দ্রনাথের পড়িবার ঘরেই বসিয়া পড়াশোনা করিব। অল্পদিনেই একেবারে বাড়ির লোক হইয়া গেলাম। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মাসিমা পরিচয় দিতেন, 'এটি আমার বোন-পো, বোদের ছোট ভাই।' মেসোমশায়কে তখনও বছরের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইত নানাস্থানে, যেখানে নূতন রেল লাইন পাতা হইত। মাসিমার শরীর মোটেই সুস্থ ছিল না। আর আমার মা তো ছিলেন চির-অসুস্থ। দিদির বিবাহ হইয়া গেল পূর্ববঙ্গে, তাহাকে সেখানেই থাকিতে হইত অনেক সময়। বাবার চাকরীতে ছুটির ব্যবস্থা ছিল খুবই কম। অনেক রবিবারেও তিনি বাড়িতে থাকিতে পাইতেন না। সুতরাং দাদাই আমার জীবনের হইলেন প্রকৃত অভিভাবক।

আমি যখন স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, সত্যেন্দ্রনাথের তখন কলেজে ফার্স্ট

ইয়ার। কিন্তু তখনই তিনি আমায় দিলেন তাঁর পড়িবার ঘরের অবাধ স্বাধীনতা। এ পর্যন্ত বাংলা নভেল পড়িতাম লুকাইয়া চুরি করিয়া। এখন তাঁর ঘরের নিরাপত্তায় বসিয়া প্রথমেই দিনের পর দিন বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী গিলিয়া ফেলিলাম। স্কুলের পড়ার যখন যতটুকু দরকার তাতে আর কতটুকু সময় লাগিত। বাকী সময়ে কাজ ছিল দাদার সঙ্গে গল্প করা, তাঁর অবসর মতো। এই গল্প-আলোচনার ভিতর দিয়াই হইত আমার প্রকৃত শিক্ষা। আমার ধারণায়, দাদা সেই-প্রকৃতির লোক যাকে বলা যায় 'জাত-মাস্টার'। কোনো কিছু পড়িয়া ভালো লাগিলে তা তখনই আমায় বোঝাইতেন। যে কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর অনন্যসাধারণ। কেবল আমি নই, সেই সময়ে কত যে ছাত্র তাঁর কাছে আসিত পড়া বুঝিয়া নিতে তা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁর নিজের পড়া যে কখন করিতেন, বোঝাই যাইত না। আসল কথা, তাঁর নিজের পড়া তিনি অনেক আগেই শেষ করিয়া রাখিতেন, কলেজের ক্লাসগুলিতে হইত তাঁর রিভিশন্-এর কাজ।

দাদা ছেলেবেলায় ছিলেন বাড়ির কাছের নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের ছাত্র। মেধাবী ছাত্র হিসাবে সেখানে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর কেহ ছিল না। তাই এণ্ট্রান্স ক্লাসে ওঠার পর মেসোমশায় তাকে ভর্তি করিয়া দিলেন হিন্দু স্কুলে, যাতে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির ঠিকমতো পরীক্ষা হয়। সেটা ছিল ১৯০৭ সাল, যাতে সে ১৯০৮ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন। পরীক্ষায় ঠিক দু দিন আগে দেখা গেল সত্যেন্দ্রনাথের বসন্ত হইয়াছে। পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইল। তাকে আর এক বছর পড়িতে হইল হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসাবে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মন আগামী বৎসরের পরীক্ষার অপেক্ষায় কেবল পুরানো পড়ায় আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না। কলেজে গিয়া গণিতের যে সব বিষয় পড়িতে হইবে তাহা তিনি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন নিজের চেষ্টায়। সংস্কৃত কাব্যপাঠের মধ্য-পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় কালিদাস, ভবভূতি, ভারতী প্রভৃতির কাব্যাবলী পড়িয়া ফেলিলেন। আর পড়িলেন ঐতিহাসিক গ্রীন-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ—'এ শর্ট হিস্ট্রী অব্ দি ইংলিশ পীপল।' এ পর্বে আমি তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু ইহার ফলের সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের 'মেঘদূত' হইতে আবৃত্তি আমি অনেকবার শুনিয়াছি। আর দেখিয়াছি, 'হিস্টোরিয়ান্স্ হিস্ট্রী অব দি ওয়ার্ল্ড' সীরিজের

ফরাসী দেশের ইতিহাসের বিপুল গ্রন্থ এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে। জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টায় তিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও মানবিক শাস্ত্র, ইহার কোনো বিভাগকেই তিনি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। শারীরিক কুশলতায়ও তিনি সব্যসাচী, কেননা, লেখার বা খাওয়ার ব্যাপারে তিনি দক্ষিণহস্তের ব্যবহারে সুদক্ষ হইলেও একটা পেনসিল কাটিতে গেলে তাঁর বাম হস্ত আগাইয়া আসে। ক্যারম, ব্যাডমিনটন ও টেনিস খেলাতেও তিনি বামপন্থী। হিন্দু স্কুলে তখন গণিতের শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্রলাল বক্সী। তাঁহার মতো বিজ্ঞান-পাগল গণিত-শিক্ষক খুব কম দেখা যায়। পরে আমরা যখন তাঁহার ছাত্র হই তিনি আমাদের ক্লাসে প্রায়ই বলিতেন, 'তোমরা কলেজে গিয়ে সবাই বিজ্ঞান পড়ো। বর্তমান জগতে বিজ্ঞান না জেনে বাস করা মিথ্যা। কলেজে না গেলে, ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেণ্ট না করলে, বিজ্ঞান শেখা অসম্ভব। আর্টস্-এর যে কোনো বিষয় তো তোমরা বাড়িতে বসে নিজেরাই পড়ে নিতে পার।' তিনি আরো বলিতেন, 'সত্যেন আমার আদর্শ ছাত্র। না, এ-ও ঠিক বলা হল না। আমি অনেক সময় ভাবি যে আমিই তার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি।' ১৯০৯ সালে এন্‌ট্রাস পরীক্ষায় কিন্তু এই আদর্শ ছাত্র তাঁকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল গণিতে 'ফুল মার্কস' না পাইয়া। ব্যাপারটি হইয়াছিল এইরূপ। পরীক্ষার খাতা জমা দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ আসিলেন হিন্দু স্কুলে, বক্সী মহাশয় তার অপেক্ষায় আছেন। প্রশ্নপত্র হাতে রাখিয়া দুজনে মুখে মুখে অঙ্কগুলি কষিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, একটি অঙ্কে সত্যেন্দ্রনাথ ১২৭কে আর ভাঙেন নাই, অবিভাজ্য ভাবিয়া। বক্সী মহাশয় বলিলেন—ন তেরম্? দু-জনেরই মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। অঙ্কে ফুল মার্কস না পাইলেও, সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাস-ভূগোলে এত বেশি পাইয়াছিলেন যে, খুব সম্ভব তাহাতে তিনিই হইয়াছিলেন প্রথম। ইহা দেখিয়া কলেজে ভর্তি হইবার সময় মেসোমশায় দাদাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন আর্টস্ কোর্সে ভর্তি হইতে।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের দিক হইতে যাহাই হোক, পরীক্ষায় সাফল্যের দিক হইতে মেসোমশায়ের পরামর্শ যে অসমীচীন ছিল না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল পরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বিখ্যাত ইংরেজি শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসেও পড়াইতেন; অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ বা অধ্যাপক পার্সিভাল বি-এ ক্লাসের নিচে

পড়াইতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন জানা গেল যে আর কয়েক মাস পরেই অধ্যাপক পার্সিভাল অধ্যাপনা হইতে অবসর নিয়া তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিলাতে গিয়া বসবাস করিবেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র অধ্যাপক ঘোষের নিকট এই ইচ্ছা জানান যে তাঁরা অন্তত কিছুদিনের জন্যও পড়িতে চাহেন অধ্যাপক পার্সিভাল-এর কাছে। ছাত্রদের এই ইচ্ছা পার্সিভাল সাহেবকে জানানো হইলে এই ব্যবস্থা হয় যে, মিলটন-এর 'কোমাস্'-এর অবশিষ্ট অংশ পার্সিভাল সাহেবই পড়াইবেন অধ্যাপক ঘোষের বদলে। ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তবুও, আমার মনে আছে, পার্সিভাল সাহেবের ক্লাসে পড়ার পর দাদার কি অপরূপ উৎসাহ ও ভক্তি। সেবারে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের টেস্ট পরীক্ষায় ইংরেজি রচনা অংশটি পার্সিভাল সাহেবই পরীক্ষা করিলেন স্বেচ্ছায়। সেই পরীক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমি পরে শুনিয়াছি আমারও অধ্যাপক স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখে। তিনি ছিলেন পার্সিভাল সাহেব-এর একান্ত অনুরক্ত শিষ্য। তিনি আমাকে বলেন, 'পরীক্ষায় দেখা গেল দুটি ছাত্র ১০০ ভিতর ৬০ পাইয়াছে। একজন আর্টস বিভাগের, আর সায়েন্স বিভাগ থেকে সত্যেন। কিন্তু সত্যেনের খাতার উপরে সাহেব লিখিয়া দিয়াছেন ৬০+১০, এই মন্তব্য করিয়া যে এই ছাত্রটি অসাধারণ, ইহার নিজস্ব কিছু বলিবার আছে।' তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে দেখিতে চাহেন ও দেখিয়া সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইয়া যান।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কথা আমার না বলিয়া উপায় নাই। দাদার কাছাকাছি থাকিয়াও আমি স্কুলে, কলেজে বা ইউনিভারসিটিতে কোনো পরীক্ষাতেই আশানুরূপ ফল দেখাইতে পারি নাই। দাদার বক্তব্য ছিল, "পরীক্ষার হলে তোর কি হয় বুঝতে পারি না।" এ সত্ত্বেও আমি কোনোদিন তাঁর স্নেহে ও আগ্রহে বঞ্চিত হই নাই। তার এই সহৃদয়তা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া আমি মনে করি।

তাঁর অনুচর হইয়াই আমি বাংলা সাহিত্যের গণ্ডি পার হইয়া প্রথমে ইংরেজি ও পরে ইউরোপীয় সাহিত্যের সীমাহীন প্রান্তরে পদার্পণ করি। দাদার ঘরে কখনও নূতন বই-এর অভাব হইত না। বিজ্ঞানের বইগুলির দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টি দিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইত। কারণ, বাবার আদেশে

আমাকে আর্টস পড়িতে হইল, যদিও তার মধ্যে একটি বিষয় রহিল গণিত। কলেজে আমি যখন প্রথম বার্ষিকে, দাদার তখন পঞ্চম বার্ষিক। ইন্টারমিডিয়েট ও বি-এস-সিতে দাদাই হইলেন প্রথম। কিন্তু তাঁর বি-এস-সি পরীক্ষার একটি দিনের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

এই সময়ে হেদুয়া পুকুরের একটি কোণে এখন যেখানে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের প্যাভিলিয়ন, শীতের শেষে ও পরীক্ষা পর্বের অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন কলেজের কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছাত্রদের একটা মণ্ডলী জমায়েত হইত প্রতি সন্ধ্যায়। এই মণ্ডলীর কেন্দ্রে ছিলেন সত্যেন বোস। ম্যাট্রিক দেবার পর আমিও তাতে যোগ দিতাম। তার আগে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমাকে বিকালের খেলাধুলার পর বাড়িতে ফিরিতে হইত গ্যাসের বাতি জ্বালার আগে মায়ের কড়া হুকুমে। ম্যাট্রিক দিবার পর হেদুয়ার আড্ডা হইতে সন্ধ্যা হইতেই উঠিয়া পড়িতেছি দেখিয়া দাদার প্রশ্ন—"কোথায় যাচ্ছিস ?" উত্তর দিলাম—"বাড়ি।" দাদার নির্দেশ আসিল—"বোস। দেরি হলে একদিন বকুনি খাবি দ্বিতীয় দিনও খাবি তারপর থেকে আর কেউ বকবে না।" জীবনে এই আমার প্রথম মুক্তির আস্বাদ বাড়ির শাসন হইতে। কিন্তু দাদার মুক্তির আদেশে শাসনের বাঁধনও কম ছিল না। সপ্তাহে তিনদিন শ্রমজীবীদের নাইট স্কুলে পড়াইতে যাইতে হইত, সন্ধ্যায় আড্ডার মোহে আটক থাকিবার জো ছিল না। সে যাই হোক বি-এস-সি পরীক্ষার গণিতে অনার্সের পালা চলিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থী। তিনি তখন প্রায়ই খালি গায়ে একটা চাদর চড়াইয়া আসিতেন। প্রথম দিনের পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন? সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, চারিদিকে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের দেখা নাই। আমি ভাবিতেছি, একবার তাঁর বাড়িতে গিয়া দেখিয়া আসিব কিনা। এমন সময় দেখা গেল দাদাকে। তাঁর এমন বিশীর্ণ বিষণ্ণ চেহারা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমরা নির্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া তিনি-ই বলিলেন—"আমি সব কটা অঙ্ক কষতে পারি নি। এই প্রথম পরীক্ষার হল থেকে অঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি।" কী শুষ্ক, করুণ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। পরে জানা গেল, কেম্‌ব্রিজের সিনিয়র র‍্যাংলার পরাঞ্জপে সাহেব এমন কঠিন ও দীর্ঘ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও তিন ঘণ্টার মধ্যে ৭৮ নম্বরের বেশি উত্তর করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু ইহার বৈপরীত্যে একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের এম-এস-সি পরীক্ষার ফলপ্রকাশে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কমনরুমে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি দাদা সেখানে। তিনি তো তখন আর কলেজের ছাত্র নন, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি এখানে কি কাজে?' জানিতে পারা গেল একটু পরে যে তিনি আসিয়াছিলেন ইউনিভারসিটি অফিসে মার্কশীট্ নিতে। খুলিয়া পড়িয়া দেখি—অবাক কাণ্ড! আটটি পেপারের দুটিতে ফুল মার্কস, আর দু-একটিতে ৯৬-এর কাছাকাছি, সবচেয়ে নিচু নম্বর হচ্ছে ৮৮। এই মার্কশীট্ এখন কোথায় আছে জানি না, ইহাকে আমি আর কখনও দেখি নাই, বা এই প্রসঙ্গে কোনো কথা কারো কাছে শুনি নাই। ইহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইলে, জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে করা উচিত নয় কি?

এই দলিলটিকে উদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ-এর জীবন-সংক্রান্ত অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দলিল বোধ হয় চিরকালের মতো নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এটি আমি একদিন দেখিয়াছিলাম মেসোমশায়ের কাছে। পরে খোঁজ করিয়া জানিয়াছি যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন সেটি তিনি কোথায় রাখিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের যখন নামকরণও হয় নাই, তখন একজন অখ্যাত গণৎকার এই 'নবজাতকের' সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াছিলেন যে, তাহার হইবে অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রচুর খ্যাতি, কিন্তু তাহার চক্ষু হইবে চিরকাল রোগগ্রস্ত। এটুকু লেখা ছিল একটুকরা কাগজে। দাদাও বোধ হয় এটিকে কখনও দেখেন নাই, বা দেখিলেও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টির এই দুর্বলতা না থাকিলে দাদা হয়তো একজন নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়ও হইতে পারিতেন, এ কথা ভাবিয়া আমার খুব মজা লাগে। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে দাদার সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্ল রায়, যিনি পরে সিনেমা জগতে বিখ্যাত হন। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন কলেজ ফুটবল টিমের একটি প্রধান স্তম্ভ। শুধু তাই নয়, এরিয়ানস্ ক্লাবের ফরওয়ার্ড-খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম ছিল বাংলাদেশে সুবিদিত। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যবর্তী মাঠটিতে তখন বিকালে ফুটবল খেলা হইত। হঠাৎ দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র দুপুরবেলায় কাজের রুটিনে ফাঁক থাকিলে ফুটবল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সত্যেন বোস ও প্রফুল্ল রায় দুজনেই ছিলেন এই দলে। প্রফুল্ল রায় দাদার কাছে আসিতেন পড়াশোনা করিতে ও গল্প করিতেনও প্রচুর। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'সত্যেন, তুই অবাক করলি; তুই গোলকীপার থাকলে

গোল দেওয়া খুব কঠিন, এ আমি দেখেছি। আশ্চর্য তোর পজিশনের জ্ঞান।' পরে উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, 'তবে আমাদের একটা সুবিধা আছে। কোনোক্রমে ধাক্কা দিয়ে তোর চোখের চশমাটা ফেলে দিতে পারলে হয়। তখন তো তুই একদম অন্ধ।' এই ফুটবল খেলায় দাদা বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এ দুপুরে-মাতন বেশি দিন টিকিল না। প্রিন্সিপ্যাল জেমস্ কড়া নোটিশ দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, স্কুলের ও কলেজের পড়ানোর কাজে ব্যাঘাত হয় বলিয়া।

এই হেয়ার-গ্রাউণ্ডেই সত্যেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রকাশ্য রূপ আমরা দেখিয়াছি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন এক ছাত্রকে, যিনি তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, ফিজিক্সের অধ্যাপক হ্যারিসন সাহেব অকস্মাৎ অপমান করিয়া বসেন। খবরটি প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা কলেজের ছাত্র-ধর্মঘট ঘটিয়া গেল। আমি তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রায় নবাগত ছাত্র। দেখিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতেছেন এই জাতীয় অপমান সহ্য না করিতে। সারা দিনের শেষে হ্যারিসন সাহেব নতি স্বীকার করায় ব্যাপার সেই একদিনেই চুকিয়া গেল। কিন্তু জেমস্ সাহেব সতর্ক হইয়া কতকগুলি নিয়ম-কানুন প্রচলন করিলেন যাহাতে পরে "ওটেন-কাণ্ডের" পথ প্রশস্ত হইল। ওটেন-কাণ্ড যখন ঘটিল ১৯১৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রজীবন শেষ হইবার পর্বেই এম-এস-সি পড়িতে পড়িতে দাদার বিবাহ হয়। মেসোমশায়কে বেশির ভাগ সময় থাকিতে হইত কলিকাতার বাহিরে, মাসিমার শরীর প্রায়ই থাকিত অসুস্থ। তাই মায়ের কথা সত্যেন্দ্রনাথ ফেলিতে পারিলেন না। কন্যা নির্বাচনে পাত্রের মতামতের প্রশ্ন—পাত্রীর কথা দূরে থাক—তখনও সমাজে প্রকট হইয়া ওঠে নাই। সত্যেন্দ্রনাথও তোলেন নাই—যদিও তিনি ইবসেন, রোলাঁ, গোর্কি সাহিত্যে মশগুল ছিলেন। তখনকার যুবক সমাজের সামনে বরপণ-প্রথাই ছিল সবচেয়ে বিকট পারিবারিক প্রশ্ন। দাদা কন্যা নির্বাচনে মাসিমাকে সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিয়া একটি শর্ত না করিয়া পারিলেন না যে যৌতুক হিসাবে একটি পয়সাও দাবি করা চলিবে না। আমি জানি, তখন এক কন্যাপক্ষ কুড়ি হাজার টাকা (তখনকার দিনের) লইয়া সাধাসাধি করিতেছিল। কিন্তু মাসিমা নিরুপায়, যেহেতু এ বিষয়ে দাদা অটল। দাদার মতো মাতৃভক্ত ছেলের কাছেও মাসিমাকে হার

স্বীকার করিতে হইল, কারণ সামাজিক ন্যায়-বিচার ছিল দাদার দিকেই। দাদার শ্বশুরমহাশয় এ হেন সুপাত্রকে বিনা যৌতুকে পাইয়া খুশি হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তবে যখন তিনি শুনিলেন যে বিবাহের রাত্রে বরানুগমনে আসিবে আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়াও পাত্রের বন্ধুগোষ্ঠী কমপক্ষে দুইশত জন, তখন, ডাক্তার মানুষ তিনি, তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল এই প্রতিভাবান যুবকটি প্রকৃতপক্ষে সুস্থমস্তিষ্ক কিনা। কে না জানে প্রতিভার সহিত উন্মাদরোগের সম্পর্ক খুব দূরের নয়। অথচ আমরা যারা সত্যেন্দ্রনাথের নিকটস্থ লোক আমাদের পক্ষে, তার বন্ধুসংখ্যা এর চেয়ে কম করিয়া ধরাই ছিল অস্বাভাবিক— যুবক মহলে এমনই ছিল তার জনপ্রিয়তা। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। মেসোমশায় আসিয়াছেন ছেলের বিবাহ দিতে, আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব পাঠানোর ব্যবস্থা হইতেছে। এমন সময় পুরানো ঘটক আসিল খোঁজ লইতে দাদার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে কিনা। এ সেই ঘটক যে কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত কন্যাপক্ষের লোক। সে আসিয়া দেখিল তত্ত্ব পাঠানোর আয়োজন হইতেছে। তাহাতে সে 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। মেসোমশায়-এর এক রসিক আত্মীয় বলিয়া উঠিলেন—'দুঃখ করছেন কেন ঘটকমশায়, আরো পাঁচ হাজার টাকা চড়িয়ে দিন না, তাহলে আমরা এখনই তত্ত্বের ঠিকানা বদল করে দিই।' ঘটক মহাশয় সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—'সত্যি বলছেন, তাহলে আমায় আধ ঘণ্টাটাক সময় দিন, আমি একটিবার জিজ্ঞাসা করে আসি।' আত্মীয়ের এই বদ-রসিকতায় মেসোমশায় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঘটককে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে তাঁর ছেলে-বেচার ব্যবসায় নেই, ও ভদ্রলোকের কথার নড়চড় হয় না। তত্ত্ব যথাস্থানে পৌছিল, ও যথানির্দিষ্ট দিনে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল।

ছাত্রজীবন শেষ হইলেই প্রশ্ন ওঠে জীবিকার। পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ সাফল্যের পর সরকারি চাকুরির কোনোরকম সম্ভ্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু শৈশকালের স্বদেশী আন্দোলনের জলন্ত অনুপ্রেরণা দাদাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ সেবাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন শুরু হইয়াছিল আশুতোষের নেতৃত্বে। কেবলমাত্র পরীক্ষা-পরিচালক প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনিভারসিটির রূপান্তর হইতেছিল উচ্চতম জ্ঞানানুশীলনের ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্রে। প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিবান তরুণ

যুবকদের এই বিরাট প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত করা আশুতোষের দূরদৃষ্টির অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এম-এস-সি পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় গণিত ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষণের কাজে নিযুক্ত হইলেন। তাঁর জীবনের একটি প্রধান সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। এজন্য আশুতোষের নিকট সত্যেন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। কিন্তু আদর্শ-নিষ্ঠ জীবনের পথ কোনো দিনই মসৃণ হইতে পারে না। কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন জীবনে আশুতোষের পরিচালনার কোনো কোনো ত্রুটি সত্যেন্দ্রনাথের চোখে পড়িলে তিনি সমালোচনা চাপিয়া যাইতে পারিতেন না। আর অপরের দৃষ্টি হইতে সত্যেন্দ্রনাথের ত্রুটি ছিল এই যে, তাঁর সমবয়সী অন্যেরা যখন গবেষণার ফলে নানা বিষয়ে 'ডক্টরেট' উপাধি অর্জন করিতেছেন সত্যেন্দ্রনাথ থাকিয়া যাইতেছেন শুধুমাত্র এম-এস-সি। অনেকের ধারণা হইত তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমী নন, তাঁর শক্তি আছে কিন্তু তিনি আড্ডাবাজ। তাঁকে দেখা যাইত হয়তো কোনো বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়া কলিকাতার পথে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া যাইতেছেন গল্প করিতে করিতে। তিনি তাস ও দাবা খেলেন। ধূমপানে অভ্যস্ত, এসরাজ বাজান। আর সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের নানা গ্রন্থ ফরাসী, ইতালীয়ান ও জার্মান ভাষায় পড়িয়া বিজ্ঞানের অবহেলা করেন। সত্য কথা বলিতে কি এ অভিযোগ আমার মনেও কোনো দিন ওঠে নাই বলিতে পারি না। কিন্তু দাদার খুঁত-ধরা ছিল আমার স্বভাব ও শিক্ষার বিরুদ্ধে। তবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার মনের ভাব তিনি ধরিয়া ফেলেন। আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, তিনি সেদিন আমায় বলিয়াছিলেন—'দেখ, জ্ঞানের রাজ্যে এখন একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন চলছে। কোনো বিষয়ের জ্ঞানকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান থেকে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। গণিত, চট্ করে করা পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন—এদের শিকড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই, ভালো কিছু করতে গেলে অনেক জানতে হয়, গভীরভাবে ভাবতে হয়। তার জন্যে সময় লাগে।" কথাগুলি তিনি আমায় বলিয়াছিলেন একেবারে সাধারণ সুরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসির সহযোগে। কিন্তু আমার মন তখনই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে অল্প কয়েক বছর কাজের পর সত্যেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন ঢাকায়—পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার-এর পদে যোগ দিতে।

প্রোফেসার পদে রহিলেন মিঃ জেন্‌কিন্‌স্‌, যিনি পরে বাংলাদেশের ডি-পি-আই হইয়া যান। এখানে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, তিনটি বিষয় লইয়াই যথাসাধ্য মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনীষার ফল প্রকাশ্যে দেখা দিতে বিলম্ব হইল না। টাইপ-করা পাঁচ-ছয় পাতার একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠাইয়া ছিলেন ইংরেজিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিখ্যাত মুখপত্র ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে, যাহাকে সংক্ষেপে বলা হয় ফিল-ম্যাগ। ঢাকা নামক অখ্যাত ইউনিভারসিটির এক অখ্যাত শিক্ষকের এই প্রবন্ধ ফিল-ম্যাগের কৌলীন্য-দৃপ্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ আপন প্রবন্ধের কপি সরাসরি পাঠাইয়া দেন আইনস্টাইনকে। জগৎ-বরেণ্য বিজ্ঞানী তৎক্ষণাৎ ইহাকে জার্মান ভাষায় স্বয়ং অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন 'টসাইটশ্রিফ্‌ট্ ফ্যর ফিজিক্'-এ, এই মন্তব্যসহ যে প্রবন্ধটিকে তিনি মনে করেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি জটিল সমস্যার এক দ্যোতনাময় সমাধান। ইংরেজিতে প্রকাশিত না হওয়ায় এ দেশের বিজ্ঞানীমহলে তাহা প্রায় অখ্যাতই রহিয়া গেল।

ঢাকা ইউনিভারসিটির সংবিধানে ছিল যে উন্নততর জ্ঞানানুশীলনের জন্য কোনো প্রোফেসর বা রীডারকে বৃত্তি দিয়া বিদেশে পাঠানো যাইবে দু বছরের জন্য। কাহাকে পাঠানো হইবে এই প্রশ্নের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথই নির্বাচিত হন। ভাইস চান্সেলর মিঃ হার্টগ এই সিদ্ধান্ত সত্যেন্দ্রনাথকে জানাইবার সময় আভাস দেন যে যদিও বৃত্তি বিষয়ে এমন কোনো শর্ত নাই, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের উচিত কোনো ইওরোপীয় ইউনিভারসিটির ডক্‌টর হইয়া ফেরা, কারণ তিনি এ পর্যন্ত গবেষণা জাতীয় কোনো কৃতিত্ব দেখান নাই। সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁহাকে দেখান আইনস্টাইনের মন্তব্য। মিঃ হার্টগ জার্মান জানিতেন, তাই আমতা আমতা করিয়া বলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন।" সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতির সূত্রপাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ঢাকার সহিতই জড়িত রহিয়াছে তাঁর জীবনের এক শোচনীয় দুর্ঘটনার স্মৃতি। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র সবে হাঁটিতে শিখিতেছে এমন সময় ফুটন্ত গরম দুধের কড়ার ভিতর পড়িয়া যায় ও নাভিকুণ্ড পুড়িয়া যাওয়ায় অচিরে প্রাণত্যাগ করে। মাসিমা তাহাতে বৌদিদি সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কারণ তাঁহার ধারণা হয় বৌদিদির অনবধানতাই এই শোকাবহ ঘটনার মূল কারণ। বৌদিদি মানুষ হিসাবে খুবই ভালো, কিন্তু সাংসারিক গৃহিণীপনায় তার

কুশলতার অভাব ছিল। আর মাসিমা ছিলেন অতিমাত্রায় সুগৃহিণী। আপন হৃদয়ের বিশালতা দিয়া দাদা দুই বিরুদ্ধপক্ষের শোকের গভীরতা আত্মস্থ করিতে পারায় সংসারে শোকের মধ্যেও শান্তি অব্যাহত থাকে।

ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও গভীরতর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রবন্ধ ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচারিত হইয়া গেল। ইহার সিদ্ধান্তগুলির সহিত আইনস্টাইন এবারে একমত হইতে না পারায় বিজ্ঞানজগতে দেখা দিল তীব্র বিতর্ক। ঢাকা হইতে তোড়জোড় করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে পৌঁছাইয়া দেখিলেন তাঁহার খ্যাতি আগেই প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। মাদাম কুরি-র লেবরেটরিতে তিনি সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়া গেলেন বিনা চেষ্টায়। ফরাসী ভাষা তিনি পড়িতে পারিতেন প্রায় ইংরেজির মতো স্বচ্ছন্দে, কিন্তু এ দেশে কথা বলার সুযোগ ছিল না। সেখানে তাঁহার মুখ ফুটিল এক নূতন ভাষায়। দু বছরের ছুটির এক বছর কাটিল প্যারিসের বিজ্ঞানী মহলে। তাঁহার হৃদয়বত্তার গুণে তিনি অনেকের পারিবারিক বন্ধু হইয়া উঠিলেন, যাঁহারা এখনও তাঁহাকে ভোলেন নাই। প্যারিস হইতে গেলেন বার্লিনে। ইংলণ্ডে যাইবার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। বার্লিনের হোটেল হইতে টেলিফোনে আইনস্টাইনকে জানাইলেন যে, তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ও বিশ্ববিজ্ঞানের সর্বাগ্রগণ্য পুরোহিতের তিনি দর্শনার্থী। আইনস্টাইন টেলিফোনেই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল বিতর্ক-বিচার। আবার ভাষা বিভ্রাটের পালা। জার্মান বলার অভ্যাস তো সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। এখানেও আইনস্টাইন তাঁহাকে সাময়িকভাবে তাঁহাদের সর্বোচ্চ আলোচনা সভার—কলোকিয়াম্-এর—সম্মানিত সভ্য করিয়া লইলেন। এখানেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তিনি হইয়া উঠিলেন পারিবারিক বন্ধু।

বার্লিনে থাকিতেই সত্যেন্দ্রনাথ খবর পাইলেন যে মিঃ জেনকিনস্ ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন কলিকাতায়। তাঁহার শূন্যপদের জন্য প্রার্থী ডাকা হইবে কেবল ভারতে নয়, বাহিরেও। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক শুভার্থী লিখিয়া পাঠাইলেন, সত্যেন্দ্রনাথ যেন আবেদনপত্র পাঠান ও সেই সঙ্গে অতি অবশ্য একখানি সার্টিফিকেট—আইনস্টাইনের। আবেদন পাঠাইবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ বাধ্য হইলেন আইনস্টাইনকে ব্যাপারটা বোঝাইয়া বলিতে। আইনস্টাইন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি বিজ্ঞানের যে কাজ করেছ

তাই কি যথেষ্ট সার্টিফিকেট নয়? পরে শুনিয়াছি, দাদার মুখে নয়, আইনস্টাইন নাকি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার এ দেশে আসায় আমরা উপকৃত হইয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথ এ দেশে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ যান জার্মানিতে ও আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট ভারতীয় গণিতবিদ্ বোসের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এ বোস যে কে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই। আইনস্টাইন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই বোস এমন একজন গণিতবিদ যাঁহার প্রতিভায় যে-কোনো দেশ গর্বিত হইতে পারে। দেশে ফিরিয়া ররীন্দ্রনাথ এই বোসকে খুঁজিয়া বাহির করেন ও আমন্ত্রণ করেন শান্তিনিকেতনে। এই আলাপ পরিচয়ের ফলেই 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর ভূমিকা।

দাদা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গল্প রচনার আজন্ম ভক্ত। 'কথা ও কাহিনী' ও 'চয়নিকা'-র বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। মনে আছে তাঁর কাছে আমি 'গোরা' পড়িয়াছিলাম এক অভিনব প্রথায়। যেখানে যেখানে আছে গোরা ও বিনয়ের তর্ক, সেখানে একপক্ষের যুক্তি পড়ার পর বই মুড়িয়া ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে অন্যপক্ষের খণ্ডন কি হইতে পারে। তা ছাড়া, 'সবুজপত্র' প্রকাশের সময় প্রমথ চৌধুরীর ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে যে আসর বসিত দাদার সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল নিয়মিত। মাঝে মাঝে আমিও সেখানে গিয়াছি আমার ছাত্রাবস্থায় দাদার অনুচর হইয়া। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'-র আসরেও গিয়াছি তাঁহার সঙ্গে। কিন্তু তাঁহাকে কখনও আগাইয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিতে দেখি নাই। দেশে থাকিতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহাকে না চেনার ইহাই ছিল প্রধান কারণ।

অথচ একদিক দিয়া দেখিলে দাদাকে বলা যায় কবিগুরুর ভক্ত—একলব্যের মতো। দাদা তো কেবল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নন, তিনি মনে-প্রাণে দেশসেবী, বাংলাভাষী সমগ্র জনসাধারণের আপনজন। এই বাঙালী জাতির সুখদুঃখ তাঁর ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের চেয়ে গভীরতর। বাঙালী জাতিকে যে ভালোবাসে সে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি না করিয়া পারে না। তাই দাদার মনন ও চিন্তা কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জটিল অঙ্কের মধ্যে আটকাইয়া থাকিতে পারে নাই, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে বিশাল সামাজিক বিবর্তনের কর্মপ্রবাহে। আজ বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা—শিক্ষার দুরবস্থা। ইহার

পদ্ধতিতে আবশ্যক আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রধান রূপ হওয়া উচিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন নয়, আমাদের সামগ্রিক চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ও প্রসার। 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রচেষ্টার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' তাহারই প্রতিষ্ঠানগত রূপ। ইহা কোনো ন্যাশনাল লেবরেটরির বা ইনস্টিটিউটের বাঙলাদেশীয় সংস্করণ নয়। বাংলাভাষী শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি ইহাকে তাহার নিজস্ব কীর্তি বলিয়া গ্রহণ করে ও লালন করে তাহাতেই হইবে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার উপযুক্ত সার্থকতা।*

* আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—বর্তমান প্রবন্ধটি তাহা হইতে গৃহীত।—সম্পাদক, **পরিচয়**।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞানের সঙ্কট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্প বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদের জন্য কার্যকরী হতে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকরা জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়মকানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে লাগান যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে, ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কিনা, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের তারকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট বড় সব জিনিসের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে

মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু' বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে, শত্রুব্যূহের মধ্যে কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা জড়পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এ-সব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানবমন ব্যগ্র ছিল। বহু দিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণীদেহের উপাদান-সমূহ সবই ঐ আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণস্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরি করে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সব জিনিস জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে সব জিনিস তৈরী করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃসংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এটি যে, দৃশ্যতঃ কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ুস্বভাব মূলতঃ পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলেছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কিনা। রাসায়নিক বিরানব্বইটি আদি বস্তুর আবিষ্কার করেছে সে কথা আমি আগেই বলেছি। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে, টমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদি

বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ বিরানব্বইটি আদি বস্তুও আবার দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেকট্রন। প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকমের জড় পদার্থের মূলে বিরানব্বইটি আদ্য ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, আদি বস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুইটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই যোজন মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌর জগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাজির সমাবেশ গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতি তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভীতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশি। এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন বিরাজমান। রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন এবং এই গঠনপ্রণালীর ফলে যে আদি বস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচে নি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিকেরা আবার

কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা আমাদের এ-স্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যত ঘন কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি বলে প্রতীয়মান হল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে; এই চিরচঞ্চল অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাতে ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য সহবস্থায় কারণস্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতুযষ্টির একপ্রান্ত রাখলে আগুনের বাইরে অন্য দিকও যে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, এর কারণ, তাঁদের মতে, অনেকটা এই, অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হয়ে উঠে, সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশ ঘাতপ্রতিঘাতে বাহিরের দিকে সংক্রামিত হয়। উত্তাপের পরিমাণ বস্তু অণুদের চাঞ্চল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা উত্তাপভেদে বস্তুর যে অবস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গতির তারতম্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম-সমূহ এই ক্ষেত্রে খাটান যায় কিনা, সে বিষয়েও আলোচনা শুরু হল এবং তাতে তাঁরা কতকটা কৃতকার্যও হলেন। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে নিউটন গতিবিজ্ঞান যে রকম করে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগান গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে সেই নিয়মগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে লাগান একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড় বস্তুর অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্যে সেই বস্তুগুলির উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দরকার। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্ত্বেও গতিবিজ্ঞান যে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারে বলে আমরা মনে করে থাকি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মুখ্যতঃ এই—বহু কোটি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড় পদার্থ। জড় পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটির অবস্থানের সঠিক খবর জানা বিশেষ দরকার হয়, সাধারণ কয়েকটির আচরণ আমরা গতিবিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই বলতে পারি, অনেক সময় উত্তাপবিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেমন একটি দেশে—যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশের আর্থিক হিতাহিত ও জন্মমৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণত নির্ভর করে সে দেশের জলবায়ুর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই

অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে এবং সে সকল বিষয়ে আমরা যেমন একটা হিসাব-নিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুসমষ্টির গতিবিধির নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম।

নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মকানুনের মতো অমোঘ, এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ ও স্থূল জড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনার সহিত ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম ধারণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ-বৈজ্ঞানিক নিয়মই ঐ রকম অনতিক্রমনীয় ও অটল হবে। কিন্তু উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে যে সে নিশ্চয়তা খাটে না, তা আগেকার কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যায়। পরমাণু অতিক্রম করে আজ যখন বৈজ্ঞানিকরা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড়জগতকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত হবে না যে, আজ তাঁরা বিদ্যুতের আদি ধর্ম থেকে যে সব জাগতিম নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে উপনীত হচ্ছেন সেগুলিকে আর জ্যামিতিক নিয়মের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসান সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগুলি নিয়মরূপেই সেগুলিকে দেখতে হবে। জ্যামিতিক নিয়ম ও পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলি নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা আরো বলার ইচ্ছা রইল।

ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতি সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরো ছোট প্রোটন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও আকৃতি আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশি যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে, আলোককে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গ বিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্রের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার নামে

একটা বিচ্ছেদহীন অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু ও বিদ্যুৎকণা সেই ঈথার-সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথার-সমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোটবড় নানা রকমের ঢেউ উঠতে পারে এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আলোর বর্ণভেদের কারণ ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যে-সকল ঢেউ-এর স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। ঈথারের তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশপথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে এক স্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্যে বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ। এগুলি আলোকের ঢেউ-এর চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জনরশ্মি আজকাল রোগনিদানের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ওই ঈথারের তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোর ঢেউ-এর তুলনায় অনেক ছোট।

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ও পৃথিবীর মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথার সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করে রেখেছে। ঈথার তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র তারা নীহারিকা থেকে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, সে শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার পথে আনীত সূর্যের কিরণরাজি। আলোকতরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড় পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথারতরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন-ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণেই যে জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্মী জড়ের বিকাশ হয়েছে ও তার লীলাখেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাত ও আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে ক্রমোন্নতির ও বিকাশের কথা বলেছি তা নিউটন থেকে আরম্ভ করে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মানবপ্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে

গণিতকারেরা গতিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ওই গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ; ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি গতিবিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যার যে দু-একটি উত্তর তখনো মেলে নি; তার জন্য তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী, নিয়মগুলি কিন্তু সর্বকাল ও সর্ববিষয়েই প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে সেই জন্যেই তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতো ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন; নিয়মমাত্রেই ওই একই পর্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রনবাদের উদ্ভব হল, যখন উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে পেলেন। তখন ওই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে বিষয় চিন্তা করতে শুরু করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষ করে, এই সব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল। আলোকবিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয়সঙ্কটে এসে পড়লেন। অন্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যে সব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, সেগুলি পরীক্ষার ভুল বলে সাব্যস্ত হল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে আলোকতরঙ্গের সহিত পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে, তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে ১৯০০ সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum theory বা শক্তিকণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটি এই। যদিও আলোকবিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে, পরমাণু আলোকতরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টিকালে পরমাণুর কার্যশক্তি ঈথারে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ করা যায় না। আলোকপথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে

বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মতো কল্পনা করা চলবে না। যাকে এতদিন অল্পায়তন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বলে ভেবে আসা হচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোকতরঙ্গকে ঢেউ সমষ্টি বলে কল্পনা করলে ভুল হবে, কারণ অনেক সময় সেটি ঠিক জড়ের মতো কণাসমষ্টিরূপেই ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারৎ খাড়া করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো করে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরি করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস, সে বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ও সময়নির্দেশ সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ এই মাপজোপের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, আমরা যখন সেগুলির মাপজোপ করি, তখন কি কি প্রচ্ছন্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায়, নিত্যনতুন আবিষ্কারের লালসায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত জিনিসকে বিশেষ বিচার না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, এখন বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করতে। এই বোঝাপড়ার বিষয়ে পরে কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

[পরিচয়, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৮ হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের এটি প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা রচনা।]

বিজ্ঞানীর নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ

১৯৬৩ সালের ১০ই অক্টোবর, যেদিন মস্কোতে জলে, স্থলে ও উর্ধ্বাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, সেদিন নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি ঘোষণা করলেন ১৯৬২ সালের শান্তি পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন অ্যামেরিকার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লাইনাস কার্ল পাউলিং। ১০ই ডিসেম্বরের স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এই পুরস্কার তিনি গ্রহণ করলেন। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে, তার পরীক্ষাও এ বৎসরে পরীক্ষা বন্ধ চুক্তির জন্য আন্দোলনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিজ্ঞানী পাউলিং এই শান্তি পুরস্কার পেলেন।

অধ্যাপক পাউলিং একমাত্র পুরুষ যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে রাসায়নিক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে একজন মাত্র মহিলা দুবার নোবেল পুরস্কার (পদার্থ বিজ্ঞানে ও রসায়নে) পেয়েছিলেন, তিনি হলেন পোল্যাণ্ডের মেরি কুরী।

পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা ও অস্ত্রনির্মাণ নিষিদ্ধকরণের সংগ্রামে অধ্যাপক পাউলিং যে বিপুল সাহস ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান পৃথিবীতে তার তুলনা খুবই বিরল। কাজেই নোবেল কমিটি শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সবচেয়ে যোগ্য মানুষটিকেই পুরস্কৃত করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লাইনাস পাউলিং-এর মতো বোধ হয় আর কেউ এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন নি। অণুর গঠন এবং অণু গড়ে উঠেছে যে পরমাণুদের সমবায়ে, তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক সংযুক্তি (binding) সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণাবলীর মূলে পাউলিং-এর বিরাট অবদান রয়েছে। যাঁরা রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম জটিল তত্ত্ব 'কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের'

পদ্ধতিকে সর্বপ্রথম কাজে লাগিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই প্রচেষ্টার ফলে রাসায়নিক পদার্থবিজ্ঞান (chemical physics) নামে বিজ্ঞানের একটি সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। অণুর সংযুক্তি (molecular bonds) সংক্রান্ত তত্ত্বের জন্যে পাউলিং ১৯৫৪ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সাম্প্রতিক কালে পাউলিং বৃহৎ অণু বিশেষ করে আমিষজাতীয় পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী 'x-ray diffraction' পদ্ধতির সাহায্যে আমিষজাতীয় পদার্থের কেলাস (crystal) গঠন বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়া 'ব্যাধির রসায়ন' বিষয়ে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে তিনি কর্মরত এবং 'আণবিক জীব-বিজ্ঞানের' (molecular biology) সমগ্র ক্ষেত্র বর্তমানে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখকরূপেও পাউলিং-এর খ্যাতি কম নয়। তাঁর চারখানি বই The Nature of the Chemical Bond, General Chemistry, Quantum Mechanics (উইলসনের সঙ্গে যুক্তভাবে) এবং Line Spectra (গুড্স্মিতের সঙ্গে যুক্তভাবে) আপন আপন ক্ষেত্রে ক্লাসিকের পর্যায়ে পরিগণিত হয়ে থাকে।

পাউলিং বর্তমানে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

১৯৫৮ সালে পাউলিং No More War নামে একখানি বই লেখেন। পরমাণু বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোর অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বইটিতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ক্রমিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার ফলে মানবদেহের ওপর যে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবের সৃষ্টি হয়ে চলেছে, পাউলিং বিশদভাবে তা বর্ণনা করেন। তাঁর মতে শুধু ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যে পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা পৃথিবীতে ঘটেছে তারই ফলে প্রায় কুড়ি লক্ষের মত শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে এবং ক্রমিক ভাবে পরীক্ষা কাজ চালিয়ে গেলে ভবিষ্যত বংশ-ধরদের ক্ষেত্রে তার প্রভাব আরো ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। সরকারী বিরূপতার জন্যে সমগ্র আমেরিকায় বইটির কোনো প্রকাশক পাওয়া যায় নি।

১৯৫৮ সালে পাউলিং পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা পরিচালনার জন্যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

১৯৬০ সালে পাউলিং স্টকহোমে সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এবং পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের জন্যে তিনি যে আবেদনপত্র প্রচার করেন, তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন পৃথিবীর উনপঞ্চাশটি দেশের এগার হাজারেরও বেশি বৈজ্ঞানিক। 'অমার্কিন কার্যকলাপ অনুসন্ধান কমিটি' পাউলিংকে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বলে অভিযুক্ত করে এবং যে সব আমেরিকান বিজ্ঞানী আবেদনপত্র রচনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের নাম প্রকাশের জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেয়। পাউলিং সে কমিটিকে জানিয়ে দেন, তাঁকে এ জাতীয় প্রশ্ন করার কোনো অধিকার তাদের নেই। যে বাষট্টিজন প্রখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণের জন্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন, পাউলিং তাঁদের অন্যতম।

১৯৬২ সালে মস্কোতে নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যে বিশ্ব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি ছিলেন তার একজন প্রধানতম উদ্যোক্তা।

শুধু বিজ্ঞানীরূপে নয়, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একজন মহান ও অতন্দ্র যোদ্ধারূপে পাউলিং-এর অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬২ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন আন্তর্জাতিক রেডক্রস্ কমিটির চেয়ারম্যান সুইস নাগরিক মিঃ লিওপোল্ড পেরসিয়ার এবং রেডক্রস্ সোসাইটি লীগের কানাডীয় চেয়ারম্যান ডঃ জন মেকালে।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

তিনজন জার্মান বিজ্ঞানী একত্রে পদার্থবিদ্যায় ১৯৬২ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন পি. উইগনার, কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মারিয়া গোয়েপার্ত-মেয়ার এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হান্স ডি. জেনসেন। পুরস্কারের অর্থের অর্ধাংশ পাবেন অধ্যাপক উইগনার, অপর অর্ধাংশ বাকি দুজন।

উইগনার পুরস্কার পেলেন পরমাণুকেন্দ্রীন ও মৌলিক বস্তুকণিকাদের তত্ত্বপ্রণয়নে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্যে। গোয়েপার্ত-মেয়ার ও জেনসেন

পুরস্কার পেলেন পরমাণুকেন্দ্রীনের মণ্ডলাকৃতি গঠন বিষয়ে (shell structure) তাঁদের আবিষ্কারের জন্যে।

রসায়নবিদ্যায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক কার্ল জিয়েগলার ও ইতালীর অধ্যাপক গিউলিও নাট্টাকে। তাঁরা দুজনেই High polymer বিষয়ে তাদের আবিষ্কারের জন্যে এই পুরস্কার পেলেন।

চিকিৎসাবিদ্যায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার যুগ্মভাবে লাভ করেছেন দুজন ব্রিটন ও একজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী। তাঁরা হলেন কেম্ব্রিজের অধ্যাপক লয়েড হজকিন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রু ফিল্ডিং হাক্সলি ও ক্যানবেরার সার জন ক্যারু একেলস্। মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নতুন আলোকপাতের জন্যে তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনার প্রভাবে স্নায়ুকোষে যে বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, অধ্যাপক হজকিন ও হাক্সলি তার আংকিক সূত্র প্রণয়ন করেছেন। এই সূত্রাবলীর সাহায্যে স্নায়ুকোষের বিভিন্ন ঘটনাবলী পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। স্নায়বিক উত্তেজনা একটি স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে কিভাবে সঞ্চারিত হয়, একেলসের গবেষণায় সে বিষয়ে নতুন আলোকলাভ করা সম্ভব হবে।

শঙ্কর চক্রবর্তী

মহানগর

সত্যজিৎ রায়ের মহানগর দেখতে গিয়েছিলাম, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মনে কিছুটা সংশয় নিয়েই।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি বিচারের মানদণ্ড, সত্যজিৎ রায় নিজেই। সংশয় ছিল এই মানদণ্ডে মহানগর উৎরাবে তো ?

সত্যজিৎ রায়ের প্রায় ছবি সম্পর্কেই অবশ্য সমালোচক মহলকে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো মত পোষণ করতে দেখা যায়। মহানগর তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের অনুরাগী (বর্তমান লেখক যার মধ্যে পড়েন) তাদের মধ্যেও এবারে বিরূপ গুঞ্জন শুনতে পেয়েছিলাম, সংশয় জেগেছিল এই কারণেই। মহানগর দেখে সে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয়েছে বলতে পারলে খুশী হতাম। অথচ, মহানগর আমাকে হতাশ করেছে, একথা বললেও মিথ্যে কথা বলা হবে। বস্তুত পক্ষে সত্যজিৎ রায়ের যে কোনো ছবি অন্য বাংলা ছবির তুলনায় এত বেশি নিখুঁত যে—'হতাশ হয়েছি' সে ছবি সম্পর্কে একথা কিছুতেই বলা যায় না।

বলতে কি, মহানগরের টাইটেল দৃশ্য—ট্রামের ট্রলির বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া—মনে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। এবং ছবির প্রথমার্ধে সে প্রত্যাশা পূরনের আভাসও পেয়েছিলাম।

মহানগরের প্রথমার্ধ প্রায় নিখুঁত। সুব্রত-আরতি-প্রিয়গোপালদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারটি আশ্চর্য বাস্তব হয়ে উঠেছে। সত্যজিৎ রায় যে মানবমনের কত দক্ষ কারুশিল্পী তার পরিচয় পাওয়া যায় আরতির চাকরি পাওয়া এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর সংস্থান থেকে। সুব্রত, তার মা, প্রিয়গোপাল, বাণী, পিন্টু—প্রত্যেকের মনে আরতির চাকরি পাওয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কয়েকটি সংলাপ, কয়েকটি টুকরো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে—প্রত্যেকটি চরিত্র স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ঘটনা নির্বাচনে, দৃশ্যসংস্থানে, রূপকের মৃদু ব্যবহারে—আশ্চর্য সিদ্ধি অর্জন করেন সত্যজিৎ। মনে হয় না ছবি দেখছি—স্পন্দমান জীবনেরই যেন একটি টুকরো চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অবশ্য আজকের দিনে, ঘরের বৌ-এর চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে সংসারে এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কিনা তা নিয়ে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে। আর রেডিওর সংবাদে যখন শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে মুখ্যমন্ত্রী বলে উল্লেখ করতে শোনা যায় তখন ঘটনাকাল আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে বলেও এ-অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করা যায় না।

কিন্তু ছবির পরবর্তী অংশে সত্যজিৎ রায় যেন খেই হারিয়ে ফেলেন। যা ছিল একান্তভাবে পারিবারিক নাটক এবং পারিবারিক নাটক হিসাবেই যা শেষ হলে, মনে হয়, সার্থক হত—তাকে আপিসে টেনে এনে এবং আপিসের সংঘাতে আরতির চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌছতে গিয়ে সত্যজিৎ যেন অনিশ্চিত পা ফেলে এগোন। ঘরের আরতি যতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক বাইরের আরতি তা নয়। এবং সহকর্মীর অপমানে আরতির হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেওয়াটাও বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। এর জন্য দায়ী প্রধানত চিত্রনাট্য। ছবির প্রথম অংশে সত্যজিৎ প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন শেষ অংশে তা দেন নি। শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন—তার ফলে build-up অসম্পূর্ণ থেকেছে। শেষাংশ তাই একান্ত প্রক্ষিপ্ত মনে হয়, প্রথম অংশের সঙ্গে তার আত্মিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-ছবি সমগ্রভাবে শেষ পর্যন্ত তাই তৃপ্তি দিতে অপারগ হয়।

মহানগরের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার অভিনয়াংশ। প্রায় প্রত্যেকেই সু-অভিনয় করেছেন। কিন্তু বিশেষ করে মনে পড়ে প্রিয়গোপালের ভূমিকায় হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির মতো—এ-ছবিতেও শিশুচরিত্রগুলি আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। সত্যজিৎ রায়ই সম্ভবত একমাত্র পরিচালক যিনি শিশু-চরিত্রকে দেখেন শিশুর চোখ দিয়েই, বয়স্কের চোখে নয়।

প্রদ্যোৎ গুহ

চিত্রভাষা ও সমকালীন শিল্পী

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন ভারতীয় শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধে ('চৈত্র ১৩৬৯) কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন। পাঠক হিসেবে আমার নিজস্ব জবাব আমি পেশ করছি।

বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্য শ্রীমুখোপাধ্যায় চিত্রভাষার সমান্তরাল দৃষ্টান্তরূপে মাতৃভাষার প্রসঙ্গে এসেছেন। তাঁর মতে মাতৃভাষার মতো আপন চিত্রভাষার প্রতিও মানুষের নাড়ীর টান ও তাতে তার জন্মগত অধিকার আছে। এবং আপন মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ যখন আজও আমাদের দেশে প্রকাশ পাচ্ছে, ঠিক তখনি হঠাৎ চিত্রভাষায় আমরা বিপরীতরূপে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছি কেন? কিন্তু মাতৃভাষার সঙ্গে চিত্রভাষার একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকায় এই তুলনা যথার্থ নয় বলেই আমি মনে করি। একদিক থেকে, লেখ্য বা কথ্য ভাষার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে একপ্রকার স্থূল প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর। বাংলা হরফে যতদিন বাংলা লেখা হবে, বিদেশী শব্দের হাজারো আমদানী সত্ত্বেও বাংলা বাংলাই থাকবে। অ আ ক খ সহযোগে শব্দনির্মাণ করে যতদিন কথা বলব, ততদিন বাংলাতেই কথা বলব। কিন্তু ভাষা বলতে যদি বুঝি তার আন্তর রূপ, কথাশৈলী, আঙ্গিক ও পদবিন্যাস, তবেই চিত্রভাষার সঙ্গে তার তুলনা চলবে। ভাষার এই গুণগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে ও বহিরাগত ভাষার প্রভাবে যেমন নিয়তই বদলাচ্ছে, চিত্রভাষারও তেমনি অহরহ রূপান্তর ঘটছে। এবং তথাকথিত ভাষার চেয়ে চিত্রভাষা যে বেশি আন্তর্জাতিক একথা অনস্বীকার্য। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার যে দুরধিগম্য ব্যবধান যা বিদেশী ভাষা শিক্ষা বা অনুবাদ ব্যতিরেকে লঙ্ঘন অসম্ভব, সুকুমার শিল্পে তা অনুপস্থিত। অপরপক্ষে, ভাষার আন্তর রূপ, শৈলী, আঙ্গিক ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যে কি সুকুমার কলায় আবহমান কাল দেশ-বিদেশের মধ্যে যে নিরন্তর মালাবদল চলেছে তা সহজেই চোখে পড়ে। এই দিক থেকে আধুনিক একটি সার্থক বাংলা কবিতা এবং 'আন্তর্জাতিক' শৈলীতে আঁকা কোনো

বাঙ্গালী শিল্পীর একটি রসোত্তীর্ণ ছবি—এ দুয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ নেই। সুতরাং মাতৃভাষা ও চিত্রভাষার আপেক্ষিক কৌলিন্য ও বিশুদ্ধতার প্রশ্নটি এখানে অবান্তর।

শ্রীমুখোপাধ্যায় ইউরোপের নব্য চিত্র আন্দোলনের ভারতীয়করণের নিশ্চয়ই পক্ষপাতী এবং তিনি যার নিন্দা করেছেন তা বোধ হয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সমন্বয়ের অসামঞ্জস্য, চিত্রকলায় অতিরিক্ত ইউরোপপ্রীতির উগ্রতা। তিনি ১৩৪০ সালে অনুষ্ঠিত আর্ট রেবেল সেণ্টারের শিল্পপ্রদর্শনীকেই ইউরোপীয় শিল্পের ভারতীয়করণের প্রথম ও শেষ সার্থক প্রচেষ্টার সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য, নব্য ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে আজ নেতৃত্বের অভিমান ত্যাগ করার দিন এসেছে। এ-ক্ষেত্রে বোম্বাই-বরোদার দানও সামান্য নয়। প্রতিভাশালিনী শের-গীল থেকে শুরু করে অতি আধুনিক কালের বহু শিল্পী প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ধারার সুষ্ঠু সমন্বয়ে যে রসসৃষ্টি করে চলেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সব শিল্পীর ভারতীয়ত্ব বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনের পুরোধাদের মতো অতখানি স্পষ্ট নয়। "Our artists were never tiresomely reminded of the obvious fact that they were Indian; and in consequence they had the freedom to be naturally Indian in spite of all the borrowings that they indulged in." ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি উল্লেখিত শিল্পীবর্গের সার্থকতা অনুধাবনের সহায়ক। অজন্তার প্রাচীরচিত্রের দিকে তাকিয়ে যখন অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান শিল্পী "আহা কি সুন্দর!" বলে শস্তা অনুকরণে ব্যাপৃত, ঠিক তখনই শের-গীল তাঁর "বধূর প্রসাধন", "দক্ষিণ ভারতীয় গ্রামবাসী" প্রভৃতি চিত্রে অজন্তার আন্তর রূপ প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। আবার কোথাও বা ফরাসী শিল্পী pure colour বা শুদ্ধ রঙের সঙ্গে রাজপুত ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রের সমন্বয়সাধন করে ভারতীয় শিল্পে নব ইতিহাস রচনা করেছেন। বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায় প্রভৃতি শিল্পীর অবদান তর্কাতীত, কিন্তু এই সব হোতাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টায় যখন অসংখ্য শক্তিহীন শিল্পী রক্তহীন শিল্পরচনায় রত, ঠিক তখনই শের-গীলের ছবি প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের অনির্বাণ দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ও নবীনের এই সুসমন্বয় ঘটেছে শের-গীলের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তীকালের কয়েকজন প্রকৃত শক্তিমান

শিল্পীর মধ্যেও। মাতিস ও লেগারের শিল্প-শৈলীতে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের নারীমূর্তির মাধুর্য ও রোমান্সের যেমন সুষ্ঠু রূপায়ণ হয়েছে সিংহলী শিল্পী জর্জ ক্যেটের চিত্রে, তেমনি ভারতের লোক-সংস্কৃতি ও কৃষকজীবনের ভিত্তিতে এক নবীন শিল্প-সৌধ নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন কে. এস. কুলকারনি। অতি আধুনিক কালে গোয়ার শিল্পী লক্ষমন পাইয়ের চিত্রকলায় ইউরোপের দিকপাল শিল্পী মিরো ও ক্লির আঙ্গিকের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির সুমিশ্রণ ঘটেছে। বাংলাদেশে রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্যে মিশেছে ভারতীয় ভাস্কর্যের বলিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য আধুনিক মন এবং নীরোদ মজুমদারের চিত্রে রয়েছে ভারতীয় প্রাচীন পুরাণের দেবদেবী, কালীঘাটের পট আর ইউরোপীয় আঙ্গিকের এক অমৃত রসায়ন। এ ছাড়া সমসাময়িক কালে শিল্পীর সংখ্যা বিরল নয় যাঁরা শুধুমাত্র 'আন্তর্জাতিক' ভাষায় সার্থক চিত্রসৃষ্টিতে সক্ষম।

দেবব্রতবাবুর অপর একটি প্রশ্নের প্রসঙ্গ এখানে আসে। দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে সংযোগহীন এই আন্তর্জাতিক চিত্রভাষার কি সার্থকতা? 'আজকের ভারতে নিরক্ষরতা অপরিসীম, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যাবস্থা, বুভুক্ষু সংখ্যাতীত, দরিদ্র কৃষিজীবী প্রধান, শ্রমজীবী মুষ্টিমেয়' এবং অগণিত দেশবাসীর জ্ঞানবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে এ কোন আকাশকুসুম রচনা করছে বর্তমান শিল্প? আমার মনে হয়, এ-সমস্যা আজকের নয়, উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত ভারতীয় রেনেসাঁসের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই এই ত্রুটির বীজ নিহিত। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সংযোগহীন, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সেই নবজাগৃতি অনিবার্য কারণেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ভারতীয় মনীষা সেদিন পূর্ব-পশ্চিমের মহামিলনে এক অপরূপ সংস্কৃতির সৌধ গড়েছিল, দেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবী মানুষের অন্তরে তার রেশ-মাত্রও পৌছয়নি। তারপর সাধারণ শিক্ষার প্রসারের ফলে দেশের একটা বড়ো অংশ যখন শিক্ষিত হল, তখন তাদেরই বা কয়জন পেরেছে এই সংস্কৃতির পবিত্র শিখাটি দিয়ে আপন অন্দর আলোকিত করতে? মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিদেশী শস্তা মুখরোচক শিল্পের আমদানী, যান্ত্রিকতা, ব্যবসায়িকতা, বিকৃতরুচি—এই সব আচ্ছন্ন করেছে সাধারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের জীবন, যাদের কাছে, কি প্রাচীন ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য, কি নবীন সংস্কৃতির গরিমা সমানভাবেই আবেদনহীন, অর্থহীন। এই সংকটে চিন্তাশীল, সুস্থরুচি, বুদ্ধিজীবী এক

সম্প্রদায় সংস্কৃতির ব্যূহসৃষ্টি করে তার মধ্যেই আত্মগোপন করল। এঁদের ভাষা; এঁদের চিন্তা তাই সাধারণের বোধগম্য নয়, আবার সাধারণের রুচি, আকাঙ্ক্ষাকে এঁরা অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে চলেন। দেশের উচ্চমানের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সবই এই Elite-এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হল। এই insularity-কে একপ্রকার অদৃষ্ট ভেবেই আমরা বেঁচে আছি। দেশের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান মেনে নিয়েই আমরা সংস্কৃতি-চর্চা করি। দেশের অধিকাংশ মানুষ বুঝবে না বলে আমরা উচ্চমানের শিল্পানুশীলন থেকে বিরত হই নি।

এ সমস্যাটি আজ জগদ্ব্যাপী, এদেশের বা দেশবিশেষের, বোধ হয়, নয়। পৃথিবীর এক সংখ্যালঘু, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখানেই শিল্প-সমস্যার আন্তর্জাতিকতা। এবং এই থেকে যে একটি আর্জাতিক চিত্রভাষার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এই গতি ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের যুগে আজকের শিক্ষিত, সচেতন ভারতীয় শিল্পী পশ্চিমের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসতে পারে না। দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে দুনিয়ার শিল্প-ইতিহাস মনের পশ্চাদপটে রেখেই সে আজ ছবি আঁকবে। আসলে, শিল্পী তুলি ধরবে সচেতনভাবে ভারতীয় হবার উদ্দেশ্যে নয়, আন্তর্জাতিক সাজবার জন্যেও নয়, তার লক্ষ্য হবে আত্ম-রূপায়ণ। যেটুকু ভারতীয়ত্ব সৎ শিল্পীর মজ্জার মধ্যে আছে, তা নিজের অগোচরেই শিল্পের মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হবে। আবার, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলে যেটুকু আন্তর্জাতিকতা আপন রক্তের মধ্যে সে আত্মসাৎ করতে পেরেছে, তাও চিত্রপটে স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠবে। এবং তার শিল্পের উৎকর্ষ বিচার হবে তার অন্তর্লোক, রসদৃষ্টি ও সৃজনী কল্পনার মানদণ্ডে। নইলে যদি জাত্যাভিমান ভাবে আমিই দেবতা, বিজাতিপ্রীতি ভাবে আমি, তবে শিল্প-অন্তর্যামী মুখ-বুঁজেই হাসবেন।

মণি জানা, কলিকাতা

গ্রাম ও গ্রামীন অর্থনীতি

পরিচয়-এর নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, গ্রামের কৃষক ও গ্রামবাসীদের কথা, তাদের সমস্যা ও সমাধানের পথের বিষয়ে, কৃষি-অর্থনীতি সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি পরিচয়-এ প্রকাশ করুন। প্রচলিত

সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদ প্রসঙ্গে

A Philosophy of Man by Adam Schaff : Lawrence & Wishart.

মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটি সামাজিক দর্শন নয়, তা একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববীক্ষা, অতএব ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাসংক্রান্ত নীতিগত প্রশ্নেও এই দর্শনের দিঙ্‌নির্দেশ করতে পারা উচিত এই ধারণা যারা পোষণ করেন Adam Schaff-এর সাম্প্রতিক দর্শনগ্রন্থ A Philosophy of Man হাতে পেয়ে তারা আনন্দিত হবেন। বিষয়সূচীর উপর একবার চোখ বুলিয়েই বলা যায় যে এ-ধরনের বই মার্কসবাদী সাহিত্যে প্রথম না হোক অতীব বিরল। "সুখের সন্ধান", "জীবনের অর্থ", "রাজনীতি ও নৈতিক দায়িত্ব" এ-জাতীয় বিষয় সাবেকী মার্কসবাদী দার্শনিক গ্রন্থে বিশেষ স্থান পায় নি বলেই আমার ধারণা। বইটি পড়ে অবশ্য নিরাশ হতে হয়। নতুন যে বিষয়গুলিকে মার্কসবাদী বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার উপর যে কোনো গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয় পাঠকের তা নয়। বস্তুত কিছু সমস্যা উত্থাপনই করা হয়েছে, তাদের কোনো সম্যক আলোচনা করা হয় নি। গ্রন্থকারের নিজের ব্যক্তিগত মতামত জানতে পারা যায়, এই পর্যন্ত। তথাপি এই প্রাথমিক প্রয়াসের গুরুত্ব লাঘব করা উচিত নয়। বরং গ্রন্থকারকে অভিনন্দনই জানান উচিত দুঃসাহসের সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করার জন্য যা মার্কসবাদী দার্শনিকেরা এতদিন যাবৎ হয় উপেক্ষাভরে নয় ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেছেন। এই এড়িয়ে যাওয়ার ফল হয়েছে এই যে নানাবিধ বিজাতীয় ভাবধারা মার্কসবাদীদের চিন্তা ও নৈতিক আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। কারণ ভাবের ঘরে যদি চুরি সম্ভব না হয় তো সেখানে কোনো শূন্যতা (vacuum)-ও সম্ভব নয়। আমাদের দেশে মার্কসবাদ-পরিত্যক্ত ব্যক্তিগত জীবনের নীতি ও আচরণের ক্ষেত্র অধিকার করে বসে আছে সনাতনী হিন্দু আচার ও সংস্কার ও তার সঙ্গে কিছুটা বুর্জোয়া ইউরোপীয় আচার ও নীতি-ধারণার মিশাল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত নীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী মানুষের মধ্যে

বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই। এ-ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে এর কোনো গুরুত্ব এখনও স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার অ্যাডাম শাফ-এর সমস্যাটা এই যে পোল্যাণ্ডের ইনটেলেক্চুয়াল মহলে সম্প্রতিকালে এই শূন্যতাটা অধিকার করেছে অস্তিত্ববাদ, বিশেষ করে সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ। তাঁর গ্রন্থটি লেখার পিছনে মূল অনুপ্রেরণাই এই সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদের অভিযানের পথ রুদ্ধ করা। সার্ত্রের নিজের জবানীতে মার্কসবাদের যেখানে শেষ অস্তিত্ববাদের সেখানে শুরু। এখানে মার্কসবাদ বলতে সাবেকী মার্কসবাদ এবং অস্তিত্ববাদ বলতে সার্ত্রের দর্শন বুঝতে হবে। সাবেকী মার্কসবাদ ব্যষ্টির আলোচনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছে, তার ভিত্তিতে ইতিহাসের গতিবিচার করছে, কিন্তু ব্যক্তির সীমানায় এসে তা থমকে দাঁড়াচ্ছে। অস্তিত্ববাদের বিষয়বস্তু একক ব্যক্তি। সুতরাং অস্তিত্ববাদ মার্কসবাদীর কাছে গ্রাহ্য হোক আর নাই হোক, সাবেকী মার্কসবাদের মূলসূত্র অনুসারেই অস্তিত্ববাদের তাবৎ ইমারত একেবারে ধসে পড়ে না। কিন্তু শাফ-এর মত, এবং আমি তাঁর মতের সঙ্গে একমত যে, মার্কসবাদ একটি সম্পূর্ণ বিশ্ববীক্ষা। সাবেকী মার্কসবাদ যদি একক ব্যক্তিতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে তো সেটা তার অসম্পূর্ণতা। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের চাপে এই অসম্পূর্ণতা বোধযোগ্য ও ক্ষমার্হ হলেও আজ তা অতিক্রমণের সময় এসেছে। তাই সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদের খণ্ডনপ্রয়াসে শাফ সাবেকী তূণের থেকে শর সংগ্রহ না করে মার্কসবাদের মূল সূত্রের ভিত্তিতে নতুন একটি তত্ত্বের সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছেন যা ব্যক্তির জীবনপ্রশ্নের ও নীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই চেষ্টা সফল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না, সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদও নস্যাৎ হয় নি, কিন্তু তবু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উত্থাপন করা হয়েছে, সেজন্য শাফ-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাঁর যুক্তিতে ছিদ্র আবিষ্কার করার চেয়ে মূল্যবান নতুনত্ব যা যা আছে তার দিকেই বেশি মনোযোগ দেব।

শাফ-এর বইয়ে সর্বাগ্রে যা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় তা তাঁর মুক্তদ্বার মনোভঙ্গি। অস্তিত্ববাদের সমালোচনায় নেমে প্রথমেই তিনি যা স্বীকার করে নেন তা এই যে পোল্যাণ্ডের বহু শিক্ষিত মহলে যদি অস্তিত্ববাদ প্রভূত প্রভাব অর্জন করে থাকে তো তা ঐতিহাসিক কারণবিবর্জিত নয়। পার্টি নেতাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলে মনে করে বহুদিন যাবৎ যারা নিজেদের এবং

কখনও কখনও অপরেরও বিবেকের টুঁটি চেপে ধরে রেখেছিল স্তালিনীয় দুঃশাসনের ইতিহাস প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর স্বভাবতই তাদের অনেকের মনে আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে একক ব্যক্তি হিসেবে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে এবং সাবেকী মার্কসবাদ কোনো সাহায্য এই বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসুদের দিতে পারে নি। অস্তিত্ববাদই দর্শন হিসেবে প্রস্তুত ছিল ঠিক এই জাতীয় সমস্যার আলোচনার আধার হিসেবে এবং তার প্রভাব অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাফ-এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি এই যে অস্তিত্ববাদ সমস্যাহিসেবে যে সব বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাপৃত তা মার্কসবাদের কাছেও সমস্যা হিসেবে গ্রাহ্য। সাধারণ সূত্র হিসেবেই তিনি বার বার জোর দিয়ে বলেন যে ভ্রমাত্মক দর্শনও নির্ভ্রম দর্শনসমস্যার উত্থাপন করতে পারে। অস্তিত্ববাদ গ্রাহ্য না বলেই অস্তিত্ববাদ যে ধরনের সমস্যার উত্থাপন করে তা মার্কসবাদী দার্শনিকের প্রণিধান দাবি করে না এ-মত অগ্রাহ্য। মার্কসবাদী নিশ্চয়ই মনে করবেন যে মার্কসবাদই একমাত্র নির্ভুল দার্শনিক মার্গ কিন্তু একথা বললে হাস্যকর হবে যে এ-মার্গের উদ্ভাবনের আগে দুই সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ যত দর্শনচিন্তা ও আলোচনা হয়ে এসেছে—শুধু জড়বাদী নয়, ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী মার্গেও—তাতে বিষয় হিসেবে খাঁটি কোনো সমস্যা নেই!

শাফ-এর উদার মনোভাব প্রশংসনীয়, কিন্তু উদারতার ঝোঁকে তিনি একটু বেশিদূর চলে যান বলে মনে হয়। "জীবনের অর্থ কি", বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের স্থান কোথায়" ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্নের অবতারণা করে তিনি একই কালে মার্কসবাদী ও নিও-পজিটিভিস্টদের সমালোচনা করেন এই বলে যে তারা কখনও এ-জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চান নি, দ্বিতীয় বর্গের দার্শনিকেরা এদের উপ-সমস্যা (pseudo-problems) বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু উপ-সমস্যার ব্যাপারে নিও-পজিটিভিস্টদের বক্তব্যের প্রতি আংশিকভাবে হলেও আমি আস্থাশীল। "জীবনের অর্থ কি ?" জাতীয় প্রশ্নকে দার্শনিক প্রশ্নের সমগোত্র বলে নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া চলে না, "অর্থ" কথাটিই এখানে অর্থহীন এবং নিও-পজিটিভিস্ট যদি বলেন যে এ-জাতীয় জিজ্ঞাসার স্থান দর্শনে নয়, তার স্থান কাব্যে, শিল্পে, ধর্মশাস্ত্র ও পৌরাণিক উপাখ্যানে তো তাও মেনে নিতে আমার দ্বিধা নেই। শাফ নিজেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি এদের দার্শনিকসমস্যা হিসেবে আলোচনা

করার প্রচেষ্টায়। অনিবার্যভাবেই এদের প্রসঙ্গে অত্যন্ত ভাসা ভাসা রকমের কিছু কথাই বলেছেন মাত্র যা বলতে দর্শনশাস্ত্রে কোনো অধিকারের প্রয়োজন হয় না।

অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে শাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। সাবেকী নীতিতত্ত্বে নৈতিক সংকটের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এমন অবস্থার আলোচনা নেই যাতে ভালো-মন্দের মানভেদ থেকে উদ্ভূত হয় এমন সমস্যা যার কোনো নির্দিষ্ট সমাধান নেই, থাকতে পারে না। এ-জাতীয় to be or not to be-র সমস্যাকে দার্শনিক বিচারের কেন্দ্রে আনাকে অস্তিত্ববাদের একটি মূল্যবান অবদান বলে তিনি অভিবাদন করেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদ প্রশ্নটিকে ঠিকমতো তুললেও ভুলভাবে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে এ-কথাটি বার বার বললেও কখনই তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেন না। তাঁর প্রধান আপত্তি সার্ত্রের ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা সম্পর্কে। শাফ লেখেন, "সার্ত্রের মতে, কিছু কিছু আবশ্যিকতাকে পরিবেশ, জাগতিক নিয়মের আকারে ব্যক্তির উপর চাপায়। কিন্তু একই কালে, ব্যক্তিরাই ইতিহাস সৃষ্টি করে। তাঁর (সার্ত্রের) ডায়ালেকৃটিকৃটি হল এই ধরনের।" শাফ একে অত্যন্ত হীন ডায়ালেকৃটিক্ বলে অভিহিত করেন। কেন তা ব্যাখ্যা করেন না। অথচ সার্ত্রের উপর আরোপিত ধারণাটা মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় ধারণা বলেই আমরাও অনেকে মনে করে এসেছি। শাফ যান্ত্রিক জড়বাদের সমর্থন করছেন না। ব্যক্তি জড়শক্তিদের দ্বারা চালিত পুত্তলিকাবিশেষ তা বলছেন না। অপরদিকে সার্ত্রও একথা বলছেন না যে পরিবেশের প্রভাব মানুষ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে। সুতরাং শাফ ও সার্ত্রের মধ্যে মতভেদটা যদি শুধুই বাক্যনির্বাচনগত না হয়ে থাকে তো তা ঠিক কোথায় তা একেবারেই পরিষ্কার করে দেখানো হয়নি। একথা ঠিক যে পরিবেশের প্রভাবে সীমানা মেনে নেওয়ার পর ব্যক্তির নিজ আচরণের জন্য তার নিজস্ব দায়িত্বের উপর সার্ত্র প্রচণ্ড জোর দেন—বস্তুত এই দায়িত্বের ধারণাটাই সার্ত্রীয় নীতিধারণার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু শাফও তো নিজেই লেখেন, "আমি বন্দী অবস্থায় মৃত্যু-দণ্ডের অপেক্ষায় থাকতে পারি। তবু আমার নির্বাচনের স্বাধীনতা আছে। আমি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারি অথবা মাথা উঁচু রেখে মৃত্যু বরণ করতে পারি। আমি এখনও স্বাধীন।" ঠিক এই অর্থেই কি সার্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বলেন না? তাহলে প্রভেদটা কোথায়?

পরিবেশ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যে ধরনের সীমানা আরোপ করে, তাকে উপেক্ষা সার্ত্র কোনখানে করেছেন? কামুকেও কি তিনি এই-ই বলেন নি যে, তোমার স্বাধীনতার ধারণা অলীক। আমরা সকলেই খাঁচায় বন্দী। তার মধ্যে বড়জোর তুমি একটু কম জনাকীর্ণ অঞ্চল বেছে নিতে পার। কিন্তু একমাত্র স্বাধীনতা যা আছে তা "স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামে রত হওয়ার স্বাধীনতা?" শাফ-এর অন্য আপত্তির কারণ সার্ত্রের ধারণায় ব্যক্তির একাকিত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান, তাতে despair, anguish প্রভৃতি কিছু নেতিমূলক ভাবকে মেনে নেওয়ার দিকে ঝোঁক। কিন্তু এখানেও শাফ-এর আপত্তি খুব ধোপে টেঁকে না। একথা ঠিক যে কয়েকটি অত্যন্ত ভাবাবেগে ভরপুর বাক্যকে অযথা গুরুত্ব প্রদান করে সার্ত্রীয় দর্শনে একটি মনোলোভা রোমান্টিকতার আমেজ আনা হয়েছে এবং যদিও ব্যক্তিকে কর্মে প্রেরণা দেওয়াই যে-দর্শনের মূল লক্ষ্য তাতে আবেগের স্থান থাকাটা অবাঞ্ছনীয় নয় তথাপি শাফ-এর সমালোচনা স্বীকার্য যে নিছক শাস্ত্রীয় বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এ-জাতীয় ঝোঁক বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু বিরক্তি মেনে নেওয়ার পর এই বাক্যগুলির দরুণই সার্ত্রীয় দর্শন নস্যাৎ হয়ে যায় কিনা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। এখানে স্মর্তব্য যে-বাক্যগুলি সাধারণত যে ভাব ও অর্থ বহন করে থাকে সার্ত্রীয় দর্শনে সেই ভাব ও অর্থ তারা বহন করে না, এবং তাদের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করলে তাদের সম্পর্কে আপত্তিও ঘুচে যায়, প্রশ্ন যা থেকে যায় তা শুধু তাদের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে। মানুষ 'একাকী' বলতে যদি এই বোঝা হয় যে মানুষ সমাজসম্পর্কহীন; একদিকে মানুষ একা অপরদিকে গোটা জগৎ সংসার, ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে ব্যষ্টিমানুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র নিরন্তর সংগ্রামের, তা নিশ্চয়ই মার্কসবাদীর জীবনবোধের বিরুদ্ধগামী হবে কারণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সখ্যভাব সম্ভব। প্রেম ভালোবাসা মিথ্যা নয়। একথা ঠিক যে প্রত্যেক মানুষই মনের একটি গভীরের তলে একেবারেই একাকী, সেখানকার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশ করার বা কারও বোধে আনার কোনো মাধ্যমই তার নেই কিন্তু এও ঠিক যে মানুষ যে পরিমাণে ভালোবাসতে পারে, যে পরিমাণে মনে সৌহার্দ্য, সহানুভূতি সহৃদয়তা ও করুণার উদ্রেক করতে পারে অথবা যে পরিমাণে মানুষ শিল্পী বা কবি সেই পরিমাণে নিজের ও অপর ব্যক্তির মধ্যে সে সেতুবন্ধনে সমর্থ হয়। কিন্তু একাকী বলতে সার্ত্র সম্পূর্ণ অন্য জিনিস বোঝেন, মানুষ বন্ধুতা সম্ভাবনা-

করে প্রথমটিকে যদি গ্রহণ করা হয় তো তার মানে হয় এই যে ব্যক্তির "will to act is determined", কিন্তু তথাপি "he is able to choose one of several alternative courses of actions." আমার কাছে এ প্রস্তাবটি স্ববিরোধী বলে মনে হয়।

"রাজনীতি ও নৈতিক দায়িত্ব" শীর্ষক পরিচ্ছেদে শাফ অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেন এমন একটি সমস্যার উত্থাপন করে যা শুধু পোলাণ্ডেই নয় সাম্প্রতিক ভারতবর্ষেও অনেকের মনকেই বিচলিত করছে। সমস্যাটি এই: কোনো পার্টির সভ্য যদি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যখন পার্টির অনুশাসন মেনে চললে তাকে এমন কাজ করতে হবে যা তার নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ভুল বা অন্যায়, এবং পার্টির নিজের লক্ষ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর, তখন তার কর্তব্য কি? শাফ নিজেই এখানে স্বীকার করে নেন যে এ অবস্থায় পার্টির সভ্যকে একক অবস্থাতেই নিজের দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, অস্তিত্ববাদীরা যে অর্থে "একাকিত্বের" কথা বলেন সেই একাকী অবস্থায়ই। পার্টির অন্তিম লক্ষ্য ও সাধনার সিদ্ধিলাভে পার্টির ঐক্যের মূল্য কতটুকু তা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকেই নিজস্ব তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখতে হবে। যদি বিশেষ কোনো সভ্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে পার্টির লক্ষ্যের স্বার্থেই পার্টির অনুশাসন অমান্য করা উচিৎ তো তাই, শাফ-এর মতে, হবে তার কর্তব্য। সাধারণ জনমত বা পার্টির অন্যান্য সভ্যদের মত কোনো কিছুই বিশেষ সভ্যের এই দায়িত্বের ভার লাঘব করতে পারে না। শাফ লেখেন, "এখানে যে দ্বন্দ্ব মূলত তা যৌথ অনুশাসন ও সত্যানুসন্ধানের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে লজ্জাকর মনে করে আমরা অনেক সময়ে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু তা ভুল। এ-একটি মানবিক সমস্যা…।" আরও বলেন, "যদি সর্ববাদীসম্মত যা শুধুমাত্র তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হই, তো বিজ্ঞানে, আর্টে এবং রাজনীতিতেও কি আশা করা যেতে পারে? ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে বুদ্ধিগত অচলতা ও মতান্ধতায় আমরা ভেসে যাব।"

একই উৎসাহের সঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হল পরবর্তী একটি অধ্যায়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা, বিশেষ করে শিল্পীর স্বাধীনতার স্বপক্ষে শাফ-এর নির্ভীক মত প্রচার। শিল্প ও বিজ্ঞানের এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বিজ্ঞানী ও শিল্পীর স্বাধীনতা অবাধই হওয়া উচিৎ (যদিও তিনি স্বীকার করেন

এমন অনেক ক্ষেত্রও আছে যাতে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই স্বাধীনতাকে সীমিত হতে হয়) এই কথা জোর করে বলার প্রয়োজন ছিল। গণিত বা পদার্থবিদ্যা বা বিশুদ্ধ সংগীতের কোনো বাদানুবাদে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত আর কারও অংশগ্রহণ করা উপহাস আমন্ত্রণ করা তো বটেই, সাহিত্য কাব্য বা চিত্রকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও শিল্পীদের উপরও যে ধরনের খবরদারি সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে করা হয়েছে তা যে একেবারেই শুভ নয় একথাও তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শের শুদ্ধতা রক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গেও তিনি যা বলেন তা আমাদের অনেকের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে বিশেষ করে আমাদের মধ্যে তাদের যারা মনে করি ভারতবর্ষেও আদর্শের বিনিময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সাফল্য সন্ধানের বিপদ গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। পোল্যাণ্ডের বিশেষ অবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শাফ বলেন, যতই থিয়োরি কপচান হোক না কেন, জনসাধারণের মনে বিদ্রোহ ভাব জাগেই যখন তারা দেখে, এবং নিতান্তই বিক্ষিপ্ত ভাবে নয়, অন্যায়, চৌর্যবৃত্তি, জাতিবিদ্বেষ, রহস্যাশ্রিত চিন্তা ও আত্মম্ভরিতার উদাহরণ। বলা হয়, কিছুকালের জন্য এ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এরই নাম কি সমাজতন্ত্র? অপর জায়গায় আমাদেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন, সামাজিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ আরও একটি ব্যাপারে আলোকপাত করে, "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিশানাকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের জঙ্গলে আদর্শকে হারিয়ে ফেলার প্রবণতা।" অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি এই প্রবণতার কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করেন, শুধু তাই না একে একটি আবশ্যিক গুণ হিসেবেও পাচার করে দিতে চেষ্টা করেন। শাফ বলেন, এরা আসলে cynic, এঁদের practicality মুখোস মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদের অধ্যায়ে এসে কিন্তু শাফ একেবারেই অসতর্ক হয়ে পড়েন। একাধারে অনেকগুলি ভুল কথা একের পর এক বলে যান। তার কারণ মানবিকবাদ বা humanism বলতে কি বোঝানো হয় তা নিয়ে মনে হয় তিনি একেবারেই চিন্তা করেন নি। Humanism-কে তিনি humanitarianism মনে করে লেখেন, "সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদ কোনো আন্‌কোরা নতুন জিনিস নয়···প্রতি যুগেই সেই যুগের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত মানবিকবাদ ছিল। যে-কোনো যুগেরই বিপ্লবী ও সংশোধনবাদী আন্দোলন,

যা সামাজিক অন্যায় ও অসমতা, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত তা অন্তিম বিশ্লেষণে মানবিকবাদে পরিনমণীয়। এই অর্থে প্রাচীনকালীন মানবিকবাদ, খ্রীষ্টধর্মের প্রথম যুগের মানবিকবাদ, রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এন্‌লাইটেন্‌মেণ্ট ও ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের মানবিকবাদের কথা বলতে পারি।" তাঁর বক্তব্য অবশ্যই সর্বৈব ভুল। মানবিকবাদের ধারণাটি কি তার আলোচনা এখানে স্থানাভাবে অসম্ভব, কিন্তু তা যে মানবপ্রেম বা জীবে দয়া জাতীয় কিছু নয়, humanitarianism-এর থেকে যে তা একেবারেই পৃথক, কোনো ধর্মীয় মতবাদ ও মানবিকবাদ যে সহাবস্থান করতেই পারে না, তা জোর করে বলা যায়। এ-জাতীয় ভুল হামেশাই করা হয় মনে হয় এবং সেজন্যই প্রসঙ্গটি ইচ্ছে করে তুললাম। উদাহরণত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শারদীয় পরিচয়'-এ লেখেন যখন তিনি কারও মুখে শোনেন "এদেশের যে পরম্পরা, যে ঐতিহ্য, তার সঙ্গে মানবিকতারও (humanism) কোনো সামঞ্জস্য নেই, তখন ··মন রুষ্ট আর বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়।" এদেশের পরম্পরা ও ঐতিহ্য মূলত ধর্মীয়, মানুষের চাইতে দেবতা এবং ইহকালের চাইতে পরকালকেই এদেশের ঐতিহ্যে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এই ধারণার বশবর্তী আমিও এই মত পোষণ করি যে এ ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবিকবাদের কোনো মৌলিক সম্পর্কই নেই। এ-ধারণা ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু আরও অনেকেরই হয়তো এই ধারণা আছে। এ-ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করতে শ্রীমুখোপাধ্যায়ই কিছু লিখুন না, আমরা যারা কানে প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস পড়িনি তারা উপকৃত হই। কিন্তু একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি: ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রে মানবিকবাদের স্থান আছে কি নেই তা বিচার করতে শুধু ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করলেই নিশ্চয়ই চলবে না, মানবিকবাদ (humanism) বলতে কি বোঝায় তাও নিশ্চয়ই পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে।

অশোক রুদ্র

তবু প্রেম তবু প্রাণ। নমিতা বসু মজুমদার। প্রকাশক: ভবানীপ্রসাদ বসু। দু টাকা
দুপুর পর্যন্ত। রামগোপাল নাথ। মিতা প্রকাশন। দেড় টাকা

সাম্প্রতিক কালের বাঙলা সাহিত্যের কবিতা শাখাটি বিশেষভাবে প্রাচুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে খ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত কবিদের কবিতা

সংগ্রহ একটির পর একটি প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সেগুলি যৎকিঞ্চিৎ সমাদরও লাভ করছে, এটা আশার কথা।

নমিতা বসু মজুমদার এবং রামগোপাল নাথ, আধুনিক কবিতার রচয়িতা হিসেবে দুটি নতুন নাম।

নমিতা দেবীর গ্রন্থে সংকলিত সবকটি কবিতাই গদ্য ছন্দে রচিত। কবিতাগুলিকে গ্রন্থমধ্যে তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। আধুনিকতার নামে দুর্বোধ্য পরীক্ষার সচেতন প্রয়াস কোথাও লক্ষ্য করা যায় না, বরং একটা সহজ আন্তরিকতার স্পর্শ কবিতাগুলোর সর্বত্র। সার্থক গদ্য কবিতা রচনা করতে গেলেও ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ দখল থাকা চাই; নমিতা দেবীর গ্রন্থে এ বিষয়ে অবশ্য কোনো কোনো স্থানে কিঞ্চিৎ শিথিলতা লক্ষ্য করা যাবে। কোনো কোনো স্থানে বিখ্যাত দু একজন কবির অস্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু কবিতা কটির 'টোন' আমাকে মুগ্ধ করেছে। বলিষ্ঠ আশাবাদে সংশয়হীন প্রত্যয়জাত উচ্চারণ কবির কলাকৌশলগত দুর্বলতাকে অনেক ক্ষেত্রে ছাপিয়ে উঠেছে। যেমন,

উজ্জ্বল প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠ আমরা
অন্ধকারের মানুষ,
শিল্পের আলো দেখব।" (শব্দ, মুঠো, বৃষ্টি)

এমন বহু উজ্জ্বল পংক্তি গ্রন্থপাঠে পাঠককে মুগ্ধ করবে। কিন্তু বইটির প্রচ্ছদরচনা ভালো নয়—তা আধুনিক রুচির পক্ষে পীড়াদায়ক।

রামগোপাল নাথের কবিতাগুলি অধিকাংশই গতানুগতিক পদ্যছন্দে রচিত। কয়েকটি কবিতায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ অগ্রজ কবিদের অনুসরণের প্রয়াসও দেখা গেল। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও কবি আধুনিকতাকে পরিহার করে কিছুটা পুরনোপন্থী। পংক্তি শেষে অন্ত্য-ক্রিয়াপদের মিল রবীন্দ্র-পূর্ব কাব্যধারার একটি বৈশিষ্ট্য; আলোচ্য বইটিতে এমন কিছু কিছু ব্যবহার আছে। নির্ভর, স্বপ্ন-সাধ, যাত্রী, পঁচিশে বৈশাখ প্রভৃতি কবিতা বেশ ভালো রচনা। সামগ্রিকভাবে কবিতাগুলোর সুরব্যঞ্জনা পাঠকের ভালো লাগবে। প্রচ্ছদপট সাধারণ স্তরের।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

ভারতীয় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়

"এখানে শিল্পচর্চা করতে এসেছি আমরা অধিকাংশ দুঃস্থ, দরিদ্র মধ্যবিত্তের দল। শৌখিন মনোবৃত্তি নিয়ে, শখের শিল্পচর্চা করতে এখানে আসেনি কেউ। অথচ ছবি সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলার মূলে কতো বাধা। একে আর্থিক সঙ্গতি কম, তায় কোহিনুরতুল্য মূল্যের কাছে আমরা পিছু হঠি। ব্যবসায়ীদের ফন্দিবাজিতে ন্যায্যমূল্যের চারগুণ ছয়গুণ মূল্য দিতে হয়।"—ধর্মতলা স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস্ অ্যাণ্ড ড্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপ-এর ছাত্রসংসদ তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকায় এসব কথা বলেছেন। আরও অনেক সমস্যা তাঁদের আছে: পুরনো নোনাধরা বাড়ি, ঘরগুলি স্যাঁৎসেঁতে, যথেষ্ট আলোর অভাব। এরই মধ্যে ছাত্ররা যে ছবি আঁকেন, সেইটেই তাঁদের শিল্পানুরাগের প্রমাণ। কিন্তু এঁদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল সরকারী উদাসীনতা। অর্থানুকূল্য তো দূরের কথা, "বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক দরিদ্রতা"র অজুহাতে কলকাতার এই পুরনো শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রটি সরকারী অনুমোদন পর্যন্ত পায়নি।

অগত্যা, এবারে তাঁরা তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়েছেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে দিয়ে।—ব্যাপারটা খুব করুণ। এবং, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এ এক মস্তবড়ো বিড়ম্বনা। বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞানীদের পেছনে ঠেলে দিয়ে মঞ্চের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রাচ্যবিদদের বিশ্ব-সভায় সভাপতিত্ব করেন রাসায়নিক ও পেট্রোলিয়ম-মন্ত্রী। এবং এই প্রসঙ্গে দেখছি, আরেকটি বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে, এমন কি, বঙ্গেশ্বরেরও মুখ্য ভূমিকা। সরকারী পদমহিমায় আর রুলিং পার্টির বস্ হিসেবে এদেশে পঙ্গুও অবলীলাক্রমে বৈদগ্ধ্যের গিরি লঙ্ঘান।

কিন্তু উপায় কী। দায়ে পড়েই তো বাবা বলা। কারণ, এসব সরকারী কর্তাব্যক্তিদের যাঁরা এ ধরণের অনুষ্ঠানে খাতির করে নিয়ে আসেন, তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেনাদের শিল্পানুরাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তাই,

ব্যাপারটা বেশ একটু করুণ—এবং বিড়ম্বিত—হলেও, মনের ক্ষোভটুকু চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রদর্শনীটি দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছি। প্রায় প্রত্যেকটি কাজেই একটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্য আছে। আমাদের আজকের আর্টের ক্ষেত্রে যে অত্যন্ত বিরক্তিকর এক কৃত্রিমতা শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা করছে, সেই ভঙ্গীসর্বস্বতা থেকে এখানকার শিক্ষার্থীরা মুক্ত বলে মনে হল। এটা এখানকার শিক্ষকদের সম্বন্ধে একটা বড়ো কথা। তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের রূপদৃষ্টি যাতে স্বভাব-স্বাচ্ছন্দ্যেই বিকশিত হয়ে ওঠে, সেদিকে তাঁরা তাদের পরিচালিত করছেন; বস্তুরূপকে বাদ দিয়ে কলাকৈবল্যের নানা কিম্ভূত প্যাঁচ কষা প্র্যাক্‌টিস করতে তাদের বাধ্য করেন নি। এখানকার এই তরুণ শিক্ষার্থীদের সৃষ্টি সহজ পথেই আত্মপ্রকাশিত। এই বাস্তবানুগ কাজগুলি দেখে আমরা তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত।

সাধারণ ভাবে, তেল-রঙের কাজগুলিই আমাদের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বলে মনে হয়েছে। অধিকাংশ কাজেই কম্পোজিশনের সৌকর্য সম্পর্কে শিল্পীর উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। চিত্রিত বিষয়ের সংস্থাপন ও বিন্যাস সম্পর্কে এই সুষ্ঠু দৃষ্টির মূলে অবশ্যই আছে শিল্পীদের সুস্থ বাস্তববাদী মনোভাব। কিন্তু রঙের ব্যবহারে এগুলিতে এক ধরনের অনুজ্জ্বলতা ও স্বাদহীনতা লক্ষ্য করা গেল: নীল-সবুজ-ধূসরপ্রধান, বিপরীত টোন-বর্জিত, মৃদু, টানা রঙের কাজ।—এর একটি কারণ সম্ভবতঃ অধ্যক্ষ শ্রীসতীশ সিংহের প্রভাব; অন্য কারণ হতে পারে—ছাত্ররা যা বলেছেন—রঙ-"ব্যবসায়ীদের ফন্দিবাজি"র ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্রদের অসুবিধে।

গ্র্যাফিক্‌স্ বিভাগের কাজগুলি এবং ভাস্কর্যগুলি ভালো। তেমনি দুর্বল কমার্শিয়ল বিভাগটি। কমার্শিয়ল আর্ট আজ এতো উন্নত হয়ে উঠেছে যে এই বিভাগে আরও কিছুটা মৌলিক কল্পনা আশা করেছিলাম। জলরঙের কাজগুলি আরেকটু বাছাই করলে দর্শকরা একটু কম ক্লান্তি বোধ করতেন।

কলকাতায় সোভিয়েত কলা-সমালোচক

কলকাতার বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক মহল ইদানিং প্রায়ই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট গুণীজনের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন। এই জানুয়ারি

মাসের প্রথম সপ্তাহে ইতিমধ্যে যে দুজন প্রখ্যাত সোভিয়েত নাগরিক কলকাতা ঘুরে গেছেন, তাঁদের একজন হলেন আজেরবাইজানের সুরকার সুলতান গাজীবেকফ—যিনি এখানে এসে বিশিষ্ট কয়েকজন গায়ক, যন্ত্রসংগীতশিল্পী ও সংগীত-ইতিহাসবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। অপর জন হলেন প্রবীণ কলা-সমালোচক ও শিল্প-ইতিহাসবিদ বোরিস ভ্লাদিমিরফ ভেইমার্ন।

ভেইমার্ন চারুকলার ইতিহাসবিদ ও প্রাচ্যশিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশ্বের নানা দেশে সুপরিচিত ও সম্মানিত। নিখিল-সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস কর্তৃক সাত খণ্ডে প্রকাশিত বিরাট গ্রন্থ 'চারুকলার ইতিহাস'-এর তিনি অন্যতম সম্পাদক। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ আর্টস'-এর প্রাচ্য চারু ও কারুকলা বিভাগটি তিনিই সম্পাদনা করেছেন। বর্তমানে ভেইমার্ন নিখিল-সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের আর্ট রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের সোভিয়েত জাতিসমূহের চারু ও কারুকলা বিভাগের প্রধান।

ভেইমার্ন জানালেন, প্রাচ্যকলার অনুরাগী হিসেবে ভারতে আসার জন্যে তাঁর যেমন দীর্ঘকালের বাসনা ছিল, তেমনি ভারতে আসার পর কলকাতায় আসার জন্যে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। কারণ, এই কলকাতাই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মস্থান।

কিন্তু, দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতায় আমাদের আধুনিক চিত্রকরদের কিছু রচনা ও কয়েকটি প্রদর্শনীতে পশ্চিমী কিম্ভূত অ্যাব্স্ট্র্যাক্শনিজ্ম্ আর মডার্নিজম্-এর দিশেহারা নকলনবিশী দেখে, ভেইমার্ন বেশ একটু বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হল। বারবার বললেন: বাস্তববাদী শিল্পই জীবনের সত্যগুলিকে যথাযথরূপে প্রতিফলিত করে। শুধু চিত্রকলা নয়—যেকোনো মহৎ শিল্পকেই জীবনের বাস্তব সত্য থেকে রস আহরণ করতে হয়। বাস্তবতার গভীরেই মহৎ শিল্পের মূল প্রোথিত। আর, সেই জীবনসত্যকে বিকৃতরূপে উপস্থিত করে তথাকথিত বিমূর্তবাদ, আব্স্ট্র্যাক্শনিজ্ম্। কারণ, তা হল জগৎ আর জীবন সম্পর্কে শিল্পীর আত্মমুখী আর অস্বচ্ছ দৃষ্টিরই প্রতিক্রিয়া।

ভেইমার্নের এই কথাগুলি শুনে মনে হয়েছিল—আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের মডার্নিস্ট হিসেবে জাহির করার জন্যে তথাকথিত বিমূর্তবাদের চর্চা করছেন, তাঁদের অনেকেরই আদৌ কোনো জীবনদর্শনের বালাই নেই। অধিকাংশই এসব করছেন—কিছুটা ফ্যাশনের টানে; আরও বেশি, ট্যাঁস দৈনিক পত্রিকার হাত-তালি কুড়িয়ে ইওরোপে যাবার স্কলারশিপ জোগাড়ের

চেষ্টায় ; এবং, সবচেয়ে বেশি, স্টাণ্ট-সন্ধানী মার্কিন-ফরাসী ট্যুরিস্টদের পকেটের দিকে লক্ষ্য রেখে।—কিন্তু, কথাটা ভেইমার্নকে বলতে পারি নি। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে যে-বিদেশী এদেশে এসেছেন, তাঁকে একথা বলা চলে না।

ভেইমার্নও মনে করেন—কিছু সংখ্যক ভারতীয় শিল্পী পশ্চিম-ইওরোপীয় ও মার্কিন মডার্নিস্টিক ফ্যাশনের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও, সেটা ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটা সাময়িক উপদ্রব। ভারতীয় চিত্রকলার যে মহৎ আর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, সেখান থেকেই ভারতীয় চিত্রকরদের প্রেরণা ও রস আহরণ করতে হবে। এবং যাঁরা তা করছেন, তাঁদের সৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত যথার্থ শিল্পের মর্যাদা পাবে। পশ্চিমী বিমূর্তবাদ মানব-স্বরূপের বিকৃতি ঘটাচ্ছে, মানুষের সত্য মূর্তিটিকে ভেঙেচুরে দিচ্ছে। তাই তা মানবতা-বিরোধী।

রবীন্দ্র মজুমদার

স ং স্কৃ তি - স ং বা দ

তাঁকে চেনা মনের একটি জয় : সপ্ততিতম জন্মদিনে বিজ্ঞানাচার্য

“যাঁকে চেনা মনের একটি জয়
মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য সে মন, ব্যাপ্তি যার সর্বদিকে,
শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, অথচ
প্রত্যহের জীবনসম্ভোগে—”

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব দেশবাসী উদ্‌যাপন করলেন ১৯৬৪-র ১লা জানুয়ারী, নতুন বছরের প্রথম তারিখটিতে। কবি বিষ্ণু দে-র ভাষায় “যাঁকে চেনা মনের একটি জয়”—সেই বিজ্ঞানাচার্য বসুর মননের ব্যাপ্তিও তাঁরই “অতি মস্তিষ্কের জটিলতায়”, অথচ যা তাঁরই আবার “আত্মভোলা, বেহিসাবী, নির্বিকার, সাত্ত্বিক প্রসাদে”-ই সম্ভবে। তাঁর মনন, মানবিকতা আর হৃদয়বত্তার সেই বিরাট ও সমাহিত জগতের বাসিন্দা হতে শুধু বিজ্ঞানী নন, সাহিত্যকর্মীদেরও তাই অবারিত নিমন্ত্রণ থাকে।

এই ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীরই একেবারে শুরু থেকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অন্যতম সহযোগিরূপে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাই বিজ্ঞানের জগত থেকে সাহিত্যের জগতে তাঁর “অগ্নিময় প্রতিভায়” স্বতই স্বচ্ছন্দবিহারী হন। সেদিনের কথাগুলি স্মরণ করেছেন সুধীন্দ্র-সত্যেন্দ্রেরই সতীর্থ-সহযোগী সেই ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীর শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় বিজ্ঞানাচার্য সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতি বর্ণনা করেছেন। এই লেখাগুলি এবং ‘পরিচয়’-এর প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের “বিজ্ঞানের সঙ্কট” প্রবন্ধটি পুনঃমুদ্রিত করে ‘পরিচয়’-এর এই সংখ্যাটিতে আমরা বিজ্ঞানাচার্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সিদ্ধেশ্বর সেন

বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসব

ইংরেজী ১৯৬৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের বহু-খ্যাত আম্রকুঞ্জে যে বৎসর শেষের সমাবর্তন সুচারুভাবে সম্পন্ন হল—সেই বৎসরটি বিশ্বভারতীর অন্যথা মন্দগতি জীবনে বিশেষ কর্মচঞ্চলতার দাবি রাখে। শতবার্ষিকী উৎসবের পরবর্তী সরকারী ও বেসরকারী উদার অর্থমঞ্জুরী এবং সংযোগ-সমৃদ্ধ উপাচার্যের উদ্যোগের ফল এই বিশেষ বছরেই পাকতে শুরু করে। বহু নতুন বিভাগ সৃষ্টি, পুরাতন বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি মারফৎ এই এক বছরেই বিশ্বভারতীর শিক্ষক সংখ্যা শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন দালানবাড়ি তৈরিতে এই এক বছরেই অন্তত অর্ধকোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের নতুন গ্রেডে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এই এক বছরের মধ্যেই কার্যকরী হয়ে অনেক মাস্টারমশাই ও কর্মীকে ঘরবাড়ি তৈরিতে প্রেরণা দিয়েছে। গত বৎসর বিড়লার উদার অর্থে পুরনো শ্রীসদনের পাশাপাশি ছাত্রীদের জন্য যে নতুন 'ডিলুক্স' হোস্টেল খোলা হয়েছিল—তারই পাশে গোয়েঙ্কার দানে আরেকটি হোস্টেল উঠবে।

চীন-আক্রমণ পরবর্তী এই বৎসরে শান্তিনিকেতনে ন্যূনতম সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে। ন্যাশানল ক্যাডেট কোর জনবল ও অর্থবলে বহুগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে।

এবম্বিধ কর্মোদ্যোগের চাঞ্চল্য ছাড়াও এই বিশেষ বৎসর অন্যান্য কয়েকটি ঘটনা উপলক্ষ্যও স্মরণীয়। বোলপুর তথা শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের ছাত্রদের ডে-স্কলার হিসেবে বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভের সুযোগ বন্ধ করার কানুন এই বৎসরই কার্যত চালু হয়। পাঠভবন স্তরে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী মাধ্যম চালুও এই বৎসরেই। শ্রীনিকেতনে উচ্চপল্লী শিক্ষা কেন্দ্রে গোলোযোগ, পুলিশ হামলা, ছাত্র ও কর্মী গ্রেপ্তার—এসব ঘটনা এই আলোচ্য বৎসরেই।

এই বিশেষ কর্মোদ্যগে চিহ্নিত বৎসরের পটভূমিতে আচার্য নেহরু আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন প্রভাতে যখন ক্লান্ত অথচ গভীর স্বরে ক্রমপ্রসারমান টেকনোলজি ধারণ করার মতন উপযুক্ত 'ইডিওলজির' সন্ধান করেন—বিজ্ঞানের পরিপূরক মানবতাবোধ—আর সেই বিজ্ঞান ও টেকনোলজির পরিপূরক শক্তির চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বভারতীর কথা যখন উল্লেখ করেন, সঙ্কীর্ণ সমসাময়িকতার

ঊর্ধ্বেও কোথাও কোনোস্থানে সভ্যতার কতকগুলি মৌলিক উপাদানে আগ্রহ, নিরলস চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বভারতীর কল্পনা যখন তাঁর ভাষণের প্রতিটি ছত্রে নিহিত থাকে তখন স্বভাবই প্রশ্ন জাগে।

বিশ্বভারতী কর্মোদ্যগের বর্তমান গতি ও চরিত্র এবং বিশ্বভারতী পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবধান কি আজ এমন পর্যায়ে পৌছয় নি যখন হয় বিশ্বভারতীর আদর্শের পুনর্বিচার করতে হবে নতুবা বর্তমান গতির মোড় ফেরাতে হবে?

নেহরুর এ বৎসরের সমাবর্তন ভাষণ এক দার্শনিক স্তরের স্বগতোক্তি। বিশ্বভারতীর সমস্যায় তা আলোকপাত করে না। উপাচার্যের প্রতিবেদন বিশ্বভারতী পরিচালনা-সংক্রান্ত ক্লান্তিকর খুঁটিনাটিতে পরিপূর্ণ—বিশ্বভারতীর বর্ণহীন কর্মধারার এক প্রতিবেদন। প্রধান বক্তা শ্রীকোঠারির ভাষণের প্রথমাংশে আত্মন, ব্রহ্মণ, মন, বস্তু ইত্যাদি মৌলিক দার্শনিক বিষয় সম্পর্কে এক বিদগ্ধ আলোচনা (যদিও প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন ওঠে) এবং দ্বিতীয়াংশে বর্তমান শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 'কেজো' কথা। ভারতের ক্ষেত্রে কৃষিবিদ্যার অপরিসীম গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া উল্লেখযোগ্য। অন্য কারণে উল্লেখযোগ্য, এই প্রসঙ্গে চীনের নজির উপস্থিত করা।

এ বছরের সমাবর্তনের উল্লেখযোগ্য 'ঘটনার' মধ্যে অধ্যাপক কবি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ। ইতিপূর্বে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

এই বৎসরই চীনাভবনের অধ্যাপক শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপ্লবোত্তর চীনের কবিতা সম্পর্কে এক নিবন্ধে পি. এইচ. ডি লাভ করেন।

সমাবর্তনের দীর্ঘাভ্যস্ত নিখুঁত আচাররীতি—মন্ত্রপাঠ, আলিম্পন, সপ্তপর্ণ দান, আম্রকুঞ্জের সেই বিশিষ্ট 'সেটিং'—এখনও অনাক্রান্ত, অক্ষত। বিশ্বভারতীর বিশিষ্টতার survival।

শান্তিনিকেতনে এবারের পৌষমেলা

৭ই পৌষ আরম্ভ হয়ে সরকারীভাবে তিনদিন এবং বেসরকারীভাবে আরও তিন-চারদিন গড়িয়ে যে মেলা শেষ হয় শান্তিনিকেতনের সেই মেলা ইতিমধ্যেই শহুরে বাঙালী সংস্কৃতিতে এক স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন অর্ধ-

শতাব্দী আগে এ ধরণের মেলার পরিকল্পনা করেন, তখন একদিকে যেমন পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের শিল্পকে উৎসাহিত করার প্রশ্ন ছিল, অপরদিকে শহরের শিক্ষিতশ্রেণীকে গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে পরিচয় ঘটানোর ব্যাপার ছিল। শহর ও গ্রামের বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে এই মেলার ভূমিকা কল্পনা করা হয়েছিল—একথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না।

বাংলাদেশে আজ এমন কোনো মেলা তথা আনন্দকেন্দ্রে নেই যেখানে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার মতো সমাজের সর্ব স্তরের এত বিচিত্র সমাবেশ হয়। পাশের গ্রামগুলির থেকে আগত 'প্রাকৃত'জনদের সঙ্গে কলকাতার হালফ্যাসান দুরস্তদের কোনো প্রত্যক্ষ বিনিময় হয় না—এ স্বাভাবিক। তবু একই মেলার আনন্দের অংশগ্রহণকারী এরা। এর মূল্য যতটুকু ততটুকু উল্লেখ নিশ্চয়ই করতে হয়।

শিল্প বিপ্লবের সৃষ্টি ইওরোপের নগর জীবনে গ্রাম সময়ের বিচারে অনেকাংশে অতীত। পুঁজিবাদী নগরকেন্দ্রের লক্ষ্যহীন গতিবেগে ক্লান্ত সভ্যতা অনেক সময় পশ্চাদমুখী হয়ে গ্রামীণ মূল্যগুলির জন্য হাতড়ে বেড়ায়। অপর দিকে, বাংলা সংস্কৃতিতে কলকাতার উপস্থিতির পাশাপাশি গ্রাম বিশেষভাবে বর্তমান। এই বর্তমান গ্রাম নগর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে না—তার চেয়ে এক আধা-কল্পিত অতীত গ্রামের হাতছানি ইওরোপীয় নকলে ক্লান্ত কলকাতা সংস্কৃতিকে সাড়া দেয় অনেক বেশি। মেলায় দু-হাত দূরের জীবন্ত সাঁওতালের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় 'কুটির শিল্প'-জাত ফোক্ কালচার তথা ড্রয়িংরুম সজ্জা উপকরণের দোকানগুলিতে টাঙানো সাঁওতালের ছবি। আর ফোক্ রুচির প্রসারতার লক্ষণ—এ বছরের 'কুটির শিল্প'জাত দোকানের ব্যাপক সংখ্যায়। রুচির বহিরঙ্গ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। বাংলার শিক্ষিত শহরবাসীর এদিকে ঝোঁকের পেছনে একটা সৌন্দর্যবোধের গভীরতার লক্ষণ স্পষ্ট। বোম্বাই বা দিল্লীর সঙ্গে তুলনা করলে যা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু এহ বাহ্য।

'গ্রামীণ শিল্প' হিসেবে উপস্থিত এই পণ্যগুলি কদর পেলেও যথার্থ গ্রামের শিল্পের কি নিদর্শন মেলে এ মেলায়? শিল্পসত্তার যদি আর্থিক জীবন ও মন এই দুয়েরই নির্দেশক হয় তবে আশেপাশের গ্রামগুলির দৈন্য—ব্যবহারিক ও আত্মিক দুই-ই—কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না? সেই মান্ধাতার আমলের হাঁড়িকুড়ি হাতা খন্তা, পাথরের বাসন—এর মধ্যে সামান্য হেরফেরও নেই। কাঠের

দরজাপাল্লাও অপরিবর্তিত। তফাৎ শুধু আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপকতায়। কোনো বছর বেশি, কোনো বছর কম। ধানের ফলন ও দরের সঙ্গে বাঁধা। নতুন ক্যানেল, ধানের অপেক্ষাকৃত ভালো দর—এই দুটি ঘটনা এ অঞ্চলে সওদা কিছুটা স্থির ভাবে বাড়িয়েছে। কিন্তু গ্রামে কুটিরশিল্পের চরম দৈন্যের শত চিহ্ন বহন করে এই পৌষের মেলা।

তবু শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা—এর মূল্য অনস্বীকার্য। বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরের এক ছবি—এ মেলা তিনদিনের জন্য তুলে ধরে। মোটরগাড়ির সঙ্গে গরুর গাড়ির সাময়িক সহাবস্থান এ মেলা ঘটায়।

সওদা শেষে মাথায় প্ল্যাস্টিকের ফুল গোঁজা সাঁওতালী ও বাউড়ি মেয়ের দল খলখলিয়ে চলেছে। ফোক্ চিত্র ও টুকিটাকি সওদা করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠছেন Busy Executive-এর bored স্ত্রী। দু-দিনের জন্য চাঙা বোধ হচ্ছে। স্ট্র হ্যাট মাথায়, ছড়ি হাতে রাজধানী ও মফঃস্বল সহরগুলির মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা দুদিনের জন্য মনের সুখে কাপ্তানী করে নিচ্ছে।

শিল্পী, সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ সবার কাছেই যার বহু মূল্য—তিনদিনের শান্তিনিকেতনের এই মেলা সে রকম এক খণ্ড ছবি তুলে ধরে।

নীলকান্ত গুপ্ত

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেস

ভারতের রাজধানীতে এবারের প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়াটা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাঁরা অনেকদিন ধরে প্রাচ্যবিদ্‌দের এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলিতে যোগদান করে আসছেন তাঁদের মতে, আগের বারে মস্কোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশ কংগ্রেসের পরে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এবারের এই ষড়বিংশ কংগ্রেসেই বিশ্বের প্রাচ্যবিদ্‌দের বৃহত্তম সমাবেশ ঘটেছিল—অন্তত প্রতিনিধি সংখ্যার দিক থেকে। ভারতে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার ফলে, স্বভাবতই ভারতবিদ্যা শাখার অধিবেশনগুলি হয়েছিল সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক। প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিনিধিদলেরই কোনো-না-কোনো সদস্য ভারতবিদ্যার কোনো-না-কোনো দিকের ওপর নতুন

আলোকপাত করেছেন। মিশরবিদ্যা ও চীনবিদ্যা বিভাগেও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ পঠিত হয়েছে।

ভানু সেন

ঢাকায় সাংবাদিকদের শান্তি মিছিল

ঢাকা, ১৬ই জানুয়ারি—ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গতকাল সাংবাদিক, লেখক প্রভৃতি এক শান্তি মিছিল বাহির করেন। তাহা ছাড়া ঢাকার সংবাদপত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে সংযত থাকিবার জন্য আবেদন জানান।

(সংবাদ)

উভয় দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অধিবাসীদের নিকট আবেদন

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের উদ্দেশে একটি আবেদন লিপিতে কলিকাতার প্রায় দুই শত শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষর দিয়েছেন।

আবেদনের কণ্ঠ যাঁরা তুলতে চেয়েছেন এবং বুদ্ধিজীবী সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন, গত কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতায় কার্ফু ও যানবাহনের অচলাবস্থার মধ্যে তাঁদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

প্রায় দুইশত জন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষরিত আবেদনটি নিম্নরূপ :

"গত দুই সপ্তাহ যাবৎ পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে যে পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চলিতেছে, তাহার নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা মনে করি যে, যাহারা এই সমস্ত জঘন্য আচরণে লিপ্ত তাহাদের সহিত মানবতা, ধর্ম ও দেশাত্মবোধের কোনো সম্পর্ক নাই। আমরা মনে করি, উভয় দেশের প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সক্রিয়ভাবে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতকারীকে অবিলম্বে নিবৃত্ত করা সম্ভব। আমরা লেখক, সাংবাদিক, চিত্রকর, অভিনয়শিল্পী, ক্রীড়াবিদ ও শিল্পব্রতীরা দেশের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই যে, তাঁহারা অবিলম্বে উভয় দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনুন এবং দুর্গতদের সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসুন।"

এই আবেদনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করিয়াছেন :—

অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সঈদ আইয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আবদুল ওদুদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, ভবানী মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, অজিত দত্ত, হিরণকুমার সান্যাল, গোপাল হালদার, লীলা মজুমদার, শিবরাম চক্রবর্তী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুবোধ ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য, সমর সেন, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, প্রাণতোষ ঘটক, সাগরময় ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, চিন্মোহন সেহানবীশ, অমিতাভ চৌধুরী, শঙ্কর, গৌরকিশোর ঘোষ, নিরঞ্জন মজুমদার, কৃষ্ণ ধর, নরেশ গুহ, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণাচল বসু, সুকুমার মিত্র, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, মণীন্দ্র রায়, অমল দাশগুপ্ত, অরুণকুমার সরকার, অরুণকুমার ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, আতাউর রহমান, ইবনে ইনাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ গুহ, কবিতা সিংহ, রাম বসু, প্রসূন বসু, পূর্ণেন্দু পত্রী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অনিল সিংহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, উৎপলকুমার বসু, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, যুগান্তর চক্রবর্তী, প্রণবরঞ্জন রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবেশ রায়, সুরজিৎ বসু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অসীম সোম, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, জ্যোতির্ময় দত্ত, দীপক মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কমলেশ চক্রবর্তী, রতন ভট্টাচার্য, তারাপদ রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ কর, মতি নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, সমরেশ বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, অসীম রায়, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যেশ ঘোষ, চিত্ত ঘোষ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সৈয়দ আবুল হুদা, রণজিৎ দাশগুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মজুমদার, শান্তিময় রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, যামিনী রায়, প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চুণী গোস্বামী, সতীশ সিংহ, গোপাল ঘোষ, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রভাস সেন, হৈমন্তী সেন, আলি আকবর খান, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,

সুখেন্দু গোস্বামী, সলিল চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অসিত সেন, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ও সি গাঙ্গুলী, রাজেন তরফদার, অজয় কর, তরুণ মজুমদার, নিতাই দত্ত, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র, জহর রায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, কানন দেবী, অনুভা গুপ্তা, শর্মিলা ঠাকুর, তাপস সেন, সমীর ঘোষ, সরযূ দেবী, শম্ভু সাহা, সুনীল জানা, সুব্রত মিত্র, সুব্রত সেনশর্মা, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, সৌমেন্দু রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, এন বিশ্বনাথন, চারুপ্রকাশ ঘোষ, অনুপকুমার, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, সাধনা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গুপ্ত, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ), নীরেন্দ্রনাথ রায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা প্রমুখ।